পাকা আমি ও কাঁচা আমি

(স্ববোধতত্ত্ব-স্বভাবতত্ত্ব)

স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর

সচ্চিদানন্দ সোসাইটি
কলকাতা

প্রকাশক
সচ্চিদানন্দ সোসাইটি

প্রথম সংস্করণ
১৪০৯

প্রাপ্তিস্থান
সচ্চিদানন্দ সোসাইটি
এ-১৯০ মেট্রোপলিটন সমবায় আবাসন
কলকাতা ৭০০১০৫

মুদ্রক
মানসী প্রেস
৭৩ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

আমিতত্ত্বের সরলভাষ্য প্রজ্ঞানপুরুষ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের গ্রন্থ *পাকা আমি ও কাঁচা আমি*। বস্তুত এটি নয়াদিল্লি চিত্তরঞ্জনপার্কের কালীবাড়িতে কয়েকটি সন্ধ্যায় প্রদত্ত প্রজ্ঞানপুরুষের ভাষণসার ষোলটি অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে। যেহেতু আমিতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ ও সমাধানের সংকলন ও সংগ্রন্থন এটি, তাই এই ষোলটি অধ্যায় ষোলটি বিচার হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

আমিতত্ত্ব খুবই গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ—বিশেষত সর্বসাধারণের কাছে এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গেলে অনেক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সরলভাবে এর অন্তর্নিহিত সত্যটি প্রকাশ করতে হয়। যুগে যুগে এই তত্ত্বের ওপর আলোচনা হয়েছে। ঋষি, দার্শনিক ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের আলোচনা, বিচার, বিশ্লেষণ অবশ্যই নানা ভঙ্গিমায় শাস্ত্রের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ঋষি-দৃষ্টিতে 'আমিতত্ত্ব' প্রতিভাত হয়েছে যার ফলশ্রুতি একাধিক কবিতায় ও প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের কাছে এই তত্ত্ব কবিতা, প্রবন্ধ বা শাস্ত্রব্যাখ্যায় সুবোধ্য হয় না, এর জন্য চাই আত্মজ্ঞ পুরুষের সাবলীল ভাষণের শ্রবণ ও তার মনন। দিল্লির কালীবাড়িতে প্রদত্ত স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের এই ভাষণমালা শ্রবণ উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের ছিল বিরল অভিজ্ঞতা। আপামর জনসাধারণের কাছে তা পৌঁছে দিতে ষোলটি বিচারের মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থের প্রকাশনা।

বোধসত্তা আমি নানারূপ বহির্প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয় মন ও প্রাণের মাধ্যমে দেহ-বুদ্ধির ক্রিয়া নিষ্পন্ন করায়। তখন বোধসত্তা চলে যায় পশ্চাতে কিন্তু এর উন্মোচন না হলে 'আমি'-র স্বরূপ প্রকাশ হয় না, তাই এর বিশ্লেষণ প্রয়োজন—'প্রথম বিচার'-এ এই বিজ্ঞানটি আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রজ্ঞানপুরুষ বলছেন—'প্রত্যেকের ভেতরে দুটি 'আমি' আছে, একটি স্থূল-বাস্তবকে নিয়ে মেতে আছে আর 'আমার আমার' করছে, অন্যটি শুদ্ধচিদানন্দস্বরূপ আত্মা।' দ্বিতীয়টি হচ্ছে, 'বোধ, চৈতন্য, জ্ঞান'। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এর সম্বন্ধে বলছেন, 'I exists eternally, I is the I of all other I's'. 'মানুষ সংসারজীবনে আমারবোধ দিয়ে একটা গণ্ডি বানিয়ে নেয়, কিন্তু আমি কথাটি হল আমিবোধ'। আবার 'যখন আমার আর আমি-র পৃথক কোনও ব্যবহার নেই, তখনই তা পরমাত্মা।'

বোধসত্তা আমি বা পাকা আমির সত্য পরিচয় জানতে তা উপলব্ধি করতে হবে—এর বিজ্ঞান ঊর্ধ্বতন মানসচেতনার বিজ্ঞানের প্রথম পর্যায়। এই বিজ্ঞান বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর স্থূল-সূক্ষ্ম, দেহ-প্রাণ ইত্যাদি অনেক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। সুন্দর করে

বলেছেন, 'জীবভাব হল self hypnotized আত্মা'। জীবভাবেই ক্রিয়াশীলতা থাকে। দেহ প্রাণের আশ্রয় আর প্রাণ ও বায়ু ক্রিয়াশীল হয় মনের নির্দেশে। বায়ু, বৃত্তি ইত্যাদি নানাবিধ তত্ত্বের তিনি সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছন্ন আলোচনা করে স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের কথা এনেছেন, বলেছেন কারণদেহের কথা—সর্বোপরি 'দেহস্থোহপি দেহাতীতম্'। জীবের জীবনের উত্তরণের সূত্রও দিয়েছেন—প্রথমে অজ্ঞান, তারপর জ্ঞানাভাস, তারপর বিজ্ঞান তার ওপরে প্রজ্ঞান। তিনি ঘোষণা করেছেন—'তুমি দেশ-কাল কার্য-কারণের অতীত, জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধির অতীত—স্বমহিমায় বিরাজ করছ; রাজা হয়ে ভিখারি হয়ে ঘুরে বেড়াবে কেন।'

তৃতীয় বিচার কেন্দ্রকে নিয়ে যা তুরীয়তে পৌছোবার আগের সোপান। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের চারের সূত্রে এটি অবশ্যই তৃতীয়। এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি সংসারের কথা এনেছেন—তাঁর মতে যা হচ্ছে স্বকৃত চিন্তা ও চর্চার সমষ্টিগত ফল। এই সংসারে থেকে বিষয়ভোগের মধ্যে কখনও অখণ্ড সুখ শান্তি ও অমৃত লাভ হয় না। 'পরমাত্মা পরমব্রহ্মসনাতন আমিময় বোধের কেন্দ্রে রয়েছেন—এই আমি আমি-র জন্যই শুদ্ধ—আমি সেই আত্মাস্বরূপ'। এই আমি ছাড়া যা কিছু তৈরি করবে সবই imperfect। উঠে এসেছে অবিদ্যাশক্তি ও বিদ্যাশক্তির কথাও। বলছেন অবিদ্যা কল্পনাই—'ignorance is your ımagination', আর বিদ্যাশক্তি সমতাপ্রধান তা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। পাকা আমি কী করে হয় বলতে গিয়ে বলেছেন স্বভাবের কাঁচা আমি স্ববোধের পাকা আমির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাকা আমি হয়ে ওঠে।

তুরীয় বোধসত্তাকে নিয়ে চতুর্থ বিচারের সূত্রপাত। একে তুরীয় থেকে আমিত্ববোধের অনাত্মবোধে অবরোহণ এবং অনাত্মবোধ থেকে আত্মবোধে আরোহণ দু'ভাবেই দেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমিক উত্তরণ-এর কথা বিশেষভাবে বিচার করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্ম এরা পরস্পর পরিপূরক কেননা এই তিন তত্ত্বের সঙ্গমেই ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব বা আমিতত্ত্বের উৎপত্তি। সংসার আমিবোধের খেলা। শিল্প সাহিত্য কলা বিজ্ঞান সংগীত দর্শন ইত্যাদি আসল সত্যের অংশবিশেষ মাত্র—এ সবের স্ফুরণে জীবের আমির অহংকার স্ফীত হতে পারে। 'অহংকারের জায়গায় অহংদেবকে বসাতে পারলেই পাকা আমিতে পৌছানো যায়। বস্তুত কাঁচা আমির গুণ ভাব উপাধি সরিয়ে তবে পাকা আমির দেখা পাওয়া যায়।'

আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব-এর বৈদিক প্রতিপাদনের সঙ্গে আমিতত্ত্বের স্বরূপের সম্পর্কের মূল্যায়ন হয়েছে পঞ্চম বিচারে। এই আলোচনা শুরু হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে। কী করে অন্বেষুরা প্রকৃতিতে সৃষ্টির চাবিকাঠি না পেয়ে অন্তরের গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে এর খোঁজ পেলেন তার পর্যালোচনা করেছেন প্রজ্ঞানপুরুষ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর। তিনি বললেন যে 'প্রথা'-ই আমাদের বৃহত্তম শত্রু, বস্তুত প্রথার কার্যকারিতা সীমিত এবং তাই এটা অজ্ঞানেরই নামান্তর। আমিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি কিছু কাহিনিও বললেন যার মধ্য দিয়েই এর প্রকৃত তত্ত্ব সাধারণের জন্য উদঘাটিত হল। জোর দিয়েই তিনি বললেন যে স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষের মুখে স্বানুভূতির বিজ্ঞান শ্রবণের ফলে শ্রোতাও স্বানুভবসিদ্ধ হয়।

ষষ্ঠ বিচার যেন পঞ্চম বিচারেরই extension। তিনি বললেন এই বিশ্বসংসার, এই জীবজগৎ অখণ্ড 'বোধময় আমি' আর 'আমিময় বোধ'-এর বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার। জীবরূপে বোধই আমি-লীলা খেলছে। 'চৈতন্যই সৃষ্টির মধ্যে সব বৈচিত্র্যের উপাদান এবং পরিণাম'। একমাত্র সত্তা সচ্চিদানন্দ—যা সৎ তা-ই চিৎ, তা-ই আনন্দ। 'মনের বহির্ভাগে জগৎ, অন্তর্ভাগে জীবন, কেন্দ্রে ঈশ্বর এবং তারও উর্ধ্বে হচ্ছে আত্মা, ব্রহ্ম'। প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি রত্নাকর থেকে বাল্মিকী হবার কাহিনি বিশ্লেষণ করলেন। পরে বললেন ধর্ম বাইরে নেই, ধর্ম অন্তরে। গুরুর কথায় বললেন যে—গুরু চার স্তরের তাদের আলোচনাও সংক্ষেপে করলেন এবং বললেন যে Real-I, সেই আবার ব্রহ্ম আত্মা। এ সব formula দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রত্যেকের হৃদয়েই রয়েছে 'আমি'—দার্শনিকরা তাকে বলেন পরমতত্ত্ব, বিজ্ঞানীরা বলেন বিজ্ঞানসত্য আর ধার্মিকরা বলেন আরাধ্য ইষ্ট। এই আমি-ই অনুভূতির স্বরূপ—নিত্যাদ্বৈত চিরন্তন।

সপ্তম বিচারে বার বার উল্লিখিত হয়েছে—আমিবোধের পূর্ণ উপলব্ধির জন্য এর সর্ববিধ ব্যবহার কীভাবে হয় তার কথা। খুব সুন্দর করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ব্যক্ত করেছেন হৃদয়ের কেন্দ্রের স্বরূপ, তা আত্যন্তিকভাবেই তাঁর নিজস্ব বাগ্‌-বিভূতিতে সম্ভব। বলেছেন যে God একটা বিশাল বৃত্তের মত সর্বত্রই যার কেন্দ্র কিন্তু পরিধি নেই, তবে তার একটা প্রকৃত কেন্দ্র আছে যা ধরলেই তার পরিধিটা পাওয়া যায় আর সেটাই হচ্ছে হৃদয়ের কেন্দ্র। হৃদয়ের কেন্দ্রেই 'আমি'র অধিষ্ঠান। এই আমি Real-I যা গন্তব্য। এই বিচারে তিনি উপাখ্যান সংযোজন করেছেন—জাহাজডুবিতে কীভাবে পিতা পুত্রকে অনুপ্রাণিত করেছেন, বলেছেন কল্পান্ত ধরে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন যুগে অবতরণের কথা। শাস্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'যঃ শাসতি অন্তঃকরণম্', তেমনি পণ্ডিতের সংজ্ঞাও দিয়েছেন—পণ্ডার অধিকারী পণ্ডিত আর পণ্ডা হল উজ্জ্বল বেদজ্ঞান। প্রকৃত কর্ম কী তা সহজভাবে বুঝিয়েছেন—যে কর্মের বীজ নেই তাই বিকর্ম বা আসল কর্ম। আবার সংক্ষেপে সার উক্তি করেছেন—'স্বানুভবসিদ্ধ আমি হল পাকা আমি, অনুভবসিদ্ধ আমি হল কাঁচা আমি'। তিনি বার বার-ই বলছেন শ্রবণের মাধ্যমেই উপলব্ধি হয় তবে তা অধিকারীদের জন্য।

আমিতত্ত্বের কথা অবশ্যই অষ্টম বিচারেও এসেছে; বিচার বিশ্লেষণ নানাভাবে হয়েছে এই গ্রন্থে। প্রাসঙ্গিকভাবে অন্যান্য তত্ত্বও এসেছে, উপাখ্যান এসেছে। তবে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায় তিনি বলেছেন—'নিজঅতিরিক্ত কল্পনা যেগুলি সেগুলি যথার্থ নয়'। আনন্দ যেহেতু সবকিছুর কারণের কারণ, আনন্দ থেকেই সবকিছু জাত হয়। আনন্দের মধ্যেই সব আছে আবার এর মধ্যেই সব লয় হয়ে যায় অতএব আনন্দ পাবার বস্তু নয়। আমির দুই রূপ, finite আর Real। প্রথমটির দাবি দ্বিতীয়টি পূরণ করে। 'পূর্ণ-আমি'র প্রসঙ্গে বলেছেন পুরুষোত্তমের কথা—বলেছেন শ্রীগীতায় central theme-ই পুরুষোত্তম। 'আমারবোধ' এবং 'আমিবোধ' বা 'আপনবোধ'-এর কথা বলেও তিনি কাঁচা আমি আর পাকা আমি-র তত্ত্ব দিয়েছেন। আমারবোধ হচ্ছে মিশ্রবোধ—এতে দেহ-প্রাণের গুরুত্ব অধিক এবং তা সংসারজীবনে সহায়ক, কিন্তু এতে আপনবোধের ব্যবহার সিদ্ধ হয় না।

অন্তঃকরণের বিকাশ-প্রকাশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে নবম বিচারে। অন্তঃকরণের চারটি ভাষা—মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত; মন দিয়েই বিচার শুরু। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এই প্রসঙ্গে 'ঈক্ষণ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন—এটি দিব্য আনন্দের স্পন্দন বলে তিনি বলছেন, এ এমন এক স্পন্দন যা নিলম্বিত হয় না, সৃষ্টিরূপে এর প্রকাশ ঘটে। তিনি বলছেন এই ব্রহ্মাণ্ড নিজের অন্তর্সত্তার স্পন্দনের (vibration) প্রকাশ। 'তোমার অন্তঃকরণের স্পন্দিত রূপ হচ্ছে এই বিশ্বজগৎ'। যেহেতু মন দিয়ে শুরু তাই মনের বিভিন্নতাও আলোচিত হয়েছে এখানে। বলছেন—'মন আত্মচৈতন্যের প্রতিফলন'। মনের পশ্চাতে আছে বুদ্ধি, তার পশ্চাতে পরমবোধি। মন আছে দেহের পশ্চাতে।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বেশ কিছু কাহিনির সাহায্যে তাঁর বিচার শোনালেন। এক ব্যক্তির স্বপ্নের পর স্বপ্ন দেখা, পি. সি. সরকার-এর ম্যাজিক-এর গল্প—প্রতিটি কাহিনি ইঙ্গিতবাচক—তাদের মূল বক্তব্য ও নির্যাস সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ভক্তির কথা বলতে গিয়ে অন্যত্র বলেছেন জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর সম্পর্কিত। এখানে ভক্তির এক নতুন সংজ্ঞা দিলেন—ভোগের গতি রহিত হলে ভক্তি আসে।

তবে সবকিছু শেষ হচ্ছে আমিতত্ত্বে যা নিয়ে এই বক্তৃতামালার সূচনা।

আগেও বলেছেন যে আত্মতত্ত্বের অনুশীলন গুরু ছাড়া হয় না। দশম বিচারে তা আর একটু বিশদ করেছেন। আত্মবোধ-ই মূল বোধ কিন্তু এতে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে গুরুর কৃপা ও অনুশাসন চাই। আত্মগুরুর কথা এই প্রসঙ্গে বিচারে এসেছে। সদ্‌গুরুর নির্দেশেই মনের জড়তা, মলিনতা, দুর্বলতা, ভ্রান্তি-ভীতি অতিক্রম করা যায় তবে গুরুকেও realizer হতে হবে, হতে হবে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত। আত্মবিজ্ঞানে মনের বৃত্তির ভূমিকাও কম নয়। বুদ্ধি অহংকার দিয়ে গঠিত এমন দশটি বৃত্তি আছে। এখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবের কথোপকথন উল্লেখ করে আমিতত্ত্বে পৌঁছানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। আত্মবোধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে তিনি দেবী ছিন্নমস্তার হস্তে ধৃত ছিন্ন মুণ্ডের মুখে নিজ রক্ত পানের কথা উল্লেখ করেছেন। আত্মবোধ, চৈতন্য সর্বব্যাপী বলছেন আবার বলছেন 'স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ'। আত্মস্থিতি, আত্মবোধ, পাকা আমির কথায় বলেছেন 'মনের ব্যবহারিক দিক পরিহার করলে স্ববোধের ব্যবহারে সিদ্ধি আসে, আত্মবোধ স্বতঃস্ফূর্ত হয়'।

একাদশ বিচার দশম বিচারের সম্প্রসারণ। আত্মবোধই একমাত্র সত্য এই উপলব্ধিই একমাত্র প্রাপ্তি। 'আমি' বা চৈতন্যের অতিরিক্ত কিছু নেই। এখানে তিনি একটি সহজ 'পরীক্ষা'-র কথা বলেছেন—'ইন্দ্রিয় দিয়ে ইষ্টকে দেখলে বিশ্বরূপ দেখা হয়। মন দিয়ে দেখলে ইষ্ট আড়াল হয়ে যায়, বুদ্ধি দিয়ে দেখলে সংশয় আসে আর স্ববোধ দিয়ে দেখলে ইষ্টই আমি, আমিই ইষ্ট'। একাদশ বিচারের এটিই মূল তত্ত্ব। বার বার বলছেন 'চৈতন্য অবিমিশ্র শুদ্ধাত্মা—ভাবের মিশ্রণ হলে হয় সৃষ্টি, বৈচিত্র্য'। এই ভাব সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণ নিয়ে। 'স্বভাবে গুণ আসে স্ববোধে নয়।' এই তত্ত্ব খুবই সহজবোধ্য। আবার বলেছেন 'গুণ আসে শক্তির সাথে'। বলছেন—মনকে সাত্ত্বিক বানাতে হবে। এর জন্যই স্তব স্তুতি জপ কীর্তন ভজন মন্ত্রোচ্চারণ,

যম নিয়ম নিষ্ঠাও এই একই কারণে। ঈশ্বর হৃদয়ে বাস করেন, কিন্তু হৃদয়ের দরজা বন্ধ থাকলে তাঁর ভূমিকা কী। তিনি বিশেষ ভাবে সমাধির কথা step by step বোঝালেন; বিভিন্ন প্রণামের ব্যাখ্যা করলেন, বিশেষ করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম-এর। জীবের ধর্ম ও আত্মার ধর্ম এক নয়। জীব পরদোষদর্শী, অভিমানী, আত্মশ্লাঘাকারী—এতে কখনও আত্মধর্মের কাছে যাওয়া যায় না। আত্মবোধ বা আমিতত্ত্ব তাঁর সূত্রে সহজবোধ্য—'I am the Bliss Absolute, I am All Divine for All Time, as It Is'।

পিতামাতার সত্য পরিচয়, পূজা বিষয়ক কিছু তত্ত্ব—এ সবের মধ্য দিয়ে আত্মবোধের তত্ত্ব ব্যাখ্যা দ্বাদশ বিচারের প্রতিপাদ্য। আমাদের হৃদয়ের গভীরে রয়েছে আমাদের আসল পরিচয় কিন্তু অন্তঃকরণ তা ঢেকে রাখে বলে এতে বৈচিত্র্যবোধ আসে এবং আসে নামরূপের অনুভূতি—আর তখন আত্মবোধ লুপ্ত হয়ে জগৎ সত্য বলে প্রতিভাত হয়। এই অধ্যায়ে তিনি পা-কাটা কুকুরের গল্প, ট্রেনে দিব্যদেবী দর্শন ইত্যাদি কাহিনি বিবৃত করে তার অন্তঃস্থিত সত্যের কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন—শিবের শিবত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মাত্ব সবই আমিতত্ত্ব। নরেন-রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে একটি কাহিনি উল্লেখ করে দেখালেন উপলব্ধি একদিনে হয় না—step by step এগোতে হবে। বাসুদেব কথাটির মূল কোথায় তা ব্যাখ্যা করলেন। সৃষ্টি আসলে চৈতন্যেরই একটি খেলা তাও বোঝালেন। সবাই আনন্দ চায়—এটাই সত্য। নানা পৌরাণিক কাহিনি, *কথামৃত*-এর অংশবিশেষ, সাধারণ ঘরসংসার—এইসব উল্লেখ করে তিনি শেখালেন সাধারণ জিনিস থেকে বৃহৎ-এ উত্তরণের পাঠ। শেষে বললেন—'ঈশ্বর আমাদের ভিতরের সম্পদ, আমাদের সত্তাশক্তি, তিনি কখনও হারিয়ে যেতে পারেন না।'

ত্রয়োদশ বিচারে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা হলেও আত্মতত্ত্বের নতুন সূত্রও এতে যোগ হয়েছে। সত্তাময় আমিবোধ আর শক্তিময় আমারবোধের মিলনে এই জীবন অভিব্যক্ত—দুই বোধের মিশ্রণের অনুপাতে ঘটে লীলাবিলাসের বৈচিত্র্য। এই মিশ্রবোধের অনুভূতি অবশ্যই স্বানুভূতি নয়। এ বোধ থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে পাকা আমি-র শরণ নিতে হবে। তত্ত্ব কাকে বলে বলতে গিয়ে বলেছেন তৎ (অর্থাৎ বৈচিত্র্য, becoming) যা থেকে জাত হয়েছে। তিন রকম দর্শনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন—স্থূলবস্তুর পরিচয় হয় স্থূল দর্শনে, মন ভাবনা চিন্তা ধ্যান নিয়ে অন্তর্দর্শন আর একটি সামগ্রিক দর্শন যা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত। মৃত্যুভয় নিয়েও বলেছেন—'সৃষ্টি unfold করে আবার fold করে—এই তত্ত্বটি জানা থাকলে মৃত্যুভয় হবে কেন। তত্ত্বনির্দেশ নিতে হয়, একথা আগে বলা হয়েছে—তবে শিক্ষা না থাকলে এই নির্দেশ নেওয়া যায় না। বলতে বলতে বললেন ষড়ঙ্গ বেদের প্রথম অঙ্গই শিক্ষা। বেদের প্রসঙ্গে আরও বললেন—বেদের বা জ্ঞানের দুটো part—একটা শব্দব্রহ্ম, অন্যটি রূপব্রহ্ম—একটা প্রজ্ঞানব্রহ্ম অন্যটি বিজ্ঞানব্রহ্ম—একটা তত্ত্বময় অন্যটা তথ্যময়। Realizer-এর উদাহরণ দিলেন সিংহশাবকের মেষপালে বড় হওয়ার কাহিনি শুনিয়ে। তিনি আমিবোধের তত্ত্বকে সর্বসাধারণের কাছে সহজতর করার জন্য কৃষ্ণ, খ্রিস্ট, চৈতন্যদেব ও তাঁদের কিছু ঘটনাবলী ও কর্মবৃত্তির কথা তুলে আলোচনা করলেন।

চতুর্দশ বিচার পুরুষোত্তম-কে কেন্দ্র করে। অবশ্য কাঁচা আমি পাকা আমি প্রসঙ্গ নিয়েই এই বিশ্লেষণ ও আলোচনা। যখন সত্তার বক্ষে শক্তির খেলা চলে তখন বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটে—এ কথা তিনি বলেছেন খুব পরিষ্কার করে, বুঝিয়েও দিয়েছেন। সেই সময় শক্তির প্রাধান্য ঘটে, এতে জীবের মূলত বস্তুপ্রীতি আসে। তখন সে কাঁচা আমি। নিজের পরিচয় কিন্তু তার নিজের হৃদয়কন্দরে আর এই পরিচয়েই তার অদ্বৈতবোধের উন্মেষ ঘটে, সে হয়ে ওঠে পাকা আমি। শক্তির স্বরূপও ভিন্ন ভিন্ন হয়। 'বিদ্যাশক্তির নাম মহামায়া, পরাবিদ্যাশক্তির নাম যোগমায়া'। অবিদ্যামায়াজাত দ্বৈতবোধের নিরসনের জন্য সাত্ত্বিক পুরুষকারের প্রয়োজন। এইখানে পুরুষোত্তম-এর কথা এসেছে। 'যাঁর অখণ্ডতার জন্য পূর্ণতার জন্য দ্বিতীয় কোনও বস্তুর প্রয়োজন হয় না তিনিই পুরুষোত্তম'। এই পুরুষোত্তম সচ্চিদানন্দ স্বয়ংপ্রকাশ এবং পূর্ণ।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এখানে কিছু অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। কিছু নিজের অভিজ্ঞতাও বলেছেন—যেমন তাঁর সূর্য ভেদ করে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে যাওয়া ও প্রত্যাবর্তন। পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি বিবিধ তত্ত্ব আলোচনা করে স্থূল-সূক্ষ্ম জগতের পারম্পর্য বিশ্লেষণ করেছেন। কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁকে যেন দুঃখে রাখা হয়—এর তাৎপর্যও এখানে উল্লেখ করলেন। এক চিত্রপরিচালিকার সঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের সাক্ষাৎকার ও তখন ধর্মতত্ত্বের মূল বিষয় নিয়ে আলোচনার কথাও এখানে প্রসঙ্গক্রমে জানালেন।

তত্ত্ব শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা বলতে গিয়ে বললেন—শ্রুতি হল শাস্ত্রসার। শ্রুতির মধ্য দিয়ে স্মৃতির বিকাশ, এর মধ্য দিয়ে মোহ নষ্ট হয়ে আত্মস্মৃতির প্রত্যাবর্তন ঘটে।

পঞ্চদশ বিচারে কাঁচা আমি থেকে পাকা আমিতে যাওয়ার পথনির্দেশিকা শুরু। এতে কাঁচা আমির বিশ্লেষণও যেমন জরুরি পাকা আমির স্থিতাবস্থা পর্যালোচনা করাও তেমনি জরুরি। ভোগী আমি—যে আমার 'বলে গুণ ভাব উপাধি সমৃদ্ধ এক অনাত্মার জগতে স্বপ্নময় জীবন উপভোগে ব্যস্ত; আত্মভূমিতে আত্মবোধের অধিকারী হলে বহির্মুখী জীবন অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে এবং অন্য এক আমিবোধে পৌঁছানো যায়—এই আমি-ই পাকা আমি। এর জন্য ত্রিগুণাশ্রিত মিশ্রভাবের বন্ধন কাটিয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবে পৌঁছানো চাই। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ ঘটাতে হবে। তার জন্য অভিজ্ঞ কারোর অধীনে শিক্ষা নিতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি তপস্যার মর্মকথা খুব সহজ করে বলেছেন—'সাধু সন্তদের সঙ্গ করে তাঁদের কাছ থেকে সংগৃহীত সৎপ্রসঙ্গ সচেতনভাবে ব্যবহার করতে হবে। একাগ্রতা নিয়ে এই ব্যবহারের ফলে বোধের জ্যোতির মাধ্যমে অন্তর্বোধের সঙ্গে যোগাযোগ হয়—অন্তরে সৃষ্টি হয় তাপ—তা-ই তপস্যা।' এখানে ভক্তির কথাও বলেছেন—অদ্বৈতভক্তি মুখ্য বিষয়। অভিজ্ঞ কে? তার আলোচনায় তিনি ঋষিগুরু ও সাজাগুরুর পার্থক্য ও তাদের অনুশাসন পদ্ধতি একটি কাহিনির মারফৎ পরিবেশন করলেন—এল দীক্ষা ও শিক্ষার তাৎপর্য, তারপর এল দান, কার্যকারণ নীতির বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ। আমির আমি, পাকা আমি অহংদেব—কে তা বোঝা যায় যখন জানা যায় যাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলে (তাদাত্ম্য হয়ে গেলে) আর কিছু হওয়ার বাকি থাকে না। অবশ্য পাকা আমি হওয়া মানেই পরমপ্রাপ্তি।

সব বিচার শেষে ষোড়শ বিচারে এসে পূর্ণ সমাধান দিলেন। বস্তুত এখানে আগের আগের বিচার সমূহের সমাধান সূত্রের একত্রীকরণ ঘটেছে। যুগে যুগে মানুষের তপশ্চর্যার গতি-প্রকৃতি এবং কেন এই পরিবর্তন—এ আলোচনাও এখানে উঠে এসেছে। "একোঽহম্ বহুস্যাম্"—বহু প্রচারিত এই বৈদিক 'মন্ত্রের' এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে অনেকের মনের সুপ্ত সংশয় দূর করেছেন। এই প্রসঙ্গেই তিনটি ইচ্ছার কথা এসেছে—চৈতন্য-এর (consciousness) তিনটি একক—তাদের personified forms ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—সৃষ্টি পর্বে যাঁরা মূলত এক এবং অন্তেও এক Absolute। সচ্চিদানন্দ-এর প্রসঙ্গে বললেন—'সৎ সর্বদাই বর্তমান এক অস্তিত্ব, চিৎ অংশ অবশ্য পরিপূর্ণ প্রকাশমান নয় শুধুমাত্র চর্চায় প্রকাশ হয়, আর আনন্দ অংশ তো একেবারেই আবৃত'—একমাত্র জ্ঞানেই তা অনাবৃত/উন্মোচিত হয়। মন প্রাণ বুদ্ধি অহংকার চিত্তের balanced development হলে এই উন্মেষের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রাপ্তি ঘটে। একেই শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলেছেন ধর্মবিজ্ঞান। আলোচনাকালে তিনি দেবর্ষি নারদ ও সনক ঋষির কথোপকথন উত্থাপন করে ভূমার তত্ত্ব প্রকাশ করলেন এবং বললেন এর জন্য step by step এগোতে হবে। সঠিক সাধনা অবশ্যই সদ্‌গুরু নির্দেশিত পথেই হবে। আত্মা স্বয়ংপূর্ণ বলে সব সাধনার অতীত। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি সূত্র দিলেন, 'মনোদয়ে জগতের উদয়, মনোলয়ে জগতের লয়।' জগৎ তো পরিবর্তনশীল বৈপরীত্যে ভরা বৈচিত্র্যময় কাঁচা আমির আশ্রয়—এর থেকেই সেই তত্ত্বে পৌঁছাতে হবে যা উদয়াতীত লয়াতীত ভূমার তত্ত্ব—পাকা আমির তত্ত্ব।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের প্রতিদিনের ভাষণ শুরু হয়েছে একটি উদ্গীত ভজন দিয়ে। এই ভজনগুলির মধ্যেই ব্যাখ্যাত তত্ত্বের সূত্রটি বিধৃত রয়েছে। এ ছাড়াও ভাষণের মধ্যে ভজন উদ্গীত হয়েছে—এতে তত্ত্বের প্রবাহ যেন বাধাবন্ধহীন হয়ে উঠেছে। তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যা গতানুগতিক কোনও দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ নয়; তা উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত এক অভিনব বাক্‌বিভূতি—যা স্বতোৎসারিত হয়ে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়মন্দিরে সহজেই প্রবিষ্ট হয়। প্রত্যেকটি বিচারের শেষে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি মন্তব্য সংযোজন করেছেন। এটি বস্তুত সেই বিচারের সার বা abstract। পাঠক বিচারটি পড়ার আগে এবং পরে এই মন্তব্যটি পড়ে নিলে, প্রজ্ঞানপুরুষের বিশ্লেষণের ধারাটি বুঝতে সহায়ক হবে।

এই গ্রন্থে 'আমি'-র স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'আমি' ব্যবহারিক দিক দিয়ে কাঁচা, যাকে প্রজ্ঞানপুরুষ বলছেন স্বভাবের 'আমি'। যখন তা বোধসত্তা হয়ে উঠেছে তখন তা পাকা অর্থাৎ স্ববোধের 'আমি'। স্ববোধের স্তরে পৌঁছোলে এই তত্ত্ব (আমিতত্ত্ব) নির্দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে। তখন বক্তা, শ্রোতা এবং বক্তব্য বিষয় অভিন্ন, একাত্ম—সবই সেই আমিময়; তখন দ্বৈত বা বৈচিত্র্য শুধু কল্পনা। এই তত্ত্ব প্রকাশ করার সময় বহু কাহিনি, ঘটনা, শাস্ত্রবাণী উল্লিখিত হয়েছে এবং যে ভাবে এগুলো ভাষণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাতে মনে হয় যেন এরাও অবশ্যম্ভাবী, তত্ত্ব প্রকাশের স্বপক্ষে যুক্তির বা উদাহরণের অবতারণা নয়।

প্রতিদিন সুদীর্ঘ সময় ধরে এই ভাষণ, ষোলদিনে তা পরিণতি লাভ করেছে। এত সময় ধরে এই ভাষণে যে ভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে তা বোধ হয় শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের পক্ষেই সম্ভব। 'বিচার' নাম দিয়ে অধ্যায় পরিচিতি দেওয়া হয়েছে; বিচার তর্ক সাপেক্ষ; কিন্তু আশ্চর্য এই যে এই বিচার শুধু তত্ত্বের নিষ্ক্রমণ, এখানে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই।

স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর যখনই যা বলেন তা মূলত আত্মতত্ত্বের কথাই। দিল্লির কালীবাড়িতে বিশেষভাবে কাঁচা আমি পাকা আমি-র তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন এবং তা সহজবোধ্য করার জন্য আলোচনার বিস্তার ঘটিয়েছেন—কাহিনি, উপাখ্যান, ঘটনা, নিজের দিব্যদর্শন এতে প্রক্ষিপ্ত করে তত্ত্বকে আরও স্বচ্ছ ও সাবলীল করে তুলেছেন। তাঁর বলার ভঙ্গিমা একান্তই নিজস্ব অননুকরণীয়—শ্রোতাদের কাছে এর শ্রবণ অবশ্যই এক বিরল অভিজ্ঞতা। এই বক্তৃতামালার সংকলন তাঁরই নির্দেশনায় প্রকাশ করা হল। প্রকাশকের ভূমিকা লিখতে গিয়ে তাঁরই কিছু কথায় প্রকাশক নিজেকে আত্মিক অনুভূতিকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছে। তা সাজিয়ে এখানে নিবেদিত হল; এতে পাঠক অনুপ্রাণিত হবেন বলেই বিশ্বাস। এই অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে আমরা ধন্য।

মুখবন্ধ

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল ষোলো দিনের ভাষণের সংকলন। ২০০১ সালে ৫, ৬, ৭ নভেম্বর এবং ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ নভেম্বর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাষণ হয় নিউ দিল্লি চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির নেতাজি সুভাষ হলে। এই হলেই তৃতীয় পর্যায়ের ভাষণ হয় ১৯, ২০, ২১ ডিসেম্বর পর পর তিন দিন। চতুর্থ পর্যায়ের ভাষণ হয় ২৬, ২৭, ২৮ ডিসেম্বর ২০০১ পর পর তিন দিন এবং পঞ্চম পর্যায়ের ভাষণ হয় ১৬, ১৭, ১৮ জানুয়ারি ২০০২, পর পর তিন দিন।

প্রথম পর্যায়ের পর পর তিন দিনের ভাষণ হল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিচারের বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় পর্যায়ের পর পর চার দিনের ভাষণ অনুরূপক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বিচারের বিষয়বস্তু। অনুরূপক্রমে তৃতীয় পর্যায়ের পর পর তিন দিনের ভাষণ হল অষ্টম, নবম ও দশম বিচারের বিষয়বস্তু। সেইমতো চতুর্থ পর্যায়ের পর পর তিন দিনের ভাষণ হল একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বিচারের বিষয়বস্তু। তদনুরূপ পঞ্চম পর্যায়ের পর পর তিন দিনের ভাষণ হল চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ বিচারের বিষয়বস্তু। ষোলোটি বিচারের মাধ্যমে ব্রহ্মাত্ম পরমতত্ত্ব অদ্বয় অহংদেব পুরুষোত্তম পাকা আমি-র স্বানুভবসিদ্ধ বিজ্ঞান অভিনব ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রত্যেকটি ভাষণকে বিচার নামে উল্লেখ করার কারণ পূর্ণের বক্ষে পূর্ণবোধে পূর্ণের বিচরণ। পরমতত্ত্বস্বরূপ নিত্যাদ্বৈত স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত সর্বসম অনুপম স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংপূর্ণ। তার মধ্যে তদতিরিক্ত দ্বিতীয় কোনও সত্তা ও তার প্রকাশ অসিদ্ধ বলে তদ্‌বক্ষে তার স্বপ্রকাশরূপই অদ্বয় ব্রহ্ম আত্মা স্বয়ং। আরও অন্যান্য নামে তাকে উল্লেখ করা হয় যথা ঈশ্বর অক্ষর ভগবান পুরুষোত্তম এবং তার সত্যপরিচয়ই হল সচ্চিদানন্দ। জীবন হল তার প্রকাশমাধ্যম বা লীলামাধ্যম। সমগ্র সৃষ্টি হল তার স্বপ্নবিলাস কল্পনা বাস্তবরূপ। এই বৈচিত্র্যপ্রধান সৃষ্টির মধ্যে জীবন তার স্বভাব অনুযায়ী খেলে বেড়ায়। জীবনের মধ্যে জীবনধারণরূপ ও তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির লক্ষ্য হল তার আনুষঙ্গিক যা দরকার যা তার চারপাশে সাজানো আছে তার সদ্ব্যবহার। আপনবোধে হয় তা সিদ্ধ ও পূর্ণ।

সৃষ্টির যেমন একটা কেন্দ্র আছে, জীবনেরও তেমন একটা কেন্দ্র আছে। সৃষ্টির কেন্দ্র সৃষ্টিকে পরিচালনা করে, জীবনের কেন্দ্র জীবনকে পরিচালনা করে। উভয় কেন্দ্রের মূল উপাদান সেই এক পরমতত্ত্বস্বরূপ স্বয়ং। সুতরাং সচ্চিদানন্দঘন পরমতত্ত্বস্বরূপের সর্ববিধ অভিব্যক্তির মধ্যেই পূর্বাপর এক তত্ত্বই নিহিত থাকে, কিন্তু স্বপ্রকাশ ক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বাপর

প্রকাশের মধ্যে সমতা বা সামঞ্জস্য থাকে না। কেন্দ্রের পরিচয় হল স্ববোধস্বরূপ। প্রকাশের ক্রম ধরে অন্তরে এসে হয় স্বভাব। তা-ই আবার প্রকাশের ক্রম ধরে বাইরে প্রকৃতিরূপে অভিব্যক্ত হয়। স্ববোধসত্তার মধ্যে পূর্ণতার কোনও অভাব হয় না। কিন্তু অন্তরে তার উপর ভাবের মিশ্রণের ফলে স্বভাবের এক অভিনব রূপায়ণ হয়। তা আবার ভাবের মিশ্রণ ও বিকারের ফলে বহির্প্রকৃতিতে এসে স্বরূপ ও স্বভাবের থেকে পৃথক বা ভিন্ন ও বৈচিত্র্যরূপে প্রতিভাত হয়। কেন্দ্রে তত্ত্বস্বরূপ নির্বিকল্প নিরবলম্ব নিরাকার নির্বিকার ভাবতীত ভেদাতীত দ্বন্দ্বাতীত অনঙ্গ অসঙ্গ অভঙ্গ অলিঙ্গ। এই সচ্চিদানন্দঘন তত্ত্বস্বরূপ সর্ব কারণের কারণ, সুতরাং সর্ব কার্যের পূর্ণ অধিষ্ঠান। তা সর্বাতীত অশেষ সাক্ষী, সর্বপ্রকাশের প্রভু নিয়ন্তা। তার সত্তায় সব সত্তাবান, তার প্রকাশে সব প্রকাশমান। এবং তার ধর্মই সবার সত্যপরিচয়। কিন্তু অন্তরে স্বভাবে ও বাইরে প্রকৃতিতে তার সত্তা থাকে পশ্চাতে, অভিন্ন শক্তির অন্তরে-বাইরে বৈচিত্র্যরূপে স্বভাববিলাসে মত্ত থাকে স্ববোধের বক্ষে। স্ববোধসত্তা শূন্য কোনও প্রকাশ সম্ভব হয় না। কেন্দ্রে স্ববোধসত্তা স্বরূপত তুরীয় ও তুরীয়াতীত। সেইজন্য নিত্য অদ্বৈত, দ্বৈত হয় কেন্দ্রের অধীনে আপন স্বভাবশক্তির মাধ্যমে। অন্তরে এসে হয় দ্বৈত স্বভাবের দ্বারা বিভূষিত। দ্বৈত স্বভাব বাইরে প্রকৃতির মধ্যে এসে হয় অনন্ত অনন্ত বৈচিত্র্যময়।

সচ্চিদানন্দসত্তা স্বপ্রকাশ শক্তির মাধ্যমে স্ববক্ষে থেকেই অর্থাৎ আপন তুরীয়সত্তার মধ্যে থেকেই কেন্দ্র, অন্তর ও বাহির রূপে অভিব্যক্ত হয় স্বকল্পিত মনোবিলাসের মাধ্যমে। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই তার প্রতিটি প্রকাশের মধ্যে তার স্বরূপের তিনটি সত্য যথা কেন্দ্র, অন্তর ও বাহির নিহিত থাকে একে অপরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। জীবনের মধ্যে তা-ই স্ববোধ, স্বভাব ও প্রকৃতি রূপে অনুভূত হয়। তার প্রকাশের মাত্রার ব্যতিক্রম হতে পারে পরস্পরের মধ্যে কিন্তু স্ববোধ স্বভাব ও প্রকৃতির ধর্মের বাইরে কোনও জীবন সম্ভব নয়।

জীবনের বহির্সত্তা প্রকৃতির রাজ্য, প্রকৃতির ধর্মই সেখানে প্রধান, স্বভাব ও স্ববোধের ধর্ম সেখানে আবৃত বা প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত। অন্তর্সত্তায় স্বভাবের প্রাধান্য, এক অংশে বহির্সত্তার সঙ্গে যুক্ত এবং আরেক অংশে কেন্দ্রসত্তার সঙ্গে যুক্ত। সেইজন্য স্বভাবের দ্বিবিধ ধর্ম দ্বৈতবোধে সক্রিয় হয়। বহির্সত্তা বৈচিত্র্যপ্রধান প্রকৃতির অধিষ্ঠান বা নিয়ন্তা হল দ্বৈতপ্রধান স্বভাবসত্তা। স্বভাবের বহির্মুখী কার্যাবলী হল অবিদ্যা অজ্ঞান প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত। তারই নামান্তর হল অনাত্মা। এই অনাত্মার অন্তরে তার জীবনীসত্তা স্বভাবরূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে। আবার অন্তর্সত্তায় স্বভাবের স্বরূপ কেন্দ্রের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তার মধ্যে বিদ্যাশক্তির সমতা একতা ও আপনতার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। অন্তরের জীবধর্ম স্বভাববশত কেন্দ্রের আত্মধর্ম স্ববোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তদ্ধর্ম প্রাপ্ত হয়। তার ব্যবহারে আসে আপনতার লক্ষণ, স্বয়ংতার লক্ষণ, একতার লক্ষণ, সমতার লক্ষণ। এই স্ববোধ-আত্মার পরিচয় হল বোধময় আমি ও আমিময় বোধ। স্ববোধের ব্যবহার সবসময় আমিবোধেই হয় এবং স্বভাবের ব্যবহার ও প্রকৃতির ব্যবহার আমারবোধে হয়। আমারবোধে গুণভাব-উপাধির মিশ্রণ অধিক থাকে। সেইজন্য নাম-রূপের প্রতীতি পৃথক পৃথক ভাবে অনুমিত হয়।

সতেরো

জীবধর্ম ও তার আদর্শ স্বভাবত দ্বৈতবোধের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয় স্ববোধের বক্ষে থেকেই। তার মধ্যে স্ববোধের অভিব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে না স্বভাবদোষে। স্বভাবের দোষ প্রধাণত গুণভাব-উপাধিযোগে স্ববোধের অন্তরায় হয়। তার কারণ সবার কাছে সুস্পষ্ট ভাবে তা প্রকাশ পায় না স্ববোধের অভাবে। জীবধর্ম স্বশক্তির ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তা উৎপত্তি হতে চরম পরিণতি পর্যন্ত অনুবর্তন ও বিবর্তনের ক্রম ধ'রেই ঘ'টে থাকে। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্ববোধ-আত্মার অভিব্যক্তির ক্রম ধ'রেই জীবত্ব অভিব্যক্ত হয়। তার জীবত্ব প্রাপ্তি হল অদ্বয়সত্তার বক্ষে অদ্বয়বোধের পরিবর্তে দ্বৈতবোধের সমর্থন এবং তদনুসারে তার অভিব্যক্তি বা স্বপ্রকাশতা। জীবত্ব বরণ ক'রেও স্ববোধ-আত্মার স্বস্বরূপতা জীব-হৃদয়ে পূর্ণ ভাবে নিহিত থাকে। তার ব্যতিক্রম কখনও সম্ভব হয় না। নিত্য পূর্ণ স্ববোধ-আত্মসত্তা অহংদেব পাকা আমি আপনবক্ষে আপনি নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তাঁর অস্তিত্বের অভাব কখনওই সম্ভব হয় না। গুণভাব-উপাধিযোগে যতরকম পরস্পরবিরোধী ভাববোধ ও অনুভূতি অভিব্যক্ত হয় তার পশ্চাতে স্ববোধ-আত্মা পাকা আমি-র উপস্থিতি সবসময়ই বর্তমান থাকে। গুণভাব-উপাধির আবরণে তা ঢাকা থাকে। জীবনাদর্শ হল এই গুণভাব-উপাধির আবরণকে আপনবোধের বিজ্ঞানের মাধ্যমে অপসারিত করা। তা সম্ভব হয় অন্তরে স্বভাববোধের উৎকর্ষের ফলে, অর্থাৎ বিদ্যাশক্তির আধিক্য বা প্রাধান্যের ফলে। বিদ্যাশক্তির অনুশীলন মাধ্যমে স্বভাবের শোধন ও উত্তরণ ঘটে। কেন্দ্রের স্ববোধ-আত্মার সঙ্গে হয় তার সাক্ষাৎ, মিলন ও তার সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্তি বা তাদাত্মসিদ্ধি। তখন দ্বৈতবোধের আর কোনও প্রভাব থাকে না, অর্থাৎ আমারবোধের ব্যবহার জীবনের মধ্যে আর প্রাধান্য পায় না। বিদ্যাশক্তির ব্যবহারে আপনবোধের বিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। তার বিস্তারের ফলে আমারবোধের অর্থাৎ দ্বৈতবোধের প্রভাব অভিভূত হয়ে যায় অর্থাৎ বাধিত বা নিরসন হয়ে যায়। আমারশূন্য আমিবোধ হল স্ববোধ-আত্মা পাকা আমি-র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ।

পাকা আমি-র স্বরূপ নিত্যাদ্বৈত। তাঁ সর্বভূতের অন্তরাত্মারূপে অর্থাৎ কেন্দ্রসত্তারূপে এবং সর্বভূতের অধিষ্ঠানরূপে নিত্যবর্তমান। সব কিছুকে ব্যেপে এই আমি তাঁর স্বরূপ ও স্বভাবকে নিরন্তর প্রকাশ ক'রে চলছে। এই আমি-র বক্ষে, আমি-র জন্য, আমি হতে, আমি-র দ্বারা আমি-র প্রকাশ; আমিবোধে নিত্য তাঁর অধিবাস ও বিলাস হল পরম আমিতত্ত্বের সত্যপরিচয়। পরমাত্মাস্বরূপ এই আমি সত্যস্বরূপ ও তাঁর অনুভূতির বিজ্ঞান প্রসঙ্গ নিজেকে দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করছে নিজের জন্য নিজের দ্বারা নিজের কাছেঁ। সচ্চিদানন্দ বোধময় আমি সচ্চিদানন্দবোধ অতিরিক্ত নয়, তা ছাড়াও নয়। নিজের সঙ্গে নিজের যে আত্মলীলা তার কারণ-কার্য, ফল ও সিদ্ধি সব মিলিয়ে তার নিজের পরিচয় নিত্যসিদ্ধ। এই বোধময় আমি ও আমিময় বোধ অতীব আশ্চর্যময় সত্য। এই আমি কখনও আমিশূন্য হয় না, তাঁর আদি-অন্ত নেই, জন্ম-মৃত্যু, উদয়-অস্ত নেই, তাঁর ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই, গতাগতি নেই, ভেদাভেদ নেই, ভাবাভাব নেই—এককথায় কোনও দ্বৈত বা বৈচিত্র্য তাঁতে অসিদ্ধ, কিন্তু সর্ববিধ

দ্বৈত ও বৈচিত্র্য তাঁর বক্ষে তাঁর দ্বারাই অভিব্যক্ত এবং তাঁর দ্বারাই অনুভূত। এই সত্যের কোনও ব্যতিক্রম নেই, কোনও বিকল্প নেই। পরস্পরবিরোধী কোনও ধর্ম আমিতত্ত্বের মধ্যে কখনও সম্ভব নয়। অস্তিরূপে যিনি নিত্যবর্তমান, ভাতিরূপে ও প্রীতিরূপে যিনি নিত্য প্রকাশমান, জীবনের আদি-মধ্য-অন্তে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি ধর্মাদি যিনি জানেন, সর্ববুদ্ধিবৃত্তির যিনি সাক্ষী, মন ও তার সংকল্পাদি ভাবনাদি, তাদের ভাবাভাবাদির বেত্তারূপে যিনি বোধে নিরন্তর অনুভবসিদ্ধ তিনি বোধস্বরূপ পাকা আমি সবারই আপন, সবারই আত্মা।

জীবনের মন-বুদ্ধি অন্তঃকরণাদি স্বভাবপ্রকৃতি স্ববোধ-আত্মার এই আমিকে ভ্রান্তিবশত ভুলে থাকে এবং জীবনভর এই ভ্রান্তির মাশুল দিয়ে যায়। আপনবোধের অভাবে দুঃখ দৈন্য দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় দিন কাটায়, মুক্তির উপায় খুঁজে বেড়ায়। স্ববোধ আমি-র স্মৃতি তার আবৃত থাকে স্বভাবের আমারবোধের বিকার ও প্রাধান্যের ফলে। সে দ্বৈতবোধে নিজের মুক্তি, শান্তি ও ইষ্টকে খোঁজে মন দিয়ে; দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের মধ্যে পেতে চায় আপন ক'রে। সত্তা আত্মা আপন অখণ্ড ভূমা নিত্য অদ্বৈত। দ্বৈত ভাবনার ক্ষেত্রই হল অন্তরের স্বভাব। মন-বুদ্ধি-অহংকার তার লক্ষণ। বাক্য-মনের অতীত যে আত্মসত্তা বা আমি, যে সব কিছুরই অধিষ্ঠান বা প্রকাশক তাকে বাক্য-মন প্রকাশ করবে কী করে? তাই বলা হয় স্ববোধ আত্মসত্তা আমি মন-বুদ্ধির অতীত, অচিন্ত্য। তাঁকে চিন্তা দিয়ে ভজন করলে পাওয়া যাবে না, চিন্তা ছাড়লে পাওয়া যাবে, অর্থাৎ স্বভাবের যে সত্যস্বরূপ স্ববোধ-আত্মা তাঁকে স্বভাব দিয়ে পাওয়া যাবে না, স্ববোধ দিয়ে তাঁর পরিচয় স্বানুভবসিদ্ধ হয়।

জগৎ হল মনের কল্পনাবিলাস। পাকা আমি-র সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ নেই। বৈচিত্র্যময় নাম-রূপের জগৎ, তার অধিষ্ঠান ও প্রকাশক হল মন। মনেই জগৎ এবং জগৎ নিয়েই হল মনের জীবন। তাই বলা হয়, মনোদয়ে জগতের উদয় এবং মনোলয়ে জগতের লয়। দেহ হতে বুদ্ধি পর্যন্ত সবই স্বভাব-মনেরই সীমা। তার স্থিতি ও ব্যবহার সবই মনের অধীন। মন আবার স্ববোধ-আত্মার অধীন। সুতরাং স্ববোধ-আত্মা পাকা আমি মন-বুদ্ধির অধীন হতে পারে না, মন-বুদ্ধির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্বন্ধই নেই। এই পাকা আমি হল অসঙ্গ একরস বস্তু সচ্চিদানন্দ-লক্ষণা। অসঙ্গ এই সচ্চিদানন্দ স্বয়ংপ্রভ দ্বৈতবর্জিত বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ সর্বসাক্ষী রূপে নিত্যবর্তমান। তাঁর সচ্চিদানন্দস্বরূপের কোনও বিকার হয় না, পরিণাম হয় না, এবং অভাবও হয় না।

সমগ্র দ্বৈতবোধের ব্যবহার পরস্পরবিরোধী ধর্মযোগে। অস্তি-নাস্তি, ইতি-নেতি সর্ববিধ কল্পিত-অনুমিত ভাবযোগে তার ব্যবহার সিদ্ধ হয়। এই সব ভাব শূন্য সর্ব কার্য-কারণাতীত অত্যন্ত নঞ্ ভাব লক্ষণা এই পাকা আমি-র কোনও দোসর নেই। এই আমি সগুণও নয়, নির্গুণও নয়; সাকারও নয়, নিরাকারও নয়; দ্বৈতও নয়, অদ্বৈতও নয়; জ্ঞানও নয় অজ্ঞানও নয়; ধর্মও নয়, অধর্মও নয়; সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়; মুক্তও নয় বদ্ধও নয়; সাধ্যও নয় সিদ্ধও নয়; জ্ঞাতাও নয়, জ্ঞেয়ও নয়; দ্রষ্টাও হয় দৃশ্যও নয়; সত্তাও নয় শক্তিও নয়; পুরুষও নয়, প্রকৃতিও নয়; প্রকাশকও নয়, প্রকাশও নয়। সবারই অবভাসক, অধিষ্ঠান নিত্যাদ্বৈত স্বয়ংপূর্ণ স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব স্বয়ং, নিরন্তর স্বানুভূতিই হল তার প্রমাণ। এই স্বানুভূতির কোনও বিকল্প নেই।

উনিশ

— স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানামৃত স্বতঃসিদ্ধ পরমে পরম
সর্বসম অনুপম স্বসংবেদ্য আপনে আপন।
সচ্চিদানন্দঘন পুরুষোত্তম স্বানুভবদেব স্বয়ং
পাকা আমি অহংদেব স্ববোধ আত্মা সনাতন।—

পাকা আমি নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ববোধে। স্ববোধবক্ষে তাঁর তত্ত্বস্ফূর্তি, অবিরামধারা তাঁর কেবল অখণ্ডবোধ আমি নিরন্তর আনন্দ আমি পরমাত্মার ধর্ম, পাকা আমি তাঁর সারমর্ম। তত্ত্বস্বরূপ তাঁর নিত্যসিদ্ধ পূর্ণ অঙ্গ।

তত্ত্ববোধে অজ্ঞানের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। এই তত্ত্ববোধই হল অখণ্ডভূমা প্রজ্ঞান বিশুদ্ধ পূর্ণ অদ্বয়জ্ঞান। তারই নামান্তর হল ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম। যেহেতু পরমতত্ত্বই হল প্রজ্ঞানঘন অখণ্ডভূমা অহংদেব বা পাকা আমি, সুতরাং ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম সত্তাই প্রজ্ঞানঘন আমিকে বোঝায়। ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মের আমি-র বক্ষে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ অভিব্যক্তির সামগ্রিকরূপ হল পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ। এক অর্থে সমগ্র সৃষ্টি। সমগ্র সৃষ্ট জীবজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রজ্ঞানঘন অদ্বয় আমি-রই বক্ষে আমি-র প্রকাশরূপ। যেমন অনন্ত জলসাগরের বক্ষে নিরন্তর অসংখ্য তরঙ্গ লহরী বুদ্বুদ ফেনা ওঠে, ভাসে, খেলা করে আবার লয় হয়ে যায়, তাদের প্রত্যেকেরই উপাদানসত্তা এক জলই, অন্য কিছু নয়। জলসাগরই হল তাদের পরিচয়। কেবলমাত্র তাদের নাম-রূপে ভেদ বা পার্থক্য হল আপেক্ষিক এবং মানসকল্পিত ইন্দ্রিয়ের বিষয়। তাদের পৃথক বা স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নেই, সেইরূপ অখণ্ডভূমা প্রজ্ঞানঘন তথা সৎ-চিৎ-আনন্দঘন ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মসত্তা সাগরে অর্থাৎ অখণ্ড ভূমা প্রজ্ঞানঘন বোধে বোধময় আমিসাগবে নিরন্তর আমিবোধের অসংখ্য তরঙ্গ লহরী বুদ্বুদ ফেনা রূপে এক আমিই নিত্যবর্তমানরূপে প্রকাশিত। সে সব নাম-রূপের পরিদৃশ্যমান জগৎ কল্পিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয। নাম-রূপাদি হল ভাবের মুখোশ। তাদের উপাদানসত্তা হল বোধময় আমি বা আমিময় বোধ।

রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো, শুক্তিতে রজতভ্রমের মতো, মরুভূমিতে মরীচিকা জলভ্রমের মতো এবং স্তম্ভে লোকভ্রমের মতো সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-আত্মায় নাম-রূপের মুখোশ পরা জগৎভ্রম হয় আত্মবোধ বা আপনবোধের অভাবে বুদ্ধিদোষে। নাম-রূপের ভাবও বোধময় আমি বা আমিময় বোধের মাধ্যমে সিদ্ধ হয়। আমি অতিরিক্ত কোনও ভাববোধের অস্তিত্ব কখনওই সম্ভব নয়। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আমিসাগরে যে-সকল ভাব-নাম-রূপ প্রতিভাত হয় তার সম্যক্ পরিচয় কেবলমাত্র বোধময় প্রজ্ঞানঘন আমি-রই প্রকাশবৈচিত্র্য। এক অখণ্ড আমি হল তাদের সবার পরিচয়। জীবনে এই এক আমিবোধই রূপে রূপে প্রতিরূপে, নামে নামে প্রতিনামে এবং ভাবে ভাবে প্রতিভাবে কত অভিনব ভঙ্গিমায় স্বয়ং প্রকাশিত হ'য়ে আপনবক্ষে আপনবোধের স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত আপনবোধের লীলায় অর্থাৎ আত্মবোধের লীলায় আপনবোধকেই ব্যক্ত ক'রে চলেছে। প্রতি জীবনে এই আপনবোধের প্রকাশ ক'রে আপনিই তা আস্বাদন ও অনুভব করেন। অন্তরে প্রাণ ও মনের সর্ববিধ প্রকাশের মাধ্যমে আপনাকে কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা

রূপে প্রকাশ ক'রে আপন-ই তা আস্বাদন বা অনুভব করেন। বুদ্ধির গভীরে হৃদযাকাশে সর্ববিধ দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের ভাববোধকে আপন স্বভাবে বরণ ক'রে, গ্রহণ ক'রে আপনবোধে তা আস্বাদন করে ঈশ্বরজ্ঞানে স্বয়ং। হৃদয়ের ঊর্ধ্বে তুরীয় ও তুরীয়াতীতে সর্ববিধ আমিবোধের অধিষ্ঠানরূপে প্রজ্ঞানঘন সচ্চিদানন্দ নিত্যাদ্বৈত আমি হ'ল ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মের আমি। এই অখণ্ড ভূমা পূর্ণ সচ্চিদানন্দঘন প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্ম আত্মা হ'ল সর্ব আমি-র হৃদয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ সর্ব আমি-র আত্মপরিচয়। আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। এই পূর্ণ নিত্য অদ্বৈত আমিস্বরূপ/তুরীয়তে গুণাতীত, ভাবাতীত, দ্বন্দ্বাতীত, ভেদাতীত, কেবল স্ববোধে প্রতিষ্ঠিত 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং'। সেই নিত্য অদ্বৈত প্রজ্ঞানঘন আত্মার আমি বিজ্ঞানময় হ'য়ে অর্থাৎ স্বভাবযুক্ত হ'য়ে হয় ঈশ্বরের আমি। জীবজগতের অধিপতি ঈশ্বরই হ'লেন বিজ্ঞানময় আমি। সেই আমি আবার জীবের অন্তরে জ্ঞানাভাসরূপে নিজেকে প্রকাশ ক'রে জীবরূপে লীলা করে। সেই অদ্বয় আমি আবার অজ্ঞানরূপে জীবের দেহ-ইন্দ্রিয়াদি ও তার ভোগ্যদৃশ্য বৈচিত্র্যময় জগৎরূপে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান নাম-রূপে নিজেকে প্রকাশ করে এবং নিজেই অহংকার সাজে তা আস্বাদন বা অনুভব করে। সচ্চিদানন্দঘন নিত্য অদ্বৈত অখণ্ড আমি তথা আত্মা তুরীয়তে প্রজ্ঞানঘন অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ, হৃদয়ে বিজ্ঞানঘন ঈশ্বর, অন্তরে জ্ঞানাভাস জীব এবং বাহিরে অজ্ঞানভূত জড়প্রকৃতি।

অনুবর্তন ও বিবর্তন ক্রম ধ'রে আমিতত্ত্বের স্বরূপকে ব্যক্ত করা হ'ল। সর্ববেদান্তসিদ্ধির অর্থাৎ বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমাত্মবিদ্যার তথা ব্রহ্মবিদ্যার বিজ্ঞানকে পরমতত্ত্বস্বরূপ পাকা আমি-র স্বানুভবসিদ্ধ বিজ্ঞানরূপে প্রকাশ ক'রে স্বানুভবদেব স্বানুভূতির পরিচয় স্বানুভূতির প্রতিরূপ সর্ব আমি-র সত্য পরিচয়কে সর্ব আমি-র বুকে পরিয়ে দিল। সবার আমি তার পরিচয় জেনে জীবনজিজ্ঞাসার সর্বোত্তম উত্তর নিজের মধ্যে নিজের দ্বারা নিজেই অনুভব করবে স্বানুভূতিযোগে।

জয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ অহংদেব পাকা আমি-র জয়।

'সোঽহংরূপ পুরাণপুরুষ পদ্মযোনি প্রকৃতিপতি সোঽহং।'

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর

সঞ্চালকের কথা

৫।১১।০১ তারিখে দিল্লি C.R. Park কালীবাড়ির নেতাজি হলে প্রজ্ঞানপুরুষ স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের আত্মবিদ্যা আমিতত্ত্বের উপর সন্ধ্যা ৭টায় ধারাবাহিক কয়েকটি ভাষণ শুরু হয়। পর পর তিনদিন—৫, ৬, ৭ নভেম্বর প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত এই ভাষণ চলে আত্মবিদ্যা আমিতত্ত্বের উপর। ভাষণ প্রারম্ভে আনুষ্ঠানিক নীতি অনুসারে প্রবক্তা ও তাঁর বক্তব্যের পরিচিতি প্রসঙ্গে শ্রোতাদের সামনে কিছু বলতে হয—

সন্তোষ সেন—নমস্কার। সচ্চিদানন্দ সোসাইটি দিল্লির তরফ থেকে আমি চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটির সভাপতি শ্রী এন. এন. সরকার মহাশয়, সম্পাদক ডঃ আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং কার্যনির্বাহক কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীবৃন্দকে জানাই শুভবিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সকলে অবগত আছেন যে দীর্ঘকালযাবৎ স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আমাদের অতি সহজ সরল ভাষায় কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও ধ্যান যোগের বিষয়ে তাঁর স্বানুভূতি ব্যক্ত ক'রে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। আজকের এই সন্ধ্যায় আবার দীর্ঘ চার বৎসর পর শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরকে আমাদের মাঝখানে পেয়েছি এবং তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত জীবনজিজ্ঞাসা ও তার সমাধানের বিভিন্ন দিক অর্থাৎ ইংরাজিতে Self-enquiry, Self-analysis and its perfection from different angles of life সম্বন্ধে তাঁর স্বানুভূতি আমরা শ্রবণ করব। সমগ্র বিষয়টি হল আত্মজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। জীবনের সমগ্র সমস্যার সমাধান হল এই আত্মজ্ঞান। প্রজ্ঞানপুরুষ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এই আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এই আত্মজ্ঞান হল Knowledge of Knowledge। এই Knowledge of Knowledge-এর বিজ্ঞান তিনি তাঁর স্বানুভূতির ভাষায় জীবনের নানা দিক থেকে সহজবোধ্য ক'রে প্রকাশ করে আসছেন দীর্ঘকালযাবৎ, সর্বসাধারণের সমগ্র কল্যাণ, মুক্তি এবং মঙ্গলের জন্য। তাঁর শ্রীমুখ হতে এই বিজ্ঞান শ্রবণে শ্রোতার অন্তরের জন্মজন্মান্তরের সকল চিন্তা ও কর্মের অজ্ঞানজাত সর্বসংস্কারের নিরসন হবার সহজ উপায় আমরা পাই। আজ তিনি সেই প্রসঙ্গে আমাদের কীভাবে উদ্বুদ্ধ করেন আমরা তা জানতে পারব। আমি চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটিকে ৫, ৬, ৭ নভেম্বর, ঐই তিনদিন এই সৎসঙ্গ আয়োজন করার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আশা করি চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটি আমাদের এইরকম আরেকটি সৎসঙ্গ ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ নভেম্বর, নেতাজী সুভাষ হলে আয়োজন করার সুযোগ দেবেন, তাহলে আমরা ধারাবাহিক ভাবে এই সূক্ষ্ম আত্মবিজ্ঞানের অনুভূতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার অধিক সুযোগ পাব। নমস্কার।

৫।১১।০১

বাইশ

২৬ নভেম্বর, ২০০১ সালে সন্ধ্যা ৭টায় দিল্লি C.R. Park কালীবাড়ির নেতাজি হলে প্রজ্ঞানপুরুষ স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম দিনের ভাষণ শুরু হয়। পর পর চারদিন—২৬, ২৭, ২৮, ২৯ নভেম্বর প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত এই ভাষণ চলে আত্মবিদ্যা আমিতত্ত্বের উপর।

প্রসেনজিৎ লাহিড়ি—নমস্কার। সমবেত সুধীজনদের জানাই বিজয়ার শুভেচ্ছা। আমার নাম প্রসেনজিৎ লাহিড়ি। আমি থাকি চিত্তরঞ্জন পার্ক-এ। আর বাবাঠাকুরের সাথে আমার সর্বপ্রথম দেখা হয় ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে। সাত বছর হয়ে গেছে বাবাঠাকুরের সাথে আছি। কয়েকটা কথা আপনাদের সাথে share করতে চাই, কী জিনিস আমি তাঁর কাছে পেয়েছি এবং এই জিনিসের দ্বারা কী ক'রে আমার জীবন peaceful হয়েছে, শান্তিময় হয়েছে। আশা করি যদি আপনাদের ভাল লাগে আপনারা তা সেইভাবে ব্যবহার করতে পারেন। বাবাঠাকুরের কাছে আসবার আগে আমার জীবনে অনেক বড় বড় সাধু মহাত্মাদের সাথে দেখা হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্নরকম ভাবে ভগবৎপ্রসঙ্গ জ্ঞানের মাধ্যমে, কর্মের মাধ্যমে, ভক্তির মাধ্যমে কীভাবে করা যায়, কীভাবে জপ-তপ-ধ্যান-তপস্যা ইত্যাদি করা যায় সেই সব তাঁদের মুখে শুনেছিলাম। কিন্তু কোথায় যেন একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছিল, সমস্ত জিনিসটার একটা সমাধান পাচ্ছিলাম না। Totality-তে সমস্ত জিনিসকে একসাথে নিয়ে যে সমাধান তা পাচ্ছিলাম না। বিরাট বড় বড় সাধু, তপস্বী, তাঁদের কী ক্ষমতা, সেগুলো সমস্ত আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করেছি, দেখেছি নিজে। এই যে প্রশ্নটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অক্টোবর মাসে ১৯৯৪ সালে বাবাঠাকুরের সাথে আমার দেখা হয়। প্রথম প্রথম যখন কথাগুলি শুনি আমিও সব বুঝতে পারিনি, আপনারা যারা প্রথমদিন আজকে এসেছেন একটু হয়ত অসুবিধা বোধ করবেন কেননা normally যা শুনে থাকেন তার থেকে কথাগুলো ভিন্ন মনে হবে। ভিন্ন মানে তথাকথিত জপ ধ্যান তপস্যা ইত্যাদি করার যে পদ্ধতি, যেভাবে আমরা তা শুনে থাকি ঠিক সেই হিসাবে শুনবেন না। সমস্ত কথাই based হবে আপনাকে নিয়ে, আমাদের নিয়ে—নিজেকে নিয়ে নিজের সম্বন্ধে কথাগুলো সমস্ত। মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত এগুলোর কী ব্যবহার, এগুলো কীভাবে আমাদের জীবনকে চালায়, কীভাবে আমরা তারই under-এ প'ড়ে আছি অথচ আমাদের আসল স্বরূপটা কী—সমস্ত প্রসঙ্গ কিন্তু আমাদের আসল স্বরূপ নিয়ে। এই কথাটা একটু ধারাবাহিক ভাবে না-শুনলে প্রথম দিকে একটু অসুবিধা বোধ হবে, হয়ত মনে হবে তা খুবই দুর্বোধ্য। কেননা আমরা সবাই আমাদের জীবনে কিছু জেনেছি, কিছু শুনেছি, কিছু পড়েছি। সেই কিছু জানা শোনা পড়া দিয়ে আমরা একটা মাপকাঠি তৈরি করি, আর যা-কিছু শুনি তার পরে ঐ মাপকাঠির মানদণ্ডে তা ফেলি। মানদণ্ডে ফেলে দেখি যদি ঐ মানদণ্ড থেকে বড় কোনও জিনিস পাই, তা মানদণ্ড reject ক'রে দেয়, আর যেই reject হয়ে গেল সেই মুহূর্তে কিন্তু আমি আর তা গ্রহণ করতে পারলাম না। তাই জন্য best উপায় হচ্ছে সেইভাবে শোনা একটা ছোট বাচ্চা ছেলে যেরকমভাবে ঠাকুরদাদা ঠাকুমার কাছে গল্প শোনে, সে কিন্তু একেবারে

পরিষ্কার মন নিয়ে পরিষ্কার মাথা নিয়ে গল্প শোনে, এর থেকে বেশি আর কোনও জিনিসের দরকার নেই। একটা ছোট বাচ্চা ছেলের মতো, গল্প শোনার মতো ক'রে অতটুকু concentration দিয়ে যদি আমরা শুনতে পারি এবং যা-কিছু শুনেছি জেনেছি এক minute-এর জন্য যদি তা একদিকে রেখে গল্প হিসাবে কথাগুলো জানতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক বেশি উপকৃত হব। আমি আমার জীবনে যে শান্তি বা আনন্দ পেয়েছি, যা priceless তা কোনও দাম দিয়ে বা পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। তা যদি একান্তই চান আপনারা পেতে পারেন একমাত্র শ্রবণের মাধ্যমে। তা কী ক'রে শ্রবণের মাধ্যমে সম্ভব হয়? আমাকে জপও করতে হবে না, ধ্যানও করতে হবে না, তপস্যাও করতে হবে না, কীর্তনও করতে হবে না—তা কী ক'রে সম্ভব! কথাগুলো শুনে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা জাগবে যে, কী বলছেন উনি! এগুলো তো আমি বুঝতেই পারছি না, ভাবতেই পারি না যে আমাকে কিছুই করতে হবে না! এতদিন শুধু জেনেছি কিছু ক'রে কিছু পাওয়া, এখন হওয়ার বিজ্ঞান শুনছি—হয়ে যাওয়া। তা কী জিনিস!

আমি জানি না আপনাদের মধ্যে কারও কখনও এই সম্পর্কে কোথাও জানবার সৌভাগ্য হয়েছে কিনা অর্থাৎ হওয়ার বিজ্ঞান সম্বন্ধে। করার বিজ্ঞান শোনবার অনেক opportunity অনেকে আমরা অনেক জায়গায় পেয়েছি। কিন্তু হওয়ার বিজ্ঞান, যা নিজের মধ্যে নিজে যে জ্ঞানসাগরে আছে, সেই জ্ঞানসাগরের উপরে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর ক'রে এগিয়ে যাওয়া। হওয়ার বিজ্ঞান—এই একটা জিনিস আপনারা শুনে দেখবেন যদি তা আপনাদের নিজের জীবনে ব্যবহার করতে পারেন তাহলে দেখবেন কীরকম অভূতপূর্ব একটা আনন্দ পাবেন, শান্তি পাবেন, যা অনেক জায়গায় অনেককিছু ক'রে পাননি। হয়ত একটা জায়গায় কোনও কীর্তনে গেলেন বা কোথাও জপে বসলেন কিংবা ধ্যানে বসলেন, কোনও যজ্ঞে গেলেন—সেই মুহূর্তটা, কিছুক্ষণের জন্য ভাল লাগতেও পারে আবার ভাল নাও লাগতে পারে কিন্তু যেই ফিরে এলেন আবার সংসারের মধ্যে তখন আবার contradiction। এত রকমের বিপরীত অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই বের হই—নিজের কর্মজীবনে বেরোই, নিজের সাংসারিক জীবনে বেরোই, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বেরোই, যেখান যাই সেখানে আমরা বিপরীত circumstances পাই—উচিত-অনুচিত, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যার মধ্যে দিয়ে আমাদের একটা continuous tussel চলতে থাকে। আমাদের কী সারাটা জীবন এইভাবেই চলবে, আমি কি সারাজীবন একটা struggling agent হয়ে বেঁচে থাকব, আমি কি জন্মেছিলাম শুধু struggling agent হয়ে বেঁচে থাকার জন্যে? না আমার অন্য কোনও একটা অস্তিত্ব আছে, স্বরূপ আছে? সেই স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার আমি কিন্তু আমার জীবনে opportunity একটাই পেয়েছি। আনন্দময়ীমা'র সাথে তিরিশটা বছর ছিলাম। জন্মের আগে থেকেই আমার মা যেতেন ওখানে, কিন্তু কোনওদিন এই তত্ত্বকথা জানবার সৌভাগ্য বা সুযোগ হয়নি। তাঁর সান্নিধ্যে থাকবার অনেক opportunity পেয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কিন্তু মনের ভিতরে এই স্পৃহা, ইচ্ছা জাগেনি তত্ত্বকথা জানবার। এইখানে এসে বাবাঠাকুরের মুখ

থেকে-জীবনের যতকিছু জিনিস, যা-কিছু রহস্য, আমার দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি আচরণাদি যথা খাওয়াদাওয়া, চান করা, ওঠা, বসা, কাপড় পরা, চলা—সমস্ত জিনিস পরমতত্ত্বের সাথে কীভাবে related তা শুনেছি। আসলে কীভাবে আমি, কী মনে করতাম নিজেকে সম্পূর্ণ জিনিসটা in totality, সবকিছু মিলিয়ে কর্ম জ্ঞান ভক্তি সমস্ত মিলিয়ে in totality-তে কী করে আমি আমার দৈনন্দিন জীবনে তা ব্যবহার ক'রে চলতে পারি এবং শান্তি পেতে পারি সেই বিষয়ে শুনেছি। আমি কিন্তু এই জিনিস তাঁর কাছে পেয়েছি। আর আপনারা যদি একটু ধৈর্য ধ'রে শোনেন, প্রথম দিকে কিন্তু একটু অসুবিধা হবে কেননা তথাকথিত যা শুনে থাকেন তার থেকে সর্বাংশে অনেককিছু ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র, ধৈর্য ধ'রে তা ধারাবাহিক ভাবে শুনতে হবে। এখানে কিন্তু কোনও দীক্ষা নেই, কোনও মন্দির নেই, কোনও মসজিদ নেই, কোনও ধ্যান নেই, কোনও তপ নেই, কিচ্ছু নেই। আপনি যে কোনও জাতির বা সম্প্রদায়ের হোন, যে কোনও দেশবাসী হোন, কোনওরকমের কোনও bar নেই, কেননা এসব আপনাকে নিয়ে কথা, আমাদের নিয়ে কথা। আমি কোথা থেকে এলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন দেশে বাস করি, কী ভাষা বলি তার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আশা করি আপনারা এর থেকে আনন্দ পেতে পারেন এবং এর থেকে শান্তি পেতে পারেন। আমরা সবাই কিন্তু শান্তি খুঁজি, জানি না হয়ত কিন্তু মনে করি টাকাপয়সা পেলে শান্তি পাব, মনে করি ইজ্জত পেলে শান্তি পাব, status পেলে পাব, অমুক পেলে, গাড়ি পেলে, বাড়ি পেলে, ঘোড়া পেলে, অমুক হলে, ছেলে পেলে, মেয়ে পেলে—আমাদের কাছে কোনও জিনিস যা নেই তা পেলে মনে করি শান্তি পাব। কিন্তু তার থেকে কি শান্তি আদৌ পাব? যদি পাই সেই শান্তি কিন্তু temporary। কিছুদিন কিছুক্ষণ থেকে আবার চ'লে যাবে। পরমশান্তির অনুভব আমি আমার সংসারের মধ্যে থেকে সংসার ত্যাগ না-করে কী করে পেতে পারি? তা কি সম্ভব? দৈনন্দিন জীবনে যা-কিছু আমি মেনে চলি, আমি গুরু ভজন করতে পারি, আমি বৈষ্ণব, আমি শৈব, আমি যা হই না কেন তার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই এ জিনিসের। এ একেবারে totally independent এবং completely original জিনিস। দেখুন আপনাদের যদি ভাল লাগে। আমি যা অনুভব করেছি তা-ই আপনাদের সামনে রাখলাম, যদি আপনারা এর ভিতর থেকে কিছু পান তো আপনাদেরই আনন্দ, আপনাদেরই শান্তি। নমস্কার।

৬।১১।০১

পঁচিশ

১৯/১২/০১ তারিখে সন্ধ্যা ৭টায় দিল্লি C.R. Park কালীবাড়ির নেতাজি হলে প্রজ্ঞানপুরুষ স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের তৃতীয় পর্যায়ের ধারাবাহিক ভাষণ শুরু হয়। পর পর তিনদিন ১৯, ২০, ২১ ডিসেম্বর ২০০১ সালে এই হলেই সন্ধ্যা ৭টায় তাঁর ভাষণ হয়। আত্মজিজ্ঞাসা আত্মবিশ্লেষণ—আমিতত্ত্বের অনুভূতির মাধ্যমে জীবনজিজ্ঞাসার সমাধান। প্রায় ৩ ঘণ্টা চলে তাঁর এই ভাষণ। শ্রোতাদের উৎসাহ, আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দিন দিন বেড়েই চলে।

পূর্ণেন্দু সান্যাল—নমস্কার। সচ্চিদানন্দ সোসাইটির তরফ থেকে আমি উপস্থিত সুধীবৃন্দ এবং কালীমন্দির সোসাইটির সভাপতি শ্রী এন. এন. সরকার মহাশয়, সম্পাদক ডঃ আনন্দ মুখার্জী মহাশয় এবং কার্যনির্বাহক কমিটির সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমরা সকলেই খুবই সৌভাগ্যবান যে আজকের এই শুভ সন্ধ্যায় আমরা আমাদের মধ্যে প্রজ্ঞানপুরুষ স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরকে পেয়েছি। তাঁরই শ্রীমুখ হতে আমরা শুনব আজ আত্মস্বরূপের অনুসন্ধানের পরিণামে 'আমি কে'। এই আত্মপরিচয় সম্বন্ধে তিনি তাঁর অনবদ্য অননুকরণীয় মৌলিক ও প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে কীভাবে অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ ও প্রবোধিত ক'রে আসছেন দীর্ঘকালযাবৎ। তাঁর বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য হল পরমতত্ত্ব নিত্যাদ্বৈত পরমসত্য সর্ব ভাববোধ নিরপেক্ষ কেবল স্বানুভবসিদ্ধ। গতানুগতিক ভাববোধে তা সর্বক্ষেত্রে যেভাবে পরিবেশিত হয় সেভাবে নয়। নিজকে কেন্দ্র ক'রে তিনি তাঁর হৃদয়ে স্বানুভূতির জ্যোতিতে নিত্য অদ্বৈত পরমতত্ত্বস্বরূপের পূর্ণাঙ্গ অনুভূতি ও পরিচয়কে সম্পূর্ণ ভাবে স্বকীয় ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছেন। সর্ববিধ দল মত পথ ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ কেবলমাত্র ঐকান্তিক অখণ্ড আপনবোধের মাধ্যমে অতি মনোরম, চিত্তাকর্ষক ও সহজ ভাবে সংসারজীবনের চারিপাশে সর্ববিধ প্রকাশের উপমা, ঘটনা ও দৃষ্টান্তকে অবলম্বন ক'রে এই পরম দুর্বোধ্য আপনবোধের বিজ্ঞানকে, আপনবোধের দর্শন ও ধর্মকে এমন অভিনব ভঙ্গিমায় পরিবেশন করেন যে কর্ম ও অন্যান্য সাধন নিরপেক্ষ ভাবে কেবলমাত্র শ্রবণের মাধ্যমে তা সর্বতোভাবে হৃদয়ঙ্গম ও সুসিদ্ধ হয়।

প্রাসঙ্গিকক্রমে সহজভাবে বলা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন সাধনপদ্ধতির মাধ্যমে প্রচলিত ধারায় দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মের যে সব গবেষণা, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয় তার মধ্যে একাত্মবোধের সমবোধের ও আপনবোধের সম্যক্ অভাব থাকে বলে জীবনের সর্ববিধ জিজ্ঞাসা, সংশয়, সমস্যা এবং সমাধানের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই দার্শনিকদের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানীদের মধ্যে এবং ধর্মনেতা ও প্রচারকদের মধ্যে একাত্মভাববোধ, সমভাববোধ এবং আপনভাববোধের সম্যক্ অভাব দৃষ্ট হয়। ফলে মানবসমাজে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অসহিষ্ণুতা, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও দোষদর্শন, ত্রিবিধ ভেদদৃষ্টি যথা স্বগতভেদ, স্বজাতীয়ভেদ ও বিজাতীয়ভেদ দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রচলিত ও গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে সর্ববিধ সামঞ্জস্যের অভাব। তাই দেখা যায় মানুষের স্বকল্পিত অজ্ঞানজাত ভেদদৃষ্টি তথা দ্বৈতজ্ঞান, যোগ্যতা ও সামর্থ্যের অভাব, ভ্রান্তি ও ভীতি জীবনকে ঘিরে রেখেছে।

এইসবের মূল কারণ হল আত্মবোধ বা আপনবোধ তথা সমবোধ বা একাবোধের অভাব। আত্মবোধ বা আপনবোধের কল্পিত বিস্মৃতি হয় আপন অতিরিক্ত অন্যভাববোধের কল্পনা ও ভাবনার দ্বারা। স্বকল্পিত আপন অতিরিক্ত অন্য বা ভিন্ন কল্পনা বা ভাবনাই হল অজ্ঞান।

কল্পনা ও ভাবনা হয় মনে। মন হল অন্তঃকরণ। তা এক হয়েও চারভাগে বিভক্ত হয়ে সক্রিয় হয়। তাদের নাম হল মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত। তাদের প্রত্যেকেরই স্বকীয় ধর্ম ও কার্য পৃথক ভাব ও লক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। গুণভাবযোগে এই চতুর্বিধ অন্তঃকরণ অভিনব ভঙ্গিমায় খেলা করে পরস্পর মিলে। তাদের খেলা হয় বোধময় অদ্বয় আত্মসত্তা আমি-র বক্ষে। অন্তঃকরণের মাধ্যমে এক বোধসত্তাই বৈচিত্র্যরূপে প্রতিভাত হয়। যতই বৈচিত্র্যময় হয় ততই পরস্পরের মধ্যে মিশ্রণ বেশি হয। তাদের মাধ্যমে বোধসত্তার যে জ্যোতি বা প্রকাশ অভিব্যক্ত হয় তার সামগ্রিক রূপই হল অবিদ্যাশক্তি। এই অবিদ্যাশক্তির মাধ্যমে একবোধ সমবোধ বা আপনবোধ সত্তা আত্মা নানাত্ববহুত্বরূপে বৈচিত্র্যরূপে প্রতিভাত হয়। সেইজন্য এগুলি হল মনের কল্পিত বিলাস। সমগ্র অন্তঃকরণকে চতুর্বিধ নামে উল্লেখ করা হলেও যে কোনও এক নামে তাকে নির্দেশ করা যায়। অন্তঃকরণের প্রত্যেকেরই দশটি ক'রে প্রধান বৃত্তি আছে। যেমন মনের হল কাম, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ভী, ধী। অহংকারের দশবিধ ভাববৃত্তি হল কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব, প্রভুত্ব, শৌর্য, বীর্য, দম্ভ, দর্প, অভিমান ও স্বার্থ। এইরূপ বুদ্ধির দশবিধ ভাববৃত্তি হল যুক্তি, বিচার, অন্বেষণ, পরীক্ষা, নিরীক্ষা, প্রমাণ, অনুভূতি, প্রজ্ঞা, সন্তোষ বা প্রীতি ও সিদ্ধি। এই চতুর্বিধ অন্তঃকরণ সম্বন্ধে জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বুদ্ধি ও অহংকার এক পর্যায়ের এবং মন ও চিত্ত আরেক পর্যায়ের। জীবনের সর্ববিধ কার্য এদের মাধ্যমেই নিষ্পন্ন হয়। আত্মার আমি নিরপেক্ষ সর্ব সাক্ষী মাত্র।

গুণের কার্য হল ভাব। তার নামান্তরই হল উপাধি। জ্ঞানস্বরূপ স্বোধ-আত্মার বক্ষে অর্থাৎ পাকা আমি-র বক্ষে গুণজাত উপাধি আসে যায় ও কর্মফল ভোগ করে। উপাধি জরাজীর্ণ ও বিকৃত হয় এবং তারই ক্ষয় বা নাশ হয়। গুণ-উপাধির ভাববিকারাদি মনের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয় অহংকারের দ্বারা। অহংকারই তার ফলভোক্তা। গুণভাবাদির অতীত বিশুদ্ধ বোধসত্তাই হল পাকা আমি, স্ববোধের আমি। প্রকাশধর্মী সত্ত্বগুণের মাধ্যমে ভাবাদির প্রকাশ হয়। ক্রিয়াধর্মী রজোগুণের প্রবৃত্তি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। জড় ও মোহ ধর্মী তমোগুণের নিষ্ক্রিয়তা সবকিছুকে ধারণ ক'রে আবৃত করে রাখতে চায়। তাতে শুদ্ধ স্ববোধ-আত্মার আমি সর্ব অবস্থায় নির্বিকার ও উদাসীন থাকে।

স্বভাবের সর্ববিধ বিকারের মধ্যে বুদ্ধি হল সর্বোত্তম। বুদ্ধি স্বভাবের প্রথম অভিব্যক্তি বা প্রতিফলন বলে তা মূলত সত্ত্বগুণের জ্যোতিতে গঠিত। বুদ্ধির সর্ববিধ ভাববৃত্তির মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রতিফলন বা প্রকাশজ্যোতি বিশেষ ভাবে নিহিত থাকে। সেইজন্য তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সব সময়ই অহংকার ও মনের কার্যকে ফলবতী করতে সাহায্য করে। বুদ্ধির চরম সিদ্ধি লাভ হয় স্বভাববোধের পূর্ণ সহযোগে এবং তা সম্পন্ন হয় বিদ্যাশক্তির মাধ্যমে।

সাতাশ

অবিদ্যাশক্তির মাধ্যমে যেমন মন-বুদ্ধি-অহংকারের অশুদ্ধি বা বিকার অধিক হয়, বিদ্যাশক্তির মাধ্যমে তাদের মল ও বিকার শুদ্ধি হয়। বুদ্ধিশুদ্ধি হয় সাত্ত্বিক বুদ্ধির উৎকর্ষের ফলে। সাত্ত্বিক বুদ্ধি বিদ্যাশক্তির সঙ্গে সব সময়ই যুক্ত থাকে। অশুদ্ধ মন-বুদ্ধি হল অবিদ্যা অজ্ঞানের বাহন। শুদ্ধ মন-বুদ্ধি হল স্ববোধাত্মার বাহন। স্ববোধাত্মাই হল তাদের ইষ্ট।

জীবনে প্রথমে অবিদ্যাপ্রকৃতির অভিব্যক্তি বেশি হয়, কোনও পর্যায়ে বহির্প্রকৃতি ও অন্তর্প্রকৃতির বিবর্তনের মাধ্যমে বিদ্যাশক্তি তথা সাত্ত্বিক ভাববোধের প্রকাশাদি তমোরজোগুণের ভাববিকারাদিকে সুকৌশলে অভিভূত ক'রে উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয়। তার ফলে স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাশক্তিব সাহায্যে পরিশোধিত হয়ে স্ববোধসত্তায় পরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তখন আর তার মধ্যে অবিদ্যা অজ্ঞানের প্রভাব বিশেষ ভাবে কার্যকরী ও ফলবতী হতে পারে না।

এইভাবে জীবনে স্বভাবের সহজাত অবিদ্যা প্রবৃত্তির ক্রমবিবর্তন হয় স্ববোধের উৎকর্ষের মাধ্যমে। স্ববোধে প্রতিষ্ঠা মানেই হল স্ববোধে আপনবোধে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠা। আত্মবোধে প্রতিষ্ঠা হলেই পাকা আমি-র প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত হয়। কাঁচা আমি জীবের আমি পাকা আমি-র শরণাগত হয়ে তার স্বতঃস্ফূর্ত অনুগ্রহের ফলে কীভাবে জীবধর্ম অতিক্রম করে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মধর্মের স্বরূপ অদ্বয় পাকা আমিতে মিশে তাদাত্ম্য লাভ করে তদ্‌ধর্ম প্রাপ্ত হয় তার বিজ্ঞান শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখ হতে শুনবার সুযোগ পেয়েছি তাঁর কৃপায়। সেই কথাই তাঁর কথায় আপনাদের সামনে প্রকাশ করতে পেরে নিজেকে ধন্য ও কৃতকৃত্য মনে করছি। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের করুণা ও অনুগ্রহের ফল আপনাদের সামনে রেখে সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

১৯।১২।০১

আঠাশ

২৬/১২/০১ তারিখে সন্ধ্যা ৭টায় দিল্লি C.R. Park কালীবাড়ির নেতাজি হলে প্রজ্ঞানপুরুষ স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের চতুর্থ পর্যায়ের ভাষণ শুরু হয়। পর পর তিনদিন—২৬, ২৭, ২৮ ডিসেম্বর এই ভাষণ অনুষ্ঠিত হয়। এই ভাষণপর্ব চলে আত্মবিদ্যা আমিতত্ত্বের উপর।

পূর্ণেন্দু সান্যাল—নমস্কার। সচ্চিদানন্দ সোসাইটির তরফ থেকে আমি উপস্থিত সুধীবৃন্দ এবং কালীমন্দিরের সোসাইটির সভাপতি শ্রী এন. এন. সরকার মহাশয়, সম্পাদক ডঃ আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং কার্যনির্বাহক কমিটির সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। গত ১৯/১২/০১ তারিখে এই হলে প্রজ্ঞানপুরুষ স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের তৃতীয় পর্যায়ের ধারাবাহিক ভাষণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পর পর তিনদিন—১৯, ২০, ২১ ডিসেম্বর এই ভাষণ চলেছিল প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত। শ্রোতাদের উৎসাহ, আগ্রহ ও ব্যাকুলতা অনুসারে আজ থেকে আবার ধারাবাহিক তিনদিন ভাষণ চলবে। আপনাদের সামনে আজ আমি শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের অনন্যসাধারণ মৌলিক স্বানুভূতির বিষয় প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলব। তাঁর স্বানুভবসিদ্ধ তত্ত্বের অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব সম্বন্ধে বেশি কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর পূর্ব পর্যায়ের ভাষণের শুরুতে আমি তাঁর মুখ হতে শোনা কথার মর্মার্থ তাঁরই কথার মাধ্যমে কিছুটা উল্লেখ করছি। সাধারণত আমরা সকলেই জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে অধিকমাত্রায় সচেতন হবার শিক্ষা পাই এবং তদনুসারে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করি। আমাদের যথাসম্ভব অর্জিত জ্ঞানের বিষয়বস্তু হল secondhand knowledge বা মিশ্রজ্ঞান, যথা বস্তুসাপেক্ষ, ব্যক্তিসাপেক্ষ, দেশ-কাল-কার্য-কারণ সাপেক্ষ, জাগতিক—দেশ-বিদেশের ঘটনাবলী, প্রাকৃতিক দুর্যোগাদি এবং রাষ্ট্র, সমাজ ও পারিবারিক ঘটনাবলী প্রভৃতি অবলম্বনে আমরা তথ্য সংগ্রহ করি, তার ভিত্তিতেই আমাদের অনুভূতি গড়ে ওঠে। আমাদের সামগ্রিক জ্ঞান ও অনুভূতি হল বিষয়সাপেক্ষ—material knowledge, wordly knowledge, physical knowledge, objective knowledge। এই জ্ঞানেরও অনন্ত অনন্ত বৈচিত্র্যমান, তাও সবার সমান নয়। আমাদের পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান/অনুভূতির পার্থক্য আমরা সহজে অতিক্রম করতে পারি না। আমাদের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বলতে গেলে জাগতিক বিদ্যা বা material knowledge-কেই বোঝায়।

জাগতিক বিদ্যা দিয়েই আমাদের জীবন শুরু এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বিদ্যার উপর নির্ভর করে আমরা চলার চেষ্টা করি। যার ফলে আমাদের মধ্যে বোধের ঐক্য সমতা ও অভিন্নতা আমরা অনুভব করতে পারি না, অর্থাৎ জ্ঞানই যে আমাদের সত্যস্বরূপ তা আমরা জানতে পারি না এবং অনুভবও করতে পারি না। অজ্ঞানবশত স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হয়েও বুদ্ধিদোষে জ্ঞাতা সেজে জ্ঞানকে জ্ঞেয়রূপে চর্চা করি জীবনভর। তার ফলে নিজের পূর্ণস্বরূপ আমিকে বা আত্মাকে না-জেনে তার আভাসের আভাসকে নিয়ে জীবনভর মাতামাতি করি। একেই বলে জ্ঞানের অজ্ঞান ব্যবহার। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছেন যাদের আমরা প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, দার্শনিক, সাহিত্যিক, কবি বলি, তাদের কথার মধ্যেও মিশ্রজ্ঞান

বা দ্বৈতজ্ঞানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কিছু সংখ্যক লোক জীবনদর্শন নিয়ে চর্চা করেন, ধর্ম-ঈশ্বর প্রসঙ্গ নিয়ে চর্চা করেন এবং জাগতিক বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও অতীন্দ্রিয় লোকের তত্ত্ব/সত্য সম্বন্ধে অনুশীলন, গবেষণা এবং সাধনা করেন। মুনি ঋষি সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে অধিকাংশই মিশ্রবোধ বা দ্বৈতবোধের চর্চা করেন। খুব কম সংখ্যক তাদের মধ্যে যাঁরা পরমতত্ত্ব/সত্য ব্রহ্ম-আত্ম বিষয়ে গভীর সাধনার মাধ্যমে নিজের মধ্যেই তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন এবং অনুভূতি খুঁজে পান। তাঁরাই হলেন শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত মহামানব, অতিমানব, সত্যদ্রষ্টা, ঈশ্বরদ্রষ্টা, আত্মজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। যুগে যুগে এরকম অতিমানব মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে, আমাদের দেশেও হয়েছে। তাঁদের সাধনলব্ধ স্বভাবসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের কথা ও বাণী এবং তার বিজ্ঞান আমাদেব শুনিয়েছেন। অতীতে বৈদিকযুগে মুনি ঋষিদের মধ্যে এরূপ ঈশ্বরদ্রষ্টা আত্মজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র অধ্যাত্মবিদ্যা তাঁদেরই অবদান। এই অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের স্বানুভূতির স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা অনবদ্য।

তিনি অধ্যাত্মবিদ্যাকে তিন ভাগে ব্যক্ত করেছেন—প্রথম ভাগে পরম অব্যক্তের বক্ষে জীবজগতের অভিব্যক্তির বিজ্ঞান প্রসঙ্গ; দ্বিতীয় ভাগে জীবনবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও পরিণাম সিদ্ধির উৎকর্ষের প্রসঙ্গ এবং তৃতীয় ভাগে পরমতত্ত্বস্বরূপের স্বানুভবসিদ্ধির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। প্রথম বিভাগের বিষয়বস্তু হল material science, তার মধ্যে অভিন্ন ভাবে অনুস্যূত হয়ে আছে জীবনবিজ্ঞান বা life science। তার মধ্যে আবার অনুস্যূত হয়ে আছে ঈশ্বরতত্ত্ব বা divine science এবং তারই সর্বোত্তম পরিচয় হল পরমতত্ত্ব অদ্বয় অখণ্ড ঈশ্বরাত্ম ব্রহ্মসত্তা—The Absolute Reality। তাঁকেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের কথা, গান ও বাণীর মধ্যে এমন অনেকগুলি অভিনব মৌলিক স্বানুভবসিদ্ধ তত্ত্ব, কথা ও বাণী আছে যা পরমসত্য হলেও আমাদের কাছে তা সহজবোধ্য নয়। কারণ তার বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, আমাদের প্রত্যেকের নিজস্বরূপ বা আপনস্বরূপের নিত্য অদ্বৈত অমৃত দিব্য সত্য পরিচয় যা নিজের মধ্যে পূর্ণরূপে নিজের জন্য নিজের দ্বারাই স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। এগুলি তাঁরই ভাষায় আমি ব্যবহার করছি। তাঁর মুখে এই প্রসঙ্গ যতই আমি শুনেছি ততই আমি অনুপ্রাণিত অভিভূত প্রবোধিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছি। তিনি এত সহজ ভাবে অনর্গল আপনবোধের বিজ্ঞানকে কত যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রকাশ করেন যা মন দিয়ে শুনলে আর প্রশ্ন করার অবকাশ থাকে না। অদ্বয় বেদান্তের এক অভিনব রূপায়ণ পাই তাঁর তত্ত্বালোচনার মধ্যে। তাঁর মধ্যে যে তত্ত্বস্ফূর্তি ঘটেছে তার তুলনা বা উপমা তিনি স্বয়ং নিজে। একথা অত্যুক্তি নয়। তাঁর প্রথম বক্তব্য হল 'জীবন হল পরমতত্ত্বের প্রকাশমাধ্যম। তত্ত্বস্বরূপের স্বয়ংপ্রকাশ রূপই হল ব্রহ্ম/আত্মা স্বয়ং। সচ্চিদানন্দ হল তাঁর সত্যস্বরূপ। নিত্য অদ্বৈত হল তাঁর স্বমহিমা, স্ববোধ বা আপনবোধে স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত। স্বভাব তাঁর অভিন্ন অখণ্ড তত্ত্ব বা দর্শন, স্বয়ং প্রকাশতা ও নিত্যবর্তমান—

তা হল তাঁর বিজ্ঞান। সর্ব সমতা একতা নিত্যতা পূর্ণতা হল তাঁর ধর্ম। তাঁর স্বসংবেদ্য স্বানুভূতির রূপ হল জ্ঞানের জ্ঞান, বোধের বোধ, আমি-র আমি অহংদেব বা পাকা আমি।'

তিনি বলেন—'এই পাকা আমি হল সর্বসত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। এই আমি হল ব্রহ্ম-আত্মা সনাতন। তিনি আপনবক্ষে আপনবোধে আপনভাবে আপনই স্বয়ং নিত্য প্রকাশমান। দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্মের অভিন্ন একক রূপ হল এই পাকা আমি-র স্বমহিমা। এই আমি-র বক্ষে আমি-র নিরন্তর প্রকাশ তাঁর অদ্বৈতের বক্ষে দ্বৈতবিলাস। সমগ্র আমি-র এককরূপ হল বিশ্বাত্মক আমি। তাঁর অনন্ত প্রকাশ হল পৃথক বা ব্যষ্টি অর্থে ব্যষ্টি আমি। এই ব্যষ্টি আমি হল অহংকারের আমি, জীবের আমি, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে আছে দেহেন্দ্রিয় প্রাণ-মন-বুদ্ধি যুক্ত যে আমি। ব্যষ্টি আমি অহংকার নিজস্বরূপ সম্বন্ধে অবিহিত নয়। নিজের মধ্যে নিজ অতিরিক্ত সত্য কল্পনা রচনা করে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায়। সেইজন্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় নাম-রূপাদি হল তার প্রিয় ও একান্ত ভোগ্য বা অনুভূতির বিষয়। জীবপ্রকৃতির এই হল লক্ষণ ও ধর্ম। জীবের আমি, ব্যষ্টি আমি-র জীবনাদর্শই হল বহির্মুখী প্রবণতা, ভোগসর্বস্ব দেহবুদ্ধির দিকে। তার অন্তরে স্বভাবের মূলে রয়েছে তার সত্য পরিচয়। ভোগের জীবনে যখন তার বিরক্তি, বিতৃষ্ণা ও বিস্বাদ আসে তখন অন্তরে সে তার স্বভাবের সন্ধান করে, আপনার বৃহত্তর অংশের সন্ধান করে ত্বংকার বোধে। সে তখন তার বহির্মুখী নানাত্ববহুত্ব ভাববোধের পরিবর্তে অন্তরে তার বৃহত্তর ভাববোধকে দ্বৈতবোধে ত্বংকারবোধে/তুমিবোধে অনুশীলন বা অভ্যাস করে। তার ফলে তার স্বভাবের উৎকর্ষ লাভ হয়, বিকারজনিত মল পরিশোধিত হয়, স্বভাবের কেন্দ্রে স্ববোধের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। সেখানে আপনাকে আপন-ই খুঁজে পায় আপনবোধে আপন হৃদয়কেন্দ্রে। এখানেই ব্যষ্টি জীবের ঈশ্বরের সঙ্গে হয় পূর্ণযোগ ও তাদাত্ম্যসিদ্ধি। ঈশ্বরকে সে তখন আপন আত্মারূপে অন্তরে-বাইরে দর্শন করে; অনুভব করে আপনবোধের ব্যবহারে। পরিণামে আপনার পূর্ণস্বরূপে অখণ্ড ভূমা আমিতত্ত্বের অদ্বয়বোধে আপনাকে অনুভব করে। এই হল স্বানুভূতির বিজ্ঞান।'

এই স্বানুভূতির বিজ্ঞান হল শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের স্বকীয় মৌলিকতার অভিনব বিজ্ঞান। পাকা আমিকে আদি-মধ্য-অন্তে আপনবোধে ব্যবহারের মাধ্যমে ব্রহ্মাত্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্যকে তিনি সবার সামনে পরিবেষণ করছেন। শুনতে শুনতে সবার আমি সেই পাকা আমি-র সঙ্গে অনায়াসে একীভূত হয়ে তাদাত্ম্যসিদ্ধ হবে। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের সঙ্গ করে তাঁর কথা শুনে আমার মধ্যে তার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁর কথা দিয়ে আমার কথা আমি শেষ করছি।

সুতরাং জীবনে ইতিবাচক বা নেতিবাচক যা-কিছু অনুভূত হয় সবই সেই এক আমি-রই সত্য পরিচয়। অতএব আপনবোধের পরিচয় প্রথমে শুনে নিন মন দিয়ে ভাল করে, তারপর তাকে সাদরে আপনবোধে বরণ বা স্বীকার করে নিন। তারপর তাকে আপনবোধে স্বানুভূতিরূপে হৃদয়ঙ্গম করুন এবং পরিশেষে পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তাতে, শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপ্রকাশ স্বানুভূতির বাণীর সুধাসাগরে। নমস্কার।

২৬।১২।০১

পাকা আমি ও কাঁচা আমি

।। প্রথম বিচার ।।

ওঁ

অখণ্ড আনন্দ সাগবম্ চিদানন্দ স্বরূপম্
সর্বজীবনম্ চৈতন্য স্ফুরণম্ কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্।।
স্বতঃসিদ্ধং স্বতঃস্ফূর্তম্ স্বসংবেদ্যম্ সনাতনম্
স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ বোধে বোধে বোধময়ম্ নিজস্বরূপম্
সর্বহৃদয়ে অধিষ্ঠিতম্ নিজবোধরূপম্
অনন্তম্ প্রশান্তম্ অমৃতম্ স্ববোধরূপম্।।
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বানুভবদেব স্বযং
সচ্চিদানন্দঘন প্রীতম্ স্বানুভবদেব স্বয়ং।।

(উদ্গীত সূত্র)

সমস্ত জীবনসাধনা, জীবনজিজ্ঞাসা এবং তার পরিণামে যে অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা তার সার অংশ এই কয়েকটা কথার মধ্যে দেওয়া আছে। মানুষ আন্দাজে যদি জিনিস খোঁজাখুঁজি করে তবে খুঁজে পাবে না। জীবনভর মানুষ ভুল করে। ভুলের কারণ সে নিজের মধ্যে না-খুঁজে দায়ী করে অপরকে। এটা মানুষের ধর্ম। কিন্তু মানুষের আসল ধর্মটা কি খালি ভুল করা আর ভুল দেখা, অন্যের দোষ দেখা, অন্যের নিন্দা করা আর অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা, আর অপরকে অবজ্ঞা, অপমান বা ছোট করা? কারণ তা না-হলে তো নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না! সংসারে তা প্রচ্ছন্ন ভাবেই হোক, পরিষ্কার ভাবে অথবা সুষ্ঠু ভাবেই হোক—সর্বত্র এই জিনিস চলে আসছে দীর্ঘকালযাবৎ। তা না-হলে এক মানবজাতির মধ্যে এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মতভেদ কেন? এত সম্প্রদায় কেন? এত ধর্মমত, কর্মমত দেশ-বিদেশে সর্বত্রই সবার আগে চোখে পড়ে। মানুষ সত্যি সত্যিই এই সব করে কি কোনও দিন শান্তি পেয়েছে? তার কি কোনও record আছে? নেই। কেন শান্তি নেই? শান্তি তো আমরা সবাই চাই, কিন্তু শান্তি কোথায় পাই? বাজারে-দোকানে তা কিনতে পাওয়া যায় না, দেশ-বিদেশ ঘুরে তা সংগ্রহ করা যায় না। শান্তির কেন্দ্র নিজের মধ্যে, কিন্তু আমরা তা জানতে পারি না কেন? তার কারণ কিন্তু বাইরে নেই। কারণ ভিতরে, বাইরে হচ্ছে কার্য। খুব মন দিয়ে কথাগুলো শুনতে হবে। আমরা কারণ খুঁজি বাইরে, প্রকৃতির মধ্যে—এভাবে জানা যায় না। জীবনে যা-কিছু সব যদি একত্র করা যায় তাহলে কিন্তু সেই কারণকে জানা যাবে না। কারণ হচ্ছে নিজে—প্রত্যেকেই নিজে হল কারণ, আর কার্য হল এই জগৎসংসার।

নিজের মধ্যে এই কারণস্বরূপ প্রসঙ্গে যা বলা হল, সেই সম্বন্ধে মানুষের ধারণা খুব কম। আমরা যা-কিছু করি, এই বাইরেই মাতামাতি করি জীবনের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত। আমাদের যা-কিছু সম্ভার বা সম্পদ সব বাইরে। দেহ থেকে আরম্ভ করে বাড়ি-ঘর, কল-কারখানা, অফিস এই নিয়ে আমরা সারাজীবন মেতে থাকি। অর্থাৎ আমাদের outer nature-টাই হচ্ছে একমাত্র বাস্তব—তা অস্বীকার কেউ করতে পারবে না। কিন্তু এই বাস্তবের মধ্যে আমরা যা-কিছু করি তার থেকে কতগুলো প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। সেই প্রতিক্রিয়াগুলো আমাদের কাছে আসে—তার নামই হচ্ছে ভোগ। এই ভোগের থেকে মুক্ত হবার জন্য মানুষ নানারকম উপায় খোঁজে। সেইজন্য সে নানারকম মত-পথ, ক্রিয়াকলাপ, কার্য ইত্যাদির আশ্রয় নেয়। সংসারজীবনে মানুষ নিজের একটা গণ্ডি বানিয়ে নিয়ে তার মধ্যে বাস করে—তার নাম হচ্ছে আমারবোধ। প্রত্যেকেরই একটা আমারবোধ আছে। 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) কিন্তু মুখস্থ করা কোনও কথা বলছে না, বই পড়া কথা বলছে না। সারাজীবন 'এ' যে সত্যের সঙ্গে ওঠাবসা করেছে, যে সত্যের বাইরে 'এ' কিছুই খুঁজে পায়নি সেই সম্বন্ধে মানুষের কাছে বলছে যা প্রত্যেকের একান্ত আপন। অর্থাৎ যে বস্তু না-থাকলে কোনও জীবনের অস্তিত্ব থাকে না, তার ক্রিয়া, চিন্তা, ধারণা, ভাবনা ইত্যাদি অবান্তর হয়ে যায়। অস্তিত্ব কী বস্তু? ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখলে শরীর, প্রাণ দিয়ে দেখলে প্রাণ, মন দিয়ে দেখলে মন, বুদ্ধি দিয়ে দেখলে বুদ্ধি—তাহলে এর মধ্যে কোনটা সত্য? সারা বিশ্বে শিক্ষাবিভাগ আছে, কিন্তু কোনও দেশের শিক্ষাবিভাগ এই শিক্ষা দিতে পারেনি। There is no record at all to make a man conscious of his total being—outer, inner, central and transcendental. কেন পারেনি? কারণ তাদের সেই জিজ্ঞাসাই জাগেনি; সেই সুযোগ তারা avail করেনি কিংবা সেই সম্বন্ধে তাদের কোনও ইচ্ছা বা চেষ্টা জাগেনি। এই প্রসঙ্গে প্রত্যেকে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করবে, 'এ' কিন্তু প্রত্যেকের ভিতরের আমি-র কথা বলছে।

'এ' সেই আমি-র সন্ধান পেয়েছে যে আমি পৃথিবীর সমস্ত কীটপতঙ্গ হতে আরম্ভ করে প্রতিটি জীবের মধ্যে আমিবোধে ফুটে উঠছে। এই আমি-র আদি-অন্ত নেই। এই আমি ছাড়া একটা মানুষও নিজেকে ব্যবহার করতে পারবে না। তাহলে এই আমি আসলে কী? এই আমি-র অনেকগুলো স্তর আছে, বহু প্রকার তার প্রকাশভঙ্গিমা। সর্বনিম্ন প্রকাশভঙ্গিমা হচ্ছে অহংকার, যা প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে। এই অহংকার নিয়ে মানুষ তার নিজের গণ্ডি তৈরি ক'রে আমারবোধ দিয়ে ব্যবহার করছে। এই অহংকার হল প্রত্যেকের বিশেষ পরিচয়। কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না। একটা ছোট শিশু হতে আরম্ভ করে বড় পণ্ডিত জ্ঞানী সাধুসন্ত প্রত্যেকেই এই 'আমি' ব্যবহার করছে। যাবে কোথায়! 'এ' তোমাদের কাছে ভগবান সম্বন্ধে কোনও কথা বলছে না। কারণ কল্পনার ভগবানের সঙ্গে 'এর' কোনও সম্পর্ক নেই,

---

বিঃদ্রঃ—বক্তব্যের সর্বত্র প্রবক্তা নিজেকে 'এ' বলে সম্বোধন করছেন। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে যেখান যেখানে 'এ'-র উল্লেখ আছে সেখানে প্রবক্তাকেই বুঝতে হবে।

তোমাদের থাকতে পারে। যদি বল কেন, তবে উত্তরে বলা যেতে পারে যে,- ভগবানের সাক্ষাৎ পেলে মানুষের দুঃখকষ্ট, ভাবনাচিন্তা, ভয়ভ্রান্তি থাকে না। তোমরা কি সেই স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ? 'এ' পৃথিবীর মানুষের কাছে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে কোনও সদুত্তর পায়নি। এমনকী সাধুসন্তরাও 'একে' পরিষ্কার ভাষায় বলতে পারেননি যে, না আমার এগুলো শেষ হয়ে গিয়েছে! হয়ত বলবেন, আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু নিজেকেই যদি আমরা নিজেরা না-চিনি অপরকে চিনব কী করে? নিজেকেই যদি নিজে না-জানি অপরকে জানব কী দিয়ে? যে নিজেকে জানে, নিজেকে চেনে সে সবাইকে চেনে। কাজেই নিজেকে চিনবার বা জানবার কি কোনও উপায় আমাদের জীবনের মধ্যে আমরা পেয়েছি? 'এ' খুব পরিষ্কার ভাষায় কথা বলছে, একেবারে ছোট শিশুদের মতো, যাতে কোনও মত-পথের লোকের বুঝতে অসুবিধা না-হয়। এখানে তো বাঙালি সমাজের, বাঙালি পরিবারের মা-বোনেরা এসে উপস্থিত হয়েছে, বাবারা এসে উপস্থিত হয়েছে, কিছু-কিছু হয়ত অবাঙালিও থাকতে পারে। 'এ' তাদের জন্য সংক্ষেপে কিছু বলবে, কেননা এখানে বেশিরভাগই বাঙালি, বাংলা ভাষায় কথা বলে, এটা বাঙালিদেরই একটা belt বা block, অবাঙালিও প্রচুর আছে। 'এ' প্রথমবার ইংরাজিতে বলতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা তো 'এর' কিছু নেই, ভিতর থেকে কী করে যে তা আসে তা অনেকের কাছে হয়ত খুব অবাক লাগবে। কিন্তু ভিতরে এমন কতগুলো chamber আছে যেগুলো খুলে গেলে কোনও ভাষাই আটকায় না। এখান (কালীবাড়িতে) থেকেই অনেকে বলেছিল যে, দেখুন বাংলায় বললে আমাদের এখানে সবার বুঝতে সুবিধা হবে, কারণ বেশিরভাগই আমরা বাঙালি, আপনি কেন ইংরাজিতে বলছেন? উত্তরে তাদের বলা হল, এখানে অবাঙালি অনেকে আছে, এই ভেবে বলা হচ্ছে। কেননা এই প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ নূতন, এর প্রকাশভঙ্গিমাও নূতন, এর রহস্যও নূতন। যে ভগবানকে তোমরা খুঁজে বেড়াচ্ছ তিনি যে তোমাদের মধ্যেই আছেন এই কথাই 'এ' তোমাদের সামনে বলবে পরিষ্কার করে।

ভগবানকে খুঁজতে হয় না, আত্মাকে খুঁজতে হয় না, অর্থাৎ নিজেকে খুঁজতে হয় না। আমি কোথায়—তা কি কেউ বলে? আমি তো আমি-র মধ্যেই আছে, ছোট শিশুও তা জানে। কিন্তু এই আমি কী—তা কিন্তু কেউ কোনও দিন বলে দেয় না। আমরা তার মধ্যে কতগুলো designation লাগাই লেখাপড়া শিখে। সেগুলোতে কিন্তু ভেদ বা পার্থক্য যায় না, আরও বেড়ে যায়। জীবনে আমাদের চলার পথে বাইরে ইন্দ্রিয় দিয়ে যা-কিছু ব্যবহার করি তার সঙ্গেই আমরা আমরণ যুক্ত থাকি। তার মধ্যে আমরা কী দেখি? রূপ আর নামের খেলা। কত রকম রূপের বৈচিত্র্য, কত স্থূল প্রকাশ, কত সূক্ষ্ম প্রকাশ—তার বেশি কিছু নেই। শব্দ, ধ্বনি, তার নাম—কিন্তু কার শব্দ, কার ধ্বনি, কার নাম? রূপের। রূপ কী? আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে, অর্থাৎ চোখ দিয়ে যা দেখি তা-ই হল রূপ। কাজেই চোখের দেখা আর কানের শোনা, এই দু'টো ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আমরা আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করি। কী রকম? হাত, পা, তারপর অন্যান্য কর্মেন্দ্রিয়, অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যবহার করি। এই নিয়েই জীবন কেটে যায়।

তার মধ্যেও মানুষ কতগুলি ক্রিয়াকলাপ করে, কারণ এগুলো দিয়ে যা-কিছু করা হয় তাকেই বলে কর্ম। কাজেই দেহ-ইন্দ্রিয়কে পরিচালনা করার জন্য, তাকে ঠিক রাখার জন্য আমরা যা-কিছু করি তার নাম হল কর্ম। কিন্তু কর্ম করতে গেলে কর্মের তো একটা কারণ থাকবে, সেই কারণ কোথায়? কারণ আমরা বাইরে খুঁজি। কারণ বাইরে নেই, কারণ হল ভিতরে।

আমাদের ভিতরে এমন অনেক কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। আমরা সারাদিন বাইরে কাজকর্ম করি। এই হচ্ছে আমাদের common life। এই হচ্ছে জীবনের এমন একটা দিক যার সঙ্গে সবাই মোটামুটি পরিচিত। কিন্তু এর বেশি জিজ্ঞাসা করলে আর কেউ কোনও কথা বলতে পারে না। তা হল সর্বনিম্ন একটা দিক। অর্থাৎ আমাদের যা আসল স্বরূপ, তার অতি নগণ্য একটা দিক হচ্ছে outer nature। আর এর উপরেই আমরা সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়ে জীবনে চলার অভ্যাস করি। আর তা নিয়েই জন্মাই, তা নিয়েই আমাদের মরণ। এর মধ্যে কিন্তু আমিবোধে চলছে সবাই। প্রত্যেকেই কিন্তু 'আমি, আমি' বলছে। কেউ কিন্তু এই আমি ছাড়া নেই। আমি তাহলে কী? আমি-র কি সত্যি কোনও রূপ আছে? আমি-র কি সত্যি কোনও গুণ-শক্তি কিছু আছে? আমরা ক'জন তা নিয়ে ভাবি? কিন্তু এই আমি-র সঙ্গে যখন যথার্থ ভাবে 'অখণ্ড আমি-র' পরিচয় হবে আমি তখনই পূর্ণ হবে।

প্রত্যেকের ভিতরে দু'টো আমি আছে। একটা আমি হচ্ছে এই স্থূল দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ ও বুদ্ধি নিয়ে ব্যবহার করছে, সে বাস্তবকে নিয়ে মেতে আছে—'আমার, আমার' প্রতিষ্ঠা করছে। মানুষের যখন জন্ম হয় তখন সে একাই আসে। তার পরে এসে সে দল বাঁধে, সংসার বাঁধে। দল মানে এখানে সংসার। সে বিবাহ করে, ছেলেমেয়ে হয়, আত্মীয়স্বজন বাড়ে, সংসার করে। আবার বিশেষ একটা সময়ে সে এই শরীরকে ছেড়ে কোথায় যে চলে যায় তার খবর সংসারী মানুষ রাখে না। অনেকেই বলে, স্বর্গে গিয়েছে! কিন্তু কোথায় সেই স্বর্গ? ঘুমিয়ে পড়ে সে কোথায় যায় তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এগুলো তো প্রত্যেকের জীবনেই ঘটে। 'এ' প্রথমদিনেই বাস্তবতা প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলেছে এই কারণে যাতে সকলের বুঝতে সুবিধা হয়। এর পরে 'এ' যে প্রসঙ্গে এগিয়ে যাবে তার জন্য একটা জমি তৈরি করা দরকার। একটা জমি পেলে সেই জমির উপরে তবে 'এ' super-construction-এর বিজ্ঞান সবার সামনে রাখবে। আমি-র বুকে আমি-র প্রকাশ বা বিলাস কী ভাবে হয়? কী ভাবে আমি নিজেকে প্রকাশ করে? জীবরূপে, মানুষরূপে, দেবতারূপে, ঈশ্বররূপে, পরমেশ্বররূপে, পরমাত্মারূপে, পরব্রহ্মরূপে এবং সর্বোপরি পরমতত্ত্বরূপে। সেই প্রসঙ্গে বিস্তৃত ভাবে বলা হবে। আমিতত্ত্বের ভূমিতে পৌঁছোলে কী অনুভূতি হয় তা-ই মানুষের কাছে খুব সহজে বলার চেষ্টা প্রথম দিকে করা হয়েছিল, কিন্তু মানুষ তা নিতে পারেনি। তাই স্থূলভূমির থেকে আরম্ভ করে কী করে যেতে হয় সেই ভূমিতে নিজেরই মধ্যে সেই সম্বন্ধে বলা হবে। তোমার স্বর্গ কিন্তু বাইরে নেই, নরকও বাইরে নেই, দেবলোকও বাইরে নেই, ঈশ্বরলোকও বাইরে নেই—সবকিছু নিজের মধ্যেই আছে। কী আশ্চর্য ব্যাপার, আমরা বাইরে খুঁজে বেড়াই!

বাইরে সবই স্থূল, বাইরে সবই জড়— তাকে ব্যবহার করছে যে সে হল প্রাণ। প্রাণ অন্তরে বা ভিতরে আছে। তাহলে ভিতর ব্যবহার করছে বাহিরকে। আবার ভিতরকে ব্যবহার করছে তারও গভীরে কেন্দ্র; আবার তাকে ব্যবহার করছে তারও গভীরে। এই ভাবে নিজের মধ্যে নিজে কী করে প্রবেশ করা যায় সেই বিজ্ঞান সবার সামনে বলা হবে—that is absolutely unknown to all। আমার মধ্যে আমি কী ভাবে আছি তাই আমি জানছি না, আমি অপরকে নিয়ে মাতামাতি করে কী করব? এই ভাবে কি সারাজীবন নষ্ট করব? আর যাদের আমি 'আমার, আমার' বলছি তারা কোত্থেকে এল? তারা আবার যখন চলে যাবে কোথায় চলে যায়? কেন আমার আমি তাদের ধরে রাখতে পারে না? এই প্রশ্ন 'এর' জেগেছিল খুব ছোটবেলা থেকে। এই যে 'আমি আর আমার' ব্যবহার করি, কী এই 'আমার'? আমার কী আছে? কেন 'আমার, আমার' ব্যবহার করি? কিন্তু আমার বলে তো তাদের আমি ধরে রাখতে পারছি না। আমার শৈশবকে ধরে রাখতে পারছি না, শৈশব চলে যাচ্ছে; কৈশোর চলে যাচ্ছে, যৌবন চলে যাচ্ছে, বার্ধক্য আসছে, চলে যাচ্ছে, আমার প্রিয়জনরা আসছে আবার চলে যাচ্ছে। কই আমারকে তো আমি ধরে রাখতে পারছি না। তবু সারা পৃথিবীর মানুষ 'আমার, আমার' কেন ব্যবহার করছে? এর কারণ বাইরে নেই, কারণ নিজেরই মধ্যে।

'এ' কারণের উর্ধ্বে যে কারণ সেই মহাকারণের সঙ্গে মানুষ কী করে পরিচিত হতে পারে সেই বিজ্ঞানও বলবে। অর্থাৎ জীবনেব জিজ্ঞাসা কোথা থেকে আসে, আর জিজ্ঞাসার সমাধান কীসে হয় তা না-জানলে সারাজীবন এই বাস্তবের মধ্যে বিদেশির বেশে ঘুরে বেড়াবে। এটা তার বিদেশ, আপনদেশ নয়। সেইজন্য এখানে বাস করতে গেলে তাকে কর দিতে হয়, tax pay করতে হয়। কী আশ্চর্য ব্যাপার! নিজেরই মধ্যে কিন্তু নিজে বাস করছে অথচ তা সে জানে না। সে মনে করছে পরদেশে বাস করছি, সুতরাং আমার তো কর দিতেই হবে, ভাড়া দিতে হবে, tax দিতে হবে। কী আশ্চর্য ব্যাপার! কে কাকে tax দিচ্ছে? সত্যিকারের এই পৃথিবীতে আমরা কয়টা সূর্যকে দেখি? এই জগৎকে প্রকাশ করছে কয়টা সূর্য? একটা সূর্য। তাহলে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ কি বলবে যে সূর্য আমার? প্রত্যেকের ভিতরে এই যে প্রকাশকরূপে যিনি আছেন, সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়, যাঁকে আমরা জানি না, অথচ তিনি আছেন বলে আমরা আছি, তাঁর কোনও পরিচয়ই আমরা জানি না, অথচ আমরা 'আমি আর আমার'-কে ব্যবহার করছি। আজকে যাদের আমার বলে ব্যবহার করছি, তারা কোথা থেকে এল? আগে কোথায় ছিল? আবার কোথায় যাবে? আমি কোথা থেকে এসেছি? কোথায় আবার চলে যাব? এসব কিছুই আমরা কেউ জানি না। এই না-জানারূপ যে কারণ তা মূলত কিন্তু নিজেরই মধ্যে। 'এ' আগে নিজের কথায় আসছে, কারণ গানটার ভিতরে শেষে তা-ই বলা হয়েছে। এটা নিজেরই পরিচয়। এই গানটা এখনই এল। কেননা গানটার মধ্যে যে কথাগুলো আছে সেই কথাগুলো আজকে এখানে নিশ্চয়ই প্রকাশ হবে। এই হল 'এর' ভিতরে খেলা।

প্রত্যেকের ভিতরেই তো আমি আছে। প্রত্যেককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমার আমি কেমন গো? তাহলে সে খুব মুশকিলে পড়বে। সে তার মনের কথা বলবে, কিন্তু আমি-র

কথা বলতে পারবে না। আমার মনে হয়, আমার বোধ হয়, আমার মতে—এরকম কথা সে ব্যবহার করবে, কিন্তু আমি-র কথা বলতে পারবে না। শিল্পীর মনের মধ্যে যে শিল্পবৃত্তি জেগে ওঠে তার কথাই সে বলবে; সাহিত্যিক সাহিত্যের কথা বলবে, দার্শনিক দর্শনের কথা বলবে, গায়ক গুনগুন করে গান করে তার মনের ভাব প্রকাশ করবে—সে কিন্তু অজ্ঞাতসারে আমিকেই প্রকাশ করল। আমি কোথায়? সংসারী মানুষ সংসারের নানা দিক point out করবে, তার পরিবারের সমস্ত members-দের কথা, জিনিসপত্রের কথা so and so। কিন্তু আমি কোথায়? ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের মধ্যে চোখ রূপ নিচ্ছে, শব্দ নিতে পারছে না; কান শব্দ নিচ্ছে, রূপ নিতে পারছে না; ত্বক (চামড়া) স্পর্শ নিচ্ছে, কিন্তু রূপ-নাম নিতে পারছে না; আবার জিহ্বা (রসনা) আস্বাদন করছে, সে অন্যগুলো নিতে পারছে না। কী অদ্ভুত ব্যাপার! আমরা বলি আমি দেখি, আমি জানি—কিন্তু আমি কোথায়? 'এ' কিন্তু একেবারে শিশু যেরকম প্রশ্ন করে সেই ভাবে প্রশ্ন করে তার সমাধানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তা একটু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সমগ্র জীবনের পরিপূর্ণ পরিচয় এককথায় হয়, কিন্তু এককথায় সমাধান নেবার মতো মনের প্রস্তুতি সবার নেই। এই যে এখানে সবাই বসে আছে, প্রত্যেকের মনের barometer কিন্তু different। 'এ' প্রত্যেকের barometer পৃথক পৃথক ভাবে দেখতে পাচ্ছে। কী ভাবে নড়ছে, কী ভাবে ঘুরছে, স্থির কোনওটাই নেই, কারও নেই। কত চিন্তাভাবনা—ভ্রান্তি-ভীতি, দুশ্চিন্তা কত ভাবেই না খেলা করছে। আর তা না-হলে একেবারে dull, passive। কিন্তু এসবের মধ্যে আমি কোথায়? তোমরা ভগবানের জন্য মন্দিরে মসজিদে গির্জায় যাও, তীর্থক্ষেত্রে যাও, পুণ্যস্থানে যাও, সাধুসন্তের কাছে যাও, কিন্তু নিজের অন্তরে কেন ডুবে যাও না? কেন নিজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারছ না? যে সব চাইতে নিকটে তোমার, very nearer to you, the nearest one is your Self/God যাঁকে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ রূপে-নামে-ভাবে-বোধে, যাঁর জন্য ক্রিয়াকলাপ, জপ-তপ-ধ্যান, বিচার, সেবা, আরতি ও পূজা করছ তিনি তোমার অন্তরেই তোমার আমি-র আমি হয়ে আছেন। কিন্তু ঐটুকু সীমার মধ্যে যদি God থাকেন কই সেই God-এর সঙ্গে তো আমার হচ্ছে না লেনদেন। আমি না-থাকলে God কোথায়? 'এ' তাকে একেবারে পরিষ্কার করে সবার সামনে বলছে।

নিজেকে যদি একবার দেখার জন্য তোমার দৃষ্টি খোলে তাহলে তুমি দেখবে যে, যাঁকে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ তিনি তোমারই নিজরূপ। তুমি তা ভুলে গিয়েছ। জন্মজন্মান্তর তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ নিজেকেই—কখনও রূপে, কখনও নামে, কখনও ভাবে, কখনও বা চিন্তার মধ্যে, মনের মধ্যে, কখনও বা শাস্ত্রের পাতায়। মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে দেখছ। 'এ' এই প্রসঙ্গে এর আগে অনেক কথাই কিছু কিছু বলেছিল। আগের জন্মে যিনি সিদ্ধপুরুষরূপে পরিচিত হয়েছিলেন তখন তাঁর ভক্তরা মিলে মঠ করেছে, আশ্রম করেছে, তাঁর মূর্তি তৈরি করেছে, মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছে। পরের জন্মে তিনি তাঁরই নিজের মূর্তির কাছে এসে প্রার্থনা করছেন—আমাকে ভক্তি দাও। আমাকে আত্মজ্ঞান দাও। 'এ' নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা সবার কাছে বলছে।

বেশ কিছু বছর আগে 'এ' উত্তর ভারতে বেড়াতে গিয়েছিল, সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল। একটা সুন্দর বড় আশ্রমে বড় মন্দির ছিল। আশ্রমের ভিতরে অনেক বড় বড় গাছ ছিল। সেই সব গাছের নিচে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুরা তাদের আসন পেতেছিল। কেউ জপ-তপ-ধ্যানে রত, কেউ শাস্ত্রপাঠে রত, কেউ ভজন-কীর্তন করছে, কেউ বা হঠযোগ সাধন করছে, আবার কেউ যাগযজ্ঞ-হোমও করছে। আশ্রমে প্রবেশ করে বড় রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় এসব 'এর' নজরে পড়ল। মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলাম শ্বেতপাথরের এক সাধুর মর্মর মূর্তি। আরও কয়েকজন সাধুসন্ত কাছাকাছি ছিল। সেই মূর্তির কাছে 'এও' দাঁড়িয়েছিল। কেননা ঐ মূর্তিটা সত্যিই খুব সুন্দর ভাবে তৈরি হয়েছিল, শ্বেত পাথরের মূর্তি। একসময় শিল্পকলার সঙ্গে 'এর' একটু পরিচয় ছিল। যে সুন্দর মূর্তিটা তৈরি করেছে, সঙ্গের লোকটিকে তার সম্বন্ধে বললাম যে, বাঃ! এই ভাস্কর তো খুব ভাল কাজ করেছে, মূর্তিটা বেশ ভাল তৈরি করেছে! সেই সময় পাশে এসে একটি যুবক দাঁড়াল, খুব সুন্দর চেহারা, কিন্তু ভাবে গদ্গদ হয়ে হাত জোড় করে কী যেন বলছে আর চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়ছে। একবার দেখলাম, দু'বার দেখলাম, তিনবার দেখলাম—একেবারে পাশেই সে দাঁড়িয়ে ছিল। ভিতরে যেন ফসফস করছে সাপের মতো। মানুষ যখন ভিতরে কাঁদে তখন ফসফস করে। সেও ফসফস করছে। দূরে একটা গাছের নিচ থেকে একজন মহাত্মা সাধু 'একে' উদ্দেশ করে বললেন, মহারাজজি দেখিয়ে আপকে সামনে ক্যেয়া খেল হো রহা হ্যায়! তাঁর বলার আগেই 'এ' দেখে নিয়েছে যে, যুবকটি নিজেরই মূর্তির কাছে নিজে এসে প্রার্থনা করছে। দেখ, এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কিন্তু কেউ গল্প বলতে পারবে না! আমরা প্রত্যেকেই তাই। আমাদের অতীত অতীত জন্মের কোনও জন্মে হয়ত বিরাট কিছু হয়ে প্রকাশ হয়েছে, আরেক জন্মে হয়ত একেবারে কিছুই হল না! নিজেরই কাছে নিজে প্রার্থনা করছে! কী অদ্ভুত! একে বলে আত্মবিস্মৃতি। 'এ' আত্মার কথায় আসবে অনেক পরে, আগে না। ....

আত্মা কথাটা সবাই মোটামুটি মুখে বলে বলে এঁঠো করে ফেলেছে—তার মধ্যে কোনও strength নেই, জোর নেই, তা যেন অকেজো শব্দ। কিন্তু 'এ' প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বোধের সঙ্গে মিশিয়ে যখন বলবে, তখন দেখবে যে আত্মাশূন্য এখানে কেউ নেই। পৃথিবীর কোনও জায়গায় আত্মাশূন্য কোনও কিছু নেই। এরও (microphone-কেনির্দেশ করে) একটা আত্মা আছে, কিন্তু এই আত্মাকে আমাদের ইন্দ্রিয় জানতে পারছে না। তুমি যখন আমি-র মধ্যে প্রবেশ করবে সেই আমি দিয়ে জানতে পারবে, তা 'আমি-রই' একটা expression, কাজেই 'এর' বক্তব্যের মধ্যে তোমাদের গতানুগতিক যে ধর্মাচরণ সেই প্রসঙ্গে কোনও কথা এখনও পর্যন্ত তোমরা পাওনি। তোমরা ভাবতে পার, উনি কী বলছেন। উনি একটু জপ-তপের কথা বলবেন, ঠাকুরের কথা বলবেন, মায়ের কথা বলবেন, ইষ্টের কথা বলবেন, হরি কথা বলবেন, তা নয় উনি কীসব অন্য কথা বলছেন। 'এ' সেই কথাই বলছে যেই কথাকে বাদ দিয়ে ইষ্টকথা হয় না, হরিকথা হয় না। তার কারণ কথাতে কথা বাড়ে ঠিকই, আবার কথা দিয়ে কথাকে কমিয়ে আনাও যায়। এক-এ থাকতে শিখেছি কি আমরা? কথা তো আমরা বলি।

আমরা ক-এ থাকতে কি শিখেছি? কথা মানে ক-এ থাকা। কই ক-এ তো আমরা থাকছি না। ক-তে কী হয়? বর্ণমালার মধ্যে 'ক' হচ্ছে ব্যঞ্জনবর্ণের আদি বর্ণ। আদি মানে প্রথমে, মূলে। মূলে থাকি কি আমরা? আমরা তো ডালপালায় ছড়িয়ে পড়েছি। তাহলে ক-তে যে আছি যেখানে ব্যঞ্জন হয়নি, মিশ্রণ হয়নি, তা অবিমিশ্র—unmixed, unalloyed। ক-তে কালী, কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পরব্রহ্ম সনাতন—তাতে আছি কি আমরা? অথচ কালীপূজা করি, কৃষ্ণপূজা করি! তা মনগড়া কল্পনা, সত্য নয়। কৃষ্ণের সঙ্গে নিজের ভেদ রেখে কৃষ্ণকে পাব কী করে? আপন হলে তবে তো তাঁকে পাওয়া যাবে। তাহলে শাস্ত্রকথার সঙ্গে মিলছে না! শাস্ত্রকথায় বলছে "বাসুদেবঃ সর্বভূতাত্মা"—বাসুদেব কৃষ্ণ হচ্ছেন সবার আত্মা। কই আমরা আত্মারূপে তো 'আমি কৃষ্ণকে' খুঁজছি না, আমরা আত্মার বাইরে তাঁকে আলাদা একটা পটে বা রূপে খুঁজি, যা সাধারণত মানুষ করে থাকে। 'এ' তার বিরুদ্ধে কথা বলছে না। কথাগুলো শুনলে কিন্তু মনে হবে বাবাঠাকুর সবকিছুকে উল্টোপাল্টা করে দিয়ে জগাখিচুড়ি করে আমাদের বিভ্রান্ত করছেন। কোনও একটা জিনিসকে খুঁজতে গেলে সেই খোঁজবার জায়গাতে কী কী আছে সব দেখতে হবে। ডাক্তার যখন রোগ নির্ণয় করেন তখন আমাদের প্রাণের ক্রিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া, মনের ক্রিয়া, দেহের ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপ—এ সবকিছু খুঁটিয়ে-নাটিয়ে দেখেন। কেননা তাকে রোগটা find out করতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে কোথায় দোষটা আছে।

দোষ কিন্তু ভিতরে আছে, বাইরে নেই। আমাদের জীবনের যত দুঃখকষ্ট, ভাবনাচিন্তা তারও কারণ ভিতরে আছে। আমি কার জন্য ভাবছি? সেটা কিন্তু জানি না। জাগতিক দৃষ্টিতে বলবে, আমার প্রিয়জনের কথা ভাবছি। আমার প্রিয়জন কে? সে কি আমার ভিতরে আমার আমি-র চাইতেও বেশি বড়? তাই যদি হয় তবে আমার আমি না-থাকলে প্রিয়জন কোথায় থাকে? দেখ, এগুলো নিয়ে দিনের পর দিন চলে গিয়েছে 'এর'। নিদ্রা কোথায় চলে গিয়েছে, আহার-নিদ্রা কিছুই ছিল না! কারণ তখন আহার-নিদ্রার কোনও ধারণাই ছিল না। তার কারণ, আমি কাকে খুঁজছি, কাকে দিয়ে কাকে খুঁজছি—এই পাগলামি মাথায় ঢুকেছিল 'এর'। সেই পাগলামি 'একে' মূলে পৌঁছে দিয়েছে। পাগল হতে হয় অর্থাৎ কোনও একটা জিনিসকে দেখতে, শুনতে ও জানতে হলে সব চাইতে বেশি প্রয়োজন যা, তা হল ব্যাকুলতা বা আগ্রহ যা সংসারী মানুষের মধ্যে খুবই কম। ব্যাকুলতা বলতে গেলে কী বোঝায়—intensified urge অর্থাৎ সেই বস্তু না-হলে চলবে না। একেবারে বাচ্চা শিশুর মতো জেদ। এই জেদ নিয়ে যারা চলে তারা মূলে পৌঁছোতে পারে। এই রকম একটা জেদ 'এর' শৈশব থেকেই ছিল যে, যতক্ষণ ওটা আমার সন্ধানে না আসে, আমি ছাড়ব না। দরকার নেই আমার অন্য কিছুর, কেবল ওটাই আমার দরকার। পাহাড় পর্বতের সাধুরা অনেক কিছু দিতে চেয়েছিল 'একে'। 'এ' তাঁদের বলেছিল, দেখ এই দিয়ে আমি কী করব? আমার এগুলো প্রয়োজন নেই। অনেক ভাল ভাল জিনিস দিতে চেয়েছিল যা সত্যিই তপস্যা করেও পাওয়া যায় না। 'এ' বলেছিল, এগুলি আমার দরকার নেই। আমাকে আমায় খুঁজে বের করতেই

হবে। এগুলো আমি নই, এই দেহ আমি নই, প্রাণও আমি নই, মনও আমি নই। তাহলে আমি কোথায়? আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। দেহ হতে বুদ্ধি পর্যন্ত সবই অবিদ্যা-অজ্ঞানজাত জড় অচেতন অনাত্মা। এগুলি সবই পঞ্চভূতে গড়া, বিকারী, পরিণামী, অনিত্য ও মিথ্যা। আমি এগুলির কোনওটাই নই, এগুলির থেকে আমি আলাদা বা স্বতন্ত্র। আমি শুদ্ধ চিদানন্দস্বরূপ আত্মা। এগুলি হল শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আমি-র বক্ষে আমি-র আভাসের প্রতিফলন, অবিদ্যা মায়াপ্রকৃতির প্রকাশবিভূতি। তা জানাই হল জ্ঞান, অজ্ঞান হল তার বিপরীত। সত্যি কথা বলতে গেলে এই হয়ে গিয়েছিল 'এর' মূল ব্যাধি। এইরকম ব্যাধি যাদের হয় তারাই আপন করে নিজেকে খুঁজে পায়, পৃথক করে নয়, আপন করে।

আপন শব্দের অর্থ হল নিজের সঙ্গে এক করে যা অনুভূত হয়। যে-সমস্ত মহাপুরুষদের তোমরা নাম শোন, ছবি দেখ, মূর্তি দেখ, মন্দিরে দেখ, তাঁরা নিজেকে আপন করে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁদের ইষ্টের মধ্যে। অর্থাৎ যাঁকে তাঁরা দরকার মনে করেছিলেন, যেই ভাবেই হোক—বিষ্ণুভাবেই হোক, কৃষ্ণভাবেই হোক, রামভাবেই হোক, শিবভাবেই হোক, কালীভাবেই হোক, দুর্গাভাবেই হোক আবার গুরুভাবে হোক, পিতাভাবেই হোক, মাতাভাবেই হোক সব খুঁজে পেয়েছিলেন আপনবোধে। কিন্তু আমিকে খুঁজে কী করে পেতে হবে? আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই প্রত্যেকেরই টাকাপয়সা রাখার নিশ্চয়ই একটা জায়গা আছে। যেখানে টাকাপয়সা রাখা হয়েছে, যদি পরে কেউ দেখে হিসাবে মিলছে না তখন ভাবে—আমি এত টাকা রাখলাম, কমে গেল! কোথায় গেল! কী হল? তখন সে অনুসন্ধান করবে। ঐ জায়গায় যখন পাবে না তখন বাইরে খুঁজবে। কিন্তু পাবে কি? যেটা হারিয়ে যায় সেটা আমরা সবসময় পাই না। পেলেও কিন্তু মর্ম বোঝে না, আবার হারিয়ে যায়। কী রকম? আমরা অসুস্থ হই। তখন আবার সুস্থ হবার জন্য চেষ্টা করি। কিন্তু যখন সুস্থ হই তখন মনে থাকে না যে আবার অসুস্থ হতে পারি। আবার অসুস্থ হই। এগুলো হচ্ছে বাস্তবের ক্ষেত্রে বাস্তব ব্যাপার। বাস্তবের ক্ষেত্র থেকে আরও গভীরে কী করে যেতে হয় তা ধাপে ধাপে বলতে গেলে 'একে' আগে বাস্তব নিয়েই কিছু কথা বলতে হবে। তার পরে 'এ' যাবে অন্য স্তরে, যেই স্তরের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়নি। আমি কী পেলে তুষ্ট হব? রূপের ঘরে যতরকম রূপই হোক, সেই রূপ মন পেতে চায়। সেইজন্য মানুষ রূপের ঘরে ঘুরে বেড়ায়। রূপের পসরা যেখানে আছে সেখানে সে খুঁজে বেড়ায় এবং তা সংগ্রহ করে। কিন্তু অল্প কিছুকাল পরে দেখা যায় তাতে তার মন ভরছে না। কেন না মনের যে মূল কোথায় তা মন যতক্ষণ না-ধরতে পারবে ততক্ষণ মনের সামনে যত কিছুই প্রকাশ হোক, যতরকম ভঙ্গিমাতেই হোক তা ক্ষণিকের জন্য তাকে একটু সুড়সুড়ি দেবে, ক্ষণিকের জন্য তাকে একটু মজা দেবে, তার পরেই কিন্তু সাজা আরম্ভ হয়ে যাবে।

বাস্তবে আমরা যা-কিছু দেখি, শুনি, আস্বাদন করি বা ভোগ করি তার জন্য যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, আমাদের তার মূল্য দিতে হবে। কী করে? দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, কষ্ট, অশান্তি আর কী! তোমরা মনে কর—এই বুঝি গেল, এই বুঝি নষ্ট হয়ে গেল, এই বুঝি হারিয়ে গেল, এই বুঝি মৃত্যু হল—এগুলো হচ্ছে বাস্তব। এর থেকে আমি কী করে মুক্ত হব? আমরা ভাবি কারও

কাছে যাই, জিজ্ঞাসা করি বিপদ-আপদ যখন আসে, আবার বিপদ কেটে গেলে দিন কয়েক চলল। এগুলো হচ্ছে বাস্তব, কিন্তু তা আমাদের সত্য পরিচয় নয়। এই নিয়ে যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন অতীতে তাঁরা অনেক কিছু সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। তার থেকে তৈরি হয়েছে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম। ধর্ম কী? দর্শন কী? বিজ্ঞান কী? এই সম্বন্ধে কিন্তু সবার ধারণা ঠিক নয়। দর্শন যাঁরা চর্চা করছে তারাও কিন্তু student, seeker but not the perfect one। ধর্ম যারা চর্চা করছে তারাও কিন্তু ধর্মের রহস্য সব জানতে পারছে না। তারা seeker অর্থাৎ সাধক। আবার বিজ্ঞান যারা চর্চা করছে, বিজ্ঞানীরাও কিন্তু সাধক, অনুসন্ধানী। কিন্তু অনুসন্ধানের মূলে যেখানে গেলে আর অনুসন্ধান করার কিছু বাকি থাকে না তা-ই গানটার প্রথমেই বলা হয়েছে 'অখণ্ড আনন্দ সাগর'। 'অখণ্ড আনন্দ সাগর', তার প্রকাশরূপ হচ্ছে চিদানন্দ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ। আনন্দ আর চৈতন্য এমনই বস্তু যা প্রত্যেকের সঙ্গে মিশে আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ পরিচয় হয়নি। তাই আমরা আনন্দ খুঁজে বেড়াই। চৈতন্যের জন্য, জানবার জন্য আমরা এখানে-সেখানে ছুটি। কাজেই গানের ভিতরে ধাপে ধাপে কতগুলো কথা বলা আছে। 'এ' গানটা ব্যাখ্যা করবে না, কিন্তু গানের বিষয়বস্তু আপনা থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়বে, কারণ তা হচ্ছে formula।

ঈশ্বর আছেন কি নেই, এ নিয়ে পৃথিবীর মানুষ বহু তর্ক করেছে, এখনও করছে, ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু আমি আছি কি নেই তা নিয়ে কোনও তর্ক হতে পারে কি? বিদেশ থেকে বহু জিজ্ঞাসু এসে প্রশ্ন করেছিল, নানারকমের প্রশ্ন। উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল যে, এত প্রশ্নের উত্তর জানলে কি তোমাদের সব জানা শেষ হয়ে যাবে? কিন্তু 'এ' একটা প্রশ্নের খবর রাখে যার উত্তর পেলে আর কোনও প্রশ্ন জাগে না। প্রশ্ন না-হলে আর জানবার জন্য তোমার প্রয়োজনও হবে না। নদী সাগরের থেকে তৈরি হয়, নানা দেশদেশান্তরে ঘোরে। কতরকম তার গতি, আঁকাবাঁকা পথে চলে, কত স্রোত। কিন্তু গ্রামগঞ্জকে ভেঙেচুরে সে চলছে, সে নিজেই জানে না। কিন্তু সাগরে গিয়ে যখন মিশে যায় তখন কিন্তু তার আর গতি নেই। সে সাগর হয়ে যায়। কাজেই 'অখণ্ড আনন্দ সাগর' দিয়ে কিন্তু 'এ' আরম্ভ করেছে, যে আনন্দের জন্য পৃথিবীর মানুষ প্রাণপাত পরিশ্রম করছে। জানবার জন্য তার কতখানি ইচ্ছা। কোথায় আকাশে উঠছে, কোথায় মাটির নিচে নামছে, সাগরের গর্ভে নামছে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে সর্বত্র অনুসন্ধান করছে। খালি জানার নেশা তার, জিজ্ঞাসা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অভিভূত ভাবে, অবশ করে। কিন্তু এর মূল কোথায়? বাইরে কিন্তু নেই।

বাহির হল অন্তরেরই প্রতিফলন। কাজেই বাহিরকে জানতে হলে, পেতে হলে পূর্ণ করে অন্তরে যেতে হবে। এখন অন্তরও কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, যদিও বৃহত্তর। তার থেকে আরও গভীরে যেতে হলে কী করতে হবে? এই শিক্ষাই তো আমাদের নেই। এই শিক্ষা কী করে পাব আমরা? 'এ' ground-টা তৈরি করে না-নিয়ে কথা বললে অনেকের পক্ষে তা বুঝতে খুব কঠিন মনে হবে। কেননা এই ভঙ্গিমায় জীবনজিজ্ঞাসা মানুষের খুব সহজে জাগে না, খুব rare। 'এ' তো লেখাপড়া কিছুই শেখেনি। কারও কাছে কিছু শিখবার শুনবার সুযোগও

পায়নি। কিন্তু যখন 'এর' ভিতর থেকে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন সাধুসন্তরা প্রশ্ন করে যে, তুমি কী করে এর সন্ধান পেলে? আমরা এত চেষ্টা করেছি কিন্তু তবুও কিছুই হদিশ পাচ্ছি না, অথচ তোমার কোনও ভাবনাচিন্তা নেই, তোমার কোনও ভ্রান্তি নেই, ভীতি নেই, কিছুই নেই, কোনও আগ্রহ ও ব্যাকুলতাও নেই। উত্তরে তাঁদের বলা হয়েছে, সাগরের কী আছে? তুমি যদি সাগর হয়ে যাও তখন তোমার কী আর প্রশ্ন থাকবে? তুমি যে নিজেই ভগবান তা যখন তুমি জেনে গেলে তখন আর কোথায় ভগবানকে খুঁজবে? তাঁরা বললেন, এ তো দারুণ কথা, এ তো শেষের কথা। তখন তাঁদের বলা হল 'এর' শেষ দিয়ে আরম্ভ। তাহলে তোমাদের কাছে 'এ' সবসময় শেষ হয়েই থাকবে। তখন তাঁরা বললেন, এ তো দুর্বোধ্য! তাঁদের বলা হল, যদি বোঝার মতো কিছু থাকে তাহলে শেষ বোঝাই হচ্ছে আসল বোঝা। আমরা কথায় বলি, শেষ ভাল হলে আসল ভাল। তার মানে? যেই ভালটা দিয়ে সব শেষ হয়ে গেল তার পরে তো আর কিছু বাকি রইল না। যাঁকে জানলে জানার কিছু বাকি থাকে না, যাঁকে দেখলে দেখার কিছু বাকি থাকে না, যা হয়ে গেলে হওয়ার কিছু বাকি থাকে না তা-ই যদি তুমি হও তাহলে তোমার আর কীসের ভাবনাচিন্তা, কীসের কর্মফল? সেই বিজ্ঞানই তোমাদের সামনে রাখা হচ্ছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে।

প্রত্যেকের একরকম চিন্তাভাবনা বা ধারণা নয়। প্রত্যেকের জিজ্ঞাসা পৃথক পৃথক হয়। যেমন পাঁচ অন্ধের হাতি দেখতে যাওয়া। হাতির কেউ পা ধরেছে, কেউ লেজ ধরেছে, কেউ তার শুঁড় ধরেছে, কেউ কান ধরেছে, কেউ পিঠ ধরেছে। তার পরে পরস্পরে এসে বলছে, কী রকম দেখলি হাতি? যে যেরকম ধরে যা বুঝেছে তা-ই বলছে। যে লেজ ধরেছে সে বলছে ঐ ঝাঁটার মতো, আবার যে পা ধরেছে সে বলছে, না, হাতি হচ্ছে একটা থামের মতো। আবার যে কান ধরেছে সে বলছে হাতিটা একটা কুলোর মতো, আরেকজন যে তার শুঁড় ধরেছে সে বলছে, হাতি কলাগাছের মতো, আর যে পিঠ ধরেছে সে বলছে হাতি হচ্ছে একটা পিপার মতো। এখন সবাই ঝগড়া করছে, তোরটা ঠিক না আমারটা ঠিক। একজন বলছে, আমি নিজে হাতে ধরে দেখেছি, তখন আরেকজন বলছে, আমিও তো নিজে হাতে ধরে দেখেছি। সংসারে আমাদের প্রত্যেকেরই খণ্ড খণ্ড জ্ঞান রয়েছে, টুকরো টুকরো জ্ঞান রয়েছে। সেইজন্য কারওর সঙ্গে কারওর মেলে না, খালি ঝগড়া হয়। তাই একে অন্যকে বলে, তোরটা ঠিক না, আমারটাই ঠিক। কিন্তু এই সব একত্রে মিলিয়ে নিলে তবে তো ঠিক হবে। কিন্তু আমরা তা করি কি? অথচ আমরা যোগ করি। কতরকমের যোগ আজকাল লোকে করছে। বহুরকমের যোগ আছে। সেই আদিমকাল থেকে মানুষ অনেকরকমের যোগ করে চলেছে। প্রত্যেকটি যোগের অভ্যাস পৃথক পৃথক। কিন্তু ঐ অংশটুকু দেখে সে মনে করেছে এ-ই হল ঠিক। 'এ' অখণ্ড দিয়ে আরম্ভ করেছে, কাজেই শেষটাও অখণ্ডই হবে, খণ্ড নয়। সে অখণ্ড, তুমি অখণ্ড, আমি অখণ্ড, সবাই অখণ্ড। তা যে বিজ্ঞান দিয়ে জানা যায় সেই বিজ্ঞানের নাম হল 'Science of Oneness' বা 'Knowledge of Oneness/ Oneness of

Knowledge'—এক-এর বিজ্ঞান, এক-এর জ্ঞান, দুই-এর নয়। কিন্তু এই এক তো তুমি নিজেই, তুমি কি নিজেকে অস্বীকার করবে?

তুমি ভগবানকে নাও মানতে পার, তুমি মন্দিরে, গির্জায়, মসজিদে নাও যেতে পার, ধর্মগ্রন্থ নাও পড়তে পার, তুমি স্তবস্তুতি নাও করতে পার, কিন্তু নিজেকে তুমি অস্বীকার করবে কী করে? এরকম লোক কেউ আছে কি যে নিজেকে অস্বীকার করে? যদি কেউ বলে, আমি নেই, তবে তা পাগলের কথা। কিন্তু এই আমি তাহলে কে যে না-থাকলে কিছুই থাকে না, আর যে থাকলে সবই থাকে? এই আমি-র আসল পরিচয় কী ভাবে আমাদের মধ্যে আছে তা যিনি সত্যি সত্যিই দেখিয়ে দিতে পারেন তিনিই হলেন ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ বা আত্মজ্ঞপুরুষ। কেননা ব্রহ্মকে একমাত্র ব্রহ্মই প্রকাশ করতে পারে, আত্মাকে একমাত্র আত্মাই প্রকাশ করতে পারে, ঈশ্বরকে একমাত্র ঈশ্বরই প্রকাশ করতে পারেন, দ্বিতীয় কেউ পারে না। যখন বলা হয়, তুমিই সেই ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম, দ্বিতীয় কোনও ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম নেই, তখনই প্রত্যেকের মন প্রতিবাদ করে। তখন সে বলে, হ্যাঁ আমি একটা জীব! আমি অমুক চন্দ্র অমুক, অমুকের ছেলে, অমুকের মেয়ে, অমুকের বউ, অমুকের মা, পিসি, মাসি so and so, আর আপনি আমাকে বলছেন এই। হ্যাঁ ঠিক তাই। কিন্তু এখানে তোমার আমি-র কথা বলা হয়েছে, তোমার দেহের কথা তো বলা হয়নি। দেহ ঘুমিয়ে থাকলে ব্যবহার করে কে? কেউ করে না। আর কে থাকলে তবে দেহ ব্যবহার করা যায়? কই মৃতদেহকে তো কেউ ব্যবহার করে না। কাজেই এই যে 'আমি, আমি' নিয়ে কথা আরম্ভ হল, এই আমি-র সম্বন্ধে বলতে গেলে খুব সুন্দর ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে হবে। প্রথমদিন 'একে' কিছুটা সময় এগুলো বলতে হচ্ছে, তা না-হলে তোমাদের মনে সেই সৌধ নির্মাণ করা 'এর' পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। তা না-হলে একটা জমির উপরে কী করে একতলা দোতলা তেতলা চারতলা বাড়ি তৈরি করে! আজকাল তো একশো দুশো তিনশো তলা বাড়ি তৈরি হয় ধাপে ধাপে। তোমার নিজের মধ্যেই তোমার 'আমি-র' বক্ষে 'আমার' খেলছে কী ভাবে? 'আমারটা' কিন্তু 'আমিকে' বাদ দিয়ে নয়, কিন্তু 'আমিটা' আমার বাদ দিয়ে আছে। এই 'আমি' আর 'আমার' নিয়ে জীবনের খেলা।

প্রত্যেকের ভিতরে একটা আমি এবং একটা আমার আছে। কেউ ছোট বা বড় নয়। কিন্তু আমরা ছোট বড় দেখি ইন্দ্রিয় দিয়ে, ইন্দ্রিয় বন্ধ করলে কিন্তু ছোট-বড় খুঁজে পাওয়া যায় না। 'এ' কতগুলো point রাখছে সবার সামনে; তার কারণ প্রত্যেকেরই মন, বুদ্ধি ও চেতনা আছে। সে নিশ্চয়ই কথাগুলোর মধ্যে অর্থ কী আছে, বোধ কী আছে তা ধরতে পারবে। 'এ' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে বলবে যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। ভগবানের ইচ্ছা হয়েছিল তিনি বহু হবেন। সৃষ্টির আদিতে কিছুই ছিল না। এই জগৎ ছিল না, কিছুই ছিল না। কী করে সৃষ্টি তৈরি হল সেই জিজ্ঞাসা যদি আগে শোনা থাকে তাহলে কিন্তু নিজেকে খুব সহজেই চিনতে সুবিধা হয়। সেই অখণ্ড যেখানে নিঃশব্দ নিষ্ক্রিয় নির্বিকল্প নিরঞ্জন নিত্যাদ্বৈত তাঁর বক্ষে এই বৈচিত্র্য এল কোথা থেকে? জ্ঞানীরা বলেন—"ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা"।

জগৎ আসবে কী করে, ব্রহ্ম তো কর্তা নয়। কর্তা না-এলে কর্ম করছে কে? জ্ঞানীরা বলছেন, প্রকৃতি কর্ম করছে। এই প্রকৃতি মানেই কল্পনা। কল্পনা সব কিছু সৃষ্টি করছে, আবার কল্পনাই পালন করছে, কল্পনাই তাকে আবার মিলিয়ে নিচ্ছে। এর একটা যুক্তি আছে। এই কথা যদি বুঝতে কেউ চায় তাহলে নিশ্চয়ই কল্পনার স্বরূপ কী, তা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা চলতে পারে। একটা জিনিস জানতে হবে আমাদের, আমরা দেখি, শুনি, জানি কী করে? আমরা ইংরাজিতে একটা শব্দ ব্যবহার করি idea, আমিকে দিয়া, I দিয়া। লেখাপড়া তো 'এ' শেখেনি। কিন্তু 'এর' মধ্যে কী করে এগুলো খেলে গিয়েছে তা ভাবলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। জ্ঞানীরা এখন শুনুক! Idea কথাটা 'এ' ভুল বলেনি। I দিয়া যা-কিছু তুমি করছ সব I-কে দিযেই করছ। তোমার ভিতরে তোমার আমিকে দিয়েই তুমি করছ, আমিকে বাদ দিয়ে কিছু করতে পারবে না। তাহলে আমি-র বক্ষে যা-কিছু করবে আমিকে দিয়েই করতে হবে। এই আমি-র কোনও জাত নেই, বর্ণ নেই, লিঙ্গ নেই, কোনও আকার-বিকার নেই—কিন্তু অস্তিত্ব আছে, প্রকাশধর্ম আছে, পূর্ণতা ও নিত্যতা আছে। তার কখনও বিকার হয় না বলে কোনও পরিবর্তনও হয় না—অপরিণামী।

এই কথাগুলো তোমার সামনে ধাপে ধাপে যদি প্রকাশ করার জন্য কিছু বলা হয়, তোমাকে তা একটু ধৈর্য ধবে শুনতে হবে। এই হল শ্রুতির বিজ্ঞান। শুধু শোনার মাধ্যমে তোমার ভিতরে নিজেকে তুমি চিনে ফেলবে। তোমার ভিতরে জ্ঞান আপনিই জেগে উঠবে। কারণ তুমি জ্ঞান দিয়ে তৈবি, জ্ঞানে ভরা, জ্ঞানে গড়া। সেই জ্ঞান কী বস্তু? জ্ঞান হচ্ছে 'আমি'। 'আমিই' হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞান ছাড়া আমিকে এবং আমি ছাড়া জ্ঞানকে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। বিদেশী যারা 'এর' কাছে এসেছিল তারা এই সমস্ত কথা শুনে হতবাক হয়ে বলেছিল, তুমি এগুলো কী বলছ! আমরা তো এসব কল্পনাই করতে পারছি না। তখন 'এ' বলেছিল, তুমি কি একথা deny করবে? তারা বলল—না, পারছি না। কিন্তু যতই শুনছি ততই দেখতে পাচ্ছি এটা তো খুব interesting ব্যাপার। তখন তাদের বলা হল—হ্যাঁ, নিজেকে নিজবোধ দিয়ে দেখা-শোনা-জানার মতো এত আনন্দ আর কিছুতে নেই। তুমি যে কোনও রকম আনন্দ অনুভব করছ তার কারণ তোমার নিজের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য একটুখানি স্থিতি এসেছিল তাই তুমি আনন্দ পেয়েছ। যে কোনও ব্যাপারেই হোক দেখা, শোনা, জানা, বোঝা, ভোগ করা সব কিছুর মধ্যে নিজের সঙ্গে নিজের একটুখানি সময়ের জন্য সম্বন্ধ হয়েছে তাই তুমি আনন্দ ভোগ করেছ। অর্থাৎ আনন্দ আর চৈতন্য অভিন্ন। কাজেই আনন্দ হচ্ছে সেই সত্যবস্তু যাকে আমরা কতগুলো বড় বড় শব্দ দিয়ে ব্যবহার করি। ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর সত্য পূর্ণ নিত্য অদ্বৈত—এইরকম কতগুলো শব্দ ব্যবহার করে অনেকেই।

তুমি যে সসীম নও তা তোমাকে জানতে হলে তোমার এই সসীমের মধ্যে অসীম কী করে আছে তা আগে শুনতে হবে। তোমার দেহের মধ্যে যে একটা প্রাণ আছে তা অস্বীকার করলে তুমি বলছ কী করে? কিন্তু প্রাণ তো দেখা যায় না বাইরে থেকে, কোনও মতেই দেখা যায় না। প্রাণ তো একটা গতি, শক্তি। শক্তিকে তুমি কী দিয়ে প্রমাণ করবে? তার গতি দিয়ে,

তার ক্রিয়া দিয়ে করতে হবে। কিন্তু প্রাণের যে আবার চৈতন্য নেই। প্রাণ গতি নিচ্ছে, কিন্তু চৈতন্য নেই। চৈতন্যের আভাসটা হচ্ছে মনে। মনের সংকল্প ও বিকল্প আছে—এগুলো 'এ' পরে ধাপে ধাপে বলবে। প্রত্যেকটা বিষয় পরিষ্কার করে বলা হবে। কোনও প্রশ্ন 'এ' রেখে দিয়ে যাবে না। কেউ অন্তত মনে করতে পারবে না যে, উনি এই কথাটাকে কেন পরিষ্কার করলেন না! কেননা বোধের কাছে দ্বিতীয় কোনও প্রশ্ন থাকে না, প্রশ্ন থাকে বোধ যেখানে ঢাকা সেখানে। একটা পাত্রের মধ্যে কী আছে পাত্রটা ঢাকা থাকলে বাইরে থেকে তা দেখা যায় না, পাত্র খুলে দিলে দেখা যায়। বোধ হচ্ছে all-open এই আকাশের মতো—আকাশবৎ স্বচ্ছ নিষ্কল নির্মল নিরঞ্জন নির্বিকার নিরাকার নিত্য স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। 'এ' যেই শব্দগুলো বলছে পরে তা ব্যাখ্যা করে দেওয়া হবে। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থবোধ দিয়ে দেওয়া হবে। এর জন্য dictionary পড়তে হবে না, জিজ্ঞাসা করতে হবে না। এই বোধই তোমার বোধ জাগিয়ে দেবে।

এই যে দেওয়ালি আসছে, আলো দিয়ে ঘর সাজাবে সবাই। একটা প্রদীপ তো প্রথমে জ্বালাতেই হবে, একটা candle তো জ্বালাতেই হবে। সেই candle দিয়ে তারপর অন্য সব candle-গুলি জ্বালাবে। 'এ' সেই এক-এর বোধ দিয়ে সমস্ত বোধকে তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেবে যাতে আর কোনও অসুবিধা না-থাকে। তোমার ভিতরে যে আমি আছে সেই আমি কী ভাবে সব কিছুর মধ্যে মিশে আছে, ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে। সেই আমি তোমার চোখে আছে তাই তুমি রূপ দেখছ, তাই রূপটা তুমি অনুভব করতে পারছ। সে কানে আছে তাই তুমি শব্দ শুনছ, অনুভব করতে পারছ। সেই রকম তোমার ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে সে মিশে আছে, কিন্তু তার সন্ধান আমরা পাচ্ছি না। কেননা আমরা ভিতরের দিকে ডুবে যেতে অভ্যস্ত নই বলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সব বাইরের দিকে ছোটে। কিন্তু আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় হল অন্তরে। বাইরের ইন্দ্রিয় ছেড়ে যখন অন্তরিন্দ্রিয়ের দিকে আমরা মনোনিবেশ করি তখন কিন্তু অন্তরের ইন্দ্রিয়ের সংবাদ পাই, বাইরেরটা পাই না। আবার অন্তরের থেকে কেন্দ্রে যাবারও রাস্তা আছে। 'ঘরের মধ্যে ঘর, তার মধ্যে ঘর, তার মধ্যে ঘর, তার মধ্যে বাস করে এক ধুরন্ধর।' সেই হচ্ছে তোমার আমি। ভীষণ ধুরন্ধর সে। সে কতরকমভাবে নিজেকে প্রকাশ করছে, তার আদি-অন্ত নেই। There is no beginning, no end of your true nature. You are infinite in the infinite, you are finite in the finite and you are One in One, One in many, many in One, many in many and so and so.

এই হল নিজের পরিচয়। তুমি অণুর থেকে আরম্ভ করে সব কিছুর মধ্যে মিশে রয়েছ। You are smaller than the smallest and greater than the greatest. এটা তোমার সেই আমি-রই পরিচয়। এই আমি ক্ষুদ্রতম একটা কীট, একটা germ cell তার মধ্যেও আছে চেতনারূপে/চৈতন্যরূপে। আমি মানেই চৈতন্য, আমি মানে জ্ঞান। জ্ঞানসাগরে জ্ঞানের অণু-পরমাণু সবই জ্ঞান। আমিসাগরে সব কিছুই সেই আমি। জ্ঞান, আমি—এই কথাগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে তোমাদের বুঝবার সুবিধার জন্য, কারণ তোমরাও ঐ কথাগুলো ব্যবহার কর। ঐ

কথাগুলোর মধ্যে যে কী রহস্য আছে তা তোমরা আস্তে আস্তে অনুভব করতে পারবে। কী দিয়ে? নিজের I-dea (দিয়ে), নিজেকে দিয়েই। 'এ' তোমাদের সচেতন করে দিচ্ছে। কী দিয়ে? নিজবোধ দিয়ে। আমিও আমি, তুমিও আমি। তোমার আমিতে এই বোধ খেলছে না, তাই আমি-র আমি তা জাগিয়ে দিচ্ছে। কী করে? তুমি যতই শুনবে ততই তোমার ভিতরের আমি expanded হবে, তোমার ভিতরের অনুভূতি বাড়তে থাকবে, জ্ঞান বাড়তে থাকবে। বাড়তে বাড়তে সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাবে। তখন তুমি অসীম অনন্ত অখণ্ড, তখন আর দুই খুঁজে পাবে না। তখন তুমি দেখবে আপনাকে আপনবোধে আপনি স্বয়ং—'পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং, আপনে আপন।' এই হল নিজের আসল পরিচয়। শুধু আপনে আপন অর্থাৎ Consciousness in Consciousness, I in I, Self in Self, Being in Being। এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করি, কিন্তু অর্থ আমরা কেউ জানি না। জলসাগরে যতই তোমার তরঙ্গ লহরী বুদ্‌বুদ্ উঠুক, যতই rolling হোক, সবই কিন্তু এক জলেরই খেলা। এই সংসারে যা-কিছু আমরা দেখছি রূপ-নাম-ভাব এ সবই এক চৈতন্য দিয়ে গড়া, চৈতন্যের বিভিন্ন expression। বৈচিত্র্য হল কী করে? কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে।

কল্পনা মানেই মন। সমষ্টি মনে সমষ্টি কল্পনা, ব্যষ্টি মনে ব্যষ্টি কল্পনা। তুমি কল্পনা দিয়ে দেখছ। এই যে এখানে আগে কিছুই ছিল না। মন্দির তৈরি হয়েছে ঐ কল্পনা দিয়ে, I দিয়ে। Idea একটা প্রথমে আসে, সেই idea-কে রূপ দিতে চাইলে তোমাকে কত কিছু করতে হচ্ছে। এটা জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতি ক্ষেত্রে অনুভূত হয়। ছোট শিশু লেখাপড়া জানে না, জানে না কিছু। তাকে নিয়ে শেখাতে বসানো হল, আরম্ভ করা হল 'অ' দিয়ে। ঐ 'অ' দিয়ে আরম্ভ করে তাকে আস্তে আস্তে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে সব কিছুর সঙ্গে। সেই শিশু বড় হয়ে যখন মুক্তপুরুষ হয়ে গেল তখন কী হল? এই একটা বিন্দুর থেকে আরম্ভ করে সে অখণ্ডের মধ্যে মিশে গেল। এখন প্রত্যেকেই তোমরা যে তাই, এটা তোমাদের কাছে ভাল করে যদি ধরিয়ে দেওয়া যায় তবেই তা তোমাদের কাছে অনুভবগম্য হবে। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ভ্রান্তি ভীতি কল্পনা সরে গেলেই তুমি শান্তি পাবে।

যখন তুমি নিজেকে নিজে আবিষ্কার করবে নিজের মধ্যে তখন তোমার চাওয়া আর আগের মতো থাকবে না। তোমার ভাবনা আর আগের মতো থাকবে না, আস্তে আস্তে সরে যাবে। ছাত্র যখন স্কুলে পড়ছে তখন পাশ করাটাই তার সবচেয়ে বড় কথা। কিন্তু স্কুলে পাশ করে যাবার পরে কলেজে গেল, কলেজে পাশ করার পর University-তে গেল, সেখান থেকে পাশ করে সে চাকরি করতে গেল। সে চাকরি করতে করতে দেখছে, আমার position-টাকে বাড়াতে হবে। সে যখন higher post -এ চলে গেল তখন আর কীসের promotion! এগুলো তো একটার পর একটা step, development, becoming। নিজের বক্ষে নিজেকে দিয়ে নিজে becoming করছে। বাড়ির থেকে তোমরা এখানে এসেছ—এটা becoming, আবার এখান থেকে বাড়িতে চলে যাবে সেটাও becoming। একটা হচ্ছে আসা আর একটা হচ্ছে যাওয়া। আমিকে নিয়ে আমি-র বক্ষে আমি-র ভাবে এই খেলা। 'এ'

কথাগুলো বলছে আস্তে আস্তে তোমাদের ভিতরে সেই পাকা আমিকে ক্রমশ awaken করার জন্য, জাগাবার জন্য, তাকে সচেতন করার জন্য। তা ভুলে গিয়ে সবাই অন্য কথা ভাবছে, অন্য চিন্তা করছে। এই কথাগুলো বার বার শুনতে শুনতে তবে এই course -এর মধ্যে তুমি আসবে। যেই মুহূর্তে তুমি এই course-এ আসবে, সেই মুহূর্তে তুমি আবিষ্কার করবে এই কথাগুলোর আসল রহস্য কী! মানে জগতে যদি কোনও অজ্ঞাত বস্তুও থাকে তাও তুমি, জ্ঞাত বস্তুও তুমি, process-ও তুমি এবং principle-ও তুমি। অর্থাৎ তুমিই কার্য, তুমিই কারণ, তুমিই রূপ, তুমিই নাম, তুমিই ভাব এবং তুমিই বোধ। তোমার নিজেকে দিয়ে অর্থাৎ তোমার আমিকে দিয়ে দেখতে চেষ্টা কর। স্থূল দেহে তুমি মানে তোমার আমিরূপ, এরকম রূপ প্রত্যেকেরই রয়েছে। তার থেকে সূক্ষ্ম হচ্ছে প্রাণ, সেই প্রাণরূপ আমি তোমার ভিতরে আছে। তার থেকেও সূক্ষ্ম হল তোমার মনরূপ আমি, যে ভাবনাচিন্তা ও অনুভব করতে পারে কিছুটা, সংকল্প করতে পারে, বিকল্প আছে তার, সংশয় ও সন্দেহ আছে তার—কিন্তু তার বেশি এগোতে পারছে না। তারও গভীরে তুমিই মানে 'তোমার আমি' সেই বুদ্ধিবিজ্ঞান। তুমি নিশ্চয় করে দিচ্ছ—তা এই। তুমি 'আমি-রই' একটা ব্যবহারিক রূপ। অখণ্ড এক বোধময় আমি/আমিময় বোধসত্তার বক্ষে তুমি, তিনি, সে, উনি, এই, সেই, তাই প্রভৃতি ভাবে ও বোধে যা-কিছু প্রকাশ পায় সবই এক আমি-রই পরিচয়। কেবলমাত্র ব্যবহারের দৃষ্টিতে পরস্পর প্রকাশের মধ্যে নামের ভেদ স্বীকৃত হয়।

তুমি প্রত্যেকটি জিনিসকে যে চিনতে পারছ বুঝতে পারছ তা owing to the presence of your intellect—that is the function of intellect। আরও গভীরে যাও, এই বুদ্ধির পরে রয়েছে সম্বোধি অখণ্ড আমিবোধ—অর্থাৎ সেই বোধ সবসময়ই সমান, তখন আর এই-ঐ এসব নেই, সবটার মধ্যেই সে 'আমিবোধে' আছে। তার মানে you are in you, you are in all, all are in you and all are in all. All are in all হল বহির্সত্তা। তা হল জ্ঞেয় দৃশ্যাদি (নাম-রূপ)। All are in One—এই হল অন্তর্সত্তা। তা হল কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা। One in all—এই হল কেন্দ্রসত্তা। তা হল সাক্ষী আত্মা পাকা আমি। One in One—তা হল তোমার আসল পূর্ণসত্তা। তা হল অখণ্ড ভূমার আমি, পাকা আমি-র পূর্ণ স্বরূপ (পরব্রহ্ম পরমাত্মা) সেই পূর্ণসত্তাকে তুমি কী করে অনুভব করবে তারই কতগুলো সহজ পদ্ধতি ধাপে ধাপে তোমার সামনে রাখা হবে। তা না-হলে একসঙ্গে বললে মন নিতে পারবে না। কেননা আমাদের মনের সেই প্রস্তুতি নেই। একটা শিশুকে পড়াতে গিয়ে তাকে তুমি যদি প্রথমেই M.A.-এর course পড়াতে যাও সে নিতে পারবে না এবং কিছুই শিখতে পারবে না। তাকে culmination-এর through দিয়ে যেতে হবে। ঐ অ-আ-ক-খ থেকে আরম্ভ করে step by step তার ভিতরে একটা development হবে। Culmination-টা এত subtle ভাবে হয় যে তা আমরা সবসময় মাপতে পারি না। ঐ যে এক একটা class-এ উঠছে, কতগুলো বিষয় পড়ছে, শুনছে, জানছে, দেখছে, তার জিজ্ঞাসা জাগছে, উত্তর পাচ্ছে, আবার এগিয়ে যাচ্ছে—এই ভাবে সে তার course complete করল। অধ্যাত্মক্ষেত্রেও

একটা course আছে। সেই course-টার নাম হল আত্মবিজ্ঞান অর্থাৎ প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান, আপনের বিজ্ঞান। অর্থাৎ নিজেকে দিয়ে নিজের বক্ষে নিজের যে প্রকাশবিকাশ ভঙ্গিমা তাকে বলা হয় আত্মবিজ্ঞান। তা সচেতন ভাবে হওয়া চাই, কল্পনার মাধ্যমে নয়, আন্দাজে নয়। গান শিখতে গেলে সা-রে-গা-মা practise করতে হয়, গলাকে স্বরে বসাতে হয়। তার পরে সময় বা time সম্বন্ধে, লয় সম্বন্ধে একটা concept আস্তে আস্তে তৈরি হয়। তখন beating আরম্ভ হয়। আপনিই ছন্দের সঙ্গে তাল এসে পড়ে। কাজেই সঙ্গীত মানেই হচ্ছে sound and time-এর combination। 'এ' আরও সংক্ষেপে বলছে তোমাদের, sound and time is nothing but one imagination and imagination is nothing but the expression of your own Being, your Consciousness।

এক বোধসত্তার বক্ষে বোধেরই তরঙ্গ উঠল, তা হল বোধের আভাস, তা-ই হচ্ছে মন। মনের মধ্যে আবার তরঙ্গ বা বৃত্তি উঠল তা-ই মনের থেকে বেরিয়ে আসল ইন্দ্রিয়ের পথে, ইন্দ্রিয়ের পথে এসে তা রূপ-নাম-ভাবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ল। 'এ' সংক্ষেপে কথা বলছে, কিন্তু এ কথাও তোমরা বুঝবে না। এর বিজ্ঞান 'একে' ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে। 'এ' যেটুকু সময় পাবে তার মধ্যে যতটা সম্ভব সেটুকু বলা হবে, আর যদি তোমাদের আরও আগ্রহ থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা আরও শুনতে চাইবে। সেই ভাবে ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করবে। 'এ' যে ক'দিন দিল্লিতে থাকবে তোমাদের সামনে তোমাদেরই আত্মপরিচয়কে নানা দিক থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করবে। কিন্তু একই কথা হয়ত কখনও কখনও তোমাদের কাছে repeat করার দরকার হবে, তার কারণ আমরা ভুলে যাই, follow করতে পারি না। তাই শ্রবণের মাধ্যম দিয়ে যে perfection আসতে পারে, realization হতে পারে, তা কিন্তু সবাই জানে না। তা একমাত্র জ্ঞানবাদী ছাড়া আর কেউ জানে না। জ্ঞানবাদীরা শুধু শ্রবণের মাধ্যমে তাঁদের realization উত্তম অধিকারীদের জন্য পরিবেষণ করেন। কিন্তু এই বিজ্ঞান তোমাদের সামনে রাখা হচ্ছে, এখানে উত্তম-অধমের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। ঐ যে গোড়াতেই বলা হল যে, সেই বোধসাগরে জ্ঞানসাগরে জ্ঞানের যত কিছু অভিব্যক্তি, তা যত ক্ষুদ্রতমই হোক বা বৃহত্তমই হোক—smaller than the smallest and greater than the greatest হোক all are but different expressions of one and the same substance, which is called Consciousness, Bliss and Peace Itself, the identity of I Absolute। শান্তি স্ফুরিত হচ্ছে শান্তির বক্ষে, আনন্দ স্ফুরিত হচ্ছে আনন্দের বক্ষে, চৈতন্য স্ফুরিত হচ্ছে চৈতন্যের বক্ষে। সব এক আমি-রই পরিচয়, আমিবোধেই তা নিত্যসিদ্ধ নিত্যপূর্ণ।

তোমার আমি-র মধ্যে যে আমিবোধের কতরকম বৃত্তি খেলছে, শৈশব থেকে তুমি কত চিন্তা করেছ, কতরকম ভাবনা করেছ, কত কিছু অনুভব করেছ সেই তুমি কিন্তু এখন এখানে বসে আছ। তুমি এখন ভাবতে চেষ্টা কর দেখি ছোট শিশু অবস্থায় মাতৃক্রোড়ে, তার পরে কত কিছু হয়েছে, সব নিয়েই বড় হয়েছ তুমি অর্থাৎ তোমার আমি, কিন্তু এখন আর পৃথক করে সে সব ভাবা সবার পক্ষে সম্ভব হবে না। কাজেই তোমার অনন্ত অতীত, কত দেহ

ধারণ করেছ, কত জায়গায় তুমি জীবনযাপন করেছ কত ভঙ্গিমায়, সেগুলোকে এখন কিছুই মনে আনতে পারছ না। এখন খালি present-টাই আসছে। কিন্তু যখন তুমি সত্যিকারের আমি-র পরিচয় পাবে তখন দেখবে যে সমস্ত কিছু তোমার কাছে একেবারে crystal clear হয়ে গিয়েছে। তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে। এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোনও উপায় নেই। যদি বল কী রকম? গতকাল ছিলে, আজকে আছ, গতকালটা আবার গতকালের আগে ছিল, গতকালে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এরকম করতে করতে তুমি দেখবে অখণ্ড অতীত হচ্ছে তোমারই প্রকাশ। অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমারই বক্ষে সামনে প্রকাশ হবার অপেক্ষায় আছে। তুমি কি নিজেকে বাদ দিয়ে এগুলো ভাবতে পারবে? এই মনের প্রস্তুতি শ্রবণের মাধ্যম দিয়ে কী করে হয় সেটা মানুষের কাছে অজানা, কিন্তু শুনতে শুনতে তোমার কাছে তা clear হয়ে যাবে। তুমি ঘরে বসে জপ-তপ-ধ্যান করে যে অনুভূতির অধিকারী হবে সেটা কয়েকদিন শোনার পর তোমার কাছে অতি সহজেই clear হয়ে যাবে। তুমি জপ করছ কীসের? কতগুলো mechanical শব্দ উচ্চারণ করছ, নিজেকেই ব্যবহার করছ। তাতে কী করছ? তুমি একটা আসনে বসেছ স্থির হয়ে, মনকে অন্য চিন্তার থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে সেই এক চিন্তা করছ কী ভাবে? সেই তুমি তোমার গুরুর নির্দিষ্ট একটা নাম, একটা বীজ, শব্দ, মন্ত্র উচ্চারণ করছ। বারবার উচ্চারণ করছ ও শুনছ। মনে মনে উচ্চারণ করছ, মনে মনেই শুনছ। আবার জোরে জোরে উচ্চারণ করছ, এই কানে শুনছ। মনে মনে চিন্তা করছ, সেটাও আবার তুমি আমিবোধে জানতে পারছ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, তোমার ভিতরে যে ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং অনুভবশক্তি এই তিনটি হচ্ছে এক শক্তিরই ত্রিবিধ অভিব্যক্তি। এই চিন্তার আরও গভীরে যদি তুমি যাও সেখানে তুমি এর সন্ধান পাবে তোমার আমিবোধে— চিন্তা কোথা থেকে ওঠে, উঠে কতক্ষণ থাকে, থেকে আবার কী ভাবে ছড়িয়ে পড়ে বা কী ভাবে মিশে যায়। কাজেই তুমি নিজের বক্ষেই নিজেকে নিয়ে কী ভাবে খেলছ, যেমন সমুদ্রবক্ষে সমুদ্রের জল নানা ভঙ্গিমায় তরঙ্গায়িত হচ্ছে, নানা ভঙ্গিমায় প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তোমার নিজের বক্ষে নিজেকে নিয়ে তুমি নিজে এই ভাবে খেলে চলেছ।

আজকের বক্তব্যের মধ্যে 'এ' শুধু আপন পরিচয় সম্বন্ধে বারবার বলছে। তার পরে এর পরবর্তী স্তর সম্বন্ধে কালকে বলা হবে। তার পরবর্তী স্তর পরশু, অর্থাৎ তিনদিন তোমার আমি-র স্বরূপমহিমা বলা হবে। এর পরে তোমাদের জমি তৈরি হবে। তোমাদের যদি আগ্রহ থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আরও শুনবার জন্য ইচ্ছা জাগবে। যেমন ছোট-শিশুদের গল্প শুনতে শুনতে মন একাগ্র হয়ে যায়—এমনি কিন্তু পড়াশুনায় মন বসছে না, কেউ পড়াতে পারছে না। কিন্তু তাকে যেই গল্প বলা হল তখন সে আস্তে আস্তে কাছে এসে বসে, দুর্বিনীত দুর্দান্ত সেই শিশুটি শান্ত হয়ে বসছে গল্প শুনবে বলে। তোমাদের এই দুর্বিনীত মন, restless mind, turbulent mind চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। সেই মন এই কথাগুলো শুনতে শুনতে close to closer হয়ে আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে নিজেই আবিষ্ট হয়ে যাবে। তখন কিন্তু তোমার মন আর বাইরের দিকে ছোটাছুটি করবে না, দুশ্চিন্তা থাকবে না, ভাবনা

থাকবে না। বাড়ি ঘরের কথা কোথায় সরে যাবে, তোমার অন্য কথা চিন্তাভাবনা সব absent হয়ে যাবে, তখন তুমি একটা মাত্র বিন্দুতে আসবে। আর সেখানে এই কথাগুলোর সারবস্তুর সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে। You are experiencing yourself in a new pattern, in a new design and in a new process gradually. এই ভাবে তোমার পূর্বের অভ্যাসগুলি আপনা থেকেই সরে যাবে। তোমাকে জোর করে ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তা করতে হবে না। Your light, inner light, the experience will dissolve all these things. বোধ কী করে? অজ্ঞানকে দূর করে—অজ্ঞানই হল অন্ধকার। অজ্ঞান-অন্ধকার হল স্বভাবপ্রকৃতির নাম-রূপ-ভাবের বৈচিত্র্য। তা কেন্দ্রের সমবোধ, একবোধ বা আপনবোধকে আবৃত করে রাখে মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো। সূর্যের তাপেই জল বাষ্প হয় এবং মেঘে রূপান্তরিত হয়ে সূর্যকে ঢেকে দেয়। সূর্যের তাপেই মেঘ সরে যায় এবং বৃষ্টি হয়ে সেই মেঘ নিচে নেমে আসে। তারপর সমুদ্র, নদী, নালার মধ্যে মিশে যায়। সেইরূপ কেন্দ্রের কূটস্থ চৈতন্যকে বোধের প্রকাশ চিদাভাস সাময়িক ভাবে কূটস্থ চৈতন্যের অংশ বিশেষকে আবৃত রাখে বা ঢেকে দেয়। সেই চিদাভাস দ্বারা আবৃত চৈতন্যই হল জীব। তার হৃদয়ে চৈতন্য ব্রহ্ম-আত্মা নিহিত। চিদাভাস তারই প্রকাশ, তারই বক্ষে দ্বৈতলীলার অভিনয় করে তার মধ্যে আবার মিশে যায়। তখন জীব শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত দিব্য অমৃতময় আত্মসত্তায় ফিরে আসে। এই ঘরের আলোগুলো যখন ছিল না, অন্ধকারে একটা আলো জ্বালালো, তখন অন্ধকার সরে গেল। দুটো আলো জ্বালালো আরও অন্ধকার সরে গেল। এই ভাবে আমাদের inner chamber will be enlightened by the words of realization, তার ফলে তোমার ভিতরে সমস্ত জিনিস বোধে বোধময় হয়ে যাবে। তখন তোমার অজ্ঞাত কিছু থাকবে না, অজানা কিছু থাকবে না, অদৃষ্ট কিছু থাকবে না, অশ্রুত কিছু থাকবে না। সবকিছুর মধ্যে you are the only subject, you are the only object and the essence of both, you are the revealer as well as the witness of both. এই হচ্ছে তোমার পরিচয়।

তুমি প্রথমে নিজেকে object-রূপে জানছ, অর্থাৎ I as object। তার পরে দেখবে object-কে ব্যবহার করছে subject, সেও তুমি অর্থাৎ তোমার আমি। তার পরে দেখবে subject-object দুটোকেই যে প্রকাশ করছে সেও তুমি—তোমার আমি। এই ভাবে নিজেকে আবিষ্কার করা যায় নিজের মধ্যে। কিন্তু কী করে? 'এ' সেই বিজ্ঞান তোমাদের সামনে বলবে। এখানে তোমাদের গতানুগতিক সাধনভজনের মধ্যে 'এ' কোনও বাধা দেবে না। কে কী কর বা না-কর সেই সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না। 'এ' খালি তোমার আমিকে নিয়ে খেলা করবে। কেননা there Self-I exists eternally, Self-I is the I of all other I's। প্রত্যেকের মধ্যে আমি আমিরূপে বসে আছি। এই আমিকে বাদ দিয়ে তোমাদের কারও কোনও পরিচয় নেই। এই আমি-র সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হলে তোমরা আপন ইষ্টকে, আপন গুরুকে, আপন মা-ই বল, ঠাকুরই বল, আত্মাই বল তাঁকে আপন করে পাবে। এই

প্রসঙ্গে একটি উদ্গীত গানে আছে—

অনন্ত বিশ্বে আছে যত প্রাণ
ক্ষুদ্র বৃহৎ কিংবা অণু পরিমাণ—
সকলই আমার অংশ আমার সন্তান
অতি প্রিয় তারা মোর অতি আপন।।
আমার অমৃতসত্তায় হয়ে সত্তাবান
আমার বিশাল বক্ষে করে অবস্থান।
আমার আনন্দখেলা বিশ্ব তার নাম
সদাই সবে মোর করে গুণগান।।
আমির বুকে আমির প্রকাশ আমির বিলাস
স্বভাবে আমি দ্বৈত সগুণ সাকার
স্ববোধে আমি অদ্বৈত নির্গুণ নিরাকার
আমিবোধে আমি সদা হই প্রকাশমান সবেতে।।
বাহিরে দৃশ্য জ্ঞেয় আমি অজ্ঞান
অন্তরে জ্ঞাতা ভোক্তা আমি আভাস জ্ঞান
হৃদয়ে সাক্ষিচেতা আমি বিজ্ঞান
তুরীয়তে ভাবাতীত আমি অখণ্ড প্রজ্ঞান।।
স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ
(নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ)
স্বানুভবদেব স্বয়ং সচ্চিদানন্দঘন প্রীতম্
সর্ববোধের অধিষ্ঠান আমি সর্বসমাধান
আমিবোধে সবেতে আমি প্রকাশমান।।

(দরবারী কানাড়া—ত্রিতাল)

প্রত্যেকের দেহের মধ্যে অনন্ত কোটি অণুশক্তি আছে, প্রাণের বিন্দু আছে। প্রত্যেকটি চেতন, তাকে ইংরাজিতে বলে germ cell। প্রত্যেকেরই প্রাণ আছে। যেমন নিজের দেহের মধ্যে আমরা আছি আবার বিশ্বদেহের মধ্যেও আমরা সেরকম আছি, মানে কী ভাবে এক-এর মধ্যে অনন্ত, অনন্তের মধ্যে এক লুকিয়ে আছে। একটা বটগাছের বীজ, একটা পেঁপের বীজ যদি মাটিতে বোনা হয় তবে গাছ হয়। সেই গাছে কতগুলো ফল হবে? সেই ফলে কতগুলো করে বীজ আছে? তাহলে দেখ তোমার মধ্যে অনন্ত কী ভাবে আছে! এটা অস্বীকার করবে কী করে? এগুলো এক এক করে point out করে তবে তোমার ভিতরে inner chamber-গুলোকে enlighten করতে হবে। প্রথম প্রথম তোমার ভাল লাগবে না, খুব সত্যি কথা। শুনতে শুনতে মনে হবে, দূর এগুলো কী! এর থেকে আমার জানাশোনা কথা যেখানে হয় সেখানেই আমি যাব। প্রথম প্রথম তা-ই মনে হবে। নূতনকে জানতে হলে তোমাকে একটা

jump দিতেই হবে। তা না-হলে তুমি পুরাতন সীমার মধ্যেই থাকবে। কাজেই প্রথম প্রথম নূতন কোনও কিছুকেই মন গ্রহণ করে না, কিন্তু আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তার পরে মন সেই নূতনকে নিজের মতো করে যখন অনুভব করতে পারে সে আবার তা ব্যবহার করতে পারে। এই ভাবেই হয় আমাদের ভিতরে আমাদের অন্তর্সত্তার বিকাশপ্রকাশ এবং এই বিকাশপ্রকাশের জন্য আমাদের সত্যি সত্যিই খুব যে একটা বেশি কিছু পরিশ্রম করতে হয় তা নয়, তা আপনা থেকেই হয়ে যায়। আমরা ইচ্ছা করে যে কর্ম করেছি তা শুধু বহির্জগতে, এই বাস্তবের ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু তোমার ভিতরে যখন চিন্তা ওঠে চিন্তাকে তুমি বন্ধ করতে পার কি? মোটেই পার না। তা আপনা থেকেই উঠছে। আরও গভীরে যদি যাও তোমার বোধের বৃত্তি আপনা থেকেই উঠবে। তখন দেখবে স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। এই ভাবে নিজের পরিচয় নিজে কী ভাবে অনুভব করা যায় তা তোমরা একটুখানি শুনছ ঠিকই তাড়াহুড়ো করে কিন্তু তা একদিনে দখলে আসবে না। ছোট শিশুর অ-আ-ক-খ একদিনে দখলে আসে না, নামতাটা একদিনে দখলে আসে না, আজকে সে হয়ত বড় হয়ে বড় বড় অঙ্ক কষছে, কিন্তু একদিন তাকে এক-দুই-তিন-চারই শিখতে হয়েছে।

আমাদের ভিতরে প্রথম যে প্রকাশটা হয় তা খুব ছোট করে বা বীজ আকারে হয়ে থাকে। তার পরে আস্তে আস্তে সেটা বড় হয়। এই বড় হতে হতে বৃহত্তর, বৃহত্তমতে পৌঁছে যায়। কাজেই আমাদের এই যে শিশুমন, এই শিশুমনকে তৈরি করতে গেলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে সে যেন বিকৃত না-হয়ে যায়। বিকৃত হয়ে গেলে তো সে আর পারবে না। সেইজন্য চারাগাছকে যখন বোনা হয় তখন বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়। গরু ছাগলে খেয়ে নেয়, পাখি ঐ চারাগাছের stem-কে খেয়ে নেয়, সেইজন্য গাছকে ঢেকে দিতে হয়। বড় হয়ে গেলে সেই গাছের মধ্যেই গরু-ছাগলকে বেঁধে রাখা যায়। সেরকম আমাদেরও এই শিশুমনকে একটু ঘিরে রাখতে হয়। আস্তে আস্তে সেই মন যখন শক্তপোক্ত হয়ে যায় তখন সেই মন দিয়েই কিন্তু তুমি অখণ্ডের বিচার ও তাতে বিহার করতে পার, কোনও অসুবিধা হবে না। এই যে তোমরা কথাগুলো শুনছ, সব কথাগুলো কিন্তু তোমাদের কাছে আজকে খুব সুবোধ্য মনে হচ্ছে না। কিছু কিছু মনে হচ্ছে, কিছু কিছু হচ্ছে না। কিন্তু তা কায়েম করতে হলে তোমাদের আরও শুনতে হবে। এ হল শ্রবণের বিজ্ঞান। তাতে কী হবে? সেটা কিন্তু প্রথমে আন্দাজ করে জানা যাবে না। 'এ' বললেও তোমরা নিতে পারবে না। 'এ' বলে দিতে পারে অনেক ভঙ্গিমাতে, কিন্তু ধাপে ধাপে, step by step বলে গেলে তখন তুমি দেখবে এই জগতে যা-কিছু হয়ে চলেছে তা বাইরে নয়। তা তোমাতে তোমার আমি-রই অনন্ত পরিচয়।

আমরা যা বাইরে দেখি তা হচ্ছে অন্তরেরই একটা স্ফূর্তি বা স্ফুরণ। আকাশের আবার বাহির আর ভিতর কী? আমরা ঘর করেছি বলে মনে করি আকাশ যেন দুটো, ঘরের ভিতর-বাহির হলেও আকাশ কিন্তু দু'টো নয়, আকাশ একটাই, কারণ আকাশ অবিভক্ত অখণ্ড, বোধস্বরূপ আমিও তাই। সেরকম বোধের কোনও বাহির-ভিতর নেই, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা তা মনে করি, এই হচ্ছে মনের বৃত্তি। কাজেই যত বৈচিত্র্য সবটাই কিন্তু exist

করছে মনের মধ্যে। এই মনটা যখন বিশ্রাম করে ঘুমের মধ্যে, কারণে চলে যায় তখন আর বৈচিত্র্য থাকে না। তখন তুমি একা, আপনে আপন। কিন্তু যেই জেগে উঠলে তখনই কিন্তু মনের ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেল, তার কাজ নিয়ে নূতন করে সে চিন্তা করতে আরম্ভ করছে, কর্ম করছে। তার ফলে তার সেই স্থিতি আর থাকছে না। কিন্তু এই এক-এর বিজ্ঞানে তোমার কর্ম থাকলেও তাতে তোমার কোনও প্রত্যবায় হবে না। তুমি বাইরে কর্ম করবে, সংসার করবে, সবই করবে, কিন্তু আমি ছাড়া হতে পারবে না। এই আমি-র মধ্যে বসে তুমি যা খুশি কর না কেন, তাকেই বলা হয় 'খুঁটি ধরে বুড়ি ছুঁয়ে থাকা', তুমি যা খুশি কর আমি-র কিছু হবে না। অর্থাৎ তুমি আপনবোধে বসে অনায়াসে সংসার করতে পার, অনায়াসে বৈচিত্র্যের সঙ্গে থাকতে পার। কারণ বৈচিত্র্য তো তোমারই (তোমার আমি-র) প্রকাশ, সেখানে দ্বিতীয় কেউ নেই। তুমি তখন নিজ ছাড়া কাউকেই খুঁজে পাবে না। তুমি তখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে নিজেকেই আবিষ্কার করতে পারবে, পুত্র-কন্যার মধ্যে নিজেকেই দেখবে। এই সূত্র ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন, তাই বলেছিলেন যে পতি-পত্নীর পরস্পরকে পরস্পরের ভাল লাগে পরস্পরের রূপের জন্য নয়, নামের জন্য নয়, ভাবের জন্য নয়—পরস্পরের মধ্যে একই আত্মা/বোধময় আমি বিদ্যমান বলে তারা একে অপরকে ভালবাসে। এরূপ পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা যে পরস্পরকে ভালবাসে তার কারণ তাদের মধ্যে একই আত্মা/আমিময় বোধ আছে বলে। এই ভালবাসার মূলে আছে One, existence of Oneness অখণ্ড আমি।

আত্মাস্বরূপ পরমপ্রেমাস্পদ। সকলের অন্তরে এক আত্মা আছে বলে সকলের মধ্যেই প্রেম ভালবাসার স্ফূর্তি হয়। সেইজন্য বলা হয়, এই প্রিয়বোধ হল আত্মার আমি-র ধর্ম। আমাদের অন্তরে নিহিত আছে আত্মা, সেইজন্য আমাদের মধ্যে আত্মার প্রকাশ প্রিয়বোধ ও শ্রেয়বোধ উভয়ই অভিব্যক্ত হয়। কারণ আত্মার থেকে প্রিয়ও কেউ নেই, শ্রেয়ও কেউ নেই। অপ্রিয়বোধ আসে আমাদের বাইরের প্রভাবে। প্রিয়তমবোধ হচ্ছে নিজেরই পরিচয়। প্রিয়তমবোধ যখন তোমার মধ্যে জাগবে তখন তুমি কারও মধ্যে আর ভেদজ্ঞান দেখতে পাবে না, একই জিনিস দেখতে পাবে। কী রকম? এই প্রসঙ্গে ছোট্ট কথা দিয়ে শুধু ইঙ্গিতকরে দেওয়া যায়। চিনির পুতুল বিক্রি হয় মেলাতে। নানা রকমভাবে চিনি দিয়ে পুতুল তৈরি করে ছাঁচে—হাতি, ঘোড়া, উট, পাখি, রথ ইত্যাদি। তুমি তার যেখানে মুখ দেবে সেখানেই চিনি, সেখানেই মিষ্টি আস্বাদন করবে। এইরকম তুমি জগতের যেখানেই ইন্দ্রিয়কে লাগাও সেখানেই তুমি চেতনাকে খুঁজে পাবে, সেখানেই বোধরূপী আমিকে খুঁজে পাবে, অর্থাৎ সেখানেই আমি। এই বোধের সঙ্গে যে নিজের পরিচয় কী ভাবে হচ্ছে 'এ' তার একটা সামান্য ইঙ্গিত দিচ্ছে। তা ধাপে ধাপে clear করলে তখন তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তুমি সবকিছুর মধ্যে নিজেকে কী ভাবে আবিষ্কার করবে। শুধু বোধ দিয়েই তা সম্ভব অর্থাৎ আমি দিয়েই আমি-র পরিচয় পাবে। তুমি জান না তাও তোমারই বোধ, আর তুমি জান তাও তোমারই বোধ। সর্বক্ষেত্রেই তোমার আমি-ই বর্তমান। কাজেই তা negative ভাবেও work করছে এবং positive ভাবেও work করছে। আবার একসময় দুটোই মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

তখন ব্যবহারটা শান্ত বা স্তব্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ যখনই মন শান্ত হয় তখন কিন্তু ব্যবহার কমে যায়। আর মন যখন অশান্ত হয় তখন ব্যবহার বেড়ে যায়।

নিজবোধে যখন তুমি নিজে, তখন কিন্তু ব্যবহার শান্ত ও সমাহিত হয়ে যাবে। তুমি সমাধিতে নিজের মধ্যে নিজেই আবিষ্কার করবে যে, আমি আমি-র মধ্যেই ছিলাম, আমি-র মধ্যেই আছি, আমি ছাড়া আমি হতে পারি না। আমি ছাড়া হয় না কভু আমি। কী করে হবে? তার কারণ আমি-ই হল তোমার সত্তা ও শক্তি উভয়ই। আমিই তোমার শক্তি। হয়ত আমিবোধে তুমি তা জান না ঠিকই, কিন্তু আমিবোধে যখন তা তুমি শুনলে তখন আমিবোধে চিন্তা করে দেখবে, তাই তো আমি নেই অথচ আমি জানব কী করে! আমি অনুভব না-করলে দেখব কী করে! তাহলে অনুভূতি আর আমি অভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। আস্তে আস্তে তোমার কাছে clear হয়ে যাবে যে, subject আর object দুটো আলাদা কোনও entity নয়। একটা টাকার এপিঠ আর ওপিঠ, যেমন আমাদের সঙ্গে আমাদের নিজের পরিচয় অর্থাৎ সত্তা ও শক্তি অভিন্ন। আগুনের মধ্যে আগুনের যে জ্যোতি ও তাপ থাকে তা আগুনের থেকে আলাদা করা যায় না। সূর্যের জ্যোতি আর তাপকে সূর্যের থেকে আলাদা করা যায় না। সুতরাং আমি আর আমারকে তুমি আলাদা করতে পারবে না, তবে হ্যাঁ আমার ব্যবহার যখন বেশি তখন আমি-র ব্যবহার কম, তখন তুমি জীব। যখন আমি-র ব্যবহার বেশি আর আমার ব্যবহার কম তখন তুমি শিব, ঈশ্বর। আর যখন আমার আর আমি-র পৃথক কোনও ব্যবহার নেই তখন তুমি পরমাত্মা। অর্থাৎ আমার মানেই হল মন, আর আমি মানে হল বোধ বা Consciousness। Consciousness + mind is Jiva আর Consciousness + minimum mind is Ishwara এবং Consciousness – mind হল Atmaa/Brahma—Pure Self। এ কথাকেই স্থান বিশেষে বলা হয়েছে, mind + Consciousness হল Jiva, Consciousness + mind হল Ishwara এবং Consciousness – mind or Consciousness + Consciousness is Atmaa/Brahma—Supreme Self. Mind হল তোমারই কল্পনা অর্থাৎ বোধের বক্ষে বোধের যখন তরঙ্গ বা আভাস প্রকাশ পায় তাকেই ইংরাজিতে বলা হয় reflection of Consciousness। Consciousness with reflection হল I + mind এবং Consciousness without reflection হল I – mind, অর্থাৎ Pure Consciousness। তুমি ঘুমের মধ্যে মনশূন্য হয়ে যাও তাই গাঢ় ঘুম হয়, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে মনের একটা অংশ খেলা করে সেইজন্য স্বপ্ন দেখ, কিন্তু স্বপ্ন ভাঙার পর তুমি জান যে স্বপ্ন দৃশ্য, মানে dreamer and the dream objects both are unreal। সেইরকম জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে যে ব্যবহার করছি তার মধ্যেও subject and object আছে। This is possible owing to the presence of our Real Self which is Pure Consciousness.

বিশুদ্ধ বোধসত্তার বক্ষে তোমার মন subject-object রূপে খেলা করছে। এগুলি clear হয়ে যাবে যেই বোধ দিয়ে তা হল তোমার নিজবোধ। তা অন্য বোধ দিয়ে হবে না। স্ববোধ দিয়ে তা সম্ভব হবে, তার পরে তুমি যখন নিজের আসল স্বরূপে পৌঁছে যাবে তখন

তুমি কী দেখবে? তখন দেখবে, আরে সব কিছুর মধ্যে তো চৈতন্যরূপে আমি-ই রয়েছি, আর তো কেউ নেই! There is no second entity. তখন তুমি সবার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে দেখবে যে, আমি সর্বরূপে প্রকাশ পেয়ে নিজের সঙ্গে নিজেই খেলে চলেছি—এ-ই হল highest discovery in life। কিন্তু প্রথমে কথাগুলো শুনে তুমি ভাবতে পার যে, কী করে তা হবে? আমি চোখে এরকম পৃথক দেখছি, আলাদা জেনে এসেছি। এই জানার পিছনে যে কারণটা সেই কারণ যদি তুমি নিজেই হও তাহলে কোনও সংশয় থাকে না। There is no cause other than your own Self, there is no effect other than your own Self. তোমার কাছে যত forms, sounds/names, actions, ideas, all reactions এসবই তোমার বক্ষে তোমাকে কেন্দ্র করে তোমার বোধরূপ আমি-ই খেলছে, তোমাকে বাদ দিয়ে তা সম্ভব নয়। তাহলে তুমি জানছ কী করে? Contradiction-টাও তোমারই প্রকাশ। তা তুমি জানবে কী করে? নিজেকে দিয়েই। ঐ idea, অর্থাৎ I-dea মানে আমিকে দিয়া। কাজেই I ছাড়া অর্থাৎ আমি (Consciousness) ছাড়া কোনও ব্যবহারই সম্ভব নয়। এবার I + Idea হল Ishwara আর I – Idea হল Paramatmaa। তার মানে আমি-রই কতগুলো stage তোমাদের সামনে আজকে point out করা হল। কিন্তু এ কথা শুনে কখনও ভেব না যে, আমার পক্ষে ওগুলো সম্ভব নয়! এ কথা শুনতে শুনতে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে যে, এই subject কত easy। কেন না তা তো already তোমার ভিতরেই আছে, তুমি শুধু তা জান না। তা-ই শুধু তোমাকে point out করে দেওয়া হচ্ছে।

নূতন করে কিছু সৃষ্টি করা হচ্ছে না। যা আছে, যা নেই—এ দুটোরই জ্ঞাতা তুমি স্বয়ং অর্থাৎ তোমার আমি এবং জ্ঞাতারও সাক্ষী তুমি স্বয়ং। You are not only the object or subject, you are the essence of both, you are the reflector of both, illuminator of both. তোমার মধ্যে তোমা অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোনও সত্তা বা শক্তির প্রকাশ অসিদ্ধ। কাজেই আত্মা বা Self-এর কথা অর্থাৎ অখণ্ড শুদ্ধ নিত্যাদ্বৈত পাকা আমি-র কথা নিজবোধ দিয়ে তোমাদের কাছে পরিবেষণ করা হল। কেননা নিজেকে/তোমার আমিকে বাদ দিয়ে তোমার পক্ষে কোনও কিছু দেখা-শোনা-জানা কিছুই সম্ভব নয়। কাজেই নিজেকে নিয়ে যে নিজের সঙ্গে নিজের খেলা তা-ই বাইরে প্রথমত বেশি, তার পরে যাবে অন্তরে, তার পরে যাবে কেন্দ্রে এবং শেষে তুরীয়তে। তখন তুমি ব্রহ্ম-আত্মা সনাতন। কারণ সেখানে আর কেন্দ্র-অন্তর-বাহির বলে কিছু নেই, থাকলেও আভাসের মতো আছে, তার কোনও প্রাধান্য নেই। সবই তোমার বক্ষে তোমারই নিজস্ব অভিব্যক্তি, অর্থাৎ Self in Self ,of Self, from Self, for Self, by Self, with Self, to Self, on Self and beyond and beyond। এই হল আত্মার formula। আত্মার জায়গায় আমাকে বসালে হবে আমি-র মধ্যে আমি, আমি-র আমি, আমি হতে আমি, আমি-র জন্য আমি, আমি-র দ্বারা আমি, আমি-র সাথে আমি, আমাকে আমি, আমাতে আমি, আমি-র উপর আমি এবং তারও পরে আমি। এবার আমি-র জায়গায় তোমাকে বসালে তোমার মধ্যে তুমি, তোমার তুমি, তোমা হতে তুমি, তোমার জন্য তুমি, তোমার

দ্বারা তুমি, তোমার সাথে তুমি, তোমাকে তুমি, তোমাতে তুমি, তোমার উর্ধ্বে বা পরে তুমি স্বয়ং। এই হল তোমার সত্য পরিচয়—ব্রহ্ম-আত্মা স্বয়ং, অখণ্ড আমিবোধে তা নিত্যসিদ্ধ।

নিজের পরিচয় জীবনে যেভাবে ক্রমপর্যায়ে অনুভূত হয় তা হল বহির্প্রকৃতিতে নাম-রূপে আমি বা তুমি, অন্তরে স্বভাবরূপে আমি বা তুমি, কেন্দ্রে আত্মা/ঈশ্বররূপে আমি বা তুমি এবং তুরীয়তে ব্রহ্ম-আত্মারূপে আমি বা তুমি। অন্যভাবে বহির্প্রকৃতিতে ও অন্তরে হল স্বভাবের আমি/তুমি, কেন্দ্রে হল স্ববোধের আমি/তুমি এবং তুরীয়তে ব্রহ্ম-আত্মবোধে আমি/তুমি। ব্রহ্ম/আত্মবোধে যে আমি-র বা তুমি-র কথা বলা হল তা কিন্তু স্বভাবপ্রকৃতির ভাববোধশূন্য আমি/তুমি। মূল কথা হল স্বভাবের আমি/তুমিতে আমারবোধের মিশ্রণ থাকে অর্থাৎ গুণ-ভাব-উপাধির মিশ্রণ থাকে। সেইজন্য তা হল মিশ্রবোধের অশুদ্ধ আমি/তুমি। বোধ গুণ-ভাব-উপাধি মিশ্রিত হলে মলিন হয়। তখন তার মধ্যে গুণ-ভাবের বিকার প্রকাশ পায়। এই গুণ-ভাবযোগে বোধের আমি/তুমি হল অশুদ্ধ কাঁচা আমি/তুমি। এই কাঁচা আমি/তুমিকে গুণ-ভাব-উপাধির বিকারজনিত প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হয়। এই গুণ-ভাব-উপাধির অংশই হল আমি-র/তুমি-র মধ্যে আমার/ তোমার ভাব। উপাধিযোগেই বোধসত্তা আত্মার অর্থাৎ আমি-র/তুমি-র সত্য মহিমা অর্থাৎ স্বরূপের পরিচয় আবৃত থাকে। সেইজন্য গুণ-ভাব-উপাধি যোগে শুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মার আমি/তুমি জীবদশা প্রাপ্ত হয়। তাকে আত্মবিস্মৃত হয়ে জীবরূপে সংসারে আমারবোধ যোগে ভ্রান্ত হয়ে মূঢ়বৎ জীবনযাপন করতে হয়। জন্ম-মৃত্যুর চক্রে তাকে পুনঃপুনঃ পরিভ্রমণ করতে হয়। এই ভাবেই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা জীবদশা ভোগ করে। আবার শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত পাকা আমি-র কৃপায় সে তার কল্পিত বা মনগড়া অবিদ্যা-অজ্ঞানজাত জীবদশা হতে মুক্ত হয়ে পুনরায় তার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মবোধে অর্থাৎ পাকা আমিবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

শুদ্ধ ব্রহ্ম-আত্মবোধই হল 'তত্ত্ববোধ'। সচ্চিদানন্দ হল তার স্বরূপ। সুতরাং সচ্চিদানন্দ বক্ষে সচ্চিদানন্দের সর্ববিধ অভিব্যক্তি সচ্চিদানন্দই, অন্য কিছু নয়। সেইজন্য বলা হয়, 'তত্ত্বস্বরূপে তত্ত্বস্ফূর্তি' হয়। তাতে তত্ত্ব অতিরিক্ত কোনও কিছুই সম্ভব নয়। তত্ত্বের দৃষ্টি তুরীয়তে নিত্যসিদ্ধ নিত্য অদ্বৈত। অর্থাৎ ব্রহ্ম-আত্মসত্তাতে ব্রহ্ম-আত্মা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত। স্বশক্তিযোগে তাঁর বক্ষে তাঁর অভিনব লীলাবিলাস হয়। তার ফলে নির্গুণ তত্ত্বস্বরূপে সগুণের এক অভিনব লীলাবিহার হয়। তাতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মাই কেন্দ্রসত্তাতে ঈশ্বররূপে, অন্তর্সত্তাতে স্বভাবরূপে জীব এবং বহির্সত্তাতে প্রকৃতিরূপে তাঁর সমগ্র অভিব্যক্তি জীবজগৎরূপে বিশ্বলীলা প্রকাশ পায়। এই লীলাতে তত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মার নিজের সত্যস্বরূপ আবৃত থাকে। তা সত্ত্বেও তাঁর যে অভিব্যক্তি হয় তা হল মিশ্রবোধে সগুণ অভিব্যক্তি। তাকেই সম্যক্‌রূপে 'তথ্য' বলা হয়েছে। সুতরাং তথ্যবোধে আমরা ঈশ্বরের জীবলীলার পরিচয় পাই। এই জীবলীলায় জীব ও ঈশ্বরের এক বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় গুণ ও উপাধির মাধ্যমে। গুণের প্রকাশকে ভাব বলে এবং ভাবের ব্যবহারকে উপাধি বলে। সমুদ্র কখনও তার বাইরের তরঙ্গ-লহরীর দ্বারা অভিভূত হয় না। পরব্রহ্ম বা Pure Consciousness

কখনও দেশ-কাল, কার্য-কারণের বৈচিত্র্যের দ্বারা অভিভূত হয় না। আকাশ কখনও সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মাঝখানে নিজেকে হারায় না। আকাশ আকাশই থেকে যায়। সৃষ্টির সমস্ত সম্ভার তার বক্ষে প্রকাশ করা হচ্ছে, আবার কিছুকাল সেখানে থাকছে, তার পরে তা আপনিই লয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আকাশ আকাশই থেকেই যাচ্ছে। আকাশকে জানছে কে? তুমি। আকাশ তোমাকে জানছে না তুমি আকাশকে জানছ? তা একটু খেয়াল করলেই তুমি দেখতে পাবে যে, কে তোমাকে চালাচ্ছে। তুমি নিজেই চালাচ্ছ। কিন্তু সেই নিজেকে তুমি আর কিছু দিয়ে জানতে পারবে না, একমাত্র নিজবোধরূপ আমি ছাড়া। সেই নিজবোধের অর্থাৎ আমি-র কোনও লিঙ্গ নেই। সে male-ও নয়, female-ও নয়। "নৈব স্ত্রীং ন পুমানেষ চৈবায়ং নপুংসকঃ।" সে পুংলিঙ্গও নয়, স্ত্রীলিঙ্গও নয় এবং ক্লীবও নয়। বাইরের অর্থাৎ আমাদের বাস্তব দৃষ্টিতে তা দেখছি। স্থূলের কথাটা সেইজন্য এত গুরুত্বপূর্ণ। স্থূল দিয়ে কথাগুলো প্রথমে রাখা হল তোমাদের সামনে, কেননা স্থূলকে base করে আমরা সবাই চলছি, তাকে আত্মার থেকে আলাদা করে বলা হচ্ছে না, তা আত্মারই একটা বৈভব, তোমারই একটা বৈভব, কিন্তু তা তোমার আসল পরিচয় নয়।

তুমি দেহধারী—এটুকুই তোমার পরিচয় নয়। দেহকে চালাচ্ছ তুমি এবং যা দিয়ে চালাচ্ছ তারও পিছনে তুমি। এ রকম করতে করতে তার পশ্চাতে যে তুমি সাক্ষিরূপে আছ, সেই সাক্ষীকে কেউ স্পর্শ করতে পারে না। সে সব কিছুকে প্রকাশ করছে, কিন্তু তাঁকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না। যেমন এই আলোটা (ঘরের light source-কে নির্দেশ করে) এই ঘরের সবাইকে আমাদের প্রকাশ করছে, কিন্তু আমরা কি আলোকে প্রকাশ করতে পারছি? এটা একটা স্থূল উপমা। সেইরকম আমাদের ভিতরে আত্মারূপ যে সূর্য, জ্যোতি অর্থাৎ সেই আমিরূপ বোধসত্তাই আমাদের বুদ্ধি-মন-প্রাণ-দেহকে প্রকাশ করছে, কিন্তু দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি তাঁকে প্রকাশ করতে পারছে না। তার মানে তোমার নিজ তথা আমি কিন্তু চিরকাল স্বতন্ত্রই থাকছে, অদ্বৈতই থাকছে। তার কোনও প্রতিপক্ষ ও বিপক্ষ নেই; তার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই; তার কোনও পরিণাম, আকার ও বিকার নেই। সে কিন্তু 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং'। এই আমি বা আপনবোধরূপ তোমার যে পরিচয় তা তুমি আজকে একটু শুনলে; তোমার মনে কিছু দ্বন্দ্ব আসবে, প্রশ্ন জাগবে এবং মনে হবে—এগুলো কখনও সম্ভব নয়! কেননা তোমার মন তা গ্রহণ করতে চাইবে না প্রথমে। কারণ তাহলে যে তার অস্তিত্ব থাকে না। মন চাইছে আধিপত্য করতে, সেইজন্যই তোমার ভিতরে এক এক সময় মন তোমাকে overcome করে ফেলে। তুমি নিজেকে control করতে পার না। কিন্তু মন যে তোমার অধীন তা যখন মন জানবে, মন তো আর তোমার উপরে আধিপত্য করতে পারবে না। কেননা আকাশকে তো কোনও সৃষ্ট বস্তু অভিভূত করতে পারে না। এই যে বড় বড় সমস্ত নক্ষত্রগুলি আছে, অবাক হয়ে যেতে হয় ভাবতে গেলে যে, এইরকম সমস্ত জ্যোতির্পিণ্ড যার থেকে আমরা এতদূরে আছি তা সত্ত্বেও সেই heat-এ আমরা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি। আর সেই অগ্নিপিণ্ডগুলি আকাশের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু আকাশ তো জ্বলে যাচ্ছে না।

Atom bomb, যা মানুষ আবিষ্কার করেছে, তা তো আকাশকে নাশ করতে পারছে না, বায়ু তো আকাশকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারছে না, জল তো আকাশকে ভেজাতে পারছে না।

আকাশের থেকেও স্বচ্ছ এবং সূক্ষ্ম হল নিজের পরিচয়। তাকে কে বাঁধবে? তাকে কে মারবে? কে তার ক্ষতি করবে বল? এগুলো শোনার পরে নিশ্চয়ই তোমার ভ্রান্তি-ভীতি আস্তে আস্তে সরবে। এভাবে তোমাদের সামনে তোমাদেরই নিজের পরিচয় দিনের পর দিন তোমরা যদি একটু খেয়াল করে শোন তখন কিন্তু নূতন করে আবিষ্কার করবে তোমাকে/নিজেকে। তখন ভাববে, আরে আমি তো তা জানতাম না! এই ভাবে আমি ভুল করেছি! আর তো তাহলে এই ভুল হবে না! কাজেই ভুলের আর মাশুলও দিতে হবে না, অর্থাৎ দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে না। 'এ' যে কথাগুলো তোমাদের সামনে রাখছে সেগুলো অবাস্তব বা অবান্তর মনে করো না। আজকে না-হলেও একদিন তোমাকে এই বোধের ঘরে যেতেই হবে। যদি বল কেন, because that is your true nature! তুমি কতকাল আর বিদেশে ঘুরবে? কত tax দেবে? কত দুর্ভোগ ভোগ করবে? নিশ্চয়ই ভোগের থেকে তোমার মুক্তির ইচ্ছা জাগবে, কিন্তু সেই মুক্তির ইচ্ছা জাগলেই তো আর হবে না। তোমাকে নানারকম ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, কিন্তু passport পাবে না। আর 'এ' যা বলছে তা হল তোমার passport, তোমাকে তা দিয়ে দেওয়া হল, তুমি যেখানে খুশি সেখানে যাও, যা খুশি তাই কর, কিন্তু এই passport-কে বাদ দিলে তুমি কোনও ক্রিয়াকলাপ করেও রেহাই পাবে না। ক্রিয়াকলাপ করলে ফল কিছু পাবে, তার পরেই আবার আগের মতো আচরণ করবে। কচুরিপানার সারিকে সরিয়ে দিলে পুকুরের জলটা দেখা যায়, তার কিছুক্ষণ পরেই দেখলে আবার যে-কে-সেই। কাজেই আমাদের মনের এই মেঘ সহজে যায় না, সহজে আমাদের বিকার যায় না। একমাত্র বোধের আলো, সেই বোধসূর্য অর্থাৎ পাকা আমি-র নিজবোধ জাগলে অন্য বোধগুলি আপনিই প্রশমিত হয়ে যায়। এই নিজবোধ জাগাবার জন্যই তোমাদের কাছে এই কথাগুলি বলা হচ্ছে।

তোমরা যে যা কর তার কোনও কিছুতেই 'এ' বাধা দিচ্ছে না, তার মধ্যে নিজেকে দেখ। Look at your Self, তুমি witness হিসাবে সব কিছুর মধ্যে আছ। তুমি এতদিন নিজেকে কর্তা-ভোক্তারূপে জেনে এসেছ, এর পরে জানবে তুমি কর্তা-ভোক্তাভাবের উর্ধ্বে, তুমি শুধু সাক্ষী। কর্তা-ভোক্তা হচ্ছে তোমার অন্তর্মন, তুমি কিন্তু অন্তর্মনের চাইতে আরও গভীরে, তার মূলে, অর্থাৎ সব কিছুর মূলে তুমি। সমস্ত কারণের কারণ তুমি যদি হও তোমাকে কে স্পর্শ করবে? কিন্তু কার্যের মধ্যে যতক্ষণ, ততক্ষণ প্রতিক্রিয়া হবেই। তুমি কার্যরূপে এসব নিজেকে মনে করছ। বাস্তব হচ্ছে কার্য। তার মূলে যাও অর্থাৎ প্রাণে। প্রাণ হল কারণ। আবার মনের কার্য। আবার মনে যাও, তখন দেখবে তা বুদ্ধির কার্য। বুদ্ধি হল পরমবোধির কার্য। বোধির ঘরে যাও সেখানে দেখবে আর কোনও কার্য নেই। অর্থাৎ 'আপনে আপন, স্বয়ং-এ স্বয়ং, পরমে পরম।' You are the supreme. You are in your true Self, in your true nature, which is One in One and beyond. কাজেই আপন বা নিজ সম্বন্ধে আজকে

শুধু একটুখানি ভূমিকা বলা হল। তার কারণ কালকে 'এ' এর উপরের construction সম্বন্ধে বলবে। অর্থাৎ গাঁথনি দিয়ে এর পরের স্তরের কথা বলা হবে। যাতে আজকের কথাগুলো পরবর্তী প্রসঙ্গকে বুঝতে সাহায্য করে তার জন্যই এই কথাগুলো তোমাদের সামনে রাখা হল। এগুলি তোমাদেরই নিজেদের পরিচয়। তা তোমরা ভুলে গিয়েছ, আবার ভুলটা ভাঙানোর জন্যই তা বলা হচ্ছে। তখন দেখবে যে, actually আমরা কত অবান্তর জিনিস নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করি, দুর্ভোগ ভোগ করি। ঐ যে বলা হল, বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের এগুলো করতে হয়। কিন্তু যখন অতিবাস্তবের সাহায্য নেবে, অন্তরের সাহায্য নেবে তখন বাস্তব হবে controlled। আবার অন্তরের যে বিকার তাকে শোধন করতে গেলে কেন্দ্রের সাহায্য নিতে হবে। তখন অন্তর হবে controlled। এরকম ভাবে কেন্দ্রকে control করবে আরও উপরে গিয়ে। এ ভাবে সব কিছুর মূলে তুমি নিজেই আছ। সর্বশেষে তুমি নিজেকেই—তোমার পাকা আমিকে discover করবে সব কিছুর মধ্যে—এই হল আত্মলীলা, to discover yourself in the gross, in the subtle, in the subtler, in the subtlest; in the finite, in the infinite, in the Absolute।

সবকিছুর মধ্যে নিজেকেই আবিষ্কার করে দেখা, এই হল আত্মার ইচ্ছা। "একোঽহম্ বহুস্যাম্"—আমি এক, বহু সেজে দেখব এবং অনুভব করব আমি-র স্বভাবমহিমা। তাই এই বৈচিত্র্যরূপে তিনি (আমি-র আমি) খেলে বেড়াচ্ছেন। আবার তাঁর ইচ্ছা যখন হচ্ছে—না, এবার আমি ঘরে ফিরব, আপন ঘরে চল মন, তখন আপনিই আবার নিজের মধ্যে নিজে ডুবে যাচ্ছেন অর্থাৎ আমিবোধ দ্বারা আমিবোধের মধ্যে ফিরে আসছেন। এই নিজের ঘরে ফিরে যাবার একটা বিজ্ঞান তোমাদের সামনে রাখা হল। সবাই যে এটা follow করবে not that, কিন্তু যতটুকু তুমি follow করবে, সামান্যটুকু করলেও তুমি তার ফল পাবে। কী ভাবে ? তোমাব বোধ কিছু না কিছু তো বাড়বে! You will attain some new light, you will acquire some new Consciousness and Knowledge and that will help you to proceed further and to go inner and ultimately you will realize your Self as all. You are all, all are you, you are One, One you are and beyond, beyond. তুমি নিজেকে ছাড়া আর কিছুই জানতে পার না, দেখতে পার না, বুঝতে পার না। বাইরে আমি দৃশ্য আর জ্ঞেয়, সেখানে আমি অজ্ঞান। এই অজ্ঞানকে আমি object-রূপে জানছি কিন্তু তাও আমি। অন্তরে আমি জ্ঞাতা আর ভোক্তা, সেইজন্য জ্ঞানাভাস। কেন্দ্রে আমি সাক্ষিচেতা, অর্থাৎ আমি witness। সেইজন্য আমি ঈশ্বরক্ষেত্রে অকর্তা অভোক্তা কেবল witness। সবকিছুর মধ্যে থেকেও আমি নির্লিপ্ত। আর তারও উপরে গেলে আমি কী? তখন আমি তুরীয়। সেখানে ভাবাতীত দ্বন্দ্বাতীত ভেদাতীত আমি অখণ্ড প্রজ্ঞানঘন। তখন এই যে পরিচয়গুলো যা তুমি শুনলে তা তোমার ভিতরে আস্তে আস্তে set হয়ে যাবে। তখন মন কিন্তু এর বিরুদ্ধে আর যাবে না। অর্থাৎ তোমার মন আগের অভ্যাসে আর ফিরে যেতে পারবে না। অভ্যাসগুলো আপনিই লয় হয়ে যাবে। এই ভাবে তুমি নিজেকে নিজে আবিষ্কার করবে নিজের বোধ দিয়ে, অন্যের বোধ দিয়ে নয়।

তোমার যে গুরু বা ইষ্ট তিনি তোমার মধ্যেই রয়েছেন তোমার রূপেই, কিন্তু তুমি আবিষ্কার করতে না-পারলে তা অজ্ঞাতই থেকে যাবে। তখন মনে করবে, আমি এত করে ডাকি হরি তোমায়, কিন্তু কই তুমি কোথায় থাক? তোমাকে তো দেখতে পাই না! গুরু, তুমি কোথায়? তুমি বললে যে, আমাকে সব সময় রক্ষা করবে, কিন্তু তুমি তো কিছুই করছ না! দূর সব মিথ্যা কথা! আবার বলে, ও ঠাকুর, তুমি কোথায়? আমি যে চোখে দেখতে পাচ্ছি না! আমরা তো এরকম ভাবেই বলি! কিন্তু এ তো নিজের সঙ্গে নিজের খেলা। কে ঠাকুর, কে গুরু, কে হরি? তখন দেখবে তোমার আত্মাই সব হয়েছে, আত্মাই সর্বরূপে প্রকাশ পাচ্ছে এবং সেই আত্মারূপে তুমি নিজেই আছ। কাজেই ঐ যে শিব, তিনি ধ্যান করছেন নিজেকেই, বিষ্ণু যোগনিদ্রায় নিজেকেই ধ্যান করছেন। ব্রহ্মা নিজেকেই নিজে জপ করছেন। মা কালীই বল, মা দুর্গাই বল, মায়ের যত মূর্তি দেখ সেখানে এক হাতে তাঁর একটা মালা আছে অর্থাৎ অক্ষরমালা—ওটা দিয়ে তিনি নিজেকেই নিজে জপ করছেন। ভুলে যেও না যে, মা ঐ আমি-রই কিন্তু একটা প্রকাশ। তিনিও কিন্তু আমি দিয়ে ব্যবহার করছেন নিজেকে। 'এ' তোমাদের সামনে একটা secret বলল আজকে, আর কিছু নয়। এই আমি কিন্তু সব কিছুরই essence, ঐ শত্রুর মধ্যেও আমি আছে, মিত্রের মধ্যেও আমি আছে, গুরুর মধ্যেও আমি আছে, শিষ্যের মধ্যেও আমি আছে। তাহলে যা-কিছু আছে তা আমি-রই কতগুলো অভিব্যক্তি বা প্রকাশ—এটা মনে রাখলে তুমি তোমার গুরুকে বা ইষ্টকে হারাবে না। তুমি মা-ই বল আর ঠাকুরই বল, আত্মাই বল, কারওকেই হারাবে না। সবই আত্মার কতগুলি প্রকাশবিকাশরূপ। অর্থাৎ আমি-র বক্ষে আমি-র প্রকাশবিকাশই হল আমি-র লীলা।

মন্তব্য ঃ

প্রথম বিচারের বিষয়বস্তু হল বোধসত্তা আমি-র নাম-রূপ বহির্প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যবহার। তা সম্ভব হয় দেহাত্মবুদ্ধিযোগে। দেহবুদ্ধির ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের মাধ্যমে। তাতে প্রাণক্রিয়ার প্রাধান্য সর্বত্রই ব্যাপক ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাতে বোধসত্তা আমি-র অস্তিত্ব থাকে পশ্চাতে। প্রতি জীবনের আরম্ভই হয় প্রাণের স্তর থেকে। বোধসত্তা অখণ্ড আমি-র বক্ষে অনন্ত অনন্ত ব্যষ্টি আমি জীবনরূপে অভিব্যক্ত হয়। তাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়-প্রাণের প্রাধান্যই প্রথমে প্রকাশ পায়। বোধরূপ সত্তা আমি-র আভাসের আভাস দ্বারা তা প্রথমে পরিচালিত হয়। এই আভাস চৈতন্যের বিস্তার ইন্দ্রিয়-প্রাণের বিবর্তনের মাধ্যমে সাধিত হয় ক্রমপর্যায়ে। ইন্দ্রিয়-প্রাণ তা সঠিক ভাবে জানে না। দেহ হতে বুদ্ধি পর্যন্ত সবই আভাস মাত্র প্রতীত। এই আভাস চৈতন্যই হল জীবের নিয়ন্তা বা বিধাতা। তার ক্রমবিবর্তনই হল ব্যষ্টি জীবের ধর্ম। তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বোধময় আমি-র দ্বারাই সিদ্ধ হয়। সেভাবে তার বিজ্ঞান আলোচনাই হল প্রথম বিচারের বিষয়বস্তু। তার পরিণাম দ্বিতীয় বিচারের মধ্যে পাওয়া যাবে।

তাহলে আজকের মতো এখানেই সচ্চিদানন্দ করতে হবে। সচ্চিদানন্দ দিয়ে আরম্ভ, সচ্চিদানন্দ দিয়ে পরিবেষণ, আবার সচ্চিদানন্দ দিয়েই শেষ।

৫/১১/০১

।। দ্বিতীয় বিচার ।।

ওঁ

ব্রহ্মানন্দং আত্মানন্দং সর্বানন্দং সচ্চিদানন্দম্
পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতম্ গগনসদৃশম্ তত্ত্বমস্যাদিলক্ষম্
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধী সাক্ষিভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং নির্বিকল্পং নিরঞ্জনম্
চৈতন্যং সর্বগং সর্বং সর্বভূতগুহাস্থিতম্
সর্বসম অনুপম স্বয়ংপ্রকাশ অখণ্ড ভূমা পূর্ণম্
সর্বসাক্ষী সর্বসত্য সর্বপূর্ণ সনাতনম্।।

(গুরুমন্ত্র)

গতকাল বাস্তব অর্থাৎ বহির্সত্তা/বহির্প্রকৃতির নাম-রূপ প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা হয়েছিল। তার কারণ, আমাদের এই দেহ বহির্সত্তা/বহির্প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত। কাজেই এই বাইরের জীবন নিয়ে আমরা মেতে থাকি। তার রক্ষণাবেক্ষণ, পুষ্টি, তুষ্টি এই সব নিয়ে জীবনের বেশিরভাগ সময় মেতে থাকি এবং আমাদের কল্পনা, সাধনা সীমিত বা সীমাবদ্ধ থাকে। তার পরের স্তর সম্বন্ধে আজকে বলা হবে, অর্থাৎ এই দেহ কার দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা প্রাণ শব্দটা ব্যবহার করি কিন্তু প্রাণের যথার্থ পরিচয় কতগুলি ক্রিয়া এবং তার প্রকাশভঙ্গিমা ছাড়া জানার উপায় নেই। তার কারণ, প্রাণ একটা বায়ু বা bio-energy। Energy কেন? তার গতি ও ক্রিয়া আছে, কিন্তু রূপ নেই। একটা রূপ বা দেহাধার অবলম্বন করে গতি ও ক্রিয়া হয়। কাজেই প্রাণের জন্য আধার দরকার হয়, তাই দেহ। কাজেই এই যে দেহ, যাকে নিয়ে আমরা আজীবন চলাফেরা করি, কাজকর্ম করি এবং সংসারধর্ম পালন করি সেই দেহের সমস্ত দায়িত্ব প্রাণের হাতে। প্রাণ নিস্তেজ বা বিকৃত হলে শরীর অসুস্থ হয়। গতি, ক্রিয়া, ক্ষুৎপিপাসা এবং ক্ষয়-বৃদ্ধি—এগুলি হল প্রাণের ধর্ম।

'এ' আস্তে আস্তে আবার ধর্মের ক্ষেত্রে আসছে। কালকে বলা হয়েছিল যে, দর্শন, বিজ্ঞান আর ধর্ম এই তিনটে একটাই মাত্র formula, কিন্তু আমরা সেই এক-এর সন্ধান জানি না বলে পৃথক পৃথক ভাবে তার ব্যবহার করি। দার্শনিকরা দর্শনের নানা মতবাদ নিয়ে মাতামাতি করে, ধর্মনেতারা নানা মতবাদের ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করে এবং বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান নিয়ে মাতামাতি করে। কিন্তু তিনটে যে কেউ কাউকে বাদ দিয়ে সিদ্ধ নয়, তা সবার কাছে সুস্পষ্ট নয়, অনুভবসিদ্ধ তো নয়ই। এই যে প্রাণের কথা বলা হল, এই প্রাণ কতগুলি ক্রিয়া ও গতির

সঙ্গে যুক্ত হয় নানা ভঙ্গিমায়। সেই ভঙ্গিমা আসে মনের থেকে। কাজেই মনের থেকে নির্দেশ না-আসা পর্যন্ত প্রাণ কিন্তু সক্রিয় হয় না। তাহলে মন কী? মনস্তত্ত্ববিদ্ যারা, তারা মনের অনেক রকম সংজ্ঞা দিয়েছে—সেগুলি সবার কাছে সুবোধ্য নয়। যারা চর্চা করে তারা তা হয়ত বুঝতে পারে, কিন্তু অপরে পারে না।

প্রত্যেকেরই প্রাণ, দেহ ও মন আছে। কী করে তার সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়ে আছি তা হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করি না বা খেয়াল করি না। একমাত্র অনুভবসিদ্ধপুরুষ অর্থাৎ যাঁরা সেই সম্বন্ধে সচেতন তাঁরাই fully aware of it, directly conscious of physical, vital and mental activities। কল্পিত কল্পনা দিয়ে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। দেহের থেকে প্রাণ আরও সূক্ষ্ম; প্রাণের থেকে মন আরও সূক্ষ্ম, আরও ব্যাপক। মন দেহকে ছাড়িয়ে চলে যায় দেহের বাইরে। মন দেশদেশান্তর ঘুরে বেড়িয়ে আসে, তার কল্পনার গতি অনেক দূর। মনের গতি বায়ুর চাইতেও দ্রুত, কথায় কথায় তা বলা হয়। এই যে প্রাণ, তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে। কারণ আধার যেখানে আছে, আকার যেখানে আছে অর্থাৎ স্থূলতা যেখানে আছে সৃষ্টির মধ্যে, সেখানে প্রাণের ক্রিয়া সবসময়ই চলছে। হয়ত কোনও জায়গায় খুব মৃদু ভাবে, কোনও জায়গায় মন্দ ভাবে এবং কোনও জায়গায় তীব্র ভাবে। এই যে তীব্র ভাবে প্রাণের গতি এটা কিন্তু আমরা স্থূল দৃষ্টিতে ঝড়-তুফানের মধ্যে দেখি। যখন ঝড়-তুফান হয় কোনও জায়গায় তখন এই প্রাণবায়ু যে বেগে প্রবাহিত হয় সেই বেগকে সংবরণ করার মতো স্থূল জগতে দ্বিতীয় কোনও শক্তি নেই। বায়ুর এতখানি শক্তি! কিন্তু এই বায়ুকে control করার জন্য আরেকটা শক্তি আছে এই সৃষ্টির মধ্যে। অর্থাৎ প্রাণের আরেকটা রূপ হল অগ্নি। সেই অগ্নিকে প্রকৃতির মধ্যে সূর্যরূপে দেখি, আমাদের দেহের মধ্যে তা হল জঠরাগ্নি, প্রাণাগ্নি এবং তার পরিপূর্ণ রূপ পাই আমরা জ্ঞানাগ্নির মধ্যে। তা অনেক পরে আসবে, তা শুধু উল্লেখ করে রাখা হল, কেননা অগ্নির সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। এই যে প্রাণাগ্নি আমাদের মধ্যে আছে এই প্রাণাগ্নি নিস্তেজ হয়ে গেলে তাকে সতেজ করার জন্য কতগুলি ক্রিয়াকলাপের সাহায্য নিতে হয়। আজকাল অনেকেই তা হয়ত কিছুটা ধরতে বা বুঝতে পারবে। তার কারণ এখন physiotherapy বলে এক বিদ্যা প্রচলিত আছে, যা বহু আগে ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন। তখন চালু ছিল, মাঝখানে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, লোকে এর মর্যাদা দেয়নি। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ডাক্তারদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, তোমরা খালি ওষুধ দিয়ে দেহকে ঠিক রাখতে পারবে না। অন্য আরও কতগুলো প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে তা জড়িত, তার সঙ্গে তোমরা যদি পরিচিত না-হও, only medicine is not enough to cure any defect, any disease of the physical body। এ কথা শুনে তারা বলেছিল, সে কী! তখন তাদের বলা হয়েছিল, কতগুলো প্রক্রিয়া, কতগুলো দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালনা, তার স্থিতি অবস্থা এবং গতি অবস্থা দুটো নিয়ে। স্থিতি অবস্থায় তাকে বলা হয় আসন আর গতি অবস্থায় তাকে বলা হয় freehand exercise। আর একটা হচ্ছে খেলাধুলা। কিন্তু এই তিনটের তিন রকম গুণ, তিন রকম ফল।

খেলাধূলার মাধ্যমে আমাদের প্রাণের গতি বাড়ে, তার দ্বারা দেহের মধ্যে রক্তের সঞ্চালন করে এবং গতি বেড়ে যায়। তার ফলে আমাদের দেহের অনেকগুলি বিকার সংশোধিত হয়ে যায় এবং ওষুধের দরকার হয় না। আসনের মাধ্যমে স্থিতি অবস্থা আসে। তার ফলে কী হয়? আমাদের অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যে-সমস্ত gland আছে সেই glandular function এবং tissue function-এর মধ্যে যে বিকার তার পরিবর্তন হয়, আসনের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে cure হয়। তা আবিষ্কৃত হয়েছিল বহু যুগ আগে। এর নাম দেওয়া হয়েছিল হঠযোগ। এই হঠযোগের কথা আজকাল অনেক বইতে প্রকাশ হচ্ছে এবং ডাক্তাররাও আজকাল এই physiotherapy-র সাহায্যে রোগীকে সুস্থ করার জন্য চেষ্টা করছেন। এগুলি সবই কিন্তু apparent nature-এর মধ্যেই পড়ছে, তার সঙ্গে 'এ' আজকে inner nature-এর যোগাযোগ সম্বন্ধে বলবে, অর্থাৎ কী ভাবে outer nature conducted and governed by the inner nature। Inner nature-এর function-গুলি লক্ষ্য করলে তার গুরুত্ব, মহিমা ও তাৎপর্য নিশ্চয়ই ধরা পড়বে। এই যে আমরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করি, হাঁটাচলা করি, বসি, কর্ম করি—এগুলি সবই প্রাণশক্তি বা bio-energy-র দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই bio-energy আমাদের শরীরের প্রতিটি তন্ত্রে তন্ত্রে স্নায়ুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দেহকে active বা সতেজ রাখে। কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যদি তার চলাচল কোনও কারণে ব্যাহত হয় তখন তার সক্রিয়তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন ও বিকার ঘটে এবং তখন শরীর অসুস্থ হয়। এর কতগুলো কারণ আছে। আমাদের দেহের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় নানা কারণে তা পূরণ করার জন্য আহারের থেকে কিছু অংশ প্রাণশক্তি সংগ্রহ করে জঠরাগ্নির সাহায্যে। অর্থাৎ আমাদের দেহের ভিতরে যে প্রাণাগ্নি, জঠরাগ্নি আছে, pancreas function আছে তার মাধ্যমে আমাদের এই দেহের কতগুলো order-কে বা discipline-কে সক্রিয় রাখে। 'এ' medical science পড়েনি, বই-টই কিছুই পড়েনি। তা যারা পড়েছে তারা হয়ত বলবে, তাহলে আপনি এগুলো অনর্গল বলছেন কী করে? 'এ' সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে যেখান থেকে সব জিনিসকে T.V.-র চাইতেও অনেক বেশি clear করে দেখা যায়। 'এর' আত্মসত্তার সঙ্গে সব জড়িত আছে বলে সেগুলি 'এর' কাছে objective ও subjective নয়, essential—সেইজন্য এগুলির সঙ্গে 'এ' জড়িয়ে আছে। আমার থেকে এগুলি আলাদা নয়, এগুলির থেকেও আমি আলাদা নই। সেই আমি-র কথাই কালকে উল্লেখ করা হয়েছে যেই আমি-র পরিচয় এখানে ধাপে ধাপে সবার সামনে clear করে দেওয়া হবে। সেই আমি সমস্ত আমি-র মূল এবং সমস্ত আমারবোধের/ভাবের মূল উৎস ও সাক্ষী। এই প্রসঙ্গে একটা গানের মধ্যে একটু উল্লেখ করা হয়েছে। 'এ' তাও define করবে। কিন্তু মুশকিল হল এগুলি বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অল্প সময়ের মধ্যে তা clear করে বলা একটু অসুবিধা হয়, অনেকগুলো point undefined থেকে যায় সময়ের অভাবে। তবু যতটা সম্ভব বলবার চেষ্টা করা হবে। তারপর নিজের মধ্যে নিজেই সন্ধান ক'রে প্রত্যেকে তা আবিষ্কার করতে পারবে। তার fundamental ground-টা কী, তা আগে clear করা দরকার।

এই যে প্রাণ, মাথার থেকে পা পর্যন্ত সর্বত্র সক্রিয় সর্ব অবস্থায়, ঘুমিয়ে পড়ছে যখন তখনও একমাত্র প্রাণই জেগে থাকে, আর কেউ নয়। মন জেগে থাকে না, মন ঘুমিয়ে পড়ে। প্রাণ সমস্ত দেহের কার্যকে পরিচালনা করে। তার ফলে আমাদের দেহ সক্রিয় থাকে। এই যে প্রাণ সক্রিয় হয় তাও কতগুলি division দিয়ে, ভাগ করে করে এক এক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্রিয়া করে। উর্ধ্বাঙ্গে, মধ্যাঙ্গে এবং নিম্নাঙ্গে তার কতগুলো divisional function আছে। যারা পূজা অর্চনা করে, আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত তারা জানেন পঞ্চপ্রাণের কথা। এই পঞ্চপ্রাণ দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তাদের স্বকীয় ভঙ্গিমায় সক্রিয় হয়ে দেহের সমস্ত কার্যকে পরিচালনা করে। সেই সম্বন্ধে detail-এ বলতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হবে, তাই তা শুধু উল্লেখ করা হচ্ছে। এগুলো অনেকেই হয়ত জানে, বই পড়েই হোক বা কারও কাছে শুনেই হোক। কেননা প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—এই পঞ্চপ্রাণ আমাদের দেহের সমস্ত ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে, আমরা সচেতন থাকি আর নাই থাকি।

অপানের কাজ হচ্ছে নিম্নাঙ্গে, অর্থাৎ আমাদের দেহের থেকে মল, মূত্রকে বাইরে নির্গত করতে সাহায্য করে এবং প্রাণ যাতে বাইরে বেরিয়ে না-যায় তাকে টেনে ধরে রাখে, এই হল অপানের কার্য। এই অপান যখন দুর্বল হয় তখন আমাদের নিম্নাঙ্গের বহুরকম বিকার বা ব্যাধি হয় এবং প্রাণ তখন খুব নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মৃত্যু হয় তারই কারণে। তার উপরে রয়েছে সমানের কাজ, অর্থাৎ নাভিকেন্দ্রে যে প্রাণের ক্রিয়া, pancreas function সবার আগে হয়। বাইরে থেকে যে আহার আমরা গ্রহণ করি স্থূল, সূক্ষ্ম, জলীয় সবরকম আহার তার ফলে pancreas function-এর মাধ্যমে কতগুলো secretion হয়। সেই secretion দিয়ে সমস্ত খাদ্যকে তৈলাভ করে নিয়ে তার মধ্যে থেকে sorting করে protein content part, fat content part and liquid content part দেহের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। এর থেকে কী তৈরি হয়? এর থেকে তৈরি হয় আমাদের brain, mind, প্রাণ, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা এবং রস— শরীরের fluid-গুলো পৃথক পৃথক ভাবে তৈরি হয়। এগুলোর division খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার। Protein content food -এর সূক্ষ্মতম অংশ মন/অহংকারকে পুষ্ট করে ও সতেজ রাখে, সূক্ষ্মতর অংশ মাংসপেশী ও স্নায়ুতন্ত্রীকে পুষ্ট করে, সূক্ষ্ম অংশ মলরূপে (বিষ্ঠা) বাইরে নির্গত হয়। Fat content food-এর সূক্ষ্মতম অংশ brain বা বুদ্ধিকে পুষ্ট করে, সূক্ষ্মতর অংশ মেদ ও মজ্জাকে পুষ্ট করে এবং সূক্ষ্ম অংশ থেকে অস্থি, নখ, দাঁত, চুল প্রভৃতি পুষ্ট হয়। Liquid content food-এর সূক্ষ্মতম অংশ থেকে প্রাণ পুষ্ট হয়; সূক্ষ্মতর অংশ থেকে রস, রক্ত ও জলীয় অংশ পুষ্ট হয় এবং সূক্ষ্ম অংশ ঘর্ম ও মূত্ররূপে নির্গত হয়। 'এ' খুব সংক্ষেপে একটুখানি indicate করছে, কেননা প্রসঙ্গ এই দিকে নিয়ে গেলে it would become a very limited and partial discussion। 'এর' বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল সমস্ত জিনিসের essence-এ নিয়ে যাওয়া। কাজেই একটা subject-কে special ভাবে বলতে গেলে হয়ত অনেকের কাছে তা খুব interesting হতে পারে, কিন্তু তাতে আসল জিনিসে পৌঁছোতে সময় লাগবে, যে সময়টা এখানে পাওয়া যাবে না।

এই আহারকে আমাদের শরীরে যথার্থ ভাবে division বা ভাগ করে সমান বায়ু তাকে যথার্থ স্থানে পৌঁছে দেবার জন্য তৈরি করে রাখে আর ব্যান বায়ু তা সমস্ত শরীরে circulate করে অর্থাৎ যেখানে যা পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। এত subtle function আমাদের শরীরের ভিতরে হয় যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়েও কিন্তু সবসময় তার reading পাওয়া যায় না। কিন্তু ধ্যানে অবস্থিত সূক্ষ্ম শুদ্ধ সংস্কৃত মনের দ্বারা আমরা এর প্রত্যেকটি reading পেতে পারি একেবারে in detail, যা apparatus-এ ধরা পড়ে না। কিন্তু সেই বিদ্যা চর্চা না-করলে তো তা দখলে আসবে না। সেইজন্য আজকাল পাশ্চাত্য দেশে *Yoga* philosophy এবং *Yoga* therapy নিয়ে বিশেষ ভাবে research চলছে। এখান থেকে যে যোগীরা গিয়েছেন তাঁদের পয়সাকড়ি দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে এই বিদ্যাকে দখল করে নিয়ে তারা বলছে, এবার তোমরা চলে যাও, আমাদের কাজ হয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশের লোকেরা আবার তাদের কাছ থেকে সেই বিদ্যা নিচ্ছে। এটাই 'এর' বক্তব্য, যেজন্য maximum লোকের সঙ্গে মিশে তাদের inspire করার জন্য খালি এই একটা কথাই বলা হয় যে, তুমি তোমার নিজের জিনিসকে ভুলে যে want feel করছ, অভাব বোধ করছ, সেই অভাব পূরণের জন্য বাইরে থেকে যে সাহায্য নিচ্ছ তা হল তোমার false movement। তুমি নিজেই self-sufficient, সব জিনিস নিজের মধ্যেই খুঁজে পাবে, be conscious about it, be alert about it, be concentrative। তুমি নিজের মধ্যে নিজেকে সন্ধান কর you will discover the complete science which can save not only you but also the humanity as a whole। মানুষের যে কী অভাব তা সে নিজেই জানে না অজ্ঞানবশত। তা বাইরের জগতের কতগুলি information নয় বা বাইরের জগতের কতগুলো object বা বিষয় নয়। That is right understanding, right knowledge, pure light, which can unfold the truth—gross, subtle, subtler, subtlest and that can illumine the entire universe in detail within and without, without any exception. 'এ' strongly কথাগুলো রাখছে। যদি কারও সত্যিই কিছু জিজ্ঞাসা থাকে সে এই কথার মধ্যে নিশ্চয়ই find out করতে পারবে, না-পারলেও তার answer 'এ' একে একে দিয়ে যাবে। Because this is a science which unfolds the truth—outer, inner, central and transcendental.

একমাত্র জ্ঞানই সেই উপাদান যা সব কিছুকে প্রকাশ করে। জ্ঞানের মধ্যে অপ্রকাশ্য কিছু নেই, nothing remains unmanifested, undecided and unestimated. Knowledge is that substance which is eternally all perfect, all luminous, self-sufficient, self-existent, infinite, homogeneous One without a second. The discovery of this Knowledge is the highest discovery which is called *Brahmajnana/Atmajnana*, beyond which there exists nothing else. ব্রহ্মজ্ঞান/আত্মজ্ঞান অতিরিক্ত কিছুই নেই। কাজেই যেখানে কিছু নেই তাও প্রকাশ করছে

এই জ্ঞান। The Knowledge unfolds the truth of absence of all, at the same time the presence of all and simultaneously the functions and the results thereof. আজকে প্রসঙ্গটা বলতে বলতে একটু side-এর অংশ নিয়ে বলা হয়েছে, যাতে এর পরে সবার পক্ষে কথাগুলো ধরতে সুবিধা হয়। কারণ প্রসঙ্গ এত subtle যে তা স্থূলের দৃষ্টিতে সবার কাছে কিছুটা focus করে আস্তে আস্তে সূক্ষ্মতে নিয়ে যেতে হবে। Actually এর কোনও mechanical process নেই। এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই সবার কাছে যাবে। কারণ বাক্‌ব্রহ্ম is the only means and process which can unfold the truth of *Brahman/Atman* Itself, because *Brahman* reveals in and through *Vak*। সেইজন্য অনুভবসিদ্ধপুরুষ বাকের মাধ্যমে ব্রহ্মতত্ত্ব সবার কাছে প্রকাশ করেন। যদিও বলা হয়েছে ব্রহ্ম-আত্মা বা Supreme Reality is beyond the range of mind and intellect, কিন্তু তা শুদ্ধ মনের গোচর। Pure mind is identified with the Divine Self and unfolds its essential nature in and through *Shuddha Vak*. আদিকাল থেকে আমরা দেখে আসছি মুনি ঋষিরা পরস্পরকে বাকের মাধ্যমেই inspire করেছেন, enlightened করেছেন। দ্বাপর যুগেও আমরা দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে বাক্য দিয়েই inspire করলেন, তার ভুলভ্রান্তি শোধন করে দিয়ে enlightened করলেন for the said purpose। সেই purpose কী? তাকে fight করতে হবে কার against-এ? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কেবলমাত্র কতগুলো দেহনাশ নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হল অজ্ঞানকে কী করে নাশ করা যায় জ্ঞানের দ্বারা তার একটা specific example ।

আমাদের body অজ্ঞানের মধ্যে পড়ে, কাজেই body-র নাশে আমাদের আত্মার নাশ হয় না। সেইজন্যই বলা হয়েছে যে, আত্মা অজর অমর অপাপবিদ্ধ, আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। আত্মা অমৃতস্বরূপ, তাঁর মৃত্যু নেই। অবিনাশী আত্মা, বিনাশী দেহ। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, অর্জুন তুমি কার জন্য শোক করছ? তোমার শোক করার কোনও যথার্থ তাৎপর্য নেই! তুমি কাকে মারবে? কে মরবে? তুমি দেখ, আমি এদের আগেই মেরে রেখে দিয়েছি, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। Because it is a game, you have come to participate in the game with Me, so follow Me and you will not be disturbed and affected. কী beautiful তাঁর conception। 'এ' সেই বিষয়ে আস্তে আস্তে আসবে, পরে অন্তর্নিহিত বিষয় clear করা হবে। The speaker of the *Vedas*, the unfolder of *vedic* truth as *Vedanta*, its publication, the realization and the result thereof, all verily are One which is I-Reality. This I is the eternal Essence, the ultimate Substratum of all manifestations and creations in all levels and in all portfolios. সেই আমি ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর যিনি সত্যকে প্রকাশ করেন as it is, not as it appears। এই appearance-এর ভার হচ্ছে প্রকৃতির, as it is-এর ভার হচ্ছে স্বস্বরূপের হাতে অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশক আত্মার হাতে। স্বয়ংপ্রকাশককে প্রকৃতি প্রকাশ করতে পারে না।

সেখানে প্রকৃতি কিন্তু সত্তার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে রয়েছে। অনেকেই শুনেছে অর্ধনারীশ্বরের কথা। শিব আর শক্তি অভিন্ন। সেই তত্ত্ব কিন্তু খুব সহজবোধ্য নয়, where becoming has become unified with the Being, the Absolute. There becoming has no seperate function, no seperate entity, no seperate intention. এখন becoming Being-এর বক্ষে কী করে হয় সেই প্রসঙ্গ আসবে অনেক পরে। The Being appears to be becoming. সত্তা কী করে শক্তি হয়ে বহুরূপ ধারণ করেছে, বহু রূপ ধারণ করেও বহুর মধ্যে সে একই রয়েছে। যেমন প্রত্যেকটি মানুষের ভিতরে তার আমি শৈশব থেকে আরম্ভ করে innumerable stage-এর মধ্যে দিয়ে আসছে—কত ভাব, ভঙ্গিমা, ক্রিয়া, ঘটনা সব কিছুর সাক্ষী সে। He cannot measure himself because his inner being, his true being is infinite, though it remains covered by self-generated lower nature. নিজের অহংকার অভিমান দ্বারা সে আবৃত হয়ে আছে। This is called self-hypnotism. জীবভাব হল self-hypnotized আত্মা, অর্থাৎ নিজেরই কল্পিত মনের দ্বারা নিজেকে নিয়ে সে যখন খেলছে, খেলতে খেলতে সে স্বরূপের কথা ভুলে গিয়েছে। কেননা মন নিয়ে খেলতে গেলে মনের একটা aspect হচ্ছে forgetfulness। মনের দশটা বৃত্তির মধ্যে একটা হচ্ছে ভ্রান্তি বা সংশয়। 'এ' সেই প্রসঙ্গ এর আগে এখানে উল্লেখ করেছে, সেই প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই আরও কিছু উল্লেখ করতে হবে। দশটা বৃত্তি দিয়ে মন গড়া। কাম অর্থাৎ desire; সংকল্প হচ্ছে resolution; বিচিকিৎসা হচ্ছে সংশয় বা doubt; ধৃতি, অধৃতি অর্থাৎ fortitude, non-fortitude অর্থাৎ ধারণ করার শক্তি, এছাড়া আছে শ্রদ্ধা (regard), অশ্রদ্ধা (disregard), হ্রী (shyness), ভী (fear), ধী (talent)। হ্রী মানে লজ্জা, ভী মানে ভীতি, ধী মানে মেধা (talent/wisdom)। এই analysis যদি 'এ' করতে যায় তাতে যে সময় লাগবে সেই সময়ে এই পৃথিবীর মানুষের সমস্ত mental science will become clear, which other countries know not। তাদের psychology কিন্তু একটা part। আমাদের যে মনোবিজ্ঞান, এই মনোবিজ্ঞান ব্রহ্মতত্ত্বের বা আত্মতত্ত্বের সঙ্গে allied. It is not limited by material nature or our outer nature.

পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই outer nature-এর সঙ্গে, physical body-র সঙ্গেই connected. Freud তো কতগুলো diseased persons নিয়ে research করেছেন, সেটা তো limited function. What about the everfree saintly persons? Freud knows nothing at all about them. এ বিষয়ে কিছুই জানা নেই সে দেশের বিজ্ঞানীদের। তারা এখন জানছে আমাদের যোগবিজ্ঞানের মাধ্যমে। এখন এই যে প্রাণের ক্রিয়া কথা প্রসঙ্গে আসছে তা আমাদের ভিতরে কী করে ক্রিয়া করে? এই pancreas-এর function উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, দেহ চালাচ্ছে কে? প্রাণবায়ু। কী ভঙ্গিমায়? সে আমাদের toe to top of the head, crown of the head, সমস্ত জায়গায় যে organic function হয়ে চলছে সেখানে কী করে সে সব পরিচালনা করছে? তার বিজ্ঞানটা কী? এটা যেমন

individual-এর দেহের মধ্যে অর্থাৎ প্রত্যেকের দেহের মধ্যে সক্রিয় আছে, তেমনই universal দেহের মধ্যেও আছে। কাজেই এই ভারতে বিজ্ঞান শুধু individual একটা aspect of nature-কে নিয়ে নয়, তা সবকিছুকে নিয়ে। সমগ্র সৃষ্টিকে ব্যেপে আমাদের এই ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা, যেখানে পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞান is mere in a preparatory stage। ওদের দেশের বিজ্ঞানীরা যখন 'এর' সঙ্গে meet করেছিল তখন বলা হয়েছিল, দেখ 'এ' তো তোমাদের পুঁথিপত্রের থেকে কোনও quotation দিতে পারবে না। But what I have studied, what I have acquired from the inner nature, outer nature, central nature and transcendental nature of life, I can freely unfold that to you. But if you are not attentive and concentrative you will never be able to follow Me, because I will not give you any conventional formula. তারা শুনতে শুনতে বলল, how could you invent all these things? উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, it is not book knowledge, it is spontaneous and revelation, it is not creation. Creation is nothing but an expression of the spontaneous revelation of the Absolute Being. কাজেই becoming-এর একটা part হচ্ছে creation, other parts রয়েছে behind the creation, which is not known to the people of this world। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুনিঋষি ছাড়া এই সম্বন্ধে কেউ গবেষণা করে কিছু পায়নি। কিন্তু তাঁদের কাছে যখন সেগুলো মানুষ শুনতে গিয়েছে তখন অবাক হয়ে ভেবেছে, একী কথা বলছেন? এগুলো তো কিছুই জানি না! কাজেই কথাপ্রসঙ্গে এই যে life-এর কথা এসে গেল আজকে matter-এর মধ্যে, প্রাণের function-টা হয় life-এ। Inner nature মানে life science। এই life science-এর মধ্যে প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার—অন্তঃকরণ নিয়ে এই inner science। কাজেই এখানে প্রাণতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব এবং বুদ্ধিতত্ত্ব বা বিজ্ঞানতত্ত্ব—এই চারটে তত্ত্ব মিলে হচ্ছে ঈশ্বরতত্ত্ব।

'এ' outer-এ প্রকৃতির থেকে আসবে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে, জীবনের ক্ষেত্রে। এই জীবন বিস্তৃত হচ্ছে from the tiniest creature to the creator Himself। ব্রহ্মা অর্থাৎ স্রষ্টা বা ঈশ্বর, যিনি এই সৃষ্টির সঙ্গে connected, তা হল Universal Consciousness and mind। তার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে all individual Consciousness and mind. Individual universal-কে জানে না। তার সামনে একটা বিরাট ক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছে—অনন্ত রূপ, নাম, ভাব। সে তার পরিধি মাপতে পারছে না। সমুদ্রের বক্ষে বসে সে দেখছে এই অনন্ত জলরাশি তরঙ্গায়িত হচ্ছে, তার কত লহরী, বুদ্‌বুদ্‌ ও ফেনা। আবার ঝড়ের সময় তা rolling করছে। যারা সেই সময় জাহাজ থেকে দেখেছে সমুদ্রের রূপ অর্থাৎ rolling of the ocean তারা জানে যে সমুদ্রের সে কী ভয়ঙ্কর রূপ, তার outer surface-এর রূপ অশান্ত, আবার তলদেশে প্রশান্ত শীতল সমাহিত। আমাদের জীবনেরও বহির্ভাগ হচ্ছে restless, turbulent, সবসময়ই চঞ্চল অস্থির গতিময়, শান্ত হতে জানে না—একমাত্র ঘুমের সময় একটুখানি শান্ত থাকে। তাও ঘুমের মধ্যে study করে দেখা গিয়েছে যে, তার মধ্যেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ে।

এই যে প্রাণের ক্ষেত্রে আমরা এলাম, প্রাণকে চালনা করছে মন। মন কী? পূর্বোক্ত দশটা বৃত্তি দিয়ে মন গঠিত। যে বৃত্তি যখন প্রধান হয় তখন সেই ভাবে আমাদের দেহের function, জীবনের function চলতে থাকে। কিন্তু এই দশটা বৃত্তির মধ্যে চারটে বৃত্তি তামসিক, তিনটে বৃত্তি রাজসিক আর তিনটে বৃত্তি হল সাত্ত্বিক। সেই প্রসঙ্গে আরও পরে বলা হবে। অত detail-এ গেলে অনেক point অসমাপ্ত থেকে যাবে। এই মনকে নিয়ন্ত্রণ কিন্তু মন নিজে করতে পারে না। মনের যে সংকল্প-বিকল্প তা mechanical ভাবে হয়ে থাকে। মনের ইচ্ছা আসছে আরও পশ্চাত থেকে—ঐ determinating faculty, that is from the intellect, intelligent part অর্থাৎ বিজ্ঞান। অন্তরের চারটে বৃত্তি—মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত। এই চারটে একত্র করে হচ্ছে অন্তঃকরণ। করণ মানে instrument, করণ মানে sense। অন্তরের তাও কিন্তু একটা sense, inner sense। আর তা আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে focus হয় বলে আমরা এই দেখা-শোনা-জানা-চলাফেরা করতে পারি, কিন্তু তা function না-করলে পারি না, সব নিস্তেজ হয়ে যায়। প্রাণের ধর্ম বলতে গেলে এর আগে যা বলা হল, ক্ষুধা যে পায় আমাদের, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গতাগতি, ক্ষয়, বৃদ্ধি—এই ছয়টা বৃত্তি হচ্ছে প্রাণের ধর্ম। মনের ধর্ম দশটা বৃত্তি, বুদ্ধিরও ধর্ম দশটা বৃত্তি, অহংকারের ধর্মও দশটা বৃত্তি। এখন সেই প্রসঙ্গ বলতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হবে, তা শুধু উল্লেখ করা হচ্ছে। সময়মতো প্রয়োজনমতো সে সম্বন্ধে যেটুকু বলা দরকার সেটুকু বলা হবে। I only want you to be conscious and aware of your inner nature which is not known to you at present. The more you listen to My words the more you will be conscious and aware of your inner nature. এই হচ্ছে শুধু শ্রুতির বিজ্ঞান। এখানে ক্রিয়াকলাপের বিজ্ঞান 'এ' আনছে না। Because for perfection you require right knowledge and knowledge does not depend on action, knowledge is independent, self-revealed, self-evident and self-abiding.

জ্ঞান স্বতন্ত্র স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংপূর্ণ, কর্ম বা ক্রিয়া অর্থাৎ পূজা-উপাসনাদি কিন্তু আপেক্ষিক, ক্রিয়া কিন্তু conditional and limited। এখন limited অবস্থায় জাত ও বর্ধিত হয়ে মানুষ জ্ঞানস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে সসীম, বিকৃত, অবিদ্যা-অজ্ঞানের অধীন মনে করে এবং জ্ঞানকেও limited মনে করে। তা হচ্ছে মনের মনে করা—it is subject to condition and limitation of mind due to the fault of lower nature। কাজেই এই intellect-কে কী করে আরও প্রসারিত করা যায়, বিস্তৃত করা যায় তা-ই হচ্ছে আমাদের ভারতীয় সভ্যতা বা culture-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যদিও এই উদ্দেশ্য সকলেরই, পাশ্চাত্য দেশের বা পৃথিবীর সব দেশের মানুষই চাইছে নিজের বিস্তার, নিজের বিকাশ চাইছে, আরও জানতে চাইছে, আরও progress করতে চাইছে, কিন্তু সবটাই apparent nature-এ। তাদের inner nature কিন্তু schooled হচ্ছে না, abated হচ্ছে না, controlled হচ্ছে না। যার জন্য এই last 11th September-এর massacre-এর পরে অনেক কিছু এগিয়ে থেকেও আবার পিছিয়ে গেল। তরঙ্গ যতই উপরে উঠুক তাকে পড়তেই হবে, কাজেই outer

development, outer progress যতই উচ্চ শিখরে উঠুক it will have to fall down, nobody can save it। But your innermost development does not depend on all other conditions, limitations and outer discipline, it is self-sufficient. কাজেই নিজেকে যতক্ষণ মানুষ পূর্ণ ও মুক্ত বোধে না-জানতে পারবে ততক্ষণ বাইরের অশুদ্ধ মিশ্র মলিন বোধ বা জ্ঞান দিয়ে সে নিজেকে save করতে পারবে না, কারওকেই save করতে পারবে না, কারওর উপকার করতে পারবে না, patch work হতে পারে। ঐ যেমন আমরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে part by part নিয়ে মাতামাতি করি temporarily, কিন্তু তার integral science-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় না। কাজেই 'এ' ধর্মের ক্ষেত্রেও ধর্মকে নিয়ে আসছে Absolute-এ, বিজ্ঞানকে নিয়ে আসছে Absolute-এ এবং দর্শনকেও নিয়ে আসছে Absolute-এ যেখানে individual-এর কোনও credit নেই, কেননা individual is only an expression, only a small unit of expression of Consciousness Itself। এই individuality dissolve হবে Universal-এ গিয়ে। Universal dissolve হয়ে যাবে Absolute-এ and Absolute will remain as It is forever and that is your true identity।

প্রত্যেকের সত্য পরিচয় কী? তুমি অখণ্ড পূর্ণ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। তুমি অজর অমর অপাপবিদ্ধ অমৃতস্বরূপ অদ্বৈত। এই কথাগুলো দিয়ে মানুষকে inspire করে দিতে হবে, তার ভুল ধারণাকে সরাতে হবে। সে নিজেকে সসীম সংকীর্ণ ভাবছে। সে নিজেকে ভাবছে, আমি সীমিত, আমি finite, আমার limited capacity, limited আমার শক্তি, limited আমার জ্ঞান—এগুলি হচ্ছে অজ্ঞান। শিক্ষার যদি কোনও মূল্য বা প্রয়োজন থাকে, তাহলে আমার ভিতরে বা প্রত্যেকের ভিতরে যে আমারবোধের দ্বারা আমি রঞ্জিত হয়ে আছে সেই ভাবকে সরিয়ে দিতে হবে, to remove the limitation, condition of our understanding otherwise education is futile। কাজেই education-এর সংজ্ঞাই হল, education is the unfoldment or manifestation of perfection which is already in you and it is all-pervading।

প্রত্যেকের ভিতরে perfection দেওয়াই আছে—so education is unfoldment of perfection, manifestation of perfection which is already in all of you।তোমার মধ্যে মুক্তি, শান্তি, আনন্দ, পূর্ণতা, ইষ্ট, দেবতা সব নিহিত আছে হৃদয়ের গভীরে। কাজেই হৃদয়ক্ষেত্রে কী করে প্রবেশ করা যায় সেই বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞপুরুষের কাছে শুনতে হবে because that is the only science which can save the humanity as a whole from all sorts of meanness, shallowness, misfortunes and all kinds of our self-generated calamities। যত কিছু calamities হচ্ছে সবই কিন্তু আমাদের মনের বিকৃতির জন্য। বিরাট বিরাট সভ্যতা তৈরি হয়েছে এবং সভ্যতা যারা তৈরি করেছে তাদেরই মধ্যে some members against-এ গিয়ে তা নাশ করেছে। This is the history of apparent nature, this is the history of our mundane existence. অর্থাৎ এই ক্ষয়িষ্ণু জগতের, বিকারী জগতের, পরিণামী জগতের, নাম-রূপের জগতের এই হল ইতিহাস। 'এ' তা দিয়েই

আরম্ভ করেছে ঠিকই, কিন্তু তার মূলে যেতে হবে যেখানে বিকার নেই, কেননা সেখানে আকার নেই। তোমার real কোনও form নেই, যখন you are in form, you are in limitation, you are in condition which are controlled by the apparent nature, but when you know that you are beyond all these things, nature has nothing to do with you, তখন তোমাকে প্রকৃতি কিছুই করতে পারবে না। Nature becomes friend, nature becomes helpful to you. কাজেই সাধনার একটা বিশেষ স্তরে গেলে সমগ্র প্রকৃতি তোমাকে সাহায্য করবে, বিরোধিতা করবে না। প্রকৃতি তোমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে, guide করে নিয়ে যাবে। "প্রকাশং করোতি ইতি প্রকৃতি, প্রজ্ঞানং করোতি ইতি প্রকৃতি, প্রবুদ্ধং করোতি ইতি প্রকৃতি, প্রশান্তং করোতি ইতি প্রকৃতি।" তখন প্রকৃতি তোমাকে প্রশান্ত করে নিয়ে আসবে, প্রবুদ্ধ করে নিয়ে আসবে—it will make you enlightened। কী করে? তার সমস্ত parasites-গুলোকে সরিয়ে নেবে, তার গুণের বিকারগুলোকে সরিয়ে নেবে। সত্ত্বগুণের প্রকাশ দ্বারা তমোরজোগুণকে control করে সত্ত্বগুণকেও নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেবে। তখন সত্য স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হবে। গুণ তখন আর প্রতিবন্ধক হবে না।

গুণই হচ্ছে উপাধি, উপাধি হচ্ছে বন্ধন। এই গুণ তখন সরে যাবে, কাজেই তোমার ভিতরে তখন দিব্য nature, অর্থাৎ divine nature will reveal from within, not from outside। তখন outside-এর কোনও conception-ই তোমার থাকবে না। There is no in and out in your true nature. In and out is a mistaken conception of our lower mind. মন দিয়ে আমাদের মধ্যে কতগুলি বিকারের conception তৈরি হয়। তা স্থূল, তা সূক্ষ্ম, so and so, so and so—all these conceptions are mental conceptions। কিন্তু আত্মার conception তা নয়, *Atman* is eternally based on Oneness, Oneness of Knowledge and Knowledge of Oneness which never fails। অর্থাৎ 'নিত্যাদ্বৈতম্ স্বতঃসিদ্ধং স্বতঃস্ফূর্তং স্বয়ংপূর্ণম্ স্বসংবেদ্যম্ স্বানুভবদেব কেবলম্।' স্বানুভবদেব, অর্থাৎ Knowledge of Knowledge, not knowledge of space, time, causation, persons, things, actions and all natural phenomena. That is 'জ্ঞানস্য জ্ঞানম্ সত্যস্য সত্যম্'—এই হল তত্ত্বস্বরূপ। সে শুধু নিজেকে প্রকাশ করে, দ্বিতীয় বস্তু সেখানে না-থাকার জন্য দ্বিতীয় বস্তুর প্রশ্নই ওঠে না। "আত্মনি আত্মানং পশ্যতি নান্যৎ", অন্য কিছু সেখানে নেই, "নান্যৎ বা ন অন্যৎ", অন্য কিছু থাকতে পারে না। তোমার মধ্যে একমাত্র তুমিই আছ আর কেউ নেই, কিন্তু তোমার কতগুলো মনোবৃত্তি তোমাকে ঘিরে রেখেছে। তুমি মনে করছ, হায়, হায় আমি তো এ পারলাম না। এই তো এসে আমার মুশকিল করে দিল! মনের ভিতরে স্মৃতিটা এসে গোলমাল করল। All these are self-created, you have to control them. কী করে সেই control-টা আসে 'এ' সেই বিজ্ঞানটা সবার সামনে রাখছে। এর মধ্যে you will find your own science। 'এ' সেই অস্ত্রটাই সবার হাতে দিতে চাইছে যার মাধ্যমে, you see everything in and through

your own understanding and not that of others। এটা তোমার আপন জিনিস, তোমার সামনে তোমাকে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেননা you are One with Me, I am One with you। This is My *Dharma*. আপনকে প্রকাশ করাই 'এর' ধর্ম। আপন কী? The light of light, the Knowledge of Knowledge, the Self of Self. কাজেই এই যে আত্মার আত্মীয় কথাটা বলা হচ্ছে তার কারণ কী? আত্মা শুধু আত্মাকেই প্রকাশ করে, অনাত্মাকে প্রকাশ করে না। অনাত্মাকে প্রকাশ করে অনাত্মা, মন। মন বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করছে, আত্মা আত্মাকে প্রকাশ করছে, সেখানে মন থাকছে না। When you are in you, of you, from you, for you, by you, with you, to you, on you and beyond, beyond then where will remain the second entity? এই formula 'এ' একে একে তোমাদের সামনে রাখবে, দেখবে how wonderful it is! You will be enlightened more and more. তখন তুমি মনে করবে, তাই তো এই ভাবে তো কখনও ভাবিনি! এই ভাবে তো চিন্তা করিনি! এই ভাবে তো বুঝতে চেষ্টা করিনি! এ তো wonderful! আমি এতদিন কী ভুল করেছি! তখন তোমার এই false dream—dream of manyness, dream of duality ভেঙে যাবে; তখন no subject, no object, but only the Consciousness Itself which is beyond subject-object conception—It is eternally the witness of Itself and all else.

Witness is untouched, it remains as it is. Witness কখনও affected হয় না, affected হয় subject। কার দ্বারা? By object. যেখানে object-subject নেই, কে কার দ্বারা affected হবে? তখন ঘুমের মধ্যে তুমি যেমন Oneness-এ কিছুক্ষণের জন্য থাক যদিও তা not-knowing state, absence of manyness, কিন্তু in the presence of manyness also you will remain in the same state which is undisturbed, uncontaminated and unaffected। কার দ্বারা? By the Knowledge of Oneness. Knowledge of Oneness has no parallel. It is homogeneous, not heterogeneous. অর্থাৎ সবসময়ই সমবোধে থাকে। আকাশ যেমন সবসময় আকাশ হয়েই আছে, তাকে কেউ কোনওরকম ভাবে disturb করতে পারে না। আর বাইরে যে আকাশ দেখা যায় তা হল ভূতাকাশ, যার মধ্যে সমস্ত ভৌতিক সৃষ্টি অবস্থান করছে। কিন্তু এই সৃষ্টি অবস্থান করছে যেমন ভূতাকাশে, তেমন ভূতাকাশ অবস্থান করছে তোমার চিত্তাকাশে, in the mental sky, আর mental sky exists in your spiritual divine sky, that is in your Self. Self alone is real, all else are only imaginary concepts. তা 'এ' মুখে এখন বলছে, কিন্তু পরে তা সবার সামনে clear করে দেওয়া হবে।

তোমাদের কাছে কল্পনা করে তা বলার উদ্দেশ্য 'এর' নয়। 'এ' যে আমি-র পরিচয় পেয়েছে তুমিও সেই আমি-ই। তা-ই তোমাদের সামনে 'এ' রাখবে step by step. It will take some time because this science is very subtle and very delicate. এখানে গোঁয়ার্তুমির কোনও প্রশ্ন নেই, তর্কের কোনও scope নেই, আমি কতটুকু জানি বা না-জানি

সেই প্রশ্ন নেই—এগুলো সব কিন্তু futile। কেননা আমাদের জানাজানি ঘুমের মধ্যেও থাকে না। যখন concentrated হয়ে কাজ করি, তখনও আমার জানাজানি বা subject-object conception থাকে না। মন তখন একাগ্র হয়ে যায়। এই মন আমাদের উপর রাজত্ব করছে, আসলে মন থাকবে গোলাম হয়ে, পোষা কুকুরের মতো। এখন আমরা মনের দাস হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, দেহের দাস হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি নিজের সত্য মুক্ত দিব্য অমৃতস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে। দেহকে তুষ্ট, পুষ্ট ও তৃপ্ত করার জন্য এবং ঘুম ও আরামের জন্য আমরা সমস্ত energy ঢেলে দিচ্ছি—this is one aspcct of life। 'এ' তা অস্বীকার করছে না। এই প্রসঙ্গ দিয়ে কালকে start করা হয়েছে। তা থেকেই তোমাদের দেখাবো যে, এই দেহের মধ্যেই রয়েছে আরেকটা দেহ অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহ। তার মধ্যে রয়েছে সেই কারণ দেহ, তৃতীয় দেহ। তার উপরে তুমি দেহাতীত "দেহস্থোঽপি দেহাতীতম্"। আজকে আমরা এই ঘরের মধ্যে এসে কিছু সময়ের জন্য সবাই বসে আছি, কিন্তু চিরকাল এখানে থাকার জন্য আমরা আসিনি। একটু পরেই আমরা এখান থেকে সবাই চলে যাব, সেইরকম এই দেহটা ব্যবহার করছি। আমরা তার বিজ্ঞান জানলে পরে এই দেহকে যেখানে খুশি সেখানে রেখে দিয়ে আমরা মুক্ত ভাবে চলতে পারব শুদ্ধ আত্মবোধে। আমাদের mind-টাই যাচ্ছে। মন এই দেহের মধ্যে থেকেও দেহের থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। তা না-হলে তুমি ভিন্ন ভিন্ন দেশ-বিদেশের চিন্তা কী করে করতে পারছ এই দেহের মধ্যে থেকে? It is so finite and limited but your mind can think so many things outside your body. তাহলে সেটা সূক্ষ্ম দেহ। সেই সূক্ষ্ম দেহও limited to some extent। তার পরে কারণ দেহ, অর্থাৎ causal body। সূক্ষ্ম দেহ হল মানস দেহ। Mental body-র পিছনে রয়েছে causal body। এই causal body unaffected হয়েই আছে। তাকে কেউ affect করতে পারে না। এই causal body-র অধীশ্বর হচ্ছেন ঈশ্বর। আর mental body ও gross body-র অধীশ্বর হচ্ছে জীব। এই জীবকে তার ঈশ্বরস্বরূপে নিয়ে আসতে হবে। কী করে? ঈশ্বরীয়বোধ তার মধ্যে জাগ্রত করে। তার পরে তাকে ঈশ্বরের ক্ষেত্র থেকে আরও উর্ধ্বে সেই পরমতত্ত্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে অর্থাৎ which is beyond duality, beyond all concepts of mind and intellect। বাক্যমনাতীত অবস্থায় সে monarch, the supreme Lord of all and beyond। He is One without a second. সে নিত্য অদ্বৈত, তার কোনও বিকল্প নেই, দুই নেই। কে তাকে স্পর্শ করবে? You are the king of all kings. You are the ruler of all rulers.

এই কথাগুলো বলে 'এ' কারওকে ধোঁকা দিচ্ছে তা যেন কেউ মনে না-করে। 'এ' আস্তে আস্তে সকলকে এই বোধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, সময় যতটুকু পাওয়া যায় তার মধ্যে। Step by step 'একে' বলতে হচ্ছে কথাগুলো, কেননা আগের stage-টা এসে আবার cover করবে। তা হয়ে থাকে অভ্যাসবশত। তা সরিয়ে দিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে হবে। আবার পূর্বের অবস্থা এসে cover করবে, তা সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কেননা আমাদের সংস্কার আমাদের বেঁধে রেখেছে, বুঝতে দেয় না, জানতেও দেয় না।

আমার দ্বারা কী করে হবে? আমি পারব না! আমার দ্বারা হবে না! আমরা প্রত্যেকেই একটা জায়গায় গিয়ে আটকে যাই। এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষার দোষ। ছোটবেলা থেকে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন ভাবে কতগুলো বিষয়ে ভয় ভীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সেখান থেকে সহজে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে না। এটা শিক্ষার demerits। 'এ' এর against-এ বহুবার বলেছে, কিন্তু এই ছোট একটা কণ্ঠের কথা সারা দুনিয়া প্রথমে শুনবে কেন? They would not listen to it. কিন্তু 'এর' মুখ বন্ধ করতে পারেনি। যারা মন দিয়ে শুনেছে তারা কিন্তু এটা মেনেছে। তারা বলেছে, this is wonderful, this is original but how can we become unified with this? 'এ' উত্তরে বলেছে, there is a process। তুমি ভেব না অমুক M.A. পাশ করেছে বলে আর কেউ M.A. পাশ করতে পারবে না। যখন একজন M.A. পাশ করেছে then there is a way, there is a process, there is a means in and through which others will also become qualified of the same। একজন যদি realize করে তবে অন্যেরা কেন পারবে না? 'এ' realized বলতে বোঝাচ্ছে the life which is fully identified with the Absolute। Partial realization is not realization, that is conception or perception in and through senses outer or inner. But realization is beyond and beyond that, there is no instrument, no medium and no agent at all.

নিজের পরিচয় যতক্ষণ আমরা কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা দিয়ে বলছি ততক্ষণ we are limited। কিন্তু যখন সাক্ষিরূপে বলছি তখন I am above all। সাক্ষিবোধ আমাদের মধ্যে আছে কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাক্ষী একটা part; মনের সাক্ষী আরেকটা part এবং বুদ্ধিরূপে জ্ঞাতা ভোক্তার সাক্ষী আরেকটা part। 'এ' প্রত্যেকটি stage part by part বলবে। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষী তো আমরা মোটামুটি ধারণা করতে পারি। আমরা অনেক সময় বলে থাকি—হ্যাঁ আমি চোখে দেখে এলাম! হ্যাঁ আমি কানে শুনে এলাম! কিন্তু আমাদের ভিতরে কর্তা-ভোক্তার যে সাক্ষী তাকে তো আমরা জানি না। কর্তা-ভোক্তার সাক্ষীকে তার সামনে ধরিয়ে দিতে গেলে তাকে আরেকটা science follow করতে হবে, যে science-টা মানুষের জানা নেই। তারা তথাকথিত ধর্মাচরণ করে দূর থেকে মনে করে, আমি খুব সাধনভজন করছি। একটা student class-এ ভর্তি হতে পারে। ভর্তি হলেই তার শিক্ষা হবে না, তাকে course complete করতে হবে, তার gap fillup করতে হবে। ধর্ম জগতে অনেকেই দীক্ষা-শিক্ষা নেয়, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। They don't follow the course further, তার বাকি অংশটা কেউ fillup করে না। তার ফলে তাদের মধ্যে যে অজ্ঞানের প্রভাব তা থেকেই যায়। তার ভাবনাচিন্তা, দুঃখ, কষ্ট, এগুলো সমস্ত as it is থেকেই যায় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। কিন্তু যেই বক্তব্য এখানে প্রকাশ করার জন্য এই শরীর নিয়ে 'এ' এসেছে সেই বক্তব্যটা কিন্তু not conventional science।

এই conventional science দিয়ে এই ধারণা কেউ আনতে পারবে না। এই science পেতে হলে one must be sincere and honest। তাকে যথার্থ devoted and

dedicated হতে হবে। কিছুটা devoted হয়ত অনেকেই আছে, কিন্তু dedicated নয়। সবার মধ্যেই dedication-এর অভাবই পরিলক্ষিত হয়। He must devote time and energy. কিন্তু কতখানি? যতখানি তার অজ্ঞান দূর করার জন্য প্রয়োজন, দেহবোধকে অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন, তার পারিপার্শ্বিকতাকে অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন, তার জানার যে গণ্ডিটুকু তা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন, তার ভ্রান্তিভীতিকে অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন এবং তার sense of individuality-কে অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন। যদি এই কথার দ্বারা কারও inspiration না-জাগে তবে 'এ' এর পরে আরও কড়া কথা ব্যবহার করবে। তা হয়ত অনেকের কাছেই মনঃপূত হবে না। কেননা অস্ত্রের পরেও অস্ত্র আছে। অজ্ঞানকে দূর করার জন্য অস্ত্র আছে। মিষ্টি কথায় যখন কাজ হয় না তখন সেই অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়। কাজেই সেই অস্ত্রটা মানুষের প্রকৃতির total ধ্বংসকে নিয়ে আসে। ধ্বংস হলে সে আর করবেটা কী! সেইজন্য সেই অস্ত্রটা ব্যবহার করার প্রয়োজন 'এ' বোধ করে না। কেন? দেখ, আমরা জগতে এমন কতগুলি মহামানবের জীবন পেয়েছি, তাঁদের ইতিহাস রয়েছে, যাঁরা সত্যের কথা বলেছেন, মানুষকে শাসন করার চেষ্টাও করেছেন, অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন, আবার অনেকে অস্ত্র প্রয়োগ করেননি। রাম, কৃষ্ণ প্রমুখ মহামানবদের অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধদেব, যিশুখ্রিস্ট, কবির, নানক, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেবকে অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়নি। তাঁরা জাগতিক অর্থে স্থূল অস্ত্র প্রয়োগ করেননি ঠিকই, কিন্তু আধ্যাত্মিক অস্ত্র অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা অপরকে অজ্ঞানমুক্ত করতে এবং জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন বা সাহায্য করেছেন। 'এ'ও কোনও অস্ত্র প্রয়োগ করছে না, কিন্তু 'এর' কাছে এমন একটা অস্ত্র আছে যেটা conventional অস্ত্র নয়, that is the Science of Oneness, তা মোক্ষম্ অস্ত্র। এই Oneness-কে কেউ ignore করতে পারবে না, কোনও মতেই নয়। অর্থাৎ কেউ নিজেকে কখনও deny করতে পারবে না। 'এ' সেখান থেকেই আরম্ভ করছে। নিজের পরিচয় সম্বন্ধে যা তুমি বল না কেন অর্থাৎ what you are at present তা কিন্তু তোমার সত্য পরিচয় নয়। এইটুকুই কি তোমার পরিচয়? তোমার স্বরূপ সম্বন্ধে যা বলা হল তা কি তুমি নও? তুমি তা ভুলে গিয়েছ। তুমি এই জায়গায় কি এই জিনিস করনি? এতদিন আগে তুমি কি এই চিন্তা করনি? তুমি কি এই কর্মটা করনি? তাকে আস্তে আস্তে past-এর দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর future-এর দিকে নিয়ে আসা হবে। তার dimension বাড়িয়ে দিয়ে বলা হবে, আগে যতখানি limited ছিলে তুমি এখনও কি ততখানি limited? This is the light of awareness! এই অস্ত্রের কাছে atom bomb কিছুই নয়। Atom bomb একটা জায়গায় blast হয়ে শেষ হয়ে গেল, তার পরে? It will not continue, but this process is eternal, it is endless, it will continually go on.

সত্যযুগেও আমি ছিলাম, ত্রেতাতেও আমি ছিলাম, দ্বাপরেও ছিলাম, কলিতেও আছি and in infinite future-এর মধ্যেও আমি থাকব। I am deathless. মৃত্যুরও মৃত্যু হয়ে

গিয়েছে। কী দিয়ে? By the light of Oneness, there death cannot exist and cannot function. 'এর' কথা প্রত্যেকের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু reaction করবেই প্রথম দিকে, তার পরে তাকে 'এ' আস্তে আস্তে channelize করবে। প্রথমেই channelize করা হবে না। 'এ' একটা focusing দিয়ে তোমাকে alert করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে আছ। তুমি বাস্তবের ক্ষেত্রে স্থূলের মধ্যে কতগুলো কল্পিত চিন্তার দ্বারা আবৃত হয়ে জীবনযাপন করছ। This is not your true identity, তুমি এই নও। তুমি নিজের পরিচয় দেবার জন্য বলছ, আমি অমুকের পুত্র, অমুকের মেয়ে বা অমুকের বাবা, অমুকের মা, অমুকের ভাই, অমুকের বোন, অমুকের বন্ধু, so and so, so and so—all these are relative। Relative মানেই হচ্ছে উপাধিযুক্ত। গাঢ় ঘুমের মধ্যে তুমি উপাধিমুক্ত, তখন কে থাকছে তোমার আপন? তার পরে যখন এই দেহ ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছ প্রিয়জনকে ছেড়ে, কই তখন তো তুমি consider করছ না যে, আমার প্রিয়জনদের যাদের আমি এত আদর করেছি তাদের ছেড়ে দিব্যি চলে যাচ্ছি—কই তখন তুমি তো consider করছ না! তারা কান্নাকাটি করছে। Nobody listens to it. সব অস্ত্রই কিন্তু 'এর' কাছে জড় হয়ে আছে। এই chapter 'এ' যখন open করবে তখন তোমরা প্রত্যেকেই কিন্তু অবাক হয়ে যাবে। তখন ভাববে, এ কী কথা! সত্যিই তো! যখন যার সময় হচ্ছে তখন সে চলে যাচ্ছে, কারও দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। যতক্ষণ থাকছে ততক্ষণ কত মায়া মোহ। এগুলো মনের বিকার। সবার সঙ্গে ব্যবহার করবে, কিন্তু মোহ-আসক্তি থাকবে না। Duty and responsibility কথাটা আমরা ব্যবহার করি, এই দুটোই কিন্তু অজ্ঞানের থেকে জাত। কিন্তু ঈশ্বর কি সত্যি সত্যিই obligation-এ আছে কারওর? আর তিনি না-থাকলে জগৎ বা সৃষ্টিটা থাকে কি? তাহলে আসল কর্তব্য কে করছে, ঈশ্বর না আমরা? মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ দ্বৈতবোধজাত ব্যষ্টি গুণ-ভাব-অবস্থাদি পূরণের নিমিত্ত স্বার্থপ্রণোদিত। নিঃস্বার্থবোধে বা স্বার্থশূন্যবোধে যে কাজ তা দিব্যকর্ম, যোগযুক্ত কর্ম, বিষ্ণুযজ্ঞ, আত্মযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ। তার ফলে আপামর সমষ্টির শুভ মঙ্গল কল্যাণ নিঃশ্রেয়স্কর লাভ হয়। আমাদের কতটুকু শক্তি আছে, দায়িত্ব আছে, ক্ষমতা আছে? আর ঈশ্বর যিনি অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু তিনি এই একটা world নিয়ে কারবার করছেন না।

তোমার সেই শুদ্ধ মুক্ত পূর্ণ আমি-র পরিচয় যখন জানবে তখন অনুভব করবে যে, you are infinite। তোমার বক্ষে অনন্ত বিশ্ব ওঠে ভাসে ডোবে জলের বুদ্‌বুদের মতো, সাবানের ফেনার মতো। The mysterious universe is not only one but innumerable. অনন্ত বিশ্ব ওঠে জাগে ভাসে ডোবে বারেবারে। কোথায়? প্রশান্ত আমিসাগরে। The I Absolute is the most peaceful abode and the real existence in which innumerable universes rise, dance, play and dissolve just like the waves, ripples, foams and bubbles of the ocean. 'এ' লেখাপড়া শেখেনি, বাবা-মায়েদের সামনে 'এ' একবার না বহুবার এই কথা বলেছে। 'এর' কোনও book knowledge নেই।

'একে' কেউ কোনওদিন কিছু শেখায়নি, কেননা গরিবের ঘরে এই দেহটা জাত হয়েছে এবং দারিদ্রকে 'এ' মহা আশীর্বাদ বলে মাথা পেতে নিয়েছে। কেননা আজ যদি দরিদ্রের ঘরে না-জন্মে একজন অর্থবানের ঘরে জন্মাতাম তাহলে বোধহয় 'এর' ভিতরে এই বিকাশ হবার সুযোগ পেত না। কাজেই 'এর' কাছে তিনটে জিনিস সব চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ—এক হচ্ছে অভাববোধ, আরেকটা হচ্ছে অসহায়তাবোধ এবং তৃতীয় হচ্ছে অসম্ভব suffering। 'এ' সমগ্র দুঃখকষ্ট বেদনাকে মা বা গুরু বলে বরণ করেছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম কারওকে পাওয়া যাবে না যে দুঃখকে গুরু বা মাতৃবোধে গ্রহণ করেছে। 'এ' দুঃখকে মা বলে পেয়েছে বলে অন্তরে বেদনার ভিতরে বেদ জেগে উঠেছে। This is My august proclamation. 'এর' স্বকীয়তা এর উপরে base করে, 'একে' কিছু ভাবতে হয় না, ভিতর থেকে আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। This is spontaneous self-revelation. It does not depend on any law, any rule, any condition, any discipline and any formula. কাজেই কেউ যখন জিজ্ঞাসা করে তুমি এগুলো কোথায় পেলে, তখন উত্তরে বলা হয় তা 'এ' কোথাও পায়নি, 'এ' নিজেই তাই। এই কথা শুনে অনেকে বলেছে, কী করে তা সম্ভব? উত্তরে বলা হয়েছে, It is Reality. Reality-কে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, Reality, তুমি Reality কী করে হলে, এ তো অবান্তর প্রশ্ন। তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তুমি মা হলে কী করে? এ তো অবান্তর প্রশ্ন। তুমি বাবা হলে কী করে? তা living example, spontaneous এবং revelation।

আরও গভীরে যাচ্ছে 'এ'। একদিন অনেক জ্ঞানীগুণীরা 'একে' ঘিরে ধরেছিল। নানা angle থেকে 'একে' প্রশ্ন করেছে, মানে তাদের অধীনে যাতে নিতে পারে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আর 'এ' তো ছেলেমানুষের মতো, বাচ্চা ছেলের মতো হাসছে, তাদের কথার জবাব দিচ্ছে। কথাপ্রসঙ্গে তাদের বলা হয়েছিল যে, একটু শান্ত হও, ধীরে ধীরে বল। একসঙ্গে সব বললে 'এ' একটা মুখে তোমাদের সব উত্তর কী ভাবে দেবে? একজন একজন করে বল। 'এ' তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবে, কিন্তু তোমাদের ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করতে হবে, সবাই একসঙ্গে উত্তর চাইলে 'এ' দিতে পারবে না। নেমন্তন্ন বাড়িতে পরিবেষণ করতে গেলে যেমন line ধরে সবাইকে পরিবেষণ করতে হয়, তেমনই তোমাদের প্রশ্নের উত্তরও এক এক করে দেওয়া হবে। একসঙ্গে সবাইকে একজন কী করে দেবে? 'এ' তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবে, কিন্তু তার জন্যে তোমরাও তৈরি থেক। 'এও' কিন্তু তোমাদের একটা প্রশ্ন করবে। তার উত্তর যদি দিতে না-পার, তোমরা কিন্তু defaulter হয়ে থাকবে। 'এ' তোমার সব supply দেবে, কিন্তু তোমরা যদি পুরোটা নেওয়ার পরে 'এর' বক্তব্যের বিনিময়ে সেই জিনিস মানতে না-পার তাহলে তোমরা defaulter হয়ে যাবে। সেই অখণ্ড এক আমিকে তোমাদের মানতে হবে। তুমি যা ইচ্ছা কর তাতে কোনও আপত্তি নেই, ultimately you will have to surrender to the Absolute I who is the underlying essence of all lives। প্রতিটি জীবনের মধ্যে আমি বিরাজ করছি, আমিভাববোধরূপে।

'এ' কোনও শাস্ত্রের কথা দিয়ে তোমাদের বাঁধছে না। তোমাদের সত্য পরিচয়টা বলা হচ্ছে যেই ভঙ্গিমায় তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অভিনব and very fruitful, effective side by side। এর জন্য তোমাকে লক্ষ জন্ম তপস্যা করতে হবে না। শুধু মনের লক্ষ্যটা এক-এতে লাগাতে হবে, ব্যস্! তাহলে লক্ষ জন্ম তোমার cover হয়ে যাবে। Because in Reality you are what Self-I is, and you realize this under circumstances tending to press it down by your imaginary conceptions. কেন লক্ষ বছর তুমি নিজে গোল খাবে নিজের ভুলের জন্য? সেই অন্ধকারের belt-টা সরে গেলেই তো you realize yourself what you are. You are not a father of one child or two or three or four, or mother of one child or two or three or four, or brother or sister of one, two, three or relatives of one, two or three—you are the essence of all. তুমি হয়ত বলবে, কী করে তা সম্ভব? তোমার কুঁড়ে ঘরের যে আকাশটা, খড় দিয়ে ঘেরা যে তোমার ছাদটা, তোমার যে ছোট একখানা ঠাকুরঘর, ঐ ঠাকুরঘরে অতটুকুর মধ্যেই কি তোমার সেই all-pervading God limited হয়ে আছেন? তুমি কিন্তু যত্ন করে পটখানা রাখছ, ঘটখানা রাখছ, মূর্তিটি রাখছ আর মনে করছ this is mine। 'এ' সেই জায়গায় তোমাকে বলছে যে, তা তোমার মনের ভিতরে রয়েছে, মনের বাইরে নেই এবং তুমি তোমার নিজের মধ্যেই রয়েছ। তোমার outlook-কে inlook-এ নিয়ে যাও, inlook-কে innerlook-এ, innerlook-কে inmost look-এ, innermost look-কে all-pervading look-এ নিয়ে যাও।

'এর' কথাগুলোর মধ্যে কোনও জায়গায় flaw নেই। But a new light is revealing step by step, word after words which you cannot deny. You will have no chance to curb one part or deny one part, because this science is ever new to you. You know not what I will speak afterward. শুনতে শুনতে তখন দেখা যাবে যে, you are familiar with it because I live in you. This is the Science of Absolute I. It will be common definitely because I is One. এই আমি-ই আমিকে প্রকাশ করে দিচ্ছে। এই আমি কী? The Knowledge/Consciousness Absolute—'প্রজ্ঞানং'। তা-ই আবার Reality, Bliss, Love and Peace Absolute—অর্থাৎ আমি অখণ্ডভূমা পূর্ণ অদ্বয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সেই প্রজ্ঞানই বিজ্ঞানকে প্রকাশ করছে, বিজ্ঞান আবার জ্ঞানাভাসকে প্রকাশ করছে অর্থাৎ inner nature-কে বা জীবনকে, জীবন আবার প্রকাশ করছে বহির্জগৎকে। বহির্জগতে এই যে বাড়িঘর তৈরি হয়েছে এগুলো জীবনই তৈরি করেছে, আগে কোথাও ছিল না কিছু। আবার যদি ধ্বংস করে জীবনই ধ্বংস করবে। কাজেই সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস সব তোমার মধ্যে দিয়ে তোমার দ্বারাই হয়ে চলেছে। You are in one aspect Brahmaa, in another aspect Vishnu, in another aspect Shiva and in Reality you are the Absolute One—*Brahman/Atman*. 'এ' ধাপে ধাপে তা তোমার সামনে রাখবে। বল এবার তুমি কী দেখছ? দেখ শ্রুতির বিজ্ঞান কতখানি direct! এর জন্য ধার

করে তোমার জ্ঞান আনতে হবে না—কোনও বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম, প্রকৃতি ও ঘটনা থেকে নয়। তোমার নিজেরই মধ্যে তুমি তোমার নিজেকে আবিষ্কার করছ। The biggest banyan tree, peepul tree lies only in the tiny seed—একটা মাত্র সূক্ষ্ম সর্ষের সমান, একটা পোস্তদানার সমান। একটা বটবৃক্ষের বীজের মধ্যে বিরাট বটবৃক্ষটা লুকিয়ে আছে। বিজ্ঞানীদের ক্ষমতা আছে কি তা deny করতে পারে? কিন্তু আত্মবিজ্ঞান বলছে, আমিই তো তাই। I am smaller than the smallest and greater than the greatest and in between this two end I pervade in and by myself i.e. in myself, of myself, from myself, for myself, by myself, with myself, to myself, on myself and beyond, and beyond beyond. এই যে formula-টা বলা হল, এই formula শুনে জ্ঞানীগুণীদের মাথা আপনিই ঘুরে যাবে। এই কথা শুনে তারা বলেছে, এ তো দারুণ! এর বাইরে আমরা কী করে যাব? এই যে সপ্ত ব্যাহৃতি সপ্ত বিভক্তিকে আপনি এই ভাবে introduce করছেন, এর বাইরে আমরা যাব কী করে? তাদের কথার উত্তরে বলা হয়েছিল—"অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্"—আমি বিভক্তির মধ্যে অবিভক্তরূপে বিরাজ করছি। In-এর মধ্যেও আমি, of-এর মধ্যেও আমি, from-এর মধ্যেও আমি, for-এর মধ্যেও আমি, by-এর মধ্যেও আমি, with-এর মধ্যেও আমি, to-এর মধ্যেও আমি, on-এর মধ্যেও আমি, beyond and beyond রূপেও আমি।

'আমিসাগরে আমি উঠি ভাসি ডুবি বারেবারে, নাম-রূপের আধারে কখনও অণুতম, কখনও বৃহত্তম সবই পরিচয় মম।' কালকে গানের মধ্যে বলা হয়েছিল 'অনন্ত বিশ্বে আছে যত প্রাণ সকলই আমার অংশ আমারই সন্তান/অতি প্রিয় তারা মোর অতি আপন/আমার অমৃতসত্তায় হয়ে সত্তাবান/আমার অখণ্ডবক্ষে করে সবে অবস্থান/আমার আনন্দখেলা বিশ্ব তার নাম/সদাই সবে মোর করে গুণগান।' প্রত্যেকেই 'আমি-আমার' বলে গুণগান করে চলেছে জগতে। এমন একটা জীব নেই যে 'আমি-আমার' ব্যবহার করছে না। 'এ' clearly সবার সামনে রাখছে বিষয়টি। 'আমি-র বুকে আমি-র প্রকাশ আমি-র বিলাস/সবেতে আমিবোধে করি আমি বাস/স্বভাবে দ্বৈত আমি সগুণ সাকার/স্ববোধে অদ্বৈত আমি নির্গুণ নিরাকার/সগুণ-নির্গুণে আমি নিত্যসমান/নির্গুণগুণী অভিনব পরিচয় আমার (আমি-র)/নাহি মোর জন্ম মৃত্যু নাহি কোনও পরিণাম/বাইরে জ্ঞেয় দৃশ্য আমি অজ্ঞান/অন্তরে জ্ঞাতা ভোক্তা আমি আভাস জ্ঞান/হৃদয়েতে কেন্দ্রে সাক্ষিচেতা আমি বিশুদ্ধ ঈশ্বর স্বয়ং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান/তুরীয়তে ভাবাতীত দ্বন্দ্বাতীত ভেদাতীত গুণাতীত আমি অখণ্ড প্রজ্ঞান/স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ/সর্বসম অনুপম স্বয়ংপ্রকাশ অখণ্ডপূর্ণ/ সচ্চিদানন্দঘন প্রীতম্ স্বানুভবদেব স্বয়ং/ সর্ববোধের অধিষ্ঠান সর্বভাবের সমাধান।' কালকে এই গানটা প্রকাশ করা হয়েছিল। এই গানটাই যদি explain করা হয় it will define the entire cosmology to you। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির বিজ্ঞানকে পরিষ্কার করে বলে দেবে। ছোট্ট একটা গানের মধ্যে তা reveal করেছে—এই হচ্ছে formula, এই হচ্ছে inner revelation। 'একে' observe করতে হয়নি, it revealed spontaneously।

জ্ঞানীদের বলা হয়েছিল, তোমরা যদি আকাশের কাছে জিজ্ঞাসা কর, আকাশ তুমি ব্যাপ্তি কোথায় খুঁজে পেলে? তোমার এই সূক্ষ্ম স্বভাব, সূক্ষ্মতম স্বভাব কোথায় খুঁজে পেলে? তুমি এই যে নিশ্চল অটল ভাবে বিরাজ করছ এই গুণটা কোথায় পেলে? আকাশ কী জবাব দেবে? আকাশ বলবে, this is my nature, আমি এই! তুমি যদি বায়ুকে জিজ্ঞাসা কর, বায়ু তোমার এই নিরন্তর গতি, সর্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার এই যে শক্তি, এত সূক্ষ্ম অথচ তোমার কোনও আকার নেই, এই গুণ তুমি কোথায় পেলে? বায়ু বলবে, আমি এই, এই আমার পরিচয়! অগ্নিকে যদি জিজ্ঞাসা কর, অগ্নিদেব তুমি এই জ্যোতি তাপ উষ্ণতা কোথায় খুঁজে পেলে? সে বলবে, এই আমার স্বরূপ! তুমি যদি জলকে জিজ্ঞাসা কর, হে জলদেবতা তুমি তোমার এই তরলতা স্নিগ্ধতা শীতলতা মধুরতা কোথায় খুঁজে পেয়েছ? সে বলবে, আমার স্বরূপই এই! পৃথিবীকে যদি জিজ্ঞাসা কর, হে পৃথিবী তুমি তোমার এই ধৈর্য স্থৈর্য সহিষ্ণুতা কাঠিন্য এবং সবকিছুকে ধারণ করে রাখার শক্তি ও স্থিতি কোথায় খুঁজে পেলে? সে বলবে, আমার এটাই স্বভাব, এই আমার স্বরূপ! এই কথা শুনে জ্ঞানীরা বলেন, কী সুন্দর analysis তুমি করলে! আমাদের বেদ-বেদান্ত পড়ে এত জ্ঞান সংগ্রহ করেও we cannot conceive this thing, যা তুমি কয়েকটি কথার মধ্যে শেষ করে দিলে। উত্তরে তাদের বলা হল, এগুলো কিছু নয়। This child is playing with himself eternally. আনন্দের শিশু আনন্দের খেলা খেলেই চলেছে, আনন্দ বিতরণ করে চলেছে, আনন্দই নিজে আস্বাদন করছে। আনন্দসাগরে আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। তাই কবির ভাষায় বলা যেতে পারে, "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।" তোমরা গানটা গাও কিন্তু এর মর্ম যে তোমার হৃদয়ে রয়েছে তা তুমি জান না। এই অনুভূতি কবির বলে মনে করছ কেন? এই কবিও তো তোমাদেরই ভিতরে তোমারই অনুভূতির একটি অংশ।

পরস্পর আমরা প্রত্যেকেই, we are One in One, of One, from One, for One, by One, with One, to One, on One and beyond, beyond—this is the formula. এটা deny করবে কে? এই সাতটা ব্যাহৃতি দিয়ে চৈতন্য লীলায়িত হচ্ছে জগতে। সপ্ত ব্যাহৃতি হল—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য। এই দেহের মধ্যেও আমাদের সপ্ত চক্র আছে, যথা—মূলাধার, সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ, আজ্ঞা ও সহস্রার। আবার সপ্ত জ্ঞানভূমি হল—শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমনসা, সত্তাপত্তি, অসংশক্তি, পদার্থভাবনা এবং তুরীয় তুরীয়াতীতম্। যেদিকেই যাও, তুমি সবসময়ই এই সাতটা ভাব নিয়ে চলছ। কিন্তু খেয়াল রাখতে পারছ না, কেননা তোমার সে খেয়াল সরে গিয়েছে তোমার অভ্যাসের দোষে, মনের কতগুলি বিলাসের জন্য। আবার তার মধ্যে তুমি তা set করে নাও, ভুল হয়ে গিয়েছে, ভুলটাকে শোধন করে নাও। তুমি ভুলে গিয়েছ তোমার আপনস্বরূপের স্থিতি যে, you are সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবল। এটা কয়েকবার ভাব, দেখবে ভিতরে কী রকম অদ্ভুত একটা স্পন্দন খুঁজে পাবে, সাড়া খুঁজে পাবে।

অজ্ঞানবশে প্রচলিত ধারায় কতগুলি গতানুগতিক অভ্যাস, অর্থাৎ জপ-তপ-ধ্যান ইত্যাদি করে চলেছ কিন্তু নিজের স্বরূপকে তো একবারও জপ করছ না—what you are in

reality! What you are in appearance তাই নিয়ে মাতামাতি করছ। তুমি আয়নায় নিজেকে দেখে ভাবছ আমাকে রাস্তায় অমুক বলল যে, আমি নাকি রোগা হয়ে গিয়েছি, তাই তো সত্যিই রোগা হয়ে গিয়েছি! কেন রোগা হয়ে গেলাম? নিশ্চয়ই খাওয়াটা ঠিক মতো হচ্ছে না—নানারকম tension তোমাকে ডুবিয়ে দিল, injection করে দিল! 'এ' কিন্তু উল্টোটা দিচ্ছে তোমাকে। তোমাকে inspire করছে inspite of all your defects in the outer nature। তোমার যাই দোষ ত্রুটি থাকুক, যতই ভুল-ভ্রান্তি করে থাক সে সবই বাইরের প্রকৃতির অন্তর্গত। You are above all, nothing can touch you. Action cannot touch the background. Background-কে বাদ দিলে foreground থাকবে কোথায়? You are the background of all. Let foreground take care of itself with the result of total non-existence. বহির্জগতে যা ইচ্ছা তাই হোক না কেন, তাতে কী এসে গেল? তাতে আমি-র কী কিছু এসে গেল? এই আমিটা কোথায়? কিন্তু আমি যতক্ষণ পর্যন্ত বহির্জগতের দ্বারা affected হয়ে আছি ততক্ষণ আমি বলব, না আমার দ্বারা হবে না! ও আমি পারব না! এটা হচ্ছে disease। নিজের disease-কে যে maintain করে, যে এই disease-কে পোষে তাকে কি encourage করা যায়? মোটেই না। কাজেই আত্মজ্ঞপুরুষ/ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ কারওকে spare করছেন না, সে যত বড় criminal-ই হোক, যত বড় mischievous person-ই হোক, তাকেও তিনি inspire করেন এবং enlighten করেন। তাই দেখা যায়, জগাই মাধাই-এর মতো পাষণ্ডের হাতে মার খেয়েও নিত্যানন্দ প্রেম দিলেন। আরও গভীরে গেলে একের পর এক আমরা দেখি যে রাম-রাবণের যুদ্ধ, কংস জরাসন্ধের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ ইত্যাদি।

আরও গভীরে গেলে আমরা দেখতে পাই, রত্নাকর দস্যু ব্রহ্মা আর নারদের কৃপা অদ্ভুত ভাবে পেল। সে এত uncultured অথচ তার বাবা একজন মুনি, নাম করা মুনিঋষিদের মধ্যে একজন, তাঁরই পুত্র রত্নাকর পাষণ্ড, কুকীর্তি করে বেড়াচ্ছে। তাকে কী করে উদ্ধার করা যাবে? কিছুই শেখেনি সে, মুনির পুত্র অথচ সে একজন দস্যু। কী contradictory! তাকে উদ্ধার করার জন্য ছদ্মবেশে ব্রহ্মা আর নারদ এসেছেন। নারদ আর ব্রহ্মাকে জঙ্গলের মধ্যে পেয়ে রত্নাকর লতা দিয়ে তাঁদের বেঁধে ফেলল। তাঁরা তখন বললেন, তুমি বাঁধছ বাঁধ, কিন্তু আমাদের কাছে কিছু নেই। রত্নাকর বলল—অতশত জানি না, কিছু না-পাই তো তোমাদের প্রাণটা নিয়ে নেব। তাঁরা বললেন—তা নিতে পার, কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞাসা করব, তুমি তার জবাবটা দিয়ে তার পরে আমাদের মারবে। তুমি এই যে কুকীর্তি, পাপ ও অন্যায় করছ এগুলোর ভাগ কে নেবে? রত্নাকর বলল—কেন? আমি মা বাবাকে খাওয়াচ্ছি, আমার পরিবারকে খাওয়াচ্ছি তারা নেবে না? ব্রহ্মা ও নারদ বললেন—তাহলে তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করে এস। রত্নাকর বলল—সেই ফাঁকে তোমরা যদি পালিয়ে যাও! ব্রহ্মা ও নারদ বললেন—না, আমাদের বেঁধে রেখে যাও। তখন রত্নাকর সেই লতা দিয়ে গাছের মধ্যে tight করে তাঁদের দু'জনকে বেঁধে রেখে যায়। ব্রহ্মা বললেন, নারদ এবার বুঝি প্রাণটাই চলে যাবে। এই মহাদস্যুর হাতে যদি প্রাণ যায় তাহলে তো গেলাম! আর তো স্বর্গে ফিরতে পারব না। নারদ বললেন—প্রভু একটু অপেক্ষা করুন, দেখা যাক কী হয়।

রত্নাকর বাড়ি ফিরে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, সে কী রে? আমি তোকে জন্ম দিয়েছি, তোর শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করেছি, আমার কাছে এত লোক এসে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, শুধু তুই কিছু করলি না, কিন্তু তার জন্য আমি কী করব? তোর ভুলের মাশুল তোকেই দিতে হবে। রত্নাকর বলল—সে কী! আমি যে তোমাদের খাওয়াচ্ছি। তখন তার বাবা বললেন—আমি তো তোকে এই দস্যুবৃত্তি করে লালনপালন করিনি। তুই দস্যুবৃত্তি করছিস তোর নিজের কল্পিত ভাবনার দ্বারা, তার ফল আমি নেব কেন? এই সবের কর্তা তুই, কর্তারই হয় ভোগ অর্থাৎ কর্মফল কর্তাকেই ভোগ করতে হবে। আমি কেন ভোগ করব? রত্নাকর—তার মানে? তোমাকে যে খাওয়াচ্ছি! বাবা বললেন—আমাকে খাইয়ে তোর কর্তব্য করছিস তুই, না-হলে খাওয়াবি না। এত বড় কথা! মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে মা বললেন—সে কী রে! তোকে গর্ভে ধরেছি, লালনপালন করেছি, তোকে আমি তো দস্যুবৃত্তি করে পালন করিনি। আমি তো তোকে বলিনি যে দস্যুবৃত্তি করতে হবে। তুই একজন মুনির ছেলে হয়ে কিছুই শিখলি না, কিছুই জানলি না, তুই দস্যুবৃত্তি করলি কতগুলো বাজে সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে! রত্নাকর—আমার তাহলে পাপের অংশ কেউ নেবে না? স্ত্রীয়ের কাছে একই প্রশ্ন করাতে সে বলল, সে কী তুমি আমাকে অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করেছ! আমার ভরণপোষণের ভার তোমার। কিন্তু তুমি পাপ কর্ম করছ, তার ফল আমি কেন নেব? তুমি তো আমার পুণ্য নিচ্ছ না, তোমার পাপটা আমি কেন নেব? তুমি আমার পুণ্য নাও। আমি যে ভাল কথা বলি তা শোন না কেন? তখন রত্নাকর বলল—তাহলে কি আমার পাপ আমাকেই ভোগ করতে হবে? কেউ নেবে না? স্ত্রী বলল—না। এই কথা শুনে রত্নাকরের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। চুপ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ব্রহ্মা ও নারদের কাছে যেতে নারদ বললেন—কী হল রত্নাকর? রত্নাকর—না, কেউ নেবে না বলছে। নারদ—তোমাকে বলেছিলাম, তোমার কর্মফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে। রত্নাকর—তা এখন আমি কী করব? তোমরা আমাকে একটা কিছু উপায় বলে দিতে পার? নারদ বললেন—হ্যাঁ তা বলতেই তো আমরা এসেছি। তুমি রাম নাম জপ কর।

ওর জিভ জড়, মানে অজ্ঞানের কী প্রভাব, তার একটা example দেওয়া হচ্ছে! অজ্ঞানী কখনও জ্ঞানকে নেবে না। পেঁচা কখনও সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না। অজ্ঞানী সংসারে আমরা সবাই। আমরা জ্ঞানের আলো সহজে নিতে পারি না, পালিয়ে আসি সেখান থেকে। সৎসঙ্গের থেকে পালিয়ে আসি, সৎ-কে চাই না, অসৎকে নিয়ে আমরা বাস করি। ব্রহ্মা ও নারদ রত্নাকরকে বললেন—রাম নাম উচ্চারণ কর। বল রাম। রত্নাকর বলে আম। কিছুতেই সে রাম উচ্চারণ করতে পারছে না। শিক্ষার অভাবে জিহ্বার জড়তা কাটছে না, তাই তার জিহ্বা 'রা' উচ্চারণ করতে পারছে না। আমাদেরও ভগবৎপ্রসঙ্গ ভাল লাগে না, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ভাল লাগে না। সেইজন্য দেহভোগের, ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয় যেখানে আছে সেখানে ছুটে যায় মন। এটা মনের ধর্ম। 'এ' individually কারওকে লক্ষ্য করে কোনও কথা বলছে না। তখন তাঁরা দু'জনে পরস্পরকে বললেন—এ তো রাম উচ্চারণই করতে পারছে না। এখন

কী করে একে উদ্ধার করা যাবে? তখন ব্রহ্মা মুশকিলে পড়ে গেলেন। তিনি নারদকে বললেন—একে তো উদ্ধার করতেই হবে, নারদ কী করা যায় বল তো! নারদ—প্রভু একটুখানি দেখি তাহলে। সেই সময় কাছ দিয়েই কয়েকজন একটা dead body নিয়ে যাচ্ছিল কাঁধে করে। নারদ আর ব্রহ্মা ভান করছেন যেন কিছুই জানেন না। তাঁরা রত্নাকরকে বললেন—রত্নাকর ওটা কী যাচ্ছে গো এখান দিয়ে? রত্নাকর—মরা দেহ নিয়ে যাচ্ছে সবাই। তাঁরা বললেন—মরা! সত্যিই মরা? রত্নাকর—হ্যাঁ। তাঁরা আবার বললেন—তুমি দেখাতে পার? রত্নাকর—হ্যাঁ মরা! তখন তাঁরা একসঙ্গে গিয়ে দেখেন dead body। তাঁরা বললেন—রত্নাকর তুমি 'মরা, মরা' উচ্চারণ কর। তার মানে আরম্ভটা কোথা থেকে হল দেখ, মৃত্যুর রাজ্য থেকে অমৃতলোকে তাকে নিয়ে গেল, মৃত্যু দিয়ে অর্থাৎ অজ্ঞান থেকে আরম্ভ করতে হবে। কাজেই 'এ' বাস্তব দিয়ে আরম্ভ করেছে। প্রথমে অজ্ঞান, তারপর জ্ঞানাভাস, তার পরে বিজ্ঞান, তার পরে প্রজ্ঞান। এই হল জীবনের উত্তরণের সূত্র। কেননা প্রত্যেকেই বাস্তবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

এই বাস্তব থেকে অতিবাস্তবে কী করে যাওয়া যায়, তা-ই সবার সামনে বলা হচ্ছে। এই হল 'এর' game। কী game? 'Sportful dramatic sameside game of Self-Consciousness'. Self-Consciousness নিজের সঙ্গে নিজেই খেলছে। এই হল ছিন্নমস্তা মায়ের রূপ। মা নিজের মুণ্ড কেটে নিজেই রক্তপান করছেন। This is the Science of Oneness, this is the Science of the Absolute. এই বিজ্ঞানের সঙ্গে 'এ' মিশে আছে। এই হল 'এ' জীবনের মধ্যে সর্বোত্তম আবিষ্কার। মা কারওকে মারছেনও না, নিজেও মরছেন না। চৈতন্যের বক্ষে অর্থাৎ আমিসত্তার বক্ষে চৈতন্যরূপী আমি নিরন্তর অভিনব ভঙ্গিমায় অনন্ত অনন্ত বৈচিত্র্যরূপে উঠছে, ভাসছে, খেলা করছে আবার লয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চৈতন্যরূপী আমি পূর্বাপর সমানই থেকে যাচ্ছে। এই অনুভূতি হল প্রত্যক্ষ অনুভূতি, স্বানুভূতি অর্থাৎ পরমার্থ/পরমাত্মদৃষ্টি। তা-ই হল স্বাঁনুভূতির ভাষায় প্রজ্ঞানঘন নিত্য অদ্বৈত তত্ত্বস্ফূর্তি। কী বলবে এখন? প্রচলিত বা আধুনিক বিজ্ঞান এখানে কী উত্তর দেবে? তারা বলবে এসব imagination। কিন্তু তারা যে এই কথাগুলোকে imagination বলছে তাহলে তাদের কথাটাও তো imagination। এখন দেখা যাক কার imagination কতদূর ছড়ায়! তোমারটা যদি আটকে যায় তাহলে যেখান থেকে আটকে গিয়েছে সেখান থেকে 'এ' যদি আরও দূরে নিয়ে যেতে পারে তাহলে 'এর'-টা তুমি/তোমরা গ্রহণ করবে কি, না করবে না? তখন তারা বলল—আপনি নিয়ে যাবেন কী করে? তখন উত্তরে বলা হল, তা দেখা যাক কী করে নিয়ে যাওয়া যায়! তুমি চালাও তোমার মনের machine, দেখি কতদূর চলে! একটা জায়গায় গিয়ে তুমি আটকে যাবেই, কেননা কল্পনা নিয়ে তোমার জীবন চলছে। আমার এই আমি-র কোনও কল্পনা নেই। আমি আটকাবে না কোনও জায়গায়। আমার কল্প-না, কল্পটা না-হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সৃষ্টি আমার কাছে নেই। এ কথা শুনে অনেকে বলেছিল—সে কী কথা! উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল—না, সৃষ্টি হয়ই নি। সৃষ্টি হচ্ছে মনের কল্পনা। তুমি যখন আত্মবোধে আসবে তখন তুমি সৃষ্টি খুঁজে পাবে না, শুধু আত্মাকেই দেখতে পাবে। আত্মা সৃষ্টিও নয়, স্রষ্টাও নয়; স্বয়ং-এ স্বয়ং পূর্ণ। You will see yourself alone. কোথায়?

"স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণু স্বয়ং ইন্দ্র স্বয়ং শিব স্বয়ং ঈশ্বর স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্বম্ স্বস্মাৎ ন অন্য কিঞ্চন।।" স্বয়ং মানে Self-I, Self is Brahmaa, Self is Vishnu, Self is Shiva, Self is Indra, Self is Ishwara, Self is all these panorama of creation and there is nothing beyond Self। And Self is verily Consciousness Itself and this Consciousness is verily the eternal I-Reality. কাজেই আমিসাগরে আমি-র লীলায় আমি ওঠে ভাসে ডোবে নৃত্য করে আমি-র বুকে, হাসে কাঁদে এবং খেলে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আমি আমি-ই থেকে যায়। যাই হোক, রত্নাকর 'মরা, মরা' উচ্চারণ করতে করতে উল্টো দিক থেকে রাম এসে গেল। 'এ' কিন্তু from the Absolute stand point থেকে এই কথা বলছে তোমাদের কাছে, আর তোমরা শুনছ বাস্তবের দৃষ্টি থেকে। 'মরা' দিয়ে আরম্ভ করে, উল্টো দিক থেকে এল 'রাম'। কাজেই 'এর' science-টা আসছে from Oneness, আর তোমরা দেখছ from manyness....।

Manyness দিয়েই তোমরা start কর। 'এ' manyness দিয়েই প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছে বাস্তব দিয়েই আরম্ভ করা হয়েছে। 'এ' বাস্তবের মধ্যেই অতিবাস্তবকে তোমাদের দেখাবে। তোমার এই আমি-র মধ্যে সেই অখণ্ড আমিকে দেখাবে। তোমার আমি-র মধ্যেই জগৎ সংসার লুকিয়ে আছে, তাও focus করা হবে step by step। তুমি অভিভূত হয়ে যাবে, অবাক হয়ে যাবে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। মনে হবে, এ কী খেলা! যেমন অর্জুনকে দেখানো হয়েছিল একটু বিশ্বরূপের খেলা, একটু বিভূতি, তা দেখে অর্জুন ভয়ে বলল, 'সংবর সংবর! বূহ্য রশ্মি সমূহ তেজঃ' অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল—হে প্রভু আমি আর পারছি না সহ্য করতে, তুমি তোমার এই বিশাল রূপ সংবরণ কর। তোমার জ্যোতি আমাকে গ্রাস করে ফেলছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আচ্ছা অর্জুন ঠিক আছে থাক। তোমরা যদি বসে রাতভর 'এর' কথা শোন তোমাদেরও ঠিক এইরকম ভীতি এসে যাবে। কেন? মন কতটুকু আহার গ্রহণ করতে পারে? খেতে চায় সে অনেক কিছু। সে অমুক হোটেলে যাচ্ছে, অমুক restaurant-এ খাচ্ছে, কিন্তু কতটুকু খায়? তার পরে বাড়ি ফিরে আসে। আবার পরের দিন খেতে ইচ্ছা করল। তোমার এই ইচ্ছাকে একেবারে তুমি খাও দেখি? একেবারে সব শেষ করে ফেল। 'একে' অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে, আপনি কী করেছেন? উত্তরে তাদের বলা হয়েছে—'এ' নিজের মাথাটাকে খেয়ে ফেলেছে। কী করে? এই অহংটা কার? অহংটা আমি-র, আমি-র মধ্যে অহংটা ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি অন্তরে, আমি বাইরে, আমি সামনে, আমি পশ্চাতে, আমি দক্ষিণে, আমি বামে, আমি অধঃ-উর্ধ্বে সর্বব্যাপী অখণ্ড এক আমি, সর্ব আমি-র কেন্দ্র বা অধিষ্ঠান। "সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠামি একোঽহম্"—আমি মানে চৈতন্য, চৈতন্য মানে আমি, তা-ই নিত্যসত্তা। Consciousness within, Consciousness without, Consciousness in front, Consciousness in the backside, Consciousness rightward, Consciousness leftward, Consciousness upward, Consciousness downward. কোথায় Consciousness নেই? 'এ' I-কে বসাচ্ছে। 'I' is within, 'I' is

without, 'I' is in front, 'I' is in the backside, 'I' is in the rightward, 'I' is in the leftward, 'I' is in the upward, 'I' is in the downward—all-pervading eternal I-Reality. এই জায়গায় তুমি নিজেকে বসালে দেখবে—তুমি অন্তরে, তুমি বাইরে, তুমি সামনে তুমি পশ্চাতে তুমি ডাইনে, তুমি বামে, তুমি উর্ধ্বে, তুমি অধঃদেশে, তুমি সর্বব্যাপী, রূপে-নামে-ভাবে-বোধে খেলছ তুমি তোমার নিজের সঙ্গে নিজে স্বয়ং। স্বয়ং অর্থাৎ বোধস্বরূপ আমি/আত্মা। তুমি তোমার মানে আমি-ই স্বয়ং।

সবার মধ্যেই তুমি আছ, তোমার মধ্যেই সব আছে। কী করে? এটা কয়েকদিন একটু শুনতে হবে তোমাদের, তবে তোমরা নিজেরাই আবিষ্কার করতে পারবে যে, এই কথাগুলো কারও ব্যক্তিগত কথা নয়, এগুলো তোমাদেরও কথা অর্থাৎ স্বানুভবসিদ্ধ অখণ্ড পূর্ণ অদ্বয় আমি-র কথা, অহংদেব পাকা আমি-র কথা। The same law, the same Reality everywhere in everything and in everybody. খালি তোমার ঐ পূজার ঘরের আকাশটাই আকাশ নয়, তোমার শোবার ঘরের আকাশটাও আকাশ, তোমার ঐ bathroom-এর আকাশটাও same আকাশ, আবার ঘরটাকে ভেঙে দিলে সেই একই আকাশ থাকবে। সেখানে কোথায় condition, কোথায় limitation! এবার বল কী বলবে? কাজেই সামনে তুমি, পশ্চাতে তুমি, উর্ধ্বে তুমি, অধঃদেশে তুমি। কোথায় তুমি নেই? এই তোমার আমিকে আস্তে আস্তে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে 'এ'। তুমি তখন কিন্তু আর আগের মতো ব্যবহার করতে পারবে না। আপনিই তা ভিতর থেকে অঙ্কুরিত হয়ে আসবে, তখন স্মৃতির মধ্যে তা জেগে উঠবে। That will check up. Checkpost দিয়ে দিচ্ছে কতগুলো। এর ফলে কী হবে? তোমার ব্যবহারের মধ্যে তখন আসবে সেই প্রসারতা, উদারতা, বদান্যতা, মহত্ব। তখন তুমি সবাইকে আপন করে নিতে পারবে। কেননা আপনটাই হচ্ছে real। সেই আপন তোমার মধ্যে আছে, কিন্তু limited, conditioned, biased and prejudiced হয়ে আছে, তাকে আস্তে আস্তে বার করে আনতে হবে। দরজা জানালা খুলে দিতে হবে ঘরের। বড় জানালাগুলো বন্ধ থাকলে ঘর যেমন suffocating হয় তেমনই তুমি তোমার ঐ ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে আমিকে রেখে হাঁপিয়ে উঠছ। একটা-দুটো জানালা খুলে দাও। দাও না খুলে, নইলে 'এ' খুলে দেবে দেখ। এই করে তাকে আস্তে আস্তে open air-এ নিয়ে আসব। আচ্ছা এবার তুমি আমার (আমি-র) সঙ্গে আস দেখি। আস্তে আস্তে তোমার barrier সব চলে যাবে। তোমার যে 'আমার ভাব' তা খুঁজে পাবে না। তখন তুমি আর এক সন্তানের মা বা বাবা নও, সমগ্র বিশ্বের মাতা বা পিতারূপে তুমি বিরাজিত, তদূর্ধ্বেও তুমি একা স্বয়ং। তখন কার জন্য শোক করবে আর কার জন্য মোহ করবে বল?

'এ' তোমার ঘরে বসেই তোমাকে তোমার স্বরূপের কথা বলছে। তোমার গুহা গহ্বরে যেতে হবে না, বনে-প্রান্তরে যেতে হবে না, মন্দির মসজিদ গির্জা দরগায় যেতে হবে না। যদি বল কেন? তুমিই তো সব হয়ে বসে আছ। তোমার দেহটাই তো একটা মন্দির, তোমার বাড়িই তো আশ্রম, তোমার মনই তো পূজারি, আর তার মধ্যে চৈতন্যস্বরূপ অখণ্ড আমি

হচ্ছে তোমার গুরু ইষ্ট আত্মা মা—যাই বল তুমি। 'এ' তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে তোমার সত্য পরিচয়। এর পরে তুমি বলতে পার যে, এ কী করে সম্ভব। 'এ' বলবে—সম্ভব হয়, প্রথম প্রথম মনে হয় এ অসম্ভব, আস্তে আস্তে সব সম্ভব হয়। কিন্তু তার জন্য কিছুটা শ্রবণ তোমাদের করতে হবে, you must pay some hearing। You must listen to the words. আস্তে আস্তে এই কথাগুলো নিজের মধ্যেই তোমরা খুঁজে পাবে এবং বুঝতে পারবে যে, এগুলো কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। There cannot be one individual isolated from all others. That God is not God; that is a dog. Therefore if anyone claims himself or herself to be God, he/she must be ever-present, unified and identified with all others, otherwise he/she cannot realize God.

ঈশ্বর যদি কেউ থাকেন তবে তা হল সবার আপন পরিচয়। কার মধ্যে নেই আপনভাব? কার মধ্যে নেই Self? আত্মার থেকে বড় দেবতা কে আছে? কৃষ্ণই বল, রামই বল, বুদ্ধই বল আর যিশুই বল—এঁদেরও আত্মা ছিল, আত্মা আছে। সব এক আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশরূপ (design-pattern)। সেই রাম নেই, কিন্তু তুমি আছ। Only you are more real than the past. কোথায় রাম কবে জন্মেছিলেন, কোথায় কৃষ্ণ, কিন্তু তুমি এখনও বর্তমান। 'এর' কথাগুলো শুনতে হয়ত rough মনে হবে। কেননা সমস্ত গণ্ডিকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে যে! তোমার limitation-কে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, তোমার গোঁড়ামিকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, তোমাকে 'গোঁড়ার আমিতে' নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 'গোঁড়ার আমিতে' নিয়ে যাওয়াই হল আসল গোঁড়ামি। মূলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তোমাকে, সেখানে তুমি দেখবে you are full, তুমি পূর্ণ। তোমার দ্বারা যেমন সব পূর্ণ তেমনই আমার দ্বারাও আমি পূর্ণ এবং সবই পূর্ণ। সেইজন্য পূর্ণের মন্ত্রে আছে—"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।" কী অর্থ দাঁড়ায়? পূর্ণের মধ্যে থেকে যা-কিছু কেটে ছেটে বাদ দাও তা পূর্ণই থেকে যাচ্ছে। যা-কিছু add কর তাও পূর্ণই থেকে যাচ্ছে। সমুদ্রের জল তুমি ঘড়া করে নিয়ে গেলে তবুও কমবে না, আবার বৃষ্টির জলে বাড়বেও না, there is no increase, and decrease in the Reality। Reality remains always the same. These is no loss, and no gain. There is no pain, it remains always the same. তুমি নিত্য ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে under all circumstances। যেমন I was as I am at present and shall remain the same। তোমার আমি রোগে, শোকে, দুঃখে, তাপে, অহংকারে, অভিমানে, ক্রোধে আমিই থেকে যাচ্ছে। এই আমিকে বাদ দিয়ে একটু রাগ করে দেখাও দেখি, দেখি একবারও কেউ পার কি না। কাজেই এই যে নিজেকে নিয়ে নিজের খেলা—ছিন্নমস্তা মা আমার খেলে চলেছেন অবিরাম। এই মা হলেন ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম স্বয়ং, সবার আমি—পরমসত্য পরমতত্ত্ব। এই মা কিন্তু একটা লিঙ্গ দেহ নন, মা কিন্তু নারীমূর্তি নন—that is the Reality Absolute। 'এ' তোমাদের কল্পিত সম্প্রদায়গত কোনও কথার মধ্যে যাচ্ছে না। I am focusing you a light which covers everything, which pervades everything, so far has been imagined by the humanity of ages together.

যুগ যুগ ধরে মানুষ যা-কিছু ভেবেছে, যা-কিছু করেছে, যা-কিছু বুঝেছে, সবকিছুর সমন্বয় এক-এ ছিল, এক-এ আছে, সেই এক-এতেই থাকবে। সেই এক-এর মধ্যে জাতি বর্ণ লিঙ্গ মত পথ নির্বিশেষে সব মিশে একাকার। তুমি কি নিজের সেই পরিচয় ছেড়ে ক্ষুদ্র, অর্থাৎ আমি অমুকচন্দ্র অমুক, আমি অমুক, এই বলবে? আর তা পারবে না। কয়েকদিন শুনলে আর তা বলতে পারবে না। তখন বলবে, হায় রে, একী শুনলাম নিজের পরিচয় সম্বন্ধে! সত্যিই কি আমি তাই! আমি এতদিন যাবৎ বলেছি অমুক চন্দ্র তমুক, অমুক চন্দ্র অমুক এই ভাবে—this is imaginary, it is conditional, it is relative! তুমি Reality, not relativity। তুমি Reality অর্থাৎ তুমিই সেই পরমসত্য পরমতত্ত্ব, তুমি তথ্যও নও, পথ্যও নও। কথাগুলো কিন্তু প্রথম প্রথম digest করতে একটু অসুবিধা হবে ঠিকই, কিন্তু এটাই সত্য, একে digest করার অপেক্ষা থাকে না। It is revealing under all circumstances as it is. One in One, One of One, One from One, One for One, One by One, One with One, One to One, One on One and beyond, beyond, beyond. One will remain always the same, that verily you are, you were and shall remain the same.

তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে। কী ভাবে? As you are, and not as you appear to be. এখন যা তুমি তা সত্য নয়। এইরকম appearance নিয়ে তুমি লক্ষবার পৃথিবীতে এসেছ। বহুবার বাবা-মা সেজেছ, সন্তান, ভাই, বোন নানারকম পোশাক পরে এসেছ। সেই পোশাকগুলি এখন নিয়ে এলে you cannot recognize any of them! তাদের মধ্যে কারওকেই তুমি গ্রহণ করতে পারবে না। আবার যখন এর পরে আরেকটা দেহ নিয়ে আসবে তখন এখনকার যে প্রিয়জন আপনজন তাদেরও তুমি reconize করতে পারবে না। So funny is life's game! কী অদ্ভুত জীবনের ধর্ম! কী জীবনের খেলা। একটা অভিনয় হয়ে চলেছে। এখানে তুমি কার? কে তোমার? ভেবে দেখ একবার। নাহি কেহ পর, সবই যে তুমি স্বয়ং। সবই তোমার আপনার। 'এ' এক-এর ধর্ম তোমাদের সামনে রাখছে, যেই এক-এর আদি-অন্ত নেই, জন্ম-মৃত্যু-ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই, অথচ সব কিছু তার বক্ষে খেলে চলেছে। তা কিন্তু যেমন ছিল তেমনই আছে। এই প্রসঙ্গ দিনের পর দিন তোমাদের সামনে 'এ' বলেছে। আজকে 'এ' আরও গভীরের বিষয় বলবে। তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থেক। শোন তোমার মহিমা, listen to your own glory, the glory of your infinite Self which is beyond creation, beyond duality, beyond relativity। It is absolutely One without a second, homogeneous by nature.

অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন professor এসেছিলেন। তিনি বললেন যে, তোমার কথা শুনতে শুনতে আমি তো আমার বয়স ভুলে যাচ্ছি (খুব elderly)। আমার তো মনে হচ্ছে আমি বোধহয় একটা শিশু হয়ে গিয়েছি। একজন খুব বড় scientist-ও এই কথা বলেছিলেন যে, আপনার কথা শুনতে শুনতে মনে হয়, লেখাপড়া কিছুই শিখিনি। এগুলো কী বলছেন, এগুলো তো কিছুই জানি না! উত্তরে বলা হল, হ্যাঁ starting from the beginning I

know nothing। 'এ' কিছুই জানে না। কিছু জানি বললেই তুমি কিন্তু ঠকে গেলে। কিছুই জানি না। ছোট শিশুর মতো হয়ে এস। তার পরে তুমি আস্তে আস্তে বড় হবে। বৃংহণ অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ, বিকশিত হয়ে চলেছে, বেড়েই চলেছে। তাঁর কোথায় অন্ত? There is no end. You have no end at all, no death at all, no birth also. তোমার জন্মই হয়নি, মৃত্যু কোথা থেকে আসবে? তোমার যে জন্ম হয়নি সে প্রসঙ্গে পরে বলা হবে, আরও পরে তা টের পাবে। এখন বলবে, কেন আমার দেহের তো জন্ম হয়েছে! আরে, এই দেহ পোশাক তুমি বহুবার পরেছ, তাতে কী এসে গেল! তোমার জন্ম হল কোথা থেকে? Birth of the body is not birth of the Self. Self is eternally One unattached Reality. Only due to ignorance one considers his body to be real. Just as body-identity is commonly found among the men of ignorance so also the Brahma-identity or Self-identity is found among the men of supreme wisdom. Without Self body তো dead। তখন তো 'টেল হরি, হরি টেল' করে নিয়ে চলে যাবে, গিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। শেষে একমুঠো ছাই, আর কিছু নেই। এই কি তোমার পরিচয়? তখন তুমি দেহ ছেড়ে দিব্যি আড়াল থেকে দেখছ কে কী করছে—কে কাঁদছে, কে হাসছে, ভারি মজার খেলা! এই কথা শুনে একজন scientist বলেছিলেন—তুমি full of life! তুমি এগুলো বলছ কী করে? উত্তরে তাকে বলা হল—তুমিও তাই বাবা। তুমি ভুলে যেও না যে, তুমি এক অখণ্ড আমিবোধের সত্তাতেই আছ, এক-এর বাইরে তুমি যেতেই পারবে না। তুমি আকাশের বাইরে নিজেকে ভাবতে পারছ কি? ঘরের থেকে বাইরে গেলেও তুমি আকাশের মধ্যেই আছ, এই এক জমির উপরেই দাঁড়িয়ে আছ। কিন্তু যদি বলা হয়, জমিটাও তুমি, আকাশটাও তুমি—how can you go out of yourself? You cannot go out of yourself. You cannot forget yourself. You can forget everything, the imaginary God also. ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এঁদের সবাইকে ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু আমি নিজেকে ভুলতে পারি না। I cannot forget myself, I cannot deny my existence. কেউ পারবে না! তাহলে তুমি কে? তুমিই সেই, যে সব হয়েছে। সে সব হয়ে বসে আছে, সবার মধ্যে আড়ালে লুকিয়ে আছে আর বলছে, আমি কিছু জানি না। কী খেলা খেলছ গো মা! হে প্রভু তুমি কী খেলা খেলছ নিজের সঙ্গে! Hide and seek, লুকোচুরি খেলছ। নিজেকেই প্রকাশ করছ, নিজেকেই আবার খুঁজে বেড়াচ্ছ—কোথায় আমি? How funny is life's game! এর পরেও কি তুমি তোমার personal ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে? হ্যাঁ, দিন কয়েক ঘামাবে। আরও দুই একটা দিন শোন, তার পরে দেখা যাবে ঘামাতে পার কতখানি। তখন তুমি সব করবে কিন্তু কী ভাবে জান? Undisturbed and unbiased mind নিয়ে। তখন তোমার mind-এ disturbance থাকবে না, ভাবনা থাকবে না, ভয় থাকবে না। কেননা তখন secret-টা out হয়ে গিয়েছে। কী রকম? Magician-এর magic game দেখতে গিয়েছ, কী অদ্ভুত কাণ্ড—ঝোলা থেকে কী বের করল, কী সব খেলা দেখাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছ না। কিন্তু খেলাটা

খুব enjoyable—সব অঘটন ঘটনা দেখাচ্ছে। একটা charming জিনিস সবার attention draw করছে, কিন্তু সবটাই একটা বোধের game বা tricks।

এই সৃষ্টিও হচ্ছে একটা trick/charm। কী রকম? 'Sportful dramatic sameside game of Self-Consciousness.' তা দেখা হয়ে গিয়েছে বলেই আজকে 'এর' কাছে তোমরা এগুলো শুনতে পাচ্ছ। 'এ' তোমাদের কাছে এই secret-টা বলে যাচ্ছে। তোমাদের মধ্যেও সেই বোধ যখন খেলবে তখন দেখবে this is the funny game of life, nothing serious! এখানে কোনও কিছুই serious নেই, nothing permanent except your own being। তুমি নিজে ছাড়া এখানে permanent কিছুই নেই। You are the eternal One, infinite One, the Absolute One, unaccessible. তুমি নিজেকে পরিমাণ করতে পারবে না—অপরিমেয়ম্ অগাধ, unfathomable, infinite, ineffable and one without a second—অদ্বিতীয়ম্। দুই নেই তোমার। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, ছায়া আছে। তোমার প্রতিবিম্ব আছে, প্রতিফলন আছে, কিন্তু তোমার বিকল্প আর কেউ নেই। This is your Reality. 'এ' ধর্মের কোনও জায়গায় আঘাত করছে না, কোনও মতবাদকে আঘাত করছে না। সব মতবাদ ও ধর্মকে নিয়ে এক জায়গায় put করা হচ্ছে। কী ভাবে? পূজার সময় যেমন সবকিছুকে একত্র করে নিয়ে সমর্পণ করা হয়, তেমনই এই সব নিয়ে এক-এর মধ্যে 'এ' অঞ্জলি দিচ্ছে এক নূতন ভঙ্গিমায়, আর কিছু নয়। Because everything belongs to eternal One and One is the background of all without which nothing can exist, nothing can function, nothing can be understood.

অখণ্ড অদ্বয় এক-কে বাদ দিলে কিছুই জানবার থাকে না। এই এক সব হয়েছে, সবের মধ্যে একই আছে, আর এক-এর মধ্যে সব আছে। এই সত্যকে কেউ deny করতে পারবে না। যদি জগতের মধ্যে substantial কিছু থেকে থাকে, that is the Science of Oneness, Knowledge of Oneness/Oneness of Knowledge which can neither be denied by the philosophers nor by the scientists nor by the religious leaders. সবাই এক-এর ছত্রতলে বাস করে বাহাদুরি দেখাবার জন্য ভাগ ভাগ করে যা বলছে তার reactionary ফল ভোগ করছে। তুমি তো ভোগ করার জন্য আসনি। You are neither a *Bhokta*, nor a *Karta*—কর্তা হলেই ভোক্তা হবে, you are neither a *Karta*, nor a *Bhokta*, nor a *Jnata*—তুমি সাক্ষিচেতা, শুধু Witness Consciousness, the immutable Consciousness—'কূটস্থ চৈতন্যম্ ব্রহ্ম আত্মা স্বয়ম্'। "Thou art that"or "That thou art", "তত্ত্বমসি"—তুমিই সেই। এর পরে 'এ' আরও গভীরে যখন তোমাকে নিয়ে যাবে তখন তুমি অবাক হয়ে ভাববে, এ কী শুনছি। এ কী, সত্যিই কি তাই! তখন মনে হবে, কোনটা সত্যি, যা জানতাম তা, না এখন যা শুনছি তা। তোমার অতীতকে মুছে সরিয়ে দিয়ে যাবে—it will remove your infinite past and apparent present. You will remain eternally all perfect in ever presence—

নিত্যবর্তমান হয়ে তুমি থাকবে। কী ভাবে? সত্তা-শক্তিরূপে। শক্তি তোমার সত্তাশূন্য নয় এবং সত্তাও শক্তিশূন্য নয়। নিজেকে নিজের মধ্যে নিজের দ্বারাই তুমি আবিষ্কার করবে in each and every manifestations of the creation। প্রতি বস্তুর মধ্যে তুমি রয়েছ as the background, as the Reality, as the underlying essence, as the ultimate truth। তুমি সত্য শিব সুন্দর। তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অখণ্ড ভূমা পূর্ণ। এই পূর্ণতা কখনও অপূর্ণ হয় না। কিন্তু পূর্ণতার বক্ষে অনন্ত প্রকাশ হয়। সব প্রকাশই পূর্ণতাকে ঘিরেই থাকে, তাকে বাদ দিয়ে থাকে না।

তোমাকে বাদ দিয়ে কিছুই নেই। All positive, all negative are nothing but different manifestations of your inner nature. কী অদ্ভুত science ভেবে দেখ। এ কথাগুলো যদি কয়েকদিন শোন তখন বুঝতে পারবে, এ তো spontaneous ব্যাপার, অনর্গল ভিতর থেকে বেরোচ্ছে। যারা এগুলো শুনেছে তারা আস্তে আস্তে সব সমাহিত হয়ে যাবে। অনেকেই হয়ত বলবে, এ beyond imagination! না, ঘাবড়িয়ে যেও না। তোমার পরিচয় তুমি জেনে নাও। If you are to know anything, if you are to see anything, the worth knowing and seeing is verily your Being or Self. "কোঽহম্, কুতঃ আয়াত, কস্যোঽহম্, কিমহম্"—আমি কে? কোথা হতে এসেছি? কী মোর পরিচয়? কে আমার? কার আমি? এসবের পরিচয় 'এ' তোমাদের বলবে। এর পরে আর তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ষোলো আনা মানাটা সবার সমান নাও হতে পারে, আবার হতেও পারে অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না। এক একদিন তোমার ক্ষুধা এক একরকম হতে পারে। কোনওদিন কম খেলে, কোনওদিন বেশি খেলে, কোনওদিন হয়ত কিছুই খেলে না। 'এর' কথা হয়ত তোমরা পরোয়াই করবে না—কুছ পরোয়া নেহি, আমি আমিই থেকে যাব। আমাকে মানলেও আমি থাকব, না-মানলেও আমি থাকব। কেননা আমাকে বাদ দিয়ে তোমার মানাও নেই, না-মানাও নেই। This or that, not this or not that, yes or no, has and has not—all are verily different expressions of I. I means eternal Consciousness, infinite Consciousness. 'চিৎস্বরূপ কেবলোঽহম্', 'সম্বিৎস্বরূপ কেবলোঽহম্', 'শান্তিস্বরূপ কেবলোঽহম্'। তোমার পরিচয় সম্বন্ধে তোমাকে বলা হচ্ছে। এগুলো আগে শোনা হয়নি, জানা হয়নি। ভাগে ভাগে নানা জায়গায় শাস্ত্রের পাতায় এই সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে, ছড়িয়ে আছে। ঐ সর্বের পুঁটুলি ছড়িয়ে গিয়েছে, আর শাস্ত্রও তাকে একত্র করতে পারছে না। তা একত্র করবে তুমিই স্বয়ং। কী দিয়ে? তোমার আমি দিয়ে, আপনবোধ দিয়ে। আমি/আপনবোধ হল পরমতত্ত্ব চিদানন্দস্বরূপের পরিচয়। আমি-র ব্যবহার বোধ দিয়ে হয়, বোধের ব্যবহার আমি দিয়ে হয়। তাই হল পরমতত্ত্বের বিজ্ঞানময়রূপ।

তত্ত্বের দৃষ্টিতে আমি-র পরিচয়—তত্ত্বের পরিচয় স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্বই ব্যক্ত করে। আদি-মধ্য-অন্তে তত্ত্বের স্বরূপ পূর্ণ ও সমানই থাকে। সর্বসম অখণ্ডভূমা শান্ত অদ্বয় পরমতত্ত্ব অহংদেব পাকা আমিবোধে স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রমাণ। জলসাগরে অনন্ত অনন্ত

ভঙ্গিমায় বুদ্‌বুদ্‌ ফেনার প্রকাশ নিরন্তর ওঠে, ভাসে, ডোবে। তাদের মূল সত্য উপাদান যেমন এক জলই, সেইরূপ অখণ্ডভূমা পূর্ণ আমিসাগরে বৈচিত্র্যময় মহান ও ক্ষুদ্র প্রকাশাদি সবারই সত্য পরিচয় ভূমা আমি। আমি অজ্ঞান, আমি জ্ঞানাভাস, আমি জ্ঞান,আমি বিজ্ঞান, আমি প্রজ্ঞান, আমি অণুতম, আমি বৃহত্তম, আমি কারণ, আমি কার্য, আমি জন্ম, আমি মৃত্যু, আমি সত্য, আমি মিথ্যা, আমি অনিত্য, আমি নিত্য, আমি অপূর্ণ, আমি পূর্ণ,আমি অধর্ম, আমি ধর্ম। এমন কোনও শব্দ নেই যা আমি নই। This is what the Real I means, আমি ছাড়া কোনও প্রকাশ সম্ভব নয়—whatever it may be, যে কোনও ভাষায় তুমি যা-কিছু প্রকাশ করবে তা শুধু আমি-র মহিমাই ঘোষণা করছে আমি-র বক্ষে থেকেই। আমি-র বাইরে যাবার উপায় নেই—come to One first। তার পরে দেখা যাক এই Oneness কী রকম খেলে তোমার মধ্যে! You cannot deny it because it is your true nature. It is your real nature which cannot be denied, which cannot be rejected, which cannot be forgotten and which cannot be curbed. তাতে গ্রহণও নেই, বর্জনও নেই, অর্জনও নেই, গর্জনও নেই। তাহলে কী আছে? আছে মাত্র সমদরশন। চারটে কথা দিয়ে 'এ' কিন্তু সব cover করে নিয়ে আসছে। গ্রহণ কাকে করবে তুমি? বর্জনই বা কাকে করবে? আর অর্জনই বা কী করবে এবং গর্জনই বা কার against-এ করবে when you are One and all and all are verily you are? You are always One without a second. 'একস্তম্ দ্বিতীয় নাস্তি'—তুমি একমাত্র এক বা অদ্বয়, তার দুই নেই। 'এ' inner nature দিয়ে আজকে প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছে, inner nature-এর একটুখানি মহিমা তোমাদের সামনে রাখা হল—what you are inwardly. What you are outwardly সেই সম্বন্ধে কালকে বলা হয়েছে, আবার what you are centrally তা আগামীকাল বলা হবে। তার পরে বাকি অংশ এর পরে আবার যখন সময় হবে তখন নিশ্চয়ই বলা হবে। 'এ' এই course-টা তোমাদের সামনে রেখে তবে দিল্লি থেকে যাবে, তার আগে নয়। যতটা সম্ভব তোমাদের সামনে রেখে দিয়ে যাওয়া হবে।

তোমাদের জিনিস তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা তো একটা বিরাট সাধনা বা তপস্যা। মুক্ত যে সে যদি অপরকে মুক্তই করতে না-পারল তবে সে যে মুক্ত হয়েছে তার প্রমাণ কী? আমি যদি আমি-র পরিচয় না-পেয়ে থাকি তাহলে তোমাদের আমি-র পরিচয় দেব কী করে? কাজেই 'এই আমি-র' কথা তোমাদের কাছে বলা হচ্ছে, 'এই আমি' দিয়ে তোমরা আমিকে ব্যবহার করছ, সবার মধ্যেই 'সেই আমি' আছে। কিন্তু কী ভাবে আছে তা তোমরা ভুলে গিয়েছ। ভুলে যাওয়াটা খুব দোষের নয়। কিন্তু ভুলে যাবার পরে তা শোধন করবার সুযোগ পেয়েও যদি শোধন না-কর that is a crime, otherwise there is no crime at all। When you know that it is a mistake তখন তুমি নিশ্চয়ই সেই mistake সরিয়ে দেবে। যার দ্বারা তোমার নিজের বা অপরের ক্ষতি হয়, অনেক কষ্ট হয় তা নিশ্চয়ই তুমি জেনে-শুনে করবে না। 'এ' তোমাকে সেই চোখ দিচ্ছে, যেই চোখ দিয়ে এক-কে দেখা যায়;

সেই মন তোমার সামনে clear করে দিচ্ছে যে মন দিয়ে এক-কে ব্যবহার করা যায়; আর সেই বোধটাই তোমার সামনে রাখা হচ্ছে যেই বোধে এক নিত্য একই থাকে। কথাগুলো নিশ্চয়ই খুব দুর্বোধ্য নয়। কেননা 'এ' তো লেখাপড়া শেখেনি, তাহলে তো খুব complex ভাষায়, দারুণ দারুণ কথা তোমাদের সামনে বলা হত। 'এর' অশিক্ষিত, অমার্জিত, অসংস্কৃত মন খেলে বেড়াচ্ছে এক-কে নিয়ে। কিন্তু 'এই মনের' কাছে শিক্ষিত, মার্জিত, সংস্কৃত মন টিকতে পারছে না। কেন না তাদের সব জিনিসই সীমিত। তাদের collected information কিছু আছে, এটাই তাদের education। ঐ লাটাই-এর সুতো পাকিয়ে তুমি ঘুরিয়ে দিলে, কয়েক পাক ঘুরেই ওটা বন্ধ হয়ে গেল। ঐ আনারকলি তুবড়ি, এই যে দেওয়ালি আসছে, বারুদ গাদা আছে আতসবাজির মধ্যে, কিছুক্ষণ পর সব শেষ হয়ে গেল। এই যে কয়েকদিন আগে America-তে এতবড় একটা ধ্বংস হল, যাই কিছু করুক ঐ আরম্ভ হল তারপর শেষ হয়ে গেল। কিন্তু 'এ' যা বলছে তার আরম্ভও নেই, শেষও নেই, কারণ তা অখণ্ডভূমা। ভূমার আদিও নেই, অন্তও নেই, ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই, আপন-পর ভেদাভেদ নেই। আপন অতিরিক্ত দ্বৈত নেই, যা আছে তা 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং'। 'একে' শেষ করবে কে? 'এ' তো অশেষ অগাধ অপরিমেয় অনন্ত প্রশান্ত অখণ্ড অমৃত। দেখ নিজের কী অদ্ভুত পরিচয় আর আমরা তা ভুলে বসে আছি! রাজার রাজা হয়ে তুমি ভিখারি হয়ে ঘুরে বেড়াবে কেন? এই ভিখারিদশা শোভা পায় না তোমাকে। নহ তুমি ভিখারি।

শংকর আর মাতা পার্বতীর এই প্রসঙ্গে কথোপকথন আছে। শংকর ভিখারির বেশে গেয়ে বেড়াচ্ছেন এবং মাতা অন্নপূর্ণার কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাইছেন—ভিক্ষাং দেহি মাতা অন্নপূর্ণা। তখন মা ভাণ্ডারের থেকে এক চামচ তুলেছেন, তুলে দিতে গিয়ে আবার ভাণ্ডারের মধ্যে রেখে দিলেন। শংকর মাকে বলছেন—ভিক্ষাং দেহি মাতা অন্নপূর্ণা। মাতা অন্নপূর্ণা তাঁকে বললেন—তুমি আগে আমাকে দাও তবে তো আমি তোমাকে দেব, না-হলে তোমাকে দিলে তুমি যদি পালিয়ে যাও! আমাকে তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না! Wonderful! এই জ্ঞানের কথা নিয়ে অনেকেই এসেছে এবং বলেছে। উত্তরে তাদের বলা হয়েছে—হ্যাঁ, তোমাদের জিনিস তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, 'একে' আগে তার দক্ষিণা দাও। তখন তারা বলেছে, দক্ষিণা! কী আপনি চান? আপনি তো টাকাপয়সা নেন না, জিনিসপত্র নেন না, তো কী দক্ষিণা দেব? জায়গা-জমি দিলেও নেবেন না, বাড়ি-ঘর দিলেও নেবেন না, আপনাকে কী দেব? তখন তাদের বলা হয়েছিল—'এ' এক-এর কাঙাল, 'এ' তোমার (তোমাদের) ঐ আমিকে চায় যা ধার করা নয়, হাওলাতি করা নয়, যা কোনও জায়গা থেকে চুরি করা নয়, যা তোমার একান্ত নিজস্ব। ঐটুকু 'এ' চায় যা তোমার একান্ত নিজস্ব। তারা এই কথা শুনে বলল, তা আমি দেব কী করে? উত্তরে তাদের বলা হয়েছে, তাহলে? 'এর' তো দক্ষিণা লাগবে, না-হলে তোমাকে আমি-র পরিচয় দিতে পারব না। তারা বলল, আপনি এই কথাগুলো এতক্ষণ বলে আমাদের ধোঁকা দিলেন কেন? তখন বলা হল—ধোঁকা দেওয়া হয়নি, 'এ' বিকল্প একটা ব্যবস্থাও করে দেবে। তুমি যদি দিতে না-পার তাহলে একটা কাজ

কর, 'একে' মেনে নাও, 'এ' তোমার মধ্যে আমিরূপে আছে, তাহলেই 'এ' আর দক্ষিণা চাইবে না। তারা বলল, এ তো দারুণ কথা বললেন আপনি। তখন তাদের বলা হল, তুমি তো তোমার আমিকে 'একে' দিতে পারবে না, তাহলে 'এর' আমিটাই তুমি নিয়ে নাও। কী করে? তোমার মধ্যে আমি আছি—এই সত্যকে মেনে নাও। এই হচ্ছে মেনে নেওয়া।

অধ্যাত্মশাস্ত্রে চারটি শব্দের উল্লেখ রয়েছে। ভারতবর্ষে চারটি আবিষ্কৃত সত্যের formula বা ভারতের চারটি স্তম্ভ কী? শৈবমত, শাক্তমত, বৈষ্ণবমত এবং গুরুবাদ। মহেশ হচ্ছে শৈবমত, মাধব হচ্ছে বৈষ্ণবমত, মা হচ্ছে শাক্তমত আর গুরু হচ্ছে মহৎ। এই চারটি 'ম' সবকিছুকে ধারণ করে রেখেছে। 'ওম্'-এর মধ্যে 'ম' হচ্ছে আদি-মধ্য-অন্তে, বাহিরে-অন্তরে-কেন্দ্রে-তুরীয়তে। তাই নমস্কারের মধ্যে চারটে স্তর। "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।" অর্থাৎ আমিকে নিচ্ছে। মেনে নিচ্ছে কী করে? নাও মা, নাও মাধব, নাও মহেশ, নাও মহৎ। কী নেবে? তুমি তো তোমার আমিকে দিতে পারছ না, তো 'এর' আমিকে তোমার সঙ্গে মিলিয়ে নাও। This is the solution which is ever possible for one and all. জ্ঞানী, মূর্খ, পণ্ডিত, ধনী, দরিদ্র, সাধু, অসাধু, মুক্ত, বদ্ধ কিছু এসে যায় না—সবার পক্ষেই তা প্রযোজ্য। This is the formula which is applicable for one and all. প্রত্যেকেই তা অভ্যাস করতে পারে।

এখানে মত-পথের কোনও গোঁড়ামি নেই, মত-পথের কোনও সীমিত ব্যাপার নেই, অহংকারের বাহাদুরি নেই, কৃতিত্ব নেই। কী আছে? আছে গোঁড়ার আমি (গোঁড়ামি), সমদরশন। এই যে বিজ্ঞান তোমাদের সামনে রাখা হল তা হচ্ছে Oneness-এর খেলার এক অভিনব দিক। এর আরও অনেকগুলো দিক আছে। তা অভূতপূর্ব, কেন না your divine nature is infinite, it has no beginning and no end। এব কোনও আদি-অন্ত নেই, you are infinite One, in the One, of the One, from the One, for the One, by the One, with the One, to the One, on the One and beyond, and beyond beyond। This is the formula. তা শুনে পাশ্চাত্য দেশেব যে সমস্ত জ্ঞানীগুণী—বিজ্ঞানী, দার্শনিক যারা 'এর' সঙ্গে meet করেছিল তারা বলেছিল যে, You are cent percent original। তোমাকে কোনও কিছু দিয়ে যেন আমরা measure করতে পারছি না। উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, এ তো তোমারই পরিচয়। এই যে তুমি measure করতে পারছ না তা বলছে কে? তোমার ভিতরে আমিই বলছে। Is it not the same I that exists in Me and playing in you as your I? তোমার বসার ঘরের আকাশটুকুই কি একমাত্র আকাশ? X, Y, Z-এর বাইরের ঘরের আকাশটা কি আকাশ নয়? Can you deny it? একটা gross level-এ যদি তুমি তাকে limit করতে না-পার how can you limit your inner nature which is subtle and subtler as well, not to speak of the subtlest one?

তুমি কী দিয়ে সীমিত করবে? How can you set any limitation to your Self? তুমি this or that and not this or not that দিয়ে যতই নিজেকে বাঁধ বা সীমিতকর ততই

কিন্তু তুমি তোমার দিব্য অখণ্ড আত্মমহিমা বা glory-কে প্রকাশ করছ। The more you think of tne negative, the more the positive science is proved and revealed. আশ্চর্য এই বিজ্ঞান! তখন তারা এ কথা শুনে বলল যে, তুমি এই বিজ্ঞান সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে দাও, তুমি চল আমাদের সঙ্গে। তখন তাদের বলা হল—না, 'এ' "স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"। I exist everywhere, in everything and in each of you; you just realize it and express it. 'এ' গিয়ে বলবে, তাহলে তো limited হয়ে যাবে! তোমার মধ্যে যে আমি আছে সেই আমি বলুক না! If you think that this I can express, then I think that you can also express, your I also can express. I is of the same nature, of the same character, of the same One I. সেই এক-ই একমাত্র রয়েছে। তুমি কেন পারবে না? Why not you? 'এ' তা-ই চাইছে, 'এ' তো তোমাকে সেই আমি-র পরিচয় দিয়ে দিয়েছে—just you express yourself in the same nature as I have expressed it to you। দেখ একটি candle দিয়ে প্রতি বছর দেওয়ালির দিন তোমরা হাজার লক্ষ লক্ষ candle জ্বেলে দাও। এই eternal I—light of Oneness lights all I's of the same light। যতই candle জ্বালো প্রত্যেকটি candle-এর একই nature, একই character, একই আলো। কোনওটাই আলাদা আলাদা নয় যে, ব্যানার্জী বাড়ির candle-এর আলো একরকম আর চৌধুরী বাড়ির candle-এর আলো আরেকরকম। তুমি division করতে পারবে না। কাজেই ঐ condition দিয়ে, title দিয়ে তুমি 'একে' (পাকা আমিকে) কিন্তু বাঁধতে পারবে না। কেননা যতই তুমি এগুলো 'এর' আমি-র ভিতরে লাগাও 'এর' glory যেমন ছিল তেমনই থাকবে, একটুও পরিবর্তন হবে না। কাজেই 'এর' increase-ও নেই, decrease-ও নেই। একবার কথাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, দেখ 'এর' ভিতরে যে আমি আছে তার কোনও promotion-ও নেই, degradation বা demotion-ও নেই। 'এ' Class-I এর ছাত্র, One-এই আছে, One-এই থাকবে। এই One কিন্তু প্রচলিত সসীম one নয়, তা অখণ্ডভূমা নিত্য অদ্বয় এক বোধসত্তা। This One is not man-made one, it is eternal One, uncreated self-begotten One—স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ।

অনেকগুলো কথার মাধ্যমে তোমাদের সামনে এই এক-এর মহিমা প্রকাশ করা হল। This is the right time to get awakened, জাগ্রত হবার সময় হয়েছে, আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হবার সময় হয়েছে। 'এ' তোমার সময় দিয়েই বলে দিল তোঁমাকে। I turn back the whole thing to Oneness. অনেকেই 'একে' বলেছে যে, তুমি এই এক-এর অভিনব বিশ্লেষণ কর কী করে? এই যে কথাগুলোকে, সমস্ত স্তরের কথাকে ভেঙে সহজ করে এক-এ নিয়ে আস, তা কর কী করে? উত্তরে তাদের বলা হয়েছে, this is the 'Science of Oneness'। Oneness কখনও absent হয় না, আর সব absent হবে। এই One remains always the same and that One is verily you are। কী অভিনব বিজ্ঞান, ভেবে দেখ তো! নিজেকে কোনওরকম ভাবে degrade করার রাস্তা কোথাও রাখা হল না।

How can you degrade yourself? "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।" আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার কর। আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করো না। তুমি নিজেকে কেন degrade করছ? How can you consider yourself to be tiniest one, smallest one, to be subject to birth, death, conditions and limitations? তুমি দেশ-কাল, কার্য-কারণের অতীত, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির অতীত। তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলম্। Think over this, reflect on this, ponder over this. এর উপরে তুমি নিজেকে দেখ, এটাই হল তোমার নিজেকে দেখবার আয়না। This mirror is before you, within you, behind you, in front of you, in right side, left side, upward, downward—সব জায়গায় এই এক অভিন্ন আমি-র mirror দিয়ে দিলাম তোমাকে। তুমি কোথায় আছ আর কোথায় নেই! তুমি সুখে, তুমি দুঃখে, তুমি ভাবনায়, তুমি চিন্তায়, তুমি জন্মে, তুমি মৃত্যুতে, তুমি সসীমে, তুমি অসীমে, তুমি সান্তে, তুমি অসান্তে, তুমি সাকারে, তুমি নিরাকারে, তুমি দ্বৈতে, তুমি অদ্বৈতে, তুমি বহুত্বে, তুমি নিত্যে, তুমি পূর্ণে, তুমি অমৃতে— কত শুনবে বল? তুমি সর্বত্র স্বমহিমায়, আপন মহিমায় বিরাজ করছ। আপনবোধে আপনার পরিচয় যথার্থ ভাবে অনুভূত হয় বলে আপনবোধের অভিনব বিজ্ঞান এক বিশেষ ভঙ্গিমায় আলোচনার মাধ্যমে পরিবেষণ করা হল। দ্বিতীয় দিনের সমগ্র বক্তব্যই হল আত্মবোধের বিজ্ঞানবিচারের দ্বিতীয় বিচার। প্রথম বিচার গতকাল ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকদিন আত্মবোধের বিজ্ঞানবিচার তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এসবই তোমার স্ববোধাত্মা অহংদেব পাকা আমি-র আপন পরিচয়।

মন্তব্য ঃ

দ্বিতীয় দিনের বক্তব্য হল দ্বিতীয় বিচার। এই বিচার অখণ্ড ভূমা এক পাকা আমি-র সত্য পরিচয়কে আপনবোধে উপলব্ধি করার বিজ্ঞানরূপে ব্যক্ত করা হল। এই বিজ্ঞানের তাৎপর্য হল আরম্ভ থেকে শুরু করে তার ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিবর্তন। বোধময় আমিসত্তা স্বয়ংপ্রকাশ বলে তার প্রকাশবিজ্ঞান জীবনরূপ ধারণ করে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ যুক্ত হয়ে অভিব্যক্ত হয়। এই স্থূল দেহের বিবর্তন ক্রমপর্যায়ে চলতে থাকে। তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-প্রাণের বিকাশপ্রকাশও সাধিত হয় সমভাবে। তার ফলে তার মধ্যে আভাসচৈতন্যের ক্রমবিকাশ হয় উত্তরোত্তর। তা-ই মানসচেতনারূপে পরিণত হয় ক্রম অভিব্যক্তির মান অনুসারে। এই মন প্রাণ-ইন্দ্রিয়-দেহের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত থাকে। সেইজন্য বহির্প্রকৃতি অর্থাৎ নাম-রূপের প্রভাব তার মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তার প্রতিক্রিয়া জীবনকে ভোগ করতে হয়। সেই সকল প্রতিক্রিয়া হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তার যে চেষ্টা দরকার তা সম্ভব হয় উন্নত ও বৃহত্তর পর্যায়ের মানসচেতনার মাধ্যমে। এই মানসচেতনা আসে অন্তরতম/উর্ধ্বতম মানসচেতনা হতে। এই দ্বিতীয় বিচারের বিষয়বস্তু উর্ধ্বতম মানসচেতনার বিজ্ঞানের প্রথম পর্যায়। তার পরিণামই হল তৃতীয় বিচারের বিষয়বস্তু।

৬/১১/২০০১

।। তৃতীয় বিচার ।।

ওঁ

চৈতন্যং সর্বজ্ঞং সর্বং সর্বভূত গুহাস্থিতম্
সর্বভাবাতীতম্ নিত্যং পূর্ণম্ অখণ্ডম্
যস্য স্মরণমাত্রেণ জ্ঞানং সম্পদ্যতে স্বয়ং
যৈব সর্বসম্প্রাপ্তিস্বরূপ তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমো নমঃ।
যস্য বোধোদয়ে তাবৎ স্বপ্নবৎ ভবতি ভ্রমঃ
তস্মৈ সুখৈকরূপায় নমো শান্তায় তেজসে।
যস্য স্মরণমাত্রেণ জ্ঞানং সম্পদ্যতে স্বয়ং
তস্মৈ সচ্চিদানন্দ জ্ঞানাত্মনে নমো নমঃ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্ জ্ঞানগম্যং সর্বস্য হৃদিধৃষ্ঠিতম্
নিত্যশুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারম্ নিরঞ্জনম্ স্বাত্মবোধম্।।

(গুরুমন্ত্র)

একই বিষয়বস্তু আমিবোধের দৃষ্টিতে যেভাবে অনুভূত হয়েছে তা উল্লেখ করা হল—

অখণ্ড ভূমা আমিসাগরে নিরন্তর ওঠে ভাসে ডোবে নৃত্য করে
কত আমি পরস্পরে আমিবোধে অভিনয় করে
অখণ্ড ভূমা পূর্ণ আমিসাগরে।।
আমার আমি তোমার আমি সবার আমি পরস্পরে
আমিবোধে আপনারে নিরন্তর ব্যবহার করে
প্রকাশ করে স্বমহিমা আপন স্বভাবের রূপ ধরে
বৈচিত্র্যের সম্ভারে আমিবোধে পরস্পরে জীবন ভরে খেলা করে
আমিবোধে আবার ঘুমিয়ে পড়ে আমি-র অন্তরে।।
আমিবোধের পরিচয় বোধের বোধ আমিবোধে হয় স্বহৃদয়পুরে
অখণ্ড ভূমা পূর্ণ আমিসাগরে আমির লীলাবাসর আমিবোধে হয়
আমি-র সাথে আমির মিলন প্রেমানন্দের পূর্ণ দর্শন
জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরপারে প্রশান্ত অমৃত প্রজ্ঞানরূপ ধরে।।
নিত্যাদ্বৈত শাশ্বত অচ্যুত আমিতত্ত্ব স্বানুভবসিদ্ধির গভীরে স্বহৃদয়পুরে
অখণ্ড প্রজ্ঞানঘন ভূমা পরমতত্ত্ব পূর্ণ আমিসাগরে।।

(আমিতত্ত্ব)

গতকাল অন্তরের প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়েছিল অর্থাৎ বাহিরের গভীরে অন্তরে কী আছে সেই কথা। আজকে কেন্দ্রে কী আছে সেই কথা প্রকাশ হল এই গানের মাধ্যমে। এই ভাবে গানের মধ্যে দিয়ে নেমে আসে ব্রহ্মবোধ/আত্মবোধের formula-গুলি। তখন বই-শাস্ত্র পড়ার অপেক্ষা থাকে না। কিন্তু এই কথাগুলোকে contradict করা শাস্ত্রজ্ঞানীদের পক্ষেও সম্ভব নয়, কারণ এগুলি শাস্ত্রের সারাৎসার। কিন্তু মানুষের মন তা গ্রহণ করার জন্য সবসময় তৈরি থাকে না বলে পেয়েও হারায়। সবদিন তো মানুষের দেহের ক্ষুধা সমান থাকে না। যেদিন যেরকম ক্ষুধা থাকে সেদিন সেরকম ভাবে আহারে তৃপ্তি হয়।

আহারেরও চারটি স্তর আছে। স্থূল আহার, সূক্ষ্ম আহার, সূক্ষ্মতর আহার এবং সূক্ষ্মতম আহার। 'এ' সমস্ত জিনিস চার angle থেকে প্রথমে রাখছে। এই কারণে আমাদের জীবনে চারটে করে স্তর পাওয়া যায়। বাহির-অন্তর-কেন্দ্র-তুরীয়; দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন আর বোধ আত্মা; স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-কারণাতীত বা সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম; অজ্ঞান (লোকে তাকেই জ্ঞান বলে ব্যবহার করে)-জ্ঞানাভাস-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান। একই ভাবে তমঃ-রজঃ-সত্ত্ব-শুদ্ধসত্ত্ব এবং তার পরে গুণাতীত। যাই হোক, এই formula of four-এর মধ্যে এগুলো পড়ে। এই formula বইটা বেরোলে পরে বিজ্ঞানজগতে একটা আলোড়ন পড়ে যাবে, কারণ তারা এই formula-কে অতিক্রম করতে পারবে না। আমাদের জীবনের সমস্তটাই formula দিয়ে গড়া, formula দিয়ে ভরা। কিন্তু এই formula আবিষ্কার করার জন্য তপস্যার প্রয়োজন।

তপস্যা বলতে গেলে, আমাদের ভিতরে যে তাপকেন্দ্র আছে তার সঙ্গে মনের পরিচয় সিদ্ধ হওয়া। আমরা চোখ বুজে অন্ধকার দেখি, ভিতরে কিছু দেখি না। যাঁরা যোগী তাঁরা দেহের ভিতরের প্রত্যেকটি organic function T.V.-র মতো পরিষ্কার ভাবে দেখতে পান। তাঁদের কাছে আর আলাদা করে কোনও scientific apparatus-এর প্রয়োজন হয় না। এই যে নিজবোধ দিয়ে নিজবোধকে, নিজেকে আবিষ্কার করা, নিজেকে দেখা, স্থূল থেকে আরম্ভ করে, from the grossmost state থেকে আরম্ভ করে ধাপে ধাপে subtlemost state পর্যন্ত—এই হল life science। Life science starts from the base level—gross physical body, then vital body, then mental, intellectual, spiritual and divine, তার পরে transcendental and above। কাজেই formula ছাড়া সেখানে এগোবার উপায় নেই। আন্দাজে এগোবার উপায় নেই, ঐ শাস্ত্রের কতগুলো শ্লোক মুখস্থ করে এগোনো যাবে না। The scripture is secondhand knowledge which cannot lead one to perfection. কিছুটা intellectual development হয়ত সম্ভব, একটু rubbing হয়, কিন্তু তাতে অহংকারটা আরও বাড়ে। শাস্ত্র পাঠ করা পণ্ডিতদের দেখা হয়েছে, তাদের সাংঘাতিক অহংকার। তারা মনে করে তারাই একমাত্র সব জানে, আর কেউ কিছু জানে না। তারা perfect realizer-কেও ignore করে শাস্ত্রজ্ঞানের দোহাই দিয়ে। তা বহুবার পরীক্ষিত হয়ে গিয়েছে। আর 'এ' তো মূর্খ ব্যাটা, 'এর' কাছে তো খুব সুবিধা, যে যা বলে কোনও আপত্তি নেই, শুধু বলা হয়—বাবা তুমি ঠিক আছ। তুমি all right। কিন্তু তুমি যে all right সেই

সম্বন্ধে কি তুমি cent percent sanguine? তুমি কি নিজ অতিরিক্ত আর কাউকে জান? তখন তারা পড়ে যায় মুশকিলে। কেননা তার ইষ্ট তো কল্পিত ইষ্ট, যেমন তোমরা তোমাদের ইষ্ট গুরুকে চিন্তা কর নিজ থেকে আলাদা করে। কিন্তু 'এ' কিছুতেই নিজ থেকে আলাদা করে কাউকে ভাবতে পারেনি। তার জন্য অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে ছোটবেলায়, অনেক রকম অশান্তিকর ঘটনা ঘটেছে। এই শরীরটার যাঁরা পিতামাতা, তাঁরা মুশকিলে পড়েছে অনেক সময় ঠিকই, কিন্তু কী করবে! এই দুর্দান্ত শিশুটিকে ঠিক বশে আনা খুব কঠিন! কেননা, আমি কারও বশে নেই, ছিল না, থাকবেও না। 'এ' ব্যক্তির আমিকে লক্ষ্য করে কিন্তু কথাটা বলছে না।

গানের মধ্যে যা বলা হয়েছে নিশ্চয়ই সকলে তার গূঢ়ার্থ বুঝতে চেষ্টা করবে। এখানে সবাই শিক্ষিত, কাজেই গানের অর্থবোধ নিশ্চয়ই কিছু কিছু সবার হয়েছে। 'অখণ্ড ভূমা পূর্ণ আমিসাগরে'—যার উপরে কোনও conception সম্ভব নয়। এর আগের দিন বলা হয়েছে, আমি হচ্ছে এমনই একটি সত্য যাকে আমরা deny করতে পারি না। Deny করতে গেলে আবার একটা আমি-র দরকার হয়। বড় বড় নাস্তিকরাও এই জায়গায় এসে মাথা ঠুকেছে। 'এ' তাদের বলেছে, তুমি 'একে' না-মানতে পার, কিন্তু তুমি কি নিজেকে deny করতে পাব? তুমি তো আস্তিক হয়েই গেলে। নাস্তিক মানে যে কাউকেই মানে না। সে একমাত্র হচ্ছে অখণ্ড ভূমা পূর্ণের আমি, তার উপরে তো আর কেউ নেই। তাকে শাসন করবে কে? তিনি কাবও দ্বারা শাসিত হন না এবং কাউকে শাসনও করেন না, তিনি শুধু সাক্ষী। তার এক ধাপ নিচে ঈশ্বর এসে শাসন করছেন তাঁর সৃষ্টিকে। আর সাধুসন্তরা শাস্ত্র পড়ে নিজেকে, নিজের দেহ-ইন্দ্রিয়-মনকে control করার চেষ্টা করছে, তাও একরকমের শাসন করা। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক student-দের কিছুটা শাসন করে, আজকাল আর পারে না, একেবারে শিক্ষকের মুখের উপর জবাব দিয়ে দেয় ছাত্র-ছাত্রীরা। বাড়িতে মা-বাবা তাদের সন্তানদের কিছুটা শাসন করতে চেষ্টা করে, আজকাল সন্তানরা তাও শোনে না। একেবারে পরিষ্কার মুখের উপর বলে দেয়। খুব সুন্দর তাদের যুক্তি! সুন্দর বলা হল এই জন্য যে, সুন্দরের মধ্যে যা-কিছু আছে সব সুন্দরই হতে হবে যদিও তা সবার কাছে সমান ভাবে অনুভূত নয়, আংশিকভাবে অনুভূত। তাই তা আপেক্ষিক সত্যের (relative truth) পর্যায়ে পড়ে। পূর্ণ সত্য সুন্দরের দৃষ্টিতে আংশিক বা আপেক্ষিকের অস্তিত্ব নেই এবং কল্পিত হলেও গ্রাহ্য নয়। কী করা যাবে? তারা বলে, তুমি তো দিতে বাধ্য। দেহের জন্ম দিয়েছ, কাজেই দিতে বাধ্য। আবার তার চাইতে আরও একধাপ উপরে উঠে বলে—তোমরা জৈবিক আনন্দ আস্বাদন করতে গিয়ে দেহের জন্ম দিয়েছ, you are bound to take care of all these। যুক্তি হিসাবে খুব সুন্দর, ভাল। কিন্তু 'অথঃ কিম্'? তার পরে কী? যারা বাধ্য তারা যদি গত হয় তখন কে দেখবে তাকে? তার জবাবটা কোথায়? Nowhere, কোথাও নেই।

জীবনটা full of problems, আমরা নিজেরা চিন্তা ক'রে, কর্ম ক'রে, ভাবনা ক'রে অনন্ত অনন্ত সমস্যা সৃষ্টি ক'রে সংসার বানিয়েছি। সংসার হচ্ছে স্বকৃত চিন্তা এবং কর্মের

সমষ্টিগত ফল। কিন্তু যাঁরা আত্মজ্ঞপুরুষ/ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ অর্থাৎ যাঁরা অখণ্ড একবোধে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের কাছে সংসার নেই, সমসার আছে। দু'টি শব্দের মধ্যে অনেক তফাত। একটা সংসার অর্থাৎ কল্পিত কল্পনার বৈচিত্র্যে ভরা আর একটা সমসার, অর্থাৎ everything here is one substance. Appearance-এ যতই বৈচিত্র্য দেখাক, কিন্তু সবাই আমি দিয়ে গড়া এবং আমি দিয়ে ভরা। আমি মানেই চৈতন্য। চৈতন্য মানে স্বপ্রকাশ সত্তা আত্মা, তাঁর প্রকাশক কেউ নেই। অতি ক্ষুদ্রতম যে কীট তাকেও study করে দেখা গিয়েছে যে, সে স্বতন্ত্র। তার নিজের ভিতরে অনুভূতির অংশ যতই ক্ষুদ্রতম হোক তার দ্বারাই সে নিজের জীবনযাপন করে। কারও কাছ থেকে সে ধার করে না। তাই বলা হয়েছে 'যা-কিছু আমার আছে, নাই গো ঋণী আমি কারও কাছে।' তা একজন কবি বলেছিলেন—তোমার কথায় কথায় ছন্দ ঝরে। তুমি কোথায় পাও এই কথা? তার প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল—পাবার আমার কোনও স্থান নেই। কেননা আমা অতিরিক্ত আমাতে দ্বিতীয় কোনও সত্তা নেই। আমি সেই আমি, যেই আমি সবকিছুর মূলে অর্থাৎ গোড়ার আমি (গোঁড়ামি)। তখন তিনি 'একে' বলেছিলেন—তোমার অসম্ভব গোঁড়ামি! উত্তরে তাকে বলা হয়েছিল—Yes, গোড়াতে তো আমিই আছি, আর তো কেউ নেই। Can you prove anything without your I? Can you know anything without your I? Can you speak anything without your I? Can you understand anything without your I? Can you perceive anything without your I? Can you express anything without your I? খুব ভেবে বল। তখন তিনি বললেন—এ তো একেবারে rebel child! উত্তরে তাকে বলা হল—Yes, আমার বিরুদ্ধে আমি বহু জনম লড়াই করেছি, আমাকে লুকিয়ে রেখে আমাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। "কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ"—অর্থাৎ তুমি কে, আমি কে, কোথা হতে এসেছি? জবাব কেউ দিতে পারেনি। জবাব নিজের ভিতরে নিজেই পেলাম। 'মত্তঃ সর্বম্, ময়ি এব সর্বম্ জাতম্, ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্, ময়ি সর্বং লয়ং যাতি'—আমাতেই সব জাত হচ্ছে, আমার মধ্যে আমার দ্বারাই সব প্রতিপালিত হচ্ছে আবার আমার মধ্যেই সব লয় হয়ে আমিময় হয়ে যাচ্ছে—মিলিয়ে নেবে সবাই! সমস্ত বেদ-বেদান্ত, দেশ-বিদেশের সমস্ত শাস্ত্রের, দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্মের একক মূর্তি হচ্ছে এই প্রসঙ্গ।

'এ' জাতি-বর্ণ-লিঙ্গ, দেশ-কাল, কার্য-কারণ, মত-পথ কোনও কিছুকে আঘাত না-করে তাদের consummations, result of consummation of all human thoughts and ideas সবার সামনে পরিবেষণ করছে। Ideas, conceptions, discoveries সামনে রাখা হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের বলা হয়েছিল, you will hardly find one among the scientific brains without a religious feeling of his own, without a scientific feeling of his own, without a philosophical feeling of his own। The scientists, the philosophers and the religious leaders (all), each of them are possessed by the sense of universal causation. None can objectify his or her own being.

Whatever he can objectify, it is reflection of his own being, that is the becoming part of the being. His or her religious feelings, philosophical feelings and scientific feelings take the form of a rapturous amusement at the harmony of natural laws which reveal an intelligence of such superiority when compared to it all the systematic thinkings, actings, and actions of human mind appear as utterly insignificant reflection. কলকাতায় একজন মস্তবড় architect পরিচয়ের ছলে কথাপ্রসঙ্গে অনেক কথাই 'একে' বলেছিল। 'এর' কথা নিয়ে একটুখানি ঠাট্টা বিদ্রূপও করত অনেক সময়। 'এ'ও lightly তার সঙ্গে কথাবার্তা বলত। কথার শেষে তাকে বলা হয়েছিল, তুমি যতই সৃষ্টি কর, কোনও সৃষ্টিই কিন্তু তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না। ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের চাইতে মহান নয়। যারা তা ভাবে তারা ঈশ্বরকে জানে না অর্থাৎ Creator is always superior to His creation। কাজেই তোমরা যতই সৃষ্টি কর জগতের ইতিহাসে তোমরা আর কতটুকু কী করতে পেরেছ? অতীতে এই মানবাত্মার মাধ্যমে বহু বিরাট বিরাট সৃষ্টি হয়ে চলে গিয়েছে—সেই সত্যযুগে, ত্রেতাযুগে, দ্বাপরযুগে। এখন কলিযুগেও তোমরা অনেক কিছুই করছ, তা আবার ধ্বংসও হয়ে যাচ্ছে, তৈরি করছ আবার ধ্বংসও হচ্ছে—রাখতে পারছ না কেন বাবারা? Have you got any such power to maintain all these things? Never, because all these are passing shows. স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মতো তা আসে আর যায়। এটা যাঁরা জানেন এবং এই বোধে যাঁরা স্থিত তাঁরাই হচ্ছেন প্রাজ্ঞবিজ্ঞ।

বই পড়ে প্রাজ্ঞবিজ্ঞ হওয়া যায় না। আর স্বানুভবসিদ্ধপুরুষ হচ্ছেন তিনি, one who is perfectly identified with the Knowledge of Knowledge। স্বানুভবসিদ্ধপুরুষ 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং'। He never depends upon anything other than His own Self, He knows none other than His own Self, He sees none other than His own Self, He never recognizes anyone other than His own Self. তাঁর আনন্দের জন্য দ্বিতীয় কোনও বস্তুর প্রয়োজন হয় না। তাঁর দর্শনের জন্য দ্বিতীয় বস্তুর প্রয়োজন হয় না, কারণ দ্বিতীয় বস্তু তাঁর কাছে অসিদ্ধ—any second entity is impossible। This is 'নিত্য অদ্বৈতম্'। One in One, One of One, One from One, One for One, One by One, One with One, One to One, One on One and One beyond and beyond. একজন scientist বলেছিল যে, এই formula আপনি কোথায় পেলেন? তাকে বলা হল যে, পাবার জিনিস নয় এই তত্ত্ব। 'এ' যদি বলে তোমার আমিকে তুমি কোথায় পেয়েছ? তুমি কী জবাব দেবে? Objective phenomena নেই যেখানে, সেখানে তুমি এই সমস্ত প্রশ্ন করলে। তোমার সেখানে subject-object-এর conception আছে—that is also imaginary experience। কী রকম? গাঢ় ঘুমের মধ্যে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে রাতে, হঠাৎ ঘুমের মাঝখানে স্বপ্নময় স্তরে ফিরে এলে। সেখানে wonderful স্বপ্ন দেখছ, enjoy করলে কিছুক্ষণ স্বপ্ন, ঝট করে স্বপ্ন ভেঙে গেল, জেগে উঠলে—

তারপর কী হল? স্বপ্ন দেখার সময় তো তুমি সবই সত্য দেখেছিলে, জেগে ওঠার পর সেগুলো গেল কোথায়? জেগে উঠে দেখলে যে তা তো নেই, তাহলে কোনটা সত্য—dream experience or the dreamer? এই awakening state-এ the experiencer and the experience of the awakening state—কোনটা সত্য? অনেক চিন্তা করে দেখলে যে, না সে তো এখন আর আমি বুঝতে পারছি না, এখন যা বুঝতে পারছি তা-ই সত্য। কিন্তু তাও আবার যখন চলে যাচ্ছে গাঢ় ঘুমের মধ্যে তখন কিছুই নেই। No world, তোমার সাধের বাড়িঘর, আপনজন, প্রিয়জন, কলকারখানা, অফিস কিছুই নেই for some hours। তখন তুমি কোথায়? তোমার মন নেই, বুদ্ধি নেই—কে দেখবে? There is no subject at all. কাজেই inner-এর থেকে আরও গভীরে তুমি চলে গিয়েছ কারণের স্তরে। ঐ যে বলা হল, the scientists, the philosophers and the religious leaders all of them are possessed by the sense of universal causation। কারণের অধীন সব; ঐ বাহির, অন্তর আর কেন্দ্র, কিন্তু কারণাতীত স্বরূপে you are the monarch, you are the undivided One, the Absolute One without a second। তুমি "নিত্যাদ্বৈতম্ শাশ্বতমচ্যুতম্ অখণ্ডম্ পূর্ণম্ স্বতঃসিদ্ধম্ স্বতঃস্ফূর্তম্ স্বসংবেদ্যম্ স্বানুভবদেব স্বয়ং"। কোনও logic সেখানে চলবে না, ধর্মের কোনও line সেখানে নিয়ে গিয়ে তুমি প্রবেশ করতে পারবে না, সব ছেড়ে যেতে হবে। যেমন জুতো ছেড়ে মন্দিরে ঢুকতে হয়, জুতো পরে কারওকে ঢুকতে দেবে না মন্দিরে। দক্ষিণ ভারতে আবার জামা গায়ে দিয়েও মন্দিরে ঢুকতে দেয় না। সেখানে জামা খুলে একটা চাদর গায়ে দিয়ে ঢুকতে হয়।

হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ কর, তোমার বাইরের পোশাক সব পড়ে থাকবে, এমনকী তোমার দেহখাঁচা ও তার পরিচালক মনও পড়ে থাকবে। এই কথা শুনে একজন বলল—এ তো দারুণ কথা বললেন আপনি। তখন তাকে বলা হল—'এর' এই আগুন কারওকে জ্বালাবে না। The fire burns everything but it cannot burn itself. অগ্নি সবাইকে দাহ করে সত্য, কিন্তু নিজেকে পোড়াতে পারে না। Consciousness Itself removes all duality but it cannot remove Itself. Self can deny all non-self but It cannot deny Itself. আত্মবিদ্যা আত্মবোধ কাকে বলে শোন। এই আত্মারূপে যে তুমি স্বয়ং সেই সত্য তোমাদের সামনে 'এ' ধাপে ধাপে রাখছে। কেননা this science is very delicate। এখানে intellect প্রথমে সবকিছু reject করে, সে মনে করে, আমি যা জানি তা-ই ঠিক আর সব বেঠিক, সেইজন্য পরস্পরের সঙ্গে হয় দ্বন্দ্ব। কিন্তু গানের মাধ্যমে বোঝা গেল যে, প্রত্যেকেই নিজের আমিবোধ দিয়েই চলে। কিন্তু এই অভিনয় করে আবার তাকে ঘুমিয়ে পড়তে হয়। অর্থাৎ এই ক্ষুদ্রভাবটা ডুবে যায় মহৎ ভাবের মধ্যে। কার্য ডুবে যায় কারণে, কারণ ডুবে যায় মহাকারণে, মহাকারণ ডুবে যায় কারণাতীতে where you alone stand as the alpha and omega of all, as the head and shoulder of all. Wonderful! Why do you degrade yourself by considering that you are subject to your

body, senses, *prana, mana, buddhi, ahamkara, citta*. All these are nothing but different expressions of your true being, which verily you are, the Saccidananda Swarupa—Pure Consciousness, Pure Bliss and Peace Absolute. ভুলে যেও না তোমার এই সত্য পরিচয়। তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ কোথায় একটু আনন্দ পাওয়া যাবে, কোথায় একটু জ্ঞান পাওয়া যাবে, দেশবিদেশে যাচ্ছ training নেবার জন্য। So strange! নিজ অতিরিক্ত তুমি কাকে খুঁজে পাবে? যাকে পাবে তা তো shadow। Object is always shadow of the subject and subject is also shadow of the Self. Self is not a shadow. It is the essence of all. It is the revealer of all. It is the illuminator of all, the light of all lights.

কথাগুলোকে বারবার তোমাদের কাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 'এ' বলছে। কেননা ঝট করে মন সরে চলে আসবে কচুরিপানার মতো, আবার তোমার সেই স্বস্থানে—আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার স্ত্রী, আমার স্বামী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার বন্ধু, আমার বান্ধব। কোথায় থাকে এসব ঘুমের মধ্যে? এই আমারবোধ নিয়ে সংসার দেখছ শৈশব থেকে, তা আজ আছে কাল নেই। প্রতিমুহূর্তে সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে, বিকার হচ্ছে এবং রূপান্তর হচ্ছে, তবু 'আমার, আমার' সবাই বলছে এবং 'আমারবোধের' ব্যবহার করছে। This is called ignorance, otherwise there is no existence of ignorance. Ignorance is your imagination. কল্পিত কল্পনা, স্বকল্পিত কল্পনার মাধ্যমে আপনারে তুমি ঘিরে রেখেছ বারে বারে, দেখছ আপনারে নানা রূপে নানা আধারে, সবই স্বপ্নময়। এ স্বপ্ন ভেঙে গেলে দেখবে তুমি একাই আছ, দ্বিতীয় কেউ নেই। 'এ' তোমাদের সামনে যা বলছে তা অনন্ত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে থেকে কথাগুলো বলছে। এই আমি তোমাদের মধ্যেও আছে, try to discover it। কী ভাবে? সেইজন্য অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে তোমাকে, এই যে beacon light ও search light দেওয়া হচ্ছে। এই light দিয়ে তুমি দেখবে সব সরে যাচ্ছে। কোথায় সেই আমি? কোথায় আমি? এও তো আমি নই, তাও তো আমি নই। কী রকম? 'নাহং দেহ'—এই negative আরম্ভ হচ্ছে। অন্তর ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে কোথায়? শ্রীকৃষ্ণও বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় যাচ্ছেন। অক্রূর তাঁকে নিতে এসেছে। অক্রূর এখানে গুরু, আর বৃন্দাবনবাসী অক্রূরের উপর একেবারে ক্ষিপ্ত। তারা অক্রূরকে বলছে—আমাদের প্রাণনাথকে আমাদের কাছ থেকে আলাদা করে নিয়ে যাচ্ছ। এটা legendary, কিন্তু 'এ' যেই প্রসঙ্গ বলছে সেটা legendary নয়, তা reality as it is। এটা far beyond the range of human intellect and mind—'বাক্যমনাতীতম্', 'বাক্ মনসোগোচরম্', 'যত বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—যেখানে যেতে গিয়ে মন, বুদ্ধি, বাক্ অর্ধেক পথ থেকে ফিরে আসে, আর যেতে পারে না। No entry, no second entity can enter there, because there alone you are. Eternally you are alone by yourself, one by yourself—there is no duality.

দুই এসেছে এক-এর থেকেই। তুমি একা দাঁড়িয়ে আছ দুই পায়ে। একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে তালগাছ, সুপারি গাছ, নারকেল গাছ, কিন্তু জীব কেউ দুই পায়ে, কেউ বা চার পায়ে। আবার অনেক প্রাণী আছে যারা বহুপদ, যেমন পিঁপড়ে—এরকম অনেক কীটপতঙ্গ আছে। আবার একরকম কেড়ি পোকা আছে, সেগুলোর অনেকগুলো পা। কিন্তু এই স্তরের থেকে গভীরে যেতে গেলে পূর্ব স্তরকে ছাড়তে হবে। তা কী ভাবে ছাড়ছে? আমিকে শুদ্ধ করছে কী দিয়ে? আমি-র সঙ্গে যতকিছু জুড়ে ছিল, সেই জোড়া জিনিসগুলোকে এবার আস্তে আস্তে ছাড়ছে। কী রকম? 'এ' ছোট ছোট কয়েকটা উপমা দিচ্ছে বুঝবার সুবিধার জন্য, only for your clear understanding। পরিশ্রম করে বাইরের থেকে যখন কেউ বাড়িতে আসে তখন ঘরে এসে পাখার নিচে বসে জামাকাপড়গুলো খোলে। একটার পর একটা যে জামাকাপড় পরে সে বাইরে বেরিয়েছিল সেগুলো এক এক করে সব খোলে। বাথরুমে গিয়ে যেটুকু আছে সেটুকুও খুলে ফেলে। তোমরা লজ্জা পেও না, কারণ লজ্জার স্থানে আমিই আছি। আমাকে বাদ দিয়ে কেউ নেই, কোথাও কিছু নেই। এগুলো মনেরই কতগুলো ভ্রম বা ভ্রান্তি। যতক্ষণ ভ্রান্তি আছে ততক্ষণ তোমার শ্রম আছে, ক্লান্তি আছে। এগুলো সব সরে যায় যখন, তখন তুমি মনের থেকে আরও গভীরে যাও। যখন দেখছ এগুলো স্বপ্নবৎ, এগুলো একটাও সত্য নয়, magician-এর magical tricks-টা জানা হয়ে গেলে, যত সুন্দরই magic হোক কোনওটাই যে real নয় তা বোঝা যায়। সেইরূপ এই জগৎ হচ্ছে একটা magical show—ইন্দ্রজালবৎ, অর্থাৎ just like the magical game of a magician. Magician কে? স্রষ্টা ঈশ্বর, অর্থাৎ the Universal mind. Universal mind নানারকম কল্পনার বৃত্তি দিয়ে গড়েছেন এই বিশ্বজগৎ। Dont get upset by my words. তোমার মধ্যে বসেও সেই বিশ্বমন ক্রিয়া করছে, তাই তুমিও সৃষ্টি করছ কিছু-না-কিছু। You have got the same image and that is why you are able to create something, but not equal to that of the Master. কিন্তু এই বোধের ঘরে যখন যাবে তখন দেখবে কে master আর কে তাঁর follower, all are but One।

গুরু যখন শিষ্যকে তৈরি করেন সাধনার রাজ্যে, প্রথমে তিনি অজ্ঞানের স্তর থেকে আরম্ভ করেন। তার পরে আস্তে আস্তে তাকে enlightened করেন। Enlightened কথাটা নিশ্চয় সবাই বোঝে—অর্থাৎ তাকে বোধ দিয়ে সাজিয়ে নেন। আস্তে আস্তে তার ভিতরে বোধের স্তর তৈরি হতে থাকে, culmination of understanding আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে হয় এবং সে একটা stage-এ ওঠে। তখন সে বলে, আমি এসব বুঝি, আমি এসব বুঝতে পারছি, আমি এসব জানতে পারছি—যা সে জানত না। এরকম করতে করতে তার জানার পরিসীমাটা বাড়তে থাকে। ক্রমশ স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যাচ্ছে, গভীরে যাচ্ছে, যাচ্ছে গভীরতম প্রদেশে। যতই গভীরতম প্রদেশে যাচ্ছে ততই স্থূলতর ও স্থূল তার কাছে insignificant হয়ে যাচ্ছে। কী ভাবে insignificant হয় তা আজকে 'এ' ধাপে ধাপে বলবে। তার আগে একটুখানি অন্য প্রসঙ্গ করে নিতে হয়। তা না-হলে তা বোঝা খুব মুশকিল। সত্যিই

মুশকিল! কেননা 'আমি-আমার' এই ভাব নিয়ে সবাই চলছে, কিন্তু এই ভাবের গভীরে কী আছে তা তো তোমাদের শোনা হয়নি কোনওদিন, বইতে পড়ে কেউ কিছু বোঝেওনি। আর গুরুরা বীজ, নাম বা মন্ত্র যা দিয়ে দিচ্ছেন তা নিয়ে তোমরা কেউ আটবার, কেউ দশবার, কেউ আঠাশবার, কেউ বা লক্ষবার জপ করছ। But it is a mechanical practice of our mind only, which is unable to realize the Truth or Knowledge Itself. That is verily your Real Self, which is free from all conditions, limitations of attributing adjuncts—রূপ-নাম-ভাবাদি. Is it the end of your life? কিংবা তোমার সামনে একটা কিছু lighted form পরিদৃশ্যমান হল। তোমার অন্তরের ভাব ঘনীভূত হয়ে একটা রূপ ধারণ করল। তুমি হয়ত বলবে, কী করে তা সম্ভব হয়? সমুদ্রে যারা পরিভ্রমণ করেছে তারা জানে, ঠাণ্ডায় সমুদ্রের কোনও কোনও অংশে বরফ জমে যায়, সব জায়গায় নয়। আর কোনও কোনও জায়গায় জল থাকে। হিমে বা ঠাণ্ডায় যেরকম জল জমে, সেরকম গভীরে ভাব ঘনীভূত হয় যাদের, তাদের মধ্যে কিছু কিছু ঘনীভূত ভাব সামনে appear করে আবার disappear করে। এটা ভাবের দর্শন, কিন্তু বোধের ঘরে গেলে এই ভাব আর থাকে না। ভাবের ঘরে যারা তারা অভিযোগ করেছিল যে, আপনি আমাদের ভাবকে ignore করছেন! তাদের বলা হয়েছিল—বাঃ রে! তাহলে তো তোমাদের সঙ্গে কথাই বলতাম না। কিন্তু তোমাদের বলছি এর পরে আরও আছে। তুমি শুক্তো দিয়ে ভাত খেলে, তার পরে ভাজাটা খেলে, তার পরে ডাল দিয়ে খেলে আর পেট ভরে গেল। আর অন্য পদগুলো খাবে না? দেখ 'এ' কী তোমাদের সামনে রাখছে। তোমার ভাব তোমার মধ্যে উঠেছে, আবার তোমার মধ্যেই লয় হয়ে যাবে। তুমি ভাবাতীতম্ ভেদাতীতম্ দ্বন্দ্বাতীতম্। কী করে? ক্রমশ তোমার ভিতরে অনুভূতি elevated হবে অর্থাৎ অনুভূতির বিস্তার হবে। অনুভূতি বিস্তার হতে হতে মনটা কোন সময়ে দেখবে লয় হয়ে গিয়েছে, তখন আপনিই সমাধি হয়ে যাবে। যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণ সমাধি হবে না। সমাধি হয়ে গেলে তুমি সমত্বের মধ্যে অধিষ্ঠিত হবে, অর্থাৎ Oneness-এ এসে প্রতিষ্ঠিত হবে। Oneness-এ কোথায় subject, কোথায় object বল?

'এ' তোমাদের delude করতে আসেনি। তোমার ভিতরে যে cause of delusion আছে সেটাকে 'এ' সরিয়ে দিচ্ছে একটু একটু করে। তার পরে কিন্তু 'একেও' তুমি খুঁজে পাবে না, কারণ 'এ' তোমার আমি-র মধ্যে চিরকাল ছিল, চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকবে। তুমি 'একে' পৃথক করে আর খুঁজে পাবে না। There is no alternative, no substitute, কোনও substitute নেই এই আমি-র। কাজেই নিত্য অখণ্ড পূর্ণ এই আমি কারও গুরুও নয়, কারও শিষ্যও নয়; আমি ঈশ্বরও নয়, অনীশ্বরও নয়; আমি সিদ্ধপুরুষও নয়, অসিদ্ধপুরুষও নয়; আমি অবতারও নয়—আমি আমি-ই। এই philosophy এর আগে বহু বছর পূর্বে revealed হয়েছিল, recently কয়েক হাজার বছরের মধ্যে তা হয়নি। কিন্তু এই যে আমিই আমি, এই আমি দিয়ে গড়া সমস্ত আমি—এই কথাটা তোমাদের নতুন লাগছে অনেকের কাছে। এই কথার মধ্যে তুমি খুঁজে পাবে নিজের আমিকে। You will discover yourself

in you, by you and ever for you. তুমি আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। কোথায় আমি? কে এই আমি? কোথা থেকে এলাম? কেন এলাম? আমার কে আপন? কে পর? এই সব প্রশ্ন নিরসন হয়ে যাবে, negated হয়ে যাবে। কার দ্বারা? তোমার নিজের দ্বারা আবৃত বিকাশের মাধ্যমে যত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়বে ততই দেখবে তোমার অজানা সব সরে যাচ্ছে এবং জানা এসে যাচ্ছে, অদেখা সরে যাচ্ছে এবং দেখা এসে যাচ্ছে, অশ্রুত সরে যাচ্ছে এবং শ্রুত এসে যাচ্ছে। এই ভাবে ultimately you alone stand and all secondary aspects অর্থাৎ predicative part of your life or objective part of your life successively disappears forever।

'এ' নিজেকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনও কিছুকে খুঁজে পায়নি। 'একে' অনেকে বলেছে, এটা তোমার ব্যাধি, mania। তোমার mania হয়েছে। উত্তরে বলা হয়েছিল, yes right you are! I accept you but you cannot accept me. 'এ' তোমরা যে যা বলছ, সব মানতে পারছে, কেননা তার মধ্যে আমি আছে বলে। But you cannot discover that Oneness, that is why you reject me. সেইজন্য বলা হয়েছিল, গ্রহণও নয়, বর্জনও নয়, অর্জনও নয়, গর্জনও নয়—সমদরশন। Come to that Oneness. দেখি ধর্মজগতের কতখানি, বিজ্ঞানজগতের কতখানি এবং দর্শনজগতের কতখানি অধিকার কার মধ্যে কী ভাবে খেলছে।

তাদের বলা হয়েছিল— তোমরা 'এর' যে mania-র কথা বলছ তার তাৎপর্য বা মর্মার্থ তোমাদের জানা নেই, তাই আন্দাজে কথাটা প্রয়োগ করেছ। তোমাদের কাছে mania শব্দের অর্থ হল অবিদ্যা-অজ্ঞানজাত মুদ্রাদোষ। কিন্তু আমি-র মধ্যে 'এ' যে mania শব্দের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুভব করেছে তা যে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ ও অভিনব তা শোন। এই mania তো খুব ভাল কথা। 'এ' তো mania-তেই ভুগছে। Mania কী? The realization of Oneness. এই realization-এর অর্থ mania শব্দের মধ্যেই নিহিত আছে। Ma + nia = Mania; প্রথমে মা বা ম। ম-তে মা, মাধব, মহেশ ও মহৎ। শাক্তদের মা, বৈষ্ণবদের মাধব, শৈবদের মহেশ ও গুরুবাদীদের মহৎ। ম বা মা-এর মধ্যে সবই আছে। এই ম-কে নিত্য নিজের সঙ্গে অভিন্ন মেনে তাঁকে নিয়ে 'এ' চলছে, অর্থাৎ 'মেনে, মানিয়ে চলছে'। এই রোগের তো কোনও চিকিৎসক নেই, কোনও ওষুধ নেই। আবার যদি ঔষধ থাকে তাও বোধরূপী আমি অর্থাৎ বোধ আর আমি অভিন্ন এক তত্ত্ব (Consciousness), যদি চিকিৎসক থাকে তাও সেই আমি—যাবে কোথায়? কারণ ব্যাধিরূপেও আমি, বিকাররূপেও আমি, মৃত্যুরূপেও আমি, অমৃতরূপেও আমি। 'এ' কিন্তু ঠাকুর দেবতা এই সমস্ত কিছুই বলছে না, কোনও উপাধি নিচ্ছে না। আমি আমিই। Try to understand the significance of these words, the implied meaning of these words, the underlying essence of these words.

'এ' ধোঁকা দিতে আসেনি। প্রত্যেকের intellect নিশ্চয়ই alert হয়ে যাবে 'এর' এই কথা শুনতে শুনতে যে, what is this! কী বলছেন উনি! আমাদের এতকালের গড়া সব চিন্তাধারা! 'এ' কোনও কিছুকেই ভাঙছে না। এই light-টি তোমার মনে জাগলে আপনিই

ওগুলো সরে যাবে—you are not to do anything, you are not to run after your ignorance and your duality। The duality will fly away when your Oneness will stand. 'এ' কারও পিছনে ছোটেনি, কারও বিরুদ্ধে 'এর' কোনও অভিযোগ নেই—তাহলে তো নিজের বিরুদ্ধেই অভিযোগ এসে যাবে। If I talk of anything opposite to anything then I will contradict myself and that is impossible. That is not possible for the Absolute I. আমি-র শত্রুও নেই, মিত্রও নেই। কী করে সেই আমি? একে একে সবগুলোকে সে সৃষ্টি করেছিল আবার সব ছেড়ে যাচ্ছে। সবাই বলে, it is impossible! প্রথমে তাই মনে হয়। কিন্তু যেই তুমি এই কথাগুলো বলছ সেই তুমি কিন্তু কয়েকটা example শোনার পরে আর এসব বলতে পারবে না। এক ব্যক্তি জন্ম যখন নিয়েছে তখন একা এসেছে, গরিবের ঘরে জন্মেছে কিন্তু by virtue of his merit প্রচেষ্টার দ্বারা, ইচ্ছা, চেষ্টা এবং তার শক্তির দ্বারা জমি কিনেছে, বাড়ি করেছে, কারখানা করেছে, পয়সা করেছে, বিয়ে-থা করেছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদের বিয়ে দিয়েছে, নাতিপুতি হয়েছে—সব হয়েছে। আবার একটা course আসে জীবনে—তখন একে একে সব চলে যাচ্ছে এবং ultimately সেও সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন কোথায় তার বাড়ি, কোথায় তার গাড়ি, কোথায় তার নারী, কোথায় তার নাতিপুতি—Is it not a statement of fact? এগুলো প্রতিদিন চারদিকে কি হচ্ছে না? অস্বীকার করবার মতো মানুষ আছে কি? ঠিক এইরকম ভাবেই আত্মজ্ঞপুরুষ সমস্ত জিনিসকে সামনে একত্র করে নিয়ে আসেন। যেমন বাচ্চা শিশু খেলনা নিয়ে খেলে, কাউকে ধরতে দেয় না, আবার আপনিই ফেলে চলে যায়। আপন আনন্দে আপনার মধ্যে আপনি প্রবেশ করে। কী ভাবে? তখন সে প্রথমে বলছে, আমার একটা দেহ চাই। দেহ বানাল। তারপর বলছে, আমার দেহকে চালাবার জন্য প্রাণ চাই। প্রাণ বানাল। তারপর মন চাইতে মন বানানো হল। অহংকার চাই, সেইজন্য অহংকারও বানানো হল। বুদ্ধি চাই, বুদ্ধি বানানো হল। Citta is the storehouse of one's inner nature. তারপরে বলছে যে, না আরও কিছু চাই। সেটা কী? আমার আরাম, বিশ্রাম ও সুখ চাই। কিন্তু যখনই শান্তি আর অমৃতের কথা বলছে তখন দেখছে এগুলো নেই। কারণ শান্তি, অমৃত এগুলোর মধ্যে নেই। You can never find immortality, Peace, real Bliss and true happiness,unending Bliss in the mundane existence অর্থাৎ অখণ্ড সুখ, শান্তি ও অমৃত বিষয়ভোগের মধ্যে পাবে না।

এই অখণ্ড দিয়ে গানটা কিন্তু আজকে আরম্ভ হয়েছে, খেয়াল রাখতে হবে, সেখানে খণ্ডের ব্যাপার নেই—no sense of individuality, no sense of division or part. Absolute দিয়ে start করা হয়েছে, সেই Absolute-এর কথায় আবার কী করে 'এ' যাচ্ছে সেই stage-গুলো দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে একের পর এক। It is the game, 'এর' কাছে game of Oneness—'Sportful dramatic sameside game of Self-Consciousness', কিন্তু অনেকের কাছে এটা খুব কঠিন, মর্মান্তিক, ভয়ংকর, দুর্বোধ্য so and so। কিন্তু 'এ' সবার

সামনে বার বার বলছে, it is a science which will lead you to your perfection, to your original nature without any difficulty because you are in reality all-perfect One, immortal One। You have no birth, no death, no change, no modifications, no alternative, no substitute, but your mind has forgotten that. সে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছে imaginary (illusory) objective phenomena-কে, কিন্তু রাখতে পারছে না, চলে যাচ্ছে তার হাত থেকে বাইরে, তবু সে বুঝতে পারছে না। তার প্রিয়জন বিয়োগ হচ্ছে তবু সে বুঝতে পারছে না। তার নিজের দেহ ক্রমশ বিকৃত হচ্ছে—শৈশব গেল, কৈশোর এল; কৈশোর গেল, যৌবন এল; যৌবন গেল, বার্ধক্য এল। কোনও কিছুই রাখতে পারছে না। বহু চেষ্টা করছে, এমনকী ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলছে—ডাক্তারবাবু, আমি যে একেবারে দুর্বল হয়ে যাচ্ছি, একটু শক্তি কী করে পাওয়া যায়! একটা সালসা দিন, একটা টনিক দিন, না-হলে একটা injection দিন! এত কিছু করেও কিছুই হল না। শক্তির বিকারে শক্তি দিয়ে make up হয়, কিন্তু সত্তার কোনও বিকার হয় না। সুতরাং make up-এর প্রশ্নই ওঠে না।

'এ' কিন্তু statement of fact বলছে, বাস্তবের মধ্যে থেকেই সব কথা বলা হচ্ছে, 'এ' বাস্তবকে উড়িয়ে দেয়নি। কাজেই 'এর' first ground হচ্ছে বাস্তব। কিন্তু বাস্তব মানে কী? তোমার বাস কোথায়? Here or in these? না কী everywhere? দেখ, কতবড় একটা দুষ্টু মন 'এর' ভিতরে বসে আছে! সব খেলছে, আবার সব ভেঙে-চুরে নূতন করে গড়ছে। 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং।' The wonderful game of Self-Consciousness—আত্মবোধের খেলায় মেতে আছে এই শিশু। অনন্তকাল খেলে চলেছে—কত সত্যযুগ, কত ত্রেতাযুগ, কত দ্বাপরযুগ, কত কলিযুগ পার হয়ে চলে গিয়েছে, আমি যা ছিলাম তা-ই আছি—no change at all, just like your I, who is the witness of your childhood, your boyhood, your youth and at present your old age। You are that same one I who is the experiencer of all. Is it not so? 'এ' কোনও অবান্তর কথা কিন্তু বলছে না। মন দিয়ে না-শুনলে কিন্তু 'এর' একটা কথারও অর্থ কেউ বুঝতে পারবে না। তোমাদের সামনে একটা নতুন প্রসঙ্গ রাখা হচ্ছে নতুনের আনন্দ অনুভব করার জন্য। You require something new, something greater, something better than what you have এবং তোমার যা ছিল, তোমার যা আছে, তার চাইতে আরও অনেক বড় কিছু। সবচাইতে বড় হল তোমার সত্যস্বরূপ স্ববোধাত্মা পাকা আমি।

সেই বৃহত্তমকে তোমার সামনে রাখা হচ্ছে। সেই বৃহত্তম হচ্ছে পরমাত্মা পরব্রহ্ম সনাতন সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান সর্ব আমি-র আমি নিত্যসিদ্ধ পাকা আমি। He is not elsewhere—না মন্দিরে, না গির্জায়, না দরগায়, না মসজিদে। তিনি আছেন আপন হৃদয়গুহায় —at the core of heart I i.e. Knowledge of Knowledge, অর্থাৎ বোধময় আমিতে/আমিময় বোধের কেন্দ্রে। এই হৃদয়ে যখন তুমি তাঁর অর্থাৎ সেই পাকা আমি-র

সন্ধান পাবে দেখবে হৃদয় surpasses all। কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হৃদয়ের মধ্যে ওঠে, ভাসে, ডোবে—হৃদয় যেমন ছিল তেমনই আছে। হৃদয় কেন? হৃতবস্তুকে ফিরিয়ে দেয় যে তা-ই হৃদয়। অর্থগুলো 'এ' পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়ে যাচ্ছে, বোধ দিয়ে দিচ্ছে, ছোট ছোট বোধ। এই dictionary-ও কিন্তু বাইরে কোথাও নেই। হারিয়ে গিয়েছে তোমার আত্মস্মৃতি, তোমার সত্যবোধের স্মৃতি, অমৃতবোধের স্মৃতি, অখণ্ডবোধের স্মৃতি—তা 'এ' ফিরিয়ে দিচ্ছে আবার। হৃদয় গভীরে খেলছেন তিনি অদ্বয়বোধের অভিনয়—'এক যে আমি বহুরে বানাই বহুর মাঝে থাকি সদাই/সর্বপ্রকাশে অমিল করে/মিলনের তরে সংসার গড়ে/সংসার মাঝে সবারে পাঠাই/ আপনবোধের খেলার মাঝে/আপনারে যাতে খুঁজে পায় সে আপন করে।' আবার হয়ে যায় সে অখণ্ড ভূমা অদ্বয় অব্যয় অমৃতময়। যেমন বাড়ি থেকে break-fast করে জামাকাপড় পরে বাড়ি থেকে বেরোলে office করতে। হয়ত সারাদিন অফিসে খেটেখুটে lunch-টা office-এ ক'রে বিকেলবেলা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প ক'রে বাড়ি ফিরে এলে। তখন কিন্তু office-এর কথা বললে মেজাজ ভাল থাকে না, কারওরই নয়। আবার যখন office-এ বেরোচ্ছে তখন যদি গৃহিণী বলে—এসব আনবে গো! এই ফর্দ দিয়ে দিলাম। তখন উত্তরে বলে— আরে রাখ! এখন সময় নেই আমার। তখন office হচ্ছে target। এ তো day to day experience! 'এ' সেই experience ছাড়িয়ে আরও গভীরে নিয়ে যাচ্ছে—what you are in Reality, not what you are in appearance। বাহ্যত তুমি যা তা তোমার আসল পরিচয় নয়। এই যে জামাকাপড় পরেছ সেটাই কি তোমার আসল রূপ? ক্রমশ একটা একটা করে দেহ স্বেচ্ছায় ধারণ করেছ এবং অভ্যাসবশত তার সঙ্গে জড়িয়ে আছ। তা কল্পনা দিয়ে গড়েছ এবং কল্পনা দিয়েই পোষণ করছ। কল্পনার অতীত কিছুই জান না যখন, তখন কী করে ছাড়াবে? একসময় দেহ চেয়েছিলে তাই দেহ পেয়েছ; প্রাণ চেয়েছ প্রাণ পেয়েছ; মন চেয়েছ, মন পেয়েছ; বুদ্ধি চেয়েছ, বুদ্ধি পেয়েছ; অহংকার চেয়েছ, অহংকার পেয়েছ এবং তার সঙ্গে যুক্ত করে কল্পিত যা-কিছু সব হয়েছে—বাড়ি, গাড়ি, সংসার, লোকজন, টাকাপয়সা ইত্যাদি, কিন্তু শান্তি নেই।

কোথায় শান্তি পাবে? তখন ছুটছ তীর্থে তীর্থে, মন্দিরে, মসজিদে যা কোনওদিন মানোনি। তারপর হঠাৎ একজনের কাছে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে নিলে, মালা জপতে বসলে—যে ভগবানকে কোনওদিন চিন্তাই করেনি! This is the wonderful game of life! বহু এরকম 'এর' কাছে এসেছে। তাদের বলা হয়েছে, 'এ' তো দীক্ষা সম্বন্ধে জানে না কিছু! কাকে দীক্ষা বলে 'এ' তা জানে না! সেই সম্বন্ধে 'এ' কিছুই বলতে পারবে না। যাঁরা দীক্ষা দেন তাঁদের কাছে যাও। 'এ' কাকে দীক্ষা দেবে? I find none other than my own Self! 'এ' তোমাদের সঙ্গে এই যে কথা বলছে তা হল—I am speaking with myself and I am listening, কেননা আমি সর্বব্যাপী। ভুলের মধ্যেও আমি, শুদ্ধের মধ্যেও আমি। কী অভিনব eternal life science, ভেবে দেখ! This is the science of all other sciences. তা-ই হচ্ছে 'বিজ্ঞানস্য বিজ্ঞানম্'। কিন্তু এরও পরপারে 'জ্ঞানবিজ্ঞানাৎ পরাৎপরম যৎ' যা গানের মধ্যে

আজকে বলা হয়েছে। তা কীরকমভাবে সম্ভব হচ্ছে! ঘুমের মধ্যে যেমন সব ফেলে অব্যক্তের মধ্যে কারণের স্তরে চলে যাও, তেমনই সচেতন ভাবে সব ফেলে কারণাতীত পরম অব্যক্ত স্বস্বরূপের ঘরে যেতে হবে। এই স্বস্বরূপ বলতে নিত্যাদ্বৈত স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত শাশ্বত অচ্যুত অমৃত মুক্ত সচ্চিদানন্দঘন পরমতত্ত্বস্বরূপ প্রজ্ঞানঘন স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব পরব্রহ্ম পরমাত্মা পুরুষোত্তমস্বরূপকে (Supreme Reality Godhead Absolute/I Absolute) নির্দেশ করা হয়েছে। কী ভাবে? 'নাহং দেহো ন মে দেহঃ'—আমি দেহ নই, দেহ আমার নয়; 'নাহং প্রাণো ন মে প্রাণঃ'—আমি প্রাণ নই ,প্রাণ আমার নয়; 'নাহং মনো ন মে মনঃ'—আমি মন নই, মন আমার নয়; 'নাহং বুদ্ধিঃ ন মে বুদ্ধিঃ'—আমি বুদ্ধি নই, বুদ্ধি আমার নয়; 'নাহং চিত্তো ন মে চিত্তঃ'—চিত্ত আমি নই, চিত্ত আমার নয়; 'নাহং অহংকারো ন মে অহংকারঃ'—আমি অহংকারও নই, অহংকার আমারও নয়; 'নাহং জীবো ন মে জীবত্বম্'—আমি জীবও নই, জীবত্বও আমার নয়; 'নাহং দেবো ন মে দেবত্বম্'—আমি দেবতাও নই, দেবত্বও আমার নয়; 'নাহং ঈশ্বরো ন মে ঈশরত্বম্'—আমি ঈশ্বরও নই, ঈশ্বরত্বও আমার নয়। তাহলে কী? Silence-এ চলে গেলে সেখানেও আমি। কেননা 'না'ও আমার বক্ষে এবং 'হ্যাঁ'ও আমার বক্ষে। All negative and all positive are different expressions of the same One existence/real existence which is all-pervading, which is above all—that verily I am.

কী ভাবে তোমাদের সামনে আমি-র·পরিচয় দেওয়া হচ্ছে তা খুব ভাল করে মন দিয়ে শোন। This is a golden opportunity for you. দিল্লি শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে, তার মধ্যে তোমরাই কেন কয়েকজনমাত্র এই opportune moment-টা avail করার সুযোগ পেয়েছ, ভাবতে পার? একটু চিন্তা করে 'এর' প্রশ্নের জবাব দেবে। অনেকেই অনেক আশ্রম, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, তোমাদের অনেকেরই গুরু মহারাজ আছেন, অনেক কিছু আছে। 'এ' কিন্তু কারও বিরুদ্ধে কোনও কথা কখনও বলেনি, তাহলে নিজের বিরুদ্ধেই বলা হবে। 'এ' শুধু তোমাদের আপন পরিচয় সম্বন্ধে বলছে, যা তোমার সব চাইতে আপন। তা তুমি বাজারে কিনতে পাবে না, ধার করে কোথাও পাবে না, কোনওখান থেকে ছিনিয়ে চুরি করে বা ডাকাতি করেও তুমি পাবে না। তোমার নিজেকে দিয়েই নিজের মধ্যে নিজের জন্য নিজেকে এটা আবিষ্কার করতে হবে। তোমার ভিতরে সেই আমিকে দিয়েই অর্থাৎ I-কে দিয়া/I + dea (Idea) I-কে তুমি দেখবে, I দিয়েই তুমি আমিকে জানবে, I দিয়েই তুমি আমিকে অনুভব করবে। 'এ' সেই বিজ্ঞান তোমাদের সামনে রাখছে—the science which is unfolded by the Absolute alone। দ্বিতীয় কেউ এই science তোমাকে দিতে পারবে না। They can talk of some reflection of this. অদ্বৈতবাদী যারা তারা হয়ত অদ্বৈতবাদের কথা কিছু বলবেন, দ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদের কথা বলবেন, নিরাকারবাদী কিছু নিরাকারের কথা বলবেন, সাকারবাদী কিছু সাকারের কথা বলবেন, যোগী কিছু যোগের কথা বলবেন, ভক্ত ভক্তির কথা বলবেন, জ্ঞানী জ্ঞানের কথা বলবেন, কর্মী কর্মের কথা

বলবেন, যারা যাগযজ্ঞ করে তারা যাগযজ্ঞের কথা বলবেন। 'এই আমি' কীসের কথা বলছে? Try to understand. 'এ' কারও ঘাড়ে কিন্তু কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে না। I am playing with Myself, Who is the Soul of all, the Self of all, the underlying essence of all, the background of all and the Reality of all. কথাগুলোকে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার কারণ হল, in order to focus the light within, in order to enlighten your inner nature, যাতে inner nature তোমাকে তা-ই dictate করে। কী রকম? ছোট্ট শিশু গান শিখতে গিয়েছে, গানের শিক্ষক, teacher male-ই হোক আর female-ই হোক তাকে গানের অ-আ-ক-খ শেখাচ্ছে অর্থাৎ সা-রে-গা-মা দিয়ে আরম্ভ করে। তারপর কয়েকটা সা-রে-গা-মার combination দিয়ে বলছে, এগুলি তুমি অভ্যাস কর, আমার সাথে সাথে গাও, তারপর নিজে নিজে কর। বাড়িতে এসে সে সকালবেলা উঠে গলা সাধতে বসল, আর বাড়ির লোকেদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা বিরক্ত হয়ে বলল—হ্যাঁ, সকালবেলা উঠেই আ-আ আরম্ভ করেছিস! কিন্তু তাকে শিখতে তো হবেই। বেশ কয়েক বছর অভ্যাসের পর তার গলা তৈরি হয়েছে, কিছু অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। তখন তার teacher বলছে, এবার আমার সাথে সাথে গাও। কী গাইব? আমার সাথে সাথে গান কর —'হে সুন্দর সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দসাগর'। ধীরে ধীরে সে follow করছে। প্রথমদিন তার পক্ষে এ গান গাওয়া সম্ভব ছিল না।

কী ভাবে Knowledge of Knowledge জীবনে প্রকাশ হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের স্ফুরণ হয়; জ্ঞানের বিকাশপ্রকাশ হয় 'এ' সে কথাও পরিষ্কার করে তোমাদের বলবে। কেননা এগুলো পরিষ্কার করে বলার জন্যই 'এই দেহ' তৈরি হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত জট পাকানো আছে, contradiction আছে, তোমার self-made doubt, confusions আছে (মনে রেখ self-made!) ততক্ষণ তোমার দুঃখকষ্ট, ভাবনাচিন্তা ও জন্ম-মৃত্যুর কারণ কিন্তু তুমি নিজেই। There is no seperate cause other than your own Self. You are the cause, you are the effect—don't forget it! এ কথা শোনার পরে তুমি আর অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারবে না, তাহলে তুমি নিজেই defaulter হয়ে যাবে। 'এ' তো সব নিজের ঘাড়ে নিয়েছে। অতি গরিরের ঘরে 'এই দেহটা' (নিজেকে নির্দেশ করে) জাত হয়েছে। Struggle কাকে বলে তা ভালভাবেই দেখা হয়েছে। তখনকার দিন সস্তার দিন ছিল, যখন আড়াই টাকা/তিন টাকা ছিল চালের মন, তখনও square meal জোটেনি। পয়সার অভাবে লেখাপড়া শেখা সম্ভব হয়নি। বাজারের থেকে ঠোঙা আর কাগজে আসত জিনিসপত্র, আশেপাশের বাড়ির লোকেরা খবরের কাগজ রাখত, তখন তো চার পয়সা খবরের কাগজ (Newspaper) ছিল। একটা newspaper চার পয়সা, এখন কত? 'এ' তো কাগজ পড়ে না, তাই বলতেও পারবে না। এখন কত দিয়ে কেনে তা বাবারাই জানে। টাকাপয়সার সঙ্গে 'এর' প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেল কোনও সম্বন্ধ নেই। তা 'এ' স্পর্শও করে না, কারও কাছ থেকে নেয়ও না। ছুঁলে শরীরের ভিতরে eruption আরম্ভ হয়ে যায়। বিকার ব্যাধিতে ভরা

শরীরটাও কিন্তু আমি। I am not afraid of anything, কেননা আমি আমাকে কী করে ভয় করব? আমাকে ভয় করব কেন? আমি তো ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব—থাকতেই হবে। I cannot go out of Me. আমাকে তো আমি অতিক্রম করতে পারব না। Try to understand My words. এই কথা বলবার জন্য একমাত্র আমিই আছি, দ্বিতীয় কেউ নেই। অন্যেরা শাস্ত্রের কথা বলবে, দেবতার কথা বলবে, ঈশ্বরের কথা বলবে, আমি কিন্তু আমি-র কথাই বলছি। Here is One, that stands alone for One. এই আমিকে বাদ দিয়ে কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু মানুষ এই কথাগুলো গ্রহণ করবে না। অনেকে হয়ত বলবে, উনি মতলবী, politics খেলছেন, আর পাঁচজন বাবার মতো। দিল্লিতে তো অনেক বাবা এইরকম গজিয়েছে, অনেক বাবা অনেক খেল দেখিয়েছে, উনি বোধহয় আর একটা খেল দেখাতে এসেছেন। No, I am not for any fraud.

আমি আমি-র জন্য, I am for only Real I and not for anything else। কালকে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, একজন এসে বলেছিল—আপনি আমাকে আত্মজ্ঞান দিন! উত্তরে তাকে বলা হয়েছিল—আত্মজ্ঞান তো বাবা দেওয়া যায় না। সে বলল—সে কী আপনি এত কথা বলছেন, এখন কার্পণ্য করছেন কেন? দিন আমাকে আত্মজ্ঞান। আমি তো তৈরি হয়েই এসেছি আপনার কাছে। তাকে বলা হল—কী দেব তোমাকে? তার পরে যখন খুব পীড়াপীড়ি করছে তখন তাকে বলা হল—দেব তোমাকে কিছু ঠিকই, কিন্তু তার আগে দক্ষিণা দাও। সে বলল—কী দক্ষিণা দেব ? আপনি তো টাকাপয়সা নেন না, জিনিসপত্র নেন না, আপনাকে জমিজমা দিয়েছে লোকে আপনি তাও নেননি, বাড়িঘর দিয়েছে তাও আপনি নেননি, তো আপনাকে দেব কী? তাকে বলা হল—একটাই জিনিস দিতে পার। তোমার আমিকে 'একে' দিয়ে দাও। এই কথা শুনে সে বলল—আমি আমাকে দেব কী করে? উত্তরে বলা হল—দিতে পারবে না? তাহলে 'একে' দক্ষিণা দিলে না, তবে তোমাকে 'আমি-র বোধ' দেব কী করে? ঠিক আছে! 'এ' যখন তোমার সামনে আছে তখন বিকল্প ব্যবস্থা তোমাকে বলে দেবে। তুমি 'একে' দিতে পারলে না, 'এ' তোমাকে দিয়ে দিচ্ছে, তুমি নিয়ে নাও। 'একে' নিয়ে নাও। সে বলল—সেটাই বা কী করে সম্ভব? তখন তাকে বলা হল—'একে' একটু মেনে নাও তুমি। Accept Me! তখন আর কথা বলে না! 'এ' তো সবাইকে accept করে নিয়েছে আমিবোধে, আপন করে নিয়েছে আমিবোধে। আমি ছাড়া কেউ নেই। তুমি 'একে' আপন করে মেনে (তোমার আমি হল এই আমি-র আমি, অন্য কেউ নয় বা পৃথক কেউ নয়) নাও। 'এ' দিয়ে দিচ্ছে, তোমার মধ্যে মানিয়ে নাও। ঐ যে mania বলছিলে, mania কথাটির অর্থ হল—'মেনে, মানিয়ে চলা।' মাকে নিয়ে চলা, মাধবকে নিয়ে চলা, মহৎকে নিয়ে চলা এবং মহেশকে নিয়ে চলা। এটা হল আরেকটা formula। এই চারটে মত ভারতবর্ষে ধর্মজগতের সবাই follow করছে—শৈবমত, শাক্তমত, বৈষ্ণবমত আর গুরুবাদ। সবটাই ম-এর মধ্যে আছে। এমনকী বেদান্তের যে 'ওম্' সেখানেও 'ম' দিয়েই শেষ। এখন মানিয়ে তো 'এ' চলছে সব কিছু, তুমিও মানিয়ে নাও। সে বলল—যা বলি তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে ঐ এক জায়গায়

আনা....., এ কীরকম বিজ্ঞান! তাকে বলা হল, এ হল এক-এর বিজ্ঞান। এখানে intellect যত বড় giant-ই হোক তাকে ঘুরে ফিরে এসে এক-এ পৌঁছোতেই হবে।

একজন খুব বড় পণ্ডিত নিজেকে প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে, সে নাস্তিক। 'এ' তাকে দেখতে গিয়েছিল। তার সঙ্গে কথাবার্তা চলাকালীন সে 'একে' বলল—আপনি না কী ভগবানের কথা বলেন? তাকে বলা হল—হ্যাঁ 'এ' শয়তানের কথাও বলে। এই কথা শুনে তখন সে বলল—কেন? উত্তরে বলা হল—'এ' শয়তান বলে। সে বলল—আপনি শয়তান, মানে? তখন বলা হল—হ্যাঁ, 'এ' তো শয়তান। সে আবার প্রশ্ন করাতে তাকে বলা হল—শত শত তানে যে ছড়িয়ে পড়েছি তাই শয়তান। এই কথা শুনে সে বলল—বাঃ আপনি তো ভাল ভাল কথা বলেন! তাকে প্রসঙ্গক্রমে আরও বলা হল—'এ' মন্দ কথাও বলে। সে বলল—কী রকম? তখন তাকে বলা হল—তুমিও শয়তান! (বলতে বলতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন)। তখন সে বলল—আপনি আমাকে গালি দিচ্ছেন? তখন তাকে বলা হল—হ্যাঁ! একটু আগেই যে তোমাকে বলা হল, 'এ' মন্দ কথাও বলে! তুমি শয়তান নও? তুমি নাস্তিক বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছ না? তুমি এই সৃষ্টির মধ্যে সব ভোগ করছ, পাচ্ছ readymade আর তুমি বলছ কাউকে মানি না? এটা কি শয়তানের কথা না? তুমি তো ভগবান মানো না, তাহলে তুমি 'একেও' মানছ না। 'এ' কিন্তু তোমাকে মানে। সে বলল—কেন? তাকে বলা হল—তোমার মধ্যে আমি আছে বলে। সে বলল—কী? আপনি আমার মধ্যে কী করে থাকবেন? উত্তরে তাকে বলা হল—এই যে কথা বলছ তুমি, এই যে তুমি শুনছ এও তো বোধ দিয়েই করছ তুমি এবং সেই বোধ তো আমি-র পরিচয়। তুমি তো আমিকে না-মেনে আমিকে ব্যবহার করছ। এও কি তোমার শয়তানি নয়? কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পরে তার মুখচোখের চেহারা খারাপ হয়ে গেল। সে দেখল যে ওঁনার logic-এর against-এ তো কোনও logic খুঁজে পাচ্ছে না! তারপর বলল— আপনি এ জিনিস কোথায় খুঁজে পেলেন? তখন তাকে বলা হল—'এ' নিজেই তাই। 'এ' পাবে কোথায়? তুমিও কিন্তু তাই, কিন্তু ভুলে আছ, তুমি মানছ না। তুমি শুধু জানতে চাইছ। তাই জানতে জানতে তুমি জানোয়ার হয়ে গিয়েছ, কিন্তু মানতে মানতে মাতোয়ারা হতে পারছ না। এদিকে 'এ' আপনবোধে সবকিছুকে মেনে আমিতত্ত্ব হয়ে গিয়েছে। এই আমিতত্ত্বের অধীন হল অন্য সকল তত্ত্ব। সকল জ্ঞান/অনুভূতি এই আমি-র পরিচয়। এই আমি হতে শ্রেষ্ঠও কেউ নেই, নিকৃষ্টও কেউ নেই। This I is the I of all, is the witness of I and the rest. It is smaller than the smallest and greater than the greatest. It is the Absolute Reality, the ultimate essence, the infinite truth and the underlying essence of Life Divine। তুমি স্বপ্ন দেখছ, স্বপ্নটা ভেঙে গেলেও তুমি কিন্তু এই কথাই বলবে। মায়েরা সোনার গয়না পরে, ভিন্ন ভিন্ন jewellers-এর কাছ থেকে কিনে পরে। যার যে design-pattern ভাল লাগে সে তা-ই পরে। কিন্তু সোনা বাদ দিয়ে কোনও design-pattern হয় কি ? কোনও বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই তা স্বীকার করবে না। আমিকে বাদ দিয়ে

কোনও জীবন তৈরি হতে পারে না। সোনা বাদ দিয়ে যেমন সোনার গয়না হয় না, তেমনই আমিকে বাদ দিয়ে কোনও জীবন তৈরি হয় না। Self-I is the eternal life, Self-I is the eternal Love. Love reversely pronounced as 'evol'.

'এ' কিন্তু একেবারে মূলের থেকে কথা বলছে। Love-কে বিপরীতক্রমে সাজালে হয় evol। সেইজন্য আগে E আনা হল। Evol অর্থাৎ Eternal virtue of Lord। Life কী? I-Reality, One I, Self-I. এই সব কথা শুনে সে বলল—বাঃ আপনি তো বেশ সুন্দর কথাগুলো বলছেন! আপনি নিশ্চয়ই অনেক পড়াশুনা করেছেন! তখন উত্তরে তাকে বলা হল—হ্যাঁ, 'এ' এমন পড়া পড়ে গিয়েছে যে আর উঠতে পারবে না। তোমাদের মতো মাথা চাড়া দিয়ে ফসফস করতে আর 'এ' পারবে না। আমি জানি—এই কথা 'এ' আর বলতে পারবে না। কেননা, আমি জানি না তাও আমি, আবার আমি জানি তাও আমি। উভয়ই বোধের কথা—সুতরাং কোনটা বলব আর কোনটা বলব না বল? কী বলব আর কী বলব না, what and what not? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল—আপনি তো খুব interesting জিনিস প্রকাশ করছেন! কিছুক্ষণ কথা বলার পরে তাকে বলা হল—তোমার কি ভাল লাগছে? সে বলল— হ্যাঁ দারুণ লাগছে! তখন বলা হল—তাহলে তুমি মানছ? ওমনি সে alert হয়ে গেল। তখন তাকে বলা হল—তুমি নাস্তিক সেইজন্য ভাল লাগছে না, তাই না? বাবা, তুমি তো রোজ খাও, তা ভাত খাও না রুটি খাও? সে বলল—রুটিও খাই, ভাতও খাই। তাকে প্রশ্ন করা হল—তুমি আমিষ খাও না নিরামিষ খাও? সে বলল—সবই খাই। তারপর তাকে প্রশ্ন করা হল—সেগুলো খাও কেন? নাস্তিকের তো এগুলো খাওয়ার কথা নয়। যে অস্তিত্বই মানে না কোনও জিনিসের সে-ই তো নাস্তিক। তুমি তো অস্তিত্ব মানো, তুমি তো নিজেকেই মানো, এই খাবারগুলোকে মানো, পথে চলছ যখন তখন জমিকে মানো, জলকে মানো, আগুনকে মানো, বাতাসকে মানো, আকাশকে মানো, সূর্যকে মানো—তাহলে তুমি নাস্তিক হলে কী করে? আর উত্তর দিতে পারে না। তখন তাকে বলা হল—দেখ বাবা, তুমি নিজের সঙ্গে কিন্তু sameside game খেলছ, তুমি নিজেকে কি deny করতে পার? অপরকে তুমি deny কর, এই ভাবে তুমি খেলা কর, কেননা তোমার এই ভাবে খেলতে ভাল লাগছে বলে। This is a design, this is a pattern যা দিয়ে তুমি খেলছ।

এই যে আমি দেহের থেকে আরম্ভ করে সব নিয়ে আছে আবার সব ফেলেও আমি সেই আমি কী? "সর্বাত্মকোঽহম্", "সর্বোঽহম্", "সর্বশূন্যোঽহম্", "সর্বাতীতোঽহম্"।' 'নাহং নাস্তং উভয়শ্চ অবভাসকম্।' আমি আমিও না, আমি তুমিও না, কিন্তু উভয়কে আমি প্রকাশ করছি। কী অপূর্ব science! এই হল ছিন্নমস্তার রূপ। তোমরা ছিন্নমস্তার নাম শুনেছ, ছবি দেখেছ। তাঁকে প্রত্যক্ষ করলে কিন্তু ভয় পেয়ে যাবে। সত্যি সত্যিই ঐরকম একটা জীবন, নিজ মুণ্ড কেটে হাতে ধরে রেখেছেন, আর রক্ত গলা দিয়ে উঠছে আর সেই মুখে রক্তপান করছেন। তার পরে দেখা গেল তিনি মরেনওনি, কাউকে মারেনওনি। এরকম কতগুলো ঘটনা বাস্তবের মধ্যে অনেক জায়গায় ঘটেছে। তার থেকে ছোট্ট একটা উপমা বললে হয়ত

অনেকে বিশ্বাস করবে না। 'এর' অনেক কথাই অনেকে বিশ্বাস করে না, তাও কিন্তু 'এ' accept করে। Class-এ যারা পড়াশোনায় ভাল না তারা last bench-এ বসে। প্রত্যেকেই কিন্তু একই বই নিয়ে class-এ যাচ্ছে। একই teacher পড়াচ্ছেন, first bench-এর ছেলেমেয়েরা তা গ্রহণ করছে, কিন্তু last bench-এর ছেলেমেয়েরা তা গ্রহণ করছে না, তারা বসে বসে খেলা করছে, গল্প করছে ইত্যাদি। কিন্তু তারা পরিচয় দিচ্ছে আমি অমুক class-এ পড়ি, I am so and so। পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়ে, কিছুই তো পড়েনি, তখন একে খোঁচায় ওকে খোঁচায়, বই টেনে নিয়ে আসে, চোথা নিয়ে copy করে, কারণ পাশ তো করতে হবে। পাশ করার ইচ্ছাটা কিন্তু সবারই সমান। কিণ্ড পড়াশোনা করার ইচ্ছাটা সবার সমান নয়। পড়া বোঝার শক্তিটাও সবার সমান নয়। এগুলো statement of fact! 'এ' বাস্তবকে নিয়েই আরম্ভ করছে, বাস্তবের মধ্যেই দেখানো হচ্ছে—'বাস তব যস্মিন্ দেশে'। তুমি কোন দেশে বাস করছ? রূপের ঘরে না নামের ঘরে না ভাবের ঘরে না বোধের ঘরে? তাহলে কে এই আমি? "কোঽহম্"। আস্তে আস্তে প্রকাশ হয়ে পড়ছে, তখন বলছে 'সর্বং অহং'—সবই আমি, কেমন করে? 'সর্বাত্মক আমি'। তা আবার কী করে? 'সর্বশূন্য আমি'। তা আবার কী করে? 'সর্বাতীত আমি'। কী রকম self-contradictory কথা হয়ে গেল! কীভাবে হয় দেখা যাক। সকালবেলা ঘুমের থেকে উঠে তুমি বাইরে তোমার chamber-এ বসলে, খাতাপত্র file নিয়ে যখন তুমি বসলে তখন তুমি 'সর্বম্ আমি', তার পরে যখন সেগুলোকে গুটিয়ে সব রেখে আবার অন্দরমহলে যাচ্ছ তখন 'সর্বাত্মক আমি'। তার পরে খেয়েদেয়ে যখন বিশ্রাম করছ তখন 'সর্বশূন্য আমি'। তার পরে যখন ঘুমিয়ে পড়লে তখন 'সর্বাতীত আমি'। কি 'এর' কথাটা খাপ খাচ্ছে? 'এ' কিন্তু ফাঁকি দিয়ে কোনও কিছু সবার কাছে বাখছে না। কেননা 'এর' এই অস্ত্রটা ভীষণ ধারালো, মানে sharper than any sharpened weapon। এই Oneness of Knowledge-কে প্রতিহত করতে পারে সৃষ্টির মধ্যে এমন কোনও বস্তু ও অধিকারী পুরুষ (ব্যক্তি) নেই। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, আত্মার আত্মত্ব, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, Knowledge-এর knowingness—সবকিছুর মধ্যেই এক আমি।

কথাগুলো খুব ভাল করে শুনতে হবে। Knowingness of knowledge, যে knowingness না-থাকলে knowledge-এর গুরুত্বই থাকে না। The luminosity of the light cannot be divided, cannot be seperated from the light. You cannot seperate the heat and light from the fire, heat and light from the sun. So you cannot seperate yourself from others and others from yourself. কী করে করবে? বাদ দিলে বাইরে, মনের মধ্যে তো তার বীজ বা সংস্কার থেকেই যাবে। এটাই তো শ্রীচণ্ডীতে সুরথ রাজা আর বৈশ্যের problem ছিল। আপন প্রিয়জনদের জন্য অনেক কিছু করে তাদের সুখে রাখার জন্য ব্যবস্থা করেছে, অথচ তারাই ছলনা করে ছলচাতুরী করে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রাণ নিয়ে, কিন্তু প্রিয়জনের কথা ভুলতে পারছে না, মনের মধ্যে সব গাঁথা আছে, যেমন তোমাদের এখন মনের মধ্যে বাড়ির কথা,

কারও অফিসের কথা, কারও অন্যান্য problem মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারছে। আবার যাদের দুষ্টু বুদ্ধি তাদের দুষ্টুমি বুদ্ধিও খেলছে কিছু কিছু, আবার কারও ধর্মকথা মনে পড়ছে। এই মনকে অতিক্রম করার রাস্তাটা কী? ঐ আমিই কিন্তু তোমাকে নিয়ে এসেছে মনে এবং সঙ্গে যুক্ত করেছে মনরূপে। আবার আমিই মন ছেড়ে চলে যাবে কখন? যখন তুমি ঘুমিয়ে পড়বে তখন মনের সাধ্য নেই তোমাকে ধরে রাখতে পারে। যতই নস্যি দাও আর যতই coffee খাও ঘুম এসে তোমাকে ঠিক ঘুম পাড়িয়ে দেবে। এ তো প্রত্যেকেই মোটামুটি অনুভব করতে পারে। But the Science of Oneness stands as it is forever for one and all, because you are in Reality the same One which is verily I-Reality.

গানের মধ্যে বলা হয়েছে, 'সবার আমি তোমার আমি, আমি-র আমি পরস্পরে আমিবোধের অভিনয় করে আমি-র মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়ে'। আবার আমিবোধে জেগে ওঠে, আমিশূন্য কিন্তু সে কখনও হয় না। 'আমিশূন্য হয় না আমি।' কেননা আমি নিত্যপূর্ণ, কখনও শূন্য হতে পারে না। পূর্ণ কখনও শূন্য হতে পারে না। কাজেই তুমি কখনও শূন্য হয়ে যেতে পারবে না, কিন্তু শূন্যের কল্পনায় মেতে থাকতে পার। ঘুমের মধ্যে থেকে আবার পরে জেগে উঠছ। ঈশ্বর একটা সৃষ্টি করে সৃষ্টিকে লয় করে দিচ্ছেন, কল্প করে যাচ্ছেন; আবার একটা সৃষ্টি করছেন ঘুমের মতো। এক একটা কল্প হচ্ছে ঈশ্বরের কাছে একদিন এবং মানুষের কাছে সহস্র যুগ, মানুষের কালের হিসাবের থেকে তা একটু অন্য রকম। তিনি যখন সৃষ্টি করে ঘুমিয়ে পড়লেন সৃষ্টি তখন লয় হয়ে গেল। আবার যখন জেগে উঠলেন তখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল, ঠিক আমাদের day and night-এর মতো। তবে এই period সম্বন্ধে 'এ' এর পরে বলবে, এই যাত্রায় তা সম্ভব হবে না। এর পরে এখানকার কর্মকর্তারা যদি আবার ব্যবস্থা করেন তখন আরেকটা series তোমাদের সামনে রাখা হবে। কী করে এই আমি দেশ-কাল, কার্য-কারণের বিস্তার করে তার মধ্যে নিজের খেলা খেলে যাচ্ছে। What is time? What is space? What is causation? What is action? সংসারটা কী ভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন—ভববাজার। সেখানে কতরকম পসার রয়েছে। সবই কিন্তু আমিবোধ দিয়ে গড়া, আমিবোধ দিয়ে ভরা। সোনারূপার দোকানে গেলে দেখবে ornament-এর বাহার। কতরকমের design and pattern। সেখানে মা-বোনেরা confused হয়ে যায়, কোনটা নেবে তা ঠিক করতে পারে না। নিজেরই সৃষ্টির মধ্যে নিজে befooled হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য নিজেকেই নিজে ভুলে যাচ্ছে, আবার সেই ভুল নিজেই ভাঙছে। কেননা এ-ই যে তার sameside game।

আজকে অন্তর থেকে কেন্দ্রে যখন 'এ' যাচ্ছে, অন্তর আর বাহিরকে বাইরে রেখে দিয়ে যাচ্ছে। আর অন্তর-বাহিরের কথা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ঘুমের মধ্যে কিন্তু আর তোমার office, বাড়ি, আপনজনকে নিয়ে তুমি ঘুমোতে পারবে না। পাশাপাশি শুতে পার, কথা বলতে বলতে তুমি কিন্তু সবাইকে ছেড়ে চলে যাবে তোমার ঘুমের ঘরে। এই experience-টা কী করে observe করা যায়? 'এ' ঘুমকেও ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। মৃত্যুটা কী তা মানুষ জানে না। কিন্তু 'এ' মৃত্যুকেও observe করেছে। 'এই শরীর' থেকে 'এ' বেরিয়ে

গিয়েছে, ছাদ ভেদ করে সূর্যকে ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন করেছিল একজন, আপনি যে সূর্যের মধ্যে দিয়ে গেলেন পুড়ে গেলেন না? উত্তরে তাকে বলা হয়েছিল—না, সূর্যের মধ্যে একটা cool ray আছে, কেননা সূর্য পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত। পঞ্চভূতের মধ্যে পাঁচটা ভূত আছে—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। কাজেই অপের একটা অংশ সূর্যের মধ্যে আছে। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে পাঁচটা ভূত রয়েছে। এই পঞ্চভূতের দর্শন যাঁর হয়েছে তিনিই তত্ত্বজ্ঞপুরুষ। কাজেই সূর্যের মধ্যে তো আমি-ই আছি, সূর্য 'একে' পোড়াবে কেন? I-Reality is the luminosity of the sun. সূর্য 'একে' পোড়াবে কেন? 'এ' সূর্যের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেল। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র পর্যন্ত 'এ' পৌছে গেল। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হচ্ছে the biggest star, সবার উপরে। তার ray-টা reddish colour-এর। তাব মধ্যে কয়েক লক্ষ সূর্য রাখা যায়। তার light-টা আমাদের এই পৃথিবীতে আসতে কত যে light year লাগে। একটা নক্ষত্র থেকে আরেকটা নক্ষত্রের দূরত্ব এত বেশি যে একটা থেকে আরেকটা নক্ষত্রে light এসে পৌঁছোতে দীর্ঘ সময় লাগে। এই সময়কালকেই light year বলা হয়। Star-এর মধ্যে যে light-টা আমরা দেখতে পাই তা কয়েক শত বছর আগে থেকে আসছে, এখন তা আমরা দেখছি। এই দূরত্বকে মাপার জন্য অর্থাৎ এই সময়কালকে নির্দেশ করা হয় light year দিয়ে। এই star-গুলো কিন্তু এক একটা life। By virtue of merit, তপস্যার বলে তেজীয়ান হয়ে, জ্যোতির্ময় হয়ে তাঁরা মহাব্যোমে বিরাজ করছেন। অমৃতত্ব লাভ করেছেন তাঁরা।

এই প্রসঙ্গে নক্ষত্রলোক সম্বন্ধীয় একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের যোগ আছে। সেই অদ্ভুত ঘটনাটি হল—সমস্ত জ্যোতির্মণ্ডল থেকে জ্যোতির সমষ্টি এক শিশুর রূপ পরিগ্রহ করে সপ্তর্ষিমণ্ডলে প্রবেশ করে। সেখানে সাতজন ঋষি বসে তপস্যা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে নরঋষির কাছে গিয়ে শিশুটি বলল, তুমি জাগো! আমি এসেছি, তুমি জাগো! তারপর তাঁকে বলল—আমি জগতের কল্যাণে মর্তলোকে যাচ্ছি। জগতের মানুষের খুব দুর্দিন। তোমার সাহায্য আমার দরকার, জগতে একটা খেলা খেলতে হবে। সেখানকার মানুষরা খুব কষ্ট পাচ্ছে। আমি যাচ্ছি, তুমি এস। তাঁর ধ্যান ভাঙতে তিনি শিশুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সেই ঋষির বিরাট দেহ, সত্যযুগের ঋষি। আমরা ভাবতে পারি না এই সব! 'এ' এই বিজ্ঞান এর আগে কিছুটা বলেছিল। সত্যযুগের মানুষ ছিল একুশ হাত লম্বা। তাদের আয়ু ছিল একলক্ষ বছর। তারা এখনকার মানুষের মতো পরিশ্রম করে কর্ম করে কিছু করত না, সংকল্পমাত্র সব হয়ে যেত। তারা ব্যবহার করত সোনার পাত্র। 'এ' এগুলো দর্শন করেছে বলেই বলতে পারছে, 'এর' তো পড়াশোনা নেই। সত্য থেকে ত্রেতায় যখন এল তখন দেহের উচ্চতা হয়ে গেল চৌদ্দ হাত, সাত হাত কমে গেল। তাদের আয়ু $^1/_{10}$th হয়ে গেল অর্থাৎ দশ হাজার বছর। তারা ব্যবহার করত রূপোর পাত্র, সোনার পাত্রও কিছু করত, কিন্তু রূপোর পাত্রের প্রচলন ছিল বেশি। তারপরে যখন দ্বাপর এল, তখন আরও সাত হাত কমে গেল। তখন হয়ে গেল সাত হাত মানুষের height। আয়ু $^1/_{10}$th কমে গেল আরও। তারা ব্যবহার করত তাম্রপাত্র। সত্যযুগের লোক, ত্রেতার লোক,

দ্বাপরের লোক তার পরে বর্তমানে এখন কলিযুগের লোক অর্থাৎ iron age এসে গেল। আমরা এখন steel-এর পাত্র ব্যবহার করি। আর আমাদের আয়ু হয়ে গেল $^1/_{10}$th মানে একশো বছরের average আয়ু আমাদের নেই। সাড়ে তিন হাত দেহ, exceptional আছে কিন্তু average-এর কথা বলা হচ্ছে। সত্যযুগে ছিল মজ্জাগত প্রাণ, তাই ছিল আয়ু অত বেশি। ত্রেতাতে এসে গেল অস্থিতে প্রাণ। তখন ধ্যানের যুগ, জ্ঞানের যুগ থেকে ধ্যানের যুগে নেমে এল। দ্বাপরযুগ হল যাগযজ্ঞের যুগ। তখন প্রাণ এসে গেল রক্তে, কাজেই দ্বাপর যুগে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে প্রচুর। আর কলিতে অন্নগত প্রাণ। 'এ' এগুলো অনেক আগে সবার কাছে clear করেছে। এই কেন্দ্রসত্তায় এসে হবে ঈশ্বর অর্থাৎ Lord of outer and inner nature। তখন outer আর inner nature কিন্তু তোমাদের আর অভিভূত করতে পারবে না। 'এ' এই প্রসঙ্গ আরও detail-এ বলবে to make it clear and easily understandable, কেননা আমিবোধের খেলা খেলতে এসেছে 'এ'। অজ্ঞান সেখানে থাকতে পারে না।

যে অজ্ঞান নিয়ে আমরা ঘর সংসার করি সেই অজ্ঞান আস্তে আস্তে সরে যাবে। তার কারণ আমিবোধের মধ্যে আমারবোধ কমে যাবে। একসময় I + myness এসেছিল অর্থাৎ I + mind হয়েছিল, এবার I – mind হবে। বাস্তবের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল I + mind, মন না-হলে কোনও জিনিসই তুমি দেখতে, শুনতে ও জানতে পারবে না। আর যেই তুমি অন্তরে প্রবেশ করছ তখন মনকে আস্তে আস্তে অতিক্রম করে যাচ্ছ, ছেড়ে যাচ্ছ। তখন 'নাহং মন ন মে মন'—আমি মন নই, মন আমার নয়। দেহ আমি নই, দেহ আমার নয়। প্রাণ আমি নই, প্রাণ আমার নয়। বুদ্ধি আমি নই, বুদ্ধি আমার নয়। অহংকার আমি নই, অহংকার আমার নয়। চিত্ত আমি নই, চিত্ত আমার নয়। জীব আমি নই, জীবত্ব আমার নয়। দেব আমি নই, দেবত্ব আমার নয়। ঈশ্বর আমি নই, ঈশ্বরত্ব আমার নয়। আমি আমিতে পরিপূর্ণ। "একোঽহম্ দ্বিতীয় নাস্তি"। "সর্বাধিষ্ঠানম্ অদ্বয়ম্ কেবল সাক্ষিচেতা নির্গুণশ্চ। বাচো সাক্ষী প্রাণবৃত্তের্সাক্ষী বুদ্ধের্সাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তেশ্চ সাক্ষী। চক্ষু শ্রোত্রাদি সর্বেন্দ্রিয়ানাঞ্চ সাক্ষী সাক্ষী নিত্য প্রত্যগাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলোঽহম্"। এই হল "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ শান্তম্ অদ্বৈতম্। শিবম্ শিবম্ শিবম্"। অর্থাৎ Self-I is the Absolute. Self-I is the highest good, Self-I is the Reality, Self-I is the Truth of all truths. There you are not a *Jiva*. You are not conditioned by anything. You are not subject to anything. There mortality cannot enter. You are immortal, eternal, infinite One without a second, of the nature of *Saccidananda* and homogeneous.

বার বার এই কথাগুলো তোমাদের সামনে রাখার কারণ মনের মধ্যে একটু একটু করে এটা গেঁথে দেওয়া। You will discover your Self in all these words. তার কারণ এগুলি তোমারই বোধের, আত্মবোধেরই পরিচয়। তুমি শুধু তা হারিয়ে ফেলেছ। Somehow or other you have forgotten your true nature. আস্তে আস্তে সেই ভুল ভাঙছে, সরে যাচ্ছে। তোমার ভিতরে সেই stability আসছে, স্থিতি আসছে, প্রজ্ঞাস্থিতি হবে। গীতার

ভিতরে তোমরা প্রজ্ঞাস্থিতির কথা পড়েছ, স্থিতপ্রজ্ঞের কথা পড়েছ। গীতা তোমারই ভাষা। হৃদয়ের ভাষা হল গীতা। গীতাতে বলা হয়েছে 'গীতা মে হৃদয়স্থিতম্'—আমার হৃদয়ে বাস করছে গীতা। এই আমি কে? এই আমি-তুমি সেই আত্মাস্বরূপ। তুমিই বাসুদেবস্বরূপ, তুমিই কৃষ্ণ, তুমিই রাম স্বয়ং, ব্রহ্মা স্বয়ং, বিষ্ণু স্বয়ং, ইন্দ্র স্বয়ং, শিব স্বয়ং, ঈশ্বর স্বয়ং। "বিশ্বমিদং সর্বং সম্মাৎ নান্যকিঞ্চম্।" 'স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং'। 'যস্য অয়ং'—সবার ভিতরে 'স্ব অয়ম্', অর্থাৎ সেই আমি, "সোঽহং"—আমিই সেই, সেই আমি। কিন্তু এটা তুমি অনুভব করবে কী করে? সেই বিজ্ঞানই তোমাদের সামনে বলা হচ্ছে।

লক্ষ জনম "সোঽহং, সোঽহং" করে তুমি হয়রান হয়ে যাবে। এ সব করতে হবে না। সেই লক্ষ জনমের অন্ধকার সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই কথাগুলোর মাধ্যমে। শুনতে শুনতে তুমি অভিভূত হয়ে যাবে। তোমার ঘরকন্না, ঘরের কথা, দেহের কথা, অন্যের কথা, আস্তে আস্তে তুমি সব ভুলে যাবে—সরে যাবে মন থেকে এই সব স্মৃতি। আবার আসবে, আবার সরে যাবে—এই করতে করতে দেখবে এই কথাগুলো তোমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যাবে। বাড়িতে, চলতে-ফিরতে, কাজকর্মের মধ্যেও এই বোধ আপনিই জেগে উঠবে।

মন্দির কোথায়, আশ্রম কোথায়—অনেকেই জিজ্ঞাসা করে সাধুসন্তদের। 'এ' বলেছে যে, মন্দির আশ্রম আবার কোথায় হবে? যেখানে আমি আছি সেখানেই মন্দির। এই কথা শুনে এক সাধু বলেছিলেন—ক্যেয়া বাত করতে হো! শাস্ত্র পড়ে তার ধারণা যেটুকু হয়েছে তার বাইরে সে ভাবতে পারবে না। কোনও এক সময়ে কোনও এক জায়গায় অতি বৃদ্ধ এক মহাত্মাকে কথাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছিল—মহারাজজি জিন্দেগি ভর তো বহুত তপস্যা কিয়া, সাধন কিয়া, লেকিন ক্যেয়া মিলা ওহ আপ মুঝে বাতাইয়ে। তিনি বললেন, ক্যেয়া কহুঙ্গা, ছোটা যব থা তব ঘর ছোড়া। আপনে যো থে সবকো ছোড়কে অভিতক তপস্যা কর রহা হুঁ, পর অভিতক কুছ মিলা নেহী! তখন তাকে বলা হল—তব কিউ এ্যায়সে তপস্যা কর রহে হ্যায় আপ? কুছ মিলনে কা আশা হ্যায় ক্যেয়া? তখন তিনি বললেন—ইয়ে অভ্যাস বন গয়া, আভি তো অভ্যাস নেহি ছোড় সকতে। তখন তাকে বলা হল—আভি মিলনে সে ক্যেয়া হোগা আপকো? তিনি বললেন—মিলনেসে তপস্যা কা জরুরত নেহী রহেগা। তাকে আবার বলা হল—আপকো যো মিলা নেহী, জিসে আপ জানতে নেহী ওহ ক্যায়সে মিলেগা? তিনি বললেন—মুঝে মালুম হোতা হ্যায় হাম কুছ নেহী কর সকতে। তখন তাকে বলা হল—নেহী কর সকতে—ইয়ে তো অহংকারকা বাত হ্যায়। আপ ক্যেয়া অহংকারকে লিয়েঁ সাধন কিয়া? তিনি বললেন—হাঁ কুছ তো হ্যায়। অহংকারকো বড়া বনানেকে লিয়ে সাধন কিয়া, অহংকারকো বড়া বানাকে ছোটা অহংকারকো নাশ করেগা। তাকে তখন আরও বলা হল—বড়া অহংকারকো ক্যায়সে নাশ করেগা? তিনি বললেন—হাঁ ইয়ে তো কভী সোচা নেহী থা। তাকে প্রশ্ন করা হল--তো আপকা আত্মা কঁহা হ্যায়? উত্তরে তিনি বললেন—ওহি তো ম্যায় ঢুন্ড রহা হুঁ। কোশিশ কর রহা হুঁ, ধ্যান কর রহা হুঁ, লেকিন মিলতাই নেহী। উত্তরে তাকে বলা হল—আত্মা কই বস্তুকা মাফিক নেহী হ্যায় যো আপকো মিল সকতা হ্যায়! তিনি বললেন—ওহ তো নেহী

হ্যায় লেকিন শাস্ত্র মে লিখা হ্যায় কী আত্মজ্ঞান হোনা চাহিয়ে, আত্মাকা জ্ঞান হোনা চাহিয়ে। উত্তরে তাকে বলা হল—আত্মা কা জ্ঞান কোই বিষয় কা জ্ঞান নেহী হ্যায়। মনকা বিষয় অউর জ্ঞান কা বিষয় মে ক্যেয়া ভেদ হ্যায়? বিষয়কা জ্ঞান অউর জ্ঞানকা বিষয়মে ক্যেয়া ভেদ হ্যায়? মন কা বিষয়, বিষয় কা জ্ঞান, মন কা জ্ঞান, জ্ঞান কা বিষয় মে ক্যেয়া ভেদ হ্যায়? তাকে আরও বলা হল যে—ইয়ে তো ধান্দাবাজিকা বাত শুনায়া আপনে। আপ তো বহুত কুছ অভ্যাস করতে হ্যায়, বহুত শাস্ত্রপাঠ কিয়া, বহুত সাধুসন্তকা সঙ্গ কিয়া, বহুত তপস্যা কিয়া, আপকো কুছ না কুছ তো জরুর মালুম হ্যায়।

তখন তিনি 'একে' জিজ্ঞাসা করলেন—আপনে ক্যেয়া কিয়া? উত্তরে তাকে বলা হল—ম্যায়নে কুছ নেহী কিয়া, হামকো আতাই নেহী কুছ। তিনি বললেন—কিউ নেহী আতা? তখন তাকে বলা হল—আতাই নেহী, ক্যেয়া করেগা? কুছ সে হাম ক্যেয়া করেগা? হাম কুছ নেহী কর সকতে হ্যায়। কুচ কাওয়াজ সে ক্যেয়া কাম করেগা? কুচকাওয়াজ করনে সে ক্যেয়া হোগা? একটু পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ক্যেয়া কহ্ রহে থে আপ? কুচকাওয়াজ। তাকে উত্তরে বলা হল—হাঁ কুচকাওয়াজ। কুচকওয়াজ করতা নেহী military লোগ? Parade নেহী করতা military লোগ? আপ কিসকে সাথ exercise কর রহে হ্যায়? কিস কারণ? আপ জো হ্যায় সো আপ হ্যায়ই। আপ খুদ আত্মা হোকে আত্মাকো ঢুন্ড রহে হ্যায়। এ্যায়সা কভি হো সকতা হ্যায়? তিনি বললেন—নেহী, ইয়ে তো নেহী হো সকতা। তাকে আবার প্রশ্ন করা হল—তো আপকো জব আত্মাকা জ্ঞান হোগা তব ক্যেয়া হোগা? আপ যো হ্যায় উসকা ক্যেয়া হোগা? রহেগা ইয়া চলা যায়েগা? আত্মাকে সাথ মিল যায়েগা। আভী ক্যেয়া আত্মাকে সাথ মিল হুয়া নেহী? ক্যেয়া আত্মা এ্যায়সা কুছ হ্যায় যো আপসে অউর মুঝসে অলগ হ্যায়? ক্যেয়া ওহ্ অলগ হো সকতা হ্যায়? আত্মা কভি মুঝসে অলগ নেহী হো সকতা, অউর ম্যায়ভি কভি আত্মাসে অলগ নেহী হো সকতা। এই কথা শুনে তিনি বললেন—ইয়ে ক্যেয়া বাত শুনায়া আপনে। আপনে তো মুঝে নয়া রাস্তা দিখা দিয়া। তখন তাকে বলা হল—ক্যায়সা রাস্তা? তিনি বললেন—এ্যায়সা তো ম্যায়নে কভী নেহী সোচা। তাকে বলা হল—আপ জিসে আত্মা কহ্তে হ্যায় উসসে আপ অলগ ক্যায়সে হোঙ্গে? আপকা মনসে আপ অগর এ্যায়সা ভাবনা কিয়া তো অলগ হোঙ্গে। ভাবনা ছোড়নেসে আপ তো একহি রহেঙ্গে। এই কথা শুনে তিনি বললেন—হাঁ ইয়ে বাত তো ঠিকই হ্যায়। তাকে প্রশ্ন করা হল—আপকো সমাধিমে ক্যায়সা লাগতা হ্যায় যব মন নেহী রহ্তা? মনকো লাগাকে যব আপ সমাধি কা কোশিশ করতে হ্যায় তো মন রহ্ জাতা হ্যায়, হ্যায় না? জবতক মন লাগাকে সমাধি মে রহতে হো তবতক মন তো রহ্ জাতা হ্যায়। আপতো মন কা exercise করতে হো। লেকিন আপ খুদ তো মন নেহী হ্যায়, মন ভি আপকা নেহী হ্যায়। ওহ্ আপকা এক বিলাস হ্যায়, উসকা মালিক আপ খুদ হ্যায়। আপতো কহ্তে হ্যায় কি আপ বহুত কুছ অভ্যাস কিয়া। তিনি বললেন—লেকিন হামারি কোই realization নেহী হুয়া। তখন তাকে বলা হল—দেখিয়ে realization অ্যায়সা কোই সাধন কা ফল নেহী হ্যায়, ওহ্ কোই objective attainment নহী হো সকতা, ওহ্ আপকা সাথহি হ্যায়, ওহ্ খুদ আপহি হ্যায়। জো কুছ নহী

হ্যায় ওহভি আপহি হ্যায়। আপ খুদকো কভি ভুল নেহী সকতে, আপ খুদ কো কভী ছোড় নেহী সকতে। ইয়েহি হ্যায় আত্মাকা মহিমা, আত্মাকা স্বরূপ। তিনি বললেন—আপকো আত্মজ্ঞান হো গয়া হ্যায়, ইয়ে মুঝে মালুম হোতা হ্যায়। তখন তাকে প্রশ্ন করা হল—তো আপকো মালুম হো গয়া কি হামারে আত্মজ্ঞান হো গয়া হ্যায়, অউর আপকো নেহী হুয়া? আপকো ক্যায়সে মালুম হুয়া কি মেরেকো আত্মজ্ঞান হো গিয়া? ক্যায়সে আপকো পতা চলা বাতাইয়ে? তিনি বললেন—ইয়েহি থোড়া বাত করতে করতে ওহ সাধু তো রোনে লগা। উসনে মুঝে বোলা—বাবা ইয়ে ক্যায়া কর দিয়া আপনে! হামকো তো একদম মস্ত কর দিয়া। তাঁকে তখন বলা হল—নেহী বাবা, ইয়ে খেল হ্যায় আত্মাকা। আপ খুদভি আত্মা হ্যায়। আপমে আপকো ছোড়কে দুসরা কোই আত্মা নেহী হ্যায়, নেহী হো সকতা। ইধারকা যো কামরা হ্যায়, গুম্ফা হ্যায় ইয়ে গুম্ফাকো তোড়নেসে আকাশ আকাশহি রহেগা। আপকা যোভি ভাবনা হ্যায় ইয়ে ভাবনা ছোড়নেসে যো রহেগা, অউর নেহী ছোড়নেসে যো সাথ মে রহেগা ওহ বরাবর একহি হ্যায়। আপ কুছ কা ধান্দা পর মনকো লাগা দিয়া, আভি ধান্দাকো ছোড়নেসে ক্যেয়া হোগা? আপ য্যায়সে হ্যায় এ্যায়সেহি রহ যায়েঙ্গে। আপ আত্মাই থে, আত্মাই হ্যায়, আত্মাই রহেঙ্গে। ওহ আপকো কোই দে নেহী সকতা অউর লে ভী নেহী সকতা, না উসকা কোই নাশ কর সকতা হ্যায়। তিনি বললেন—আপ তো গীতাকি ভাষাকো একদম কায়েম কর লিয়া। তখন তাকে বলা হল—নেহী হাম গীতা নেহী পড়া। তিনি বললেন—ক্যেয়া বাত করতে হ্যায়? আপনে গীতা নেহী পড়া? উত্তরে তাকে বলা হল—কুছ পড়াই শুনাই হামারি কাম কা নেহী হ্যায়। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কিউ? তখন তাকেবলা হল—ক্যেয়া করেগা পড়াই করকে? হাম যো হ্যায় ওহি রহেঙ্গে।

এই কথা শুনে এত enlightened হয়ে গেলেন যে তিনি বললেন—বহুত সাধুসন্তকে সাথ মিলেথে, লেকিন এ্যায়সা বাত কোই নেহী শুনায়া। তখন তাকে বলা হল—দেখো সাধু সাধুকী বাত শুনতা হ্যায়। হাম তো সাধু নেহী হ্যায়। তিনি বললেন—কিউ নেহী? তখন তাকে উত্তরে বলা হল—হাম তো কভি অসাধু নেহী থে, তো সাধু বননেকে লিয়ে হামারি জরুরত ভি নেহী হ্যায়। এই কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তার পরে 'একে' জড়িয়ে ধরে বললেন—আজ হামারি যিতনা ভি বাকি থা সব আপনে পুরা কর দিয়া। আপ এক প্রণাম তো হামারি লিজিয়ে। উত্তরে বলা হল—নেহী বাবা, প্রণাম কা জরুরত নেহী হ্যায়, আপ খুদকো প্রণাম কিজিয়ে। আপকা চরণমে হাত লাগাকে প্রণাম কিজিয়ে।

You are the Lord of yourself, you are the *Guru* of yourself, you are the student of yourself, you are all in all. এই সব কথা শুনে তিনি বললেন—ইয়ে ক্যায়সা আত্মাকা মহিমা আপনে শুনায়া আজ! ইয়ে অনুভূতি ক্যায়সে আপকা পাক্কা হুয়া? তাকে বলা হল—ম্যায় এ্যায়সা হি হুঁ, আপভি এ্যায়াসা হি হ্যায়। ধান্দাবাজি মত কিজিয়ে। সব ঠিক হ্যায়। এই প্রসঙ্গ এখানে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে Self realization-এর জন্য কোনও রকম তপস্যা বা সাধনার প্রয়োজন হয় না। "স্ববেদনে কা নিয়মাদি অবস্থা।" অর্থাৎ there is no regulative means for the realization of your Self, because Self is

ever-realized. Self is ever-perfect. একজন realizer যখন তা বলছেন, তুমি তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখ—that is the only way, there is no other alternative। তুমি ক্রিয়াকলাপ করে কিন্তু নিজেকেই নিজে সসীম করে রাখছ। সেইজন্য বলা হয়েছে, অচিন্ত্য আত্মাকে চিন্তার দ্বারা তুমি কী করে ধরবে, মন তো সেখানে প্রবেশ করে না। 'অচিন্ত্যং চিন্ত্যমানোঽপি চিন্তারূপম্ ভজত্যসৌ'— অচিন্ত্য রূপকে তুমি চিন্তার দ্বারা ভজনা করছ। How can you realize your Self through your mind when there is no mind? You are in the Self, of the Self, from the Self, for the Self, by the Self, with the Self, to the Self, on the Self and beyond, and beyond beyond.

সাধনা একটা বিলাস। 'এর' কথা শুনে অনেকেই হয়ত একটু বিরক্ত হতে পারে এবং মনে করতে পারে যে, আমরা তাহলে যে সাধনভজন করছি, জপ-তপ করছি তা কি করব না? সব করবে, কিন্তু কার জন্য? তোমার কল্পিত ইষ্ট গুরুর জন্য না তোমার নিজের স্বরূপের জন্য? তোমার স্বরূপ বাইরের থেকে এনে কি ভিতরে ঢুকিয়ে দেবে? তোমার আমি-র জায়গায় কি নূতন কোনও একটা আমি ঢুকিয়ে দেবে কেউ? এর উত্তর 'একে' দিতে হবে। Can you get another I in place of the present I? বর্তমান আমি-র জায়গায় কী তুমি আত্মার আমি, ব্রহ্মের আমি, সত্যের আমি, আলাদা করে একটা আমিকে খুঁজে পাবে, না এই আমিই সেই ভাবে ফুটে উঠবে, কোনটা? কাজেই এই বিজ্ঞান যতই শুনবে ততই মধুর মনে হবে। 'মধুরং মধুরং' করতে করতে তুমি উপলব্ধি করবে how wonderful it is! আমি আত্মা ছিলাম, আত্মা আছি, আত্মা থাকব। এক অখণ্ড ভূমা আমি-র পরিচয় আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এখন ভুলটা ভেঙে গিয়েছে, স্বপ্ন দেখছিলাম, স্বপ্নটা ভেঙে গিয়েছে। This is such a funny game! 'এ' কিন্তু বানিয়ে একটা কথাও কারও কাছে বলছে না। কেননা 'এ' যদি তোমাকে ধোঁকা দেয় সেই ধোঁকাটা return হয়ে 'এর' কাছেই ফিরে আসবে। আমিই বলছি, আমিই শুনছি—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। সুতরাং I cannot deceive myself। আমি কখনও আমিকে ধোঁকা দিতে পারে না, অহংকার দিতে পারে। অহংকার আর অহংদেব এক কথা নয়। অহংকার মানে দেহেন্দ্রিয়-প্রাণের সঙ্গে যুক্ত যে আমি সেই আমি, অর্থাৎ কাঁচা আমি। কী রকম?

আমির আমি অহংদেব ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম পরম
বিশুদ্ধ চৈতন্য সর্বসম নির্গুণ নিরঞ্জন।।
সর্ববোধের অধিষ্ঠান সর্বভাবের সমাধান
সচ্চিদানন্দঘন প্রীতম স্বানুভবদেব স্বয়ং।।
আমির ব্যবহার আমি আবার অহংকার অভিমান
চিদাভাস গুণাধীন অন্তঃকরণ বুদ্ধি মন।।
আত্মার আমি অহংদেব পুরুষোত্তম ভগবান
নির্গুণগুণী অন্তর্যামী পাকা আমি সনাতন।।

অহংকারের আমি জীবের আমি কল্পনাপ্রধান
গুণাধীন কাঁচা আমি জানে না পাকা আমির ধরম।।
জীবের আমি অজ্ঞানী জানে না পাকা আমির সাধন
অজ্ঞানেতেই জন্ম তার অজ্ঞানেতেই মরণ।।
পাকা আমি নিত্য সত্য অখণ্ড পূর্ণ সনাতন
নাইরে তার জন্ম-মরণ নাইরে কোনও পরিণাম।।
সর্ববোধের অধিষ্ঠান সর্বভাবের সমাধান
সচ্চিদানন্দঘন প্রীতম স্বানুভবদেব স্বয়ং।।
(সিন্ধুভৈরবী—দাদরা)

তোমার real nature-টা যা তা-ই বলা হল। আমি-র আমিতে তুমি কী করে আসবে সেই বিজ্ঞানই তোমাদের সামনে বলা হল। এখন দেখ, সময় তো সব দিক দিয়েই কম! বাড়িঘরে সবাই যাবে, আবার বাড়িঘরের কাজ আছে। তার মধ্যেও কিন্তু তুমিই রয়েছ, আমিই রয়েছে। 'এ' কিন্তু সংসারকে কখনও আত্মবিরোধী বলেনি। তোমার আত্মজ্ঞানের জন্য বা ঈশ্বরলাভের জন্য বনে জঙ্গলে যেতে হবে না, পাহাড় পর্বতে যেতে হবে না, গুহাগহ্বরে যেতে হবে না, কিছু ছাড়তে হবে না। এ এক অভিনব বিজ্ঞান! তুমি যা ছিলে তা-ই থাকবে, তার মধ্যেই তুমি নিজেকে আবিষ্কার করবে, কেননা তুমি চিরকালই বর্তমান আছ নিজের মধ্যে নিজে। তুমি হারাওনি। এই সত্যই এই কথার মধ্যে তুমি আবিষ্কার করবে। এর চাইতে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না। This is the highest attainment, highest achievement. This is the goal of life for which you are struggling for ages together. যুগযুগ ধরে, জন্মজন্মান্তর ধরে মানুষ হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে নিজেকে, দেশ হতে দেশান্তরে, রূপ হতে রূপান্তরে, নাম হতে নামান্তরে, ভাব হতে ভাবান্তরে। কত রূপ ধরে এসেছ, কত জনম নিয়েছ, কত জায়গায় ঘরসংসার বেঁধেছ, ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে সব। আবার বাঁধছ, আবার বাঁধবে, this is coming and going। কাকে দিয়ে? তোমার আমিকে দিয়েই। এই আমি ছাড়া হয় না আমি। তা এর পরের স্তরে আরও clear করে তোমার সামনে রাখা হবে, তবে প্রসঙ্গটা শুনতে শুনতে clear হবে। এছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। এ হল শ্রুতির বিজ্ঞান। সাধনভজন, ক্রিয়াকলাপ করে কিছুই হবে না। কবির ভাষায়—"আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ চিনি না।" সত্যিই তো! তোমার বৃহত্তর, বৃহত্তম আমিটি তোমাকে হাতে ধরে নিয়ে যাবে। That is your Self, that is your Guru, that is your Maa, that is your Thakur within you, in your I. তা তোমার আমি-র মধ্যে আছে, বাইরে কোথাও নেই।

'নাইরে নাই আমি কভু আমি ছাড়া ভাই
আমির মধ্যে আছি আমি আমির মধ্যে ছিলাম
আমির মধ্যে থাকব আমি এই কথাটাই শুনিলাম।'
... . (বাউল—দাদরা)

অখণ্ড আমিতত্ত্বের কোন তুলনা নাই কোন তুলনা নাই
মহাশূন্যে আমির মাঝে আছি আমি নিত্য একাই।।
আমিতে পূর্ণ আমির বাস আমির জন্য আমি হতে আমিব প্রকাশ
আমির দ্বারা জানি আমি আমাকেই মানি আমি
সগুণ নির্গুণে আমি আবাব নির্গুণগুণী স্বয়ং আমি।।
আমির মাঝে খেলি আমি নিত্যাদ্বৈত পরমতত্ত্ব ইহাই
আমির কোন দ্বৈত নাই আমির মাঝে আছি আমি একাই।।

(বাউল—কাহারবা)

তোমার পরিচয় তোমার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, এখন তুমি রাখবে কী রাখবে না, ব্যবহার করবে কী করবে না, তা কিন্তু তোমার decision। এখানে কিন্তু কোনও দোষ নেই। তুমি যদি নাও গ্রহণ কর তাতে তোমার আমি ছোট হয়ে যাবে না। তাতে কিন্তু এই বৃহত্তর আমি-র একটুও কমবে না, আবার গ্রহণ করলেও একটুও বাড়বে না। আমি আমিই থেকে যাবে। Whether this I knows or not, no matter, I remains always the same. কাজেই তোমাব পরিচয় সম্বন্ধে বাইরের, অন্তরের এবং কিছুটা কেন্দ্রের সংবাদ তিন দিনে তোমরা শুনলে। বাকিটা এর পরে আবার বলা হবে। তারপর পুরোটা নিয়ে নিজেকে দেখবে। তার পরে যদি কিছু বলার থাকে তখন বলা হবে। 'এ' সবসময় ছিল, সবসময়ই আছে। তারও রহস্য তোমরা অনুভব করতে পারবে যে, Real-I cannot go out of Me। আমি যেথা আছে, সেথা কেবল আমিই আছে। 'এ' যে আমি-র কথা বলছে, নিজের আমি দিয়েই তুমি তার পরিচয় পাবে।

Self-I never likes to spoil anything. ক্ষুদ্রতম বস্তুও 'এর' কাছে আপন। নিকৃষ্ট বস্তুও 'এর' কাছে আপন। যা আজ তুমি নিকৃষ্ট মনে করে ফেলে দিচ্ছ, এমন একটা সময় আসবে যখন সেটার প্রয়োজন হবে। একজন ভক্ত, খুব বড় একজন মহাপুরুষের শিষ্যা, একটা খাতা সেলাই করতে গিয়ে অনেকখানি সুতো কেটে ফেলে দিচ্ছিল। তখন তাকে বলা হল, মা এ কী করলে? এই সুতোটা ফেলে দিলে কেন? তুলে রাখ। সে বলল—এটা দিয়ে কী কাজ হবে? তখন তাকে উত্তরে বলা হল—রাখ না, একটা সময় আসবে এতটুকু সুতোর জন্য তোমাকে মুশকিলে পড়তে হবে। এই কথা শুনে সে বলল—সেকী! তখন বলা হল—এর মধ্যেও কিন্তু সত্য আছে। একদিন গেল এই ঘটনা। আর একদিন ছোট্ট এতটুকু একটা কাগজের প্যাকেট, সেটা মুড়ে waste paper basket-এ ফেলে দিচ্ছিল। তখন বলা হল—এ কী করছ? ফেলে দিও না। সে বলল—কেন? এ দিয়ে কী হবে? সেই সময় ঝাঁটা দিয়ে বাড়ির লোক ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল—ও কী করছে? সে বলল—ও ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। তখন তাকে বলা হল—ঝাঁটাটা আমার হাতে দাও। ঝাঁটাটা নিয়ে চারদিক থেকে ময়লাগুলো একটা পরিস্কার জায়গায় centre-এ নিয়ে এসে ওই প্যাকেটের মধ্যে তুলে তাকে বলা হল—ঐ সুতোটা দাও। তারপর সুতো দিয়ে বেঁধে একটু জলের ছিটা দিয়ে

dustbin-এ প্যাকেটটা ফেলে দেওয়া হল। তারপর ঐ জায়গাটা হাত দিয়ে পুঁছে নেওয়া হল। তারপর তাকে বলা হল—এই ভাবে পরিষ্কার করতে হয়। সব দেখে শুনে সে বলল—এ কী বিজ্ঞান! তখন বলা হল—হ্যাঁ, ঝাঁটা দিয়ে ঐভাবে ঝাঁট দেয় না, তা অলক্ষ্মীর লক্ষণ। অলক্ষ্মী বলার কারণ হল, ঐ ধুলোগুলো ছড়িয়েই পড়ল চারদিকে। এই আমি-র বিজ্ঞান এত perfect যে কোনও জায়গায় তোমার কাজে কোনও ত্রুটি থাকবে না।

একদিন, বহু বছর আগে, তখন কিছু লোক 'এর' কাছে আসতে শুরু করেছে। 'এ' তো স্বপাক রান্না করে যাই হোক গ্রহণ করত, অল্প জিনিসপত্র ঘরের ভিতরে, বাসনপত্র ইত্যাদি থাকত। লোকজন এলে পরে চা দেওয়া হত সবাইকে, তখন 'এই শরীরটাও' চা গ্রহণ করত। অনেক বছর আগেকার কথা। খুব ভাল brand-এর চা—এখন থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে নিশ্চয় বর্তমানের মতো অবস্থা ছিল না। যাই হোক অনেকগুলো কাপ রাখা হয়েছিল, কাপগুলো ভেঙে যায় বলে অনেকগুলো গ্লাস রাখা থাকত। গ্লাসগুলো ভেঙে গেলে আবার নিয়ে আসা হত। অনেকগুলো গ্লাস সাজানো থাকত। সেই সময় electric stove-এ অর্থাৎ heater-এ একবেলা রান্না করে কিছু খাওয়া হত, আর দুধ রাখা হত চা বানাবার জন্য। সেই সময় সকলের জন্য খাবার বানিয়ে রাখা হত। একদিন ধরা পড়ে গেল 'এ'। সবাই জিজ্ঞাসা করত যে, ভাল ভাল খাবার আপনি কোন দোকান থেকে কিনে আনেন? আমরা বাড়িতে কিনে নিয়ে যাব। তখন তাদের বলা হত—আচ্ছা সেটা না হয় পরে বলা হবে, এখন থাক। তা একদিন খাবার বানাবার সময় লোক এসে পড়াতে সব দেখে ফেলল। যাই হোক, যেই জন্যে এটা বলা হচ্ছিল, ঐ খাবার বাসনগুলো যে সব মায়েরা আসত তারা পরিষ্কার করতে চাইত। তারা বলত—আপনি এভাবে এত সব করছেন, আমরা এগুলো পরিষ্কার করে দিই। তাদের বলা হত—না, তোমরা এগুলো করো না, তোমাদের বাড়িঘরেরটা কর, এখানে কিছু করো না, তাহলে 'এর' কতগুলো অসুবিধা হবে। তারা বলত—কী অসুবিধা হবে আপনার? তখন বলা হত—'এর' অসুবিধা হবে, 'এ' অলস হয়ে যাবে। 'একে' অলস বানিয়ে দেবে তোমরা? তোমাদের বাড়িঘরের কাজটা তোমরা কর ঠিক মতো। তারা জোর করে বাসনগুলো ধুয়ে নিয়ে এল। তখন তাদের বলা হল, বাসন ধুয়ে নিয়ে এলেই ধোয়া হয়ে গিয়েছে ভেবেছ? তারা বলত—হ্যাঁ। তখন উত্তরে বলা হয়—না ধোয়া হয়নি। তারা এই কথা শুনে বলল—এই তো ধুয়ে নিয়ে এলাম! তখন বলা হল—না এরকম ভাবে ধুতে নেই। তুমি এই বাসনগুলো ধুয়ে এখানে রাখলে, এবার দেখ 'এ' কী ভাবে পরিষ্কার করে। বাসন ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে এসে তাদের বলা হল—দেখ, তুমি কীরকম ভাবে ধুয়েছিলে আর তা 'এ' কীরকম ভাবে ধুলো। ধুয়ে আনার পর কাপড় দিয়ে মুছে জায়গা মতো সেগুলো গুছিয়ে রাখা হল। তারপর তাদের বলা হল—এই ভাবে জিনিস রাখতে হয়, এই ভাবে জিনিসের যত্ন নিতে হয়। এর মধ্যেও আমি আছি। আমি আমাকেই সেবা করলাম। তারা বলল—এ কী! এভাবে তো সংসার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না! তখন তাদের বলা হল—সেইজন্যই তো বলেছিলাম তোমরা পারবে না, তোমরা দেখ। এখানে এসেছ, দেখ নূতন কিছু পাও কি না। বাড়ির কাজ করতে গিয়ে তোমরা বিরক্ত হও, অসন্তুষ্ট হও, ক্ষেপে যাও, ফেলে রেখে দাও কাজ। তিন দিনের কাজ পড়ে থেকে জমে যায়। এটা কিন্তু right use নয়।

Right knowledge ছাড়া right use হয় না। অর্থাৎ সত্যিকারের জিনিসটা (ব্যবহারবিজ্ঞান) জানা না-থাকলে তার যথার্থ ব্যবহার করা যায় না। যথার্থ ব্যবহারের জন্য কতগুলো জিনিস শিখতে হয়। যারা জানে তাদের দেখে শিখতে হয়, শুনে শিখতে হয়, তা না-হলে ঠেকে শিখতে হয়। এই তিনটের মধ্যে সবচাইতে ভাল হচ্ছে দেখে শেখা, তার পরে শুনে শেখা অথবা ঠেকে শেখা। কিন্তু ঠেকে শেখা ভাল নয়, তাতে কিছু loss হয়। সংসারে বেশিরভাগ লোকই ঠেকে শেখে, আবার একদল ঠেকেও শেখে না। 'এর' কাছে সংসার কিন্তু important। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আমি আছি। তোমাদের বাসনপত্র, ঝাঁটা হতে আরম্ভ করে সবকিছুর মধ্যে আমি আছি। তাহলে ভেবে দেখ যে, এই আমিবোধ কী ভাবে তোমাকে perfection-এর মধ্যে পৌঁছে দেবে। কিছুই তোমার ছাড়তে হবে না। আপনা থেকেই তা তোমার ভিতরে প্রকাশ হয়ে পড়বে। তুমি তখন সব জিনিসের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি খুঁজে পাবে—that is the right knowledge, that is the right understanding—Knowledge of Knowledge। এর পরে চারদিন এই মাসেরই শেষের দিকে আবার নূতন করে অনেককিছু শোনা যাবে। দেখ তার মধ্যে তুমি নিজেকে কী ভাবে আবিষ্কার করতে পার! কিন্তু যতক্ষণ আবিষ্কার করতে না-পারছ ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই আমি-র সঙ্গে তোমাদের পুরোপুরি identity হবে না। আর identity হয়ে গেলে দেখবে আমি তোমার সঙ্গে চিরকাল ছিলাম, আছি এবং থাকব। আমাকে তুমি বাদ দিতেই পারবে না। এই আমি কোনও ব্যক্তি নয়, এই আমি কোনও ভাবও নয়, নামও নয়, অথচ সবকিছুর মধ্যে আছে স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায়। যাই হোক, আজকের কথাগুলো নিয়ে একটুখানি ভেব, প্রয়োজন হলে কথাগুলো লিখে রেখে দিও। সে-ই হচ্ছে চতুর যে কোনও কথা হারায় না। সবকটা কথা নিয়ে তারিখ দিয়ে, সময় দিয়ে লিখে রাখলে তার কাছে এটা guiding principle হয়ে কাজ করবে। এটা তার কাছে সম্বল হয়ে গেল, কারণ এই সম্বল সব জায়গায় পাওয়া যায় না, সত্যিই পাওয়া যায় না। অনেক জায়গায় 'এ' ঘুরেছে, বড় বড় আশ্রমেও ঘুরেছে, সেখানে অনুষ্ঠান হয়, পূজা উৎসব হয়, সবকিছু হয়, কিন্তু তত্ত্বকথা সেখানে আলোচনা হয় না, শাস্ত্র কথা হয়, তথ্য কথা হয় not তত্ত্বকথা। গীতা পাঠ হচ্ছে, গীতার ব্যাখ্যা হচ্ছে, উপনিষদ পাঠ হচ্ছে, চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষের জীবনী পাঠ হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা হচ্ছে—but not about *Tattva* অর্থাৎ তত্ত্ববিশ্লেষণ হয় না। আমিতত্ত্ব সেখানে কিন্তু absent without which তোমার তরকারি আলুনি হয়ে যাবে। খুব যত্ন করে তরকারি রান্না করলে, কিন্তু খেতে বসে দেখলে তরকারিতে নুনই দেওয়া হয়নি। এও যেন ঠিক তাই। এই আমি ছাড়া যা-কিছুই তৈরি করবে তা-ই কিন্তু imperfect।

আমিকে দিয়ে, আমিকে জুড়ে যা-কিছু করবে তা যোগসিদ্ধি। হয় আমি-র সঙ্গে সব জোড়ো নয়ত সবকিছুর সঙ্গে আমিকে জোড়ো। দু'দিকেই তোমার সুবিধে, একই result পাবে। এই সবটাই আমি, তাহলে সবটা আগে দেখছি, আমিকে result হিসাবে পাচ্ছি। আর তা না-হলে আমিই সব। আমি আমি-ই থেকে গেল, সবও রয়ে গেল। এতে তোমার সংসার ভাঙবে না, নূতন করে তৈরি হবে, সমসার হবে। যে শান্তি আনন্দ তুমি হারিয়ে ফেলেছ সেই

শান্তি আনন্দ তোমার অটুট থাকবে, কিছুই হারাবে না। তখন তোমার কোনও কিছুতেই মন বিকৃত হবে না, মন অস্থির হবে না, চঞ্চল হবে না, ভ্রান্তি ভীতি থাকবে না। কেননা তুমি তো সেই এক-এ প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেখছ loss is not loss, gain is not gain, pain is not pain, কেন না it is always the game। তুমি দেখছ তোমার সঙ্গে তোমার আমি (বোধ-আত্মা, চিদাত্মা বা জ্ঞানাত্মা) সবসময়ই রয়েছে, যাবেটা কোথায়! ঘুরে ফিরে তোমারই কাছে আসবে। আমিশূন্য কিছু হতেই পারে না। আছে কী নেই তা প্রকাশ করে দিচ্ছে তোমার আমি। কিন্তু আমি-র absence-টা আমি কোনওদিনই জানতে পারবে না। I cannot experience the absence of I. পারবে কী করে! তা-ই সবার সামনে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হচ্ছে। Outer gross থেকে inner subtle-এ, inner subtle থেকে central subtler-এ, central subtler থেকে transcendental subtlest-এ, ক্রমে আমরা বাইরের বোধ থেকে ভিতরের বোধে যাচ্ছি। কাজেই আবার বাইরের কথাও রাখা হচ্ছে, অন্তরের কথাও রাখা হচ্ছে, কেন্দ্রের কথাও রাখা হচ্ছে এবং কেন্দ্রের পরে তুরীয়ের প্রসঙ্গ বলে আবার cyclic order-এ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোমাদের সামনে পুরো complete science-টা বলা হচ্ছে, এবার তুমি ব্যবহার কর যেমন খুশি। It is your science, you are what you are in Reality. তোমাদের ইষ্টকে 'এ' কেড়ে নেয়নি। 'এ' সেই জায়গায় পূর্ণতাকে তোমার সামনে রাখছে যা চিন্তায় তুমি আনতে পারবে না, ধরতে পারবে না, ভাবতে পারবে না।

মন্তব্য ঃ

প্রথম বিচারের বিষয়বস্তু হল জীবনের বহির্সত্তা, দ্বিতীয় বিচারের বিষয়বস্তু হল অন্তরের বোধসত্তা এবং তৃতীয় বিচারের বিষয়বস্তু হল কেন্দ্রের বোধসত্তা। এই কেন্দ্রসত্তা হল প্রথম দুই সত্তার অধিষ্ঠান বা কারণ। প্রথম সত্তা অর্থাৎ বহির্সত্তার অধিষ্ঠান হল অন্তর্সত্তা এবং তার অধিষ্ঠান হল কেন্দ্রসত্তা। বহির্সত্তা হল প্রাণপ্রধান, অন্তর্সত্তা হল মনপ্রধান এবং কেন্দ্রসত্তা হল বুদ্ধি/ঊর্ধ্ব মনপ্রধান। বহির্সত্তা ও অন্তর্সত্তার প্রকৃতি হল অবিদ্যা। অন্তর্সত্তার নিম্নভাগ বহির্সত্তার সঙ্গে যুক্ত এবং তার ঊর্ধ্বভাগ কেন্দ্রসত্তার সঙ্গে যুক্ত। অন্তর্সত্তাকেই বলা হয় স্বভাব। তার নিম্ন বা বহির্ভাগ হল অবিদ্যাপ্রধান এবং ঊর্ধ্বভাগ হল বিদ্যাপ্রধান। অবিদ্যাশক্তি নাম-রূপের জননী। স্থূল জড়তা ও অজ্ঞান তার লক্ষণ। বিদ্যাশক্তি হল সমতাপ্রধান, সমত্বের কারণ বা জননী। তা কেন্দ্রের সঙ্গে নিত্যযুক্ত। আপনবোধে হয় তার ব্যবহার। আপনবোধের ব্যবহারে জীবনের কেন্দ্রসত্তায় হয় স্থিতি। তার ফলে অন্তরের স্বভাবের হয় শোধন ও স্ববোধে হয় প্রতিষ্ঠা। এই ভাবে স্বভাবজাত জীবনের স্বভাবের বিকার মুক্ত হয়ে স্ববোধে প্রতিষ্ঠা হয়। অর্থাৎ স্বভাবের কাঁচা আমি স্ববোধের পাকা আমি-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাকা আমিতে পরিণত হয়। তৃতীয় বিচারের এই হল ফলশ্রুতি। তার পরিণাম বা সিদ্ধি হল চতুর্থ বিচার ও তার ফল।

আজকের মতো এখানেই সচ্চিদানন্দ।

৭/১১/২০০১

।। চতুর্থ বিচার ।।

জীবজগতে মানুষ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই বিশেষ স্থান অধিকার করার পশ্চাতে রয়েছে তার অনন্ত অনন্ত অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে তাকে অনেক বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। বেঁচে থাকার তাগিদে ইন্দ্রিয়বোধে চলে কিছুকাল কিছু সংগ্রহ করেছে, তার পরে ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে কী আছে তা অনুসন্ধান করেছে অন্তরে এবং তার পরে তার পশ্চাতে কী আছে তাও অনুসন্ধান করেছে। এই ভাবে অনুসন্ধানের ফলে একের পর এক স্তর অতিক্রম করে পরিশেষে সে পৌঁছোবে এমন একটা স্তরে, যেখানে কোনও জিনিস মাপা যায় না। সেখানে মানবীয় বুদ্ধি এবং মন মিশে যায়, পৃথক ভাবে কাজ করতে পারে না। সেইজন্য বুদ্ধিজীবীরা ব্রহ্মজ্ঞানী আত্মজ্ঞানী ঈশ্বর-অনুভবসিদ্ধ পুরুষদের গতানুগতিক ভাববোধের মাপকাঠি দিয়ে কিংবা শাস্ত্রের কথার মাধ্যমে প্রথমে অস্বীকার করে। কিন্তু অনুভবসিদ্ধ পুরুষকে কোনও কিছুই বাঁধতে পারে না, তাঁরা তাদের যে অনুভূতি, তা-ই মানুষের কাছে প্রকাশ করেন। তা প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক সময় তাঁদের অনেক দুঃখকষ্ট বরণ করতে হয় এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হয়। অনন্ত মানবের ইতিহাসে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির প্রচুর আছে। কেননা সমাজজীবনে মানুষ যে ভাবের সঙ্গে পরিচিত, সেই পরিবেশ, সমাজজীবনের কাঠামো, চিন্তাধারা ও অনুভূতির মাপকাঠি দিয়ে সবকিছুকে সে মাপতে চায়, জানতে চায়, অথচ তার জীবনের যে অভাববোধ, দুঃখবোধ এবং সর্বোপরি তার অজ্ঞানজাত ভাববোধ, ভীতি, মৃত্যুভয়, এগুলি কিন্তু কোনও বুদ্ধিজীবী অতিক্রম করতে পারে না।

জীবনের অনুসন্ধানের মাত্রা কিন্তু সবার সমান নয়, অনুভূতির মাত্রাও সমান নয়। অন্তরের ভাব অনুসারে মানুষের রুচি, যোগ্যতা, ক্ষমতা তৈরি হয়। এই প্রসঙ্গ একটুখানি ধরিয়ে দিয়ে তার পরে তোমাদের কাছে মূল বক্তব্য বলা হবে, তার কারণ কোনও কথাই ভূমিকা ছাড়া বললে কারও পক্ষেই তা বোধগম্য হয় না। আর সেই কথাগুলি বলার জন্য আজ এখানে সবার সামনে 'এ' উপস্থিত হয়েছে। এই কথাগুলো conventional কথা নয়, শাস্ত্রের মুখস্থ করা মতপথের কথা নয়, মনগড়া বা কল্পিত কোনও সিদ্ধান্তও নয়। অর্থাৎ মানুষ তার চিন্তার গভীরে যেটুকু সত্যের সন্ধান পায় তা-ই সে thesis-রূপে, theory-রূপে, doctrine-রূপে প্রকাশ করে। সেই theory, thesis, doctrine কিন্তু সত্যকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করতে পারে না। সেখানেও partial truth-কে জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমরা নানা ভঙ্গিমায় পাই। তার এক একটা অভিব্যক্তি হল শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান

ইত্যাদি। তারও উৎকর্ষ আছে, তারও চমৎকারিতা আছে, তারও আনন্দ আছে, কিন্তু সেই আনন্দ ও অনুভূতি সমগ্র সৃষ্টির রহস্যকে, অর্থাৎ সৃষ্টির পশ্চাতে যে নিত্য সত্যবস্তু আছে যার সত্তায় সত্তাবান হয়ে বিশ্ব অভিব্যক্ত হয় এবং বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যার প্রকাশ নানা ভঙ্গিমায় হয়, তার পরিচয় জীব কিছুটা সংগ্রহ করতে পারে। এই জীবের কিন্তু স্তর একটা নয়, অনন্ত স্তর আছে। আবার প্রতি স্তরের মধ্যে মানের ভেদ আছে। কাজেই পরস্পরের মধ্যে আমরা ভেদটাই দেখি আমাদের মন-বুদ্ধির অনুভূতি দিয়ে। কিন্তু এই ভেদের পশ্চাতে যে একটা অভেদ ভাব আছে, এই খণ্ড খণ্ড প্রকাশের পশ্চাতে যে এক অখণ্ড সত্তা আছে, এই নানাত্ব-বহুত্বের পশ্চাতে যে একত্ব আছে, এই অসমান, বৈচিত্র্যের পশ্চাতে যে সমত্ব আছে, অনিত্যের পশ্চাতে অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর পরিবর্তনশীল বিকারী বস্তুর পশ্চাতে যে নির্বিকার নিত্যস্থায়ী সত্য আছে এবং তার অধিকারী যে একমাত্র মানুষই হতে পারে ও মানুষের মধ্যেই যে তা নিহিত আছে সেই সম্বন্ধে সকলে মোটেই অভিহিত নয়। এই আবিষ্কার কিন্তু সকলের মধ্যে হয় না। তাই দেখা যায় মানুষের অনুভূতির একটা অংশ দর্শন, আরেকটা বিজ্ঞান এবং তৃতীয়টি হল ধর্ম।

দর্শন হচ্ছে সেই জ্ঞান যাকে ভিত্তি করে আমরা সবকিছুর পরিমাপ করতে চাই, সব কিছুর মাত্রা নির্ণয় করতে চাই, পরিধি খুঁজে পেতে চাই এবং আদি-অন্তের সন্ধান করি, সেই সত্যবোধের যে এককরূপ তাকেই বলা হয় দর্শন। অর্থাৎ তত্ত্ববোধ, ontology, এককথায় Metaphysics। এই তত্ত্ববোধের অধিকারী সবাই হতে পারে না। মনুষ্যসমাজে একসময়ে এই তত্ত্ববোধের অধিকারী অনেকে হয়েছিলেন। সেই ঋষিযুগে, কিন্তু তার পরবর্তীকালে মানুষের মধ্যে এই তত্ত্ববোধ কিছুটা আবৃত হয়ে যায়। এখন মানুষের কাছে পরিপূর্ণ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। পূর্বে যাঁরা সেই সন্ধান করতেন তাঁরা সমাজের বাইরে জীবনযাপন করতেন। কিন্তু এই তত্ত্ববোধের অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষের যে মন ও বুদ্ধির ব্যবহার সংযত ভাবে একাগ্র ভাবে একান্ত ভাবে করতে হয়েছে তার ফলেই এসেছে সেই তত্ত্বের ব্যবহারিক দিক অর্থাৎ বিজ্ঞান দিক। বিজ্ঞান অর্থে সেই পূর্ণ অদ্বয়বোধের প্রকাশভঙ্গিমা এবং সেই প্রকাশভঙ্গিমা এক ভাবে সব জায়গায় প্রকাশ হয়নি। এই বিজ্ঞান বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানে মানুষ বিজ্ঞান বলতে গেলে Physics, Chemistry, Mathematics ইত্যাদিকে বোঝায়। কিন্তু সত্যের বিজ্ঞান Physics, Chemistry, Mathematics-এর উপর নির্ভরশীল নয়। আমাদের জীবনবিজ্ঞান Physics, Chemistry, Mathematics-এর উপর নির্ভরশীল নয় এবং ঈশ্বরীয় বিজ্ঞান বা আত্মবিজ্ঞান সর্বোপরি ব্রহ্মবিদ্যা, পরাবিদ্যা সেগুলি কিন্তু এই আমাদের প্রচলিত প্রাকৃতবিদ্যার অধীন নয়। এই বিজ্ঞানের আদি-অন্ত সম্বন্ধে কিছু কথা নিশ্চয় এখানে প্রকাশ করতে হবে, কেননা অনেক রকম প্রশ্ন নিয়ে 'এর' কাছে মানুষ এসেছে। গতানুগতিক প্রশ্নের উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, তোমরা অনেক পড়েছ, জেনেছ, শুনেছ, কিন্তু যা পড়নি, শোননি ও জাননি সেই সম্বন্ধে 'এ' শুধু বলবে।

শাস্ত্রজ্ঞান নিয়ে মানুষ আজ পর্যন্ত ঈশ্বরলাভ করতে পারেনি, শান্তিও পায়নি এবং তার মৃত্যুভয়ও কাটেনি। তবু মানুষের মধ্যে শাস্ত্র পড়ার একটা নেশা বা মাদকতা আছে, তার মধ্যে তারা একটা আনন্দ পায়। সাধনভজন করেও কিন্তু সত্যের সন্ধান সবাই পায় না। কদাচিৎ দুই-একজন এর সন্ধান পায়। কাজেই এই যে জীবন এই জীবনের আলাদা একটা বিজ্ঞান আছে। তার পরে পার্থিব জগতে আমরা প্রকৃতিকে দেখি নানা ভঙ্গিমায়—তারও একটা বিজ্ঞান আছে। কাজেই বিজ্ঞানের স্তরও অনেক ব্যাপ্ত। এই বিজ্ঞান ছাড়াও আছে ধর্ম অর্থাৎ দর্শন ও বিজ্ঞানের সামগ্রিক সত্তা এবং তার অভিব্যক্তিকে যে ধারণ করে রাখতে পারে অর্থাৎ নিজ সত্তার মধ্যে তাকে ধরে রেখে তার প্রকাশকে সংযত ভাবে ব্যবহার করতে পারে তা-ই হল ধর্ম, যা বাইরে-অন্তরে-কেন্দ্রে-তুরীয়তে সর্বব্যাপী। এই ধর্মের ঘনীভূত রূপই হল ঈশ্বর বা আত্মা। ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা হল Self-Knowledge/Divine Knowledge। ক্রিয়াকলাপ হল ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে মানুষের একটা বর্ণপরিচয়ের মতো, যেমন লেখাপড়া শিখতে গেলে বর্ণপরিচয় দিয়ে আরম্ভ করতে হয়। সেই বর্ণপরিচয় নিয়েই আমাদের জীবন কেটে যায়। কাজেই বর্তমানে যে ধর্মের আচরণ আমরা দেখি তা অনেকটা বর্ণপরিচয়েরই মতো, কিন্তু তার ঊর্ধ্বে আর মানুষ যেতে পারছে না। এই যে পূজা-অর্চনা এগুলি স্থূল ক্ষেত্রেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তা স্থূল থেকে আসবে অন্তরে, অন্তরের থেকে যাবে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে ছড়িয়ে যাবে সমগ্র জগৎব্যাপী, তারপর তারও ঊর্ধ্বে। কাজেই পূর্ণতার জাগরণ যে বিজ্ঞানের মাধ্যমে হয় সেই পূজা কবে আরম্ভ হবে যাকে জানলে জানার কিছু বাকি থাকে না, যাকে দেখলে দেখার কিছু বাকি থাকে না, যার হয়ে গেলে হওয়ার কিছু বাকি থাকে না? সেই বিজ্ঞান কোথায়? অবশ্য এই কথাগুলো 'এর' বই পড়ে তোমরা জানতে পারবে। 'এ' কিন্তু বই পড়ে জানেনি, কারণ পড়াশুনার সঙ্গে 'এর' কোনও সম্বন্ধ নেই। সেদিক দিয়ে 'এ' কিন্তু No. 1 মূর্খ। তা সবার কাছেই 'এ' স্বীকার করে।

'এর' অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা পুঁথিগত নয় এবং লোকের কাছে শোনা কথা নয়। সারাজীবন 'একে' সংগ্রাম করতে হয়েছে বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে। বহির্জগতে, বাইবে সমাজের ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে, দৈহিক নানা রকম বিকার ব্যাধির সঙ্গে এবং অভাব অভিযোগ নানা রকম দুঃখকষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করে, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করে, প্রিয়জন আপনজনের সঙ্গে সংগ্রাম করে আজকে 'এ' এমন একটা স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে সর্বপ্রকার সংগ্রাম সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ নদী গিয়ে সাগরে পৌঁছেছে। একটা ছোট্ট কথা। নদী, দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বহু বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে মোকাবিলা করে, জটিল কুটিল বক্রগতিতে ঘুরে ফিরে নিজেকে কোনওরকমে রক্ষা করে সে যখন সাগরে গিয়ে পড়ে তখন তা পরিতৃপ্তি বা পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রত্যেকটি জীবন যেন এক একটা নদী। তার দু'টি কূল। একটা হচ্ছে নেতি, আরেকটা ইতি। অর্থাৎ একটা হচ্ছে তার না-জানা, আরেকটা হচ্ছে জানা। মানুষ মাত্রেই কিছু জানে, কিছু জানে না। এই দুই কূলের মাধ্যমে মানুষকে এগিয়ে

যেতে হয় জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। বার বার সে এক একটা দেহ নিয়ে জগতে আসে। কিন্তু এর থেকে সে কবে রেহাই পাবে? তার মুক্তি কোথায়? নদী যেমন সাগরে গিয়ে মিশে গেলে তার আর পৃথক কোনও পরিচয় থাকে না, তার কোনও গতিও থাকে না, তার কোনও প্রকাশও থাকে না। সে তখন সাগর। এই ভাবে প্রত্যেকটি জীবন অখণ্ড সাগরের বক্ষে কী ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে একটুখানি আগে যিনি বললেন সে 'এর' কথারই কিছু প্রতিধ্বনি সবার কাছে রাখলেন এই জন্যই যে, 'এর' কথাগুলো লোকের কাছে বলতে গেলে কিন্তু তার একটা ভূমিকা বলা দরকার। কারণ 'এ' গতানুগতিক পূজা, গতানুগতিক বিজ্ঞান বা দর্শনের কোনও কথা বলার জন্য এখানে আসেনি। অবশ্য তাতে 'এর' অধিকারও নেই। কেননা 'এ' skilled man-ও নয়, scholar-ও নয়, philosopher-ও নয়, seer-ও নয়। 'এ' 'আমি'। 'এ' 'আমি'-র বিজ্ঞান বলবে। এই 'আমি'-র বিজ্ঞানের যে কী beauty, তার যে কী sanctity এবং তার যে কী utility তা মানুষকে একটা একটা করে স্তর ধরে 'এ' বলবে।

এই আমি মানেই হচ্ছে বোধ। বোধ মানেই আমি। বোধের একেবারে নিম্নতম প্রকাশ হতে আরম্ভ করে সর্বোত্তম প্রকাশ পর্যন্ত সবই এক বোধসাগরের বক্ষেই কিন্তু হচ্ছে। বোধসাগরের বাইরে কেউ যেতে পারবে না, যেমন আকাশের বাইরে কোনও প্রকাশ নেই। যত সৃষ্টি সব আকাশের মধ্যেই আবদ্ধ। শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে, আত্মা-ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনেক record আছে, কিন্তু সেগুলো পড়ে নিজের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রত্যেকের নিজের মধ্যে যে একটা আমি আছে, সেই আমিকে আমরা ব্যবহার করি প্রত্যেকে। ছোট শিশু হতে আরম্ভ করে একজন ব্রহ্মজ্ঞানী পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ এই আমিকে ব্যবহার করছে। কিন্তু সত্যিকারের আমি-র পরিচয়টা ক'জনের মধ্যে ফুটে ওঠে? সেই আমিকে জানলে সব আমিকে আপন করে পাওয়া যায়, যেখানে আর জবরদখল করতে হয় না। তা টাকা দিয়ে জমি কেনার মতো নয়, কোনও জিনিস possess করার মতো নয়। কেননা আমি object-ও নয়, subject-ও নয়। আমি হল একটা eternal substratum। সেই আমি-র বক্ষেই সকল রূপ-নাম-ভাব design-pattern-রূপে ফুটে ওঠে। যেমন এক সোনা দিয়ে মায়েরা সংসারে নানা রকম গয়না তৈরি করে, কিন্তু design-pattern সোনাকে বাদ দিয়ে নয়। সোনা সম্বন্ধে concept-টা ক'জনের পাকা? একমাত্র জহুরি যারা তারাই জানে, সবাই জানে না। নানা রকম খাদ মেশানো সোনা আছে। সবাই সেটা বোঝে না। Design-pattern নিয়ে সবাই মাতামাতি করে। সংসারে সবাই আমরা এই রূপ-নামের চক্রে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। কাজেই বিশেষ একটা রূপকে আমরা চিরকাল ধরে রাখতে চাই, কিন্তু তা কখনওই সম্ভব নয়। যখন তিনি pass করে চলে যান তখন তাঁর ছবি বা মূর্তি এবং তাঁর কিছু কথা নিয়ে আমরা জীবন কাটাই। কিন্তু প্রতিটি জীবই যে সেই এক উপাদানে গড়া—এই কথাটা মানুষকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে না-পারলে আমরা যে ঈশ্বর-আত্মাকে খুঁজি, তাঁর সঙ্গে যে একটা অভিন্ন সম্বন্ধ আছে, একক সম্বন্ধ আছে, সম সম্বন্ধ আছে, এক অখণ্ড সম্বন্ধ আছে, তা কিন্তু সবাই জানতে

পারে না। সেইজন্য দেখা যায়-শুধু মতবাদের লড়াই এবং মতপথ-সম্প্রদায়ের লড়াই—সর্বক্ষেত্রেই। দর্শনের ক্ষেত্রে দার্শনিকদের মধ্যে কোনও মতের মিল নেই। বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোনও মতের মিল নেই। ঈশ্বরের কথা সবাই বলে কিন্তু সেই ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়ে তারা দ্বন্দ্ব করে কেন? আসল কথা হল, তারা সত্যবস্তুকে, অর্থাৎ নিজেকে ভাল করে জানে না, চেনে না। আত্মা আর ঈশ্বর যে অভিন্ন—তা জানলেই ঈশ্বরবোধ বা আত্মবোধ সিদ্ধ হবে, নতুবা নয়। তা কোথায়? শাস্ত্রের পাতায় নয়, মূর্তিতে নয়, ক্রিয়াকলাপের মধ্যে নয়। তবে কোথায়? নিজের মধ্যে, নিজের আমি-র মধ্যে। এই আমিকে দিয়েই আমিকে আমাদের সন্ধান করতে হবে।

জীবন আরম্ভ হয় আমি দিয়ে—আমি-র ব্যবহার। কিন্তু আমি দিয়ে যে আমি-র ব্যবহার হয় সেই ব্যবহারের মধ্যে তারতম্য আসে কেন? পার্থক্য হয় কেন? পার্থক্য হওয়ার কারণ হল, আমি যখন প্রকাশিত হয়, আমি-র বক্ষে কতগুলো ভাবের মাধ্যমে এই বোধ প্রকাশিত হয়। এই ভাবের ঘনীভূত রূপটি হল মন। মনের অনন্ত বৃত্তি। এই বৃত্তির মধ্যে দিয়ে যখন বোধ প্রকাশিত হয়, তখন একবোধকে আমরা বহুরূপে দেখতে পাই। কিন্তু সেই মনকে যখন আমরা সরিয়ে দিই তখন আর বৈচিত্র্য থাকে না। কাজেই আমাদের যত মতবাদ সব মনের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আমরা যা অনুভব করি ইন্দ্রিয় দিয়ে তা হল একবোধেরই কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার। তা প্রথমে বোঝা যায় না। বর্ণপরিচয়ের মতো আমাদের প্রথমে কিছু শিক্ষা নিতে হয় ঠিকই, তার পরে আর আমরা কেউ এগোতে পারি না। আমরা ইন্দ্রিয়ের রাজ্যেই থেকে যাই। ইন্দ্রিয়ের কিন্তু নিজস্ব কোনও শক্তি ও অনুভূতি নেই। তার মধ্যে আত্মজ্যোতি প্রতিফলিত হয়। সেইজন্য চোখের মধ্যে রূপ, কানে শব্দ বা নাম, নাকে গন্ধ, ত্বকে স্পর্শ, জিহ্বায় স্বাদ ইত্যাদি অনুভূত হয়। এই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধকে আমরা পঞ্চতত্ত্ব বলি। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা এগুলো অনুভব করি। কিন্তু এই পঞ্চতত্ত্বই আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমাই পঞ্চতত্ত্ব।

আমরা প্রত্যেকেই সংসারের এই পঞ্চতত্ত্বের বেশি কেউই যেতে পারছি না। যখনই কথা বলি তখন আমরা একটি শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু এই শব্দের আদি কোথায়? অন্ত কোথায়? মাঝখানে একটা landmark দিলেই তো হবে না! শব্দের আদিও যেখানে অন্তও সেখানে। সেই আদি-অন্তে আছে শুধু বোধ, বিশুদ্ধবোধ। সেই বোধ মানেই হচ্ছে আমি। আমি ছাড়া কোনও বোধের ব্যবহার সম্ভব নয়, আর বোধ ছাড়া আমি-র ব্যবহার অসিদ্ধ। 'এ' ধর্মজগতে কিন্তু unconventional line-এ কথা বলেছে যেখানে conventional কোনও ব্যাপার নেই। একথা কিন্তু যারা গতানুগতিক ধর্ম করে তারা মানবে না এবং অতীতেও 'এ' যখন বহুবার এসে বলে গিয়েছে তখন 'একে' তারা মানেনি, 'একে' crucifix করেছে, শাস্তি দিয়েছে body-কে, কিন্তু 'এর' কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। সেই আমি-ই আসছি ঘুরে ফিরে। কালের বক্ষে, দেশের বক্ষে এবং সবার আমি-র মধ্যেই মিশে আছি, কেননা এক

অখণ্ড পূর্ণ আমি-র কতগুলি projection হচ্ছে এই জীবজগৎ। কাজেই আমিশূন্য কোনও আমি হতে পারে না। সেই আমি কোন আমি? যেই আমি সব আমিকে আপনবোধে একবোধে জানে, অর্থাৎ Knowledge of Oneness, not knowledge of duality and manyness. Duality দিয়ে আমরা দ্বৈতকে জানি, manyness দিয়ে আমরা বৈচিত্র্যকে জানি, আর Oneness দিয়ে আমরা একত্বকে জানি। কাজেই Knowledge of Oneness-এর অধিকারী জগতে very few। জগতে দার্শনিক আছে, ধার্মিক আছে এবং বিজ্ঞানী আছে। তারা আমাদের এমন কোনও সমাধান দিতে পারে না যে, দর্শন, বিজ্ঞান আর ধর্ম একমাত্র একবোধেরই তিনটি প্রকাশ। কারণ তাদের ভেদদৃষ্টি আছে, তারা অখণ্ডকে খণ্ড রূপে দেখে এবং অভেদকে ভেদরূপে দেখে। সেই একমাত্র বোধের নামই হচ্ছে আমি। I মানে Pure Consciousness revealed as দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম। সেটা কী করে সিদ্ধ হয়, সেই প্রসঙ্গে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। 'এ' খুব সংক্ষেপে তোমাদের কাছে সেই কথা বলছে। কেননা 'এর' সময় নির্দিষ্ট আছে চারদিন ঠিকই, কিন্তু এই বিরাট প্রসঙ্গ যা জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারাও লাভ করা সম্ভব নয় তা সবার সামনে 'একে' রাখতে হচ্ছে ঐ সীমিত দুই/আড়াই ঘণ্টার মধ্যে। তা সত্ত্বেও তা সবার কাছে প্রকাশ করা হবে।

প্রত্যেকের নিজস্ব একটা আমি আছে। সেই আমি-র মধ্যেই সে এর সন্ধান খুঁজে পাবে, কেননা আমি হচ্ছে বোধে গড়া, বোধে ভরা। আমরা যা-কিছু অনুভব করি বাইরে থেকে অনুভব করি না, অনুভব করি নিজের মধ্যেই। অনুভূতির কেন্দ্র হচ্ছে হৃদয়। হৃদয়ের আরেক অর্থ হল, হৃত বস্তুকে ফিরিয়ে দেয় যে। হৃত বস্তু কী? আমাদের আপন পরিচয়। আপন পরিচয় হৃদয়বোধে সিদ্ধ হয়। এই আপন পরিচয়ের মধ্যে আমরা ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্মকে একবোধে পাই। তাঁকে আমরা দল-মত-পথ নিরপেক্ষ ভাবে অর্থাৎ impartially, free from any dogma and free from any prejudice, pride একবোধে অনুভব করব যখন, তখনই আমরা পরাসিদ্ধি পরামুক্তি লাভ করব। তখনই আমাদের মধ্যে সেই পরমতত্ত্ব reveal করবে। পরমতত্ত্ব মানে পরম আমি, পরমবোধ—সেই অখণ্ডবোধ যাকে বলা হয় সত্যস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এবং এক কথায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আমরা যুগে যুগে দেখি এরকম অনুভবসিদ্ধ পুরুষ এসেছেন। তাঁরা এসে সেই এক-এর কথাই বলে গিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষ তা সম্পূর্ণ ভাবে নিতে পারেনি। তারা ঐ design-pattern-কেই ধরে বসে আছে। কাজেই এখনও আমরা সেই ছবির পূজাই করছি—রামের ছবি, রামের মূর্তি, কৃষ্ণের ছবি, কৃষ্ণের মূর্তি এবং অন্যান্য আরও অনেকের ছবি এবং মূর্তি নিয়ে। এই নিয়ে দ্বন্দ্ব সংগ্রাম চলছে তো চলছেই। ধর্ম জগতের কোনও কথা প্রকাশ্যে বলা চলবে না, কেননা সেখানে অপর মত এসে আপত্তি জানাবে। সেখানে স্বাধীনতা নেই মানুষের। অথচ সত্য কিন্তু এক। ঈশ্বরকে আমরা সবাই ডাকছি যার যেই নামে রুচি সেই নাম দিয়ে, যেই ভাবে রুচি সেই ভাব দিয়ে। কিন্তু আমরা সেই এক ঈশ্বরকে মানি না, আমরা তাঁকে জানবার চেষ্টা করছি

মন দিয়ে। মন কখনও তাঁকে জানতে পারে না, কেননা মন বৈচিত্র্যময়। মন বিকারী, পরিণামী, অস্থায়ী ও অনিত্য। সেই অস্থায়ী, অনিত্য বস্তু দিয়ে আমরা নিত্য পূর্ণকে কী করে ধরব? তাঁকে ধরার একমাত্র সহজ উপায় হল নিজের আমি-র মধ্যে।

একজন মস্তবড় বিজ্ঞানীর এক দার্শনিকের সঙ্গে যখন দেখা হয়, পরস্পরের মধ্যে কিছু কথা বিনিময় হবার পরে দার্শনিক বিজ্ঞানীকে বলল—তুমি সারাজীবন বিজ্ঞানচর্চা করে কী করলে? দর্শন তো করতে পারলে না! দর্শন তো অনুভব করতে পারলে না! তার কথার উত্তরে বিজ্ঞানী বলল—তুমি শুকনো দর্শনে পড়ে আছ, তার তো ব্যবহার করতে পারলে না! অর্থাৎ দু'জনে একবোধে আসতে পারল না। এই দু'জন যে একবোধে আসতে পারল না, এই সংবাদটা দুইজনেরই ভক্ত শিষ্যের কাছে পৌঁছালো। আলোচনাকালে তাদের সঙ্গে এক ধার্মিকের পরিচয় হয়। সেই ধার্মিক সব শুনে শুধু হাসল। এই প্রসঙ্গে ধার্মিক বলল—কী করে তারা একবোধে আসবে, তাদের তো ধারণ শক্তিই নেই! তখন ভক্তরা জিজ্ঞাসা করল—কীরকম? সে বলল—বিজ্ঞানের যে কত স্তর আছে সেই সম্বন্ধে কি তোমরা জান? আর দর্শনের যে কত স্তর আছে তাও কি তোমরা জান? তা আমি ধারণ করে রেখেছি। কাজেই অজ্ঞানকেও আমি ধারণ করে রেখেছি, জ্ঞানকেও ধারণ করে রেখেছি এবং বিজ্ঞানকেও ধারণ করে রেখেছি। তখন তারা বলল—তুমি কী দিয়ে ধারণ করলে? তুমি ধারণ করলে কী করে? জ্ঞান বলল—আমাকে বাদ দিয়ে তুমি জানবে কী দিয়ে? বিজ্ঞান বলল— আমাকে বাদ দিয়ে তুমি ব্যবহার করবে কী করে? এই triangular fight আরম্ভ হয়ে গেল পরস্পরের মধ্যে। দর্শন বলল আমি শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞান বলল আমি শ্রেষ্ঠ, ধর্মও বলল আমি শ্রেষ্ঠ। এই তিনের সমাধান আর হয় না।

তখন ঈশ্বর ভাবলেন যে, এ তো মহামুশকিল! আমাকে নিয়েই এরা দ্বন্দ্ব করছে! তখন তিনি কী করলেন জানো? তিনি এক মূর্খের বেশে তাদের সামনে এলেন। তিনি লেখাপড়া শেখেননি, শাস্ত্র পড়েননি এবং কারও কাছে কিছু শোনেনওনি, শেখেনওনি। তিনি বললেন, তোমরা দ্বন্দ্ব করছ কেন? একজন মাথা নিয়ে মাতামাতি করছ, আর একজন পেট নিয়ে মাতামাতি করছ, আর একজন পা নিয়ে মাতামাতি করছ। আর তিনটে কি পৃথক ভাবে চলতে পারবে? পারবে না। ছোট্ট কথা একজন মূর্খের মুখ থেকে বেরোচ্ছে। তিনি বললেন, তোমারই মাথা হচ্ছে তত্ত্ব, তোমার ইন্দ্রিয়াদি-মন হচ্ছে বিজ্ঞান এবং আমি সবকিছুকে ধারণ করে রেখে দিয়েছে অর্থাৎ ধর্ম। আমিই প্রজ্ঞান, আমিই বিজ্ঞান, আমিই ধর্ম। তারা বলল—কীরকম? তখন তিনি বললেন—আমি তোমাদের থেকে আমিকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর দার্শনিককে বললেন—তুমি কথা বল। বিজ্ঞানীকেও বললেন—তুমিও কথা বল। ধার্মিককেও একই কথা বললেন। তারা যাই বলতে যায় 'আমি' এসে যায়। তখন তারা দেখল যে, এ তো মহামুশকিল! তখন তারা (দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম) আমিকে বলল যে—তুমি এই নিগূঢ়তত্ত্ব অর্থাৎ সর্বপ্রকাশই যে আমি তা কী করে জানলে? তিনি বললেন—আমি এই

দিয়েই গড়া। আমাকে জানার অপেক্ষায় চলতে হয় না। আমি জ্ঞানস্বরূপ, আমি বিজ্ঞানস্বরূপ, আমি প্রজ্ঞানস্বরূপ। এই আমিই ঈশ্বর, আমিই আত্মা, আমিই ব্রহ্ম। মানুষের কাছে এটা অহংকারের কথা বলে মনে হবে। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌দেবী ঋক্‌বেদের রাত্রিসূক্তে প্রথমে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন। চণ্ডীতেও রাত্রিসূক্তে এই কথা আছে এবং উপনিষদেও ব্রহ্মতত্ত্বের মাধ্যমে এ কথা ব্যক্ত হয়েছে। যোগে তা আত্মতত্ত্ব এবং ভক্তের কাছে ভগবদ্‌তত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয়েছে। কর্মীব কাছে তা গুরুতত্ত্ব। একতত্ত্বের পৃথক পৃথক নাম। কিন্তু তার সত্য রহস্য সহজ করে বললেও মানুষ তা গ্রহণ করতে পারবে না।

আমরা সবকিছু পৃথক পৃথক করে ব্যবহার করতে ভালবাসি, জানতে ভালবাসি কিন্তু হজম করতে পারি না। ব্যবহার করার পরে যে ফলটা আসে অভিজ্ঞতারূপে তাকে আমরা পরিপূর্ণ ভাবে নিতে পারি না। তখন আমরা কিছু বাদ দিই। আমরা যা চাই তা আংশিক, পূর্ণ করে চাইতে পারি না। একটা অংশরূপে চাই, প্রত্যেকেই তাই। অংশরূপে চেয়ে যখন অংশ ফুরিয়ে যায় তখন আমরা আবার হায় হায় করি, আবার চাই। জানতে গিয়ে আমরা কিছু জেনে সাময়িক ভাবে শান্ত হই আর তার পরেই আবার ফুরিয়ে যায়। আরও কিছু জানতে চাই, কেননা নূতন করে আমাদের সামনে অনেক প্রশ্ন এসে উপস্থিত হয়। তা ব্যবহার করতে গিয়ে আমাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা শেষ হয়ে যায়, আর পারি না। জীবনে মানুষ অর্থ রোজগার করে কর্মক্ষেত্রে, বাড়িতে এসে তা ব্যবহার করে। যৌবন চলে যাবার পরে বার্ধক্য যখন আসে তখন সামর্থ্য ফুরিয়ে যায়। তখন আর কাজ করার শক্তি থাকে না। এগুলো statement of fact, কিন্তু এর মধ্যেই সেই আমি-র খেলা হয়ে চলেছে। সেই আমি স্থূলে, সূক্ষ্মে, কারণে, কার্যে। বাইরেও আমি, অন্তরেও আমি, হৃদয়ের গভীরেও আমি এবং তার উর্ধ্বেও আমি। কেননা বোধের আদি-অন্ত নেই। যদি আদি-অন্ত করতে হয় তাহলে আমিবোধ দিয়েই করতে হবে। সেই খেলা আমরা জীবনে প্রত্যেকেই খেলে যাচ্ছি। জীবনের একটা আদি আছে, আবার একটা অন্তও আছে। Are we satisfied? এই জীবন নিয়ে এসে আমরা যা-কিছু করলাম একদিন তা শেষ হয়ে গেল, চলে গেল। Is it enough? অতীতে কোথায় ছিলাম, কী করেছি, কেউ সেই সম্বন্ধে জানি না। অথচ আমরা এই জীবনে কত হম্বিতম্বি করি আমাদের সামান্য পুঁজি-জ্ঞান নিয়ে। সেইজন্যই বলা হয়েছে যে, সবকিছুর সমাধান নিজের মধ্যেই। যেটা জানি না তাও আমি এবং যা জানি তাও আমি। ইতিবাচক, নেতিবাচক, অর্থাৎ all positive, all negative-এর এককরূপ হচ্ছে আমি। এই আমি-ই হচ্ছে ঈশ্বরের পরিচয়, আমি-ই আত্মার পরিচয়, আমি-ই ব্রহ্মের পরিচয়। কিন্তু সেই ব্রহ্ম আমি অতিরিক্ত নয়। আমরা ভুল করে নিজেকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরকে ভাবি, নিজেকে বাদ দিয়ে আত্মচিন্তা করি, নিজেকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মবিচার করি এবং গুরুকেও নিজ থেকে আলাদা করে দেখি। এর ফলে গুরুর সঙ্গে একাত্মতা বা তাদাত্ম্য হয় না, ঈশ্বরের সঙ্গে, ইষ্টের সঙ্গে তাদাত্ম্য হয় না। তাই এই প্রসঙ্গে একটি গানে বলা হয়েছে—

গুরু আমার শক্তি সত্তা গুরু আমার মাতা পিতা
গুরু আমার বন্ধু ভ্রাতা গুরু আমার ইষ্টদেবতা।।
গুরু আমার আমি স্বয়ং অন্তর্যামী অন্তরাত্মা
আমির আমি গুরু স্বয়ং পুরুষোত্তম পরমাত্মা।।
গুরু সবার শক্তি সত্তা গুরু সবার মাতা পিতা
গুরু সবার বন্ধু ভ্রাতা গুরু সবার ইষ্টদেবতা
গুরু সবার আমি স্বয়ং গুরু সবার অন্তরাত্মা।।
গুরু নামে গুরু জ্ঞানে গুরু ভাবে গুরু ধ্যানে
থাকি সদা গুরু সনে চলি আমি গুরু জ্ঞানে
থাকে গুরু আমার সনে আমি বোধে আমি জ্ঞানে।
করেন প্রকাশ ব্রহ্মবিদ্যা প্রজ্ঞানঘন আত্মতত্ত্ব
আমি বোধে আমির মাঝে স্বসংবেদ্য সর্বসত্য
আমি জ্ঞানে গুরু আমার সচ্চিদানন্দ শক্তি সত্তা
বোধের বোধে পাকা আমি জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা সাক্ষীদ্রষ্টা।।

(গুরুভজন)

গুরুই আত্মা, কেননা গুরু ছাড়া জ্ঞানলাভের অন্য কোনও উপায় নেই। ঈশ্বরের প্রথম অভিব্যক্তি হচ্ছেন গুরু। আত্মা বা ঈশ্বর অভিন্ন। 'এ' আত্মার কথা বলছে বলে ঈশ্বরবাদীরা *বলেন, বাবাঠাকুর তো ঈশ্বরকে মানেন না! উত্তরে 'এ' তাদের বলেছে—হ্যাঁ 'এ' তাকেই* মানে যাকে তুমি মান না। আর তুমি যাকে ঈশ্বর বলছ, তাকে মেনেও কিন্তু ঈশ্বর জ্ঞানটি তোমার হচ্ছে না। 'এর' ঈশ্বর কিন্তু হারায়নি, আত্মাও হারায়নি। কেননা আত্মার মধ্যে তাঁরা ধরা পড়ে গিয়েছেন আমিবোধে। এই আমিবোধে সমস্ত দেশ-কাল, কার্য-কারণ, অতীতের সব রহস্য revealed হয়ে গিয়েছে। আলাদা করে 'এর' বিজ্ঞানচর্চা ধর্মচর্চা জ্ঞানচর্চা করার আর প্রয়োজন হয়নি। এটাই সবার সামনে রাখা হচ্ছে যে, যা এই হৃদয়ে আছে তা সবার হৃদয়েই আছে। যা এই আমি-র মধ্যে আছে তা সবার আমি-র মধ্যেই আছে, but you do not care for that, you do not accept that, you do not embrace that whole heartedly। সবার আমি মিলেই এক আমি। সেই আমি সবারই হৃদয়ে রয়েছে। কেউ বলতে পারবে না আমি আত্মাশূন্য বা ঈশ্বরশূন্য, কেননা ঈশ্বর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন এবং সবার হৃদয়েই তিনি প্রতিষ্ঠিত। আত্মা, ব্রহ্ম ও গুরুর ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু আমরা যখন চর্চা করছি মতবাদের সাধনার দ্বারা, তখন আমরা সবকিছু থেকে নিজেকে পৃথক ভাবে ভাবনা করি। তার মানে আমরা ভাগ ভাগ করে অখণ্ডকে ব্যবহার করতে গিয়ে আর অখণ্ডতে ফিরে আসতে পারছি না মনের ভ্রমে। তখন কী করতে হবে? সব ভাগকে আপনবোধ দিয়ে মানতে হবে। আপনবোধের মানেই হল the only Oneness of Knowledge and Knowledge of Oneness which embraces all

contradictions, all positive and negative concepts of life, outer and inner, here and there, whatever we experience—সবটাই কিন্তু সেই আপনবোধেরই প্রকাশ। 'এ' আত্মবোধ, গুরুবোধ, ব্রহ্মবোধ, ঈশ্বরবোধ ছেড়ে চলে এল আপনবোধে। আপনবোধ ছাড়া কেউ নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে না। তা সে যেই ভাষাই হোক, পৃথিবীর যেই দেশের লোকই হোক তার একটা আপনবোধ আছে, that sense of I-ness, sense of myness reveals all truth। সেই I-বোধকে মানতে বলা হচ্ছে যে তোমার ভিতরে আমিরূপে আছে, আমিকে একটুখানি মেনে চল। তোমাব আমিকে তুমি degrade করো না। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছিলেন, তুমি আমিকে অবসাদগ্রস্ত করো না, তোমার আমিকে দিয়েই তোমার আমিকে উদ্ধার কর অর্থাৎ আত্মা দিয়ে আত্মাকে উদ্ধার কর। তাহলে আত্মা কটা? আমি রূপে, আমি নামে, আমি প্রাণে, আমি মনে, আমি বুদ্ধিতে। আবার আমি অজ্ঞানে, আমি জ্ঞানাভাসে, আমি বিজ্ঞানে, আমি প্রজ্ঞানে; আমি স্থূলে, আমি সূক্ষ্মে, আমি সূক্ষ্মতরে, আমি সূক্ষ্মতমে; আমি বাইরে, আমি অন্তরে, আমি কেন্দ্রে, আমি তুরীয়তে—সর্বদিকে আমি। এই আমি-র জায়গায় বোধকে বসানো হচ্ছে।

Consciousness outwardly, Consciousness inwardly, Consciousness centrally, Consciousness transcendentally; Consciousness in the gross, Consciousness in the subtle. Consciousness in the subtler, Consciousness in the subtlest. Similarly Consciousness in Consciousness, of Consciousness, from Consciousness, for Consciousness, by Consciousness, with Consciousness, to Consciousness, on Consciousness and beyond, and beyond beyond. Consciousness in name, Consciousness in idea, Consciousness in Consciousness. In the same way Consciousness in ignorance, Consciousness in knowledge, Consciousness in wisdom, Consciousness in Supreme Wisdom or Knowledge Absolute. এই ভাবে চারটে স্তর ছড়ানো আছে জীবনের সব খেলায়। এই চারটে স্তরকে আমরা ব্যবহার করি জীবনে নানা ভঙ্গিমায়। কিন্তু তা আমিকে দিয়েই ব্যবহার করা হয়। শৈশব থেকে আরম্ভ করে জানার চরম স্তরে গিয়েও কিন্তু আমিকে দিয়েই আমরা সবকিছু ব্যবহার করছি। আমিকে বাদ দিয়ে কিন্তু কিছুই সম্ভব নয়। A realizer also uses this I. এই প্রসঙ্গে সহজ করে বলা হয়েছে—আমিসাগরে অনন্ত আমি ওঠে, ভাসে, ডোবে, খেলা করে। খেলা শেষে আবার সাগরের মধ্যেই তা মিশে যায়। এই রহস্যটা যদি জানা যায় তাহলে আমি তো কখনও বিকৃত হতে পারে না। তা জানা হয়ে গেলে মৃত্যুভয় থাকে না। মৃত্যু কখনও আমি-র হয় না। কারণ আমি-র জন্ম নেই। জন্ম হচ্ছে আকারের অর্থাৎ দেহের। দেহের আকার, বিকার ,ক্ষয়, বৃদ্ধি , ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং পরিণাম আছে, কিন্তু এই সবকিছুর সাক্ষিরূপে রয়েছে আমি। I am the witness of all. প্রত্যেকেই বুকে হাত দিয়ে এটা স্বীকার করবে যে, হ্যাঁ শৈশব থেকে অনন্ত ভাববোধের একমাত্র wit-

ness হচ্ছে I। প্রত্যেকের আমি একই কথা বলছে যে I am, I exist, I know এবং I know not—দুটোই সত্যি। To know is to exist and to exist is to know. Existence and knowledge are but One. When existence and knowledge are One, then it is infinite. And what is infinite is changeless, it is without any modification, i.e. it is beyond death. Death is a change, death is a modification. And where there is no death, that is immortality. And what is immortality? It is infinite Absolute. That is why it is full of bliss and peace. This is the formula.

'এ' লেখাপড়া শেখেনি। কিন্তু এই formula-টা সবার সামনে রাখা হচ্ছে। দেখি intel-lectual-রা, শাস্ত্রজ্ঞানীরা এটাকে কী করে কাটায়! তারা কয়েকটা শব্দ বলবে। কিন্তু তার আগে কী আছে এবং পরে কী আছে? তুমিই আছ। You exist before and after what you know and know not. But your existence is eternal because I is eternal, infinite. এখানে যে কথা বলার জন্য আজকে সবার সামনে 'এ' এসেছে তা হল, প্রত্যেকের আমি-র যে আদি রূপ, তার চারটে রূপ। আদি রূপে সে কী অবস্থায় ছিল এবং বর্তমানে সে কী অবস্থায় আছে? একটা মানুষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে তখন কী অবস্থায় থাকে? আবার দিনের বেলায় জেগে উঠে সে কী অবস্থা অনুভব করে? আমি কিন্তু একই থাকে। রাত্রে ঘুমের মধ্যে তার বিজ্ঞানময় রূপটি অর্থাৎ মন ও বুদ্ধি বিশ্রাম করে, তার ফলে বৈচিত্র্য থাকে না, ব্যবহার থাকে না। কিন্তু বৈচিত্র্যশূন্য অবস্থাকেও ধারণ করে রেখেছে তার ভিতরে সেই আমিই, অর্থাৎ ধর্মভাব। তা ধারণ করে রাখে, sustain করে রাখে। একেবারে অণুতম প্রকাশকেও সে ধারণ করে রেখেছে, বৃহত্তম প্রকাশকেও ধারণ করে রেখেছে। সেজন্যে তার আরেক নাম "অণোরণীয়ান এবং মহতোমহীয়ান"। অর্থাৎ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতমও আমি এবং বৃহৎ হতে বৃহত্তমও আমি। এর মাঝখানে সবটাই এক অখণ্ড বোধস্বরূপ আমি-র পরিচয়। এই আমি-র পরিচয় সবার সামনে রাখার জন্যই এই প্রসঙ্গটি বলা হয়েছে, কেননা আমরা conven-tional অনেক কিছু ধর্মমতের কথা শুনি। শৈবমত, শাক্তমত, বৈষ্ণবমত, গুরুবাদ সব সত্য, provided I exist—তা মানলে, নতুবা নয়। সবই আমি-রই পরিচয়। আমিই শিব, আমিই বিষ্ণু, আমিই শক্তি আবার আমিই গুরু। সেইজন্যে স্বয়ং ব্রহ্মা, স্বয়ং মানে আমি। "স্বয়ং ব্রহ্মাঃ স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়ং ঈশ্বরঃ স্বয়ং শিবঃ স্বয়ং ইন্দ্রঃ স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্বং সস্মাৎ নান্যকিঞ্চন।" এই আমি-র বাইরে কিছু নেই, থাকা সম্ভবই নয়। এই কথাটা প্রত্যেকেই একটুখানি ভাবলেই বুঝতে পারবে যে, আমিশূন্য কোনও জীবন নেই। এই আমি-র মধ্যে সব রহস্য লুকিয়ে আছে। আমি-র মধ্যে বীজ, আমি-র মধ্যে বৃক্ষ-ফুল-ফল সব, অর্থাৎ আমি-রই চারটি মহিমা। কী? 'I' is the cause, 'I' is the effect, 'I' is the finite, 'I' is the infinite, 'I' is neutral, 'I' is positive, 'I' is negative and beyond, and beyond beyond.

যখন মানুষ গাঢ় ঘুমে ঘুমিয়ে থাকে তখন প্রত্যেকের আমি সৃষ্টির ঊর্ধ্বে—I am above all creation, above all contradiction, above all duality। আবার যখন জেগে

উঠছে I/he is playing with duality, he is playing with plurality, he is playing with contradictions। জীবনে নানারকম ঘাত-প্রতিঘাত এসে তাকে ধাক্কা দিচ্ছে, কিন্তু তার আমিকে কেউ মারতে পারছে না। মৃত্যুকে অনুভব করার জন্যও আমিকে থাকতে হবে, এবং কিছু নেই তা অনুভব করার জন্যও আমিকেই থাকতে হবে। কাজেই all positive and all negative are identified with this Real I। সেইজন্য প্রত্যেকের আমি হচ্ছে প্রত্যেকের আপন। 'এই আপন ছাড়া হয় না আপন, আপনতাই আপন ধর্ম।' অর্থাৎ I দিয়েই আমরা সব কিছুকে জানছি, কারণ I হল Consciousness। বোধটাই আমি, আমিরূপে ফুটে উঠছে। The Infinite Consciousness symptomatizes as I. "একোঽহম্ সর্বমিতি।" এক আমিই বহু হয়েছি। "একোঽহম্ সর্বমিতি"—এই বোধটি যাঁর হয় সেই মহাত্মা সুদুর্লভ। অতি দুর্লভ সেই মহাত্মা যিনি এই আমিতত্ত্বকে বুঝতে পেরেছেন। গীতার ভিতরে এই আমিতত্ত্বের কথাই বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, হে অর্জুন "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" তুমি অন্য সব ধর্মকর্ম ছেড়ে একমাত্র আমি-র শরণ নাও। এই আমি সবার মধ্যেই রয়েছে আমিরূপে। "ঈশ্বরঃ সবভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।" আমি-ঈশ্বর সবার হৃদয়ে বাস করছে। কী রূপে? আমিরূপে। কিন্তু যারা এর ব্যাখ্যা করেন তারা বলেন, কৃষ্ণ এখানে বলতে চাইছেন যে, কৃষ্ণ সবার হৃদয়ে, আমরা তো কৃষ্ণ বলে কেউ মনে করছি না, আমি বলে মনে করছি। তার ভাষণের সঙ্গে কথার সঙ্গে মিলছে কোনটা? "ঈশ্বরঃ সবভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।"—ঈশ্বর দিয়ে বলা হল, আবার "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ"—সর্বভূতের হৃদ্‌দেশে একমাত্র আমিই বিরাজ করছি। কী বোধে? আমিবোধে। এই অর্জুনকেই আবার অন্য সময়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক পরে তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণকে বলতে হয়েছে যে, অর্জুন তুমি অনেক প্রশ্ন আমাকে কর অনেক সময়, সবসময় তো আমি প্রস্তুত থাকি না কাজেই তোমার সব প্রশ্নের উত্তর সবসময় একরকম ভাবে দেওয়া সম্ভব হয় না। তুমি হয়ত তাতে ভুল বোঝ। ঠিক আছে, তোমাকে আজকে আমি খুব রহস্যপূর্ণ কথা বলব। এখন আমার খুব খিদে পেয়েছে তুমি কিছু খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আস। অর্জুন সখার জন্য, কৃষ্ণ বেশধারী সখা—যে কৃষ্ণ সর্বভূতের হৃদয়ে সর্বরূপে সর্ববেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি', (এই কথার মর্মার্থ হল, যার মধ্যে সর্বভূত বাস করে এবং সর্বভূতের হৃদ্‌দেশে যিনি বাস করেন) সেই বাসুদেব সর্বত্র রয়েছেন তাঁর জন্য খাবার সংগ্রহ করতে গেল....।

'একে' একজন বৈষ্ণববাবা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, বাবাঠাকুর তোমাকে অনেকে শ্রদ্ধা করে, আমি কিন্তু শ্রদ্ধা করতে পারছি না, কারণ তুমি কৃষ্ণকে degrade করছ! উত্তরে তাকে বলা হল, কৃষ্ণকে 'এ' degrade করছে না, কৃষ্ণই degrade করছেন। তিনি বললেন, কেন? তখন তাকে বলা হল, কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কর গিয়ে। তোমার যদি কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে থাকে তবে তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। আর কৃষ্ণ যদি কাউকে মারেন তাহলে কৃষ্ণকেই মারতে হবে কৃষ্ণকে। কিন্তু কৃষ্ণ অমর, কেননা আত্মা অমর। এই আত্মা তোমার ভিতরে।

তোমার আমি অমর। যদি কৃষ্ণ কোথাও থেকে থাকেন তবে তোমার আমি-র মধ্যেই আছেন, বাইরে কোথাও নেই। যেমন তুমি কর্মক্ষেত্রে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াও—অফিসে, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে, প্রিয়জনের বাড়িতে বা ভ্রমণ উদ্দেশে, তীর্থভ্রমণের উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যাও, কিন্তু আমিকে নিয়েই তুমি যাচ্ছ। কিছুদিন কোনও জায়গাতে থেকে আবার ফিরে এলে। প্রত্যেকেই তাই। সুতরাং সেই আমি যিনি কৃষ্ণরূপে তখন খেলা করে গিয়েছেন সেই কৃষ্ণ আবার আরেকটা রূপ নিয়ে যখন আসছেন তখন তোমরা তাঁকে চিনতে পারছ না! এই কথা শুনে তিনি বললেন, তুমি এ কী করে বলছ? তখন তাকে বলা হল, দেখ, তুমি শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত কতগুলো দিন অতিক্রম করে এসেছ! এই যে এতদিন তুমি বেঁচে আছ সবদিন কি একইরকম ভাবে তোমার দিন কেটেছে? নিশ্চয়ই কাটেনি। তুমি কিন্তু একাই ছিলে, সেই তুমি এখনও আছ। তুমি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলে তখন অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়ে এসেছিলে। ছিলে অব্যক্ত অর্থাৎ unmanifested, but you manifested and entered in the womb of your mother through the process of the combination of sperm and blood/germ। প্রথমে একটা body তৈরি হল, সেই body-কেই তুমি মনে করছ আমি। কিন্তু দেহরূপ যে আমি তা আমি-রই একটা ছোট্ট পরিচয়। দেহ ছাড়াও যে তুমি, তোমাব আমি আছে, তার পরিচয় গাঢ় ঘুমের মধ্যে পাওয়া যায়, যেখানে দেহবোধ থাকে না, সংসাবেব প্রিয়-অপ্রিয়জনের বোধ থাকে না, তোমার কলকাবখানা, অফিস, বাড়িঘর কাবও পরিচয় থাকে না, but you exist as One without a second। ঘুম ভাঙার আগে পর্যন্ত তুমি One, ঘুম ভাঙলেই তুমি manifold হয়ে গেলে মনের মাধ্যমে। তোমার সেই আমি কিন্তু আমি-ই রইল। But through mind, with the association of mind you become manifold. সেইজন্যই শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, আকার থাকলে বিকার হবে এবং বিকার থাকলে বিকারের পশ্চাতে তার একটা background থাকবে। সেই background কিন্তু সেই আমি-ই। আর জন্ম-মৃত্যুটা হচ্ছে আমারবোধের। আমারভাবের আদি-মধ্য-অন্ত আছে, কিন্তু আমিবোধের আদি-মধ্য-অন্ত নেই। আমাববোধের মাঝখানটা ব্যক্ত, আদিটা অব্যক্ত আর শেষটা অব্যক্ত। যেমন দেহ ধারণ করার আগে আমি ছিল, কিন্তু আকার ছিল না, মাঝখানে দেহ ধাবণ কবল, তারপর আকার এল। কিছুদিন আকাব থাকল আবার আকারটা নাশ হয়ে গেল, আমি কিন্তু আমি-ই রয়ে গেল। এই জায়গায় আকাশটা এই ঘরটা তৈরি কবার আগেও ছিল এবং এখনও আছে। একদিন এই ঘরটা যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখনও আকাশ থেকে যাবে। তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যাই হোক, এই যে বিরাট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হল, যুদ্ধের একটা প্রস্তুতি হয়েছিল। দুইপক্ষ তৈরি হয়েছিল। যুদ্ধ হয়ে যাবার পর সব শেষ হয়ে গেল। যারা এসেছিল তারা আর নেই।

অর্জুনের কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, অর্জুন তুমি দুঃখ করছ কাদের জন্য? এরা আগেও ছিল না, এখনও নেই, মাঝখানে ছিল ক'দিনের জন্য। তুমিও বহুবার দেহ ধারণ করে এসেছ, আমিও বহুবার দেহ ধারণ করে এসেছি। কিন্তু তোমার তা মনে নেই, আমার তা মনে

আছে। This is the only difference! শুধু মনের খেলা, আত্মারূপে কিন্তু there is no difference। এই যে তিনটে মন্দির তৈরি হয়েছে, লোকের দৃষ্টিতে কালীমন্দির, শিবমন্দির, রাধাকৃষ্ণ মন্দির, কিন্তু তিন মন্দিরের আকাশ কি পৃথক? বিগ্রহটি পৃথক, form পৃথক, কিন্তু এই form-এর যেমন উৎপত্তি হয়েছে, আবার একদিন এই form থাকবে না, যেমন আমাদের form-ও থাকে না। অতীতে কত মন্দির তৈরি হয়েছে, কত বিগ্রহ তৈরি হয়েছে, সেই বিগ্রহ কোথায় গেল! এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। কতগুলি লোকপ্রবাদ আছে।

বৃন্দাবনে গোবিন্দজির মূর্তি ও মন্দির সম্বন্ধে ইতিহাস রয়েছে। সেই মূর্তি সম্বন্ধে যা প্রবাদ আছে সেই সম্বন্ধে লোকে বলছে, না এটা আসল না, এটাও প্রক্ষিপ্ত। আসল গোবিন্দজির মূর্তি ঔরঙ্গজেব নষ্ট করে দিয়েছিলেন। Whatever may be, ঔরঙ্গজেব যেমন অনেককিছু নষ্ট করেছেন, তেমন তার নিজের দেহটাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরাও যেমন অনেককিছু নষ্ট করি, তেমন নিজেদের দেহটাও নষ্ট করে আবার আরেকটা part of শক্তি। বাইরের nature পরিবর্তনশীল, বিকারী—এই জন্যই তাকে প্রাকৃতবিদ্যা বলে। এই প্রাকৃতবিদ্যার মধ্যে রয়েছে পাঁচটা ভূত, আর মন-বুদ্ধি-অহংকার। কিংবা মতান্তরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিনগুণ। এগুলো বাদ দিয়ে কিন্তু analysis করা যায় না, এগুলোর পরিচয় পূর্ণ ভাবে পাওয়া যাবে না। এগুলো সম্ভব হয়েছে আমি-র সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে। আমিকে বাদ দিয়ে কিন্তু কারও কোনও অস্তিত্ব নেই, প্রকাশও নেই। গাঢ় ঘুমের মধ্যে এগুলোর অস্তিত্ব থাকে না, শুধু আমি থাকে। 'আমিশূন্য কিন্তু আমি হয় না। কিন্তু জগৎশূন্য আমি হয়। নিদ্রা তার পরিচয়।'

'এ' ছোট ছোট কথাগুলি বলছে, don't take it otherwise! এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে নানা ভঙ্গিমায় বর্ণনা করা আছে। যারা শাস্ত্রচর্চা করে তারা এগুলো লোকের কাছে বলে। 'এ' শাস্ত্র না-পড়েই এগুলো বলছে, কেননা 'এ' নিজেই তাই এবং you are also that. But you are not conscious of it because you care more for something else other than your Self. এই otherness হল কল্পনা। অন্যকিছুকে মূল্য দিতে গিয়ে নিজেকে মূল্য আমরা দিতে পারি না, হারিয়ে যায়। সেইজন্য আমাদের জ্ঞানের মধ্যে ভাগ হয়ে পড়ে অর্থাৎ কিছু জানি, কিছু জানি না। এই কিছু এসে পড়ল আমাদের জীবনে যখন, তখন আমরা জীবভাবে থাকি। সেই এক আমি জীবভাবের সঙ্গে যুক্ত। যখন কিছুকে ছাড়ল তখন সে জীবভাব ছেড়ে শিবভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। তাই দেখা যায় সাধারণত মহাত্মা মহাপুরুষরা সংসারের থেকে আলাদা হয়ে সরে দাঁড়ান, কেননা তখন তাঁদের এসব আর ভাল লাগে না। তাঁরা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান, নির্জনে যান, কেননা নিজের মূল্যবোধটা তাঁরা অনুভব করবেন বলে। নিজের মূল্যবোধ অনুভব করতে হলে একটু একান্তে যেতে হয়। কেননা হিসাবকে যদি আমরা মিলাতে চাই, তবে একান্তে বসে তা পরিলক্ষণ করতে হবে, দেখতে হবে। তা না-হলে হিসাব ঠিক মিলবে না।

জীবনের মূল্যায়ন করতে গেলে আমিবোধ দিয়ে একটু হিসাব করতে হবে। 'এ' কথাগুলি বলছে বলে মতবাদের সাধক যেন মনে না করেন যে, উনি আমার ইষ্টকে বাদ দিয়ে আমিবোধের

কথা বলছেন। ইষ্ট আমিবোধেরই একটা fashion। সে যেই ইষ্টই হোক, শিব, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, no matter—all are different design and pattern of the same One substratum which is called I। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না! অবশ্য এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে এই মুণ্ডুটাকেও দেহের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এরকম বহুবার গিয়েছে 'এর' মুণ্ড। আমি তো আছি। আমি তো দেহে সীমিত নই। রূপে-নামে-ভাবে আমি সীমিত নই, আমারই বক্ষে রূপ-নাম-ভাব খেলে। সমুদ্রের দুটো তরঙ্গকে কামান দিয়ে গুলি মারলে পরে কি সমুদ্র নাশ হয়ে যায়? What nonsense! মানুষ হিংসায় মত্ত হয়ে অপরকে, আরেকটা দেহকে গুলি করে মেরে দিল, ছোরা মেরে দিল, বোমা মেরে দিল—তাতে আত্মার কী এসে গেল! কিন্তু এই বোধ আমাদের জাগছে না বলেই আমরা ধর্ম করেও ধর্ম করছি না, আমরা অধর্মকে ধর্ম বলে মানছি, বিজ্ঞানচর্চা করেও বিজ্ঞানের রহস্য বা মর্ম বুঝছি না, দর্শন চর্চা করেও দর্শনের যথার্থ অনুভূতি জাগছে না—উল্টোপাল্টা তার অনুমান হচ্ছে মাত্র। সুতরাং জীবনভর আমরা যা করি সবই অবিদ্যা-অজ্ঞানের পর্যায়েই পড়ে, বিদ্যার চর্চাও হয় না, তার ফলও পাই না। পরাবিদ্যার কথা তো বলাই বাহুল্য। আজকে বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ কতখানি অশান্তি ভোগ করছে। সারা পৃথিবীতে tension চলছে। এইরকম বিজ্ঞানের development জগতের ইতিহাসে বহুবার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কী হল তার পরিণাম? এটা এক certain level পর্যন্ত উঠবে নাগরদোলার মতো, নিচের থেকে chair-টা উপরে উঠল, আবার নিচে নেমে গেল। Therefore this physical science or material science or natural science cannot give the solution. Problem create করবে। এই problem create করার জন্য তাকে solution দিতে হবে নিজবোধ দিয়ে। এই নিজবোধের চর্চাটা আমাদের হয়নি। We have cultured so many affairs but not the truth of our I-Principle. আমরা ego অর্থাৎ অহংকার নিয়ে মাতামাতি করেছি অনেক, কিন্তু I-Principle অর্থাৎ অহংদেবকেনিয়ে মাতামাতি করিনি। I-Principle is I-Reality.

অহংকার মানে জীবভাব, তার মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরভাব বা শিবভাব। তাকেই বৈষ্ণবরা বলে বিষ্ণু, শৈবরা বলে শিব, শাক্তরা বলে শক্তি এবং গুরুবাদীরা বলে গুরু, বৌদ্ধরা বলে বুদ্ধ, মুসলমানেরা বলে মহম্মদ/আল্লা, খ্রিস্টানরা বলে Christ—different personalities এসে গেল। কিন্তু all personality-র পশ্চাতে রয়েছে একটা impersonal substratum which is called I. I has no gender, no personality, but personality appears in the existence of I. কাজেই রামও বলছে I, রাবণও বলছে I। তফাতটা কোথায়? দুটি form-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব হল, দুটি form-ই আজকে আর নেই। But I remains present in each one of us. তাই ভক্ত বলে 'ঘট ঘটমে রাম হ্যায়'। ঘট ঘটমে রাবণভি হ্যায়। তা না-হলে জগতে এইরকম দ্বন্দ্ব বিদ্রোহ করছে কে? রাবণ! কেন? তা হচ্ছে play of I/Self-Consciousness। চৈতন্যসাগরে চৈতন্যের কত তরঙ্গ লহরী উঠছে, ভাসছে, ডুবছে, তারপর পরস্পরের সঙ্গে খেলা করে আবার সাগরেই মিশে যাচ্ছে। কাজেই এই রামই বলি,

রাবণই বলি, যত personality সব সেই এক আমি-রই কতগুলো অভিব্যক্তিমাত্র, আর কিছু নয়। এ কথাটা যদিও খুব ধাক্কা দেবে মতবাদের সাধকদের, কিন্তু তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কারণ সে নিজেই একটা form, সে তার নিজের form-কে অস্বীকার করে অন্যদের কী করে স্বীকার করবে? যখন আমরা কাউকে স্মরণ করছি তখন নিজেকে দিয়েই স্মরণ করছি। Without my existence nobody can remember anything, কাউকে স্মরণ করা সম্ভব নয়। কাজেই আমি-র যে রহস্য, তত্ত্ব, 'এ' এই চারদিন তা নানা angle থেকে সবার সামনে রাখবে এবং প্রত্যেকের আমি তা অনুভব করবে। কতখানি মানবে বা না-মানবে সেটা কিন্তু 'এর' হাতে নেই। সূর্য জগৎকে আলো দেয়, তাপ দেয় কিন্তু জগতের মানুষ কতখানি মাপবে, কতখানি ব্যবহার করবে সূর্য তো আর মাপকাঠি দিয়ে মাপে না, পরিমাণও করে না।

সত্তাশক্তির নিত্যলীলায় স্বভাবের আনন্দ খেলায়
নামরূপের এই বিশ্বমেলায় জীবনের যত পর্যায়
সবই তো বোধের অধ্যায়, সবই তো বোধের অধ্যায়।।
সুখ দুঃখ হাসি কান্না আঘাতের ব্যথা বেদনা
ভাবনা চিন্তা মৃত্যুর ভয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব অভিনয়
মিছে নয় কিছুই মিছে নয়, মিছে নয় কিছুই মিছে নয়।।
না-মানিলে শুধু সংশয়, মেনে নিলে সবই সত্যময়
সে যে বোধে বোধময় অখণ্ডেরই পরিচয়
আপনবোধের সমুচ্চয়, আপনবোধের সমুচ্চয়।।
মাধুর্যের স্বভাবমহিমায় জীবনের সকল অধ্যায়
বৈচিত্র্যের কামনা বাসনায় আপনাব স্বরূপ জানায়
প্রকাশ ক'রে গানে ও কথায়, প্রকাশ ক'রে গানে ও কথায়।।

(আড়ানা—ত্রিতাল)

আমি-র বক্ষে আমি কত ভাবে খেলে তার একটা indication পাওয়া গেল। অর্থাৎ আমিবোধে আমি কত ভঙ্গিমায় নিজে লীলায়িত হয়। সে রাম বল, কৃষ্ণ বল, বুদ্ধ বল, যিশু বল, মহম্মদ বল, নানক বল, কবির বল, চৈতন্যদেব বল, রামকৃষ্ণদেব বল আবার শক্তি বল। দেখ কতরূপে মাতৃমূর্তি প্রকাশ হচ্ছে—দশমহাবিদ্যা। মাতৃমূর্তি প্রসঙ্গে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল। তাকে উত্তরে বলা হয়েছিল—দেখ 'এ' দশ কোটি মহাবিদ্যার সন্ধান পেয়েছে। Why not দশ কোটি মহাবিদ্যা? দশমহাবিদ্যা নিয়েই তোমরা তুষ্ট! দশ টাকা পকেটে এলেই ভোগী মনে করে, ওঃ অনেক এসেছে! ক'দিন থাকবে, তারপর খরচা হয়ে যাবে। তার পরে? সেই বোধ চাই যে বোধটি সর্ব অবস্থাতে পূর্ণ থাকে। তা হল আমিবোধ। আমি-র কখনও নাশ নেই। "নাহং জাতো ন প্রবৃদ্ধো ন নষ্টো দেহোস্যোক্তা প্রাকৃতাঃ সর্ব ধর্মাঃ। কর্তৃত্বাদি চিন্ময়স্য অস্তি নাহংকারস্য এবহি আত্মন্যো মে শিবোঽহং শিবাতীতোঽহং।।" অর্থাৎ আমার

জন্ম-মৃত্যু-ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই। দেহের জন্ম-মৃত্যু আছে, ক্ষয়-বৃদ্ধি আছে। তার সাক্ষী আমি। কতবার তোমরা জন্মগ্রহণ করে এসেছ, কতবার খেলে গিয়েছ আবার কতবার খেলবে! গীতাতেও এই কথাই বলা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, অর্জুন তুমি আর আমি বহুবার জন্মেছি, এই রাজারাও বহুবার জন্মেছে, আবার আমরা দেহ নিয়ে আসব। আবার খেলে চলে যাব। "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।" হে অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি তা জানি, কিন্তু তুমি তা বিস্মৃত হয়েছ। তাই আমি তোমাকে সেই কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।" অর্থাৎ এই রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য অতি পবিত্র গোপন তত্ত্ব।

সমস্ত গোপনীয় বস্তুর মধ্যে গোপন হল আমিতত্ত্ব। কেননা এর কোনও বিকল্প হয় না, no alternative। প্রত্যেকের ভিতরে যে আমি আছে সেই আমি-র কোনও alternative নেই, কোনও substitute নেই, কোনও duplicate নেই। প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে নিজে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র কেন? এই আমিবোধ ধরে রেখেছে তোমার চিন্তাভাবনা সবকিছুকে, ধারণ করে রেখেছে বলেই তা ধর্মস্বরূপ, ব্যবহার করছে বলেই তা বিজ্ঞান, আর সর্ব অনুভূতির স্বরূপ বলে তা প্রজ্ঞান, অর্থাৎ দর্শনস্বরূপ। কাজেই you are the embodiment of all দর্শন, all বিজ্ঞান, all ধর্ম। 'এ' এই প্রসঙ্গকে নানা ভঙ্গিমায় সবার সামনে রাখছে। দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্ম পৃথক কোনও ব্যাপার নয়। জীবনকে বাদ দিয়ে এগুলির কোনও অস্তিত্ব নেই। এটা জীবনেরই অভিব্যক্তি, তোমারই মহিমা। কেননা তুমি ধর্মস্বরূপ, তুমি দর্শনস্বরূপ, তুমি বিজ্ঞানস্বরূপ। কেউ যদি বলে, আমি একটা চুনোপুটি মানুষ/জীব! তুমি আমাকে এগুলো কী বলছ? উত্তরে তাকে বলা যেতে পারে, জীবভাবটা তোমার একটা aspect, you know that you are a *Jiva* but you are in Reality *Shiva*, and that is unknown to you, কেননা তা আবৃত করে রেখেছে তোমার নিজের মন। এই জীবের মধ্যেই যাঁরা realize করে তাঁরা বলে—"সোঽহং", "অহং ব্রহ্মাস্মি"। একসময় সে এই জীবভাবে ছিল। পরে সে-ই বলছে "ব্রহ্মাস্মি"। শিশু বয়সে শিশুর ভাব, যৌবনে যৌবন ভাব, বার্ধক্যে বার্ধক্যের ভাববোধ, কাজেই এখন যারা পিতা হয়েছে তারা একদিন শিশু ছিল। The father of today was oneday a child, and the child of today will become oneday a father. Similarly, 'the saint of today was oneday a sinner and the sinner of today will be a saint oneday'. এই হল ব্যবহারিক ধর্ম ও সত্য। রাগ করতে পারে তারা। তাহলে sinner of today, আজ যাদের sinner বলছে সংসারে, যারা পাপ কর্ম করছে, অধর্ম করছে তারাও একদিন saint হবে।

'এ' দেখছে আত্মা—সে apparent sinner-ই হোক আর saint-ই হোক, the same One I-Principle/I-Reality। আমিশূন্য কেউ নেই। এই আমি-র পরিচয় জানলে sinner আর saint-এর মধ্যে ভেদ থাকে না। মা সন্তানের রহস্যটা জানে বলে, সন্তানের সমস্ত বিকারের সাক্ষী বলে, সন্তানকে সে ত্যাগ করতে পারে না। এটা স্থূল দৃষ্টিতে একটা উপমা

বা উদাহরণ দেওয়া হল। Exception আছে ঠিকই। কিন্তু আমি-র ক্ষেত্রে কোনও exception-কে আনা যায় না। কেননা আমি সবসময় আমি-ই থেকে যায়। আমি আমিশূন্য হয় না। মায়ের মধ্যে বিকার আসতে পারে লৌকিক দৃষ্টিতে, কিন্তু এই গর্ভধারিণী মায়ের উপরে রয়েছেন দেশমাতা। তার উপরে রয়েছেন জগৎমাতা, তারও উপরে পরমাত্মা। সেই পরমাত্মাই প্রসবিতা। তিনিই পিতা, তিনিই মাতা। সেইজন্য গানের মধ্যে বলা হয়েছিল—'গুরু আমার মাতা পিতা'। তিনি নিজেই গুরু, নিজেই মাতা, নিজেই পিতা। তোমরা ভজনে গাও না? "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব। ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব। ত্বমেব সর্বং মম দেবোদেবঃ।।" এই বল, কিন্তু নিজেরা ব্যবহারের সময়ে কেন ভুলে যাও? তোমরা যুক্তি দেখাও যে, তা চৈতন্যদেব করতেন, চৈতন্যদেব বলেছেন। সেই চৈতন্যদেব তো সবার মধ্যে রয়েছেন। চৈতন্য নেই কার মধ্যে? 'এ' একটা formula-র মধ্যে সত্যকে আবদ্ধ করে রাখতে পারছে না। 'I' is not all-perfect only in 'this body'. 'I' is all-perfect with all I's, manifested and unmanifested altogether.

অনন্ত আমিসাগরে কত আমি ওঠে, ভাসে, ডোবে, তার ভিতরে খেলা করে। আমি আমি-ই থেকে যায়। কিন্তু এই রহস্যটি ও সত্যটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া অতীতে সম্ভব হয়নি। এই সত্য সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। যদি একজনও এই বোধে উদ্বুদ্ধ হয়, that individual one will make others inspired and enlightened with the knowledge of Absolute Oneness. তুমিই সত্য ব্রহ্ম, তুমি সত্য আত্মা, তুমি সত্য ঈশ্বর—this is Vedanta। বেদের অন্তভাগে হচ্ছে এই জ্ঞান, আর প্রথমভাগে হচ্ছে কর্মকাণ্ড। সেইজন্য অর্জুনকে বলা হয়েছিল, অর্জুন "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।" হে অর্জুন, তুমি ত্রিগুণের বিষয় বেদকে ছেড়ে নিস্ত্রৈগুণ্য হও; গুণাতীতে চলে এস। কেননা তোমার স্বরূপ গুণাতীত। তিন গুণের মধ্যে দ্বন্দ্ব হবে। তুমি নিজে সামাল দিতে পারবে না। তোমারই ভাব এসে তোমাকে অতিক্রম করবে, যেমন সূর্যের তাপে উৎপন্ন মেঘ এসে সূর্যকেই ঢেকে দেয়। সেইরকম নিজের সৃষ্টি এসে নিজের উপরে চেপে বসল, যা বর্তমান জগতে দেখা যায়। যাই হোক, এই সব মেঘ কেটে চলে যাবে। আমি-সূর্য আবার জেগে উঠবে। এই আত্মসূর্য মানেই আমি-সূর্য। এই চরম বা পরমের আমি জেগে উঠবে, তখন সমস্ত চুনোপুটি আমিগুলো এসে লুটিয়ে পড়বে তার পায়ে। এই আমি যাদের মধ্যে জেগে উঠেছিল তাঁদের আমরা বলি Godman, মহাপুরুষ, অবতারপুরুষ, so and so। তাঁরা কিন্তু কারওর থেকে আলাদা নন। এই বার্তাটাই তাঁরা দিতে আসেন, কিন্তু মার খেয়ে যান। কার কাছে? নিজের কাছে নিজেই।

তোমরা হাসবে হয়ত 'এর' কথা শুনলে। ছোটবেলায় তো খেলাধূলা করে সব শিশু, 'এই শরীরটাও' তো একসময় ছোট শিশু ছিল, খেলাধূলা করেছে। খেলার মাঠে football খেলার competition চলছে। কোনও পক্ষে গোল হচ্ছিল না। এখন goal না-হলে খেলার কী আনন্দ আছে! 'এ' নিজের goal-এই নিজে goal দিয়ে বসল। আর সবাই 'একে' মারার জন্য ছুটছে আর 'এও' খুব ছুটতে লাগল। কিন্তু 'একে' ধরতে পারল না কেউ। তারপর

থেকে আর 'একে' খেলায় নিত না। নিজের goal-এই 'এ' goal দিয়েছে, sameside goal দিয়ে আনন্দ করা হল। ঈশ্বরও samside game খেলছেন নিজের সঙ্গে, তাই ছিন্নমস্তারূপে মা নিজেই নিজের মুণ্ড কেটে রক্ত পান করছেন। মাতৃভক্ত ক'জন পারবে এটা সামাল দিতে! এই দৃশ্য একবার দেখলে তো heart fail করবে। আর 'এ' তো প্রতি মুহূর্ত এই দৃশ্যই দেখছে। শিল্পী তার সৃষ্টি তৈরি করল অপরূপ করে, সৃষ্টিকে আবার ভেঙে দিল। The same case! কিন্তু সত্যই কি ধ্বংস হচ্ছে? তা দেখাবার জন্যে যে Divine Mother-কে তোমরা মা বলে ডাক, মন্দিরে মা কালীরূপে দেখ, দুর্গারূপে দেখ, 'এ' সেই মাকে দেখছে 'আমিবেশে, আমি-র বোধে আমি-র মধ্যে'। 'আমিবোধে' সেই মা জগৎ সৃষ্টির রহস্যটা দেখালেন দাবাঘুঁটি খেলা দিয়ে।

বিরাট একটা দাবার chess board, যারা দাবা খেলে জানে। তার মধ্যে দুই পক্ষ সাজিয়েছে সাদাঘুঁটি, কালোঘুঁটি। খেলা হচ্ছে, কিস্তিমাত হচ্ছে। সব ঘুঁটিগুলো মরল, পাশে রেখে দিল, আবার সেগুলোকে তুলে সাজানো হল এবং খেলা হল। দেখ এক বীজ দিয়ে আমি সৃষ্টি করছে, আবার ধ্বংস করছে, আবার সৃষ্টি করছে—এই আমার খেলা। আমিবোধে আমি খেলে চলেছে অনন্তকাল। কবির ভাষায়—"শিশু হয়ে খেলছ হরি শিশু সনে"। অর্থাৎ খেলাটা শিশুদের মধ্যে খুব জমে ভাল, বৃদ্ধদের মধ্যে জমে না। কেননা বৃদ্ধদের বুদ্ধিটা বেশি matured হয়ে যায়। তারা খেলাটাকে ঠিক সেই spirit-এ সবসময় নিতে পারে না, যতটা শৈশবে এবং যৌবনে তারা নিয়েছে। কাজেই খেলার spirit-টা যে বোঝে সে কিন্তু শিশু হয়ে যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণবেশে সেই আমি যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলে গিয়েছেন। তিনি কিন্তু কারওকে মারেনওনি, নিজেও মরেননি। কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে আমরা দেখলাম, যাত্রাদলের মতো, theatre-এর মতো, যেন মেরে ফেলল, সেই dead body greeen room-এ নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল। পাশাপাশি বসে গলা জড়িয়ে ধরে বিড়ি খাচ্ছে deadbody-রা (যাত্রাদলের রাজারা)। আমরাও ঠিক তাই। 'একে' এসে যখন কেউ বলে অমুকে গত হয়েছে বাবাঠাকুর, তখন উত্তরে 'এ' বলে, সে তো মরেনি, green room-এ গিয়েছে! পোশাক পাল্টাতে green room-এ গিয়েছে! এর পরে আরেকটা পোশাক পরবে। এই কথা শুনে অনেকে বলে, তুমি কী এ সমস্ত বলছ, জানো বাড়িতে শোকের চিহ্ন! উত্তরে তখন বলা হয়, আরে এও তো একটা অভিনয়। এই শোকটাও তো অভিনয়! তোমরা জানো হয়ত, এই শোক করার জন্য ভাড়া করা লোক পাওয়া যায়। তারা তোমার বাড়িতে এসে কেঁদে যাবে, এমন কান্না কাঁদবে যে যারা আসবে তারা অভিভূত হয়ে যাবে। আরে কী সাংঘাতিক ব্যাপার! চার ঘণ্টা, ছয় ঘণ্টা কান্নাকাটি করে পয়সা নিয়ে তারা চলে যাবে। Is it not a funny game? যে কান্নাকাটি করছে নিজের বাবা-মার জন্য, সাত দিন পরে সে-ই আবার ক্লাবে গিয়ে স্ফূর্তি করছে, মজা করছে। This is life! অস্বীকার করার উপায় নেই। This is the game of life! Life মানেই I, আমিশূন্য life হতে পারে না। কীটপতঙ্গের মধ্যেও I-sense আছে, খেলছে in the pattern of impulses and instincts। তা-ই তাদের I-sense. Study করলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

আজকে যা দিয়ে প্রসঙ্গ আরম্ভ হল, তা first chapter of the present topic। তারজন্য একটা শুধু ভূমিকা রাখা হল, কেননা এর পরের যে কথাগুলো আসবে সেগুলো কিন্তু খুব সূক্ষ্ম, ব্যাপক এবং অর্থবোধক। হয়ত তার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় নেই। পরিচয় করাবার জন্যই তো এত কথা বলা হচ্ছে। আমিবোধের পরিচয় কী করে পাওয়া যায় এবং তার অনুসন্ধান কী করে করতে হয় সেই প্রসঙ্গে 'এ' তোমাদের বলছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। কে এই আমি? কী এই আমি-র পরিচয়? কোথা থেকে এসেছি? আবার কোথায় চলে যাব? 'কোথা হতে এলাম আমি, কোথা ফিরে যাব, নাই ঠিকানা, কে বলে দেবে মোরে, বল না।' গুরুর কাছে বলছে, গুরু বলছেন, হ্যাঁ এই নাম জপ কর, ধ্যান কর, এই কর্ম কর। 'এ' বলছে না, এগুলো করতেও পার, না-করতেও পার। এর উপর 'এ' কোনও রকম মন্তব্য করবে না। 'এ' তোমাকে point out করছে যে, এই হল তোমার পরিচয়। যাকে তুমি খুঁজছ তা তোমারই আমি। বৃহত্তর বেশে, বৃহত্তর কল্পনার মাধ্যমে I am searching for or questing for Truth/God। সেইজন্য কৃষ্ণকে, বুদ্ধকে, রামকে, যিশুকে, মহম্মদকে, শিবকে, কালীকে আমরা অবলম্বন করে খুঁজছি নিজের আমিকে। Ultimately কী realize করব? Self, Self has assumed innumerable forms! "একোঽহম্ সর্বমিতি।" কী রকম? 'রূপে রূপে প্রতিরূপম্, নামে নামে প্রতিনামম্, ভাবে ভাবে প্রতিভাবম্, বোধে বোধে বোধময়ম্।'

অনন্ত রূপে আমি-র খেলা, অনন্ত নামে আমি-র খেলা, অনন্ত ভাবে আমি-র খেলা, অনন্ত বোধে আমি-র খেলা। শেষে বোধসাগরে সব মিশে একাকার—আমি একলা। "একোঽহম্ বহুস্যাম্।" আমি বহু হব—এই ইচ্ছা জেগেছিল ঈশ্বরের আমি-র। তাই তিনি বহু হয়ে খেলা করছেন, আবার বহুকে, সমস্তকে কুড়িয়ে নিয়ে এক-এ আপনাতে মিলিয়ে নিচ্ছেন। প্রত্যেকে কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত, ঠিক এই picture প্রত্যেকের মধ্যেই। তার ভিতরে ছোট শিশু হয়ে সে যখন জন্মেছে, তখন তার ভাবগুলো ছিল latent। যত বড় হচ্ছে, ভাবগুলি আস্তে আস্তে প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকাশ পেয়ে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই শিশু লেখাপড়া শিখে বিরাট কারখানা তৈরি করছে। সেখানে হাজার হাজার লোককে provide করছে। তাদের প্রত্যেকেরই বিরাট সংসার, সেখানে কত লোক provided হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে তার ভাব। সে ঠিক exactly তারই একটা miniature form। কাজেই প্রত্যেকেই হচ্ছে ঈশ্বর in a miniature form। তাকে পূর্ণ form-এ নিতে গেলে তোমাকে I-Principle-এর base-এ নিজেকে ভাবনা করতে হবে। আমি সসীমে, আমি অসীমে; আমি অস্তিতে, আমি নাস্তিতে; আমি খণ্ডতে, আমি অখণ্ডতে; আমি ভেদে, আমি অভেদে; আমি রূপে রূপময়, নামে নামময়, ভাবে ভাবময়, বোধে বোধময়। কিন্তু বোধশূন্য আমি হয় না এবং আমিশূন্য বোধ হয় না। এই কথাটা প্রত্যেকেই মনে গেঁথে নিয়ে যাও।

সংসার হচ্ছে আমিবোধের খেলা। এই বোধের খেলাঘরে কত ভাবে বোধ প্রকাশিত হয়। কখনও তুমি গম্ভীর; কখনও তুমি রাগ করছ; কখনও তুমি অভিমান করছ মানে দ্বেষে, হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছ; কখনও বা আনন্দে হাসাহাসি করছ; কখনও বা শোক-মোহ

করছ—কিন্তু তোমার আমিকে বাদ দিয়ে এই feelings-গুলো সম্ভব নয়। All sorts of expressions in life are possible owing to the presence of I. তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এমন কোনও intellect জগতে নেই যে এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু এই principle-কে, এই truth-কে আগে focus করা হয়নি কেন? হয়ত প্রয়োজন হয়নি। সেই জায়গায় গুরু, মা, ঈশ্বর, আত্মাকে বসানো হয়েছে এবং ব্রহ্মকে বসানো হয়েছে। সবই তো imaginary term, mere sound তো! Why should not I use the I, that is also a sound. Yes this I is very substantial, because it cannot be denied. I can deny the sounds like *Brahma*, *Atmaa*, *Ishwara* but I cannot deny I and Me. Can anybody deny It? Never! To deny, this I is required. This is the august proclamation. This is the highest discovery. That I is present before you all. You are not lost, you are not inferior to anybody, you are as superior to superior one. You are as Divine as Divine has manifested and revealed in the past, in the present andDivine as you will manifest in the future with the same understanding. এই হল 'এর' বক্তব্য যে, you are not undivine, you are divine—to make you aware of this truth. As when divine is all-pervading, all-embracing, how can you be exempted? 'এ' সবটাকেই মানে, প্রত্যেকের বাড়িতে যেন discipline-টা ঠিক থাকে, তাহলে 'এ' আনন্দে থাকবে। আনন্দে প্রত্যেকেই যাতে থাকে তার জন্যই এই প্রসঙ্গটা বলা হল।

You are the truth of all *Ananda*, truth of all knowledge, truth of all peace and love. There is no knowledge, peace, love other than you or apart from you. এই কথাগুলো তোমরা যেভাবে নিতে চাও নিতে পার। নিজেকে degrade করো না, অবসাদগ্রস্ত করো না এই ভেবে যে, আমি হীন, আমি পারি না, আমি so and so—তাকে বলা হয় অপরাধ, অর্থাৎ antithesis to the Self. Self is ever-present everywhere in everybody in the nature of I/Consciousness. Self is Consciousness Itself. প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে, তুমি তাকে কৃষ্ণ বল, রাম বল, 'এর' কোনও আপত্তি নেই। Dont degrade কৃষ্ণ, dont degrade রাম, শিব। কেননা Self has taken all forms i.e. Self appears in their forms and plays the game of Consciousness/I। 'এ' সেই জায়গায় বসিয়েছে আমিকে, অহংকারকে নয়। আমিকে base করেই সব অনুভব করছে, বোধ করছে এবং সব ব্যক্ত করছে। সেইজন্য গানের মধ্যে বলে দেওয়া হল—'আমি-র আমি অহংদেব ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর ভগবান স্বয়ং।' কিন্তু অহংকারের আমি হচ্ছে জীবের আমি। তা কল্পনাপ্রধান, গুণাধীন এবং ভ্রান্তির কারণ। অহংকার গুণাধীন ও ভ্রান্তির কারণ। সেই অহংকারের জায়গায় 'এ' বসিয়েছে অহংদেবকে। তুমি অহংকার নও, তুমি অহংদেব। তুমি মাত্র দেহ-ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি নয়, তুমি "দেহস্থোঽপি দেহাতীতম্", তুমি পূর্ণ, তুমি নিত্য, তুমি শুদ্ধ, তুমি বুদ্ধ, তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অখণ্ড শাশ্বত অচ্যুত। এই

কথাগুলো দিয়ে তোমাদের ভিতরে 'এ' আত্মবোধের পাকা আমিকে জাগিয়ে দিতে চাইছে। দেখ জাগে কি না! Why should you degrade yourself thinking that I am finite, I am so and so. তাই যদি তুমি ভাবতে পার তাহলে তুমি অসীমকে কেন ভাবতে পার না? মনটাকে ঘুরিয়ে নাও। তুমি উত্তর দিকে যদি যেতে পার তবে দক্ষিণ দিকে কেন যেতে পার না? দেখ, নিশ্চয় পারবে যেতে। না-পার তো 'এ' আছে তোমার হৃদয়ে বা বুকে, 'এ' টেনে নিয়ে যাবে। কোথায়? অখণ্ড আমিসাগরে। I am always present in you as your Real I, the Absolute. হৃদয়ের গভীরে পরিপূর্ণ ভাবে আমি বিদ্যমান। যেমন আকাশ সর্বত্র বিদ্যমান, আমি চিদাকাশরূপে চিদম্বররূপে অখণ্ড ভূমা আমিবোধরূপে সর্বত্র বিদ্যমান, একটা নিকৃষ্ট বস্তুর মধ্যেও আমি।

একজন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিল, আপনি বিষ্ঠার মধ্যেও? উত্তরে তাকে বলা হয়েছিল, হ্যাঁ আমি বিষ্ঠার পোকারূপে তার মধ্যেও বিদ্যমান, that is also My expression। কেননা বোধ ছাড়া তুমি তা উচ্চারণ করতে পারছ না এবং পারবেও না। এই কথা শুনে সে বলল, আপনি এত গভীরে! উত্তরে বলা হল, হ্যাঁ নরকেও আমিই আছি, স্বর্গেও আমি আছি আবার তার উর্ধ্বেও আমি আছি। তবে হ্যাঁ, যে নরক ভালবাসে সে নরকে বাস করছে, আমি সেখানে নরকেই বাস করছি তার বুকে বসে। যে যেরকম ভাবে আমাকে ব্যবহার করতে চায় সেই ভাবেই ব্যবহার করছে। খুনি খুনিরূপেই ব্যবহার করছে। তাদের বলা হয়েছিল, হ্যাঁ ঠিক আছে, হবি তো ১নং খুনি হবি। বদমাস হবি তো ১নং বদমাস হয়ে দেখা। ডাকাত হবি তো ১ নং ডাকাত হয়ে দেখা। সাধু হবি তো ১নং সাধু হয়ে দেখা। ১ নম্বরে আয়, এক-এ আয়। এক মানে One, One মানে I। এক-এর খেলা খেলব। এক-এর খেলার মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, দুই-এর খেলায় দ্বন্দ্ব আছে। এই কথা শুনে তারা বলেছে, আপনি তো প্যাঁচে ফেলে দিলেন! এক-এ আসলে তো আর এগুলো করতে পারব না! তখন তাদের বলা হল, এক-এ এসে দেখ না পারিস কি না! আগে আয় তো! সবার হৃদয়ে যে আমি আছে সেই আমি-র দুটো রূপ। একটা দেহ হতে বুদ্ধি পর্যন্ত উপাধিযুক্ত। এই আমি-র হৃদয়ে আরেকটি আমি আছে, তা হল নিরুপাধিক নৈর্ব্যক্তিক নিত্যপূর্ণ কেবল চিদানন্দস্বরূপ পাকা আমি। তার পরিচয়ই আজ তোমাদের সামনে কিছুটা বলা হল। এই পাকা আমি-র কথা অহংকারের আমি/কাঁচা আমি সহজে নিতে পারে না। কাঁচা আমি-র গুণ-ভাব-উপাধিকে সরিয়ে তবে এই আমিকে দেখা যায় ও জানা যায়। কাঁচা আমি-র উপাধি-গুণ-ভাবাদি বিচারপূর্বক নিকৃষ্ট ও হেয় জেনে তা পরিহার করতে হয়। সেই বিচারের পদ্ধতি ধরেই আজকের কথাগুলি বলা হল। সেইজন্য আজকের কথাগুলি হল চতুর্থ বিচার।

মন্তব্য ঃ

আজকের বিচার হল চতুর্থ বিচার। এই বিচারের তাৎপর্য তুরীয়বোধের প্রসঙ্গ হলেও তার বক্ষে কেন্দ্রসত্তার বোধ, অন্তর্সত্তার বোধ ও বহির্সত্তার বোধের ব্যবহারাদি যেভাবে হয় তার গুণাগুণ ও বিশেষত্ব আমিবোধের মাধ্যমে সিদ্ধ হয় কীভাবে তার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা।

প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে জীবনের মধ্যে আমিবোধ কীভাবে খেলে তার বিশেষত্বকে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কীভাবে স্ববোধ বা আপনবোধের মধ্যে স্বভাববোধের ব্যবহার লীলায়িত হয়, আবার তার মধ্যে অর্থাৎ স্বভাববোধের মধ্যে প্রাকৃত অনাত্মবোধের ব্যবহার প্রাধান্য পায় তাও আমিবোধের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। তুরীয় বোধসত্তা থেকে পর্যায়ক্রমে বহির্বোধসত্তায় আমিবোধের অবরোহণ গতির বিশ্লেষণ, বিচার, আবার অনাত্মবোধ হতে ক্রমপর্যায়ে এই আমিবোধের তুরীয়বোধসত্তায় উত্তরণ ও তাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা—এই উভয় বোধের গতির মধ্যে আমি-র অস্তিত্ব ও প্রকাশকে বিশেষ ভাবে দেখানো হয়েছে।

বর্হিসত্তা প্রকৃতির সঙ্গে অর্থাৎ নামরূপের সঙ্গে যে আমির সম্বন্ধ হয় সেই আমি জীবের আমি, কাঁচা আমি, অজ্ঞানী—তাকে অহংকার বলে। এই অহংকার জীবনে দেহ হতে বুদ্ধি পর্যন্ত সবকিছুকে আমারবোধ ও ভাব যুক্ত করে ব্যবহার করে। সেইজন্য অহংকারের ব্যবহারে আমির অংশ অল্প এবং আমার অংশ সর্বাধিক বেশি। এই আমারপ্রধান আমি হল জীবের ধর্ম অর্থাৎ অহংকারের ধর্ম। জীবের এই অহংকার আপনার কামনা-বাসনা পূরণের জন্য কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা ভাববোধে আপনাকে ব্যবহার করে জীবনে চলে। অহংকারের এই আমার ভাব ও বোধই হল তার সংসার। অহংকার স্বভাবেরই প্রকাশ অর্থাৎ বহির্প্রকৃতিকে ব্যবহার করে অহংকার। সে নিজেকে না-জেনেই আমার আমার করে জীবনের সব ব্যবহার করে অভ্যস্ত। তার বেশি সে আর জানে না। এই অহংকারের অধিষ্ঠান হল কেন্দ্রসত্তা স্ববোধাত্মা। অন্তরে স্বভাবের ব্যবহার অহংকার দ্বারা হয়। অহংকারের ব্যবহারে যে বিকার বা প্রতিক্রিয়া হয় তা অহংকার শোধন করতে পারে না। তাকে তা শোধনের জন্য গুরুকে বরণ করতে হয়, গুরুর সাহায্য নিতে হয়। গুরু তাকে ত্বংকার বোধে সাধনার দ্বারা স্ববোধের ঘরে অর্থাৎ কেন্দ্রসত্তার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। এইভাবে জীবের আমি, কাঁচা আমি দ্বৈতবোধের প্রভাবমুক্ত হবার জন্য অদ্বৈতবোধের পাকা আমির শরণাগত হয় এবং তাঁর কৃপায় পাকা আমির বোধের সঙ্গে তাদাত্ম্য সিদ্ধ হয়।

২৬/১১/২০০১

।। পঞ্চম বিচার ।।

ব্রহ্মানন্দং আত্মানন্দং সর্বানন্দং সচ্চিদানন্দং
পরম সুখদং কেবলম্ জ্ঞানমূর্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলম্ সর্বধীসাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং দ্বন্দ্বাতীতং ভেদাতীতম্ গুণাতীতম্
নিত্যমদ্বয়ম্ সচ্চিদানন্দঘন কেবলম্ জ্ঞানমূর্তিম্
সদগুরুং ত্বং নমাম্যহম্
ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম স্বরূপম্ সদ্গুরুং ত্বং নমাম্যহম্।
ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম সনাতনম্
পরমেশ্বর পরমব্রহ্ম পরমাত্মা নিরঞ্জনম্
সচ্চিদানন্দং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্।

(গুরুমন্ত্র)

কেবল জ্ঞানমূর্তি বলতে কী বোঝায়? যেখানে সৃষ্টির অভাব, অর্থাৎ সৃষ্টি সেখানে নেই। সেখান থেকে সৃষ্টি কী ভাবে নেমে এল তা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অনাদিকাল থেকে মানুষের মনকে এই প্রশ্ন নাড়া দিয়েছে যে, কী করে সেই পরমতত্ত্বস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, যার মধ্যে কোনও মিশ্রণ নেই, যেখানে শক্তি ঘুমিয়ে আছে, অর্থাৎ শক্তির কোনও ক্রিয়া নেই, সেখানে কী করে সৃষ্টি উৎপন্ন হল? পাশ্চাত্যদেশের বিজ্ঞানীরা তা নিয়ে গবেষণা করছে বর্তমানে এবং অতীতেও করেছে। এই দেশের মুনি ঋষিরা এ নিয়ে যথেষ্ট তপস্যা ক'রে তার রহস্য জানার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক মুনির পক্ষে কিছুটা জানা সম্ভব হয়েছিল অর্থাৎ এই পরমসত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে তাদাত্ম্য লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। এই দর্শন দূরের থেকে দেখা কোনও বস্তু নয়। তা ইন্দ্রিয়ের দর্শনও নয়। ইন্দ্রিয়ের কাছে এই গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ইন্দ্রিয় সসীম, স্থূল জিনিসকে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতে পারে। সূক্ষ্ম জিনিসকে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতে পারে না। এই প্রসঙ্গ খুব কঠিন এবং সূক্ষ্ম বলে বিজ্ঞানীরা যন্ত্রের মাধ্যমে সূক্ষ্মকে দেখতে চেষ্টা করে। এই বিরাট ভারতবর্ষের অর্থাৎ এই মহাদেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন। বৈদিক যুগের আগে যে যুগ ছিল তাকে বলা হয় প্রাক্‌বৈদিক যুগ। অর্থাৎ বৈদিক যুগ আরম্ভ হওয়ার অনেক আগেও এই দেশের মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেছে এবং প্রকৃতির এক একটা শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছে

এই ভেবে যে, এই শক্তি প্রকৃতির মধ্যে কী ভাবে লুকিয়ে থাকে! তা সন্ধান করতে করতে এই প্রকৃতিশক্তির অনেক গোপন রহস্য তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই সমস্ত দেখে তারা ভাবল যে, এই শক্তিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, কেননা এই শক্তিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে, ষড়ঋতু অর্থাৎ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এবং চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্ত। তারপর ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক প্রকাশ, নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এগুলি প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিরই পরিচয়। সুতরাং এই প্রকৃতিই হচ্ছে একমাত্র কারণ যার থেকে এই সৃষ্টি প্রকাশ হয়েছে।

সব প্রশ্নের উত্তর ঋষিগণ প্রকৃতির থেকে পাননি। তখন তাঁদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে যে, যেগুলো আমরা জানিই না বা প্রকৃতির থেকে জানতে পারছি না তার কারণ কোথায়? প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মনে জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ অজ্ঞাতকে জানার জিজ্ঞাসা, অদৃষ্টকে দেখার জিজ্ঞাসা, অশ্রুতকে শ্রবণের জিজ্ঞাসা জেগেছে এবং যা অভূতপূর্ব তা জানার ইচ্ছা অন্তরে উদয় হয়েছে। ইচ্ছা জাগলেই তো জানা যায় না। কাজেই তাদের ভিতরে এই জানার চেষ্টা নানা ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেয়েছে। তারা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাসস্থান তৈরি করে সেই পরিবেশ অনুযায়ী অন্বেষণ, জানার ইচ্ছা, জিজ্ঞাসাকে পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করেছে, যেমন এখনও মানুষ করছে। আকাশমার্গে একদল গবেষণা করছে, রকেট পাঠিয়ে গ্রহ-গ্রহান্তরে কী আছে সেই সত্যকে জানবার জন্য চেষ্টা করছে। আরেকদল সমুদ্রের গর্ভে ডুবে গিয়ে সেখানকার সত্যকে জানার চেষ্টা করছে। আর একদল পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে উঠে বহু তথ্য সন্ধান করছে। এই ভাবে অনেকে সত্যকে জানবার চেষ্টা কবছে। এগুলো সবই প্রাকৃত সত্য, যে সত্য অস্থায়ী, বিকারী ও পরিণামী। এমনকী তা জানতে গিয়ে মানুষ মৃত্যুকেও বরণ করেছে, নানা রকম বিকারের সম্মুখীন হয়েছে, রোগ-ব্যাধির সঙ্গে মোকাবিলা করেছে এবং সেগুলোকে দূর করার জন্য চেষ্টাও করেছে প্রকৃতির সাহায্যে। এখনও মানুষ তা করছে। মানুষ সর্বরকম ব্যাধি-বিকারকে দূর করার জন্য এই প্রাকৃতশক্তি, অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্ট উপকরণাদিরই সাহায্য নিচ্ছে। রোগ নিরাময়ের জন্য তিনরকম ভাবে medicine তৈরি হয়—প্রথম হল metallic, দ্বিতীয়টি হল herbal, আর তৃতীয়টি হল chemical। এই তিনরকম medicine দিয়েও কিন্তু সব রোগ নিরাময় হয় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শুধু মনোবলের দ্বারা, অর্থাৎ মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে ব্যাধি নিরাময়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

মানুষ মনের শক্তির সন্ধান পেয়েছে বাইবের শক্তি থেকে আলাদা করে। বাইরের যে শক্তি তার চাইতে তো মনের শক্তি কম নয়, কারণ বাইরে প্রকৃতি যা জানে না বা প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া যায় না তার সন্ধান মনেই পাওয়া যায়, কারণ মন আরও সূক্ষ্ম। এই ভাবে মনের গভীরে মানুষ প্রবেশ করাব চেষ্টা করে। প্রাকৃতশক্তির পাশাপাশি জীবনীশক্তির যে মাহাত্ম্য তা মানুষ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে এবং বহু চেষ্টার ফলে তা আবিষ্কার করেছে। এই জীবনের উৎপত্তি, বিকাশপ্রকাশ এবং তার অভিব্যক্তির মধ্যে নতুনত্ব, গুরুত্ব, মাহাত্ম্য আস্তে আস্তে মানুষের কাছে প্রকাশ পায়। প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি জড়, নিষ্প্রাণ বা নিষ্ক্রিয় জীবনের মধ্যে সেই শক্তি সক্রিয় কী করে হল! এই জিজ্ঞাসা নিয়ে আরম্ভ করেছে। জিজ্ঞাসার

দ্বিতীয় স্তরে point-গুলোকে clear করতে হবে, তার কারণ মানুষের জিজ্ঞাসাকে বাড়িয়ে না-তুলতে পারলে চরম প্রশ্ন তার সামনে রাখলে সে বুঝবে না, নিতেও পারবে না। কাজেই এই মনের জিজ্ঞাসা স্থূলকে অবলম্বন করে আরম্ভ হয়েছে এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেখান থেকে তার উত্তর বা সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করেছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে । যেমন সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ করে সূর্য গভীর মধ্যাহ্নে একরকম, আবার সায়াহ্নে একরকম, রাত্রিবেলায় আরেকরকম। এই ভাবে প্রকৃতিশক্তির অন্তর্নিহিত সত্যকে তারা আস্তে আস্তে মনের মধ্যে গুছিয়ে নিয়েছে বা অনুভব করেছে। বার বার ঘটনাকে লক্ষ্য করে তা নির্ণয় করার একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছে। সময়ের সঙ্গে তার যোগসূত্র তৈরি হয়। এই যে সূর্য উদয় হয় এবং অস্ত যায়, এই যে ঋতুগুলি এক একটা আরম্ভ হয়, শেষ হয়, এই ভাবে মনের দ্বারাই স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্মের সন্ধান করেছে। দেশ মানে স্থান, তার পাশে কালের পরিচয় সে পায়। আস্তে আস্তে সে কালের ব্যবহার করতে শেখে। কালের ব্যবহার অতীতকালের মানুষ কী ভাবে করেছে তা কিন্তু এখনকার মানুষ জানে না, ভুলে গিয়েছে। আমরা যে সময়ের হিসাবটা রাখি তা পাশ্চাত্য দেশের সময়ের হিসাবের অনুকরণই বেশির ভাগ। কেবলমাত্র আমাদের ভারতবর্ষে পূজা এবং ধর্মচর্চার জন্য আমরা চন্দ্রের সাহায্যে সময় বা তিথির মাধ্যমে কতগুলি ক্রিয়াকলাপ করি আর অন্যান্য কাজ সূর্যের গতিকে লক্ষ্য করে করা হয়।

সূর্যকে অবলম্বন করে যে সময়ের হিসাব আর চন্দ্রকে অবলম্বন করে যে সময়ের বিচার এর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য দূর করার জন্যই চার বছর অন্তর অন্তর ইংরাজি গণনার মধ্যেও অর্থাৎ পাশ্চাত্যদেশের গণনার মধ্যেও একটা করে leap year, অর্থাৎ একটি দিন বেড়ে যায়। এই ভাবে আবার তিথি দিয়ে দেখতে গেলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন খুঁজে পাওয়া যায় না, পাঁচ দিন কম থাকে। তা হিসাব করে তারা একটা মাসকে পরে বাড়তি মাস হিসাবে ধরে যাকে মলমাস বলা হয়। সেই মলমাসে আমাদের পূজা অর্চনা, শুভ কাজ কিছু হয় না। তার কারণ পৃথিবীর সঙ্গে চন্দ্রের যে সম্বন্ধ এবং পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের যে সম্বন্ধ এই দুটির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। আমাদের দেশের ঋষিরা এই বিষয়ে যে-সমস্ত তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন তাতে তাঁরা এটুকু জানতে পেরেছিলেন যে, চাঁদের নিজস্ব কোনও জ্যোতি নেই। কিন্তু সূর্যের জ্যোতি চাঁদের মধ্যে পড়ে সেটা controlled হয়। সেই তাপ বা আলো controlled হয়ে ওখান থেকে এই পৃথিবীতে এসে reflected হয়। তার ফলে প্রাণের দেহধারণ করার যোগ্যতা হয়। অন্যান্য গ্রহতে তা সম্ভব নয় বলে সেখানে প্রাণের দেহধারণ করার সুযোগ খুব কম। একমাত্র এই পৃথিবীতে তা সম্ভব। 'এ' তা উল্লেখ করছে এই কারণে যে, 'একে' প্রথমে এই পৃথিবী প্রসঙ্গে কতগুলো কথা বলতে হবে, তার পরে গ্রহ-গ্রহান্তরের কথা আসবে অনুভূতির গভীরে।

এই যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি তা কয়েকটা মহাদেশের সমষ্টি। আরও মহাদেশ হয়ত আছে, তা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে দেশের আকার, গঠন

এবং পরিবেশ সৃষ্টি হয়। প্রাকৃত বিজ্ঞানীরাও তা এখন স্বীকার করে। এই যে প্রাকৃতবিদ্যা, তা হল আমাদের অনুভূতির একটা দিক। আজকের প্রসঙ্গ প্রথমেই আরম্ভ হয়েছে 'ব্রহ্মানন্দং আত্মানন্দং সর্বানন্দং সচ্চিদানন্দং' দিয়ে। এই যে চারটি স্তরের কথা বলা হল—'ব্রহ্মানন্দং আত্মানন্দং সর্বানন্দং সচ্চিদানন্দং পরম সুখদং'—সেই সুখ অন্য কারণ নিরপেক্ষ, অন্য কার্য নিরপেক্ষ, তাই তা "পরম সুখদং কেবল জ্ঞানমূর্তিম্। দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষম্। একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতম্"। এই জ্ঞানমূর্তির কথাই এখানে আরম্ভ করা হয়েছে, আর সব কিন্তু subordinate এবং এই জ্ঞানমূর্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই বলা হয়েছে যে, এই জ্ঞান প্রজ্ঞানঘন নির্দ্বন্দ্ব সর্বসম তত্ত্বমস্যাদিলক্ষম এবং তা নিত্য শুদ্ধ নির্মল অচল সর্ববুদ্ধির সাক্ষী। তা আমিবোধরূপে ভিন্ন ভিন্ন মানে এবং অখণ্ডবোধে প্রকাশিত হয়। আমি আর জ্ঞানকে আলাদা করা যায় না, এই প্রসঙ্গে গতকাল কিছুটা বলা হয়েছিল। আজকে কতগুলো কথা প্রসঙ্গক্রমে আসবে যা গতকালের কথাগুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা ঈশ্বর বলি কিন্তু ঈশ্বর কী বস্তু, আত্মা কী বস্তু, ঠাকুর কী বস্তু, মা ও গুরু কী বস্তু—এ সম্বন্ধে সবার ধারণা সসীম। অর্থাৎ সবার ধারণা খুব পরিপক্ক নয়। আমরা ব্যবহার করি গতানুগতিক ভাবে, প্রচলিত রীতি বা ধারা অনুসারে, অথবা ছোটবেলা থেকে যা দেখেশুনে এসেছি সেই অনুসারে। হিন্দুদের একরকম রীতি এবং অন্যান্য ধর্ম-মতপথের লোকেদের আরেকরকম রীতি। তাদের বিশ্বাস গড়ে ওঠে সেই ভাব থেকে এবং অনুভূতিও খেলে সেই ভাব অনুসারে। কাজেই একজনের অনুভূতির সঙ্গে অন্যের অনুভূতির তফাত হয়ে যায় ভাবের তারতম্যের জন্য।

ভাব তৈরি হয় দেশ-কাল, কার্য-কারণের সঙ্গে অর্থাৎ স্থান, সময়, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সমস্ত অভিব্যক্তি—এই সব মিলিয়ে নিয়ে জীবনের উপরে আসে কতগুলি ধারা। তাকে ধরে জীবন কতগুলো reading নেয়। সবার পক্ষে এই reading নেওয়া সম্ভব হয় না, যাদের জিজ্ঞাসা বেশি তারাই নেয়। জিজ্ঞাসা অনুরূপ যে অনুভূতি হয় তা নিজের সঙ্গে পরপর মিলিয়ে নেয়। যে গবেষণা মানুষ করে তা একটা সূত্র ধরে আরম্ভ করে এবং তার আনুষঙ্গিক ক্রমকে খুব একাগ্রতা সহকারে পর্যবেক্ষণ করে, চিন্তা করে এবং বাইরের প্রকাশের সঙ্গে মিলিয়ে তার থেকে সে reading-টা নেয়। সেই reading হচ্ছে তার একটা ছোট্ট experience অর্থাৎ অভিজ্ঞতা। এই ভাবে আমাদের মধ্যে বোধের কতগুলো স্ফুরণ হয়, যেমন বীজ থেকে গাছ হয়, অঙ্কুরিত হয়ে তার পরে foliage হয়, ফুল, পাতা ইত্যাদি এবং ফুলের থেকে ফল হয় অর্থাৎ এগুলো কতগুলি পরিণাম বা ক্রম অভিব্যক্তি। মানুষের জীবনটাও একটা বীজের থেকেই তৈরি হয়েছে। কাজেই এই বীজ কিন্তু চৈতন্য দিয়েই তৈরি। কারণ চৈতন্যসাগরে অচৈতন্য বস্তুও চৈতন্যেরই একটা অভিব্যক্তি, অজ্ঞানও জ্ঞানেরই একটা অভিব্যক্তি। গতকাল এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। সব জায়গায় এই জ্ঞান বর্তমান, সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করে যা নির্দেশ করা হয়েছে, সেইরকম আমিও সর্বত্রই। কেননা জ্ঞান আমি ছাড়া প্রকাশিত হয় না আর আমিও জ্ঞান ছাড়া প্রকাশিত হয় না। আমি আর জ্ঞান অভিন্ন। এই অনুভূতি আমরা বহু

আগে হারিয়ে ফেলেছি, যার জন্য আমিকে আমরা সব সময় পৃথক মনে করি এবং ঈশ্বরকে বা জ্ঞানস্বরূপকে আমরা নিজ হতে পৃথক মনে করি। সেইজন্য জ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক, কিন্তু আমি সম্বন্ধে ধারণা পৃথক নয়। পৃথিবীর সর্বদেশের মানুষই এই আমিকে তাদের পরিভাষাতে ব্যবহার করে। ইংরাজিতে আমরা বলি 'I', বাংলায় বলি 'আমি', কোনও কোনও ভাষায় বলে 'মুই', কোনও কোনও ভাষায় বলে 'me', কোনও কোনও ভাষায় বলে 'মন', কোনও কোনও ভাষায় বলে 'অহম্'। কাজেই এগুলি হচ্ছে পরিভাষার কতগুলি বৈশিষ্ট্য—কিন্তু উপলক্ষ বস্তুটি এক।

যে কথাটা বলার জন্য এই প্রসঙ্গ বলা হল, সেই কথাটা প্রথমে বললে কিন্তু তোমাদের মন নিতে পারবে না। কারণ মনকে আমাদের তৈরি করে নিতে হয়। যে কোনও বিষয়ে চর্চা করতে গেলে মনকে সেই বিষয়ের কতগুলি fundamental point, কতগুলো vocabularies অর্থাৎ তার ব্যবহারের জন্য যে শব্দগুলি একান্ত দরকার সেই শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিতি আবশ্যক। Physics শিখতে গেলে, পড়তে গেলে কতগুলো Physics-এর term আছে, vocabulary আছে, Chemistry-রও একইরকম, Mathematics, Philosophy-র ক্ষেত্রেও সেরকম, Religion এবং Science-এর ক্ষেত্রেও একই রকম—প্রত্যেকটি বিষয় শিখতে গেলে আমাদের কতগুলো শব্দের সাহায্য লাগে। কেননা মনকে সেই ভাবে তৈরি করতে হয়। জীবন ব্যবহার করি আমরা মন দিয়ে, কিন্তু ব্যবহার করছি যে মন দিয়ে সেই মন তার সম্ভার পাচ্ছে কোত্থেকে? মনের পশ্চাতে কী আছে তা কিন্তু মন দেখতে পাচ্ছে না, যেমন আমরা আমাদের ভিতরটা দেখতে পাই না। মন তার ভিতরটা দেখতে পায় না। কিন্তু সত্যিই কি ভিতরটা দেখা যায় না? তার জন্য আলাদা করে আমাদের কিছু অনুশীলন করতে হয়, নূতন করে training নিতে হয়।

পূর্বে এই কথাগুলো কিছু বলা হয়েছিল। আদিমকালে মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সম্ভারকে ব্যবহার করতে গিয়ে প্রকৃতিশক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং সেই মোকাবিলা এখনও মানুষ করছে। এখনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি মোকাবিলা করার মতো শক্তি মানুষের মধ্যে তৈরি হয়নি। কিন্তু যাঁরা অতিমানব, মহামানব, মহাপুরুষ, অবতারপুরুষ তাঁরা কিন্তু প্রকৃতিশক্তির অধীন নন। এই প্রসঙ্গ লোকের কাছে পরিবেষণ করতে গেলে মানুষের কাছে কতগুলো data দেওয়ার প্রয়োজন আছে। শুধু মুখের কথায় তা মানুষ মানবে না। আর 'এও' ফাঁকি দিতে বা লোককে ধোঁকা দেবার জন্য আসেনি। My experience covers all possible queries with their all possible answers. 'এর' কাছে ঈশ্বর একটা imaginary figure বা imaginary idea or imaginary entity নয়। আত্মা 'এর' কাছে আমা অতিরিক্ত কোনও অস্তিত্বশূন্য প্রাণ বা অস্তিত্বশূন্য কোনও বস্তু নয়। যাঁকে বাদ দিয়ে কোনও জিনিসই সম্ভব নয় তা প্রত্যেকের ভিতরে প্রত্যেকের 'আমি' রূপে বিরাজমান। 'এ' এই সত্য প্রথমদিন থেকেই

উল্লেখ করে আসছে। কিন্তু সেই সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। আমাদের সেই শিক্ষা লাভ হয়নি। আমরা যে শিক্ষা পাই সেই শিক্ষার মধ্যে এই প্রসঙ্গ নেই। Ego বলে একটা শব্দ আমরা পাই, that is very insignificant। কেননা ego হল দেহেন্দ্রিয়, স্থূল বস্তুর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু 'এ' যেই 'আমি'-র কথা বলছে, এই 'আমি' কিন্তু স্থূলতেও আছে, সূক্ষ্মতেও আছে, সূক্ষ্মতরতেও আছে এবং সূক্ষ্মতমতেও আছে। অর্থাৎ তা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত আছে, জীবনের সঙ্গে যুক্ত আছে, জীবনের সমষ্টি অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত আছে, ঈশ্বরের উর্ধ্বে যে পরমেশ্বর তাঁর সঙ্গেও যুক্ত আছে কেবল সাক্ষীবোধে। কেননা তা কেবল জ্ঞানমূর্তি—Absolute Consciousness, the fundamental Reality, the underlying Essence of life, life-pervading Truth and the eternal Substratum, which is ever-present and never goes out of existence; without which no expression, no experience and no understanding is possible. That remains always the same without any change and modification. That is absolutely changeless, featureless, actionless, formless, changeless and secondless, অর্থাৎ One without a second, তার কোনও বিকল্প নেই—no substitute, no alternative and no duplicate। তাহলে সেই আমি-র প্রকাশ যখন কোনও জীবনের মধ্যে হয় তখন তাঁকে আমরা অতিমানব বলি, Superman, Godman বলি। তা imaginary নয়, mind সেখানে মাথা নত করে, কেন? তাঁর greatness-এর কাছে, তাঁর ভিতরে যে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়, শক্তির অভিব্যক্তি হয় তার কাছে। কাজেই মানুষের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানীগুণী তাঁকে মানুষ মানতে বাধ্য হয় নানা কারণেই। সহজ ভাবে দেখা যায় যে সমাজে আমাদের মধ্যে যারা একটু বেশি অভিজ্ঞ লোক তার কাছে পরামর্শ নিতে যায় অন্যেরা, সেইরকম এক একটা subject-এ যে পারদর্শী হয়, অর্থাৎ বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করে তখন তার কাছ থেকে সেই অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে হয়। তা মনুষ্য সমাজের একটা বিশেষ নীতি। যাদের কাছ থেকে আমরা তা গ্রহণ করি তাদের অতীতকালে বলা হত কর্তা, নেতা, ওস্তাদ। তা-ই পরবর্তীকালে আচার্য ও গুরুর রূপ ধারণ করে modified form-এ এসেছে।

বোধের অভিব্যক্তির উপরে নির্ভর করেই জীবনকে বেঁচে থাকতে হয়। এই বোধ সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা বাড়াবার জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল, কিন্তু যেই শিক্ষা আমরা এখন পাচ্ছি তা হল all objective and material। শুধু বাস্তব দৃষ্টিতে বাস্তবতাকে বজায় রাখার জন্য দেহের বোধ, ইন্দ্রিয়ের বোধ, আমাদের চারপাশের পারিপার্শ্বিক environmental বোধ, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বোধ, দেশ-কাল, কার্য-কারণের বোধ, বস্তুর বোধ, ব্যক্তির বোধ এবং নানাবিধ ঘটনার পাঁচ মিশেলি (mixed consciousness) বোধ নিয়ে আমরা জড়িত। এগুলো নিয়েই হচ্ছে মানুষের জীবনচর্চা। কিন্তু মানুষের অনেককিছুই এর মধ্যে যখন আর cover করে না তখন মানুষ জানতে চায় এর সমাধান কোথায়। এই যে জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু—এগুলোর সমাধান কোথায়? যতই আমরা atomic research,

electronic research করি, তা মানুষের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির সমাধান আনতে পারে না। তা মানুষকে হয়ত আরাম দেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মানুষের ভ্রান্তিভীতিকে দূর করতে সাহায্য করছে না বরং বাড়িয়ে দিচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান এক একটা করে গবেষণা করে আর মানুষ একেবারে লাফিয়ে ওঠে। তারা ভাবে, একেবারে প্রকৃতিকে আমরা জয় করে ফেলেছি! সেই গবেষণাই আবার সর্বনাশের কারণ সৃষ্টি করে। 'এ' কথা প্রসঙ্গে যে দু-একটা কথা বলছে, তা irrelevant নয়। একসময় কিছু বিদেশি মনীষীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, যোগাযোগ হয়েছিল। তারা বলেছিল, দেখুন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, প্রাচ্যের বিশ্বাস আর পাশ্চাত্যের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের। এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে যে জীবন তাও স্বতন্ত্র। আমরা এতকাল অনেক বিষয়ে গর্বিত ছিলাম এবং প্রাচ্যকে হেয়জ্ঞানে, পূর্ব দেশীয় লোককে হেয়জ্ঞানে অবহেলা করেছি। কিন্তু এখন দেখছি যে, তাদের কাছে যে জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে তা আমাদের কাছে নেই। আমরা বস্তুবিষয়ক জ্ঞানে exhausted হয়ে গিয়েছি, আমাদের জ্ঞান দিয়ে আমরা সুখ আরামকে ভোগ করতে গিয়ে exhausted হয়ে গিয়েছি, তার পরে আর খুঁজে পাচ্ছি না যে, এর পরে আর কী করা যায়! অথচ এই প্রাচ্যদেশের মনীষীদের সঙ্গে, জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখতে পাচ্ছি তাঁদের চিন্তা, কর্মধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তার মধ্যে রয়েছে এমন একটা base অর্থাৎ ভূমি বা স্থিতি যা আমাদের চাইতে অনেক বেশি গভীরের। তার ফলে এখানকার মানুষের আন্তরিক বা আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস এবং শান্তি অনেক বেশি, যদিও তা বর্তমানে অনেকটা ব্যাহত হয়েছে মিশ্রণের ফলে।

তাদের কথাব উত্তরে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে শুধু বোধেরই ব্যাপার, আমরা যত sense of difference, sense of identity করি না কেন all are nothing but different expressions of the same One Consciousness which verily is I Reality. This I Reality reveals and plays in four aspects, namely (i) transcendental and beyond (ii) central and universal (iii) inner and individual and (iv) outer and manifold. (i) Transcendental and beyond is I Absolute, (ii) Central and universal is I universal, (iii) Inner and individual is I individual and (iv) Outer and manifold is diversified. I Absolute is Supreme Reality or Divine Self Absolute. I universal is Self Divine, the Lord of creation, attributeless attributeful ever-free Divine Self, I individual is ever subjective doer, enjoyer and experiencer life principle and I diversified is all material objective. I-Reality is the real existence, the underlying essence and the life pervading truth of all aspects of I. Without Knowledge/Consciousness I exists not and without I Knowledge manifests not. This is the characteristics of I-Reality. এই হল অনুভূতির চরম কথা। 'এর' আমি খালি বোধের ঘরে বোধের কথাই বলে যাচ্ছে। জীবনে যে কোনও department-এ যে কোনও subject নিয়ে চর্চা করতে গেলে মানুষের দরকার হয় experience, and experience comes direct from

the innermost Consciousness. And innermost Consciousness is nothing but a revelation of the transcendental Consciousness। তা 'এ' step by step অঙ্কের মতো করে দেখাবে যাতে প্রত্যেকে তা follow করতে পারে। কেননা বোধের বিজ্ঞানে অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। এখানে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, মত, পথের কোনও restriction applicable নয়। 'এ' সীমাকে, meanness-কে, shallowness-কে, dogmatism-কে, fanaticism-কে, pride and prejudice-কে কী করে কাটাতে হয় সেই বিজ্ঞান প্রসঙ্গে বলবে। Knowledge is such a power which can interpenetrate everything, which can dissolve all contradictions of whatever nature it may be. কেননা বোধের গতি রোধ করতে পারে এরকম কোনও পৃথক শক্তি নেই। কারণ বোধ হল শ্রেষ্ঠ শক্তি, the highest power which is all-pervading. All-pervading power cannot be resisted, cannot be divided, cannot be affected and contaminated by any of the expressions of the same Consciousness. বোধের প্রকাশ কখনও বোধকে অতিক্রম করে না এবং করতে পারেও না। Point-গুলো কিন্তু ছোট, প্রত্যেকে যদি এগুলো একটু খেয়াল করে তাহলে they can easily follow My words and My Science of Oneness of Knowledge । 'এ' এক-এর বিজ্ঞান বলতে এসেছে, দ্বৈতের বিজ্ঞান নয়, মানসিক বিজ্ঞান নয়, যদিও মনকে 'এ' ব্যবহার করছে, কিন্তু কী দ্বারা? মন যার কাছে চৈতন্য পায়, বোধ পায়, আলো পায়, light পায় তার দ্বারা। Mind has no knowledge of itself. মনের কোনও আলো বা চৈতন্য নেই। It is a reflected consciousness. The background Consciousness reveals in the inner nature which appears as mind. That is the first manifestation.

এই mind-এর মধ্যে চারটে স্তর আছে বা ভাগ আছে। Mind-কে বলা হয় অন্তঃকরণ, অর্থাৎ inner faculty or organ of senses। এই যে অন্তঃকরণ এটা একটা medium, instrument বা একটা manifested ground ।এর মাধ্যমে background-এর থেকে, যে background কেবল জ্ঞানমূর্তি, অর্থাৎ Knowledge Absolute, all-pervading Knowledge Absolute, the eternal substratum which never deviates, যার কখনও বিকার হয় না, পরিণাম হয় না, যার মধ্যে ক্রিয়া নেই, সে still, সেখানে কী করে এল duality, it is a very pertinent question! এর সমাধান যারা জানেন তাদের কাছে সৃষ্টিটা secondary। সৃষ্টি করতে গেলে একটা উপাদান বা উপকরণ চাই। সেই উপকরণটা কীরকম? যেমন একটা ঘর তৈরি করতে গেলে ঘরের একটা উপাদান চাই, elemental cause দিয়ে কার্যে আসতে হয়। কিন্তু element হলেই তো হবে না, তার একটা instrumental cause চাই, অর্থাৎ matter আছে কিন্তু matter-কে চালাবে কে? একটা life চাই।

Life-এর মধ্যে কী আছে? Life এর মধ্যে একটা দেহ আছে, দেহের মধ্যে কতগুলি ইন্দ্রিয় আছে, ইন্দ্রিয়কে চালাচ্ছে প্রাণ, প্রাণকে চালাচ্ছে মন, মনকে চালাচ্ছে বুদ্ধি। 'এ' শব্দগুলো

বলে যাচ্ছে কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটি Consciousness-এর standpoint থেকে analysis করে দেখাব as it revealed in Me. I have not gathered any knowledge from anywhere, I don't follow anybody except My own Self. যেই আমি নিত্যকাল ছিল, দেশ-কাল, কার্য-কারণ সৃষ্টি হওয়ার আগেও ছিল, সেই আমি এখনও আছে এবং চিরকাল থাকবে and that I exists in you all as your I। তা পরিষ্কার করে বুঝলে পরে you will be perfectly relieved from your worries, agonies and anxieties caused by your own mind. You will be tensionfree, carefree, desirefree and fearfree। অর্থাৎ জীবনে আর fear থাকবে না, ভ্রান্তিভীতি, জরা, ব্যাধি থাকবে না, মৃত্যু থাকবে না। কেননা Consciousness-এর মৃত্যু নেই, তার shadow-র মৃত্যু আছে। মৃত্যু মানে change, Consciousness never changes, but Its reflection changes, তাঁর reflection-এর change আছে এবং reflection-এর reflection-এর change সব চাইতে বেশি। তার reflection maximum হচ্ছে objective। এই objective-কে analysis করলে চৈতন্যই পাবে, আর কিছু পাবে না।

বিদেশ থেকে যে scientist-রা এসেছিল তাদের একটা পাথরের টুকরোকে দেখিয়ে বলা হয়েছিল যে, এটাকে analysis কর টুকরো টুকরো করে, then you will find atom, atom-কে তুমি analysis কর তাহলে neutron এবং electron পাবে। Neutron is uncharged particle which has no change and modification at all. Electron is ever-changeable. In and through the process of analysis you will find Protron, Photon etc. কিন্তু তার দ্বারা নিজেকে জানা যাবে না। তুমি ওইটুকু সম্বন্ধে জানতে গিয়ে ওখানে দেখলে জ্ঞান এতগুলো বৃত্তি নিয়ে সেখানে এসেছে। From one point to many expressions কতগুলো বৃত্তি! প্রত্যেকটি বৃত্তির একটা করে নাম, একরকম ব্যবহার and that depends upon the expression of knowledge and experience। এই কথা শুনে তারা বলল, আরে তুমি এসব কী বলছ? উত্তরে তাদের বলা হল, If I take away the experience, the expression of knowledge, you cannot find anything, you cannot know anything. Your knowledge is possible because the Consciousness is functioning in you. That is knowingness of knowledge , Be-ness of Being. Luminosity of light is always present, otherwise light cannot be light, Knowledge cannot be Knowledge and Consciousness cannot be Consciousness.

চৈতন্য ছাড়া চেতন হয় না। জ্ঞান ছাড়া জ্ঞান কখনও হয় না এবং অনুভূতি ছাড়া অনুভূতি/আমি কখনও হয় না। এগুলি সবই আমিকে base করে। What a great wonder! That I exists always as I. One I never changes it's course, it's form, it's nature. I remains always I। দেখ সবার মধ্যে যে আমি আছে, সে রোগে, শোকে, তাপে, দুঃখে আমিকে ব্যবহার করছে। Nobody can ignore It! But you do not pay

any importance to all these things. Why? Because you have not been trained up. সেই শিক্ষাই তোমাদের নেই। বর্তমান ধর্ম আমাদের সেই শিক্ষা দিতে পারেনি। 'এ' ধর্মকে criticize করছে না। ধর্মের মধ্যে যার অভাব তা-ই 'এ' রাখছে সবার সামনে। অনেক ধর্মনেতা 'এর' উপরে খুব অসন্তুষ্ট। একটু মন দিয়ে শোন। তুমি কি বলতে পার যে সেই পরমসত্যের সঙ্গে তোমার তাদাত্ম্য হয়েছে? জীবনভর তো তুমি কত ক্রিয়াকলাপ করেছ, কিন্তু have you experienced that Reality as your I? If not then listen to Me, then you will definitely be enlightened and will realize yourself with the same light as I have got. 'এর' আমি আর তোমার আমি-র মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, because I am the same Consciousness and you are also the same Consciousness, only that your mind does not allow you to know it. Difference-টা হচ্ছে দেহ থেকে বুদ্ধি পর্যন্ত। তোমার মনই তোমাকে allow করছে না। Mind has become very much biased and prejudiced by conventional laws. কতগুলো গতানুগতিক প্রচলিত ধারার সঙ্গে আমরা accustomed হয়ে গিয়েছি right from our birth, তার ফলে আমরা তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। Our convention is the greatest demon, এর নাম বৃত্রাসুর। এই বৃত্রাসুরকে নিয়ে দেবতাদের মধ্যেও চিন্তা হয়েছিল কারণ বৃত্রাসুরের দ্বারা দেবতারা স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন। It is a legendary and mythological একটা ঘটনা, কিন্তু এর মধ্যে reality রয়েছে।

দেবতাদের যে আমি তা প্রপীড়িত হয়েছিল এই বৃত্রাসুরের দ্বারা—অর্থাৎ আমাদের যে বৃত্তির সমষ্টি, বুদ্ধি-মন-অহংকার-চিত্ত (অন্তঃকরণ)। এই হচ্ছে আমাদের বন্ধন। অন্তঃকরণ রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে কাজ করে না, তাই রাত্রিবেলা আমরা একটু শান্তি পাই সবাই। It is a fact, nobody can deny it . আর যাঁরা মহাসাধক তাঁরা ধ্যানের গভীরে এই অন্তঃকরণকে অতিক্রম করে উপরে চলে যান above mind । তাঁরা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সেখান থেকে যখন নেমে আসেন তখন তাঁরা মনের তাঁবেদারি করেন না। যদি করেন তাহলে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। If I give any importance to mind and intellect of any higher stage I will definitely deviate from my true nature (Self-nature). আমি বুদ্ধির দাস নই, আমি মনের দাস নই। আমি মনের গোলামি করি না, মন আমার গোলাম, মন আমার বশে থাকবে। একটা দেশের President নিশ্চয়ই এটা বলতে পারেন যে, আমার সমগ্র দেশ, সমস্ত দেশের যে নাগরিক তারা সবাই আমার অধীন। সভ্যতার দিক থেকেই কথাটা আসছে। তাঁকে আমরা মানি, কেননা he is the first citizen। তাঁর উপরে কতগুলো দায়িত্ব আছে যেটা আমরা নিজেরা নিতে পারি না। By virtue of merit তাঁকে আমরা President করেছি। এগুলো আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে হয়ত মনের বিচারে differ করতে পারে, কিন্তু this is the rule। প্রকৃতির রাজ্যে এই যে বড় বড় শক্তি, সমস্ত phenomenal ব্যাপার আমরা যে দেখছি, providential agents যেমন the sun, the moon,

the stars, বায়ু, অগ্নি, জল—এদের মধ্যে যে শক্তি inherent আছে, অন্তর্নিহিত শক্তি যেভাবে এদের মধ্যে অবস্থান করছে, সেই শক্তিকে আমরা অতিক্রম করতে পারি না, কেননা আমরা limited কতগুলো ধারণা নিয়ে বাস করছি। এই ধারণাকে যদি আমরা অতিক্রম করতে পারি তখন দেখব এদের সঙ্গে আমাদের identity রয়েছে।

'এ' এরকম গুণী লোকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিল, যাঁরা কতগুলো অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। সেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে নেই। তাঁরা বলেছিলেন, আমরা সাধারণত এক বেলা না-খেয়ে থাকলে কৃশ বা দুর্বল হই, কিন্তু উত্তরাখণ্ডে পাহাড় পর্বতে এমন অনেক সাধক আছেন যাঁরা তিনদিনে সামান্য একটু কিছু খান। কেউ বা সাত দিনে সামান্য একটু কিছু খান—একটু গাছের ফল, কিংবা দু'একটা গাছের পাতা অথবা বরফের মধ্যে পড়ে থাকা চমরী গরুর দুধ যা চিমটে দিয়ে একটু খুঁচিয়ে নিয়ে লোটার মধ্যে রেখে দেন। পরে ধুনি জ্বালিয়ে যখন তাঁরা বসেন তখন গরম করে তা তাঁরা খেয়ে নেন, অর্থাৎ দুধ বরফের মধ্যে পড়ে জমে যায় (তা-ই হল মালাই বরফ)। তা পাহাড়ি দেশের ঘটনা, আমাদের plane-এ আমরা তা জানি না। আমরা এখানে মালাই বরফ খাই, কুলফি বরফ খাই, ice cream খাই। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দশ দিনে একটু কিছু খান, কেউ কেউ শুধু জল খান। তাঁরা বলেন যে, জল হজম করা খুব কঠিন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যিনি প্রতিষ্ঠাতা বা founder, সেই প্রণবানন্দ স্বামী, তাঁর followers-দের বলেছিলেন যে, "ভালমন্দ খাওয়ার জন্য কিন্তু কখনও লালায়িত হোস না! তোরা সেবা করার জন্য এসেছিস, তোদের দায়িত্ব আমার। আমি তোদের বলছি, তোরা যা পাবি grudge করবি না, তা-ই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবি, অভিযোগের সঙ্গে নয়। যদি কিছু না-পাস তাহলে জলই পান করবি। এই জলই তোদের রক্ষা করবে, কারণ জল হচ্ছে প্রাণের একটা রূপ।"

আমরা উপোস করে তিনদিন চারদিন থাকতে পারি, কিন্তু জল না-খেলে শরীরে অনেক বিকার সৃষ্টি হয়ে যাবে, জলপান করলে তা হবে না। যাই হোক, সাধুদের মধ্যে কেউ কেউ জলপান করেন আবার কেউ কেউ জলও পান করেন না। তাহলে তাঁরা কী করেন? গুম্ফার থেকে বেরিয়ে এসে সূর্যের তাপের মধ্যে তাঁরা কিছুক্ষণ বসে থাকেন এবং ultraviolet ray-টুকু নিয়ে গুম্ফাতে ঢুকে যান। সেখানেই তাঁরা তপস্যা করছেন। আমাদের সভ্য মানবসমাজ কিন্তু তাঁদের কোনও খবর রাখে না। তাঁদের অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁদের অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে জানতে পারলে আমাদের সমাজের মানুষ ছুটবে তাঁদের পিছনে। তাঁদের কাছে গিয়ে বলবে, বাবা, আমাকে এই করে দাও। বাবা আমাকে ওই করে দাও। তাই ঘটছে চারদিকে। আবার কেউ কেউ সূর্যের আলোও নেন না, গুম্ফার থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে সেই পাহাড়ের উপরের পবিত্র হাওয়া অর্থাৎ শ্বাস ভর্তি করে হাওয়া নিয়ে কুম্ভক করে চলে যান গুম্ফার ভিতরে। শুধু হাওয়ার উপরেই তাঁরা বেঁচে আছেন, কেননা হাওয়াও তো প্রাণ। এগুলো

সম্বন্ধে research আমাদের বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও ভালো করে হয়নি। সাধকরা বা তপস্বীরা তা নিয়ে মেতে আছেন। তারা একটা class, they are also scientist।

'এ' scientist-দের বলেছিল যে, তোমরাই মনে করো না যে, you are the only scientist। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জায়গায়, প্রত্যেকটি মানুষ to some extent is a scientist। কেননা তার মধ্যে কতগুলি বিজ্ঞানের ব্যবহার হচ্ছে, যার অভিজ্ঞতা প্রত্যেকের মধ্যে বিশেষ বিশেষ degree-তে প্রকাশ পাচ্ছে, you cannot ignore them। অনেকক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে একটা ছোট শিশুর কাছ থেকে আমরা এমন কিছু জিনিস শিখতে পারছি যা বৃদ্ধরাও জানে না। 'এ' আবিষ্কার করেছে 'All Divine for All Time, as It Is,' and this is the highest proclamation। সভ্যতার ইতিহাসে এই কথাটা তোমরা হয়ত বেদান্তের ভাষায় পেয়েছ "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" রূপে। ভক্ত, যোগী অনেক সময় বলে, ঈশ্বরই সব হয়েছেন, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে তা মানা very difficult। যদি ঈশ্বরই সব হয়েছেন, তাহলে সবাইকে আমরা ঈশ্বর বলে মানতে পারছি না কেন? এই সবকে ছেড়ে আমরা বিশেষ একটা রূপ, নাম, ভাবকে কেন দেখছি? 'এ' কিন্তু ওতে তুষ্ট নয়। I must find out the background of all these, the essence of all these, the underlying reality of all these. That is not imaginary, that is not one's monopoly or patent idea, thought, doctrine, thesis or theory. That is the Reality as it is for one and all for all time. All time, কেননা সত্য সর্বকালের জন্য, কাল কখনও সত্যকে গ্রাস করতে পারে না। তাঁরা "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলতে All Divine-কে বোঝান, but not for all time as it is—এই কথা তাঁরা বলতে পারেননি। তাই এই কথা মুখ থেকে বেরোনোর পরে অনেকে বলেছে যে, বাবাঠাকুর তুমি দেখছি একটা নূতন sermon দিয়ে গেলে 'for all time', আবার 'as it is', পৃথিবীর সর্বদেশের মানুষের জন্য দিয়ে গেলে। তাদের এই কথাটা মানতে হবে, এ কথা শুনতে হবে, তাদের follow করতে হবে যে, if we talk of God that God cannot be limited by one sect, by one school of faith, by one tribe or section of people। কোনও দল-মত-পথের অধীন আত্মা বা ভগবান নন অর্থাৎ অখণ্ড আমি অখণ্ডই থেকে যায়, কেবল আমারভাববোধটা পাল্টায়। যা নিয়ে আজকে চলছে—হানাহানি কাটাকাটি। তারা প্রত্যেকেই দাবি করছে, আমারটা ঠিক, অন্যেরটা বেঠিক। কিন্তু 'for all time, as it is' এই কথাটা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা কার সঙ্গে লড়াই করব? There is no second entity apart from the God or Self, and that God or Self is verily your Real I (Self I). When you discover that, with whom will you fight? For what cause and how, why? কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবে মানুষ? কিন্তু মানুষকে কী করতে হবে? তাকে তা নিজের মধ্যে আবিষ্কার করতে হবে, বাইরে নয়।

If you want to study anything, if you want to learn anything, if you want to know anything, if you want to be perfectly convinced by anything,

that is verily your Self I. That I is full of infinite power or potency. All possibility and probability can be experienced only in your Real I. এই I হচ্ছে God/Self, আবার I হচ্ছে dog, একেবারে opposite। প্রথম I হল অহংদেব পরমজ্ঞানী এবং দ্বিতীয় I হল অজ্ঞানী। যেমন মানুষের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা এবং তার পুত্র—পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা/জ্ঞান বা experience-এর পার্থক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রত্যেকের আমিকে অবলম্বন করেই তা সম্ভব হয়। Experience-এর তফাত, শুধু vary করছে experience। প্রত্যেকেরই পোশাক আলাদা, প্রত্যেকেরই মনের বৃত্তি আলাদা, কিন্তু প্রত্যেকের I কিন্তু আলাদা নয়। I-এর কোনও gender নেই। I দিয়ে কখনও কেউ বলতে পারবে না যে, এই I male, এই I female বা এই I neuter। এক college-এর principal-কে কথাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, বাবা তোমরা এত ছেলেমেয়েকে পড়াও, শেখাও তো সবাইকে, কিন্তু যতখানি শিক্ষা সবাইকে দিয়েছ এবং দিচ্ছ তার কিছুটা অংশ নিজেকেও দিও। এই কথা শুনে তিনি একটুখানি offended হলেন। তিনি বললেন, আপনি কী বলছেন! তখন তাকে বলা হল, হ্যাঁ শেখাতে গেলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। A teacher is more a student than a teacher himself or herself. তিনি বললেন যে, আপনার কথার যুক্তি আছে। উত্তরে বলা হল—হ্যাঁ, সেইজন্য ভগবান is the most humble One. We cannot be humble, we only grumble in all respects of life. পরস্পরের সঙ্গে আমরা grumble করছি। God is most humble. নিকৃষ্ট হতে নিকৃষ্টতর এবং নিকৃষ্টতম হতে পারেন একমাত্র God/Self এবং তাই হয়েই তিনি আছেন। He has become that. নিজে demonstration দিয়ে দেখাচ্ছেন যে, দেখ, I have become all. That is why, 'All Divine for All Time, as It Is'. 'এ' তা উপলব্ধি করে বলছে, আন্দাজে মন দিয়ে বলছে না। বাবা-মায়েদের সামনে 'এর' এ-ই বক্তব্য।

I am not a *Sadhu/Sant* কেন না 'এ' কখনও অসাধু হয়নি। 'এ' সাধু হতে যাবে কেন? সাধুসমাজ এ কথা শুনে বলেছে, আপ ক্যেয়া বোল রহে হ্যায়? অসাধু হলে তো 'এ' সাধু হবে। 'এ' সাধু হওয়ার কোনও প্রয়োজনই বোধ করেনি। উত্তরে বলা হয়েছিল, দেখ a patient takes medicine, but a man of sound health never takes any medicine। এই কথা শুনে তারা বলল, হাঁ ইয়ে বাত ভি সহী হ্যায়। তখন তাদের বলা হল, সহী বাত হ্যায় তো সহী বাত শুনো। দেখো তুমলোগ তো ইতনা শাস্ত্রপাঠ কিয়া, ম্যায়নে তো কুছভি নেহী কিয়া। খুদ কো পাঠ কিয়া ম্যায়নে। আপনে কো শিখায়া ম্যায়নে। I have trained up Myself, I have studied Myself and not anybody else. আমি-র মধ্যে আমি আবিষ্কার করেছি infinite-কে। That infinite is in the outer nature, in the inner nature, in the central nature, in the transcendental nature and you are also the same, though you are not conscious of it because you have been hypnotized by your lower nature i.e. the nature governed by your *Tamas*

and *Rajas*. Your imagination is a bar for your Self-realization. কিন্তু এই imagination-কে ঘর্ষণ করতে করতে, ঘষতে ঘষতে দেখবে তা চিকনাই হয়ে গিয়েছে। It will become brilliant, shining. তখন তা দেবতা হবে, তৈজস হবে, তার পরে ঈশ্বর হবে, তার পরে আরও পিছনে, মানে Pure Consciousness-এ পরিণত হবে। Unmixed Consciousness, unalloyed Consciousness and infinite One, undivided One Consciousness–that is the Absolute I. সেই Absolute I-এর বক্ষেই কতগুলো I খেলা করছে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিমায়। কী ভাবে? দেহের সঙ্গে যুক্ত অহংকারের আমি, তারও গভীরে সমষ্টি অহংকারের আমি, তারও গভীরে ত্বংকারের আমি, তারও গভীরে সমষ্টি ত্বংকারের আমি। এই 'আমার আর তোমার, তোমার আর আমার' দিয়ে জগৎসংসার। 'এ' এই যে কথাগুলো রাখছে, এর মাধ্যমে কিন্তু কারওকে আঘাত করছে না, কারওকে degrade করছে না। I only express the scientific analysis of the Self-Conscious Awareness.

আত্মবোধের অভিব্যক্তি জগৎসংসার। All contradictions in the outer nature is verily I am. All duality in the inner nature is verily I am. All unity of Consciousness centrally in the core of heart is verily I am and above all these the transcendental Consciousness in transcendental nature is also I am and I am beyond, beyond, beyond. 'ন বিদ্যা আত্মবিদ্যাৎপরি ন জ্ঞানং আত্মজ্ঞানাৎ পরম'—আত্মজ্ঞানের পরে আর কোনও জ্ঞান নেই, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এর পরে আমাকে আর কী জানতে হবে? ব্রহ্ম মানে I am the Absolute, Absolute covers all. Nothing is exempted and that verily you are. এই আমিবোধ কিন্তু কারওকে বাদ দিয়ে নয়। You are the same One, but you have forgotten that, no matter, get up, rise up. When you have got a chance to realize your Self, why should you not utilize that opportunity? এর জন্য তো তোমাকে কিছু pay করতে হবে না। School, College-এ পড়তে গেলে তোমাকে pay করতে হচ্ছে, কেননা দ্বিতীয় বস্তুকে স্বীকার করতে হচ্ছে তার জন্য, তোমাকে তা বজায় রাখার জন্য pay করতে হচ্ছে। আর নিজেকে স্বীকার করার জন্য তুমি কাকে pay করবে? Whom to pay? You are the master, you are the student. লোকে বলবে, ইনি পাগলের মতো কী আবোল-তাবোল বলছেন, unconventional! Yes, I am not subject to any convention, convention is a limitation and limitation is ignorance. Why should I become a foul or subject to ignorance? Why? I think none of you also are subject to ignorance, because everybody wants to overcome ignorance.

আমরা অজ্ঞানকে অতিক্রম করার জন্য প্রতিমুহূর্ত ইচ্ছা করি, চেষ্টা করি, কিন্তু তবুও পারি না। 'এ' একটা নূতন light, নূতন দৃষ্টিকোণ, নূতন অনুভূতির কথা সবাইকে বলছে। এখানে 'এ' কোনও পুরানো কথাকে বাদ দিয়ে দেয়নি। যা তোমাদের আছে তার মধ্যে আরও add (add Me) কর। Add more and more and you will become all-perfect. You

will realize your Self as all-perfect, কেননা 'এ' perfection-এর light-টা তোমাদের দিচ্ছে। Imperfect mind-এ perfection-এর light নিয়ে যাও, mind will become অ-মন অর্থাৎ mind-এর contradiction বন্ধ হয়ে যাবে। একটা কথা প্রসঙ্গে এই বিজ্ঞানীরা নানারকম প্রশ্ন করে 'একে' বলেছিল, বাবাঠাকুর তুমি বিজ্ঞানের উত্তরগুলি এত সহজে কী করে দাও একেবারে গতানুগতিক চার পাশের উদাহরণ দিয়ে? প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল, দেখ জ্ঞানস্বরূপ এত সোজা বস্তু যে, তার মধ্যে কোনও mixture নেই। জ্ঞান কোনও admixture নয়। That is genuine. এত genuine যে তার থেকে genuine আর কিছু হতে পারে না। যা-কিছু সম্ভব শুধু একমাত্র শুদ্ধ জ্ঞানের জন্যেই। তা ছিল, আছে এবং থাকবে এবং সেই জ্ঞান তোমার আমি। তা-ই হল original।

'এ' শাস্ত্রের পাতা থেকে কিছু উল্লেখ করছে না, মন্দিরে, গির্জায়, দরগায় যাচ্ছে না। কিন্তু সেখানে কেউ গেলেও 'এ' আপত্তি করবে না, কারণ তা তোমার মধ্যেই রয়েছে। It is your outer nature. তুমি যখন মন্দিরে যাচ্ছ, গির্জায় যাচ্ছ বা মসজিদে যাচ্ছ that is your outer chamber, but তুমি যাচ্ছ, মন্দির তোমার ভিতরে ঢুকছে না। তোমার দেবতা তোমার ভিতরে ঢুকছেন না। তুমি দেবতার মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করছ due to your false and perversive understanding। সোজা কথায় মানুষকে বলা হয়েছিল, দেখ মানুষ দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়ায় সত্যের সন্ধানে। তার ইষ্ট ঠাকুরকে দেবতাকে খুঁজে বেড়ায়, সাধুসন্তরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দার্শনিক বস্তু নিয়ে, প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করছে, এইরকম। কিন্তু তোমায় আশ্রমে আশ্রমে ঘুরতে হবে না। 'The best of the *Ashramas* is your shelter, best of the Temples or Mosques or Churches is your body, and best of the priests is your mind and best of the *Ishtas* or your chosen deities or God or Self is verily your true I.' এই solution-কে এমন কোনও মতবাদ নেই যে কাটাতে পারে। 'এ' কারওকে ভুল পথে চালাবার জন্য আসেনি। My light of understanding is so infinite, unmixed and unalloyed that it will never deceive anybody, কারওকে কখনও বিভ্রান্ত করবে না। যারা বিভ্রান্ত হয়ে আছে তাদের বিভ্রান্তি সরে যাবে, কিন্তু যারা গোঁড়ামি, অর্থাৎ মতবাদের গোঁড়ামিতে ভুগছে তারা 'এর' কাছে আসবে না, শুনবে না 'এর' কথা। তারা ঐ চক্রের মধ্যেই ঘুরবে। মাতাল যেমন মাতালের আড্ডা ছাড়া কোথাও যেতে চায় না, পেঁচা যেমন রাত্রিবেলা বেরোয়, দিনের বেলা বেরোয় না, সেইরকম যারা মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে তারা মতবাদ ছাড়বে না। সীমার মধ্যে থেকে তারা অসীমকে খুঁজছে। তা একটা foul game. যেমন একই জায়গায় paddling করছে, গাড়ি আর চলছে না।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের তিন মাতালের গল্প বলছি শোন— তিন মাতাল একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলছে, চল আমরা একটু তীর্থ করব, অনেক তো পাপ কর্ম করলাম। মদ খেয়ে অনেক কুকর্ম করেছি, চল এবার একটু তীর্থ করি গিয়ে। কিন্তু কী করে যাই! কাছাকাছি একটা তীর্থ আছে, আমরা সন্ধ্যাবেলা নৌকোয় উঠে চড়ে বসলে সকালবেলা পৌঁছে যাব। সেখানে গিয়ে স্নান

সেরে মন্দিরে গিয়ে একটু পুজো দিয়ে আসব। আমরা তো কোনওদিনই পুজো দিইনি। আচ্ছা, মন্দিরে যখন যাবই কালকে তাহলে আজকে একটু বেশি করে মদ খেয়েনি। তিনজন খুব করে মদ খেয়েছে। মদ খেয়ে নৌকায় উঠেছে তিনজনেই। নৌকোয় উঠে বসে একে অপরকে বলছে, আমি হাল ধরব, একজন বলে আমি বৈঠা বাইব (বৈঠা মানে নৌকো চালাবার জন্য যে কাঠের একটা piece থাকে, তা দিয়ে জলকে একরকম করে নাড়তে হয়, ফলে নৌকো জলের উপর দিয়ে চলে)। সারারাত তিনজনে নৌকো বাইল, ভোর হয়ে এল। তখন একজন আরেকজনকে বলছে, আরে আমরা তীর্থক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়েছি! তারপর তিনজন তাকিয়ে দেখে নৌকা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। তার মানে তার নোঙরটা তোলা হয়নি, দড়িটা বাঁধাই ছিল, তা আর খোলা হয়নি। 'এ' সত্য ঘটনা বলছে, it is not a funny story, যা বাস্তবে ঘটে তাই বলা হচ্ছে। বাস্তবের অর্থ হল— 'বাস তব যস্মিন দেশে,' তা-ই বাস্তব। তুমি যেখানে বাস করছ তা-ই বাস্তব। তুমি নিজের মধ্যেই বাস করছ, that is the greatest বাস্তব। আর এ তো বাইরে। আজকে আমরা এখানে সবাই মিলিত হয়েছি। দুই ঘণ্টা পরে আমরা এখানে থাকব না। কিন্তু এখন এই হল বাস্তব। কেন বাস্তব সম্ভব হল? 'এ' এখানে বসে আছে বলে। কিন্তু আমি তো আমি-র মধ্যেই আছি। আমি বাইরেও আছি, আমি অন্তরেও আছি, আমি কেন্দ্রেও আছি, আমি তুরীয়তেও আছি। Because Consciousness is all-pervading and I am the identity of Consciousness.

Everything exist in Consciousness because everything is the manifestation of Consciousness. Everything dwells in Consciousness and everything dissolves in Consciousness. Consciousness remains the same, so am I. Everything মানে appearance. Appearance উঠছে, কিছুক্ষণ থাকছে, তারপর ডুবে লয় হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই যে দেহ নিয়ে এখানে বসে আছে এই দেহ কতবার পৃথিবীতে এসেছে ও গিয়েছে তা কেউ অনুমান করতে পারবে না। কিন্তু শৈশবের থেকে এই বর্তমান বয়স পর্যন্ত কতগুলি বৃত্তি প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকের ভিতরে খেলেছে তা কেউ কি হিসাব করে বলতে পারবে? Mental vibrations under different circumstances, different conditions and different events! তা সুখেরই হোক, দুঃখেরই হোক এবং ভীতিপ্রদই হোক আর আরামদায়কই হোক। আমরা এই মনকে নিয়ে চলছি। মন সাপের মতো খোলস বদলাচ্ছে। আমরা যেমন পোশাক পাল্টাই সেরকম মনও দেহ পাল্টায়। কিন্তু দেহকেই আমরা গুরুত্ব দিই বেশি। এই হল জড়বুদ্ধি, অর্থাৎ অহংকারের এই সবচাইতে বড় demerit। দেহই হচ্ছে সর্বস্ব সবার কাছে। এরা হচ্ছে জড়বাদী। জড় বস্তুর মধ্যেও চৈতন্য আছে, কিন্তু তা lowest unit of consciousness। এই lowest unit of consciousness-কে যে ব্যবহার করছে সে something different and something greater to some extent। সেই অহংকারও কিন্তু ঐ জড়কে ছেড়ে চৈতন্যের দিকে যেতে চায় না—তাহলে সেই অহংকার আর অহংকার থাকবে না। কাজেই মন বস্তুকে ছেড়ে, অবলম্বনকে ছেড়ে নিরবলম্ব হতে চায়

না। ঘুমের ঘোরে প্রকৃতির নিয়মানুসারে কিছুক্ষণের জন্য মন বিশ্রাম করে কোথায়? তার পশ্চাতে অব্যক্তে বা কারণে। তখন মনের কোনও ক্রিয়া থাকে না, ঘর-সংসার জগৎও থাকে না। ঘুমের মধ্যে জগৎ থাকে না, কেননা সেখানে অহংকার নেই। জগৎ দেখে অহংকার/ কাঁচা আমি, আর তাকে দেখে পাকা আমি। এই আমি দেখে অহংকারকে আর নিজেকে। অহংকারকে দেখে shadow হিসাবে, নিজেকে দেখে Real হিসাবে। আর অহংকার দেখে নিজেকে light হিসাবে, reflection হিসাবে, আর জগৎকে দেখে তার ভোগ্য বস্তু হিসাবে, অর্থাৎ object of enjoyment. Therefore outer nature is concerned with the inner nature. Without your inner senses mind and ego cannot experience the outer nature, any object of nature, form of any kind, sound of any kind, texture of any kind, taste of any kind and touch of any kind. তার জন্য চাই ইন্দ্রিয় আর মন। তা অহংকারের সম্পদ।

অহংকার ইন্দ্রিয় এবং মন নিয়ে স্থূলের সঙ্গে বাস করছে, এই হচ্ছে সংসার। This is the lowest unit of Consciousness. অর্থাৎ চৈতন্যের একেবারে নিম্নতম অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। তা ব্যবহার করছে যে সে to some extent greater, and that is your subjective ego. And when ego comes in contact with your central nature that is the universal ego. তখন universal ego ঈশ্বর বা স্ববোধাত্মা কিন্তু আর জারিজুরি করতে পারছে না। যেমন ছোট শিশু, খুব দুষ্টুমি করে, কিন্তু যেই মা আর বাবা এসে পড়ল তখন খুব careful হয়ে গেল। আমরা প্রত্যেকেই শিশু। আমরা খুব হম্বিতম্বি করি। কিন্তু আমাদের থেকে খুব বেশি powerful যারা তাদের কাছে আমরা চুপচাপ। 'এ' statement of fact রাখছে যাতে এই বক্তব্যের সার বস্তুর সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ হয়। যদি লক্ষ বছরও লাগে I will always remain ready to shower the light of Oneness for cach and all because I am that eternal existence which never goes out of existence, which never deviates. আমি স্বরূপত যেমন ছিলাম তেমনই আছি, তেমনই থাকব for one and all, since I am in outer nature appearing as manifold, myriad of forms. I am in inner nature as subjective ego of the individuals and in the central nature I am *Swabodhatmaa* or *Ishwara* or Lord, the creator or the sustainer or the ruler of the creation and in the transcendental nature I am the all-pervading ever-perfect Divine Self, *Brahman/Atman* and beyond, beyond. That I is verily the Absolute which is ever-present everywhere, in everything in the creation, that is why you are the same. জলের উপরে যতগুলি তরঙ্গ, লহরী, বুদ্‌বুদ্, ফেনা ওঠে, সবটার মধ্যে water-ই হল abiding reality. Similarly যতগুলি জীবন পৃথিবীতে প্রকাশ হয়ে আছে, যেই দেশের হোক, যেখানেই হোক সবই made of eternal Substratum, Consciousness which verily

is Absolute I-Reality. Consciousness সেখানে খেলছে, It is revealing, just like bubbling in the outer nature, enjoying that in the inner nature, witnessing that from the central nature and transcendental nature. Again it is above all, because there is no object, there is no subject. Therefore the I of you in the outer nature is the object of enjoyment; in the inner nature it is the ego subject, the enjoyer, the experiencer; in the the central nature you are the ruler, you are the controller, to some extent witness of all. And in your transcendental nature your I is above all, free from all contradictions of duality, plurality and relativity.

Outwardly যা-কিছু দেখছ সব relativity এবং inwardly all duality। কীরকম? আমি আর আমার। বাইরে সবটাই আমার, আমরা চাইছি সবটাকে আমার করে পেতে। All objects we want to possess, we want all objects under our control. কাজেই তা হচ্ছে objective, এই হচ্ছে আমার। অন্তরে ego হল subject, আবার অন্তরের থেকে আরও গভীরে গেলে পরে সেখানে God or Self হচ্ছে subject, ego বা জীব হচ্ছে সেখানে object। অর্থাৎ কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতাকে control করছে I Consciousness from behind। কাজেই জীবের যে নেতা, জীবের যে কর্তা সে জীবেরই হৃদয়ে বসে আছে, সে-ই হচ্ছে বিধাতা। তাঁরই বিধান কাজ করছে সর্বত্র সবার মধ্যে। প্রত্যেকের central Consciousness is the Divine One. You are not to run after the God anywhere. God is ever-present in your central Consciousness. "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি।" ব্রহ্ম-আত্মার অধিষ্ঠান হচ্ছে হৃদয়। "হৃদয় সর্ববিদ্যানাং একায়নমেব।" হৃদয় কেন? সে সবকিছুকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। কী দিচ্ছে? Lost memory, আমরা আত্মবিস্মৃত হয়ে রয়েছি। সেই বিস্মৃতি বা বিস্মরণকে ফিরিয়ে দিচ্ছে হৃদয়, যেমন হৃদয় সর্বাঙ্গের রক্ত suck up করে নিয়ে তা শুদ্ধ করে আবার পৌঁছে দিচ্ছে সর্বাঙ্গে, এই হল হৃদয়ের বিশেষত্ব। দূষিত রক্তকে টেনে নিচ্ছে হৃদয়ে, তারপর শুদ্ধ করে সর্বাঙ্গে পৌঁছে দিচ্ছে। Scientist-রা 'একে' বলেছে যে, বাবা তুমি যে spontaneously বলে যাচ্ছ সব angle থেকে তা কী করে সম্ভব হচ্ছে? উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, 'এর' কাছে সবটাই তো vivid,কেননা সব জায়গায় চিদাত্মা/বোধাত্মা রূপে অখণ্ড এক আমিই রয়েছি। I talk of Myself, with Myself, for Myself, by Myself, to Myself and I remain Myself alone. This is the funny game. This is 'Sportful dramatic sameside game of Self-Consciousness'. এ কথা শুনে তারা বলল, এ তো wonderful! শুনতে শুনতে তারা কিন্তু অনেকেই inspired হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তারা বলল, এই এতক্ষণ তোমার কথা শুনতে শুনতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমাদের বাড়িঘর আছে বা আমাদের কিছু আছে। উত্তরে তাদের বলা হল Yes, this is the verbal testimony, which can lead you to your goal, which is already there in you. I am not to create your goal, nor even you need to create and build up your goal. Your goal is with you, because you are verily the goal

Consciousness. The concept of goal is verily you and you are to appreciate it. How? Only by listening to that from a perfect realizer.

সুর একটা হতে পারে, কিন্তু রাগ অনেক রকমের হয়। একজন ওস্তাদের কাছে যখন কেউ একটা রাগ শুনল, তখন একজন বলতে পারে যে, হ্যাঁ আমি এই রাগটা অমুক ওস্তাদের কাছে শুনেছি। One can then appreciate what is *Raga*. কাজেই one can appreciate one's own identity, Self-identity only when one comes in contact with a perfect realizer of Self-Knowledge. That is the quintessence of the Vedas. এ হল বেদের সার। That is the essence of all knowledge. জ্ঞানস্বরূপ হল আত্মা ঈশ্বর ব্রহ্ম পাকা আমি। এই জ্ঞানাত্মাই একমাত্র সারবস্তু যা সবকিছুকে প্রকাশ করে, নিজেকেও প্রকাশ করে, কিন্তু জ্ঞানাত্মাকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না। And that is *Jnanaswarup*, not *Jnanabhas*, not reflection of knowledge but the Knowledge Itself which is verily your Self, not your mind, not your ego, not your intellect. All these are reflections of your Real I. Real I is the witness, which is the background of all these and all these constitute your entire nature, this is the foreground. Foreground cannot be possible without any background and background is all-perfect and eternal. Foreground is not so, it may change, it may deviate and that is why we experience the differences and the changes. Who is the experiencer? In the outer nature it is verily your ego, in the inner nature it is also the ego but that ego is upper ego, and in your central nature you are ego free. Upper ego অন্তরের duality দেখছে, বাইরের relativity-ও নয়, contradiction-ও নয়। তাতে এত maximum contradiction থাকে না।

Relativity outer-এ, duality inner-এ এবং unity of Consciousness centre-এ। হৃদয়ের গভীরে তুমি সব বোধকে এক করে পাচ্ছ। যেমন গাঢ় ঘুমের মধ্যে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে, সাধক সমাধির মধ্যে সব একাকার করে পাচ্ছে। ধ্যানের গভীরে যোগী সব অনুভূতিকে একাকার করে পাচ্ছে আত্মারূপে, 'ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যৎ যোগিনঃ'—যোগিগণ ধ্যান অবস্থায় মনকে সবকিছুর থেকে withdraw করে নিয়ে এসে সেই এক বিন্দুতে অভ্যাস করতে করতে সেই বিন্দু ছাড়িয়ে চলে যান মূলে। He realizes himself as the all-pervading Reality. তখন তিনি সেখান থেকে নেমে এসে বলেন—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"। "বেদাহম্ এতং"—আমি সেই পরম পুরুষকে পেয়েছি। কোথায়? আমি-র মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। আহা কী আনন্দ! কী আনন্দ! কী আনন্দ! ভজনের মধ্যে তা দেওয়া হয়েছে—'অহো কী আনন্দ! অহো কী আনন্দ! অহো কী আনন্দ আনন্দ রে! আনন্দে আনন্দ পরমানন্দ কেবলানন্দ বলি কারে!' এই হল সেই আনন্দসাগর অর্থাৎ I in I. The Absolute I which is free from all mental imaginations, this or that or not this or not that. All negative and positive সেখানে স্তব্ধ, শান্ত হয়ে যায়। You alone exist as One by oneself—আপনে আপন।

আপনে আপন স্বরূপ আপন সর্বসম সত্তা নিরুপম।।
সচ্চিদানন্দঘন অখণ্ড পূর্ণ স্বানুভবদেব স্বয়ং পুরুষোত্তম
অক্ষর পরাৎপরম ঈশ্বর অদ্বয় ব্রহ্ম আত্মা সনাতন।
অনাদি তত্ত্ব সত্য জ্ঞানামৃত কারণ
প্রশান্ত অনন্ত অমল চিরন্তন।।
শাশ্বত অচ্যুত নিত্যাদ্বৈত আপন নিষ্কল নির্মল নিরবদ্য নিরঞ্জন
স্ববোধে স্বভাবে স্বভাবে স্ববোধে আপন
সমরসসুধা পানে সদাই মগন।।

এই আপন প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে, কেউ আপন ছাড়া নয়। This is the science of all other sciences, this is the philosophy of all other philosophies, this is the religion of all other religions. This is the essence of all and that verily you are. এই হল বেদান্তের ভাষায় "তত্ত্বমসি"—তুমিই সেই। কে? সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-আত্মা সনাতন। He is nowhere, but everywhere and present verily as your I. 'এ' কারওকে ধোঁকা দিতে আসেনি, 'এ' নিজের সঙ্গে খেলা করছে আমিবোধে, কিন্তু 'একে' সবাই মানতে পারছে না। আপন আপন ধর্মমত, আপন আপন মনের concept দিয়ে সে কিন্তু নিজেকে আলাদা করছে। 'এর' কথা শুনে অনেকে হয়ত বলবে, উনি বলছেনটা কী! আমরা এতকাল যা করে এসেছি, আমাদের বিশ্বাস সব হারিয়ে ফেলব? উত্তরে বলা যায়—না, বিশ্বাসকে বাড়াও! Elevate your mind! You are not so limited and finite and confined to only within this body or within your ideas and thoughts or within the concept of your imaginary culture. Culture নিয়ে আছে যতক্ষণ মন, ততক্ষণ মন is a vulture. You are not a vulture. Thought vulture is nothing but expression of your mental concept. মনের মধ্যেই বাস করছে vulture এবং vulture-এর মধ্যেও তোমার মনের একটা অংশ আছে, কেননা you pervade all। সেইজন্য 'একে' যখন একদল challenge করেছিল যে, তুমি যে বলছ, তুমিই মন, তার প্রমাণ কী? তখন তাদের বলা হয়েছিল, হ্যাঁ পাপের মধ্যেও আমি (বোধরূপী আমি), আমিই পাপ, আমিই পুণ্য, আমিই সত্য, আমিই মিথ্যা, আমিই ধর্ম, আমিই অধর্ম, আমিই মৃত্যু, আমিই অমৃত, আমিই অজ্ঞান, আমিই জ্ঞান, এরপর আর কী বলতে চাও? সবটাই আমি/ I। কেননা সবটাই বোধের বৃত্তি। Without Consciousness you cannot utter any word, not to speak of its awareness. It depends upon your expression of mind and mind dwells in your I.

'এ' conventional ধর্মের ব্যাখ্যা করছে না, ধর্মের essence-টা নিয়ে 'এ' খেলা করছে। কীসের খেলা? Game of Oneness of I Consciousness. Your very I dwells here (নিজের ভিতরে দেখিয়ে) and My I also dwells in you, because the Con-

sciousness is all One in existence, One in essence, One in Reality, that is the eternal substratum, that is the background of all, that is the underlying essence of your life. Your mind may play with this and may not, still I exist in you. When you are a revealer it is I, due to the presence of I, when you are accepting it, that is also due to the presence of I, when you are playing the opposition it is also due to the presence of I, when you play with the affirmation and with the all favourable conditions it is also due to the I. When you experience anything it is also due to the I and when you cannot then it is also due to the I. Because I exist in all positive and negative expressions and existence, because I cannot be divided, I cannot be absent as It is ever-present. The Reality cannot be absent, the background cannot be absent, the essence cannot be absent, that is the Self, that is the Divine, that is the Reality and that is all-pervading, infinite One without a second. "একমেবাদ্বয়ম্"। 'অদ্বয়ম্'—non-dual, though it appears to be dual, it appears to be manifold, still it is One. Because manifold is nothing but different expressions of the One and the same Reality. The Reality lies in the background. In the foreground it is the appearance, and in the background it is the essence. Expressions are in the foreground and Essence is in the background.

আমারবোধ হল contradiction, আমারবোধই হল relative, আমারবোধই হচ্ছে dual, আমারবোধ হচ্ছে combination বা mixture। আমি কিন্তু সবকিছুর পশ্চাতে ছিলাম, আছি এবং থাকব। তোমার দেহের মৃত্যুতেও সেই আমি-র কিছু এসে যায় না। যেমন গাঢ় ঘুমের মধ্যে তোমার সবকিছু absent হয়ে যায়, তাতে তোমার আমি-র কিছু এসে যায় না, আরামে তুমি ঘুমিয়ে পড়। কই তখন তো ভাব না যে, আমার প্রিয়জনকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে, অথচ মৃত্যুর বেলায় আমরা কান্নাকাটি করি। আরে সে তো পোশাক পাল্টিয়ে আবার আসবে খেলতে! নূতন বেশে আসছে, নূতন করে খেলবে। ঐ দাবার ঘুঁটি, কিস্তিমাত করে পাশে মেরে রাখল, আবার সেই মরা ঘুঁটিগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে নূতন করে আরম্ভ করল খেলা। সুতরাং এই world drama-কে সাতবার সমাধির গভীরে 'এর' experience করতে হয়েছে। বিরাট এই বিশ্বচক্রটা যেন একটা দাবার board, তার মধ্যে সমস্ত জীব, তার মধ্যে আবার একটা positive side এবং একটা negative side। এই দুটো খেলতে খেলতে এ ওকে মারছে, ও একে মারছে—temporarily পাশে ফেলে রাখছে। যখন সব শেষ হয়ে গেল, কিস্তিমাত হয়ে গেল, আবার সবগুলিকে বসিয়ে নিয়ে same game শুরু হয়ে গেল। You are playing the sameside game repeatedly. কতবার ঠাকুরদাদা হয়ে পিতা হয়ে ভ্রাতা হয়ে বন্ধু হয়ে আবার শিশু হয়ে এসেছে, আবার সেই শিশুই পিতা, ঠাকুরদাদা হয়ে background-এ চলে যাচ্ছে। কোথায়? Greenroom-এ। পোশাকটা তো পাল্টাতে হবে! It is a drama. Don't forget you are not lost, nothing is lost. Everything is appearing and disappearing, coming and going. Universe is a passing show,

তোমার মনের পর্দায় T.V.-র মতো আসে আর যায়। You are the eternal witness. The entire universe is a T.V. made by your mind. As the T.V. is created by some experienced mind so also the universe is a T.V. which is made by your master–mind and your mind is the experiencer. But your Self, Real I is the witness—witness of both subject-object and the rest.

আজকের প্রসঙ্গ কালকের প্রসঙ্গ থেকে একটু অন্যরকম। তা একটু ভাল করে মন দিয়ে খেয়াল করতে হবে। কেননা এর পরের বিষয়বস্তু যা আসবে তা কিন্তু আরও গভীরের বিষয়। 'এ' চৈতন্যের বিভিন্ন side-টা সামনে রাখছে চৈতন্যের কাছে। You are Consciousness, I am Consciousness, the Consciousness is playing with the Consciousness. Consciousness-এর formula টা কী? Consciousness in Consciousness, of Consciousness, from Consciousness, for Consciousness, by Consciousness, with Consciousness, to Consciousness, on Consciousness and beyond, and beyond beyond. If I put I in place of Consciousness then I in I, of I, from I, for I, by I, with I, to I, on I and beyond, and beyond beyond. এই formula দিয়ে যখন এগুলো বলা হয়েছে তখন scientist-রা বলেছে, বাবা আর সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে! আমরা এবার চুপ করে থাকব, খালি শুনে যাব। তাদের বলা হল, Yes, এই science হল শ্রুতির বিজ্ঞান। শুনতে শুনতে তুমি ঘুমিয়ে পড় শ্রবণের বিষয়ের মধ্যে। 'কীরকম? মা, বাড়ির বড়রা, বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে শোনায় যখন, তখন কোথায় যায় সে? সে ঘুমের দেশে যায়। 'এ' তোমাকে আমি-র দেশে পাঠাচ্ছে আমি-র বার্তা দিয়ে, আমি-র সংবাদ দিয়ে এবং আমি-র খোরাক দিয়ে। তা গ্রহণ করতে করতে তোমার মন আমিসাগরে পৌঁছে যাবে, তখন তুমি নিজের আমি ছাড়া আর অন্য কিছু পৃথক করে খুঁজে পাবে না। একদিন কয়েকজন শিক্ষিত মানুষ 'একে' challenge করল যে, আপনি যে বললেন এই শ্রবণের মাধ্যমে perfection-এ পৌঁছানো যায়, তার কি কোনও প্রমাণ দিতে পারবেন? তখন বলা হল, হ্যাঁ। একবার কিছু professor foreign থেকে এসেছিল, তার মধ্যে সবাই science-এর লোক, একজন মাত্র ছিল Literature-এর। তারা প্রশ্ন করল যে, আপনার realization সম্বন্ধে nutshell-এ আমাদের কাছে বলুন। উত্তরে তাদের বলা হল, nutshell-এ বললে তোমরা নিতে পারবে? পারবে না। কেননা তোমাদের system সেভাবে তৈরি হয়নি। তুমি যদি খাবারের মধ্যে fibrous substance কিছু না-খেয়ে খালি liquid juice নাও তাহলে কিন্তু তোমার system fail করে যাবে। সেইরকম সত্যকে গ্রহণ করতে গেলে এই gross-কেও তোমার গ্রহণ করতে হবে। কাজেই 'এর' বক্তব্যের মধ্যে কিন্তু তুমি gross, subtle, subtler, subtlest সবটা নিয়ে একটা unit পাচ্ছ (One)। That One embraces all. এই কথা শুনে তারা বলল, তা কী করে সম্ভব? Gross nature-এ যা আছে তা তো limited! উত্তরে তখন তাদের বলা হল, limited-কে limited বলছে কে? Limited-এর মধ্যে থেকেই তো তুমি তা বলছ। তুমি limited-এর বাইরে গিয়ে তা বল তো

দেখি! তখন তারা বুঝতে পেরে বলল, আরে এ তো একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ point! তা তো আমরা ভাবিনি!

তারা আরও বলল যে, আপনার কথা দিয়ে আপনি যে আমাদের realization-এ পৌঁছে দেবেন বলছেন তা কী করে সম্ভব? উত্তরে বলা হল, 'এ' তোমাদের একটা ছোট্ট demonstration দিচ্ছে। একটা বড় পিতলের গামলা নিয়ে আসা হল। সবাই গামলা কাকে বলে নিশ্চয়ই জানে। সেই গামলার মধ্যে কাদামাটি মাখিয়ে কাদাজল রাখা হল। আরেকটা পাত্র তার মধ্যে বসানো হল, তার মধ্যে কিছু কাদাজল আছে, মানে muddy water, আর উপর থেকে 'এ' কাদাজল ঢালতে লাগল। Result-টা কাদাজলই থেকে গেল। This is what we are doing. Now I will demonstrate you differently only to enlighten you. তারপর একটা বড় পাত্রে পরিষ্কার জল নিয়ে আসা হল। এই পরিষ্কার জল, ঐ যে পাত্রটা বসানো ছিল তার মধ্যে রাখা হল। তখন পরিষ্কার জলটা পাত্রের মধ্যে ঢালতে ঢালতে ঐ পাত্রের ভিতরের কাদাজলটা overflow হতে লাগল। নিচের পাত্রটার জল যখন ভর্তি হয়ে গেল তখন জলটা ফেলে দিতে বলা হল। জল ফেলে দিয়ে পাত্রটি রাখা হল। আর ঐ বসানো পাত্রটার মধ্যে আবার পরিষ্কার জল ঢালা হল। জল আবার পড়াতে ভিতরের কাদামাটি overflow হয়ে পড়ে গেল। Ultimately শুদ্ধ বা pure water রইল। এই demonstration দেখার পর তারা বিস্ময়ে বলল, wonderful! সবাই দেখে অবাক হয়ে গেল। তারা আরও বলল যে, Are you showing any mircale? তখন উত্তরে তাদের বলা হল— No, this is not a miracle, 'এর' কাছে কোনও miracle নেই। 'এ' এই এক-এর কথা তোমাকে শোনাতে শোনাতে তোমার মধ্যে নানাত্ব-বহুত্বের যে বৃত্তিগুলি আছে সব washout করে দেবে। Listen to Me! দিনের পর দিন আত্মতত্ত্ব শোনার পরে you will find the result। এক-এর বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মবোধের বিজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ। কিছুদিন নিরন্তর শুনতে শুনতে তার সঙ্গে অভিন্ন সম্বন্ধ স্বভাবতই গড়ে ওঠে। তা পরীক্ষিত। যেমন একজন সুস্থ স্বাভাবিক লোককে যদি সবসময় বলা হয়, 'তুই পাগল, তুই পাগল...' সেই লোকটি অল্পদিনের মধ্যেই পাগল হয়ে যাবে। তাও পরীক্ষিত। মিথ্যা শ্রবণের ফল মিথ্যা, সত্য শ্রবণের ফল সত্য। স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষের মুখে স্বানুভূতির বিজ্ঞান শ্রবণের ফলে শ্রোতা স্বানুভবসিদ্ধ হয়ে যায়।

এই কথা শোনার পর আরেক দল 'একে' challenge করে বসল। তারা বলল—তা তো বুঝলাম! কিন্তু আমাদের জন্মজন্মান্তরের সংস্কার আপনি সব মুছে দেবেন কী ভাবে? তখন তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলা হল—হ্যাঁ, প্রতি মুহূর্তে তুমি যে ভাবের মধ্যে বাস করছ, যার দ্বারা governed হচ্ছ, সেগুলো সরিয়ে দিতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। কীরকম? তাদের মধ্যে কয়েকজনের কতগুলি chronic disease ছিল। বয়স হলে অনেক রকমের chronic disease হয়। তারা একভাবে বেশিক্ষণ বসে থাকতে কেউ পারে না। প্রায় এক মিনিট, দেড় মিনিট, দুই মিনিট পর-পরই position change করে। আবার কেউ কেউ pocket-এর থেকে ওষুধ বার করে খেয়ে নেয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার chain

smoker-ও আছে। তাদের সামনে 'এ' ঈশ্বর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিল। প্রসঙ্গ করতে করতে 'এ' নিজের মধ্যে ডুবে গেল। এই ভাবে দুই ঘণ্টা কেটে গেল। এই অবস্থা দেখে সবাই spell-bound হয়ে গেল, তারা একইরকম ভাবে বসে রইল, একটুও নড়েনি কেউ। তখন তাদের মধ্যে একজন point out করল, বাবাঠাকুর অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, আমাদের সবাইকে অনেক দূরে যেতে হবে। 'এ' প্রকৃতিস্থ হবার পর তাদের বলল—ও হ্যাঁ! যারা বসেছিল তারা একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর তাদের বলা হল—এতক্ষণ তো তোমরা কোনও ব্যথা, বেদনা, কষ্ট কিছু feel করনি, ওষুধও খেতে হয়নি। How is it possible that has been demostrated before you all? তখন সবাই হাতজোড় করে বলল—বাবাঠাকুর তুমি ভগবান! 'এ' বলল—No, 'এ' কোনও designation নিয়ে খেলতে আসেনি! I am not God, God is God. সেইজন্য গানের মধ্যে তোমরা God-এর কথা শুনছ। But I am what I am. This I does not require any designation. God-কেও এই আমি দিয়েই ব্যবহার করতে হয়, অবতারকেও এই আমি ব্যবহার করতে হয়, মহাপুরুষকেও এই আমি ব্যবহার করতে হয়, কাপুরুষদেরও এই আমি ব্যবহার করতে হয় এবং সংসারীকেও এই আমি ব্যবহার করতে হয়।

আমিসাগরে অনন্ত কোটি কোটি আমি ওঠে, ভাসে, ডোবে, খেলা করে এবং আবার আমি-র সঙ্গে মিশে যায় একাকার হয়ে, থাকে সব মিশে চিরতরে। 'এর' বক্তব্যের মধ্যে কোন কথাটা মিথ্যা? কোন কথাটা contradictory? সবাই লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মানুষ। এই কথাগুলোর অর্থবোধ প্রত্যেকের ভিতরে আছে। কিন্তু 'এই মূর্খ' লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায়নি, গরিবের ঘরে দেহটা জাত হয়েছে, সবসময় square meal-ও জোটেনি, still the body is alive। অনেকে 'এই শরীরটার' বয়স জিজ্ঞাসা করে। 'এ' বলে—বয়স দিয়ে কী করবে? একটা জামা পরেছ, জামাটা কতদিনের পুরানো তা জেনে আর কী হবে? এ একটা পোশাক পরা হয়েছে, দিন কয়েক 'এই শরীরটা' আছে, আবার একটা ভাল শরীর নিয়ে এসে খেলবে। I am the eternal player, the player who plays the 'Sportful dramatic sameside game of Self-Consciousness'. ঈশ্বর খেলেন কি না সেই খবর 'এ' রাখে না। But I play the sameside dramatic game—'Sportful Dramatic sameside game of Self Consciousness'! All the words are known to you. There is no mistake or fault–পুরো বক্তব্যটাই পরিষ্কার। 'এ' কত বেশ ধারণ করে এসে খেলা করে, 'এ' (সামনে সবাইকে দেখিয়ে) অনন্তবেশ ধারণ করে খেলা করছে। কোথায় শেষ আমার? 'এর' আদিই নেই, অন্ত কোথা থেকে আসবে? I am without beginning and without end. Beginning and end appear in Me. Time and space appear in Me, all causation, actions appear in Me. I am the essence of all of them. "Thou art that". প্রত্যেকেই তাই। 'এ' কারওকে degrade করছে না। তোমার মতপথকে 'এ' আঘাত করছে না। তুমি যে কোনও জিনিসে বিশ্বাস নিয়ে থাক 'এর' তাতে কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু

you live in your I। সমস্ত মতপথ belongs to mind, your mind not to your I. Mind itself belongs to your I. But I does not owe anything from anyone because I is infinite One, sufficient One, all-perfect One, Absolute One without a second. It does not require any second entity for Its support. It is supportless. কেননা তা 'নিষ্ক্রিয়োঽস্মি নির্বিকারোঽস্মি নিরাকারোঽস্মি নিষ্কল নির্বিকল্পোঽস্মি, নিত্যোঽস্মি, নিরবলম্বোঽস্মি নির্দ্বয় (অদ্বয়)।' নির্বিকার আমি changeless, নিষ্কল আমি partless, নির্বিকল্প আমি free from alteration, নিরাকার আমি formless, নিত্যোঽস্মি অর্থাৎ I am eternal, নিরবলম্বোঽস্মি অর্থাৎ I am supportless, নিত্যোঽস্মি, নিরবলম্বোঽস্মি নির্বিকল্পোঽস্মি—I am the Absolute, অদ্বয়—I am secondless eternally, One by Myself।

আমি-র বক্ষে কত বড় বড় আমি উঠছে, ভাসছে, ডুবছে, খেলা করছে যেমন সাগরবক্ষে কত বড় waves উঠছে, বিরাট বিরাট তরঙ্গ উঠছে, ডুবছে, ভাসছে। কত অবতার এসে খেলে চলে গেলেন আমি-র বক্ষে। কত দেবতা খেলছেন, কত মানুষ, কত জীবজন্তু জানোয়ার সবাই আমি-র বক্ষে খেলে চলেছে। All are different expressions of the One and the same I—Infinite I-ocean. কাজেই যে আগুন 'এর' মধ্যে জ্বলছে তা 'এ' ছাড়া দ্বিতীয় কেউ বুঝতে পারবে না। Mind and intellect-এর ক্ষমতা নেই যে তা বুঝতে পারে। This fire of wisdom burns all duality, just like fire which burns the fuel. সমস্ত দাহ্যবস্তুকে আগুন যেমন পোড়ায়, কিন্তু নিজেকে সে পোড়ায় না, fire does not burn itself। আগুন নিজেকে পোড়াতে পারে না। What a great wonder! সেইরকম জ্ঞানাগ্নি অর্থাৎ বোধের আমি সবকিছুকে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নেয়, পৃথক করে কিছু রাখে না। তাতে তার নিজের কোনও রূপান্তর বা বিকার হয় না। (বিকারের আমি হল অহংকারের কাঁচা আমি, মনের ঘর তার লীলাভূমি। বোধের ঘরে অর্থাৎ পাকা আমি অহংদেবের মধ্যে অহংকারের বা কাঁচা আমি-র অস্তিত্বও নেই এবং ক্রিয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কারণ বোধের আমিতে বোধই সারাৎসার। এই বোধ নিত্য অদ্বয়।) আমি সবকিছুকে প্রকাশ করছে, কিন্তু আমিকে একমাত্র আমিই প্রকাশ করতে পারে, দ্বিতীয় কেউ তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। এই আমি-র কোনও বিকল্প নেই। "কোঽহম্", "সোঽহম্"—সেই আমি। যে প্রশ্ন করেছে সে-ই আমি। যাবে কোথায়! খুব অর্বাচীনের মতো কথাগুলো সবার সামনে রাখা হল, কারণ এখানে সবাই qualified. All have got some academic qualification. But 'this one' (নিজেকে দেখিয়ে) is a number one fool, stupid number one, idiot number one and a man devoid of all common senses, devoid of manyness, devoid of relativity, devoid of duality, devoid of individuality, plurality, devoid of everything but not devoid of I-Reality. 'এর' বক্তব্যের মধ্যে কোথাও কোনও flaw থাকলে যে কোনও একজন point out করতে পারে। তাহলে সে-ই কিন্তু অর্থাৎ, he will play the 'Sameside dramatic game of Self-Consciousness' as a opposite one. When you contradict you will play the sameside game, and

when you accept it you enjoy the game, experience the game as your own being. You are the greatest idea and theme of drama, you are the dramatist, you are the prompter, you are the actor, actress, acting and you are the audience as well. The drama itself is enjoyed by you, is made by you and the experiencer of all verily you alone are.

কত দুঃখ, সুখ, কষ্ট, বৈচিত্র্য জীবনে অনুভব করেছ, তার হিসাব কেউ দিতে পারবে না। So infinite is your I who has experienced all these but your I cannot go out of itself. তোমার body যাবে, ইন্দ্রিয়-প্রাণ যাবে, মন যাবে, বুদ্ধি যাবে, অহংকার যাবে, কিন্তু সবকিছুর absenceও তুমি দেখবে। কীরকম? যেমন একটা hall, দুপুরবেলা খালি ছিল, তারপর সন্ধেবেলায় এখানে আলো জ্বেলে দেওয়া হল, তখনও কোনও লোকজন আসেনি। The lights of this hall expressed the absence of everything. তার পরে যখন সবাই একে একে আসতে আরম্ভ করল, অর্থাৎ বক্তা (নিজেকে দেখিয়ে), শ্রোতা, technician সবাই এল, কাজ আরম্ভ হয়ে গেল, drama হতে আরম্ভ করল, তখন light সবকিছুকে প্রকাশ করল। মধ্যক্ষেত্রে সব ব্যক্ত। কিছুক্ষণ পরে drama শেষ হয়ে গেলে সবাই চলে যাবে, the light will then express the absence of all. What a great wonder! So is verily your I who experiences the absence of all. All are then absent and the experiencer experiences only the absence of all, but the experiencer exists. He experiences the negation of all, absence of all and after that he experiences the positive side, the manyness as object-subject for sometime and again the absence of all subject and object. You remain alone, One by yourself. This is the glory of your eternal I, the great noble I who is the essence of all possible thoughts, ideas, actions and results of your life. It is the life-pervading truth, the underlying essence of all, the background Consciousness, the eternal substratum of all, which can never be deviated, which can never be denied.

তুমি সবকিছু deny করতে পার, এমনকী নিজের ইষ্ট, দেবতা, ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বরকে এবং আত্মীয়স্বজনকেও, but you cannot deny your own existence। অপরের অস্তিত্বকে তুমি deny করেছ, কিন্তু নিজের অস্তিত্বকে deny করতে পারবে না। নিজের অস্তিত্বকে deny করতে গেলে নিজেকে দিয়েই তা করতে হবে। কাজেই নিজের অস্তিত্ব নিত্যবর্তমান। তুমি প্রিয়জনকে নিয়ে সংসার করছ, আবার যখন সময় হচ্ছে তুমি সব ফেলে রেখে চলে যাচ্ছ, কারওকে পরোয়া করছ না, you never bother for anything! Is it not a fact? কোথায় যাচ্ছ তোমার নিজের খুশিমতো? You leave this objective world, this gross nature and you venture to experience the subtle nature, so you leave the gross body. It is your mind who decides it, this is the fact of everydays experience of world phenomena. Nobody can deny it! 'এ' আরও ধাপে ধাপে

এই প্রসঙ্গে তোমাদের বলবে only to enlighten you, to qualify you to see only your Self and not anybody else। তোমার অতি নিকটে যে তুমি তাকেই জান না। তুমি জানার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছ দেশ হতে দেশান্তরে, রূপ হতে রূপান্তরে, নাম হতে নামান্তরে এবং ভাব হতে ভাবান্তরে। You are running after to know something, to possess something, to experience something, to enjoy something. What a great tragedy that after all such enjoyment and all experience you find yourself deserted! এত কিছু করার পরেও সব চলে গেল, আর তুমি একা পড়ে রইলে! Is it not a fact? তোমাদের হয়ত মনে নেই, 'এর' কাছে এগুলো কিন্তু অনন্তকাল as vivid as you are। যেমন 'এ' তোমাদের দেখছে, তার চাইতেও prominent ভাবে বোধের মধ্যে শুধু বোধ দিয়ে বোধস্বরূপ নিজেকে দেখছে। বোধই subtlemost, বোধই subtler, বোধই subtle, বোধই gross, কিন্তু I remain always present in each of them as the substratum of all, as the essence of all and as the background of all. That I never goes out of existence, it remains always the same as it is. I means Infinite Self. Infinite Self alone exists and nobody else. That is verily your I—not your mind, intellect, nor even your *Prana*, senses and body. In deep sleep you give up all of them. But when you wake-up you have all of them. When you are asleep you forget your physical body, vital, senses, mind, ego, intellect, *samsara*, forget all your relatives and the universe—you remain alone as One.

কোনও ধর্ম শিক্ষা দেয় কি তোমাকে এই ভাবে? বাল্যশিক্ষা নিয়েই কি সারাজীবন কাটিয়ে দেবে? তোমাকে step by step এগিয়ে যেতেই হবে। আমরা ধর্মের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, দর্শনের ক্ষেত্রে kindergarten-এ পড়ে আছি সবাই, একপাও এগোচ্ছি না কেউ। একটু নতুন কথা বললেই একেবারে ফস করে ওঠে সবাই। ধর্মের জগৎ, বিজ্ঞান জগৎ, দর্শন জগৎ প্রত্যেকেই বলে, এ তুমি কী বলছ? আমাদের বিশ্বাস কেড়ে নিচ্ছ! উত্তরে বলা হয়, কোন বিশ্বাস? যে বিশ্বাসকে কেড়ে নেওয়া যায় তা যথার্থ বিশ্বাসই নয়। বিশ্বাসের অর্থই তোমরা জান না। তোমরা মনগড়া একটা বিশ্বাস নিয়ে থাক। বিশ্বাস মানে বিশেষ রূপে যে শ্বাস, অর্থাৎ তোমার বহির্মুখী মনের গতি, অন্তর্মুখী মনের গতি যখন বিশেষরূপ ধারণ করবে বা এক-এ আসবে তা-ই হল বিশ্বাস। বিগত শ্বাস—শ্বাস মানে প্রাণের ক্রিয়া। মন তা অনুভব করে। যেখানে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় সেখানে মনের কোনও কাজ থাকে না, কিন্তু বোধসত্তার আমি থাকে, তার অভাব হয় না কখনও। অর্থাৎ দ্বৈতবোধের অভাব যেখানে, দ্বৈতবোধ যেখানে রুদ্ধ হয়ে যায় তা-ই বিশ্বাস। বিষ্ণু অর্থে all-pervading Reality, বিশ্বাস-এর বি অর্থে বিষ্ণু অর্থাৎ all-pervading Reality এবং শ্বাস মানে বাস করা। When you live in the Knowledge of all-pervading Reality that is বিশ্বাস। তার মানে Self-Knowledge is বিশ্বাস। Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge is বিশ্বাস। Knowledge of Knowledge is বিশ্বাস। এই বিশ্বাস

ক'জনের আছে? 'এ' এক-কে নিয়ে মাতামাতি করছে বাচ্চা শিশুর মতো, খেলনা নিয়ে যেমন শিশু মেতে থাকে তেমনই 'এও' নিজেকে খেলনা বানিয়ে নিজের সঙ্গে খেলায় মেতে আছে। 'এ' সেই গতানুগতিক ধর্মের কথা বলছে না, সেই গতানুগতিক বিজ্ঞানের কথা বলছে না, আর সেই প্রচলিত দর্শনের কথাও বলছে না which are all possible thoughts or ideas। বিজ্ঞান-ধর্ম সবকিছুকে যে প্রকাশ করতে পারে, অথচ সব প্রকাশ করেও যে তার নিজের স্বরূপ রক্ষা করতে পারে, maintain করতে পারে without any contamination, without any effect, without any reaction that is the Real I, the Absolute I who is eternally One without a second. "একমেবাদ্বয়ম্ সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"—(Truth, Goodness, Beauty Absolute) এখানে শিব অর্থে বিগ্রহের শিব নন। শিব শব্দের অর্থ হল Truth, Beauty and the Highest Good; যিনি বিশেষ রূপ ধারণ করতে পারেন অর্থাৎ সেই রূপটি যিনি ধারণ করেছেন, that is the Absolute I। কাজেই appearance is not the Real I, appearance-কে যিনি প্রকাশ করছেন তিনিই (Real I) তা অনুভব করছেন।

তোমার আমি কিন্তু তোমার দেহ নয়, nor even your *prana*, senses, *mana*, *buddhi, ahamkara, citta*, এমনকী এদের সমষ্টিও নয়—nor even totality of all. Your I is above all, the witness of all of them, the impersonal witness—impersonal, impartial witness. Follow My words! 'এ' সেই light সবার সামনে রাখছে which is the light of all lights, the Knowledge of all knowledge, not knowledge of persons, things, actions, results, space, time, causation। দেশ-কাল-কার্য-কারণ-পাত্র, রূপ-নাম-ভাব-বোধের প্রকাশককে 'এ' রাখছে, অর্থাৎ অবভাসক, light of all lights. I am the Science of all other sciences, I am the Knowledge of all other knowledge, I am the Dharma of all other Dharmas, I am the Darshana of all other Darshanas. ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান are possible owing to My (Real I) presence. আমারই বক্ষে অনন্ত ভাব ওঠে, ভাসে, ডোবে, খেলা করে রূপে-নামে-ভাবে, just like waves, ripples, bubbles, foam of the ocean spontaneously rising, dancing, playing, existing and dissolving. All have got the same abiding reality water. এক জলে গড়া, জলে ভরা সমস্ত তরঙ্গ, লহরী, বুদ্‌বুদ্। সেইরকম এক আমি চৈতন্য, মানে চৈতন্য দিয়ে গড়া, চৈতন্য দিয়ে ভরা, এক আমি দিয়ে গড়া সমস্ত রূপ-নাম-ভাব, বহির্বিশ্বের সবকিছু। এই জন্য তা হল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, দর্শনের দর্শন এবং ধর্মের ধর্ম।

'এ' কাউকে degrade করছে না। প্রত্যেকের আসল পরিচয় সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। যখন অ-আ-ক-খ কেউ আরম্ভ করে তা-ও বিদ্যা, that is also education। কিন্তু এই বিদ্যা ক্রমশ সেই alphabetical stage-এর থেকে আরম্ভ করে montessori stage, kindergarten stage, তারপর lower primary, middle primary, upper primary, secondary, middle seconday, higher secondary, তারপর degree course, master degree

এবং তারও পরে M.A, PRS, PhD.—এই করতে করতে সে এগিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যার প্রকাশ। অ-আ-ক-খ বিদ্যা, তুমি অ বলতে যা বোধ করছ, 'এ' অ বলতে বোধ করছে আমি। তুমি অ বলতে বোধ করছ ঐ একটা অক্ষর, it is only a sound, a letter or alphabet। প্রত্যেকটি অক্ষরের মধ্যে বোধরূপী আমি বা আমিরূপী বোধই রয়েছে, সেই অক্ষরের রূপে-নামে-ভাবে-বোধে তার শক্তি-সত্তা খেলছে বোধরূপে। I is the essence of all gods and goddesses. Gods and goddesses are Consciousness presiding in your senses, mind, ego, intellect and all providential agents i.e. the sun-god, the moon-god, the water-god, the fire-god, the earth-god, তার পরে তারও উপরে রয়েছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অর্থাৎ the creator, the preserver and the dissolver, তারও উপরে রয়েছে পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর। তাঁর personification কত রকমের! শিব, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ ইত্যাদি। প্রত্যেকেই সেই একই চৈতন্যে গড়া, একই চৈতন্যে ভরা। Nobody can deny it.

I-Consciousness সরিয়ে নিয়ে গেলে কী থাকবে? কিছুই থাকবে না। কিন্তু Consciousness-কে তো absent করা যাবে না। It cannot be removed, because it is all-pervading Reality. It is the real existence which exists and which will remain the same because it is the background of all. Background-কে সরানো যায় না। কে সরাবে? Who will remove it? Remover itself, সে নিজেই, অর্থাৎ তোমার I? তুমি তোমার আমিকে কী করে সরাবে? সরিয়ে দেখাও নিজের আমিকে, আর অন্যকিছু তো বাদ দিয়ে দেওয়া হল! It is not possible! তাহলে 'এ' কোন science তোমাদের সামনে রাখছে, কোন ধর্ম এবং দর্শন রাখছে তার একটুখানি ইঙ্গিত তোমাদের দিয়ে দেওয়া হল। এই বক্তব্যের essence তোমরা কালকে কিছু শুনেছ, আজকে তার থেকে আরও এক degree উপরে শোনানো হল। কেননা ধাপে ধাপে না-দিলে তোমাদের পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। Your intellect, mind will fail to grasp all these things, because this is absolutely a new light before you. এই জিনিস পূর্বে তোমরা শোননি।

তোমরা ধর্মের অন্যরকম ব্যাখ্যা শুনেছ। ভক্ত ভক্তির বিজ্ঞান বলেছেন, শাক্ত শক্তির বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলেছেন, যোগী যোগের বিজ্ঞান বলেছেন, জ্ঞানী জ্ঞানের বিজ্ঞান বলেছেন এবং শাস্ত্র পাঠ করে তোমাকে শুনিয়েছেন। 'এর' শাস্ত্র 'এ' নিজেই, পাঠকও 'এ' নিজেই এবং শ্রোতাও 'এ' নিজেই। Can you deny it? 'এ' যদি বলে, তোমার ভিতরে যে আমি, সেই আমিই এতক্ষণ এখানে বসে খেলা করে গেল আর তোমাদের মধ্যে বসে সেই আমিই শুনল! কেননা আমি হল all-pervading real Existence I Absolute (পাকা আমি). It cannot be denied, nothing can divide it and nothing can remove it. তা কেউ সরিয়ে নিতে পারে না, কেউ ভাগ করতেও পারে না—'অবিভক্তং বিভক্তেষু'। তা 'নিত্যম্', কখনও অনিত্য হয় না। নির্বিকার অর্থাৎ বিকার নেই; নিরাকার অর্থাৎ এর কোনও আকার নেই;

নির্বিশেষ অর্থাৎ এর কোনও বিশেষ নেই; নির্বিশেষণ অর্থাৎ এর কোনও বিশেষণ নেই, substitute নেই, duplicate নেই। যার substitute ও duplicate আছে তা space, time, causation অর্থাৎ relative-এর মধ্যে পড়ে যাবে। বহির্জগতে সবকিছুর পরিবর্তন বা change হয়, কিন্তু নিজের আমি-র কোনও পরিবর্তন হয় না। আমি প্রত্যেকের সঙ্গেই থাকে। This is the practical demonstration of I-Reality (আমিতত্ত্ব). Can you deny it? তুমি বাড়ির থেকে এখানে এসেছ, আবার সময়মতো বাড়ি ফিরে যাবে, anywhere you may go but your I remains always with you। 'এ' ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সবার মধ্যে আমিবোধে আছে বলে সবাইকে আমি বলেই উল্লেখ করছে। 'একে' অনেকে প্রশ্ন করেছে, তুমি যে এই ভাবে কথা বলছ, তুমি তো অভিশাপ কুড়োবে! তাদের কথার উত্তরে বলা হয়েছিল, অভিশাপটাও তো আমি, আমিই তো অভিশাপ দিচ্ছি। অভিশাপ যে বুঝবে সেই বোধটাও তো আমি নিজেই, otherwise how can you distinguish it as অভিশাপ? The curse, the word curse and the meaning of this word depends upon the essense of knowledge and understanding and that verily is I-Reality or I principle (Self I/Divine I). All are one and the same Consciousness/Knowledge Itself—Wisdom Absolute. আগুন সবকিছুকে পোড়ায়। Fire burns all but it cannot burn itself. So I can dissolve all, but I cannot dissolve Myself, কারণ dissolve করতে গেলে আমাকে থাকতেই হচ্ছে। I cannot go out of My Existence and that I is verily you all—yes, all of you verily I am. This is the Realization of the Reality Absolute (*Brahman/Atman*).

মন্তব্য ঃ

গতদিনের বক্তব্য চতুর্থ বিচারের বিষয় কাঁচা আমি-র বিশেষণপূর্বক পাকা আমিতে উত্তরণের বিজ্ঞান। সেই প্রসঙ্গ ধরে আজকের বক্তব্যবিষয় হল পঞ্চম বিচার। এই বিচারের মাধ্যমে আমিতত্ত্বের বিজ্ঞানকে অর্থাৎ ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরের স্বরূপকে অহংদেব আত্মারাম পুরুষোত্তম ভগবানকে পাকা আমি-র বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যথাসম্ভব সহজবোধ্য করে সবার সামনে পরিবেষণ করা হল। এই আমিতত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা পঞ্চম বিচারের মূল সারমর্ম। ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব হল পরমতত্ত্ব। তা-ই হল অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। বোধতত্ত্বের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে অখণ্ড পূর্ণ অদ্বয় আমিতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপে অভিনব ভঙ্গিমায় প্রকাশ করা হল। বোধময় আমি/আমিময় বোধের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে আপন আত্মস্বরূপের যথার্থ পরিচয় যেভাবে স্বানুভবসিদ্ধ হয় তার অভিনব বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণই পঞ্চম বিচারের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য। পঞ্চম বিচারের ফলশ্রুতি অবলম্বনে ষষ্ঠ বিচারের বিষয় ব্যক্ত হবে।

২৭/১১/২০০১

।। ষষ্ঠ বিচার ।।

ওঁ

সচ্চিদানন্দঘন তত্ত্ব পরম
শাশ্বত অচ্যুত নিত্য অদ্বৈত স্বয়ং ।।
স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংপূর্ণ
সর্বভাবের অধিষ্ঠান সর্ববোধের সমাধান
সর্বজীবন প্রকাশমহিমা তাঁর আপন সন্তান।
আমি তুমি প্রকাশ তাঁর তাঁর স্বভাব আপন
অতি প্রিয় তারা অতি আপন
সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মপরম
সত্যজ্ঞানানন্দঘন স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংপূর্ণ
আমি তুমি তাঁর প্রকাশমাধ্যম
সর্বজীবন তাঁর অতি আপন।
আমি তুমি সেই অদ্বয় আমি সনাতন ।।

(অদ্বয়তত্ত্ব)

ভারতবর্ষ এমনিই একটি দেশ, যে দেশের মহিমা, গরিমা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সব কিছুকে আপন করে নিয়েছে। যদিও পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশ এখনও তা পারেনি। ভারতবর্ষ এবং ভারতের যে শিক্ষা, ধর্ম এবং এখানকার যে সংস্কৃতি তা সর্বগ্রাহী, সর্বধারী, সবার আপন। কিন্তু ভারতবর্ষের এই পরম আদর্শকে পৃথিবীর সব দেশের মানুষ এখনও বুঝতে পারেনি। সেইজন্য এমন বিশেষ বিশেষ অধিকারী পুরুষের দরকার যাঁরা এই ভারতের মহান আদর্শকে, মহান শিক্ষাকে, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞানকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারেন অদ্বয় আপনবোধের বিজ্ঞানরূপে। সেইরকম পুরুষ না-হলে দল-মত-পথ যা সৃষ্টি হয় সমাজের মধ্যে তা অতিক্রম করে মহামানবের মহামন্ত্র সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় না। পাশ্চাত্যের যে মহিমা তা প্রাচ্যের মহিমা অতিরিক্ত নয় বরং তার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রাচ্যের মহিমার যে বৈশিষ্ট্য তা যুক্তি তর্কের অপেক্ষা রাখে না। তা অনুভবসিদ্ধির বিষয়। প্রাচ্যের (ভারতের) মহিমার যে অভিনবত্ব, ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে নিহিত আছে, এই অনুভূতি হচ্ছে ভারতের একান্ত আপন। তাই ভারতের মুনি ঋষি মহাত্মা মহাপুরুষ সাধুগণ এই এক মহামন্ত্রের জয়গান করে গিয়েছেন যে—ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম পরমতত্ত্ব পরমসত্য সবার হৃদয়ে নিহিত। তা জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার পক্ষেই প্রযোজ্য। এ বিষয়ে মতান্তর অবান্তর।

ভেদাভেদ হল মনের ভ্রম, আমাদের বুদ্ধির বোঝার ভুল। আজকে যাকে আমরা ছোট শিশু দেখছি, সেই শিশুই একদিন বিরাট জ্ঞানীতে পরিণত হবে। সেইরকম ছোট বীজের থেকে প্রথমে গাছ হয়, তারপর ফুল ও ফল হয়। প্রত্যেকটি জীবন সেই ব্রহ্মাত্মবীজে তৈরি, ব্রহ্মাত্মভাববোধে ভরা, ব্রহ্মাত্মভাববোধে গড়া। এই কথাটি সমস্ত ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের সারমর্ম, কিন্তু তা পরিপূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার উত্তম অধিকারী পুরুষ বড় দুর্লভ। জগতের ইতিহাসে আমরা এমন সমস্ত মহামানবের পরিচয় পাই, সেই বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত, যাঁরা স্বানুভবসিদ্ধ জ্ঞানে সবার উপরে শীর্ষস্থান দখল করে আছেন, সেই সব মহাপুরুষের জীবনাদর্শ, তাঁদের শিক্ষা ও অনুভূতির ধারা ঠিকমতো সবাই আমরা নিতে পারিনি। তার জন্য আমাদের মধ্যে এত মতবিরোধ, ভুল বোঝাবুঝি ও দ্বন্দ্ব—ভাবের আদর্শে, অনুভূতিতে, শক্তি-সামর্থ্যে, যোগ্যতায়, কর্মে এবং কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র। তার জন্য এমন একটা সূত্র আমাদের দরকার, এমন একটা formula, এমন একটা নীতি ও এমন একটা বোধ প্রয়োজন যা সবকে বরণ করে নিতে পারে, আপন করে নিতে পারে এবং একসূত্রে গেঁথে নিতে পারে। অনেকেই চেষ্টা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের চেষ্টার ধারক-বাহক খুব বেশি তৈরি হয়নি। তার কারণ দর্শন, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অমিলে ভরা। দর্শনের ক্ষেত্রে যত দার্শনিক তাদের মধ্যে মতের মিল নেই, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ এবং ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মের নেতাদের মধ্যেও কোনও মিল নেই। 'এ' statement of fact বলছে, তার কারণ 'এ' সেই মূল সূত্র সবার সামনে প্রকাশ করতে এসেছে যেই সূত্রের মধ্যে জাতি-বর্ণ-লিঙ্গ-দল-মত-পথের কোনও প্রভাব নেই, যা সবার জন্য, সর্বকালের জন্য, সর্বদেশের জন্য, সর্বমানবের জন্য পরম কল্যাণকর, মঙ্গলকর, মুক্তিপ্রদ ও শান্তিপ্রদ।

শান্তি একটা শব্দ, পৃথিবীর সর্বদেশের মানুষ তা উচ্চারণ করে, কিন্তু তার জন্য আমরা আদৌ প্রস্তুত নই। মুক্তির কথা ঠিক সেইরকম। মুক্তির বাণী অনেকে বলেন বটে, কিন্তু মুক্তির বাণী কোথায়? বাইরে নয়, দল-মত-পথে নয়, প্রত্যেকের আপন আপন হৃদয়ে। পূর্ণতা নিহিত আছে প্রত্যেকের নিজের হৃদয়ে, বাইরে কোথাও নেই। বাইরে যে মন্দির মসজিদ গির্জা তা শুধু আমাদের দৈনন্দিনজীবনে, সমাজজীবনে, জাতীয়জীবনে সবার সঙ্গে একত্রে মিলিত হবার একটা পীঠস্থান বা দেবভূমি। দেবভাব আমাদের নিজেদের জীবনের মধ্যেই নিহিত আছে। তা ফুটিয়ে তোলার জন্য এগুলি সাহায্য করে। এই দেবভাবের পরে আসবে ঈশ্বরীয় ভাব, তার পরে আসবে পরমাত্মা পরব্রহ্মের ভাব। তা কী? 'সচ্চিদানন্দম্ সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। পরমতত্ত্বম্ অনাদি অনন্তম্ অখণ্ড ভূমা শাশ্বত সনাতনম্ নিত্যাদ্বৈতম্।' একমাত্র সূত্র যা সবকিছুর মধ্যে গাঁথা আছে তা হল প্রত্যেকের আমি। তা প্রকাশ করার জন্য একটাই মাত্র জিনিস দরকার হয়—I principle। এই আমি প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়ে রয়েছে। ছোট শিশু হতে আরম্ভ করে পরম অজ্ঞানী, পরম জ্ঞানী এবং ভগবৎ অবতার মহাপুরুষ বলে যাঁরা পরিচিত, প্রত্যেকেই আমি-র ব্যবহার করেন। এই আমিকে বাদ দিয়ে চৈতন্যের ব্যবহার হয় না। এর আগের দিন এই প্রসঙ্গে অল্প কিছু কথা 'এ' প্রকাশ করেছে। তা আজকে আরও সুন্দর

করে সবার কাছে যাতে গ্রাহ্য হয় সেই ভাবে বলা হবে, যেখানে প্রত্যেকের আমি তার উত্তরাধিকারী। সেই পরম আমি-র বক্ষে পরম আমি-র প্রকাশধারা নিরন্তর হয়ে চলেছে। যেমন সমুদ্রবক্ষে, নদীবক্ষে তার জলরাশি তরঙ্গ, লহরী, বুদ্‌বুদ্ আকারে কত ভঙ্গিমায় ওঠে, ভাসে, খেলা করে আবার ডুবে যায়। সবটারই abiding reality হচ্ছে water। Similarly এই সৃষ্টির মধ্যে যত বৈচিত্র্যই হোক, সমস্ত বৈচিত্র্যের উপাদান এবং তার যে পরিণাম সবটাই হচ্ছে এক চৈতন্য। চৈতন্য দিয়ে সবকিছু গড়া, সবকিছু ভরা, চৈতন্যের প্রকাশ সবার মধ্যে হয়ে চলেছে, শুধু মানের তারতম্য প্রকাশের দিক থেকে। কিন্তু সত্তার দিক থেকে সব নিত্যসম উপাদান। প্রকাশের মানের তারতম্য হয় গুণভাব সহযোগে। গুণভাবের নিজস্ব কোনও প্রকাশশক্তি নেই, চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত হলে চৈতন্যের স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতি প্রতিফলিত হয় তার মধ্যে। সেইজন্য স্বয়ংপ্রকাশ এক চৈতন্যস্বরূপ আমি বহু ভঙ্গিমায় ভাব-নাম-রূপে প্রতিভাত হয়।

এই যে নিত্যসম উপাদান তা ভুলে গিয়ে আমরা খালি প্রকাশের ধারার ভেদ বা পার্থক্য নিয়ে মাতামাতি করছি। তা হল আমাদের বুদ্ধির ভ্রম বা বোঝার ভ্রম। এই বুদ্ধি আমাদের উপকার যেমন করে আবার অপকারও করে। কেননা এই বুদ্ধিই আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে, ভুল বোঝাবুঝির ফলে তার কুফলও ভোগ করতে হয় বুদ্ধিদোষে। আমরা অখণ্ড ভূমা পূর্ণের সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সসীম মনে করি, স্বল্প শক্তি-জ্ঞানের অধিকারী মনে করি এবং জীবভাবে নিজেকে ভাবনা করি নিজ বুদ্ধিদোষে। অথচ নিজের পূর্ণতা নিজের হৃদয়ে নিহিত রয়েছে যার কোনও পরিমাপ করা যায় না। যার জন্য কথাপ্রসঙ্গে অনেক মূল সত্যের কথা এখানে বলা হয়েছে যা বেদ-বেদান্তের মধ্যে ঢাকা পড়ে রয়েছে আমাদের বুদ্ধির চাতুর্যের জন্য, বুদ্ধির চমৎকারিতার জন্য। বুদ্ধি তো গোলাম, বুদ্‌বুদ্ আকারে ধী। অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরে বুদ্ধি হচ্ছে একটা বুদ্‌বুদ্ সদৃশ। তার মধ্যে সেই সত্য নিহিত আছে। কিন্তু সাগরের বক্ষেই আছে, সেইজন্য সাগরকে ছেড়ে তার আলাদা কোনও পরিচয় নেই। Absolute-কে বাদ দিয়ে individual life-এর কোনও অস্তিত্বই থাকা সম্ভব নয়। চৈতন্যকে বাদ দিয়ে কোনও প্রকাশ সম্ভব নয়, অনুভূতিও সম্ভব নয়। অনুভূতি আর প্রকাশ সবই আমিবোধে গাঁথা, আমিবোধে ভরা। এই আমি কী? "কোঽহম্"—আমি কে? আমি অজ্ঞান, আমি বৈচিত্র্য, আমি রূপ, আমি নাম, আমি প্রাণ, আমি মন, আমি বুদ্ধি, আমি অহংকার, আমি চিত্ত, আমি চিদ্‌স্বরূপ, আমি আনন্দস্বরূপ, আমি পূর্ণস্বরূপ, আমি অখণ্ড, আমি ভূমা, আমি ব্রহ্ম-আত্মা সনাতন, সবার হৃদয়ে আমি-র অধিষ্ঠান।

I-less কোনও life নেই। এই আবিষ্কার 'এই দেহের' মধ্যে হয়েছে। এই দেহ নিয়ে 'এ' বহুবার এসেছে জগতে। কিন্তু প্রত্যেকবারই মানুষের কাছে 'এ' পরমসত্যের কথা প্রকাশ করেছে। তার জন্য যথেষ্ট শাস্তি 'এই দেহ' বরণ করে নিয়েছে। এবারও হয়ত নিতে হবে। কেননা সমস্ত দল-মত-পথের যে মূল সূত্র তা বলে দিলে দল-মত-পথ 'একে' ছেড়ে কথা বলবে না। কিন্তু পরম এক-কে তো অস্বীকার করার ক্ষমতা কারও নেই। Without the eternal One there cannot be duality, plurality, any relativity. And that is

ever-present in the Consciousness of I. I-less কোনও life নেই। পৃথিবীর কোনও দেশের মানুষ I principle-কে বাদ দিয়ে, তাদের ভাষায় I-কে যাই বলুক তারা, এই I-কে ছাড়া কোনও কিছু প্রকাশ করতে পারবে না। গতকাল 'এ' এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলেছে, আজকে আরও বিশেষ করে বলবে যে, আমি দিয়ে কী করে আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজ নিষ্পন্ন হচ্ছে প্রত্যেকেরই জীবনে। কিন্তু আমরা এই আমিকে কখনও খেয়াল করি না। মনকে খেয়াল করি, তাও সবাই করি না। দেহ-ইন্দ্রিয় নিয়ে মাতামাতি করি, কিন্তু কোনও অনুভূতি চৈতন্য ছাড়া হয় না, আবার চৈতন্যও কোনও অনুভূতি ছাড়া সম্ভব নয়। আমি ছাড়া প্রকাশ হতেই পারে না। কাজেই আমি ভাব, আমি বোধ, চৈতন্য, এগুলো সব একই অর্থবোধক। এই সত্য আগে মানুষের কাছে ধরিয়ে দিয়ে তার পরে তার জীবনের পরিণামগুলো দেখাতে হবে। আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি ভাল, আমি মন্দ, আমি ছোট, আমি বড় এই আমি দিয়েই কিন্তু আমরা ব্যবহার করছি, কিন্তু who is that I? সেই আমি কে? আমরা ঈশ্বরের নানা রকম বিভূতি নিয়ে মাতামাতি করি, শক্তির নানা রকম বিভূতি নিয়ে মাতামাতি করি, কিন্তু আমিকে বাদ দিয়ে কি কোনও জিনিস সম্ভব? Without I কোনও কিছু সম্ভব নয়, I-dea ও আমিতত্ত্বকে 'এ' *Knowledge of Knowledge*-এর মধ্যে এত scientific way-তে analysis করেছে যে scientist-রা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি এসব পেলে কোথায়? উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল—এ কোনও পাবার জিনিস নয়! It is present in each and every individual life. কেননা প্রত্যেকেই আমরা সেই এক উপাদানে গড়া। The eternal substratum is Consciousness, which is the quintessence of the Vedas. সমস্ত বেদসাগরের একমাত্র সত্তা হচ্ছে সচ্চিদানন্দম্, যা সৎ তা-ই চিৎ, তা-ই আনন্দ। কেননা সৎ হচ্ছে নিত্যবর্তমান এবং চিৎ হচ্ছে স্বয়ংপ্রকাশ, তার দ্বিতীয় কোনও প্রকাশক নেই। তা অখণ্ড বলে আনন্দ। 'এ' সংক্ষেপে সেই সম্বন্ধে বলছে। তা জীবনের প্রতি পদে কী ভাবে আমরা ব্যবহার করি তা দেখিয়ে ধাপে ধাপে মন বোধের ঘরে প্রবেশ করে বোধের স্বরূপ কী ভাবে অনুভব করতে পারে সেই সম্বন্ধে কিছুটা বলা হবে। কেননা এই বিষয় খুব সূক্ষ্ম এবং এক কথায় সমস্ত মতপথের অতীত। কোনও মতপথ দিয়ে তা ছোঁয়া যায় না। মতপথকে বাইরে রেখে তা ছুঁতে হবে। কীরকম? আমরা যখন মন্দিরে যাই, জুতো বাইরে রেখে মন্দিরে প্রবেশ করি। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলোতে কতগুলো সুন্দর নিয়ম আছে, জামা পরে মন্দিরে ঢোকা যায় না, খালি গায়ে চাদর জড়িয়ে ঢুকতে হবে, কোনও কোনও মন্দিরে মাথাটা ঢেকে ঢুকতে হবে, খালি মাথায় ঢোকা যায় না। এই নিয়মগুলোর তাৎপর্য আছে এবং আমরা পূজা পার্বণে যা-কিছু করি এগুলোর significance-এর সঙ্গে বর্তমানে আমাদের কোনও পরিচয় নেই। Dead কতগুলি rites and rituals নিয়ে আমরা জীবন কাটাই।

'এই শরীরটা' যখন ছোট ছিল, (শরীরটার বয়স ছোট ছিল, এই আমি-র বয়স ছোট নয়। এই আমি time-এর অতীত) এই প্রসঙ্গে এই দেহের জনককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বাবা কোথা থেকে নিয়ে এসেছ এই আমিকে? বাবা জবাব দিতে পারেননি। তাঁকে

জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কেন আনলে? এই দেহ খাঁচার মধ্যে ভরে কেন এনেছ? বাবা বলতে পারলেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এই যে বিজয়া দশমীর দিন তোমরা সকলে এত ধুমধাম করে বিসর্জন দিচ্ছ মাকে, কই মাকে ঘরে আনার সময় তো এতটা ধুমধাম করো না। বিসর্জনের সময় সকলের কী আনন্দ, ছেলেমেয়ে সবার! দেবদেবীর নামে একেবারে জয়গান গাইছে। বাবা বলেছিলেন, এগুলো অভ্যাস। এই প্রসঙ্গে বাবাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—কিন্তু এই বাল্যশিক্ষা কি সারাজীবনই করতে হবে বাবা? বাবা বলেছিলেন—তোর কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না রে বাবা! কেননা তুই এমন একটা জিনিস নিয়ে এসেছিস যেই জিনিসের কোনও বিকল্প নেই। তোর উত্তর তোর কাছেই আছে, শাস্ত্রও তোর উত্তর দিতে পারবে না, কেননা তুই এমন মৌলিক কথা বলিস এতটুকু অল্প বয়সে যা আমরা বয়স্ক হয়েও ভাবতে পারি না। এগুলো তোর কাছে কত সহজ। তুই এই ভাব নিয়েই এসেছিস। 'এ' বাবাকে উত্তরে বলেছিল—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ, কিন্তু বাল্যশিক্ষা কি তোমরা সারাজীবনই পড়বে, তার পরে আর এগোবে না? জীবনে কর্মক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে এবং দর্শন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতগুলো limited book knowledge নিয়েই কি আমাদের চলতে হবে? পরম পুস্তকটি কবে পাঠ করবে? সেই অখণ্ড আমি-র বক্ষে, অখণ্ড সত্তা আমি-র বক্ষে অনন্ত আমি ওঠে, ভাসে, ডোবে, নৃত্য করে, খেলা করে, আবার লয় হয়ে যায়। তার মধ্যে যতই বিরোধ হোক, যতই মিল থাকুক, কিন্তু এক বোধময় সত্তা আমি-র বক্ষে সব একাকার হয়ে যায় একবোধে। এই একবোধের চর্চা আমাদের culture-এর মধ্যে পূর্বে ছিল, এখন আর নেই।

সাধুসন্তদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তোমরা সাধুসন্ত হয়েছ না সাধুসন্ত সেজেছ, বল? এই প্রশ্ন শুনে সাধুরা বলেছিলেন—তুম এ্যায়সা সওয়াল কিঁউ করতে হো? 'এ' তখন তাঁদের বলেছিল, তুম জবাব দো। সাধু কিসকো কহতে হ্যায়? কিঁউ সাধু বনা তুমলোগ? সাধু তখন বললেন—তুম বোলো। উত্তরে তাঁকে তখন বলা হল—হাম তো বোলনে কে লিয়েহি আয়ে হ্যায়, ইসকা উত্তর জরুর দেঙ্গে। জীবনের সাধ কীসের জন্য? নানাত্ব-বহুত্বের জন্য। মানুষের অন্তরে নানা রকমের সাধ। কিন্তু নিজের পরিচয়টা জানলে আর সাধ পূরণ করার ইচ্ছা থাকবে কি? সাধশূন্য অবস্থা পূর্ণ ও মুক্ত অবস্থা। সাধু সংসার ত্যাগ করেন, অন্তরের ভোগ বাসনা ত্যাগ করে সাধু সাজতে যায়, কিন্তু সাধশূন্য সহজে হওয়া যায় না। আমি-র মর্ম যদি কেউ জানে তাহলে আর সাধ করার সাধ বা ইচ্ছা হবে না, সাধ আপনিই দমিত হবে। কেননা আমিকে বাদ দিয়ে কিছু নেই। কিন্তু আমিকে ভুলে থেকে মন নিয়ে আমরা সংসার করি, জীবনযাপন করি।

মনের নানা দিকে অনন্ত শিখা, অগ্নিশিখার মতো কামনাবাসনার সঙ্গে সে ছড়িয়ে পড়ছে। মনকে আমরা লাগাম টানতে জানি না। তাই মনের বৈচিত্র্য ইচ্ছা, বৈচিত্র্য ভাব বৈচিত্র্য ভঙ্গিমায় লীলায়িত হয়। তা-ই কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে আর পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের ভেদ আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখি। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করলে ভেদ কোথায়? মনের মধ্যে তার স্মৃতি থাকে। মনের দরজা বন্ধ করলে এই স্মৃতিটাও থাকে না। স্মৃতির মধ্যেও আমি

আছি। কাজেই মনের ঊর্ধ্বে যে আমি-র পরিচয় দেহের ভিতরে ও বাইরে সেই এক বোধময় আমি/আমিময় বোধ আছে। আমি মানে Consciousness। দেহে, ইন্দ্রিয়ে, প্রাণে, মনে, বুদ্ধিতে, অহংকারে, চিত্তে, সমগ্র প্রকৃতির মধ্যেও তা আছে। তার ঊর্ধ্বে যে চৈতন্য তার মধ্যে প্রকৃতির কোনও ছাপ নেই। সব জায়গায় কিন্তু চৈতন্য আছে। এই চৈতন্যের মধ্যে সব জায়গায় আমি আছে। কাজেই আমি দেহাত্মবুদ্ধি নিয়ে চলে, প্রাণের ভাবনা করে, মনের ভাবনা করে, বুদ্ধি দিয়ে সে নানারকম বিচার করে, কিন্তু কোনওটাই তার টেকে না অর্থাৎ স্থায়ী নয়। যতক্ষণ না সে নিজের পরিচয়টি, সেই আমিকে না জানে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়। আমি কী বা কে? আমি দেহ না ইন্দ্রিয়, না প্রাণ, না মন, না বুদ্ধি, না অহংকার, না চিত্ত, না এর সমষ্টি, না সমগ্র প্রকৃতি, না এছাড়া অন্য কিছু? এই প্রশ্ন সবার মধ্যে জাগে না, যাঁদের মধ্যে জাগে তাঁরাই সাধক।

সংসারী মানুষ অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে নিজে সাধু সাজতে চায়। আর সাধক হন তাঁরাই যাঁরা অন্যের দোষ না-দেখে নিজের দোষ দেখেন। সেই দোষকে তাঁরা শোধন করতে চান, আর যাঁরা শোধন করতে পারেন তাঁরা সিদ্ধ হন। সিদ্ধ হলেই কিন্তু শেষ হল না, তার পরেও থেকে যায় আমাদের বীজ। সেই বীজ হল অজ্ঞানের বীজ। অজ্ঞান কী? আমিকে পূর্ণ করে না-জানা। আমিকে জানা হলে, অর্থাৎ চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যকে জানলে তখন আর কোনও অজ্ঞানের বীজ বা বিকার থাকে না। আমরা অহংকার দিয়ে সবকিছু ব্যবহার করি। চৈতন্যের প্রতিফলন হল বুদ্ধি, মন, অহংকার, চিত্ত অর্থাৎ এই অন্তঃকরণ। তার থেকে আসছে ইন্দ্রিয়ের প্রতিফলন, তার থেকে আসছে ইন্দ্রিয়ের বাইরে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে। এগুলো হচ্ছে reflection of reflection। এগুলো অঙ্কের হিসাবে 'এ' সবার কাছে রেখেছে। 'এ'তো লেখাপড়া শেখেনি, হাতে কলম নেই, কিন্তু অন্তরে সানাই বেজে যাচ্ছে নিরন্তর। অনাদিকাল থেকে এই সানাই বেজে যাচ্ছে এবং বেজে যাবে। কেননা বাক্ দ্বারাই ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করে—বাক্ ব্রহ্ম। এই বাক্ ব্রহ্ম ছাড়া সত্যের প্রকাশ সিদ্ধ হবে না, ক্রিয়ার দ্বারা সিদ্ধ হবে না, ভাবনার দ্বারা সিদ্ধ হবে না, বাক্ তাকে সিদ্ধ করে দেবে। তাই দেখা যায় ঋষি যুগে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ঋষিরা বাক্য দিয়েই নিষ্পন্ন করেছেন। মুনিরাও ঠিক তাই করেছেন। সাধুসন্ত মহাত্মারাও সত্য বাকের ব্যবহার করেন, যে বাক কলুষিত হয়নি। অর্থাৎ সেই বাক চৈতন্যকে বাদ দিয়ে তদতিরিক্ত কোনও ভাবনা করে না বা ভাবনার সঙ্গে যুক্ত থাকে না। সেই বাক্ হচ্ছে সত্যবাক্ যা সত্য নিত্য এক। এই এক হল প্রত্যেক আমি-র ভিতরে যে একটা 'আমি' আছে সেই আমি, অর্থাৎ the underlying essence of I-Knowledge, I-Consciousness, I-principle, not ego। আমি-র থেকে বেরিয়ে গিয়ে reflection হল মহৎ বুদ্ধিতে, বুদ্ধির থেকে reflection হল মনে এবং মন থেকে অহংকারে। তাই অহংকার হল reflected consciousness, not Real Consciousness।

এই অহংকার যুক্ত আছে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও বস্তুর সঙ্গে। বহির্জগতের সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত আছে যে চৈতন্য তা হল অহংকার। অন্তরের সঙ্গে যুক্ত আছে যে চৈতন্য তা হল বৃহত্তর

অহংকার। তারপরে আরও গভীরে যা আছে তা হল ত্বংকার। আরও গভীরে যখন যাচ্ছে তা হল বৃহত্তর ত্বংকার। আরও গভীরে রয়েছে অহংদেব অর্থাৎ পুরুষোত্তম ভগবান। এই পুরুষোত্তম ভগবান প্রত্যেকের হৃদয়ে রয়েছেন। পুরুষোত্তম—উত্তম পুরুষ, ক্ষর পুরুষ নন, অক্ষরপুরুষও নন। ক্ষরপুরুষ হচ্ছে বাইরের সব বিকারী পরিণামী বস্তুগুলি, এগুলি সব reflection of consciousness দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু মন একাগ্র হয়ে গেলে এগুলো আর থাকে না। যেজন্য মনের বহির্ভাগে হচ্ছে জগৎ, অন্তর্ভাগে জীবন, কেন্দ্রে ঈশ্বর এবং তারও উর্ধ্বে হচ্ছে আত্মা-ব্রহ্ম। কাজেই অজ্ঞানে জগৎ, জ্ঞানাভাসে জীব, বিজ্ঞানে ঈশ্বর এবং প্রজ্ঞানে ব্রহ্ম পরমাত্মা। এই চারটে শব্দকে ইংরাজিতে উল্লেখ করে কী করে এর ভিতরে এগুলো খেলছে সে কথাও বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তা নিয়েই জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে একটা মস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে। তারা বলেছে যে, উনি বলেন লেখাপড়া শেখেননি, শাস্ত্র পড়েননি, কারও কাছে কিছু শোনেননি, তো উনি কী করে এগুলো এরকম ভাবে extempore বলে যাচ্ছেন। উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল—তোমরা কতগুলো condition-এর সঙ্গে আজন্ম পরিচিত, কিন্তু condition-এর বাইরে যে আর কিছু থাকতে পারে তা তোমরা ভাবতে পার না। যখন এরকম কোনও exceptional life আসে, তোমরা প্রথমে তাঁর বিরোধিতা কর, তাঁকে তোমরা গ্রহণ কর না। তাঁকে অপদস্থ করার চেষ্টা কর দল-মতের দোহাই দিয়ে। কিন্তু যখন তিনি স্বমহিমায় আপন ভাবকে প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আস্তে আস্তে তাঁকে আবার মানুষ গ্রহণ করে। বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

আচার্য শঙ্করকে তাঁর সময়ে সবাই গ্রহণ করতে পারেনি। তারা ভাবত যে, তিনি একটি বাচ্চা বয়সের ছেলে। ষোলো বছর বয়সে তিনি শাস্ত্রের সমস্ত ব্যাখ্যা অনর্গল বলতে পারতেন। বড় বড় সমস্ত জ্ঞানীগুণী বয়স্ক লোক তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি হননি। কারণ তারা so much conditioned যে convention-এর সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে ছিল। পরবর্তীকালে আচার্য শঙ্করই হলেন অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবক্তা। তাঁকেও অনেক বিরুদ্ধ মতবাদের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। একইরকম ভাবে বুদ্ধদেবকেও নানা বিরুদ্ধ অবস্থা face করতে হয়েছে। ওদেশে Socrates-কে, যিশুখ্রিস্টকে তো মেরেই ফেলল। মহম্মদকে face করতে হয়েছে, নানককে face করতে হয়েছে, কবিরকে face করতে হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণকে face করতে হয়েছে, রামচন্দ্রকে face করতে হয়েছে, চৈতন্যদেবকে এবং রামকৃষ্ণকেও একইভাবে অজ্ঞান-অন্ধ স্বার্থপর ধর্মনেতা, সমাজনেতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতলবী ভোগী মানুষদের বিরোধিতাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। সর্ববিরুদ্ধ অবস্থাকে তাঁরা মোকাবিলা করেছেন এবং তাঁদের আত্মশক্তির জোরে সে সব বাধা বা বিরোধিতাকে দমন করতে সমর্থ হয়েছেন। আত্মশক্তির কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ নেই। 'এ' এগুলো বই পড়ে বলছে না, প্রজ্ঞানয়নে এগুলো দর্শন করা হয়েছে, কেননা 'এর' কাছে অপ্রকাশ্য কোনও বস্তু নেই। I am that light which reveals all possible and all impossible, all real and all unreal, all finite and all infinite, all gross, subtle, causal and all transcendental.

আমিই যখন সব তখন আমার কাছে কোনও জিনিস তো unknown, unseen থাকতে পারে না। Because I is the embodiment of *Saccidananda*. আমি সৎ ছিলাম, আছি এবং থাকব। আমি বলতে কিন্তু এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ নয়। প্রত্যেকের ভিতরেই এই আমি রয়েছে হৃদয়ের গভীরে। অহংরূপে এর প্রকাশ হয়, কিন্তু বুদ্ধি ও মনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা মলিন হয়ে অহংকাররূপে প্রকাশ হয়। মন-বুদ্ধিকে সংযত করে এই আমি-র সন্ধান মানুষ প্রথমে রূপের মধ্যে করে, স্থূল রূপের থেকে সূক্ষ্মরূপে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর থেকে সূক্ষ্মতম আবার কেউ নামের মধ্যে সন্ধান করে, যথা স্থূল নামের থেকে সূক্ষ্ম নামে, সূক্ষ্ম নামের থেকে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর থেকে সূক্ষ্মতমে, আবার কেউ ভাবের মধ্যে করে, যথা স্থূল ভাব, সূক্ষ্ম ভাব, সূক্ষ্মতর ভাব, সূক্ষ্মতম ভাব, কেউ বা direct বোধস্বরূপের মধ্যে সন্ধান করে। "উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ। স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমা।।" অর্থাৎ যারা পূজাপার্বণ কিছুই করে না খালি খায়দায়, মজা লোটে তারা অধম। এগুলো হচ্ছে indirect অর্থাৎ base level-এ তারা আছে। একটা কথা 'এ' তোমাদের বলবে, অনেকে হয়ত এই কথা থেকে বিকল্প কিছু প্রশ্ন করবে। সেই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু অল্প একটু পরে সে নিজেই পাবে।

রত্নাকরের কথা অনেকেই জানে। সে এক মুনির পুত্র, কিন্তু দস্যুবৃত্তি করে। সে মুনির কাছে কোনও শিক্ষা গ্রহণ করেনি। সে ছোটবেলা থেকেই দুর্দান্ত ছিল। সে অসৎসঙ্গে পড়ে অসৎবৃত্তি অবলম্বন করে জীবনযাপন করে বড় হয়েছে, সে অসৎবৃত্তি ছাড়তে পারে না। তার গর্হিত কাজকে লক্ষ্য করে তাকে উদ্ধার করার জন্য ব্রহ্মা এবং নারদ একদিন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন যে, দেখ রত্নাকর এত বড় মুনির ছেলে, কিন্তু তার জীবনটা কী রকম! ওকে কোনওরকমে আমরা সাহায্য করতে পারি কি! নারদ বললেন, প্রভু চেষ্টা করে দেখতে পারি, চলুন আমরা যাই। দু'জন বনপথে ছদ্মবেশে চলেছেন। আর রত্নাকর তো দস্যু, বনপথে যাকে পায় তাকেই ধরে, মেরে যা-কিছু পায় কেড়ে কুড়ে সব নিয়ে যায়। বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন, মায়েরও বয়স হয়েছে, রত্নাকর বিয়ে করেছে, তার পত্নী আছে, সে দস্যুবৃত্তি করে তাদের ভরণপোষণ করে। বাবার কোনও উপদেশই ছেলে শোনে না। যেমন আজকাল অনেক ছেলেমেয়েরা পিতামাতার কোনও উপদেশ শোনে না। এটা একটা standard । সৃষ্টির মধ্যে অনেকগুলো gradation আছে। একটা stage-এ এইরকম বহু জীবন আছে। রত্নাকর তাদের মধ্যে একজন। রত্নাকর কতখানি অজ্ঞ ছিল, অজ্ঞানে আবদ্ধ ছিল সেটা point out করে, ওই standard কোথায় ছড়িয়ে আছে আমাদের মধ্যে তা তোমাদের বলা হবে। বনপথে ব্রহ্মা আর নারদকে রত্নাকর ধরল। ব্রহ্মা ও নারদ রত্নাকরকে বললেন, আমাদের কাছে কিছু নেই। আমরা তো বনের পথে ঘুরে বেড়াই, আমরা তপস্বী সাধক। সে বলল, তা তো জানি না! কিছু যদি নাও পাই তাহলেও তোমাদেরকে শেষ করে দেব, কারণ তোমরা না-হলে বাইরে গিয়ে আমার বদনাম করবে। কাজেই এই ভাবে বহু জীবন নষ্ট করেছে সে।

নারদ ব্রহ্মাকে বললেন, প্রভু আজ বুঝি রত্নাকরের হাতেই আমাদের জীবনটা যাবে! ও কিন্তু শুনবে না কোনও কথা। আমাদের কাছে তো কিছুই নেই, কী দেব ওকে? ব্রহ্মা বললেন, দেখা যাক! দু'জনে রত্নাকরকে বললেন, আমরা একটা জিনিস দেখেছি, কিন্তু তুমি তা দেখতে

পাচ্ছ না। রত্নাকর বলল, কী? তখন তাঁরা বললেন, তুমি এই যে-কাজগুলো করছ প্রতিদিন, সেই কাজের যে ফল জমা হচ্ছে, সেই জমা ফলটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না। রত্নাকর বলল, সেটা কী? তখন তাঁরা বললেন, তাকে বলে সংস্কার। তোমার এইরকম সংস্কার জমা হয়েছে যে এগুলো যখন তোমার কাছে ফিরে আসবে তখন তা তোমাকে ভোগ করতে হবে। রত্নাকর বলল, তার মানে! আমি তো আমার মা-বাবার জন্য, আমার স্ত্রীর জন্য, সংসারের জন্য এগুলো করছি, আমার কর্মফল তারা নেবে! তাঁরা রত্নাকরকে বললেন, তাদের জিজ্ঞাসা করেছ কি? রত্নাকব বলল, আমি জিজ্ঞাসা করতে যাই আর এই ফাঁকে তোমরা পালিয়ে যাবে তাই না! তাঁরা বললেন, ঠিক আছে, তুমি যা বলবে আমরা তা-ই করব। রত্নাকর তাঁদের লতা পাতা দিয়ে খুব কষে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে গেল বাড়িতে। একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত লতা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে দিয়ে গেল। তাঁরা দু'জনে রত্নাকরকে বললেন, ঠিক আছে আমাদের বেঁধে রেখে দিয়ে যাও, দেখ তোমার বাড়ির লোকেদের জিজ্ঞাসা করে যে, কেউ তোমার সংস্কার নেবে কি না!

ব্রহ্মা আর নারদ ওই গাছের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় অবস্থান করছিলেন। রত্নাকর বাড়িতে এসে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল যে, বাবা, আমি যে এই কর্ম করছি, তোমাদের খাওয়াচ্ছি, পরাচ্ছি, এর জন্য আমার যদি কোনও পাপ হয়, অপরাধ হয়, তার অংশ তুমি নেবে তো? বাবা বললেন, না, তোমার কর্মের ফল তোমার কাছে যাবে, আমার কাছে আসবে কেন? রত্নাকর বলল, কেন যাবে না? আমি যে তোমাদের খাওয়াচ্ছি! বাবা বললেন, তোকে আমি জন্ম দিয়েছি, তোকে জ্ঞান দান করার জন্য অনেকরকম ভাবে চেষ্টা করেছি। আমি তো চুরি করে, বদমাইশি বা ডাকাতি করে তোকে খাওয়াইনি। আমার ভাল কর্মের ফল তো তোকে স্পর্শ করল না, তোরটা আমাকে কেন স্পর্শ করবে? আমাকে নিতে হবে কেন তোর কর্মফল? রত্নাকর বলল, তুমি একটুও নেবে না? বাবা বললেন, না, তা সম্ভব নয়। রত্নাকর আবার বাবাকে বলল, তুমি আমার ফল নেবে না? বাবা—আমি নিতেই পারি না, তা সম্ভব নয়। তোমার পেটে ব্যথা হতে পারে, তাই জন্য সেই ব্যথা কি আমার পেটেও হবে? তোমার ক্ষিদে পেলে কি আমারও ক্ষিদে পাবে? তখন রত্নাকর ভাবল, তাই তো! মার কাছে গিয়ে একই প্রশ্ন করতে মাও একই জবাব দিলেন। স্ত্রীর কাছে গিয়েও একই প্রশ্ন করাতে সে বলল, না, তুমি ধর্ম সাক্ষী করে, অগ্নি সাক্ষী করে আমাকে বিয়ে করেছ। আমাকে তুমি লালনপালন করবে, তুমি যদি অন্যায় ক'রে রোজগার কর তার জন্য তো আমি দায়ী থাকব না। তুমি একজন ঋষির পুত্র, তুমি অন্যায় করবে কেন? রত্নাকর বলল, তোমরা তাহলে কেউই নেবে না? স্ত্রী বলল, না। তখন রত্নাকর ভাবল, এই রে! তাহলে আমার এইসব কর্মের ফল একা আমাকেই ভোগ করতে হবে, আর কেউ নেবে না! মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল সে।

বনের পথে একদিন চলতে চলতে সে দেখতে পেল একটি কুষ্ঠ রোগী পড়ে আছে। তার গলিত কুষ্ঠ, হাত-পা গলে যাচ্ছে। তখন তাকে সে জিজ্ঞাসা করল, তোর এইরকম অবস্থা হল

কী করে? তখন লোকটি বলল, আমার কর্মফল আমাকে এই ভাবে ভোগ করতে হচ্ছে। রত্নাকর বলল, তোর কর্মফল। সে কী রে। লোকটি রত্নাকরকে বলল, হ্যাঁ, কর্মফল ভোগ করতে হয়। রত্নাকর বলল, আমি মানি না। লোকটি বলল, তোমাকেও মানতে হবে, সবাইকেই মানতে হয়। সেই কথা তখন মনে পড়ল তার যে, রাস্তার পারে সে ওকে দেখেছিল। ওর নাম ছিল দামু। সে ভাবল, দামুকে দেখেছিলাম রাস্তার ধারে পড়ে রয়েছে, আমারও তো ওইরকম অবস্থা হবে, তাহলে আমি কী করব! ব্রহ্মা ও নারদের কাছে ফিরে এসে সে বলল, বাড়িতে আমার কর্মফল কেউ নেবে না। তখন তাঁরা বললেন, তোমাকে বলেছিলাম তোমার এত কর্মফল জমা আছে যে সেই কর্মফল দেখেই আমরা তোমার কাছে এসেছি, তোমার যদি কোনও উপকার করতে পারি। রত্নাকর তাঁদের বলল, আমার উপকার করে তোমাদের লাভ? তাঁরা বললেন, আমরা লাভ-লোকসান কিছুই জানি না, আমাদের এই কাজ। যেমন বাতাস বয়ে যায়, তাতে লোকের উপকার হয়। যেমন সূর্য উঠে তাপ দেয়, আলো দেয়, তাতে সবার উপকার হয়। সূর্য তো তার বিনিময়ে কিছুই নেয় না, বাতাস তো কিছু নেয় না কারও কাছ থেকে। এই পৃথিবীতে আমরা হেঁটে বেড়াই পা দিয়ে, পৃথিবীর মধ্যে আমরা বাস করি। কত অত্যাচার করি, পৃথিবী কিন্তু কোনও প্রতিবাদ করে না। পৃথিবী সরে গেলে আমরা কি থাকতে পারব? কোথায় থাকব!

এইরকম দু'-একটা কথা বলার পরে রত্নাকর তাঁদের জিজ্ঞাসা করল যে, তাহলে আমার কী উপায় হবে বল? তাঁরা বললেন, তোমাকে উপায় বলতেই তো আমরা এখানে এসেছি। তুমি তো শুনছ না আমাদের কথা। তখন রত্নাকর বলল, তোমরা বল, আমি শুনব। নারদ বললেন, প্রভু, কী দিয়ে আরম্ভ করব? ও তো একেবারে অজ্ঞানের নিম্নভূমিতে বাস করছে, ওকে কী করে আপনি জ্ঞান দেবেন? ব্রহ্মা বললেন, দেখা যাক! নারদ তো রাম নাম জপ করেন, তিনি ভাবলেন, ওকে রাম নাম শেখাই কী করে! তাঁরা রত্নাকরকে বললেন, তোমাকে আমরা একটা মন্ত্র দিচ্ছি। রত্নাকর বলল, মন্ত্র কী? তাঁরা বললেন, একটা শব্দ, তা মন দিয়ে উচ্চারণ করলে মনের ভিতরে যে দোষগুলি আছে সেই দোষগুলি সরে যাবে। রত্নাকর তাঁদের জিজ্ঞাসা করল, কী করে? তাঁরা বললেন, তুমি উচ্চারণ করেই দেখ! রত্নাকর বলল, শব্দটা কী? তাঁরা বললেন—বল রাম। রত্নাকর উচ্চারণ করল আম। তাঁরা বলেন রাম আর রত্নাকর বলে আম। রত্নাকরের জিহ্বা এত জড় যে, সে রাম উচ্চারণ করতে পারছে না। আমাদের দেশে সুদূর গ্রামে যদি আমরা যাই, সেখানকার মানুষ যেভাবে কথা বলে, সেই কথাবার্তা কিন্তু খুব জড়। অনেক শব্দ তারা বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করে, ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না। জিহ্বা এত জড় বা stiff যে সব শব্দ ঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। এখানে জড় শব্দের অর্থ জিভটা খুব stiff, সব শব্দ স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। আমরা যে লেখাপড়া শিখি, ওই অ-আ-ক-খ থেকে আরম্ভ করে আস্তে আস্তে আমাদের জিভটা flexible হয়ে যায়। কথা বলতে বলতে, ওই শব্দগুলি উচ্চারণ করতে করতে

জিভটা flexible হয়। এইরকম ভাবে জীবনে ব্যবহারের দ্বারা আমাদের দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের কিছু কিছু বিকার শুদ্ধ বা refined হয়। একেই ইংরাজিতে বলে evolution, outer evolution, inner evolution, central evolution and total evolution। অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ব্যবহারের মাধ্যমে তার পরিশোধন (refinement/purity)। এই ভাবে পরিশোধিত হয়ে সে আবার অবিমিশ্র চৈতন্যসাগরে পৌঁছে যায়। যেমন নদী বহু দেশ দেশান্তর অতিক্রম করে কুটিল-জটিল পথে নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সাগরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়।

আমাদের প্রত্যেকটি জীবনকে, each and every individual life, whoever may be here or there or anywhere in the world will have to meet the Absolute, because Absolute is the eternal abode for all. That is the origin and that is the end of all. এই বাণীটি যদি ধর্মের মধ্যে না-থাকে, বিজ্ঞানের মধ্যে না-থাকে, দর্শনের মধ্যে না-থাকে, তাহলে আমরা কোনও কিছু দিয়েই মানুষের উপকার করতে পারব না। মানুষকে আমাদের এই চরম বাণী দিতে হবে যে, দেখ তুমি যত দোষই করে থাক, যতই অজ্ঞানী হও, পূর্ণতা নিহিত আছে তোমার অন্তরে। এই পূর্ণতাকে তোমার লাভ করতেই হবে। Rise up, get up—তুমি ওঠ, এই ভাবে চল। তাকে পথ দেখাবে কে? যিনি সাধু বা সৎ অর্থাৎ যিনি চিদ্‌স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপের সঙ্গে পরিচিত। এইরূপ আত্মজ্ঞপুরুষ আত্মার পরিচয় দিতে পারেন, আর অনাত্মা নিয়ে যারা মাতামাতি করে অনাত্মার পরিচয় তারা দেবে। সেইজন্য পাঠশালায় base level থেকে আরম্ভ করে আমরা দেখি পাঠশালায় গুরু, primary school-এর থেকে শুরু করে, lower primary, middle primary, upper primary, secondary, middle secondary, upper secondary, higher secondary, তার পরে diploma course, degree course, master degree পড়ানো হয়। এই teacher বা শিক্ষকের মানের তারতম্য আছে। এরা হচ্ছে সবই লৌকিক গুরু। সেইজন্য গুরুর চারটি স্তর, যথা—মহাগুরু, পরমগুরু, পরাৎপরমগুরু এবং পরমেষ্ঠীগুরু। পরমগুরু হচ্ছেন মাতাপিতা—the representative of God। 'এ' তা খুব সহজ করে মানুষের কাছে বলতে চেষ্টা করছে, কিন্তু মতবাদের গোঁড়ামি যাদের বেশি তারা সহজে তা নিতে পারছে না। মা-বাবা যে ভগবান এটা যে মানতে পারে তার তো রাস্তা পরিষ্কার। কারণ মা-বাবার ঋণ আমরা কিছু দিয়ে শোধ করতে পারি না।

আমরা অব্যক্তের মধ্যে ছিলাম bodyless অবস্থায়, সূক্ষ্ম অবস্থায়, সেখান থেকে আমাদের body নেবার জন্য সাহায্য করেছেন মা-বাবা and that is possible because মা-বাবার মধ্যে ভগবানের একটা বিরাট অংশ প্রকাশ হয়ে আছে। মা-বাবাও কিন্তু স্রষ্টা, ব্রহ্মার প্রতিনিধি। সেইজন্য মা-বাবা হচ্ছেন পরমগুরু। তার পরে আচার্যগুরু যিনি আমাদের পরবর্তী শিক্ষা দেন। মা-বাবা দেহ দিয়ে ছোটবেলায় লালন-পালন করে শিক্ষার যোগ্য করে বা তৈরি করে সন্তানকে শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত করে দেন, শিক্ষকের কাছে অর্পণ করেন শিক্ষাগ্রহণের জন্য।

আগে গুরুকুল ছিল, এখন school-college হয়েছে, নানারকম শিক্ষা ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেখানে আমরা কী শিখছি? প্রাকৃত পরিচয়। বহির্বিশ্বের রূপ-নামের পরিচয় শিখছি সেখান থেকে আমরা অর্থাৎ এটা কী, ওটা কী, এটা কী করে হয়—শুধু স্থূল ব্যাপার। তার পরে যখন সূক্ষ্ম ব্যাপার জানবার চেষ্টা করি তখন আমরা আরেক স্তরের গুরুর কাছে যাই। এই ভাবে আমরা দ্বিতীয় স্তরের গুরুর কাছে যাই, আচার্য গুরু ছেড়ে তৃতীয় স্তরে। দ্বিতীয় স্তরের গুরু হচ্ছেন পরমগুরু—মহাগুরু, পরমগুরু। তৃতীয় স্তরের গুরু হচ্ছেন পরাৎপরমগুরু অর্থাৎ ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করার জন্য যোগ্যতার মানকে বাড়িয়ে দিতে যিনি সাহায্য করেন। অর্থাৎ স্থূল জিনিসের পরিচয় দেন মাতাপিতা ও লৌকিক গুরু। সূক্ষ্ম জিনিসের পরিচয় দেন পরমগুরু, সূক্ষ্মতর জিনিসের পরিচয় দেন পরাৎপরমগুরু। সূক্ষ্মতম স্তরের পরিচয় দেন পরমেষ্ঠীগুরু। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আরও পরে বলা হবে। এখন শুধু এখানে উল্লেখ করা হল, কেননা প্রসঙ্গক্রমে তা এসেছে।

নারদ এবং ব্রহ্মা রত্নাকরকে শিক্ষা দিতে এসে প্রথমে একেবারে base level থেকে আরম্ভ করলেন। কী ভাবে? নারদ ও ব্রহ্মা রত্নাকরকে যখন রাম নাম উচ্চারণ করাতে পারলেন না, তখন চিন্তা করলেন যে, একে কী করে শিক্ষা দেওয়া যাবে! এ তো শব্দই উচ্চারণ করতে পারছে না, জড় জিহ্বা, 'র' উচ্চারণ করতে পারছে না! একে অমৃতস্বরূপ রাম নাম কেমন করে দেব! রাম নামের তাৎপর্য 'এ' পরে ব্যাখ্যা করবে। সেই সময় দূর থেকে শবযাত্রীরা একটা শব নিয়ে যাচ্ছিল। তা দেখিয়ে নারদ ও ব্রহ্মা রত্নাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, রত্নাকর ওটা কী যাচ্ছে? রত্নাকর বলল, মরা। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মরা! সেটা কী? রত্নাকর বলল, হ্যাঁ, মানুষ গত হলে তাকে নিয়ে গিয়ে আগুনে দাহ করা হয়। তা না-হলে বনে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে যায় এবং জন্তু জানোয়াররা তা খেয়ে ফেলে। তাঁরা দু'জনে রত্নাকরকে আরও জিজ্ঞাসা করলেন, আর কী করে? রত্নাকর বলল, অনেকে আবার মাটির নিচে গর্ত করে পুঁতে ফেলে। তখন তাঁরা বললেন, তুমি তো অনেককিছু জানো দেখি! রত্নাকর বলল, হ্যাঁ, আমি তা দেখেছি! তারপর রত্নাকর তাঁদের প্রশ্ন করল, ও আর বাঁচবে না? তাঁরা বললেন, না। তখন রত্নাকর জিজ্ঞাসা করল, তাহলে ও যে পাপ করে গেল ওর পাপগুলো কী হবে? তোমরা যে বললে, পাপ ভোগ করতে হয়, ও তো ভোগ না-করেই চলে গেল। নারদ ও ব্রহ্মা তাকে বললেন, ও কোথাও চলে যায়নি, আবার ওকে দেহ নিয়ে এসে পাপের ফল ভোগ করতে হবে। রত্নাকর জিজ্ঞাসা করল, কেন? তাঁরা বললেন, ওর কর্মফল যাবে কোথায়? তা তো সাথে সাথেই থাকবে। তখন রত্নাকর বলল, তাহলে আমি কী করব? আমি যে তোমাদের মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারছি না। তোমরা তাহলে আমার কী উপকার করতে এসেছ? তখন তাঁরা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ওই 'মরা, মরা'-ই উচ্চারণ কর। একেবারে base অর্থাৎ অজ্ঞান থেকে আরম্ভ করল, মানে death বা lifeless অবস্থা থেকে। The education starts from 'অ', অর্থাৎ অজ্ঞান থেকে। পরবর্তীকালে দেখবে যে,

এই 'অ'-ই অখণ্ড হয়ে গিয়েছে, যা অজ্ঞান তা-ই প্রজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। 'এ' তা-ই প্রমাণ করেছে সবার সামনে এক একটা stage ধরে ধরে।

সবারই ভিতরে বোধ আছে, শুধু বোধকে এদিক থেকে ওদিকে নেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ from right to left and from left to right। এবার দেখ তুমি কোথায়! মড়া উচ্চারণ করতে করতে রত্নাকরের মধ্যে রাম এসে গেল। তাহলে অমৃত লুকিয়ে আছে মৃত্যুর মধ্যে, অজ্ঞানের মধ্যে লুকিয়ে আছে জ্ঞান এবং তার সাক্ষী আমি। প্রত্যেকের ভিতরে আমি আছে। এই আমিকে বাদ দিয়ে অজ্ঞান নেই, জ্ঞানাভাস নেই, জ্ঞান নেই, বিজ্ঞান নেই এবং প্রজ্ঞানও নেই। এই বিষয় মানুষের কাছে নূতন করে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কারণ মানুষ এতদিন ধরে এই ভঙ্গিমায় ভাবনা করেনি। সে আমিকে বাদ দিয়েই সব জানতে চাইছে। আমরা কীরকম বোকা! এই প্রসঙ্গে আরেকটা ঘটনা এই শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দশ বন্ধু মিলে একটা জায়গায় যাচ্ছিল, দশবন্ধুর সবাই যুবক, খেলাধূলা করে, তারা সাঁতারও জানে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে মাঝখানে একটা নদী পড়েছে, খুব খরস্রোতা নদী। তখন তারা পরস্পরকে বলল যে, দেখ, এখানে তো পার হওয়ার মতো কোনও নৌকো দেখছি না, তো সাঁতরেই পার হয়ে যাই। তাদের মধ্যে একজন বলল, এই শীতের মধ্যে এতটা দূরে ওই পারে কী করে যাব? শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে যেতে রাজি হল। সবাই নদীতে নেমে সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে উপস্থিত হল। সবাই গুনছে যে তারা সবাই আছে কি না। প্রত্যেকেই গুনছে নিজেকে বাদ দিয়ে। প্রত্যেকেই গুনে দেখছে ন'জন হচ্ছে। Statement of fact বলা হচ্ছে! প্রত্যেকেরই একই ভুল হচ্ছে অর্থাৎ নিজের হিসেব পাচ্ছে না। So foolish we are!

এখানে অনেকেই বলতে পারে, এ তো জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে হবে না! 'এ' এই বিষয়ে আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরাও কখনও কখনও এরকম ভুল করেন। Einstein তো চরম বিজ্ঞানী, পৃথিবীর সর্বদেশের মানুষ তো তাঁকে greatest scientist বলে। Einstein-এর জীবনে দুটো ঘটনা আছে। একদিন তিনি ধোপাকে ডেকেছেন কাপড়চোপড় দেওয়ার জন্য। পাঁচটা বান্ডিল দিয়েছেন, প্রত্যেক বান্ডিলে ছয়টা করে কাপড়। ধোপা গুনে নিয়ে চলে গিয়েছে। ধোপা দেওয়ার সময় ছয়টা বান্ডিল দিয়েছে, তাতে পাঁচটা করে কাপড়। Einstein বাড়ি ছিলেন না, বাড়ি এসে দেখে ভৃত্যকে বললেন, একটা বান্ডিল বেশি। আমি পাঁচটা বান্ডিল দিয়েছিলাম। একটা বান্ডিল তার কাজের লোককে দিয়ে ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। পরে তিনি কাপড় গুনে দেখেন কাপড় কম আছে। তখন তিনি ভৃত্যকে বললেন, এ কী! আমি দিলাম পাঁচটা বান্ডিল, আমার তিরিশটা কাপড় থাকার কথা, সেখানে পঁচিশটা কাপড় আছে, আর পাঁচটা কোথায় গেল? তখন তিনি ধোপাকে ডেকে পাঠালেন। ধোপা তাঁকে বলল, আমি আপনার কাপড় সব কটা গুনে নিয়ে গিয়েছি। তিনি বললেন, তা হতেই পারে না! তার পরে ধোপা ভাবল, কি জানি, দেখি বাড়ি গিয়ে! সে বাড়ি গিয়ে দেখে একটা বান্ডিল রয়ে গিয়েছে। ধোপা সেই বান্ডিল নিয়ে তাঁর কাছে আসে। তিনি ধোপাকে বললেন, এটা তো

আমার বান্ডিল নয়।আমি তোমাকে পাঁচটা বান্ডিল দিয়েছিলাম, তুমি ছ'টা বান্ডিল পাঠিয়েছ কেন আমাকে? সে বলল যে, আপনি গুনে দেখুন আপনার সব ঠিক আছে কি না! যখন ছয়টা গুনছেন তখন মিলছে না। তিনি বারবার একই কথা বলছেন, আমি তোমাকে পাঁচটা বান্ডিল দিয়েছি তুমি ছ'টা বান্ডিল দেবে কেন? এটা একটা অদ্ভুত ঘটনা!

তাঁরই জীবনের আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। এতবড় একজন scientist, তিনি violin বাজাতে ভালবাসতেন এবং কুকুর পুষতেও খুব ভালবাসতেন। তাঁর বাড়িতে অনেকগুলো কুকুর ছিল। তার মধ্যে একটি কুকুরের বাচ্চা হয়েছে। সেই কুকুরের জন্য যে ঘরটা বানিয়েছেন, সেই ঘরের মধ্যে একটা gate ছিল। তিনটে/চারটে কুকুর ছানা ছিল। কিন্তু সমস্যা হল একটা gate দিয়ে কী ভাবে চারটে কুকুর ছানা আসবে? মিস্ত্রিকে ডাকা হল। তিনি তাকে বললেন, কুকুর ছানাগুলোর জন্য একটা ঘর করে দাও, তাতে পাঁচটা দরজা করবে। সে বলল, কেন? তিনি বললেন, আমি যা বলছি তুমি তা-ই কর। মিস্ত্রি এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। মিস্ত্রি ভাবল, পাঁচটা দরজা করলে তো একটা বিশ্রী জিনিস হবে, একটা দরজা দিয়ে কেন হবে না! বড় জোর দুটো দরজা করা যেতে পারে। চুপচাপ এই কথা ভাবতে ভাবতে দিন কেটে গেল। Einstein বাড়ি এসে দেখলেন, মিস্ত্রি গালে হাত দিয়ে বসে আছে। তিনি মিস্ত্রিকে বললেন, তুমি কাজটা এখনও করনি? সে বলল, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আপনি আমাকে help করুন! আমরা এখন সেই গল্প শুনে হাসি, কিন্তু it is a case that happened in the life of the greatest scientist। দ্বিতীয় দিনও মিস্ত্রি কাজ করল না, তৃতীয় দিন Einstein একেবারে রেগে গেলেন। তখন মিস্ত্রি বলল, Sir আপনি যা বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার ঘরে পাঁচজন বন্ধু যদি আসে, তবে তো একটা দরজা দিয়েই প্রবেশ করে। একজন সামান্য মিস্ত্রিকে এই জ্ঞান দিতে হল! তখন Einstein ভাবলেন, হ্যাঁ, তাই তো! মিস্ত্রি বলল, আপনার কুকুরের সঙ্গে সঙ্গে তার পাঁচটা বাচ্চাও তো মায়ের পিছনে পিছনে আসবে। তখন তিনি ভাবলেন, তাই তো! এ তো আমার মাথায় খেলেনি! তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্মের ক্ষেত্রেও আমরা same blunder করি যতক্ষণ পর্যন্ত না এই যথার্থ আমি-র পরিচয় অর্থাৎ শুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মার পরিচয় আমরা না জানি। যতক্ষণ সাগরে গিয়ে না-পৌঁছানো যায় ততক্ষণ আমাদের sense of individuality will prolong, nobody can get rid of it। রত্নাকর 'মরা, মরা' করতে করতে 'রাম'-এ পৌঁছে গেল।

আমরা অজ্ঞান দিয়ে আরম্ভ করে প্রজ্ঞানে পৌঁছে যাব। জ্ঞানীগুণীরা বলেছে, বাবাঠাকুর তুমি শাস্ত্র পড়নি, এই যুক্তি কোথায় পেলে? 'এ' যুক্তি নিয়েই জন্মেছে, 'এ' যোগযুক্তই আছে, 'এর' বিয়োগ হয়নি। 'এ' কাকে বিয়োগ করবে? নিজেকে বিয়োগ করবে কী করে? Can you subtract or minus you from yourself ? To do that you require another I and that is impossible. এই কথা শুনে সবাই চুপ করে গেল। আমি নেই,

বোধ আছে; আর বোধ নেই, আমি আছে—একটা example দিয়ে বুঝিয়ে দাও তো। 'এ' তো মহামূর্খ, তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। 'এ' শাস্ত্র পড়েনি, শিক্ষাদীক্ষা কিছু পায়নি, প্রয়োজনও হয়নি। এই কথা শুনে তারা বলল, শিক্ষা না-পেয়ে কী করে তা সম্ভব হতে পারে? উত্তরে বলা হয়েছিল, ঋষিদের কে শিক্ষা দিয়েছিল? তাঁরাই যে বেদ-বেদান্ত রচনা করেছিলেন। তাঁরা কোন school college-এ পড়েছিলেন? এই যুগে রমন মহর্ষি, রামকৃষ্ণদেব, আনন্দময়ী মা, এঁরা কি লেখাপড়া শিখেছিলেন? কবির, মহম্মদ কি লেখাপড়া শিখেছিলেন? একের পর এক মহর্ষির আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু তাঁরা পরমসত্যের সঙ্গে পরিচিত হলেন কী করে? যদিও তাঁদের জীবদ্দশায় they were not accepted and recognized । পরবর্তীকালে তাঁদের posthumous followers হয়েছে অনেকেই। আমরা সবাই posthumous followers। বাবাকে মানছে না, বাবার মৃত্যুর পরে বাবার oil painting করে, মূর্তি তৈরি করে, নামকরা একজন dignified person-কে নিয়ে এসে মালা দিয়ে আমরা নিজেরা credit নিই। কিন্তু living time-এ তাঁকে আমরা মানি না। This is another fault যার জন্য তাদের বলা হয়েছিল যে, দেখ 'এর' কাছে কিন্তু তোমাদের ধর্মজগৎ একেবারে crystal clear। ধর্ম বাইরে নেই, বাইরে কর্ম, ধর্ম অন্তরে—যে সবকিছুকে ধারণ করে রেখেছে। বাহির কিন্তু কিছু ধারণ করে রাখেনি। তোমার ভিতরে তোমার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত এবং তার সমষ্টি, এগুলোকে কে ধারণ করে রেখেছে? That is *Dharma* which is the sustaining principle, the supreme sustaining principle is called *Dharma*। ধারণ করার শক্তি একমাত্র ধর্মের আছে, আর কারও নেই। এই ধর্ম প্রত্যেকের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে, কেননা ধর্ম all-pervading। সনাতন ধর্ম all-pervading, man-made ধর্ম is sectarian।

তোমরা কিছু শব্দ উচ্চারণ কর, যেমন স্বয়ম্ভু, স্বয়ংসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ, পূর্ণসিদ্ধ। এই শব্দগুলো কোথেকে এল? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের গুরু কে? আজকে জগন্মাতার একটা মন্দির এখানে তৈরি হয়েছে। এই মাতৃবোধকে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করে, সেই মা-কে একসময় প্রশ্ন করেছিল 'এই আমি'—মা তুমি মা হলে কী করে? কোনও মায়ের ক্ষমতা আছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? মা হল কী করে? মা তো মা-ই। এটা স্বতঃসিদ্ধ। মা বললেন, আমি মা হয়েছি এটার উত্তর একমাত্র তুমি বলতে পারবে, আমি বলতে পারব না। তখন জিজ্ঞাসা করা হল, কেন? মা বললেন, আমি তো মা, আর তোমার ভিতরে মা শব্দটা উচ্চারিত হয়েছে, উদ্গীত হয়েছে এবং তুমি তার সমাধান তোমার মধ্যেই খুঁজে পাবে। কেননা আত্মার মধ্যে রয়েছে সমস্ত সিদ্ধান্ত, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বা সমাধান। তুমি যদি আত্মা হয়ে থাক তাহলে তুমিই তার উত্তর। এরপর 'এ' উত্তর খুঁজে পেল। 'মাতা আমি, পিতা আমি, আমি অনন্ত প্রকাশসন্তান, সবার মাঝে আমিবোধে আমি নিত্যবর্তমান।' এই আমি জগৎ জুড়ে, সমস্ত জগৎ আমি-র বক্ষে ওঠে, ভাসে, ডোবে। তোমার ভিতরে তোমার জানা-অজানা, জ্ঞান-অজ্ঞান, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা সবকিছুর মূলে তুমি, অর্থাৎ তোমার এই আমি।

-এই আমিকে বলা হয়েছে 'আত্মা, অ-তম, তম নয়, তমকে প্রকাশ করে যে তাঁর দ্বৈত নেই, তাঁ স্বয়ংপ্রকাশ, প্রকাশক বা অবভাসক।

বিশেষ বিশেষ অধিকারীপুরুষের মধ্যে দিয়ে এই কথাগুলো যখন প্রকাশ পায় তখন আমরা তাঁদের বলি ভগবান যেমন বুদ্ধ, যিশু, রাম, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব ইত্যাদি। কিন্তু চৈতন্য কি শুধু তাঁদেরই মধ্যে প্রকাশ হয়েছে? তাঁদেরই একমাত্র 'আমি' আছে, আর কারও কি আমি নেই? চৈতন্য নেই? যখন আবিষ্কার করা হল যে, আমিবোধে গড়া, আমিবোধে ভরা সর্বজীবন, তার design-pattern যখন পাল্টাচ্ছে আমিকে অবলম্বন করেই design-pattern পাল্টাচ্ছে। যেমন সোনাকে base করে যত design-pattern হয়, design-pattern ভেঙে ফেললেও আবার ঠিক সোনাই থেকে যায়, সোনা উড়ে যায় না, তেমনই আমি ছাড়া কখনওই আমি হয় না। দেহ পাল্টাচ্ছে, রূপ পাল্টাচ্ছে, ভাব পাল্টাচ্ছে এই আমিকে base করে। আমি আসছে নানা পোশাক পরে, যেমন আমরা প্রত্যেকেই পোশাক পাল্টাই। নানা পোশাক পরে আমি। আবার নতুন পোশাক পরে পুরানো পোশাক ছেড়ে দিই, কিন্তু আমি থেকেই যায়। এটা স্থূল দৃষ্টিতে বলা হল। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমারকে পোশাক করছে আমি। আমি uses the sense of myness, I uses the myness—আমি আর আমার। আমার ব্যবহার করলেই বৈচিত্র্যের মধ্যে আমি এসে গেল, তখন সংসার। যখন বৈচিত্র্যশূন্য তখন সমসার, রাত্রে ঘুমের মধ্যে আমরা সমসারে পৌঁছাই অল্প সময়ের জন্য। আর সমাধিবান পুরুষ সমাধির গভীরে যখন পৌঁছান তখন তাঁর নিদ্রার নিদ্রা হয়ে যায়। মৃত্যুরও মৃত্যু আছে। এই কথা শুনে একজন সাধু বলেছিলেন যে, বাবা এ কী দারুণ কথা বলছ তুমি। উত্তরে 'এ' বলেছিল, হ্যাঁ, when you are fully identified with the inmost Self death has nothing to do with you. But so long as you are a man you are subject to death. তুমি নিজেকে কোনটা ভাবনা করবে, মৃত্যুর অধীন না মৃত্যুর অতীত? তুমি দেহধারী না দেহাতীত? "দেহস্থোঽপি দেহাতীতম্ রূপস্থোঽপি রূপাতীতম্ নামস্থোঽপি নামাতীতম্ ভাবস্থোঽপি ভাবাতীতম্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলোঽহম্।" ভাব! ভাবতে ভাবতে তুমি দেখবে এই আমিই সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ, দ্বিতীয় কোনও সচ্চিদানন্দস্বরূপ নেই। আমি-র অতীত কেউ নেই, আত্মার অতীত কোনও আত্মা নেই। "ন বিদ্যা আত্মোপরি ন জ্ঞানম্ আত্মজ্ঞানাৎপরি ন দেব আত্মদেবাৎপরি।"

আত্মা মানে নিজের আমিবোধ, আমারবোধ নয়। I plus my or mine is *Jiva*. যেখানে আমারবোধের অধীন আমি সেখানে জীব, যেখানে আমারবোধের অধিপতি আমি সেখানে আমি শিব, অর্থাৎ আমি ঈশ্বর। আর যখন আমারবোধশূন্য আমি তখন আমি পরব্রহ্ম পরমাত্মা। এক আমি যেমন প্রত্যেকের আমি, কখনও শান্ত, নিষ্ক্রিয়, কখনও অশান্ত, সক্রিয়, কখনও অভিমানী, কখনও শোকগ্রস্ত, কখনও বা বিষাদগ্রস্ত, আবার কখনও হর্ষোৎফুল্ল, হর্ষযুক্ত, হাসি ঠাট্টার মধ্যে আছে। সর্বক্ষেত্রেই আমি কিন্তু আমি-ই রয়েছে, তার কোনও পরিবর্তন নেই।

যেই আমি শৈশব থেকে সর্ব অবস্থায় 'আমি, আমি' বলে আসছে, বার্ধক্যেও সেই আমি কিন্তু কখনও পাল্টায় না, জীবনে অন্য সবকিছু পাল্টায়। তার দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের বিকার হচ্ছে, কিন্তু আমি সাক্ষিরূপে থেকেই যাচ্ছে, because I is unborn, I cannot die. Death pertains to your body, mind, ego, but not to your Self. Self means pure I. এই আমি প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে। 'এ' সেই আমিকে তোমাদের ভাল করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। Don't forget your Real I which is divine, 'All Divine for All Time, as It Is', because that I is the only substance which is eternally pure, infinite One, immortal and homogeneous by nature। অর্থাৎ এই আমি-র মধ্যে দ্বিতীয় কোনও কিছুর মিশ্রণ নেই। 'আমার' যুক্ত হলেও 'আমি' কিন্তু আমিই থেকে যায়। 'আমার' উদয়-অস্ত, ক্ষয়-বৃদ্ধি, উৎপত্তি-নাশ বিকারাদি আছে। এসবের অধিষ্ঠান সাক্ষিরূপে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ অমৃত মুক্ত পাকা আমি চিরন্তন সনাতন। তার কোনও অভাব বিকারাদি হয় না। আমার বিকৃত হতে হতে একসময় লয় হয়ে যায়, কিন্তু আমি থেকে যায়। সমুদ্রের তরঙ্গ অনেক উঠছে আবার লয় হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সমুদ্র সমুদ্রই থেকে যাচ্ছে।

এই যে নিজের সত্য পরিচয় অখণ্ড ভূমা তা আমাদের শিক্ষার মধ্যে আনতে হবে in all respects। তাহলে আমাদের ভিতরে যত বিকারভাব তা আপনিই প্রশমিত হয়ে যাবে। কীরকম? যেমন অঙ্ক শিখতে গিয়ে আমরা নামতা মুখস্থ করি—যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ শিখি। শিখতে শিখতে অঙ্কের যে philosophy তার সঙ্গে পরিচিত হই, অর্থাৎ অঙ্কের দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। তার পরে অঙ্কের ব্যবহারবিজ্ঞান অর্থাৎ অঙ্ক দিয়ে আমরা অনেক জিনিসকে ধারণ ও পূরণ করি, সমস্যার সমাধান করি। আজকে এই যে building-গুলো হয়েছে তা অঙ্কের সাহায্যে, হিসাবের মাধ্যমে, মাপের পরিণামে সম্ভব হয়েছে। এগুলো আসল কোত্থেকে? সাংখ্য হচ্ছে জ্ঞান, তার থেকে এসেছে সংখ্যা। সংখ্যা হচ্ছে number। আমরা অঙ্ককে কেন base করি না? অঙ্ক হল more accurate to prove the truth of anything, কোনও জিনিসের সত্য পরিচয় পেতে হলে অঙ্কের সাহায্য নিতে হয়, পরিমাপের সাহায্য নিতে হয়, নতুবা যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় না। That is why geometrical proof, mathematical proof helps us so much to transcend the ignorance, defect and the fault or error that we do in all spheres of life, in all steps of life. প্রতিপদে আমরা যে ভুল করি তা শোধন করি higher or greater understanding দিয়ে। ভুল হয় অজ্ঞানের মাধ্যমে অর্থাৎ জ্ঞানের অভাবে। ভেদজ্ঞান হয় অজ্ঞানের মাধ্যমে জ্ঞানের অভাবে, কিন্তু জ্ঞান এসে গেলে ভেদটা সরে যায়। অন্ধকারের মধ্যে আমরা একটা গাছকেই মানুষ বলে ভুল করি। আমরা একটা দড়িকে, একটা কাপড়ের পাড়কে কিংবা একটা জলের আঁকা-বাঁকা সরু একটা স্রোতকে সাপ বলে ভ্রম করি। এগুলো হচ্ছে আমাদের যথার্থ জ্ঞানের অভাব। সেইরকম নিজেকে আমরা জীবরূপে ভ্রম করি নিজবোধের অভাবে, জগৎকে ভ্রম করি নিজবোধের অভাবে। কেননা নিজবোধের অতীত তো কোনও জগৎ নেই। জগৎ নিজবোধেরই

কতগুলো expression অর্থাৎ বহিরভিব্যক্তি। 'এ' এই নিজবোধকে আত্মবোধকে আমিবোধকে সবকিছুর উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই কথাগুলো বলছে, তাহলে সমাধান একসঙ্গে এসে যাবে।

প্রত্যেকেই আমরা সেই এক-এ ভরা, এক-এ গড়া। অর্থাৎ এক মানেই চৈতন্য। সেই চৈতন্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় যখন আমরা এক-এ প্রতিষ্ঠিত থাকি। কিন্তু আমার নিয়ে যখন এক বলে তখন আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা বিভক্ত হয়ে যায়। তার ফলে কী হয়? কতগুলো বিকার আসে। এই বিকার যখন আসে তখন এই আমি স্থির থাকে, আমারটা স্থির থাকতে পারে না। আমার আমিকে আঘাত করে। সেই আঘাতে যখন একটা প্রতিক্রিয়া হয়, তা হচ্ছে অহংকার বা অভিমান। কিন্তু Real I-এর কিছু হয় না, যেমন ভূমিকম্প হয়ে গেলে একটা শহর ধ্বংস হয়ে যায়, a city gets destroyed, কিন্তু আকাশ ধ্বংস হয় না, কেননা আকাশ সূক্ষ্মতম। স্থূল ভূত নষ্ট হয়ে গেলেও আকাশ নষ্ট হয় না, আকাশের বক্ষেই সমস্ত ভূত অবস্থান করছে। সেইজন্য আকাশ থেকে যায় নির্বিকার। সেইরকম বোধের কেন্দ্রে যে আমি, সেই আমি থেকে যায় নির্বিকার, কিন্তু আমারভাব ধ্বংস হয়ে যায়।

সব আমার একত্র করে নিয়েই সংসার। আমার যতই তুমি কমাবে সংসারটা ততই ছোট হয়ে যাবে। ঘুমের মধ্যে আমার ছোট হয়ে যায়, কেননা মনের বৃত্তিগুলি একত্র করে দিয়ে তার মধ্যে যে চৈতন্য প্রকাশিত হচ্ছে তা-ই হল সংসার। সেইজন্য নিজের বোধটাই চোখের মধ্যে দিয়ে রূপে রূপে প্রতিরূপে, কানের মধ্যে দিয়ে শব্দে শব্দে প্রতিশব্দে, নামে নামে প্রতিনামে, মনের মধ্যে দিয়ে ভাবে ভাবে প্রতিভাবে এবং বুদ্ধির মাধ্যমে নানা বোধে তা অনুভূত হয়। কিন্তু এর পশ্চাতে রয়েছে একটাই মাত্র জ্যোতি বা light of understanding। যেমন এই light-টাই (room-এর light-কে নির্দেশ করে) এখানে সবকিছুকে প্রকাশ করছে। এই light-টা বন্ধ করে দিলে কিন্তু এতগুলো প্রকাশ আর দেখা যাবে না। তাহলে বাইরের জিনিস দেখতে হলে বাইরের একটা light দরকার এবং আমাদের ভিতরে ইন্দ্রিয় আর মনের দরকার। কিন্তু অন্তরের জিনিস দেখতে গেলে তো বাইরের light-এর দরকার হয় না, মন ও ইন্দ্রিয়েরও দরকার হয় না। সেইজন্য স্বপ্নের সময় আমাদের বাইরের চন্দ্র-সূর্যের প্রয়োজন হয় না। দেহের ইন্দ্রিয়গুলো নিস্তেজ হয়ে থাকে, কিন্তু মন সৃষ্টি করে নূতন জগৎ। গাঢ় ঘুমের মধ্যে মন থাকে না বলে কোনও সৃষ্টি নেই, কিন্তু সৃষ্টির বীজ বা কারণ থাকে। আবার যখন আমরা জেগে উঠি সেই কারণ সঙ্গে সঙ্গে সব একসঙ্গে কার্যকরী হয়। এক second-এ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে এই total inner function-টা শুরু হয়ে যায়। এই মনের ঊর্ধ্বে যে আমি-র পরিচয় তা শুনে শুনে তবে সিদ্ধ হবে। ক্রিয়াকলাপ দ্বারা তা সিদ্ধ হবে না। ক্রিয়া করে দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন। আত্মা কিন্তু ক্রিয়াধীন নয়, নিষ্ক্রিয়। আত্মা রূপাধীন নয়, কিন্তু রূপের অবভাসক। আত্মা নামময় নয়, নামের অবভাসক। আত্মা কিন্তু ভাবময় নয়, ভাবের অবভাসক। কেননা আত্মার বোধ এই ভাবে গুণ এবং মনের

মাধ্যমে বহু ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হচ্ছে। কীরকম? Stage-এর সামনে কতগুলো footlight থাকে। Stage-এ যখন বাচ্চা ছেলেমেয়েরা নাচগান করে, তখন footlight-এর উপরে shade দেওয়া হয়। যেরকম shade দেবে colour-এর, light-টা সেরকমই আসবে। কাজেই 'আমি' হচ্ছে সেই pure light, তার সামনে মনের নানা রকম ভাবযুক্ত রং, সেই ভাব রং দিয়ে আমরা বৈচিত্র্যকে দেখছি বাইরে। মনের ভাব রংটি যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বৈচিত্র্য থাকবে না। আমরা ছোটবেলা থেকে এগুলোর সঙ্গে পরিচিত নই, এর পশ্চাতে যে রহস্য, অর্থাৎ সেই এক-এর বিজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি বা ভুলে গিয়েছি। সেই ভুল আমাদের শোধন করে নিতে হবে। অঙ্কে ভুল হতেই পারে। যদি first-step-এ ভুল হয় তাহলে যতগুলো step করবে সব step-ই ভুল হবে। আমরা জীবনে first step-এ ভুল করে বসে আছি! যা 'আমি' নই তা-ই নিজেকে ভাবি, আর যা 'আমি' তত্ত্বত বা যথার্থ তা নিজেকে ভাবি না। কাজেই 'আমি' যেখানে অকর্তা, সেখানে নিজেকে 'আমি' ভাবি কর্তা। 'আমি' যেখানে অভোক্তা, সেখানে 'আমি' নিজেকে ভাবি ভোক্তা। 'আমি' যেখানে অজ্ঞাতা, সেখানে 'আমি' নিজেকে ভাবি জ্ঞাতা। তত্ত্বত 'আমি জ্ঞানস্বরূপ পাকা আমি', সেই 'আমি' জ্ঞাতা সাজতে যাব কেন?

পাকা আমি-র স্বরূপ

কাজেই 'আমি'-র পরিচয় পাওয়া যায় Right Knowledge দিয়ে। Right Knowledge শব্দের অর্থ—'আমি' কর্তাও নই, ভোক্তাও নই, জ্ঞাতাও নই, 'আমি' শুধু সাক্ষিচৈতন্য। এই হল Right Knowledge। অর্থাৎ unmixed knowledge, unalloyed knowledge, uncontaminated knowledge, unlimited and unconditioned knowledge, এই হল 'আমি'-র যথার্থ পরিচয়। Conditioned হয়ে গেলে তার সঙ্গে 'আমার' যুক্ত হবে। কাজেই I + Mine and Mine + I দুটোই আছে। I + Mine and Mine + I এই দুটোর মধ্যে তফাত আছে। Mine + I হল জীব এবং I + Mine হলেন ঈশ্বর। আবার I – Mine হল ব্রহ্ম-আত্মা—এ-ই হল Real I (পাকা আমি)। প্রত্যেকের ভিতরে Real-I আছে, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে, চিদাকাশে—যেমন এই বাইরের ভূতাকাশে সবকিছুই আছে। এত বড় বড় এক একটা গ্রহ-নক্ষত্র, সূর্য একটা নক্ষত্র তার মধ্যে তেরো লক্ষ পৃথিবী স্থান পায়। এইরকম একটা বিরাট সূর্যকে আমরা এখান থেকে দেখছি কত ছোট্ট। এই সূর্য অপেক্ষা অনেকগুণ বড় নক্ষত্র আরো কত আছে, তাদের আলো এখানে পৌছোতে কত লক্ষ বছর সময় লাগে! একে বলে light years, অর্থাৎ তাকে জ্যোতির্বর্ষ বলা হয়। আমরা এখন যে light-টা দেখছি সেই light হচ্ছে এখন থেকে অনেক বছর আগেকার। এত দূরত্ব যে তা আমাদের মন নিতে পারে না। কিন্তু 'আমি'-র মধ্যে তা রয়েছে, বাইরে নেই। 'আমি'-র বাইরে কিছু নেই, 'আমার' বাইরে আছে। কারণ 'আমার' ভাগে ভাগে বিভক্ত। "অবিভক্তং বিভক্তেষু"—অর্থাৎ বিভক্তের মধ্যে 'আমি' হচ্ছে অবিভক্ত। আমাকে কেন্দ্র করে 'আমার' চারধারে বৃত্তাকারে ঘোরে নাম-রূপের আকারে। সে কে? আমার ভাব। আমাকে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ 'আমি'-কে বাদ দিয়ে 'আমার' কখনও সক্রিয় হতে পারে না, সিদ্ধ হতে পারে না,

কোনও বিষয়েই না। তার কর্ম, চিন্তা, ধ্যান, ধারণা সবকিছুই impossible। কাজেই 'এ' এমন একটা formula সবার সামনে রাখছে যা সমস্তরকম theory, thesis, doctrine-এর উর্ধ্বে। মানুষের all sorts of research work and their results সবকিছুর background হচ্ছে 'I'. 'I' is the background of all Consciousness. 'I' is the underlying essence of all our knowledge, 'I' is the life-pervading truth, the truth which makes everything existent. Every function, every action and every result, all are centered in the Real I.

এই 'আমি'-র প্রসঙ্গ সবার সামনে 'এ' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেন আনছে? কারণ কোন ভাবটা যে কার মনে লেগে যাবে তা সে মন দিয়ে বুঝতে পারবে না, নিজের আমিকে দিয়ে শুধু বুঝতে পারবে। একমাত্র প্রত্যেকের ভিতরে আমি তা বুঝতে পারবে। 'এ' আমি-র কথা বলছে আমি-র কাছে। আমি-র আমি-র কাছে কেউ নেই। All these are nothing but different manifestations of the same One 'I'. That 'I' is Brahman/Atman/Ishwara, Who is all-pervading, ever-present। কিন্তু শাস্ত্র বলছে—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", অর্থাৎ ব্রহ্মই সবকিছু হয়েছে, কিন্তু বাকি কথাগুলো শাস্ত্র বলতে পারছে না, অর্থাৎ শাস্ত্রে তা নেই। তা কী? 'for All Time, as It Is'! তাই এত দ্বন্দ্ব। সর্বসময়ে এক-ই রয়েছে, এরকম সত্য যদি আমরা জানি তাহলে কার সঙ্গে কার দ্বন্দ্ব হবে? Who will fight with whom, why and how when there is only One Self-I, transcendentally, centrally, inwardly and outwardly? বাইরে রূপে আমি, নামে আমি, ভাবে আমি, বোধে আমি—তাহলে আমি কার সঙ্গে ঝগড়া করব? এই যে বর্তমানে একটা দারুণ দুর্দিন জগতের ইতিহাসে, মানুষের ভ্রান্তিভীতি মৃত্যুভয়কে জয় করার দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই।

আমি মৃত্যুকে জয় করলাম তখনই যখন I know that I am immortal, I am the revealer of death। Death-কে আমি জানি as an object, object cannot supercede the subject। Object subject-কে overcome করতে পারে না। Everything is object to Me. একজন বলেছিল যে, আপনি এ কী বলছেন? আপনি রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এঁদের degrade করছেন? উত্তরে বলা হল, No, I don't degrade anybody. 'এ' সবকিছুকে আমি-র মধ্যে খুঁজে পেয়েছে, কাজেই all verily is I-Reality (Consciousness Itself), which is ever present, একটা form-এ আমি রাম হয়েছিলাম, একটা form-এ আমি কৃষ্ণ হয়েছিলাম, একটা form-এ আমি মহম্মদ হয়েছিলাম—তা তো একটা individual expression, but Real I is present in each and everybody as their own Self-I. কাজেই 'ঘট ঘটমে রাম হ্যায়'—এই কথার তাৎপর্য বা অর্থ এখানেই সিদ্ধ হয়, নতুবা নয়। কিন্তু 'ঘট ঘটমে রাম হ্যায়'—যদি তাই হয় তাহলে রামভক্তরা সবাইকে রাম মানতে পারছে না কেন? অতটুকু একটা পিতলের রামকে নিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর জীবন্ত রামদের মানতে পারছে না। এ কীরকম ধর্ম? এ কীরকম দর্শন ও বিজ্ঞান? একটা পাথরের থেকে মূর্তি

তৈরি করা হল, শিল্পীকে দিয়ে বা নিজেই কল্পনা করে নিজের ভাব দিয়ে, মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করা হল—তা তো মানুষের মনের বহিরভিব্যক্তি। আবার নিজেই তাকে পূজা করছে, তার মানে নিজের সঙ্গে নিজেই খেলছে, 'Sportful dramatic sameside game of Self-Consciousness'. কী করে তা অস্বীকার করবে? কিন্তু এই বোধ জাগ্রত হলে আমি-র ভিতরে reaction থাকবে না। যেমন একই ব্যক্তি দাবা খেলতে বসেছে, দুই side-এর খেলা, দুই side-এর চাল একজনই দিচ্ছে। সে কিন্তু impatient হয়ে যাচ্ছে না, সে কিন্তু excited হচ্ছে না, nervous হচ্ছে না বা agitated হচ্ছে না। আমি যখন আমি-র সঙ্গেই খেলা করব তখন আমি কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করব? এইরকম একটা সত্য, অদ্ভুত সত্য মানুষের কাছে একটা বাধা নিয়ে এসেছে ঠিকই। অনেকেই বলেছে, বাবাঠাকুর তাহলে সংসার চলবে কী করে? উত্তরে বলা হয়েছিল, as usual, যেমন চলছিল। যেমন একজন magician, অর্থাৎ যে magic খেলা দেখায়, সে আরেকজন magician-এর magic দেখতে গিয়েছে। সে দিব্যি enjoy করছে, knowing fully that all these are nothing but magical game. So when you are aware of your true Self you will enjoy your game which is occuring in each individual in different modes ever revealing spontaneously.

প্রত্যেকের মধ্যেই আমি/I-Consciousness ওঠে, ভাসে, ডোবে, খেলা করে। সাগরের বক্ষে সাগর তরঙ্গ লহরীর দ্বারা, তার rolling-এর দ্বারা disturbed feel করে না। The Pacific ocean, the waveless ocean and the ocean with waves are the same one ocean, so you are in many, you are in One, all the same. কী অর্থে? সত্যের অর্থে। সত্য দেশ-কাল, কার্য-কারণের অতীত। দেশ-কাল, কার্য-কারণ হচ্ছে মনের ভ্রম। আসলে কোনও দেশ-কাল, কার্য-কারণ নেই। Because you are the essence of all. There is nothing inferior to you, nothing equal to you, not to speak of your superiority. Superiority কোথা থেকে আসবে? আমিকে বাদ দিয়ে তা সম্ভব নয়, আমি দিয়েই তো আমি superior-কে বুঝছি, আমি দিয়েই তো আমি inferior-কে বুঝছি, আমি দিয়েই তো আমি সবকিছু বুঝছি, আমিকে বাদ দিয়ে কি কোনও কিছু বোঝা সম্ভব? সেইজন্য আমি-র মধ্যে প্রথম reveal করল idea অর্থাৎ ভাব। এই ভাব দিয়েই আমরা সবকিছু গড়ছি, যা-কিছু করছি I দিয়া, অর্থাৎ I + dea (idea), আমিকে দিয়া অর্থাৎ সবকিছুর মধ্যেই আমি নিত্যবর্তমান। 'এ' বালকের মতো কথা বলছে, কিন্তু the depth of My words, the light of My utterings are not so easy to understand। এখানে দ্বন্দ্ব নেই, আনন্দ আছে। ছোট শিশু আনন্দে নৃত্য করছে, খেলা করছে। প্রত্যেকের ভিতরে আমি নৃত্য করে চলেছে অনন্ত ভঙ্গিমায়। কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা কী করে বলবে? একজন master dancer dais-এর উপরে উঠে নানা ভঙ্গিমায় মুদ্রা, হাতের মুদ্রা দিয়ে dance করল, কোন মুদ্রা real, কোন মুদ্রাটা unreal, কোনটা superior, কোনটা inferior, এরকম judge করার কোনও ক্ষমতা আছে কারও? তাহলে এই যে নানা ভঙ্গিমায়, নানা দেহের মধ্যে দিয়ে লীলায়িত হচ্ছে

যে চৈতন্য তার মধ্যে inferior-superior বিচার করছে বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি কি সত্যি সত্যিই pure? কাজেই যখন আমরা অপরকে গ্রহণ করতে পারছি না তখনই আমাদের বিকার। সেই বিকারকে শোধন করি আমরা অপরকে স্বীকার করে। কাজেই অপরকে মান দিলে নিজের মান ছড়িয়ে যায়, তখন আর অপমান লাগে না। আর অপরকে মান না-দিয়ে নিজে মান নিলে পরে অপরের মানে আঘাত করা হয়। তখন তা নিজের কাছে এসে অপমানে পরিণত হয়।

আমরা ভুল করি, অপরের দোষ দেখি আর নিজের গুণগান গাই। কিন্তু মহৎ যাঁরা তাঁরা কী করেন? অপরের গুণগান করেন এবং নিজের দোষ দেখেন। আর যাঁরা পূর্ণ তাঁরা দোষও দেখেন না, গুণও দেখেন না। তাঁরা দেখেন 'I' exists everywhere। 'এ' কিন্তু conventional ধর্মের কথা বলছে না, দর্শনের কথাও বলছে না, বিজ্ঞানের কথাও বলছে না। 'আমি' আমিকে ব্যবহার করছে আমি দিয়ে। 'I' uses I, অর্থাৎ Consciousness is playing in Consciousness, with Consciousness, for Consciousness, by Consciousness. তার জন্য formula হচ্ছে Consciousness in Consciousness, of Consciousness, from Consciousness, for Consciousness, by Consciousness, with Consciouness, to Consciousness, on Consciousness and beyond, and beyond, beyond. This is the formula which can save the entire human community from all sorts of misery and trouble. জগৎ সেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, কোনও solution পাচ্ছে না। তারা একটা light পাচ্ছে না যা দিয়ে তারা অন্ধকারের মধ্যে চলবে এবং তার সমাধান খুঁজে পাবে। সমাধান আছে তার নিজেরই মধ্যে। কী দিয়ে? If there is any contradiction I am that, I is the cause of all effects. I is all effects and I is the cause. Cause থাকলে effect থাকবে। And I is also beyond cause and effect, both are I in essence. সমাধান হয় কি না তা এবার বুঝে দেখ! উভয় ভাবকে গ্রহণ করতে পারলে সমাধান হবে, না-হলে সমস্যা থেকে যাবে। এখন বলতে পার আমি ভাবব কেন? তুমি যদি সমাধান না-চাও তাহলে ভাববে না। কিন্তু সমাধান চায় না এমন একটা individual life আছে কি? মাতামাতি করছে সবাই নানা রকম ভাবে। সমস্ত রংকে মিলিয়ে এক রংয়ে নিয়ে আসা যায় কী ভাবে? সমস্ত ভাবকে, শব্দকে, রূপকে এক-এ কী করে নিয়ে আসা যায় তার বিজ্ঞান নানা ভঙ্গিমায় বলা হচ্ছে দীর্ঘকালযাবৎ। যদিও তা সহজে কেউ follow করতে চাইছে না, কিন্তু অমান্যও করতে পারছে না। I am for you all, though all of you are not for Me. But you have got One I, and that I verily is I-Reality.

আমি বাস করি সবার হৃদয়ে। 'আমি-র বক্ষে আমি-র প্রকাশ, আমি-র বিলাস, আমিবোধে সবেতে অবিরাম করি আমি অধিবাস। আমি-র লীলায় নিত্যযুক্ত আমি, আমিশূন্য হই না আমি।' আমি-র খেলায় আমি-র আনন্দ অনুভব করি একমাত্র আমিই। আবার দুঃখকষ্ট সেই আমি-ই মন দিয়ে ভোগ করে, কেননা তা আমি-রই মহিমা। যতরকম বৈচিত্র্য সত্তার সবই different expressions of One Consciousness। দুঃখও একটা অনুভূতি, সুখও একটা

অনুভূতি, আমরা যা-কিছু ব্যবহার করছি মন দিয়ে তা হল expression of One and the same Consciousness and that Consciousness is verily I am। আমিশূন্য কোনও অনুভূতি হতে পারে কি? তাহলে আমি কী করে বলি যে, এটা আমি অনুভব করছি! কী দারুণ! প্রত্যক্ষ সত্যকে আমরা অস্বীকার করি। তাই কিছু কিছু লোক বলছে যে, আপনি কী আমাদের দীর্ঘকালের ভাববোধ সব ভেঙে চুরমার করে দেবেন? উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, না 'এ' কিছু ভাঙতে আসেনি। 'এ' তোমার মনটাকে রাঙিয়ে দিতে এসেছে। কী দিয়ে? অখণ্ড পূর্ণ অদ্বয় আমিবোধের জ্যোতিতে। The light of Oneness, the Knowledge of Knowledge which reveals all, not knowledge of things, persons, actions, results, space, time, causation, events of nature and totality of all. সবকিছুই 'আমি'-র বক্ষে 'আমি'-রই প্রকাশ, আর কিছু নয়। This is the solution. তা মন দিয়ে একটু খেয়াল করলে পরে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, তা problem solve করার এক অভিনব solution! সমস্ত ধর্মমত, দর্শনের মত, বিজ্ঞানের মত সব একাকার হয়ে গিয়েছে। এর নাম হচ্ছে আমিসাগর। পাকা আমি তারই ঘনীভূত রূপ।

এক যে আমি বহুরে বানাই বহুর মাঝে থাকি সদাই
সব প্রকাশের অমিল ক'রে মিলনের তরে বারেবারে
মহামিলনের যজ্ঞশালা নাম-রূপের এই বিশ্বমেলা
সব প্রকাশের মিলন খেলা সব আবার একের লীলা
স্বভাবপ্রেমে ভালবাসায় সমান ক'রে সবারে মিলাই।।
যে-রূপে যে-নামে মোরে যে-ভাবে যে ভজন করে
সঁপে দিয়ে জীবন তার পূর্ণ ক'রে মোর তরে
থাকি আমি স্বমহিমায় এক হয়ে তার অন্তরে।
অভেদ সব রূপ সব নাম অমৃত সমান এক প্রাণ
সবেতে আছে মোর সত্তাই সবে গায় মোর মহিমাই।।

(বাউল—দাদরা)

Contradiction আর কী করবে? Can you deny your I? You can deny everything, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, দেবদেবী, ঠাকুর এসব না-ভাবলেও কিছু এসে যায় না। But you cannot deny your own existence which is the Reality of all manifestations. আমি নেই জগৎ আছে এটা কী করে সিদ্ধ হবে? আর জগৎ আছে আমি নেই তা-ই বা কী করে সিদ্ধ হবে? কাজেই এই বক্তব্যের মধ্যে আসল বস্তুটা কী, তা খুব ভাল করে খেয়াল করতে হবে। তা খেয়াল করার জন্যই বারবার 'এ' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা angle থেকে কখনও রূপের থেকে, কখনও নামের থেকে, কখনও বা ভাবের থেকে, কখনও বোধের থেকে, কখনও বহির্প্রকৃতি, কখনও অন্তর্প্রকৃতি, কখনও কেন্দ্রপ্রকৃতি, কখনও বা তুরীয়প্রকৃতি, কখনও জড় বা চেতন—এই ভাবে নানা ভঙ্গিমায় তোমাদের সামনে পরিবেশণ

করা হচ্ছে পরমতত্ত্বস্বরূপ আমি-র পরিচয়। কীসের জন্য? সবই চৈতন্যেরই প্রকাশ। এই যে চৈতন্যের বক্ষে চৈতন্যের অভিনয় তা হচ্ছে চৈতন্যের লীলা। 'রূপে নামে ভাবে বোধে খেলছে মা আমার।' মা মানে আত্মা। যিনি সবকিছুকে প্রকাশ করছেন, কিন্তু তিনি নারীমাত্র নন—প্রকাশক। "প্রজ্ঞা প্রসৃতা পুরাণী।" সবার হৃদয়ে বসে কী ভাবে তিনি প্রকাশ করছেন। 'স্বয়ং মাতা স্বয়ং পিতা স্বয়ং বন্ধু স্বয়ং ভ্রাতা স্বয়ং ইষ্টদেবতা। আবার স্বয়ং সবার আমি স্বয়ং অন্তরাত্মা।' কথাগুলি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে একটা নূতন ভঙ্গিমায় সবার কাছে রাখা হচ্ছে। তা না-শুনলে কিন্তু এই বিষয়ের অধিকারী কেউ হতে পারবে না। 'এ' প্রত্যেকের সত্য পরিচয়টি দিয়ে দিচ্ছে—what you are in Reality, but not what you are in expression or in appearance। বাইরে আমরা প্রত্যেকেই পৃথক, যেমন এই জায়গায় কতগুলো room তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটি room পৃথক। কিন্তু জমিটি এক, আকাশ এক। প্রত্যেকের বাড়িতে বসার ঘর, শোবার ঘর, পূজার ঘর, রান্নাঘর, আবার store house (store room) অর্থাৎ জিনিসপত্র রাখার ঘর এবং bathroom ইত্যাদি রয়েছে। সব ঘরের এক shape নয়, কিন্তু সব ঘরের মধ্যে আকাশ ও জমি এক। ঘরগুলো ভেঙে দিলে আকাশ থেকে যাবে একই রকম। কাজেই আমাদের দেহ নাশ হয়ে গেলেও আমাদের আমি কিন্তু সরে যাবে না—that is "আকাশবৎ, নিষ্কলোঽহম্, নির্মলোঽহম্, নিরঞ্জনম্"। এই আমিকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। *Caitanya* is untouched by anything because it is the eternal principle, the all-pervading, all-perfect infinite One of homogeneous nature. Homogeneous nature মানে তার মধ্যে কোনও heterogeneous function নেই। Heterogeneous nature হচ্ছে in mind, মনের মধ্যে বিকার নানারকম ভঙ্গিমায় আছে। যেমন সমুদ্রের উপরিভাগে unquiet surface movement অর্থাৎ উপরিভাগটা তরঙ্গায়িত বা লীলায়িত। তলদেশ শান্ত সুশীতল।

কাজেই প্রত্যেকের হৃদয়ে যে আমি-র সত্তা বা অস্তিত্ব তা হচ্ছে Witness Consciousness, ever-perfect, ever-transcendental, নিত্যসাক্ষী। কীরকম? 'বাকের সাক্ষী, প্রাণবৃত্তির সাক্ষী, বুদ্ধির সাক্ষী, বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী, চক্ষুর সাক্ষী নিত্য প্রত্যগাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলোঽহম্।' অস্বীকার কেউ করতে পারবে না! 'এ' কারও ধর্মমতপথে কিন্তু আঘাত দেয়নি। This is the only principle which is free from all pride and prejudice, free from all dogmas, all fanaticism, sectarianism, all individual theory, thesis, doctrine and intellectualism. এখানে বুদ্ধি দাস বা গোলাম। কার? অখণ্ড ভূমা আমি-র। এই বুদ্ধি পরমবোধির অধীন, পরমবোধিস্বরূপ আমি। I am that Absolute I and all else are my expressions. In Me they exist, in Me they play, in Me they dissolve again. আমি-র মধ্যেই তারা ওঠে, আমি-র মধ্যেই তারা খেলা করে, আমি-র মধ্যেই তারা লয় হয়ে যায়। I remain always the same without any contamination. আমি-র কোনও বিকার বা পরিণাম হয় না। এই আমিকে দার্শনিকরা বলে পরমতত্ত্ব,

বিজ্ঞানীরা বলে বিজ্ঞানসত্য, আবার ধার্মিকরা বলে আরাধ্য ইষ্ট, কেউ বলে ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর, কেউ নানা রকম দেবদেবীর নাম বলে। 'এ' সবগুলোর সারবস্তু 'আমি' দিয়ে নির্দেশ করছে। কিন্তু তা অসিদ্ধ করতে পারবে না কেউ, অস্বীকার করতে পারবে না কেউ।

আমিকে আত্মা-ব্রহ্ম না-বললেও চলতে পারে, তাতে কোনও ক্ষতি হবে না যদি আমিবোধে আপনবোধে সব মানার অভ্যাস দৃঢ় হয়। আমিকে প্রত্যেকের দরকার। আমি সোনার গয়না তৈরি করব অথচ সোনা বাদ দিয়ে, তা তো সিদ্ধ নয়। আমি রূপ-নাম-ভাবের খেলা খেলব চৈতন্যকে বাদ দিয়ে তা তো সিদ্ধ নয়। আর চৈতন্য তো আমাকে বাদ দিয়ে সম্ভবই নয়।

I is the Substratum of all, the underlying Essence of all. কাজেই বুদ্ধির সাক্ষী আমি, মনেরও সাক্ষী আমি, প্রাণবৃত্তির সাক্ষী আমি এবং বাইরের সমস্ত স্থূল বস্তু রূপেও আমি এবং সর্বাতীতরূপেও আমি অর্থাৎ 'চৈতন্য একোঽহম্'। কীরকম ভাবে? 'সর্বাত্মকোঽহম্, সর্বোঽহম্, সর্বশূন্যোঽহম্, সর্বাতীতোঽহম্। কেবল অখণ্ড বোধরূপ অহম্।' আমি হচ্ছে কেবল অখণ্ড বোধরূপ আনন্দ। এই 'আমি-র' থেকেই বোধ, আনন্দ, যা-কিছু আমরা বলছি সব প্রকাশ হয়ে পড়েছে। শক্তি-জ্ঞান-আনন্দ-প্রেম, কর্ম-যোগ-জ্ঞান-ভক্তি, অজ্ঞান-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান, রূপ-নাম-ভাব-বোধ, দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি, কলি-দ্বাপর-ত্রেতা-সত্য, ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বাণপ্রস্থ-সন্ন্যাস—এইরকম formula of four all are included in I-Reality। ১-এর থেকে ১৬-টা পর্যন্ত ঘর হচ্ছে মৌলিক। ১৬-র পরে যতগুলো সব এই ১৬-র মধ্যে পড়ে যায়। সেইজন্য 'এর' ভিতরে প্রকাশ হয়ে পড়েছে formula of one, formula of two, formula of three, formula of four, formula of five, formula of six, formula of seven, formula of eight, formula of nine, formula of ten, formula of eleven, formula of twelve, formula of thirteen, formula of fourteen, formula of fifteen, formula of sixteen. *Knowledge of Knowledge* বইটার ভিতরে 'এ' দর্শন, বিজ্ঞান আর ধর্মকে এক I-Principle/I-Reality-এর মধ্যে কী করে প্রকাশ করেছে তা বইটা পড়লে লোকে বুঝতে পারবে। অনেকেই বলেছিল, বইটা Nobel Committee-তে পাঠিয়ে দিলে এই বইটা accepted হতে পারে। উত্তরে বলা হয়েছিল, 'এ' কিন্তু ঐ সমস্ত করতে যাবে না। 'এর' প্রকাশ তোমাদের ভাল লাগলে তোমরা গ্রহণ করতে পার। বইটার second partও বেরিয়েছে। মানুষের যতরকম বিরুদ্ধ চিন্তা, তা কী করে এক-এ নিয়ে আসা যায় সেই formula এই বই-এর মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। মানুষ অনেককিছু চেষ্টা করছে, কিন্তু সমাধান অজ্ঞাত রয়েছে। ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব এই নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। কিন্তু all *Tattvas* যে একতত্ত্বেরই প্রকাশ তা সবাই জানে না, সেই একতত্ত্ব হচ্ছে আমিতত্ত্ব। তা অহংদেব বা পুরুষোত্তম। কী রকম? তা আপনবোধে ব্যবহৃত হয়। আপনবোধের ব্যবহার দ্বারা অদ্বয়বোধ সক্রিয় হয় অর্থাৎ পাকা আমি প্রজ্ঞানঘন, নিত্যাদ্বৈত, স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ। আপনবক্ষে আপনবোধে আপনি স্বয়ং আপনাকে নিয়ে আপন আনন্দে লীলায়িত। আমি তত্ত্বস্বরূপ পাকা আমি সর্বতত্ত্বের সার,

সর্ববোধের কেন্দ্র সাক্ষী স্বয়ংপ্রকাশ নিত্যসত্তা। একটি উদ্গীত গানে তার স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে—

আপন স্বরূপে পূর্ণ আপন
স্বয়ংপ্রকাশ ভূমা স্বয়ং।।
আপন প্রেমে আপন সদামগন
আপনবোধে আপন অনন্য পরম।।
আপন ভাবে খেলে স্বয়ং প্রকাশে মহিমা আপন
আপনবোধে করে গ্রহণ সর্বপ্রকাশ আপন।।
আপনবোধে করে ধারণ আপনবোধে করে আস্বাদন
আপনবক্ষে আপন স্বয়ং নিত্য করে বিচরণ।।
আপনে আপন চিদানন্দঘন সৌম্য শান্ত সর্বসম
আপন অধিক নাহি অন্য আপনতা আপন ধর্ম।।
আপন মহিমা সমদরশন কালাতীত অনুপম
আপন সত্তা সনাতন নিরঞ্জন চির মৌন
আপন সত্তা সনাতন নিরঞ্জন সচ্চিদানন্দঘন।।

(আড়ানা—তেওড়া)

প্রত্যেকের আমি-র পরিচয় সম্বন্ধে বলা হল। কিন্তু এর মধ্যে কোনও মতপথের একটুও সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ কিছু নেই। This is the quintessence of all—the summum bonum of all human endeavour, human culture, human research and enquiry. This is the essence of Self-enquiry অর্থাৎ 'স্বস্বরূপ অনুসন্ধানম্', আপনার অনুসন্ধান। আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় এসেছি? কেন এসেছি? কোথায় যাব? কেন এরকম হল? এই সমস্ত প্রশ্নের একমাত্র answer 'I-Reality পাকা আমি'। কীসে? আমি দেশে, আমি কালে, আমি কার্যে, আমি রূপে, আমি নামে, আমি ভাবে, আমি বোধে, আমি স্থূলে, আমি সূক্ষ্মে, আমি সূক্ষ্মতরে, আমি সূক্ষ্মতমে, আমি বাইরে, আমি অন্তরে, আমি কেন্দ্রে, আমি তুরীয়তে, আমি অজীবে, আমি জীবে, আমি দেবতার মধ্যে, আমি শিবে, আমি আত্মা-পরমাত্মাতে, আমি সসীমে, আমি অসীমে, আমি অখণ্ড ভূমা, 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং'। This is the truth of your Real-I. প্রত্যেকের ভিতরে আমি কী ভাবে আছে তাই বলা হল। Can you deny 'I' of 'I'? This will solve all the problems created by human mind all over the world and humanity will be saved and also be transformed into divinity and enjoy the eternal Reality as Oneness of Knowledge/Knowledge of Oneness.অর্থাৎ অদ্বয়বোধে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে তুমি দেখবে, তুমিই ছিলে, তুমিই আছ, তুমি নিত্যবর্তমান, দ্বিতীয় কেউ নেই। 'আপনবোধে সব আপন হয়ে যায়/আপনশূন্য আপন কভু নয়/আপনতাই আপনতার পরিচয়/আপনতা আপন ধর্ম।' আপনকে আপনই প্রকাশ করে, তার কতখানি মহিমা। আমরা এই আপনকে

খুঁজে বেড়াই, কোথায় আমি? কোথায় আমি? তাই বলা হয়েছে, "কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ। কস্য ত্বং কঃ কুত আয়াতস্তৎ ত্বং চিন্তয় যদিদং ভ্রাতঃ।।" হে ভাই, একবার বিচার করে দেখ কে তুমি? কে তোমার মাতা? কে তোমার পিতা? কোথা হতে এসেছ? কেন এসেছ? কারণ কী? If cause verily you are then action also verily you are এবং 'কুতঃ আয়াত মত্তঃ পরতর নান্যৎ কিঞ্চিৎ'—যখন আমা অতিরিক্ত কিছু নেই তখন 'মত্তঃ সর্বম্, অহমেব সর্বম্, ময়ি সর্বম্, সর্বতোহি অহম্'। অর্থাৎ আমাতেই সব, সবেতে আমি। আমার (আমাতে—in Me) মধ্যেই সব, সবার মধ্যেই আমি। আমিই সব, সবই আমি। 'এর' কথাগুলি বুদ্ধির jugglery নয়। এটা তোমাদের সমাধান। যদি তোমাদের কোনও problem থাকে বলে মনে কর তাহলে এই কথাগুলো সেই problem-এর solution। এখানে তোমার হিং টিং ছট মন্ত্র অসিদ্ধ। Because all *Mantras*, all formulas other than your I cannot give you the solution. একথা শুনলে নিশ্চয়ই মতবাদের সাধক এবং নেতারা 'একে' বরদাস্ত করবে না। কিন্তু সত্য তো কারও অধীন নয়, আমি তো কারও অধীন নয়। আমার অধীন সব।

আমি কিন্তু body-র অধীন নই। পোশাকের মতো body-টা সবাই পরেছে, 'এও' পরেছে। বহুবার body পরে সবাই এসেছে, 'এও' এসেছে, সবাই তা ভুলে গিয়েছে, কিন্তু 'এ' তা ভোলেনি—এটুকুই তো তফাত। সেই ভুলের শোধনটা first step-এই করে দেওয়া হচ্ছে যাতে পরবর্তী step-এ ভুলটা না-হয়। অঙ্কের first step-এ ভুল করলে পরবর্তী সবকটা step ভুল হবে। আমাদের জীবনে তা-ই করছি আমরা। প্রথম step-এ আমিকে আমরা ভুলে গিয়েছি। কিন্তু আমাদের ধর্মজগৎ, বিজ্ঞানজগৎ আর দর্শনজগৎ এই solution-টা কেউই দিতে পারছে না, সবাই হাতড়াচ্ছে। জীবনভর পরিশ্রম করে গেল, জীবনের শেষে দেখল কিছুই নেই, I am landed nowhere। অর্থাৎ যা মনে কল্পনা করেছিল তা মিলল না। আমার মনগড়া হরি, মনগড়া ঠাকুর, মা, গুরু যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ান তবে মনে করলাম, আমার সব সমাধান হল। কিন্তু সেই মনগড়া ঠাকুরকে দেখেও তো মন মানে না। তখন বলে, ঠাকুর তুমি এইরকম কেন করলে? তুমি আমার জীবনে এই দুঃখকষ্ট কেন দিলে? তোমার একটু লজ্জা করে না? অনেকেই বলে, একবার পেলে হয় সেই ভগবানকে, দেখে নেব! এক পাগল ঠিক এইরকমই বলেছিল। সেই পাগল কীরকম ভাবে ভগবানকে attack করল! ভগবান বললেন যে, তুই আমাকে ডেকেছিস তাই তোর কাছে এসেছি। সে বলল, তোমাকে তো আমি ডাকিনি। ভগবান বললেন, সে কী রে! পাগল বলল, না, আমি তো আমাকে ডেকেছি। ভগবান তখন বললেন, তুই এতক্ষণ ডাকলি, আমি তো সেজন্যই তোর কাছে এসেছি! পাগল বলল, আমি তোমাকে ডাকিনি, তুমি কে? আমি তো তোমাকে চিনি না। তুমি এসে যা ইচ্ছা তাই বলবে আর আমি তা মেনে নেব? আমি তোমাকে চিনি না। ভগবান বললেন, তোকে তুই কি চিনিস? সে বলল যে, এই যে আমি তোমার ভিতরে তুমি হয়ে আছি, তোমার আমি হয়ে আছি! ভগবান ভাবলেন, এই পাগলকে কী করে শায়েস্তা করা

যায়, ও তো আমার মুখোশ খুলে ফেলে দিয়েছে! তখন ভগবান বললেন, যেই তুমি সেই আমি, যেই আমি সেই তুমি। তা তুই যেমন জানিস আমিও তেমন জানি। তুই যেমন মানিস আমিও তেমন মানি। তাহলে ভেদ রইল কোথায়? ভগবান ভক্তের দাস, অনেকে এই কথা বলে। ভক্ত ভগবান ছাড়া সত্য আছে কি এবং সত্য ছাড়া কেউ বাঁচে কি? এই সত্যই হল পরমতত্ত্বস্বরূপ আমি।

'একে' একজন জিজ্ঞাসা করেছিল যে, বাবাঠাকুর তুমি কোনও দীক্ষা দাও না, তোমার কাছে এত সব লোক দেশ বিদেশ থেকে আসে, কিন্তু তুমি কাউকে তো দীক্ষা দাও না! উত্তরে তাকে বলা হয়েছিল, দীক্ষা কাকে দেব? 'এ' 'এর' সমানই কাউকে পায়নি, 'এর' থেকে ছোটও কাউকে পায়নি, 'এর' থেকে বড়ও কাউকে পায়নি। 'এ' একা, একাই আছে সবার মধ্যে। কাকে দীক্ষা দেবে 'এ'? How is it possible? এই কথা শুনে সে বলল, সে কী! তোমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে। উত্তরে তাকে বলা হল, হ্যাঁ খারাপের অর্থ যদি শোন তাহলে তুমি বলবে, আমিও সেই খারাপ হব! তোমরা শব্দগুলো ব্যবহার কর আমিকে বাদ দিয়ে। তত্ত্ব হচ্ছে আমি। অর্থাৎ বোধস্বরূপ হচ্ছে আমি। তুমি যে শব্দটা ব্যবহার করলে তার বোধটা যদি তুমি অনুভব না-কর তাহলে তুমি আমাকে বাদ দিলে। আমি ভুল করলাম কোথায়! সে বলল, তুমি এত রসাল কী করে হলে? তখন তাকে বলা হল, দেখ, তোমার কথা শুনে 'এর' হাসি পাচ্ছে। এই যে তুমি জিজ্ঞাসা করছ তা যেন অনেকটা এরকম—তুমি সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করছ তোমার এই তরলতা স্নিগ্ধতা বা এই জলীয় ভাব কোথায় পেলে? আগুনকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছ যে, আগুন তোমার তাপ আর জ্যোতি কোথায় পেলে? সূর্যকে জিজ্ঞাসা করছ, তোমার এই তাপ আর জ্যোতি কোথায় পেলে? বায়ুকে জিজ্ঞাসা করছ বায়ু তোমার এই যে সর্বব্যাপী নিরলস প্রবহমানতা এ তুমি কোথায় পেলে? আকাশকে জিজ্ঞাসা করছ, হে আকাশ তুমি তোমার এই সূক্ষ্মতা, সর্বব্যাপ্তভাব কোথায় পেলে? পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করছ, পৃথিবী তোমার এই সর্বংসহিষ্ণুতা তুমি কোথায় পেলে? কী জবাব দেবে তারা? তারা বলবে, আমরা যা তা-ই। এগুলো আমাদের স্বরূপ। 'একে' যখন জিজ্ঞাসা করছ তখন 'এ' বলবে যে আমিও তাই অর্থাৎ আমি আমিই। Self-I is verily that, what you can think over, what you can decide and decide not all verily Self-I is. Self-I is all positive and all negative. দুটোই বোধেরই ব্যবহার। এই ভঙ্গিমায় পূর্বে দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্মকে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এভাবে যদি মানুষ ব্যবহার করে তাহলে এই contradiction সরে গিয়ে আবার সেই যে প্রচলিত সত্যযুগের কথা বলা হয়, all truth আবার প্রকাশ হয়ে পড়বে only on the basis of this application। এখানে আর কোনও individual ধর্ম-মত-পথ-দর্শন-বিজ্ঞান দিয়ে কোনও কাজ হবে না। এই বিজ্ঞান কী করছে? অনেক উপরে উঠছে আবার ডিগবাজি খেয়ে পড়ছে।

আজকাল আমেরিকা একটা দারুণ দুর্দিনের সঙ্গে মোকাবিলা করছে। কেননা তাদেরই আবিষ্কৃত বিজ্ঞান তাদেরই সর্বনাশ টেনে নিয়ে আসছে, কোনও উপায় নেই। কেননা এই

বিজ্ঞান ধ্বংসেরই বিজ্ঞান, সৃষ্টির বিজ্ঞান তারা আবিষ্কার করতে পারেনি। আমাদের দেশের ঋষিদের প্রবর্তিত পথ আমরা হারিয়েছি। আমরা অসুরদের পথ বেছে নিয়েছি, আমরা অসুর হয়ে গিয়েছি। বোধস্বরূপ আমিতে যেই রং লাগাবে সেই রংই প্রকাশ হবে, যে ভাবনা করবে সেই ভাবনাই অনুভূত হবে। Consciousness is that substance which takes the shape and appearance of that which mind thinks over. মন যা ভাবনা করে ঠিক সেই ভাবেই বোধ খেলা করে, কিন্তু তাতে বোধের কিছু পরিবর্তন হয় না। মন লাফালাফি কিছুক্ষণ করে, তারপর কাবু হয়ে পড়ে। কারণ মনের নিজস্ব কোনও জ্যোতি নেই, তা ধার করা, হাওলাতি করা জ্যোতি। অর্থাৎ reflection দিয়ে সে কাজ করছে, reflector-কে সে চেনে না। কাজেই মনকে উল্টো করলে হয় নম অর্থাৎ ন মম। মন মানে আমার, আমারভাববোধই হল মন। আর উল্টো করলে পরে ন মম, আমার নয়। আরেকটা কী? ন-ম, 'ন' মানে নমস্কার, 'ম' মানে মাধব, 'ম' মানে মহেশ, 'ম' মানে মা, 'ম' মানে মহৎ। আমাদের ভারতীয় দর্শনবিজ্ঞান, ভারতীয় শিক্ষা আদর্শে চারটে দিক আছে। একটা হচ্ছে শৈবমত, একটা শাক্তমত, একটা বৈষ্ণবমত, আরেকটা গুরুমত বা গুরুবাদ, অর্থাৎ শৈববাদ, শাক্তবাদ, বৈষ্ণববাদ, গুরুবাদ। 'ম' সব-বাদের মধ্যেই আছে। মহেশ শৈব, মাধব বিষ্ণু বা বৈষ্ণব, মা শাক্ত, মহৎ গুরু—চারটিই আছে। এই চারটি 'আমিতত্ত্বের' পরিচয়। চতুষ্পদ ব্রহ্ম মানে চতুষ্পদ 'আমি'। আমি স্থূল, আমি সূক্ষ্ম, আমি সূক্ষ্মতর, আমি সূক্ষ্মতম। তা formula of four-এর মধ্যে পড়ে গেল। পঞ্চতত্ত্ব আমি, পঞ্চপ্রাণ আমি, পঞ্চভূত আমি এবং পঞ্চকোষ আমি। এগুলো formula of five-এর মধ্যে পড়ে। এগুলি একটা একটা করে বললে পরে *দেখা যাবে খালি বোধেরই কতগুলো ব্যবহার।*

এক মাটি দিয়ে কুমোররা এত প্রতিমা তৈরি করছে, মনের ভাব দিয়ে আমাদের চাহিদা মিটিয়ে দিচ্ছে। কতরকম রূপ, design-pattern তৈরি করছে, উপাদানসত্তা কিন্তু সবেতে একই মাটি আছে। শিল্পীরা কতরকম ছবি আঁকছে—একটা background কিন্তু permanent থাকতেই হবে—সে দেওয়ালই হোক, কাপড়ই হোক, কাগজই হোক। সেইরকম জীবনের বৈচিত্র্যখেলা সম্ভব হতে পারে একমাত্র বোধময় আমি/আমিময় বোধের background থাকলে পরে। সে হিন্দু, পার্শী, ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, *বৈশ্য, শূদ্র এবং মানুষের যতরকম* possible thoughts, ideas, actions and results এসবই শুধু কতগুলি আমিময় বোধের অভিনয় এবং সেই বোধস্বরূপই হচ্ছে 'আমি'—আমি-র অভিনয়। 'এ' কথাগুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে। 'I' is the centre, 'I' is the background, 'I' is the underlying essence—*যে যা ভাববে।* (Individual আমি হলে I am হয় এবং universal-I ও transcendental-I-এর ব্যবহার is দিয়ে হবে, am *দিয়ে নয়)। তোমার ইষ্ট বা দেবতা তোমার আপনস্বরূপ, সবই এই বোধময় আমি* অহংদেব, অহংকার নয় কিন্তু। কাজেই তোমার গুরু, ইষ্ট ঐ এক জায়গায় একাকার। সেখানে *কিন্তু পৃথক আর কারও অস্তিত্ব নেই। একজন সাধু 'একে' বলেছিলেন যে, তুমি তো খালি*

অভিশাপ কুড়োবে। উত্তরে বলা হয়েছিল, 'এ' তো অভিশাপ কুড়াতেই এসেছে। অভিশাপ কুড়িয়ে 'এ' যা ছিল তাই থেকে যাবে। নীলকণ্ঠ বিষপান করেছিলেন বলে মানুষ বেঁচে আছে, নইলে কেউ বেঁচে থাকত না। অভিশাপ কুড়িয়ে 'এ' নেবে। কেউ অভিশাপ নেবে না। ভগবানের বিশেষরূপ যখন 'এর' কাছে প্রকাশ হয়েছিল তখন তাঁকে বলা হয়েছিল, দেখ তুমিও কিন্তু 'এর' থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে না। তখন তিনি বললেন, তুমি যা চাও তাই তোমাকে আমি দেব। উত্তরে তাঁকে বলা হয়েছিল, 'এ' তো কিছু চাইছে না। তিনি তখন বললেন, না তবু তোমাকে কেমন যেন আমার কিছু দিতে ইচ্ছা করছে! তখন তাঁকে বলা হল, কী দেবে তুমি? তোমার দেবার কী ক্ষমতা আছে? তুমি অংশ দেবে। অখণ্ডকে দেবে কেমন করে? অখণ্ডতা আমি নিজেই। সমুদ্রকে নদী এসে বলছে, আমি তোমাকে দিচ্ছি নাও। তুমি না-দিলেও আমি সমুদ্রই থাকব, দিলেও আমি সমুদ্রই থাকব, আমি বাড়ব না—no increase and no decrease of this I। কী দেবে তুমি আমাকে? তিনি বললেন, তুমি যা চাইবে। উত্তরে বলা হল, 'এর' তো চাওয়াই আসছে না। 'এ' চেয়ে থাকতে পারে, তুমি যেমন খুশি খেলছ খেল, 'এ' দেখবে। I is the eternal witness, আমি শুধু দ্রষ্টা বা সাক্ষী। 'আমি' বুক পেতে দিয়ে আছি, আমার বক্ষে মা নৃত্য করে চলছে। 'আমি' দেখেই যাচ্ছি। কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে মা নাচুক দেখি! 'কোথায় নাচবি মা শ্যামা যদি বক্ষখানা না পাস আমার।' কাজেই আমিই শক্তি, আমিই সত্তা। এটাই আসল সমাধান। বোধময় আমি-র কোনও সমস্যা নেই, কিন্তু অহংকারের আমি-র সমস্যা বহু, সমবোধ বা অদ্বয়বোধের অভাবে। দ্বৈতবোধে ভেদ বা পার্থক্যই হল তার বৈশিষ্ট্য। তাতে সমস্যা হল—শক্তি আলাদা, সত্তা আলাদা; রূপ আলাদা, নাম আলাদা, ভাব আলাদা; বাহির আলাদা, অন্তর আলাদা, কেন্দ্র আলাদা; স্থূল আলাদা, সূক্ষ্ম আলাদা, কারণ আলাদা, সূক্ষ্মতর আলাদা—এইরকম ভেদ শুধু ইন্দ্রিয়ে আর মনে। গাঢ় ঘুমের মধ্যে যখন তুমি তলিয়ে গেলে তখন কোথায় তোমার ভেদ, কোথায় সংসার!

একজন বৈষ্ণব 'একে' অভিশাপ দিয়েছিল। কেননা 'এর' কথাবার্তাগুলো তো মার্জিত নয়। লেখাপড়া তো শেখেনি, মূর্খ তো! পড়াশুনা করা হয়নি, কাজেই কথাবার্তার মধ্যে কোনও ভদ্রতা নেই, অভদ্র, No 1 চাষী। 'এ' মানবজীবনের উপরে চাষ করে। আবাদ ফলাই কী? আত্মজ্ঞান। এই চাষী শুধু আত্মজ্ঞান ফসল ফলায়, আর কিছু নয়। আমি সাধুও না, কেননা আমি অসাধু হইনি, সাধু হতে যাব কেন? আমি জ্ঞানী নই। কেননা আমি অজ্ঞানী হইনি তাই। আমি ধার্মিক নই। কেননা আমি অধার্মিক হইনি। আমি বিজ্ঞানী নই, কেননা অজ্ঞান আমাকে গ্রাস করেনি। আর আমি দার্শনিক নই, কেননা আমি পণ্ডিত হতে চাইনি। তাই পণ্ডিতদের সামনে বলা হয়েছিল যে, "সর্ব কর্মং পণ্ডং করোতি য স এব পণ্ডিতঃ মূর্খঃ"। তা 'এ' হতে রাজি নয়। পণ্ডিতরা সর্বকর্ম পণ্ড করে দক্ষিণা নিয়ে চলে যায়। কী পণ্ড করল? সে তোমরা বুঝবে, পণ্ডিতদের নিয়ে যখন তোমরা কারবার করবে তখন। "পণ্ডা ইতি বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির্যস্য স পণ্ডিতঃ ইত্যুচ্চতে" নিত্য বর্তমান এই আমিতে। 'পণ্ডা ইতি বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি'—অর্থাৎ বেদ যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত। কী ভাবে? বেদনার মধ্যে। I is the ঘনীভূত বেদনা।

জগতে বেদনার ঘনীভূত রূপটাই হচ্ছে আমি। এই ঘনীভূত বেদনার মধ্যে বেদন জেগে উঠেছে। অন্তরে আকার সরে গিয়ে বেদন হয়েছে, কেন্দ্রে 'ন'-টা সরে গিয়ে বেদ হয়ে গিয়েছে। আর তুরীয়তে জাতবেদা অর্থাৎ বেদে। 'এটা' বেদে। বেদেরা ঘুরে বেড়ায়। তাদের বাড়ি ঘর নেই। কোথায় থাকবে 'এ'? সবার মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন কথায় কথায় সবার সামনে একজন বলেছিল যে, তুমি তো একটা পাগল No 1! উত্তরে তাকে বলা হয়েছিল, ঠিকই বলেছ! 'এ' তোমাদের কথা সব মেনে নিচ্ছে। পাগল তো! সত্যিই 'এ' পাগল। কিন্তু 'এ' কীসের পাগল সেটা শোন। এই উদ্গীত গানের মধ্যে তা বলা আছে।

আমার মা পাগল বাবা পাগল পাগল পাড়ার ভগ্নীভাই
যে দেশেতে সবাই পাগল আমি কোন পাগলের মন যোগাই।।
এক পাগলে নাচে গায় আরেক পাগলে দেখে
আরেক পাগলে হাসে কাঁদে আরেক পাগলে বলে।
এক পাগলে শুয়ে থাকে কোনও কাজ না-করে
আরেক পাগলে হরি হরি বলে দেখ তোমরা সবাই
এক পাগলে বলে আমি জানি না কিছু ভাই
আরেক পাগলে বলে তুই শিক্ষা করিসনি তাই।।
এক পাগলে বলে আমি বড় অসহায় দুঃখী ভাই
আরেক পাগলে বলে তোর দুঃখের কোনও কারণ নাই।।

(বাউল—দাদরা)

'এ' কার মন যোগাবে? আর পাগলের আরেক অর্থ হল, পা-টা 'এর' গোল হয়নি, তবে goal পেয়ে গিয়েছে 'এ'। 'এ' goal post-এর পিছনে আছে। 'একে' কেউ ছুঁতে পারবে না। ছুঁতে গেলে সে মিশে যাবে। তার নিজের অহংকারের পৃথক আমিকে তখন রাখতে পারবে না—মিশে 'এর' সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে। নদী সাগরে গিয়ে সাগরকে ছুঁয়ে আর আলাদা নিজের রূপ রাখতে পারে না। কাজেই জীবের আমি 'এর' আমি-র মধ্যে মিশে যাবে, আলাদা করে পৃথক থাকতে পারবে না। কাজেই goal post -টা হচ্ছে এক, আর তার পশ্চাতে 'এ' আছে, তার মানে এক-এর অতীত অর্থাৎ নিত্যাদ্বৈতম্, শুধু অদ্বৈতম্ নয়। দ্বৈতবাদীরা এসে মারামারি কাটাকাটি করে। তারা বলে, আমরা ঠিক তুমি বেঠিক। আরে এ যেন বাচ্চা ছেলেদের মতো ঝগড়া করা! দ্বৈত কী, অদ্বৈত কী, সাকার কী, নিরাকার কী, এগুলো তো মনের কতগুলো বিকার! যেমন দুটি বাচ্চা শিশু প্রতিমা দেখে বলছে ঘোষ পাড়ার প্রতিমা হচ্ছে সবচেয়ে বড়, আরেকজন বলছে, না, ব্যানার্জী পাড়ার প্রতিমাটা সবচেয়ে বড়। দু'জনে ঝগড়া করে দু'জনের দাঁত ভেঙে দিল দুটো। এখন কে বড় তা সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে দাঁত দুটো গেল দু'জনের। বড়রা তাদের কাণ্ড দেখে বলল, যা এবার দুই মন্দিরে দুই প্রতিমার দুই পাশে গণেশ হয়ে গিয়ে বস গে! আমরাও ঠিক একই রকম। অমৃতের বক্ষে অমৃতের সন্তান সব, অথচ অমৃত ভুলে মৃত্যুকে নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করছি আমরা। কীসের জন্য?

আমরা নিজের স্বরূপটা ভুলে গিয়েছি বলে। 'নিজবোধস্বরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ'—এই সত্যের সঙ্গে পরিচয় আমাদের হয়নি। হরি যদি কেউ থাকেন তা হল প্রত্যেকের আমি। রাম যদি কেউ থাকেন তবে তা প্রত্যেকের আমি। শিব যদি কেউ থাকেন তা প্রত্যেকের আমি। কৃষ্ণ যদি কেউ থাকেন তা প্রত্যেকের আমি এবং আল্লা যদি কেউ থাকে তাও প্রত্যেকের আমি।

একথা বললে 'এর' দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হবে না এই শরীরটা নিয়ে। অথচ বহুবারই মরতে মরতে 'এ' মরেনি। দেহের থেকে বেরিয়ে গিয়েও কিন্তু আবার দেহের মধ্যে ঢুকেছে, মৃত্যুটা যে কী তা দু'বার দেখা হয়ে গিয়েছে। দেহের থেকে 'এ' বেরিয়ে গেল, দেখলাম বেরিয়ে যাচ্ছে, মাথা ভেদ করে বেরিয়ে গেল, একেবারে ছাদ ভেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে rocket-এর মতো, তারপর সূর্য ভেদ করে বেরিয়ে গেল। আরে! পুড়লাম না, একেবারে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে বিরাট নক্ষত্র গো! তার ভিতরে একেবারে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে, একেবারে লাল। সেখানে গিয়ে কী হল? সেখান থেকে আবার ফিরে এলাম স্থূল দেহঘরে। সবই ছায়াছবির মতো সাক্ষিরূপে দেখে গেলাম। আচ্ছা থাক সেই প্রসঙ্গ! আবার একটা স্থূল দেহ নিয়ে এসে sameside game খেলে চলেছি। কীরকম? 'এই শরীরটা' যখন ছোট ছিল, খেলার মাঠে তখন ফুটবল খেলতে গিয়ে goal হচ্ছিল না। দুই team-এর সঙ্গে খেলা, final game-এ goal হচ্ছে না দেখে শেষ পর্যন্ত নিজের goal-এই 'এ'গোল দিয়ে দিল, goal তো হওয়া দরকার, আনন্দ তো goal দিয়ে। কে হারল, কে জিতল তাতে কিছু এসে যায় না। আর সবাই 'একে' মারবার জন্য তাড়া করল। আর 'এ' তো ছুটে পালিয়ে গেল। 'এর' সঙ্গে কেউ পারেনি, এখনও পারে না। কেন? ছুটে যেখানে যাবে সেখানে 'এ' (আমি) আগে গিয়ে পৌঁছে বসে আছে, দৌড়ে গিয়ে পৌঁছোতে পারবে না। সেখানে বোধ সর্বত্র বর্তমান বা বিদ্যমান। বোধের অভাবে আমাদের দেহ নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু বোধ দেহ দিয়ে চলছে না দেহটা বোধ দিয়ে চলছে, কোনটা? আজকে 'এ' কেন্দ্রবোধের কথা বলল, আগের দিন অন্তরের বোধের কথা বলা হয়েছে, প্রথমদিন বাইরের বোধের কথা বলা হয়েছিল। আগামীকাল তুরীয়বোধের কথা বলা হবে, যদিও এই অল্প সময়ের মধ্যে এই কথা শুনে কিন্তু তোমাদের ভাল লাগবে না।

নিমন্ত্রণ বাড়িতে একদিন একটু ভাল করে খেলে পরের দিনই আবার মনে হবে, ইস ঐ জিনিসটা ওখানে খেলাম না! আবার নতুন জিনিস খেয়ে পেট ভরালাম, ভাল জিনিসটাই খাওয়া হল না! আবার একদিন নেমন্তন্ন হলে ঐ ভাল জিনিসটাই খাব! এরকম আমাদের মনে হয়। 'এ' এই নেমন্তন্নটা প্রতিদিনই কিছু কিছু সবার সামনে রাখছে। নিমন্ত্রণ অর্থাৎ মন্ত্রণ সেখানে থাকবে না। তাহলে কী থাকবে? 'অমৃতম্' অর্থাৎ 'কর্মস্য ফলম্ চিন্তায়াং ফলম্ ধ্যানস্য ফলম্।' কর্ম, চিন্তা, ধ্যানের ফল জ্ঞানামৃত। অমৃত কী? যা বিকৃত হয় না, রূপান্তরিত হয় না, যার কোনও পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যার মৃত্যু নেই। একমাত্র বোধময় আমি-র মৃত্যু নেই, বোধাভাস আমারও মৃত্যু নেই। 'এ' ঘুরে ফিরে আবার আমিতে আসছে। So simple, straight and direct is the light of Oneness! One remains always One, it

never deviates from its true nature. আমি কখনও আমিশূন্য-হয় না। এই আমি হচ্ছে direct, indirect নয়, কারও মাধ্যমে অনুভূতি নয়।

আমি অনুভূতির স্বরূপ, কিন্তু অন্য সব অনুভূতির মাধ্যম দিয়ে আমার কাছে এসে পৌঁছায়। আমি আমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। "স্ববোধেনান্য বোধেচ্ছা বোধরূপ তয়া হি আত্মনঃ স্বাত্মবোধরূপ পুরুষোত্তমোঽহং।" স্ববোধে অন্য বোধ নেই, আপনবোধ ছাড়া অন্য কোনও বোধ কখনওই সিদ্ধ নয়। অন্যবোধ সব সিদ্ধ হচ্ছে আপনবোধ দিয়েই, নিজবোধ দিয়েই, আমিবোধ দিয়েই। "স্ববোধে ন অন্যবোধেচ্ছা"—অন্যবোধ নেই, আপনবোধে শুধু আপনবোধই আছে। স্ববোধরূপ পুরুষোত্তম—আমি পুরুষোত্তম, উত্তম পুরুষ অর্থাৎ ক্ষর পুরুষও নয়, মধ্যম পুরুষ বা অক্ষর পুরুষও নয়, পুরুষোত্তম অর্থাৎ আমি দ্বৈতের আমিও নয়, বহুত্বের আমিও নয়, এমনকী অদ্বৈতের আমিও নয়, আমি নিত্যাদ্বৈত। আবার আমিই অদ্বৈত, আমিই দ্বৈত, আমিই বহুত্ব—কিন্তু আমার নিত্যাদ্বৈত বক্ষে থেকে। যেমন বাবারা bank-এর থেকে লাখ টাকা তুলে নিয়ে আসল বাড়িতে, আসার পথে ভাবল নাতি-নাতনিদের জন্য কিছু জিনিস কিনে নিয়ে আসবে, দোকানে গিয়ে কিছু কিনে নিয়ে আসল, সে তো লাখ টাকা খরচা করে এল না, কয়েকটা টাকা খরচা করল, সব টাকা কি খরচা করল? কাজেই নিত্যাদ্বৈত স্বয়ং অদ্বৈত ও দ্বৈত হয়ে প্রকাশ হলেও কিন্তু তার নিত্যাদ্বৈতস্বরূপ ঠিকই থেকে গেল। 'এ' ছোট্ট ছোট্ট কথাগুলি রাখছে। প্রপীড়িত, দুস্থ মানবসমাজে এই যে বিকৃত মন, রুগ্ন মন, অসুস্থ মন এবং নানারকম সমস্যাপূর্ণ মন নিয়ে সবাই সংসার করছে, তাদের এই সমস্যাগুলোকে সরিয়ে সমাধানটা দেখানো হচ্ছে। কিন্তু একদিনে এতে স্থিতি হবে না, তা ঘন ঘন শুনতে হবে। ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে তা হবে না, সারাজীবন জপ-তপ-ধ্যান করলেও কিন্তু তা সম্ভব হবে না। তাতে মনের কিছু যোগ্যতা বাড়বে, কিন্তু আমি তো যোগ্যতার অধীন নয়। আমি তো গুণাধীন নয়। আমি তো কোনও কর্মাধীন নয়, ভাবনাধীন নয়, আমি 'ভাবাতীতম্ দ্বন্দ্বাতীতম্ ভেদাতীতম্ গুণাতীতম্ স্বস্বরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিতম্'। 'স্বয়ং-এ স্বয়ং, আপনে আপন, পরমে পরম।' 'এ' প্রত্যেকের আমি-র কথাই বলছে। কেননা এই ঘরের আকাশ দিয়ে ঐ ঘরের আকাশকেও বোঝা যায়, নিশ্চয়ই তাতে তফাত কিছু নেই। বাইরের appearance-টার তফাত তো হতে পারে অর্থাৎ ঘরের shape ও size-এর তফাত হতে পারে, কিন্তু আকাশটা একই। তা ত্রিকোণই হোক, চতুষ্কোণই হোক আর গোলই হোক বা আয়তক্ষেত্রই হোক আবার কোনও ক্ষেত্র নাই হোক—'আয়তনশূন্য আয়তনপূর্ণ সবই একবোধে ধন্য পূর্ণ।'

তবে এই প্রসঙ্গ কারও যদি মনঃপূত না-হয়ে থাকে এবং সে রাগ করে তবে সে নিজের বিরুদ্ধে নিজেই যাবে। অর্থাৎ 'I' cannot go against 'I'. তা কখনও সম্ভব নয়। 'I' can go against imaginary concepts or ideas but 'I' cannot go against Myself. যাই হোক, এই প্রসঙ্গ কিন্তু সবার আপন প্রসঙ্গ, 'এর' ব্যক্তিগত কিছু নয়। তবে অন্যান্য concept-এর সঙ্গে একটুখানি clash হবে, তার কারণ এতকাল যা অভ্যাস হয়েছে তার সঙ্গে ঠিক মেলানো

যায় না প্রথম প্রথম। কিন্তু তা চেষ্টাসাপেক্ষ এবং ধীরে ধীরে তা সহজ হয়ে যায়। It's so easy. কেননা এই বক্তব্যের মধ্যে alloyed কিছু নেই, কোনও mixture নেই। It is not an admixture of something, It is free from all mixture. সেইজন্য তা mixture-এর সঙ্গে মেশাতে গেলে একটু অসুবিধা হবে এবং এর সুফল লাভ করা সম্ভব হবে না।

মন্তব্য ঃ

আজকের বিচারের বিষয়বস্তু হল অখণ্ড 'বোধময় আমি/আমিময় বোধের' বৈচিত্র্যময় ব্যবহার এই জীবজগৎ বিশ্বসংসার। এক 'বোধময় আমি/আমিময় বোধ' অনন্ত অনন্ত ভঙ্গিমায় আপনবক্ষে আপনাকে নিরন্তর প্রকাশ ক'রে নিজবোধ দিয়ে তা ব্যবহার ক'রে জীবরূপে আত্মলীলা খেলে চলেছে। জীবনে সর্ব ব্যবহারের মধ্যে এবং আচরণের মধ্যে ইতিমূলক ও নেতিমূলক ভাববোধের প্রকাশ দ্বারা আপনস্বরূপের মহিমাকেই প্রকাশ করছে অন্তরে-বাইরে ভাববোধের মাত্রা অনুসারে। আবার আপনাকে ভুলে কখনও বহির্সত্তায় স্থূল সসীমের খেলায় জড়িয়ে পড়ছে, কখনও বা অন্তরের ভাববোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনের রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছে, জানতে চাইছে, কখনও কেন্দ্রসত্তা স্ববোধ দিয়ে স্ববোধের মধ্যে মিশে যাচ্ছে— সর্বত্রই 'বোধময় আমি/আমিময় বোধের' লীলাভিনয়। আদি-মধ্য-অন্তে আমি নিত্যবর্তমান।

ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব সবই পরমতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন নামমাত্র। এই পরমতত্ত্বই আবার আমিতত্ত্ব। এই আমি প্রজ্ঞানঘন সচ্চিদানন্দস্বরূপ পুরুষোত্তম অহংদেব পাকা আমি। পাকা আমির বক্ষেই তাঁর স্বভাবশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত লীলায়িত হয় স্বমহিমায়। তাঁর অভিব্যক্তি সকল সর্বক্ষেত্রে সবসময় সবার মধ্যে প্রতিভাত হয় না। তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রকাশের মানের তারতম্য পূর্বাপর সম্বন্ধ ধ'রে অনন্ত অনন্ত বৈচিত্র্য রূপে প্রতিভাত হয়। এ প্রসঙ্গে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, আশ্চর্যময় এবং রহস্যময় বক্তব্য হল বহির্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি উভয়ক্ষেত্রে যতরকম প্রকারভেদই অনুভূত হয় তাদের মধ্যে আমিসত্তা ও আমি-শক্তিরই অর্থাৎ বোধসত্তা ও বোধশক্তিরই পরিচয় মেলে অনুভূতি রূপে। বোধ আর অনুভূতি অভিন্ন, সুতরাং ভাবশূন্য অনুভূতি এবং অনুভূতিশূন্য বোধ হয় না। আমিতত্ত্ব যখন বোধময়, অনুভূতিময় তখন সবই তত্ত্বত আমিময়। এই হল পাকা আমি আমিতত্ত্বের তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয়।

২৮/১১/০১

।। সপ্তম বিচার ।।

ওঁ

প্রাণ আমার সত্তা আমার আমার সত্য আত্মা আপন
স্বভাব আমার স্ববোধ আমার অমৃত অক্ষর পরাৎপরম ।।
শক্তি আমার ইচ্ছা আমার ভাব আমার আমার মন
ধর্ম আমার কর্ম আমার জ্ঞান আমার ক্রিয়ামাধ্যম।
প্রজ্ঞান আমি বিজ্ঞান আমি আমি নির্গুণ সগুণ স্বয়ং
অদ্বৈত আমি দ্বৈত আমি আমি বিশ্বাতীত বিশ্বজীবন ।।
ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর আমি নিষ্কল নির্মল নিরঞ্জন
স্ববোধে আমি সর্বান্তর্যামী কার্য-কারণ সমদরশন ।।
স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত শাশ্বত অচ্যুত নিত্য অদ্বৈত
সর্বসম অনুপম স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংপূর্ণ।
সর্ববোধের অধিষ্ঠান সর্বভাবের সমাধান
সচ্চিদানন্দঘন প্রীতম স্বয়ং স্বানুভবদেব স্বয়ং।
পরমে পরম স্বয়ং-এ স্বয়ং আপনে আপন
প্রজ্ঞানঘন পুরুষোত্তম স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব স্বয়ং ।।

(বাউল—কাহারবা)

প্রত্যেকের মধ্যে বোধের চারটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তা মনে রাখা খুব কঠিন, সেইজন্য বারবার তা উল্লেখ করতে হয়। এই অনুভূতির রাজ্যে repetition-টা খুব দরকার। বারবার repeat করে তা বোধ/অনুভূতির সামনে রাখতে হয়। অনুভূতি আমাদের অন্তরের ব্যাপার। কিন্তু স্বানুভূতি কথাটা যা গানের মধ্যে বার বার বলা হল, তা হল বোধের বোধ। কিন্তু অন্তরে আমাদের বোধের বোধ আসে না। অন্তরে যে বোধ খেলে, আজকে সেই প্রসঙ্গে কিছুটা বলে তারপর অন্তরের উর্ধ্বে যে বোধ সেই বোধ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। কেননা আদিপর্ব, মধ্যপর্ব, অন্তপর্ব—এই তিনটি পর্বকে বলতে গেলে ধাপে ধাপে যেভাবে বলা দরকার অল্প সময়ের মধ্যে তা সংক্ষেপে বললে সত্যিই বোঝা সম্ভব হবে না। কেননা সেই প্রস্তুতি না-থাকলে তা অনুভব করা খুব মুশকিল। যারা শাস্ত্র পড়ে অভ্যস্ত তারা শাস্ত্রের কতগুলি কথা মনে রাখে। যারা সাধনভজন করে, তারা জপ-তপ-ধ্যানের যে বিজ্ঞান শুধু তা-ই মনে রাখে। কিন্তু এখানে যা বলা হচ্ছে তা হল শ্রুতিবিদ্যা। শুধু শ্রবণের মাধ্যমে

realization—তা হচ্ছে supreme, সর্বোত্তম অধিকারীদের জন্য। বোধের বিচারে 'এ' অধম বলে কারওকেই খুঁজে পায়নি। A particle of gold is gold—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কাজেই জ্ঞানের এক অণুও জ্ঞানই। তা দিয়ে অজ্ঞানকে দূর করার অসুবিধা নেই যদি তার বিজ্ঞান জানা থাকে। আমাদের মধ্যে জ্ঞান অনেকেরই আছে, কিন্তু বিজ্ঞান জানা নেই, অর্থাৎ কী ভাবে কোন জ্ঞানের কোন অংশ ব্যবহার করলে সেই জ্ঞানফল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ হয় তা সবার জানা নেই। আমরা বহু চেষ্টা করে কিছুটা কার্য উদ্ধার করতে চাই, আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে চাই। তার জন্য আমরা আমাদের প্রচলিত ধারায় যার যেরকম সামর্থ্য যোগ্যতা সেই অনুসারে চেষ্টা করি কোনও ব্যাপারকে সমাধান করার জন্য। কিন্তু সুষ্ঠু ভাবে সমস্যার সমাধান আমাদের হয় না, অন্তত সংসারজীবনে তো নয়ই। তা সর্বত্রই দেখা যায়—খালি ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বদেশেই, যেখানে মানুষ আছে সেখানেই। মানুষের মধ্যে যে চারটি বোধের স্তর আছে প্রায় cent percent লোক তার প্রথম স্তরটা নিয়েই ব্যস্ত অর্থাৎ outer nature, প্রাকৃতবিদ্যা, যা ইন্দ্রিয়-মন দিয়ে আমরা গ্রহণ করতে পারি— sense perception world যাকে বলা হয়, কিন্তু তা manifold, relative।

এই relative existence-এর যে অনুভূতি সেই অনুভূতি প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে, কেননা এখানে প্রকৃতির সব জিনিস পাল্টাচ্ছে অর্থাৎ তা changeable। এই changeable nature-এর part-এ জ্ঞানসত্তা পাকা আমিকে কখনও স্থির ভাবে পাওয়া যাবে না। এর গ্রহীতা বা জ্ঞাতা part-টা রয়েছে আমাদের ভিতরে। আমাদের যে অন্তঃকরণ তার দু'টি part। একটা হচ্ছে জ্ঞেয়, আরেকটা হচ্ছে জ্ঞাতা, অর্থাৎ একটা দৃশ্য এবং আরেকটা দ্রষ্টা, একটা object এবং আরেকটা subject. Object part-টা হচ্ছে বাইরে, subject ভিতরে। কিন্তু বাইরের বললেও বাহিরটা একেবারে excluded নয়, Self-এর মধ্যেই রয়েছে অর্থাৎ আমি-র যে পূর্ণ সত্তা, background, সেই background-এর মধ্যে সব exist করছে। একটা বড় বৃত্ত যদি আঁকা হয়, সেই বৃত্তটা হচ্ছে Absolute। ধর বড় একটা বৃত্ত, সেই বৃত্তের মধ্যে যে কোনও জায়গায় আমরা একটা centre বানাতে পারি। কিন্তু প্রত্যেকটি centre-এর পরিধি একমাত্র real centre ছাড়া পাওয়া যাবে না। সেইজন্য ভগবান সম্বন্ধে একটা খুব witty remark আছে। তা হল—God is just like a big circle whose centre is everywhere but circumference nowhere. কথাটা বিজ্ঞানীদের কাছে খুব ধাক্কা দিয়েছে। তারা এ কথা শুনে বলেছিল—বাঃ এ তো সুন্দর একটা কথা শুনলাম! উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল—হ্যাঁ, তুমি যে কোনও জায়গায় centre বানিয়ে circle করতে পার, কিন্তু তার পরিধি সব জায়গায় পাওয়া যাবে না। একমাত্র real centre-এ ধরলে পরে একটা পরিধি পাওয়া যায়।

ঐ real centre-ই হচ্ছে আমাদের core of heart, হৃদয়ের কেন্দ্র, যাকে হৃদ্‌দেশ বা হৃদয়াকাশ বলা হয়। তারই নাম হচ্ছে চিদাকাশ, সম্বিদাকাশ, ব্রহ্মপুর ও চিদম্বরম্। এগুলি সংস্কৃত শব্দ। 'এ' সংস্কৃত পড়েনি, কিন্তু কী করে যে 'এর' ভিতরে এই সব তত্ত্বগুলি ফুটে উঠেছে তা নিয়ে অনেকেই অনেকরকম প্রশ্ন করেছে। তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল—

দেখ, সত্য বস্তুটি প্রকাশ করার জন্য বা প্রকাশিত হওয়ার জন্য দ্বিতীয় আরেকটা সত্যের প্রয়োজন হয় না। তা অনেকেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। সত্যের কোনও বিকল্প নেই বলে তা স্বয়ংপ্রকাশ। স্বয়ংপ্রকাশ সত্য যদি জীবনধারণ করে জীবনরূপে প্রকাশিত হতে চায় তাহলে তাঁর তো কোনও support-এর দরকার হয় না, সে নিজেই Self-sufficient, Self-supporting। এখন এই কথাটা dependent মানুষের কাছে খুব সুবোধ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মন refined হয়ে one pointed না-হবে ততক্ষণ তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। এই কথাগুলো শুনতে শুনতে শ্রোতার মন আপনা থেকেই one point-এ চলে যাবে। Centre ধরে যদি চার ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে নিচের যে ভাগটা তা একটা triangle হয়ে যাবে। ঐ trangle-টাই হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টির অংশ, বাকি $^1/_4$th হচ্ছে supremely Unmanifest।

'এ' ঋক্‌বেদের কতগুলি chapter দেখেছিল অর্থাৎ envision করেছিল। একসময় ধ্যান আপনা থেকেই হয়ে যেত, রাতে ঘুম হত না। রাত্রে হয়ত বসে থাকতেই হত, ঘুম হত না। ছয় বছর চোখের পাতা 'এর' পড়েনি, একদম stiff হয়ে গিয়েছিল। তার পরে একজন যোগী তিনি চোখের পাতাটাকে loose করে বললেন যে, বাবা তোমার এমন বিরাট কাজ নিয়ে তুমি এসেছ, আমরা তো তা ধরতেই পারব না। তোমার এই দেহের মূল্য অনেক বেশি। উত্তরে তাঁকে বলা হল, 'এর' কাছে কিছু নেই। 'এ' বহুবার এই দেহ নিয়ে এসেছে, বহুবার দেহের পরিণাম dramatic ভাবে হয়েছে, কিন্তু আমি আমিই আছে। যাই হোক, ধ্যানের গভীরে ঋক্‌বেদের কিছু অংশ পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি হয়েছিল। 'এ' তো বেদ-বেদান্ত পড়েনি, কিছুই জানে না। ভিতর থেকে তা উদ্গীত হয়েছে। এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বগুলি শুনে অনেকেই বলেছে, এ কী করে সম্ভব! উনি তো বেদ পড়েননি অথচ বেদের কথা আসছে কোথা থেকে? সেখানে একটা শ্লোক ছিল—"পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদং অস্য অমৃতং দিবিঃ।" অর্থাৎ অখণ্ডের একপাদে বিশ্বভূতানি অর্থাৎ বিশ্বভুবন, আর ত্রিপাদ "অমৃতং দিবিঃ" অর্থাৎ supremely Unmanifest। সেখানে কোনও manifestation নেই। বৃত্ত দ্বারা অখণ্ডকে নির্দেশ করা হয়েছে। বৃত্তটা যদি চার ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে নিচের যে ভাগটা তা একটা triangle অর্থাৎ ত্রিভুজ। এই ত্রিভুজ সমগ্র সৃষ্টিকে represent করছে, আর $^1/_4$th হচ্ছে Unmanifest বা পরম অব্যক্ত। আর ঐ যে centre point ওখানে ঈশ্বর, আর তার উর্ধ্বে পরমাত্মা পরব্রহ্ম। এই তত্ত্বটি *সানাই* পত্রিকার পিছনে emblem-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এবং পত্রিকার ভিতরে পর পর কয়েক সংখ্যাতে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যাও প্রকাশ করা হয়েছে। তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করেছিল যে, এর significance কী? তখন তাদের বলা হয়েছিল যে, এখানে সমস্ত cosmology, cosmography emblem-এর মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় আছে। বাইরে তিনটি circle এবং তার মধ্যে একটা square আছে, triangle-টার মধ্যে আবার একটা circle আছে। Circle-এর মধ্যে আবার ছোট্ট একটা circle আছে একেবারে centre-এ। ঐ triangle-টা হচ্ছে ত্রিগুণাপ্রকৃতি অর্থাৎ সৃষ্টি করতে গেলে শক্তি, energizm দরকার, ক্রিয়ার জাগরণ দরকার —তা-ই triangle-এর অর্থ।

সত্তা আর শক্তি অভিন্ন, সত্তার বক্ষে শক্তি জেগে উঠলে কী হয় আমরা তার একটি মাত্র symbol দেখি মা কালীর মূর্তির মধ্যে। শিব নিচে শুয়ে আছেন আর মা কালী তাঁর বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন করেছিল যে, এই মূর্তির significance কী? উত্তরে বলা হয়েছিল তা হচ্ছে Real existence-এর উপরে। Existence is neutral, তার মধ্যে energy charged হয় না। কিন্তু তার যে অন্তর্নিহিত power বা শক্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম শক্তিশূন্য নয়। ব্রহ্মের বক্ষে ব্রহ্মের শক্তি নিহিত আছে অর্থাৎ Absolute-এর বক্ষে Absolute-এর শক্তি নিহিত আছে। মনের একেবারে শিখরে উঠলে তবে তা অনুভবগম্য হয়, নতুবা নয়। Absolute কথাটাই তো মানুষের কাছে এবং বিজ্ঞানীদের কাছে একটা number মাত্র। আর আমাদের ভারতবর্ষে Absolute is the Reality, It is not mere a number। এই Reality হচ্ছে বোধে বোধময় অদ্বয় অব্যয় অমৃতময়। এই শব্দগুলো দারুণ forceful! এই প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ ধরলে পরে আমরা সেই বোধে পৌঁছোতে পারব। কাজেই বোধ দিয়ে বোধের ঘরে যেতে হবে; বোধের ঘরে যাবার দ্বিতীয় কোনও আর বিকল্প রাস্তা নেই। এই যে একপাদে সৃষ্টি, সৃষ্টির background-এ কিন্তু circle-টা রয়ে গিয়েছে। Background-এ কিন্তু অখণ্ড সত্তা ব্রহ্ম-আত্মা রয়েছে। কাজেই অখণ্ড আমি-র বক্ষে তার যে অংশে সৃষ্টি তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই চতুর্ভূজ এবং আরেকটা ত্রিভুজ। চতুর্ভুজ হচ্ছে ঈশ্বর স্বয়ং এবং তার অন্তর্ভুক্ত ত্রিভুজ হচ্ছে শক্তি এবং প্রকৃতি।

চতুর্ভুজে ঈশ্বর কেন? ঈশ্বর সৃষ্টির fundamental base-গুলোকে সবই control করছেন। শক্তি সত্তাকে অতিক্রম করে যায় না। সেই ঈশ্বর হচ্ছেন বিজ্ঞানময় পুরুষ, আর বিজ্ঞানময় পুরুষের যে বিজ্ঞানক্রিয়া তা-ই হচ্ছে শক্তি। অর্থাৎ প্রজ্ঞান হচ্ছে Knowledge Absolute, তার বক্ষে energizm হল অর্থাৎ "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম।।" অর্থাৎ অন্ন এখানে mother, matter নয়। তপস্যার মাধ্যমে ব্রহ্ম energized হলেন, সৃষ্টির সংকল্প তাঁর ভিতর জেগে উঠল—"একোঽহম্ বহুস্যাম্"—আমি এক, আমি বহু হব। তা তাঁর একটা স্বপ্ন। এই তাঁর আদি ইচ্ছা, the infinite Will। প্রত্যেকের ভিতরে আমাদের যে desire তা হচ্ছে সেই will-এর একটা projection। এই desire-এর কেন্দ্রে গেলেই আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারব। এখানে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে পৌঁছোলে, তা ঈশ্বরের ক্ষেত্র (diagram-এ তর্জনী দেখিয়ে নির্দেশ করলেন), এই অখণ্ডের থেকে ঈশ্বর নেমে এলেন (মধ্যমা অঙ্গুলি দেখিয়ে নির্দেশ করলেন), তারপর বিজ্ঞানময় হয়ে, অর্থাৎ প্রজ্ঞানময় বিজ্ঞানময় হলেন, বিজ্ঞানময়ের থেকে জ্ঞানাভাস (অনামিকা অঙ্গুলিদেখিয়ে নির্দেশ করলেন) হয়ে এখানে (কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দেখিয়ে নির্দেশ করলেন) অজ্ঞানে নেমে এলেন। এই সবটাই কিন্তু (চারটি আঙুল দেখিয়ে) সত্তার বক্ষে হয়ে চলেছে। কাজেই অজ্ঞান বলতে আমরা যা দেখছি তা জ্ঞানশূন্য অবস্থা নয়, কারণ জ্ঞান কখনও শূন্য হতে পারে না।

Vedantist-দের কাছে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, তোমরা প্রকৃতিকে এত হেয় করছ কেন? তাহলে কিন্তু self-contradictory হয়ে যাবে তোমাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত! এই কথা শুনে তারা বলল, কেন? তখন বলা হল, তাহলে তোমরা antithesis to the Self-এ চলে যাবে। অনাত্মাকে base করে আত্মসিদ্ধান্তে আসা যায় না। অনাত্মা আত্মারই একটি অংশ বা প্রকাশ। কাজেই অজ্ঞান জ্ঞানশূন্য অবস্থা নয়, জ্ঞানের একটা বিশেষ অবস্থা, সর্বনিম্ন অবস্থা, মানে lowest unit of knowledge in the Knowledge Absolute। তার প্রকাশের মধ্যে অজ্ঞান হচ্ছে একটা প্রকাশ। অজ্ঞানও জ্ঞান। তখন তারা বলল যে, তুমি যে কথাটা বলছ তার প্রমাণ কী? তাদের বলা হল যে, একটা গাছের বীজের মধ্যে প্রাণের কোনও স্পন্দন বিজ্ঞানীরা বের করে দিতে পারবে? পারবে না। এমনকী matter, পাথর তারও যে প্রাণ আছে তা ভারতীয় ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁদের নির্দেশে এই পাথর দিয়ে দেবমূর্তি তৈরি করে পূজা করা হয় এবং অনুভবসিদ্ধপুরুষ ঐ পাথরের মধ্যেই চেতনাকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সেরকম মহাপুরুষ আমাদের দেশে জন্মেছেন। ঐ ধাতুর মূর্তি, পাথরের মূর্তি, কাঠের মূর্তি, মাটির মূর্তির মধ্যে 'All Divine for All Time, as It Is' সিদ্ধ তবেই হয়, নতুবা নয়।

ব্রহ্মবাদে খালি "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", কিন্তু not for all time, not for as it is—এই কথাটা সেখানে নেই। সর্বকালের জন্য নেই এবং 'as it is' এই কথাটাও নেই। ব্রহ্মসূত্র যারা পড়েছেন তারা উল্লেখ করেছেন যে, বাবাঠাকুর তুমি "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", তার সঙ্গে 'for all time, as it is' এটা কোথায় পেলে? উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, ওর মধ্যে আছে বলেই পেলাম, আমি তা-ই। কাল কি আমাকে নাশ করতে পারে? কাল দেহটা নাশ করতে পারে। কাল তো বোধের একটা বৃত্তি। বোধকে অতিক্রম করবে কী করে কাল? তখন তারা বলল, এ তো অদ্ভুত কথা বলছ তুমি! উত্তরে বলা হল, হ্যাঁ, যেই শব্দগুলো তোমরা প্রয়োগ কর সেই শব্দগুলো বোধের কতগুলো expression, কিন্তু বোধকে তুমি অতিক্রম করবে কী দিয়ে? অতিক্রম করতে গেলে বোধ দিয়েই বোধকে অতিক্রম করতে হবে—বোধ তো থেকেই যাবে। Consciousness cannot be transgressed, তাকে অতিক্রম করা যায় না। Because Consciousness is the eternal Substratum, the permanent Background, the life-pervading Truth, the underlying Essence of all possible expressions and impressions. কাজেই চৈতন্যসাগরে চৈতন্যের যে লীলায়িত রূপ তার একটা অংশে আমরা সৃষ্টি দেখতে পাই। সেই সৃষ্টি সক্রিয় হচ্ছে চিৎশক্তির মাধ্যমে। চিতিমাতা হল চিৎশক্তি অর্থাৎ Consciousness-ই পিতা, Consciousness-ই মাতা।

ঋষিযুগে matriarchal age ছিল না, patriarchal age অর্থাৎ পিতৃপ্রধান সমাজ ছিল। তাই সেই সময় Consciousness-এর দেব অংশ, অর্থাৎ পুরুষ অংশ, পুরুষ দেবতার পূজা বেশি করে করা হত। বেদের মধ্যে সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইন্দ্রদেব, বরুণদেব, পবনদেব,

অগ্নিদেব ইত্যাদির পূজা তখন প্রচলিত ছিল। তার অল্প পরে, যদিও সমসাময়িক কিংবা কিছু পরে দেখা যায় শক্তির manifestation। এই সমস্ত তত্ত্বগুলি আমাদের ইতিহাস অর্থাৎ বেদের culture যারা করেন তারাই জানেন। কিন্তু 'এর' বক্তব্য যা, তা প্রথমেই গানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে—'প্রাণ আমার আত্মা আমার'। এই গানটি দিয়ে কেন আরম্ভ করা হল? বেদে যে প্রাণের কথা আছে তা হল প্রাণশক্তি, কিন্তু বেদান্তে ব্রহ্ম-আত্মাকে উদ্দেশ করে প্রাণ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং প্রাণ সত্তা ও শক্তি উভয় অর্থেই ঋষিগণ অবগত হয়েছিলেন।

আত্মজ্ঞানী/ব্রহ্মজ্ঞানী যখন প্রাণ শব্দ ব্যবহার করেছেন তখন ব্রহ্ম-আত্মাস্বরূপকে নির্দেশ করেই ব্যবহার করেছেন। সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরকে হিরণ্যগর্ভ, মহাপ্রাণ, সূত্রাত্মা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কী অর্থে কখন প্রাণ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা না-জানলে সত্যোপলব্ধি যথার্থ হবে না। বেদান্তের প্রাণ কিন্তু মুখ্য প্রাণ, গৌণ প্রাণ নয়। অখণ্ড প্রাণসাগরে কত প্রাণের রূপ যে ফুটে উঠেছে তার আদি-অন্ত করার উপায় নেই। যেমন রাতে গভীর আকাশে, গভীর নিশীথে আকাশের দিকে যদি বেশ ভাল চক্ষুষ্মান পুরুষ তাকিয়ে দেখে তাহলে সে নক্ষত্রকে গুনে শেষ করতে পারবে না। সেরকম এই পৃথিবীতে প্রাণের সংখ্যা, তাদের নানা রকম ভেদের অন্ত নেই। এমনও প্রাণী আছে একঘণ্টার জন্য দেহপ্রাপ্ত হয়, তারপরই দেহ নাশ হয়ে যায়। এরকম আস্তে আস্তে সময় ধরে প্রাণীর জীবনীশক্তি হাজার বছর, দুই হাজার বছর, তিন হাজার বছর, চার হাজার বছর, পাঁচ হাজার বছর—এরকম প্রাণী এখনও আছে। তবে মানুষের পক্ষে তাদের সন্ধান পাওয়া খুব মুশকিল, কেননা তারা পাহাড়ের এমন জায়গাতে আছে যেখানে মানুষ যেতে পারে না। কিছু কিছু যোগী তাদের meet করতে পারেন, কিন্তু তাদের কথা শুনবে কে, আর মানবেই বা কে? এমনও মহাপুরুষ আছেন পাঁচ হাজার বছর আগেকার অর্থাৎ সত্য যুগের, ত্রেতা যুগের, দ্বাপর যুগের সাধক এখনও আছেন। 'এর' এই কথাটা শুনে হয়ত অনেকেই বলবে যে, উনি বাড়াবাড়ি করছেন! তাঁরা যেখানেই থাকুন সেখান থেকেই জগতের কল্যাণের জন্য সাধনা করে চলেছেন। তাঁদের একটা vibration অন্যান্য সমস্ত vibration-কে control করতে পারে এবং আমরা ঘরে বসে যে হঠাৎ কোনও বিষয়ে inspiration পাই তার পশ্চাতে রয়েছে এই সব মহাপুরুষদের vibration, যা চারদিক থেকে ether-এর মধ্যে ভেসে বেড়ায়।

আজকের যুগের বিজ্ঞান অর্থাৎ ওই যে satellite দিয়ে একদেশের কথা অন্যদেশে পরিবেষণ করছে এগুলি বহু পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল। অতীতের শব্দ, কথা, ঘটনার record বায়ুমণ্ডলের বিশেষ স্তরে সঞ্চিত আছে। বিজ্ঞান তার কিছুটা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। অধ্যাত্মবিদ্যায় পারদর্শী আত্মযোগীর কাছে সর্ব কালের সর্ব ঘটনার record সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। আত্মজ্ঞানী সর্বজ্ঞত্বের বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন। সেইজন্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা অতিরিক্ত তাঁর কাছে আর কিছু নেই। তা-ই হল অদ্বয়বোধের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির মধ্যে দুটি জিনিস—একটা হচ্ছে শব্দ এবং আরেকটা হচ্ছে জ্যোতি, অর্থাৎ নাম আর রূপ। এই

দুটিই হচ্ছে সৃষ্টির basis। এই দুটিই কিন্তু Consciousness দ্বারা অর্থাৎ চিৎশক্তির দ্বারা প্রকাশিত, নিয়ন্ত্রিত এবং চিৎশক্তির মধ্যে এগুলি অবস্থান করে আবার লয় হয়ে যায়, কিন্তু চিৎসত্তা background-এ as it is থাকে। 'এ' প্রথম থেকেই চিৎসত্তার প্রসঙ্গে বলেছে। কাজেই চিৎশক্তি দিয়ে চিৎসত্তাকে ধরতে গেলে শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। আজকে সেই সম্বন্ধে কিছু কথা বলা হবে। কেন এই শক্তির সাধনা আমাদের দেশে এত বেশি হয়েছিল, কেন শক্তিকে মা বলা হয়? এগুলি আন্দাজে বলা যায় না। এর পিছনে বিজ্ঞান আছে যেই বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। আমরা শুধু সংবাদটা জানি, জ্ঞানটুকু আছে আমাদের, বিজ্ঞানটা জানা নেই।

জ্ঞান কী করে ব্যবহার করলে মাকে পাওয়া যায় বিশেষ বিশেষ অধিকারী পুরুষ এসে তা দেখিয়ে গিয়েছেন। যেমন রামচন্দ্র মাতৃসাধক ছিলেন, তিনি মায়ের আরাধনা করেছেন, অকালবোধন করেছেন। রাবণও মায়ের আরাধনা করতেন। এগুলো prehistoric, ত্রেতাযুগের কথা। সত্যযুগেও আছে, কিন্তু 'এ' সেই প্রসঙ্গে যাবে না, তাহলে প্রসঙ্গ অনেক বড় হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ শক্তিসাধনা করেছেন। রামচন্দ্র যেমন করেছেন ত্রেতায়, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ করেছেন, ত্রেতায় আরও অনেকেই করেছেন। দ্বাপরের পরে কলিতেও অনেকে করেছেন। বর্তমান যুগেও মাতৃসাধক অনেকের নাম পাওয়া যায় যাঁরা মায়ের সঙ্গে খেলা করেছেন। একদম বাস্তব দৃষ্টিতে আমরা যেরকম মা ও সন্তানকে দেখি ঠিক সেই ভাবে। 'এ' সেই chapter-এ আজ যাবে না, কেননা 'এর' বক্তব্য হচ্ছে নিত্যাদ্বৈত। তার মধ্যে অদ্বৈত ও দ্বৈত তো নিশ্চয়ই included। যাই হোক, দ্বৈতের কথা বলবার মতো অনেক হয়ত অধিকারী পুরুষ আছেন, কিন্তু অদ্বৈতের উপরে নিত্যাদ্বৈতের কথা বলার মতো পুরুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন তা দিয়ে আমাদের কী হবে! অনেকেই 'একে' বলেছে যে, আপনি তো তুরীয়তে বসে আছেন, আমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আপনি তো মোটেই জড়িত নন। উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, কথাটা তো বলছি আমি তোমার মধ্যে, তুমি তো আমাকে চেন না। আমি যে বোধস্বরূপ তা তুমি জান না। যখন জানবে তখন কিন্তু এরকম ভাবে আর অভিযোগ করার কোনও বৃত্তিই তোমাদের ভিতরে আসবে না।

বোধের কোনও বিকল্প ও প্রতিপক্ষ নেই। কিন্তু মনের প্রতিপক্ষ আছে, কেননা মনের ভিতর অনেকগুলি বৃত্তি আছে। Mind is diversified and heterogeneous but Consciousness is homogeneous. একরসসার, 'অভিন্নং চিৎতত্ত্বং প্রজ্ঞানস্বরূপম্'। প্রজ্ঞানস্বরূপ—অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানস্বরূপ। সেখানে নাহি আছে রূপ, নাহি আছে নাম, নাহি আছে ভাব, শুধু বোধে বোধে বোধময় অদ্বয় অব্যয় অমৃতময়। গানের প্রতিটি ছত্রে কিন্তু এই তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রাণ আমার সত্তা আমার আমার সত্য আত্মা আপন। স্বভাব আমার স্ববোধ আমার অমৃত অক্ষর পরাৎপরম্।' 'অমৃত অক্ষর পরাৎপরম্'—তারও পরে, superior to অমৃত অক্ষর। অক্ষর ব্রহ্ম, যিনি indestructible, the immortal indestruct-

ible যে entity তারও উর্ধ্বে। কাজেই 'ধর্ম আমার কর্ম আমার'—মানে আমিই ধর্ম এবং আমিই কর্ম। 'শক্তি আমার ইচ্ছা আমার ভাব আমার আমার মন ধর্ম আমার কর্ম আমার জ্ঞান আমার ক্রিয়া মাধ্যম'—বোধের বিজ্ঞানে কী ভাবে সৃষ্টিরহস্য আছে পর পর সংখ্যা দিয়ে তা নির্দেশ করা হয়েছে। *Knowledge of Knowledge* গ্রন্থটির (immortal classic) মধ্যে এগুলো খুব precisely এবং very scientifically deal করা হয়েছে। Diagram-ও দেওয়া আছে, খুব carefully না-পড়লে, একটা miss হয়ে গেলে কিন্তু আর বোঝা যাবে না। অনেকেই বলেছে যে, বাবাঠাকুর তোমার এই immortal classic, এটার জন্য তুমি অমর হয়ে থাকবে! তখন তাদের বলা হয়েছিল, অমর হওয়া আর মরণ এই দুটির সঙ্গে 'এর' কি সত্যি সত্যিই কোনও সম্পর্ক আছে? 'এর' তো কোনও চাহিদা বা প্রয়োজন নেই। 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং।' কিন্তু আমি static principle-মাত্র নই, তা-ও আমি-রই প্রকাশ বটে, কিন্তু that is limited। I can not be limited, though limitation reveals in Me, by My own experience, by My own light, by My own Consciousness. What is limitation? It is nothing but expression of the same One Consciousness. That Consciousness is verily I-Reality. 'প্রজ্ঞান আমি বিজ্ঞান আমি আমি নির্গুণ আমি সগুণ।' প্রজ্ঞানের পরব্রহ্ম পরমাত্মা বিজ্ঞানময় হয়ে ঈশ্বর হলেন। আমি ঈশ্বর, তার পরে আরও আছে। আমি নির্গুণ, আমি সগুণ, আমি বিশ্বাতীত, আমি বিশ্বজীবন, আমি অদ্বৈত, আমি দ্বৈত, আমি নিরাকার, আমি সাকার, আমি সর্বসাধারণ। ঈশ্বর আমি, আত্মা আমি, ব্রহ্ম আমি নিষ্কল নির্মল নিরঞ্জন। স্ববোধে অর্থাৎ আপনবোধে আমি সর্বান্তর্যামী।

প্রত্যেকের ভিতরে আমিরূপে বাস করছে বলে অন্তর্যামীরূপে আমি-ই আছি এবং 'কার্য কারণের সমদরশন', সেখানে সাক্ষিরূপে পাকা আমিই আছি। বোধময় আমি-র বক্ষে যে কার্য উঠছে, কারণ উঠছে তা-ও আমি, তার সাক্ষীও আমি। আজকে সাক্ষী স্তরের কথা বলা হবে। কিন্তু অন্তরের এই ভাববোধ সম্বন্ধে কিছুটা না-বললে সাক্ষী স্তরে যাওয়া যাবে না। কেননা তা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত শাশ্বত অচ্যুত নিত্য অদ্বৈত। স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত মানে spontaneous, self-existent, self-evident, eternal, infinite, undeviated, অর্থাৎ যার কোনও বিচ্যুতি হয় না, change হয় না, modification হয় না। এই সমস্ত শব্দগুলি আমরা ব্যবহার করি, কিন্তু তার তাৎপর্য আমাদের জানা নেই। Dictionary খুঁজে এগুলো পড়ে কিন্তু তার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সেইজন্য শাশ্বত অচ্যুত নিত্য অদ্বৈত eternal। অদ্বৈত মানে non-dual, One without a second, there is no second of I and Me। তাই বলা হয়েছে, আমা সমান কেউ নেই, আমা থেকে বড় বা ছোটও কেউ নেই। একা আমি-ই আছি সর্বত্র। 'একোঽহম্ সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠামি সর্বাধিষ্ঠানম্ অদ্বয়ম্ কেবল বোধে বোধে বোধময়ম্ সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পুরুষোত্তম কেবলম্।' পুরুষোত্তম শব্দের অর্থ Supreme personality of Godhead Absolute, the Supreme person। ক্ষরপুরুষ হল এই changeable object, material যা আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে ব্যবহার করি।

অক্ষর পুরুষ হল আমাদের মধ্যে যে জীবাত্মা, আর তারও গভীরে অর্থাৎ হৃদয়কেন্দ্রে পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তম ভগবানের কথা আমরা শাস্ত্রের পাতায় পাতায় পাই, কিন্তু সেই পুরুষোত্তম ভগবান বিশেষ এক স্থানে, বিশেষ এক জীবনে, বিশেষ এক রূপে সীমিত নন। 'বাসুদেব সর্বভূতাত্ম সর্বভূতাত্মা'—সেই বাসুদেব কে? 'সর্বভূতঃ হৃদ্দেশে যঃ বসতি সঃ বাসুদেবঃ'। সবার হৃদয়ে বাস করছেন বলে তিনি বাসুদেব। All-pervading Reality cannot be limited by one form, by one name, by one action and result. কাজেই অতীতে কী দেহধারণ করে এসে কী লীলা করে গিয়েছেন, সেই divine personality-কে বর্তমানে আমরা স্মরণ করছি as a past incident। কাজেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'এর' কয়েকটা কথা মানুষকে একটু ধাক্কা দেয়। আমরা, বিশেষ করে মানবসমাজ, we are accustomed to worship the past, neglect the present and anticipate the future। আমরা অতীতকে পূজা করতে ভালবাসি, বর্তমানকে করি অবহেলা আর ভবিষ্যৎ নিয়ে করি জল্পনা-কল্পনা। কাজেই নিজের স্বরূপ আমরা জানব কী করে? অনেকে হয়ত বলবে, বলুন নিজের স্বরূপ প্রসঙ্গে, আমরা তা শুনে অনুভব করব। তা তো বলা হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে তা অনুভব করতে গেলে তোমাদের প্রস্তুতি থাকা চাই। একটা লকড়ি উনুনে দিলেই জ্বলবে না। তার ভিতরে যতটা moisture আছে তা ধোঁয়া রূপে বেরোবে। আমাদের ভিতরে এই কথাগুলো প্রবেশ করলে একটা reaction হবে, তা observe করতে হবে impersonal outlook দিয়ে, otherwise it would not be effective।

অনেকগুলো ওষুধ আছে যা খেলে problem aggravate করে, ঐ ওষুধ দিয়েই আবার সেই রোগ নিরাময় হয়। এই হল science, অর্থাৎ right use of knowledge। 'এ' ছয়টা right use-এর কথা বলেছে ধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে। (i) Right use of life energy; (ii) right use of our education, whatever it may be, of what standard no matter; (iii) right use of time; (iv) right use of money or wealth; (v) right use of environment and lastly; (vi) right use of all the above five. এই ছয়টা right use হলে পরেই that is real *Dharma*। কেন? Right use of life-ই হচ্ছে মহাযোগ, এই যে জীবনটা পেয়েছ, তার যথার্থ ব্যবহার কী দিয়ে হতে পারে? By right knowledge. Right knowledge মানে the knowledge which is not conditioned or limited by the sense of doership, enjoyership and past experience, অর্থাৎ কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতাভাবশূন্য যে জ্ঞান তা-ই হচ্ছে right knowledge। তা হল সেই জ্ঞানস্বরূপ যার আলাদা করে জ্ঞাতা সাজার প্রয়োজন হয় না; জ্ঞানক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না এবং result-এর জন্য অপেক্ষাও করতে হয় না। কেননা এই সবকিছুর মধ্যে আমিই আছি, all-conscious I (Self) exists in all of them।

এই যে জীবনে আমরা যা-কিছু করি এগুলি আমাদের অন্তঃকরণের মাধ্যমে সাধিত হয়। অন্তঃকরণের মধ্যে চারটে ভাগ আছে—বুদ্ধি, মন, অহংকার, চিত্ত। বুদ্ধি হল আমাদের মধ্যে

যে বিচারশক্তি, ভাল-মন্দ বোধ বা হিতাহিত বোধ, শুভাশুভ বোধ, ইষ্ট-অনিষ্ট বোধ অল্প হলেও প্রত্যেকের ভিতরে কিছুটা আছে। বুদ্ধি মনকে বলে দেয় এটা এই, ওটা ঐ অর্থাৎ ascertaining faculty হচ্ছে বুদ্ধি, ascertain করে দিতে সাহায্য করে। মন কিন্তু ascertain করতে পারে না, মনের হচ্ছে pros and cons অর্থাৎ সংকল্প আর বিকল্প, resolution and doubt। মনের ভিতর একটা সংকল্প হল এবং সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকল্পও হল। কাজেই মনের ভিতর একটা doubt আসে। 'এ' এগুলো নিয়ে আরও গভীরের কথা বলেছে, সেগুলো এখানে অবান্তর বলে বলা হবে না। মন দশটা বৃত্তি দ্বারা গঠিত। একইভাবে দশটা বৃত্তি নিয়ে হচ্ছে বুদ্ধি, অহংকারের দশটা বৃত্তি নিয়ে হচ্ছে অহংকার। মন আর চিত্ত হচ্ছে এক, চারটে অন্তঃকরণের মধ্যে মন আর চিত্তকে এক পর্যায়ের বলা হয়। বুদ্ধি আর অহংকারকেও এক পর্যায়ের বলা হয়। সেইজন্য শুধু দুটিই ধরা হয়। অন্তঃকরণ বলতে জ্ঞানীরা এই দুটিই ব্যবহার করেন বেশি। সাধারণ মানুষের কাছে চারটিই আছে পৃথক। অহংকার হচ্ছে কোনও কিছু করার জন্য যে ইচ্ছা, পাবার জন্য যে ইচ্ছা তা এবং তাতে সবসময় থাকা, সবকিছুর মধ্যে assert করা, এই হচ্ছে অহংকারের কাজ—সে জানুক আর না-জানুক। চিত্তের কাজ হচ্ছে স্মৃতিসংস্কারের ব্যবহার। আমাদের অতীত অতীত দেহে, জন্মে আমরা যা-কিছু চিন্তা এবং কর্ম করেছি তার সূক্ষ্ম সংস্কার বা বীজগুলি যেখানে জমা থাকে তার নাম চিত্ত অর্থাৎ memory house।

আমাদের মধ্যে এত subtle ভাবে এগুলো আছে যে এগুলোর সন্ধান কোনও বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি দিয়ে চেষ্টা করলেও পাওয়া যাবে না। ধ্যানের গভীরে মনকে একাগ্র করে তবে এর সন্ধান পাওয়া যায়। কাজেই মনের মতো বড় যন্ত্র আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। সব যন্ত্র মনই আবিষ্কার করেছে আবার মনের উপরেই তারা কর্তৃত্ব করতে গিয়েছে—তা-ই হচ্ছে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় demerit। বিজ্ঞানীরা কোনও কিছু গবেষণা করে সমাধান করার জন্য কতগুলো যন্ত্রের সাহায্য নিচ্ছে, কিন্তু সমস্ত জিনিসটা তৈরি করছে নিজের মনের একাগ্রতা দিয়ে অথচ নিজেকে সে জানে না। The most tragedy for scientist is that the subjective part of the scientist is always engaged in solving some problems like studying the miraculous phenomena, gross and subtle. And whenever he is able to discover something he becomes very glad and satisfied to some extent, not all perfect. That is why he again changes his formula. বিজ্ঞানীরা খালি change করেই যাচ্ছে। এই যে স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ নিত্যাদ্বৈত তা সর্বসম অনুপম। সবসময় সে সমানে আছে, just like the subtle ether or space। আকাশ যেমন সবসময় সমানে আছে, আকাশের মধ্যে কোনও অসমান নেই—it is infinitely one plane, so is the true nature of Consciousness।

"আকাশবৎ নিষ্কল অহম্ নির্মল অহম্ নিরঞ্জন অহম্"। আমি আকাশের মতো নিষ্কল নির্মল নিরঞ্জন অবিভক্ত নির্বিকল্প নিরবলম্ব নির্বিকার নিরাকার নিঃসীম নিস্পন্দ—কথাগুলো একটুখানি মন দিয়ে শুনলে দেখা যাবে যে, এই শব্দগুলোর সঙ্গে আমরা খুব বেশি পরিচিত

নই। কিন্তু শুনতে শুনতে আমাদের মধ্যে এই vibration-টা আপনিই জেগে উঠবে। একদিন Peru University থেকে একজন lady professor এসেছিলেন, তিনি philosophy-র professor ছিলেন। তিনি বেনারসে অনেকদিন ছিলেন, শান্তিনিকেতনে অনেকদিন ছিলেন, Calcutta University-তে research করেছিলেন, অনেক কিছুই করেছেন। তিনি Research করতেই এসেছিলেন। তিনি কারও কাছ থেকে 'এর' কথা শুনে একদিন phone করলেন এবং নিজের পরিচয় দিয়ে 'এর' সঙ্গে meet করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 'এর' সঙ্গে দেখা করতে এসে তিনি প্রশ্ন করলেন যে, এই যে তোমাদের দেশে তোমরা ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব এগুলো চর্চা কর এর base কী? উত্তরে তাকে বলা হল, তুমি তো শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে এসেছ, বেনারসের মতো জায়গায় তুমি অনেকদিন ছিলে, অনেকের সঙ্গ করেছ, সেখানে University-তে পড়েছ, শান্তিনিকেতনে এসেছ, সেখানেও তুমি অনেকের সঙ্গ করেছ, অনেক বইপত্র পড়েছ, Calcutta University-তে এসেছ, সেখানেও তুমি অনেকের সঙ্গ করেছ এবং বই পড়েছ। তিনি উত্তরে বললেন, they could not satisfy me। তখন তাকে জিজ্ঞাসা কর হল, Why not? তিনি বললেন, those were mere words, I want the light of realization। তখন তাকে বলা হল, তুমি কি আশা করে এসেছ এখানে যে light of realization পাবে? তিনি বললেন, আমি শুনে এসেছি যে তুমি realizer। তাকে প্রশ্ন করা হল, তুমি কি তা বুঝতে পারবে 'এর' সঙ্গে কথা বলে? তিনি বললেন, চেষ্টা করব, সেইজন্যই তো এসেছি। তখন তাকে বলা হল যে, 'এর' এই বোধটা তোমার বুদ্ধি দিয়ে তুমি মাপতে পারবে না, কারণ তোমার বুদ্ধিটা limited করে তুমি একটা ছাঁচ তৈরি করে এসেছ, ঐ বুদ্ধির মধ্যে যেটুকু পাবে সেটুকুই তুমি বুঝবে, তার বাইরে কিছুই তুমি বুঝবে না। This is the conditioned state of intellect which we all possess.

আমরা যে বুদ্ধি ব্যবহার করি তা হচ্ছে একটা conditioned intellect। তার মধ্যে limited একটা ছাঁচ বা dice তৈরি হয়ে আছে। ঐ dice-এর মধ্যে যা পড়ে we can recognize that, তার বাইরে কিছুই আমরা recognize করতে পারি না। সেইজন্য দেখা যায় আমাদের মধ্যে যাঁরা মহামানব, অতিমানব এসেছেন তাঁদের living time-এ contemporary intellectuals-রা তাঁদের ঠিকমতো assess করতে পারেননি, contradict করেছেন। তাঁদের disregard করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে বাদ দিয়েও দিয়েছেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাই, ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই, সর্ব ক্ষেত্রেই তাই। তাকে আরও বলা হল যে, তুমি কি পারবে? যদি unbiased and unprejudiced mind নিয়ে তুমি বস তাহলে 'এ' তোমার সঙ্গে কথা বলবে, নতুবা নয়। কেননা 'এ' তোমাকে যে কথাটা বলবে তার কোনও ছাঁচ নেই। The Absolute has no dice at all. তার কোনও duplicate নেই যার দ্বারা তুমি Absolute-কে মেপে নেবে। তার কোনও measuring rod নেই, it is immeasurable, অপরিমেয়ম্ অগাধ গভীর, unfathomable and spontaneous। তুমি কোথা থেকে

আরম্ভ করবে? It is without any beginning or end—আদি-অন্তবিহীন। সত্য সসীম নয়, যদিও সসীমের মধ্যে সেই রূপে সত্যই প্রকাশিত no doubt, কিন্তু তার দ্বারা সত্যকে জানা যায় না। রূপ-নাম একটা মাপকাঠি। রূপের মধ্যেও gross আছে, subtle আছে, subtler আছে, subtlest আছে। নামের মধ্যেও gross আছে, subtle আছে, subtler আছে, subtlest আছে। এই কথা শুনে তিনি খুব alert হয়ে গেলেন। তিনি বললেন যে, তুমি বলে যাও আমি শুনছি। 'এ' কিছুক্ষণ কথা বলার পরে দেখা গেল তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন 'এ' চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, তুমি বলছ না? উত্তরে তাকে বলা হল, হ্যাঁ, বলছি। তিনি প্রশ্ন করলেন, কী বলছ? তাকে বলা হল, 'এ' silence-টা প্রকাশ করছে। এই কথা শুনে তিনি বিস্ময়ে বললেন, what! তখন তাকে বলা হল, Yes, silence is a language which speaks of the silence and that is the language of Absolute Reality. এই কথা শুনে তিনি একেবারে বিস্ময়ে হতবাক! কী অদ্ভুত তার expression! চোখে-মুখে যেন একটা flash খেলে গেল তার। তারপর তিনি বললেন, তুমি এ জিনিস পেলে কোথায়? উত্তরে বলা হল, তোমাদের প্রত্যেকেরই এক কথা! As if it is an object which is found somewhere. No, it is the Reality which reveals in Itself, for Itself, by Itself. তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার মধ্যে একমাত্র তুমি! তোমার I-টাই আছে, আর কিছু নেই! তখন উত্তরে তাকে বলা হল, I-কে কেন্দ্র করে তার চারধারে ভাববৃত্তিগুলি ঘুরে ঘুরে রূপে-নামে খেলে বেড়ায় নিরন্তর। আমি কিন্তু আমি-র কেন্দ্রে থেকে যায়। এখন তোমার মন খেলতে খেলতে বাইরে চলে এসেছে, রূপে রূপময় হয়েছে, বাইরে শব্দের সঙ্গে নামময় হয়েছে, সে ঘরে ফেরার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। সেইজন্য জীব আর ঘরে ফিরতে পারছে না। জীবকে ঘরে ফেরাবার জন্য একজন guide-এর দরকার, একজন দিশারির দরকার যিনি তাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবেন। কোথায়? আপনঘরে। কেননা সে নিজের ঘর ছেড়ে এই sense of otherness-এর সন্ধানে বেরিয়েছে।

এই sense of otherness হচ্ছে একমাত্র কারণ for creations। কাজেই 'এ' অজ্ঞান বলে কোনও বস্তুকে খুঁজে পায়নি। যদিও অজ্ঞানটা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তা জ্ঞানেরই একটা অংশ। সেইজন্য 'এ' অজ্ঞানকে অন্য অর্থে ব্যবহার করেছে। কিন্তু sense of otherness জেগেছিল এক নিজেকে বহুরূপে আস্বাদন করবে বলে। এক আমি বহু হলে কীরকম হয়—এই যে concept, vibration বা thought, এই যে idea এটা প্রথমে জেগে উঠেছিল বোধময় আমিসত্তার বক্ষে কিংবা অখণ্ড আমিময় বোধসত্তার বক্ষে। সেইজন্য এই চিন্তাকে আদি চিন্তা বা আদি ইচ্ছা বলা হয়। অনাদিসত্তার বক্ষে এই ইচ্ছা জেগে উঠেছিল, যদিও এই সত্তা এক আমি, তাতে কিছুই নেই, কোনও সৃষ্টি নেই। সৃষ্টির আদিতে কী ছিল, কী ছিল না, তা বলবার জন্য কোনও subject-ই নেই। Subject না-থাকলে object-ও নেই। But the Reality existed as It exists and shall remain the same. কিন্তু সেই Reality হচ্ছে বোধে বোধময় আমিসত্তা। আগেরদিন কথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বোধমাত্রই কিন্তু আমি এবং

আমিমাত্রই বোধ। এই আমি রয়েছে, ছিল এবং থাকবে। আমিশূন্য বোধ হয় না এবং বোধশূন্য আমি হয় না। সুতরাং অখণ্ডবোধ যখন, তখন অখণ্ড আমি। Silence বোধ যখন, তখন silence আমি। এই কথা শুনে তিনি (Dr. Jimmy) বললেন, আমি তো tape recorder নিয়ে আসিনি। তখন তাকে বলা হল, permanent tape-recorder হচ্ছে তোমার mind, mind-এ tape করে নিয়ে যাও। এই কথা শুনে তিনি বললেন, what! তাকে বলা হল, Yes! শ্রুতির বিজ্ঞান যন্ত্রের মাধ্যমে তুমি নিতে পারবে না। যন্ত্র তোমাকে যন্ত্রণা দেবে। শ্রুতির বিজ্ঞান তোমার নিজের মধ্যেই রয়েছে। এই সমস্ত তত্ত্বগুলি শুনে you just identify yourself with that। তখন তিনি বললেন, এই বিদ্যা তো আমার জানা নেই! তখন উত্তরে তাকে বলা হল, তাহলে right use করতে তুমি পারছ না। Wrong use করলে কিন্তু তুমি result right পাবে না। অঙ্কের first step যদি তুমি ভুল কর তাহলে প্রত্যেকটি step তোমার ভুল হয়ে যাবে। You will follow the wrong process step after step and you will never reach the right result. আমাদের জীবনেও ঠিক তাই হচ্ছে! আমরা যে জীবনে কোথায় ভুল করে এসেছি we cannot recognize that!

তাহলে আমাদের কী করা দরকার? এমন একজন realizer দরকার যিনি তা point out করে ভুলটুকু সরিয়ে দেবেন। এগিয়ে চল—"চরৈবেতি", চলতে থাক, go ahead, থামবে না। Don't stop until and unless you reach the goal—that means until and unless you find only your Self everywhere in everything for all time as it is. That is the goal. 'এ' goal-এর কথা বলেছে বলে অনেকেরই হয়ত মনে সংশয় জাগতে পারে যে, এই goal-এর অর্থ কী? এই goal হচ্ছে নিজের পরিচয়। "কোঽহম্" অর্থাৎ আমি কে? Self-enquiry বা নিজস্বরূপের অনুসন্ধান। নিজের অনুসন্ধান কে করছে? নিশ্চয়ই Real I নয়, কারণ Real I তো কখনওই হারায়নি। তাহলে কে করছে? Real I-এর বক্ষে আমি-র বহু হবার যে সংকল্প বা expression, that is the first vibration সত্তার বক্ষে। Silence-এর বক্ষে যখন জেগে উঠল সেই vibration, আস্তে আস্তে একের পর এক vibration ছড়িয়ে পড়ল। পরস্পর vibration-এর মধ্যে যে distance সেখান থেকেই space এবং time সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ 'এ' যেরকম দেখেছে তা-ই বলছে, কিন্তু যারা ভাষাবিদ্ তারা হয়ত আরও সুন্দর ভাষায় এটাকে explain করতে পারবেন। কিন্তু subject matter-টা 'এ' সবার সামনে রাখছে। If you require to explain it very methodically and scientifically with very appropriate words permitted by your inner understanding you can attempt that. কিন্তু তা আপনা থেকেই প্রকাশ হবে। তা প্রকাশের জন্য কোনও বাইরের সাহায্যের দরকার হবে না। সূর্যকে আলো দেবার জন্য দ্বিতীয় একটা সূর্যের দরকার হয় না কারণ সূর্য স্বয়ংজ্যোতি স্বয়ংপূর্ণ। It does not have to borrow the light and heat from any other second entity. এই একটা স্থূল উপমা দেওয়া হল।

Real I does not care for any second entity, does not bother for any second entity to express Itself and reveal Itself in the light of Oneness i.e., in the light of relativity outwardly, duality inwardly, unity centrally and spontaneous identity transcendentally which is unqualified, attributeless, non-dual, eternal One, Self-abiding, Self-revealing. তা স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব। স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব স্বয়ং বোধে বোধময়। এ কথা শুধু প্রত্যেকের real আমি-র জন্য বলা হচ্ছে। প্রত্যেকের ভিতরে এই আমি আত্মারূপে রয়েছে। তারও গভীরে তা পরমাত্মা অর্থাৎ হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে। তা-ই হল transcendental state। তুরীয়সত্তা, তার বক্ষেই কেন্দ্রসত্তা প্রতিষ্ঠিত, উভয়ে অভিন্ন যোগে সুসংস্থিত, তা কেবল স্বানুভবসিদ্ধ। কেন্দ্রসত্তা হল অন্তর্সত্তার অধিষ্ঠান। অন্তর্সত্তা আবার বহির্সত্তার অধিষ্ঠান। অন্তর্সত্তা ও বহির্সত্তা উভয়ই আবার অনুভূতিসাপেক্ষ। কিন্তু কেন্দ্রসত্তা ও তুরীয়সত্তা হল স্বানুভূতিসাপেক্ষ। স্বানুভবসিদ্ধ আমি হল পাকা আমি এবং অনুভবসিদ্ধ আমি হল কাঁচা আমি। কিন্তু আমরা ইন্দ্রিয়-মন নিয়ে রাতদিন ব্যস্ত থাকি বলে আমরা তার খবর রাখি না। তার মানে finite-এর সঙ্গে যুক্ত থেকেও আমরা স্বরূপত finite হয়ে যাইনি। মানুষকে inspire বা enlighten করার জন্য এই কথাগুলো দরকার। প্রত্যেকের মনে রাখতে হবে যে, you are a man in appearance but not limited permanently. Your true nature is infinite Self which is beyond the range of mind and intellect. তা মন-বুদ্ধির অতীত, 'বাক্যমনাতীতম্ বাকমনসোগোচরম্ সত্যম্ আত্মস্বরূপম্ সর্বভূতানাম্ হৃদ্‌দেশে তিষ্ঠতি।'

সর্বহৃদয়াকাশে বিরাজমান তোমার আমি-র আমি। আত্মা একটা imaginary concept নয়। তোমার আমিকে যতটা তুমি ছোট ভাবছ ততটা কিন্তু নয়। অথচ সেই আমি দিয়েই তোমরা সবকিছু সাধন কর। তোমার এই আমি তো সেই আমি-রই প্রকাশ। Why should you degrade yourself? আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করবে কেন? Why should you consider yourself to be limited and finite one? এই জীবভাব হচ্ছে তোমার কল্পনা, তা তোমার dream. Rise up and think you are not limited by your body, senses, ego, mind, intellect—all are nothing but different expressions of your Real I which exist in the core of your heart. হৃদয়ের গভীরে বিরাজমান তোমার আসল সত্তা, সেখানে দুই নেই। মনের ভিতরে দুই এবং ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বহু। এই দুইয়ের পশ্চাতে এক রয়েছে। সেই এক কিন্তু তুমি, তারও উর্ধ্বে সেও তুমি। তোমার infinite nature-এ কোনও limitation নেই, you are beyond limitation, beyond গুণ, ত্রিগুণাপ্রকৃতির অনেক উর্ধ্বে তুমি।

তাই অর্জুনকে বলা হয়েছিল, "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।" বেদ হচ্ছে ত্রিগুণের ধারা, তিন গুণ দ্বারা সৃষ্ট বেদ। কর্মকাণ্ডে বহু শাখা, আমাদের ভোগের জন্য, আরামের জন্য আমরা কর্মকাণ্ডকে ব্যবহার করি। এই দেহের জন্য, আমাদের পারিপার্শ্বিক

পরিবেশের জন্য আমরা কর্ম করি, কিন্তু সেই কর্মচক্রের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে জানি না। আমরা প্রবেশ করেছি কর্মক্ষেত্রে, কিন্তু আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু মানুষের ভিতরে যে নিরন্তর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়ে চলেছে সেই খবর মানুষ রাখে না। যাই হোক, এই যে কর্ম এটা হল একটা lowest unit of Consciousness-এর ক্ষেত্র অর্থাৎ কর্মক্ষেত্র। এখান থেকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাই যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা মানুষকে সর্বদা আশ্বাস দেন, এগিয়ে যাবার জন্য তাদের উৎসাহ দেন, উদ্দীপনা জাগিয়ে দেন এবং বলেন যে, তোমরা আরও এগিয়ে যাও, এর পরে আরও আছে।

বহু বছর আগেকার কথা, 'এই শরীরটা' তখন খুব ছোট। 'এর' বড় ভাই, মেজদাদা মাকে একটা গল্প বলেছিল। তখনকার দিনে Matriculation course-এ একটা ইংরাজি (Lahiri Select Poems) কবিতার বই ছিল। কবিতার নাম ছিল 'Light house'। 'Light house' কবিতার বিষয়বস্তু হল—পিতা পুত্রকে নিয়ে বিদেশ থেকে ঘরে ফিরছেন, দেশে ফিরছেন জাহাজে করে। মা সন্তানের জন্য ঘরে অপেক্ষা করে আছেন। কিন্তু যেই জাহাজ করে তারা আসছিলেন সেই জাহাজটা wrecked হয়ে যায়। সমুদ্রের নিচে অনেক পাহাড় থাকে, সেই পাহাড়ের ধাক্কায় জাহাজ ভেঙে সমুদ্রে ডুবে যায়। জাহাজ যখন ডুবে যায় তখন জাহাজের যারা মূল কর্মকর্তা তারা যতটা পারে সব যাত্রীদের boat এবং buoy-র মাধ্যমে জাহাজের থেকে নেমে যেতে বলছিল। পিতা তার পুত্রকে নিয়ে যখন নেমেছেন তখন একটা wave আসাতে buoy-টি তাদের কাছ থেকে সরে যায়। তখন পিতা পুত্রকে বুকে নিয়ে সাঁতার কেটে অপর পারে যেতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন বাঁচার ইচ্ছার তাগিদে। ঠাণ্ডায় পুত্রের শরীর প্রায় জমে যাচ্ছে। তার পিতা খালি inspire করে পুত্রকে বলছেন—এই তো বাবা এসে গিয়েছি। দেখ মা তোমার জন্য cake বানিয়ে অপেক্ষা করছে। তোমার জন্য ঘর সাজিয়েছে, তোমার বিছানা করে খেলনাগুলো সাজিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। এই ভাবে পিতা পুত্রকে constantly অর্থাৎ তার mind-কে inspire করতে করতে নিয়ে আসছেন। পিতা পুত্রকে বলছেন, ঐ যে দেখ light house দেখা যায়! আমরা তো পারে এসে গিয়েছি। (Light house মানে কী? এইরকম সমুদ্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কতগুলো tower থাকে, তাতে লোক থাকে যারা দিকভ্রষ্ট জাহাজগুলোকে দিক নির্ণয় করে দিতে সাহায্য করে। কেননা সমুদ্রে যাত্রীদের নানা রকম বিপদ face করতে হয়। এই light house-এর মাধ্যমে পূর্ব থেকে জাহাজের কর্মকর্তারা বিপদের সংকেত পায় এবং সেইমতো জাহাজের পথ পাল্টে ফেলে।) এই light house দেখিয়ে পিতা যতই পুত্রকে inspire করার চেষ্টা করছেন পুত্রও যেন ততই collapse হয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডায় সে যেন আর পারছে না। পিতাও utmost চেষ্টা করে যাচ্ছেন সাঁতার কেটে পুত্রকে নিয়ে পারে আসার জন্য। Light house-এর থেকে জাহাজের কর্মকর্তারা light ফেলে দেখতে পায় যে, দুটি প্রাণী যেন ভাসতে ভাসতে আসছে এবং struggle করছে। Immediately তারা relief force পাঠিয়ে দেয়। সেই relief

worker-রা যখন কাছে আসছে, একেবারে nearest, তখনও পিতা পুত্রকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন, আর ভাবনা নেই, দেখ এরা আমাদের নিতে এসেছে। তোমার মা লোক পাঠিয়ে দিয়েছে। শুধু মায়ের কথা বলে পিতা পুত্রকে inspire করছেন। 'এ' যেমন শুনেছিল ঠিক সেই ভাবেই তোমাদের সামনে বলছে।

তা আজকের কথা নয়, তা হল প্রায় ১৯৩৩/৩৪ সালের কথা। 'এর' গর্ভধারিণী মা শুনছেন আর ক্রমাগত তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। 'এ' মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখছে একবার, আরেকবার দাদার দিকে তাকিয়ে দেখছে। 'এ' ছোটবেলায় অতিরিক্ত দুষ্টু ছিল, এখনও তাই। কারণ দুষ্টুমি না-থাকলে লীলা করা যায় না। ঐ sober, sublime nature নিয়ে লীলা হয় না (হেসে)। মা হঠাৎ বোধহয় খুবই shock পেলেন। দাদা মাকে বলল, মা এই আরেকটু বাকি আছে, তুমি শুতে যেও না, একটুখানি শুনে যেও। যখন relief-এর লোকেরা পিতার কাছে এল তখন পিতা তাদের বলছেন যে, দেখ শিগগিরি একে গরম সেঁক দাও, গরম দুধ খাইয়ে ওকে সতেজ করে দাও। ওর মায়ের কাছে ওকে নিয়ে যাব, মা ওর জন্য কেক বানিয়ে অপেক্ষা করছে। এই কথা বলতে বলতে পিতাও collapse করে গেলেন। 'এর' পরিষ্কার মনে আছে, এই কবিতাটা শোনার পর দাদাকে বলা হয়েছিল, দাদা, বাবার কী sacrifice না! দাদা বলল, তুই শুনেছিস বসে বসে? তখন বলা হল, হ্যাঁ, খুব ideal father না! এরকম father যদি ঘরে ঘরে হয় তাহলে সন্তানদের inspire করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। দাদা 'এর' মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। So is the functions of a Real Guru. Real Guru কী করছেন? তাঁর কাছে surrendered যে life, যে আত্মসমর্পণ করেছে তাকে তিনি উদ্ধার করবেনই, যদি তিনি সদ্‌গুরু হয়ে থাকেন। 'এ' professional গুরুর কথা বলছে না, cent percent perfectly devotional গুরুর কথা বলা হচ্ছে। যেমন এখানে father ছেলেকে পারে তুলে রেখে দিয়ে গেল, সেরকম গুরুও তাঁর শরণাগত ভক্তকে ভবনদী পার করে দেবেন....।

সাধু আমাদের দেশে অনেক আছে, প্রায় দেড়-দুই কোটি। কিন্তু ভারতবর্ষের এই দুরবস্থার জন্য তাঁরা কেউ এগিয়ে আসছেন না। যদিও 'এর' কাছে এগুলোর কোনও মূল্য নেই। একসময় সাধুদের উদ্দেশে বলা হয়েছিল যে, তোমরা সমাজের থেকে অনেক কিছু নিয়েছ, কিছু দিতে হবে তো তোমাদের। না-দিলে কিন্তু তোমাদের reaction ভোগ করতে হবে। এই কথা শুনে অনেকেই বলেছিলেন, জীব আপনা সংস্কারকে লিয়ে দুর্ভোগ ভোগ করতা হ্যায়, হাম লোগ ক্যেয়া কর সকতে হ্যায়? উত্তরে বলা হয়েছিল—ইয়ে ক্যেয়া বাত হ্যায়? তুম লোগ সমাজসে যো লেতে হো, উসকো লওটানা ভি পড়েগা। তুম দুকানমে গয়ে, কোই আচ্ছা সা মেহেঙ্গা সামগ্রী লিয়া, লেকিন আগর পয়সা নেহী দিয়া তো ক্যেয়া ও ঠিক হোগা? কুছ দেনা পড়েগা তুমকো। তখন তারা বললেন, হাম তো সাধু আদমী হ্যায়, হামারে পাস তো কুছভি নেহী হ্যায়। তখন তাদের বলা হয়েছিল, তুমহারে পাস সত্য হ্যায়, শ্রদ্ধা হ্যায়,

ভক্তি বিশ্বাস হ্যায়। আগর ইয়ে সব নেহী হ্যায় তো তুম ক্যায়সা সাধু হো? ওহি তো দেনা পড়েগা। সংসারী লোগোকো শিক্ষা দো। সত্য কো ধারণ করনে কি শক্তি দে দো। উন লোগো কো সমঝাও, রাস্তা বাতলাও। ও ভুল কিয়া, পর তুম তো সাধু হো, উসকো light দো, জ্ঞান দো। উসকা ভ্রান্তি হঠাও, নেহী তো ক্যায়সে সাধু হো তুম! সির্ফ নাম সে ইয়া পোশাক পেহেননে সে কোই সাধু নেহী বনতা! এই কথা শুনে তারা বললেন, ইয়ে বাচ্চা তো বহুত তেজী বাত করতা হ্যায়, ইয়ে কৌন হ্যায়? তখন তাদের বলা হল, হাম তুমহারে আপনে হ্যায়, সবকা আপনা হ্যায়। ইয়ে খেলনে আয়া হ্যায়, আকেলা নেহী খেল সকতে, খেলনে কে লিয়ে বৈচিত্র্য চাহিয়ে। তুমলোগ তো খেলনে কে লিয়ে আয়া। তুমহারা যো role হ্যায় ও ভি এক খেল হ্যায়। সাধু কা role তুম নিভায়ো। গুম্ফামে রহেনে সে কোই ফয়দা নেহী হোগা। আপনা হৃদয় গুম্ফামে প্রবেশ করো। বাহার কা গুহামে রহকে কোই ফয়দা নেহী হোগা।

'এ' তো দুষ্টু number one, কাউকেই তো পরোয়া করে না। কিন্তু সত্যই দেখা যায় যে মানুষ মানুষকে আপন করতে পারে না, দেবতাকে আপন করবে কী করে? How is it possible? ঘরে ঘরে ভগবান, living God, তাকে ফেলে মানুষ কোথায় ছুটছে ভগবানের সন্ধানে। এর চাইতে deluded soul আর কে থাকতে পারে! একজন মূর্খ হতে পারে, কিন্তু lifeless নয়। Life-এর কাছে life-এর মূল্য আছে। আমাকে আমি যতখানি ভালবাসি ঠিক ততখানি আমি তো অপরকে ভালবাসতে পারি, কিন্তু কেন ভালবাসছি না! Why should I not love others. I myself dwell in all of them as I. I am the all-pervading Reality. অখণ্ড সত্তারূপে আমি যেখানে আছি সেখানে আমার বাইরে কে আছে? কেউ নেই। সবগুলো তো আমারই মূর্তি। এটা (নিজেকে নির্দেশ করে) যেমন আমার একটা মূর্তি, এগুলোও সব আমার মূর্তি, সারা বিশ্বে সবই আমার মূর্তি। I cannot go against myself, I cannot fight against Myself, I cannot kill Myself. সেইজন্য কাউকে হত্যা করার মতো মহাপাপ আর কিছু নেই। কিন্তু সেই পাপকে কী আমরা feel করি? Feel করি না। নিজের প্রিয়জনকে আমরা কষ্ট দিতে ভুল করি না একটুও। সে কথা ভেবেও দেখি না। অথচ আমরা শাস্ত্র পড়ি, তীর্থ করি, ধর্ম করি—এগুলো সব বিলাসিতামাত্র।

'প্রাণ বোঝে প্রাণের মর্ম অন্যে বোঝে না। মন বোঝে মনের মর্ম অন্যে বোঝে না।' কাজেই প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিল হবে—এ তো স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছু নয়। মনের সঙ্গে মনের মিল হবে। 'এ' সেই Oneness-এর কথা বলছে যেখানে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। That is the unity and identity of all as One eternally and that One dwells everywhere in every creation, in every manifested being. 'এ' ধর্মের ধর্মের কথা বলছে, বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের কথা বলছে, দর্শনের দর্শনের কথা বলছে। এগুলো imaginary concept নয়। 'এ' সাধু নয় আবার অসাধুও নয়। আমি আমি-ই। এই আমি-র পরিচয় আমি বহন করে চলেছি অনাদিকাল, যেই আমি-র different aspects হচ্ছে দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, কলা সবই মনেরই manifestation। কিন্তু বোধস্বরূপ আমি

না-থাকলে কার জন্য এগুলো? কে প্রকাশ করছে এগুলো? কার কাছে? For whom, Who? Verily your 'I', the supreme Godhead, পুরুষোত্তম। God of all other gods is verily 'I' of you. 'এ' কোনও মতবাদের কথা বলছে না, প্রথমেই বলা হয়েছে যে, মতবাদের সঙ্গে 'এর' কোনও সম্পর্ক নেই। 'এ' কোনও কিছুকে degrade-ও করে না, upgrade-ও করে না। 'এ' কাউকে প্রশংসাও করতে শেখেনি, আবার কারও নিন্দা করতেও শেখেনি।

'এ' শুধু point out করছে সেই One-কে। You have forgotten your true Self somehow or other. Rise up, be conscious, be alert and be Self-possessed. You are not born to suffer trains of miseries. খালি দুঃখ ভোগ করার জন্য তুমি দেহধারণ করে আসনি। 'এ' তা কিছুতেই ছোটবেলা থেকেই স্বীকার করতে রাজি ছিল না। দুঃখও তো আমার attribute বা glory। আমি থাকলে দুঃখ ও সুখ থাকবে। I am more than সুখ-দুঃখ। Why should I care for সুখ-দুঃখ? 'জন্মমৃত্যু পায়ের ভৃত্য'—কী সুন্দর কথা! কিন্তু আমরা তা মনে রাখি না কেন? খালি মৃত্যুভয়েই সব সন্ত্রস্ত। আরে মৃত্যুটা তো expression of knowledge, জন্মটাও তাই! কার বক্ষে? অখণ্ড আমি-র বক্ষে। তুমি কিন্তু আমিশূন্য আমি হয়ে যেতে পারবে না। Remember My words. This is your true identity. তোমার সত্য পরিচয় অমুক চন্দ্র অমুক নয়। ঐ দেহটুকুই তোমার পরিচয় নয়। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্ত লোমকূপের মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে তোমার ভিতরে। You are so infinite! সেখানে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তো একটা তিল, পোস্তদানার মতো, তার থেকেও ক্ষুদ্রতর। এই নিজের infinite glory কেন ভুলে যাবে? কে তোমাকে উদ্ধার করবে তুমি ছাড়া? There is none to save you apart from your own Self. Your Self is the only saviour, not of your Self only but also of all others. Because you exist in all of them as verily the Consciousness.

'এ' কিন্তু নূতন ভঙ্গিমায় ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞানকে অভিনব একবোধ তথা আপনবোধের দৃষ্টিতে তোমাদের সামনে রাখছে। It is only Consciousness which can give the intrinsic value of all our thoughts, ideas, actions and results. Without Consciousness nothing is solved. কাজেই চেতনরূপে প্রত্যেকেই আমরা চেতনার পুতুল বা প্রতিমা। চৈতন্যকেই represent করছে প্রত্যেকে। None is devoid of Consciousness. Everybody is full of Consciousness. You just exercise your Consciousness. তোমার চেতনার দ্বারাই তুমি জানছ তোমার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্তকে এবং তাদের কর্ম ও ফলকে। প্রত্যেকেই তাই। বাইরে নানা রূপ-নাম- ভাব, ঊর্ধ্বে আকাশমার্গে তার অনন্ত মহিমা, পাহাড়পর্বতে অনন্ত মহিমা, সমুদ্রগর্ভে অনন্ত মহিমা, বনপ্রান্তরে অনন্ত মহিমা—সবই চৈতন্যেরই কতগুলো প্রকাশ, আর কিছুই নয়। Without Consciousness nothing is understood, nothing is perceived, nothing is realized. কথাগুলোর মধ্যে essence-টা কী? শুধু বোধ খেলছে। বোধই বলছে, বোধই

শুনছে। Personification is also an expression of Consciousness. কত রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ চলে গিয়েছেন উঠে ভেসে।

একবার এক বৈষ্ণববাবা এসেছিলেন নবদ্বীপ থেকে। তিনি কট্টর বৈষ্ণব। তিনি কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কারও ভজনা করেন না। বৈষ্ণবভাব নিয়েই তিনি আছেন। আরেকজন বৈষ্ণবের মাধ্যমে 'এর' কথা শুনে তিনি এসেছিলেন। তিনি এসে হাতজোড় করে প্রণাম করে বসলেন। 'এ' চুপ করে বসেছিল। তিনি বললেন যে, একটু কৃষ্ণ কথা শোনাবেন? প্রথমবার তার প্রশ্নের কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার তিনি আবার বললেন, একটু কৃষ্ণকথা শুনতে এলাম আপনার কাছে! তখন তাকে বলা হল, কত নম্বরের কৃষ্ণের কথা শুনতে চাও? তিনি বললেন, কত নম্বরের কৃষ্ণ মানে? তখন তাকে বলা হল, বাহাত্তরটা কল্প তো হয়ে গিয়েছে। এক এক কল্পে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি বাহাত্তরবার এসেছে। এটাকে বলে মহাযুগ। মহাযুগ বাহাত্তরবার হয়ে গিয়েছে, অন্তত যতটুকু হিসাব করে ধরা পড়েছে 'এর' কাছে সেটুকুই বলা হচ্ছে। তার বাইরে আরও আছে। দ্বাপর আর কলির সন্ধিক্ষণে যে presiding deity Consciousness সেই কৃষ্ণ বাহাত্তরবার এসে চলে গিয়েছেন, তুমি কত নম্বরেরটা শুনতে চাও? এই কথা শুনে তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। তিনি ভাবলেন 'এ' কৃষ্ণকে degrade করছে। তার পরে তিনি বললেন যে, তোমার কাছে এলাম এত আশা করে আর তুমি আমাকে নিরাশ করছ? উত্তরে তাকে বলা হল, না, তোমার কত নম্বর কৃষ্ণের কথা শুনতে ভাল লাগবে তা-ই বল! চাইছ কত নম্বরের কৃষ্ণকে? তুমি যে বৃন্দাবনলীলার কথা বলছ, বৃন্দাবনলীলা বাহাত্তরবার হয়ে গিয়েছে। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, বাহাত্তরবার হয়ে গিয়েছে! তখন তাকে বলা হল, হ্যাঁ। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি এসব জানলে কী করে? তখন তাকে বলা হল, যা করে তুমি এক কৃষ্ণের খবর রাখ, ঠিক সেরকম করেই 'এ' বাহাত্তরজন কৃষ্ণের খবর রাখে। তিনি বিস্ময়ে বললেন, সেকী! তখন তাকে বলা হল, ঘাবড়িয়ে যেও না, এর কী শেষ আছে? ঈশ্বরতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের কি কখনও আদি-অন্ত করতে পারবে? তোমার যেটুকু দরকার সেটুকু পেয়েও কিন্তু তুমি পরিপূর্ণ তৃপ্ত হবে না, তোমার মনে হবে আরও চাই, কেননা অল্পে তুষ্টি নেই।

"নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্"—অল্পে কারও তুষ্টি বা সুখ নেই। অখণ্ডবোধের নাম সুখ। 'এ' ছোট করে সংজ্ঞা বলছে। অখণ্ডবোধের নাম সুখ। স্বল্পবোধের নাম সুখ নয়, তা আরাম। কাজেই আমরা আরামকে সুখ বলে ভুল করি। "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।" অল্প হচ্ছে মর্ত্যম্, ভূমৈব অমৃতম্। তাহলে অমৃতই সুখ। সুখ মানে অখণ্ড, অখণ্ডই হল সত্য, সত্যই হচ্ছে জ্ঞান, জ্ঞানই হচ্ছে আনন্দ, আনন্দই হচ্ছে প্রেম এবং প্রেমই হচ্ছে মুক্তিশান্তি। তুমি এর থেকে কোনটাকে বাদ দেবে? তুমি তো বলছ, আমি ভাগবত। ভাগবত তো বলছি তোমাকে। 'এ' ভাগবতই তো বলছে কারণ 'এ' ভাগবত ছাড়া আর কিছু জানে না। ভাগবত শব্দের অর্থ হচ্ছে ভগবানকে যে ভালবাসে তাকে বলা হয় ভাগবত। ভগবান মানে আত্মা। আত্মাকে একমাত্র আত্মাই ভালবাসতে পারে, অনাত্মা ভালবাসতে পারে না। কাজেই ঋষিবাক্য যদি

মান তাহলে কী দেখবে? "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।" অর্থাৎ পতি যে পত্নীকে ভালবাসে বা পত্নী যে পতিকে ভালবাসে উভয়ের মধ্যে এক আত্মা আছে বলে তা সম্ভব। এই এক আত্মা না-থাকলে কেউ কারওকে ভালবাসত না। আমরা dead body-কে ভালবাসি না। পত্নী গত হলে পতিও পত্নীর dead body তাড়াতাড়ি করে বাড়ির থেকে সরিয়ে দেয়। পত্নীও তাই করে। তার পরে মৃতদেহকে 'টেল হরি হরি টেল' করে বাড়ির থেকে বিদায় করে দেয়। তুলসীপাতা, গোবর জল ছড়িয়ে শুদ্ধ করে—অমঙ্গল হবে এই কল্পনায়, তাই মঙ্গল করার ব্যবস্থা করে দিল। এই ভাবে আমরা আমাদের মনের কল্পনা বা বিকারকে প্রশ্রয় দিয়ে চলি। কিন্তু পুত্র পিতার সঙ্গে যে সম্পর্ক তা এক আত্মার সম্পর্ক। বাইরে দেহের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক কিন্তু নিত্য নয়। তা ক্ষণিকের, স্বল্পকালের জন্য। কাজেই তা আত্মা হতে পারে না। আত্মার দৃষ্টিতে সবই আত্মময়, অনাত্মার দৃষ্টিতে সবই অনাত্মা।

আত্মা কালাতীত, দেশ-কালের অতীত, কার্য-কারণের অতীত। নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা, সর্বভূতাত্মা, 'সর্বভূত হৃদ্‌দেশে তিষ্ঠতি'। আত্মা সবার হৃদয়ে বাস করছে। কীরূপে? সবার আমি-র আমি রূপে। অহংদেব স্বয়ং স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব, অহংদেব স্বয়ং পুরুষোত্তম পাকা আমি। 'স্ব' মানে আত্মা, আপনবোধ। আপনবোধে দ্বিতীয় কোনও বোধ থাকতে পারে না। তাহলে তা আপনবোধ হয় না। কাজেই "স্ববোধে ন অন্যবোধেচ্ছা"—স্ববোধে অন্য কোনও বোধের ইচ্ছাই হতে পারে না। "স্ববোধেন অন্যবোধেচ্ছা", "স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা বোধরূপ তয়াহি আত্মনঃ।" বোধস্বরূপ হচ্ছে আত্মা বা পাকা আমি। "বোধরূপ তয়াহি আত্মনঃ স্বাত্মবোধরূপ পুরুষোত্তমোঽহং।" একে দুই দিক থেকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। "স্ববোধে ন অন্যবোধেচ্ছা"—স্ববোধে অন্যবোধ থাকে না। আর যদি "স্ববোধেন অন্যবোধেচ্ছা" বলি তবে এর অর্থ হল—স্ববোধের দ্বারাই অন্যবোধ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ আমিবোধ দ্বারাই সব বোধ সিদ্ধ হয়। কাজেই সাতের ঘরে এবং তিনের ঘরেও আমিই রয়েছি। তার কারণ তিনের ঘরে triangular fight আর সাতের ঘরে স্থিতি। যেমন চল রে ভাই ঘরে যাই। ঘরে এ-কার, এ-কার সপ্তমী বিভক্তি। 'আমার' মধ্যে এই জিনিসটা নেই। সপ্তমী বিভক্তি 'আমার' মধ্যে। অর্থাৎ এ-কার দিয়ে হয় সপ্তমী বিভক্তি নির্দেশ আর তৃতীয়া বিভক্তি হচ্ছে দ্বারা দিয়ে বা কর্তৃক অর্থাৎ সংস্কৃতে তাকে বলছে "বোধেন", বোধের দ্বারা। কাজেই তৃতীয়া বিভক্তি এসে গেল।

আজকে pertinent প্রশ্ন যা তা হল, বোধ অন্তরের থেকে অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করলে কীরকম লক্ষণ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করলে কীরকম লক্ষণ প্রকাশ পায়? তার স্থূল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আমরা কাজ করতে করতে যখন ক্ষণিকের জন্যও একাগ্র হই তখন আমাদের আশেপাশের কোনও চিন্তা বা ভাবনা থাকে না, কী ঘটনা ঘটছে তাও আমরা জানতে পারি না। যখন তা জানা যায় তখন মনে হয়, আরে আমি তো টের পাইনি!

তার মানে মন যদি একাগ্র হয় তাহলে বাইরের খবর রাখা যায় না। আবার বাইরের খবর রাখলে মনকে একাগ্র করা যায় না। বাইরের কাজ শেষ করে রাত্রে সবাই ঘরে ফেরে যখন (ঐ সপ্তমী বিভক্তি ঘরে ফিরল) তখন বিশ্রাম করে। বিশ্রাম করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। তখন দেহ-ইন্দ্রিয়-মন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণ নিষ্ক্রিয় হয় না। তখনও প্রাণের ক্রিয়া চলতে থাকে। তা না-হলে তো dead হয়ে যাবে। কিন্তু জগতের variation সম্বন্ধে কারওর কোনও ধারণা নেই। তার মধ্যে স্বপ্নের অবস্থায় আরেকটা জগৎ সৃষ্টি করছে মন এবং তা ভোগ করছে। আর গাঢ় নিদ্রার মধ্যে সব absent, সেখানে আমি-র আমি অনুভব করছে নিজের স্বরূপকে। সেখানে all absent, all free। সেখানে কী? "সর্বাত্মকোঽহম্", "সর্বশূন্যোঽহম্", "সর্বাতীতোঽহম্।" আমি তখন 'স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কারণাতীতোঽহম্।' 'স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কারণাতীতোঽহম্'—আমি তখন এই ক্ষেত্রে (তর্জনী নির্দেশ করে)। 'রূপ নাম ভাবাতীতোঽহম্। সর্বরূপ সর্বনাম সর্বভাবাতীতোঽহম্'— সর্বস্থূল সর্বসূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর। সর্বাতীত হয়ে গেলে এখানে (তর্জনীর দিকে নির্দেশ করে) নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। নিষ্ক্রিয় হওয়ার অর্থ অকর্তা, অভোক্তা ও অজ্ঞাতা হয়ে যাওয়া। তখনই right use, right knowledge এসে গেল। কাজেই তখন 'অকর্তাঽস্মি অভোক্তাঽস্মি অবিকারোঽস্মি অক্রিয়।' তখন আমি অকর্তা, আমি অভোক্তা, আমি অবিকারী। কেননা ক্রিয়া নেই সেখানে, বিকার আসবে কোথা থেকে? No action, no modification, no energizm. Energy comes to standstill position. তখন শান্ত হয়ে আসছে।

শান্ত না-হলে আমরা শান্তিলাভ করতে পারব না। একটা চলন্ত গাড়িকে ঠিক করা যায় না, চলতে চলতে যদি খারাপ হয়ে যায়, a running defective car cannot be repaired। তাকে থামাতে হবে, তাকে ঠাণ্ডা করতে হবে, observe করতে হবে তবেই তাকে repair করা যাবে। জীবনে যদি বিকার আমাদের কিছু হয় তবে সেই বিকার শোধন করতে হলে আমাদের প্রথমে শান্ত হতে হবে, we must relax ourselves first। সেখানে বুদ্ধির জারিজুরি কিচ্ছু খাটবে না। কাজেই শান্ত হয়ে observe করতে হবে দোষটা কোথায়? You must find out the fault. কিন্তু আমরা তো এভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নই। কাজেই এই যে course, এই course-টা সম্পূর্ণ আলাদা বলে 'এ' সমস্ত course-এর essence-টা তোমাদের বলছে, কেননা এগুলোর সঙ্গে হয়ত তোমাদের কিছু কিছু পরিচয় আছে, কিন্তু আসলের সঙ্গে পরিচয় নেই। এগুলো করতে গিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের স্বরূপের থেকে বিচ্যুত হয়েছি অর্থাৎ বিস্মৃত হয়েছি, আত্মবিস্মৃত হয়ে রয়েছি।

আমরা অন্য জিনিসের importance দিতে গিয়ে নিজেকে ভুলে আছি, we give more importance to something else which is other than our own Self, i.e. Pure Consciousness। আমরা conditioned consciousness, qualified consciousness, mixed consciousness, limited consciousness, alloyed consciousness-কে মূল্য দিচ্ছি, কিন্তু Pure Consciousness-কে মূল্য দিচ্ছি না। সেইজন্য আমরা পৃথক পৃথক

ভাবে আমিগুলোকে দেখছি। কেননা আমাদের দৃষ্টিটা রয়েছে ভেদের ঘরে, ইন্দ্রিয়ের ঘরে। ইন্দ্রিয়ের ঘরে ভেদ, অতীন্দ্রিয়ের ঘরে অভেদ। অতীন্দ্রিয়ের ঘরে আমরা ঘুমের মধ্যে যাচ্ছি, কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় যেতে পারছি না তো! জাগ্রৎ অবস্থায় যাতে যাওয়া যায় সেইজন্যই কথাগুলো বলা হচ্ছে এবং তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, Pure Consciousness is always awake. Consciousness-এর মধ্যে কখনও নিদ্রা, বিকার, ক্রিয়া, অর্থাৎ কর্ম, কর্তা এবং কর্মফল নেই। That is why it is eternally perfect and that perfect 'I' dwells in the active I of all individuals. প্রত্যেকের active I-এর মধ্যে সেই perfect 'I' আছে, সেইজন্য active I-এর খালি foreground-এর দিকে নজর, background-এর দিকে নজর নেই, অর্থাৎ inward minded হতে পারছে না। Introspection-এর দিকে যেতে পারছে না। তার meditation হয় না। তার বিষয়চিন্তা হয়, বিষ্ণুচিন্তা হয় না, অনাত্মচিন্তা হয়, আত্মচিন্তা হয় না। অকর্ম নিয়ে সে মাতামাতি করে, আসল কর্ম সম্বন্ধে জানে না। আসল কর্মটা কী? অর্থাৎ যেই কর্মের বীজ নেই তা-ই হল আসল কর্ম।

গীতার ভিতরে অর্জুনকে এই আসল কর্মের কথা বলা হয়েছিল, the secret of all sorts of activities। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, তুমি তো কর্মের বিজ্ঞান জান না— "গহনা কর্মণোঃ গতিঃ"। কর্মের গতি হচ্ছে very mysterious, "দেবাঃ ন জানন্তি", দেবতারাও কর্মের রহস্য জানেন না। আমি তোমাকে কর্মের বিজ্ঞান বলছি। তিন প্রকার কর্ম আছে, যথা—কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম। এছাড়া আছে নিত্যকর্ম, নিষিদ্ধকর্ম। যে কর্ম করলে ক্ষতি হবে সেই কর্ম হল নিষিদ্ধ কর্ম। আর যে কর্ম করলে কল্যাণ মঙ্গল হবে তা হল বিহিত কর্ম, অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে। সেই বিহিত কর্ম করলে গৃহীদের কল্যাণ মঙ্গল হবে, কিন্তু আমরা সেই বিহিত কর্ম করতে প্রস্তুত নই। পূজাকর্ম, নিত্যকর্ম যা আমাদের বিধান আছে আমরা তাও ঠিকমতো follow করি না। কাজেই কর্মের রহস্য আমরা বুঝব কী করে? কর্ম করেও যে কর্মের ফল হয় না তার রহস্য কী? কর্ম হয়ে কর্মটা অকর্ম হয়ে গেল। অকর্ম আর বিকর্মের মধ্যে তফাত হল, প্রথমটি কর্মরূপে গ্রাহ্যই করা হচ্ছে না, আর দ্বিতীয়টি কর্মরূপে গ্রাহ্য হচ্ছে, কিন্তু তাতে কর্মের বীজ থাকছে না। মানে actionless action, অর্থাৎ seedless action, the action which has got no reaction at all, কর্মের প্রতিক্রিয়া হবে না অথচ কর্ম হবে। কী অসাধারণ secret! অদ্ভুত science!

বিদেশে বিজ্ঞানীরা দার্শনিকরা গীতার এই কর্মবিজ্ঞান শুনে খুব সুন্দর মন্তব্য করেছিল। Hastings গীতার একটা interpretation, translation করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, কর্মের বিজ্ঞান নিয়ে পৃথিবীতে যত চিন্তা এবং গবেষণা হয়েছে তার মধ্যে ভারতবর্ষে যেই ভঙ্গিমায় তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে that is supreme। গীতার ভিতরে তার প্রমাণ রয়েছে। Churchil-এর মতো একজন shrewd politician, তিনি বলেছিলেন যে, real politician জগতে very rare, একজনের কথা আমি জানি যিনি real politician, মানে

politician by birth and by quality and He is Krishna. Churchil-এর মতো লোকের মুখে শ্রীকৃষ্ণের সুনাম সত্যি 'ভূতের মুখে রামনাম'-এর মতোই শোনায়। এগুলো 'এ' বই পড়ে তোমাদের বলছে না। এগুলো 'এর' মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যাই হোক, বক্তব্যটা তা নয়, বক্তব্যটা হচ্ছে কর্ম সম্বন্ধে বলা হল। Right action তখনই হবে যখন action-টা হবে আমিবোধে। সবকিছুর মধ্যে Consciousness as it is থাকবে অথচ তা স্বতঃস্ফূর্ত হবে, কেননা Consciousness is not a static principle। Knowledge-কে যদি ভাঙা হয় তাহলে দুটো part পাই, know and ledge, ledge মানে steps, ladder। তার মানে জ্ঞান ধাপে ধাপে প্রকাশ পায়, কিন্তু Knowingness of knowledge সবসময় রয়েছে, মানে knowledge without knowingness সম্ভব নয়। Similarly luminosity of light, (ঘরের light-কে দেখিয়ে) এই আলোর যে জ্যোতি তাকে বাদ দিলে আলোর কোনও অস্তিত্ব নেই এবং তা বাদ দেওয়াও যায় না। সেইরকম বোধের বোধয়িতা অর্থাৎ বোধের যে বোধরূপ ধর্ম তা কখনও বোধশূন্য হয় না।

আমি যেমন আমিশূন্য হয় না, তেমন বোধও বোধশূন্য হয় না। বোধ আর আমি অভিন্ন সত্য। কীরকম? সেই বোধসত্তাই হচ্ছে ব্রহ্ম-আত্মা। তার প্রকাশরূপটা কীরকম?

সর্বসমবোধের স্বরূপ পরমাত্মা আপন
সর্ববোধের অধিষ্ঠান স্বানুভবদেব স্বয়ং।।
নাহি কোথাও জগৎ সংসার ব্রহ্ম আত্মা ভিন্ন
অনুভবসিদ্ধ জগৎসংসার কেবল ব্রহ্ম আত্মাই পরম।।
ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্বে নাহি ভিন্ন কোনও কার্য-কারণ
কারণশূন্য হয় না কার্য তথা কার্যশূন্য কারণ।
কার্য-কারণ তত্ত্ব অভিন্ন ব্রহ্মই তার সারমর্ম
ব্রহ্ম বক্ষে জগৎরূপে ব্রহ্মই আছেন স্বয়ং।।
ব্রহ্মবোধে জগৎ সত্য জগৎ বোধে তা আবৃত অজ্ঞান কারণ
ব্যাপ্য-ব্যাপকতা মিথ্যা সর্ব সত্য ব্রহ্ম-আত্মা সত্যের অনুশাসন।
পরমতত্ত্ব হলে জ্ঞাত অজ্ঞানজাত ভেদজ্ঞানের হয় নিরসন
ব্রহ্ম-আত্মজ্ঞান অজ্ঞানমুক্ত অসিদ্ধ সেথা বিশেষ্য-বিশেষণ।।
....

(কালেংড়া—দাদরা)

This is the conclusion! প্রত্যেকের আপন পরিচয়টা কোথায় সিদ্ধ? সর্বসমবোধে। এখানে মন-বুদ্ধির কোনও exercise নেই। You are in the Absolute Bliss and Peace where all duality, all outer relativity, inner duality and central unity dissolve altogether. You remain One for all time as it is. এই সত্যই তোমাদের সামনে বারবার প্রকাশ করা হচ্ছে। এ এত spontaneous যে সমস্ত শাস্ত্রের essence

আপনিই উদ্‌গীত হয়ে পড়ছে, কেননা শাস্ত্র তো তার একটা aspect-মাত্র, Reality তো শাস্ত্র নয়। শাস্ত্র হচ্ছে তার একটা প্রতিধ্বনি। আসল শাস্ত্র কী? নিজের মনকে শাসন করা। "যঃ শাসতি অন্তঃকরণম্"—আপনার অন্তঃকরণকে কী করে শাসন করেছে? একবোধে রাঙিয়ে নিয়েছে। এটাই সন্ন্যাস, সত্যকে ন্যাস করেছে, সাজিয়েছে। ন্যাস মানে সবসময় ত্যাগ নয়। যেমন মায়েরা কেশবিন্যাস করে ঠিক সেইরকম ভাবে সাজিয়ে নিতে হয়। কী দিয়ে? সবটার মধ্যে সত্যকে বসিয়ে—এটাও সত্য, ওটাও সত্য। Then you can declare that 'All Divine for All Time, as It Is.' As it is অর্থাৎ সত্য সত্যই ছিল, সত্যই আছে, সত্যই থাকবে, time cannot create any disturbance, cannot create any deviation of the truth, সত্যের কোনও বিচ্যুতি ঘটাতে পারে না। So perfect is your Self! Why should you bother about imperfection, mortality, duality—all these are mental expressions, but you are above mind, mind is your organ.

You are not slave of mind. মন হচ্ছে ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ। মনের দাস কেন হবে? কিন্তু এই কথাটা মানুষকে শেখানো হয়নি। তাই বলা হয়েছিল যে, If there be any saintly person and if He comes forward, then He must declare His saintly version to the universe and be one with them, realize Self-Identity with them and enlighten them by chanting the glory of the Self. তুমি আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেই বোধের কথাই সবার কাছে বল which is worth knowing and all else are insignificant। 'এর' কথা হয়ত খুব ধাক্কা দেবে অনেককে, কিন্তু 'এ' সেই ধাক্কাটাই দিতে চাইছে। 'এ' এক-এর ধাক্কা দিয়ে এক-এর ঘরে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই কথাগুলো বলছে, অনেক সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে, it is high time for all of us to come back to our Godhead Absolute. Godhead Absolute মানে I am not mortal, I am not subject to physical body, senses, *prana, mana, buddhi, ahamkara, citta* and above all these. All these are nothing but different expressions of My own Self which is eternally One without a second. বহির্প্রকৃতি বা সত্তা অন্তর্সত্তা বা স্বভাবের কার্য। স্বভাবে তার অধিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠা। স্ববোধ হল আবার স্বভাবের অধিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠা। স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত সবই দ্বৈত অনুভূতিসাপেক্ষ; কিন্তু স্ববোধ হল সর্ববোধের অধিষ্ঠান, সর্বভাবের সমাধান স্বানুভবসিদ্ধ অদ্বয়বোধ। সেইজন্য কেন্দ্রসত্তা স্ববোধ-আত্মা দ্বৈতবোধের নাম-রূপ-ভাবাতীত, দ্বন্দ্বাতীত ও ভেদাতীত, আপনবোধে স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত। তার ঊর্ধ্বে নিত্যাদ্বৈত স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংপূর্ণ বোধে বোধময় অদ্বয় অব্যয় অমৃতময় পরম আমিতত্ত্ব পাকা আমি স্বানুভবসিদ্ধ পরমাত্মা পুরষোত্তম পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

আমি নিত্য অদ্বৈত, আমার বক্ষে দ্বৈত নানাত্ব-বহুত্ব ওঠে, ভাসে, ডোবে সাগরের তরঙ্গ-লহরীর মতো। That cannot affect Me. এই ঘরে অনেক জিনিসপত্র। এই যে আজকে আমরা সবাই এসে ঘরে ঢুকেছি তাতে ঘরের কি কোনও ক্ষতি হয়েছে? আবার যখন

বের করে নিয়ে যাব তাতেও ঘরের কি কোনও loss হবে? Similarly মনের ভিতরে অনন্ত বৃত্তি উঠতে পারে, আবার বৃত্তি লয় হয়ে যেতে পারে, but your true nature will remain the same as it is, which is above all our concepts of traditional *dharma*, traditional *vijnana* and traditional *darsana*। এখানে কিন্তু compromise করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। আমি কী জানি, কী জানি না it is insignificant, all these belong to mind and not to the Self. Self-এর কোনও বিকল্প নেই, আমি-র কোনও বিকল্প নেই, Consciousness-এর কোনও বিকল্প নেই। অন্ধকারেরও একটা আলো আছে, অন্ধকারকে প্রকাশ করছে সেই জ্ঞানই। অজ্ঞানকেও প্রকাশ করছে জ্ঞান। সেই জ্ঞান যদি আমি হয়ে থাকি তাহলে আমিই আমিকে প্রকাশ করছি। সবার ভিতর আমি আছে। 'এ' কোনও sectarianism আনছে না, fanaticism বা intellectualism আনছে না। All these conventional sense are imaginary concepts which creates troubles in life, brings miseries in life.

জীবনে খালি দুঃখ বহন করে নিয়ে আসে আমাদের গতানুগতিক ধর্মভাব, আমাদের গতানুগতিক দর্শন, বিজ্ঞান। কিন্তু 'এ' সেই বিজ্ঞানের কথাই বলছে যেই বিজ্ঞান সমস্ত বৈচিত্র্যকে এক-এতে নিয়ে আসতে পারে। This science can bring all contradictions to one unity and identity that is One Self/ I Absolute. সেটাই দর্শন যেই দর্শন সবসময় একই থেকে যায়, that which remains always same One without a second—no change at all, no modification at all, কোনও বিকার নেই। বিকার হচ্ছে অজ্ঞানের স্তরে। আমি above all these, I am the realizer of all, I am the revealer of all, আমি অবভাসক, প্রকাশক। আমি প্রকাশ নই। Let প্রকাশ run away or exist, I care for none, কেননা আমি আমিই—জানলেও আমি, না-জানলেও আমি। I remains always the same I. 'এ' এই I-এর কথা বারবার সবার সামনে রাখছে। 'এ' জানে যে, I-এর কথা শুনবার জন্য মানুষ নিশ্চয়ই ব্যাকুল হবে। তারা আরও শুনতে চাইবে এবং সেই সুযোগও তারা পাবে। They will listen, because only through listening you will rise above all contradictions, you will rise above all your conventions, all your misunderstandings, demerits which is the cause of your sufferings in life. ধর্ম করে যদি আমার অধর্ম থেকেই যায় তাহলে সেই ধর্মাচরণের কোনও মূল্য নেই। বিজ্ঞান যদি আমার অজ্ঞানকে সরাতে না-পারে সেই বিজ্ঞানের কোনও মূল্য নেই এবং দর্শন যদি manifold হয় তাহলে আমি শান্তি পাব না। *Darsana* must be One. এই One কিন্তু প্রত্যেকের আমি, বারবার তা তোমাদের সামনে point out করা হচ্ছে, don't forget that।

প্রত্যেকের মধ্যে আমি রয়েছে, তা সে যত নিকৃষ্টই হোক আর উৎকৃষ্টই হোক, no matter, all qualities are insignificant। Qualities cannot overcome the Reality.

Reality is above all. It is the underlying essence of all qualities, apparent vibrations. তা আসে আর যায়। কাজেই quality pertains to *Prakriti*, not to the Self, not to the Real I. প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করছে। সে দেহ-ইন্দ্রিয়ে কাজ করছে। আমি শুধু সাক্ষিরূপে তা দেখছি। নিজেকে এর মধ্যে attach করলেই, কর্তা-ভোক্তা হয়ে গেলেই প্রকৃতির জালে জড়িয়ে যাবে। 'এ' secret-টা আবার point out করছে। If you consider that you are doing then you are contaminated but if you stick to the sense that I am the witness, I cannot be the subject, I am the witness of both the subject and the object, then subject-object cannot touch you. I am untouched, unattached. Let everything take care of themselves. সব আপনা থেকেই হয়ে যাবে, becoming আপনিই becoming হয়ে চলবে; কিন্তু ক্ষতি নেই, সংসার আপনিই চলবে। 'এ' কোনও জায়গায় disturb করছে না। প্রকৃতি আপনিই চলবে। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, দেহ এগুলো হচ্ছে প্রকৃতির সৃষ্টি। "দেহোস্যোক্তা প্রাকৃতাঃ সর্ব ধর্মাঃ।" এই দেহের ধর্ম হচ্ছে প্রকৃতির ধর্ম। প্রকৃতি তার কাজ করবেই। করুক! তুমি শুধু সাক্ষিরূপে দেখ। Don't get contaminated, তার মধ্যে attached হয়ে যেও না। আমার দেহ বলতে যেও না, আমি দেহ বলতে যেও না। সেইজন্য বলা হচ্ছে—

'নাহং দেহো ন মে দেহো নাহং প্রাণো ন মে প্রাণঃ
নাহং মনো ন মে মনো নাহং বুদ্ধিঃ ন মে বুদ্ধিঃ
নাহং অহংকারো ন মে অহংকারো নাহং জীবো ন মে জীবত্বম্
সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলম্ স্বানুভবদেব স্বয়ম্।।'

(আমিতত্ত্ব)

•

তাহলে আমি কী? আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পুরুষোত্তম কেবলম্। সকালে সময়মতো যদি আট/দশবার এটা ভাব দেখবে তোমার ভিতরের অজ্ঞান, demerits আপনিই সরে যাবে। This is Reality, ultimately এই বোধে তোমাকে আসতেই হবে, লক্ষ জনম পরে হলেও তোমাকে এই বোধে আসতেই হবে। 'এ' তা এখনই তোমার সামনে রাখছে। 'এ' তোমার পরিচয়টা দিচ্ছে, তোমার qualification নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। বহু title নিয়ে কোনও লাভ হবে না। তাই যখন সবাই 'একে' বলল, তুই লেখাপড়া শিখলি না, মুখ্যু হয়ে রইলি! উত্তরে তখন বলা হয়েছিল, দেখ "সর্ব কর্মং পণ্ডং করোতি য স এব পণ্ডিতঃ মূর্খঃ"—সেই পণ্ডিত'এ' কোনওদিনই হতে রাজি নয়। কেন? পণ্ডিত সর্বকর্ম পণ্ড করছে, কারওকে পরোয়া করে না। আর বেশি রেগে গেলে পণ্ডিতরা পৈতে তুলে নিয়ে অভিশাপ দেয়। কত অভিশাপ যে দিয়েছে 'একে', আর 'এ' তা মাথা পেতে নিয়েছে। তাদের বলা হয়েছে, তোমরা সুখে থাক, আনন্দে থাক। তুমি 'একে' অভিশাপ দিলে, আর 'এ' তোমার কল্যাণ মঙ্গল চাইছে! তোমার অভিশাপ সব 'এ' নিয়ে নিল। অবশ্য আসল পণ্ডিতের সংজ্ঞাও তাদের বলা

হয়েছে—"পণ্ডা ইতি বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির্যস্য স পণ্ডিতঃ" অর্থাৎ উজ্জ্বল বেদজ্ঞানকে পণ্ডা বলে। সেই পণ্ডার যিনি অধিকারী তিনিই হলেন আসল পণ্ডিত। এইরূপ পণ্ডিত বিনয়ী, ধীর, স্থির এবং অভিমান অহংকার শূন্য। যদি 'এর' লক্ষ জনম নরকবাস হয় তবু 'এ' তা বরণ করবে, till you rise up, get enlightened, be established in your true nature। তাতে যদি 'একে' লক্ষ জনম দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় তা 'এ' ভোগ করবে। কতজনম 'এ' দুর্ভোগ ভোগ করেছে, আরও কয়েক লক্ষ জনম ভোগ করবে। কিন্তু 'এ' জানে তার secret। কাজেই দুঃখভোগ করলেও আমি কিন্তু দুঃখভোগ করব না। কেননা সমস্ত দুঃখমূর্তিকে 'এ' একসঙ্গে বরণ করে নিয়েছে।

দুঃখ আমার মা, দুঃখ আমার গুরু। আমাকে আর মারবে কে? কী দিয়ে মারবে আমাকে? আমি তাকেই মা বলেছি যেই মা সন্তানশূন্য হয় না, অর্থাৎ সত্যশূন্য হয় না, আনন্দশূন্য হয় না। সৃষ্টির আদিতে আনন্দ, মধ্যে আনন্দ, অন্তে আনন্দ। আনন্দই পিতা-মাতা, আনন্দই সন্তান। 'এ' সেই আনন্দেরই খবর রাখে, নিরানন্দের খবর রাখে না। কাজেই প্রত্যেকের ভিতরে আমি আছি বলেই 'আমি' আমার বার্তা আমি-র কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। 'এর' এখানে কোনও স্বার্থ নেই। 'এ' অর্থও নেয় না, আশ্রমও করেনি, কাউকে দীক্ষাও দেয়নি। 'এ' পরমার্থের বক্ষে পরমার্থের মহিমাই শুধু প্রকাশ করছে। তা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হয়ে চলেছে।

মন্তব্য ঃ

সপ্তম বিচারে ষষ্ঠ বিচারের পরিণামকে আরও ব্যাপক ভাবে সহজে বোধগম্য হবার জন্য আমিময় বোধের সর্ববিধ ব্যবহারকে পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করা হয়েছে। জীবনের অন্তরে-বাইরে আমরা যা-কিছু চিন্তাভাবনা করি, কর্ম করি সে সবের মধ্যে পরস্পরবিরোধী ভাবের অংশ বেশি থাকে। তা মনের প্রভাবেই হয় সত্য, কিন্তু মন তার সমাধান বা রহস্য সঠিক ভাবে জানতে পারে না। সে সবের মধ্যে বোধরূপে আমিই যে আছে তা মন জানে না। মনের বোধের পশ্চাতে যে আমিবোধ আছে তা মনের বোধ জানে না কিন্তু বোধের বোধ আমি জানে। বোধের বোধ যে আমি সে-ই সর্ব সমস্যার সমাধান, সর্ব মুশকিলের আসান। সেই আমি আশ্বাস দিয়ে সবাইকে বলে, তোমাদের সাথে আমি নিত্য আছি এবং কীভাবে তোমাদের মধ্যে স্বয়ংপ্রকাশ হই তা তোমাদের সামনে পরিবেষণ করছি তোমাদের অবগতির জন্য। বোধের আমিকে আপনভাবে 'মেনে, মানিয়ে চল' অর্থাৎ 'আমি'-কে দিয়ে তোমাদের জীবনের সকল 'আমি ও আমার' ভাববোধের ব্যবহারকে রাঙিয়ে নাও। তাহলেই তোমাদের স্বরূপবোধে স্থিতি, পূর্ণতা, অমৃত, মুক্তি, শান্তি সুসিদ্ধ হবে।

২৯/১১/০১

।। অষ্টম বিচার ।।

ওঁ

সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম পরম
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত শাশ্বত সনাতনম্ ।।
নিষ্কলং নির্মলং নিরবদ্য নিরঞ্জনম্
সর্বভূতগুহাস্থিতম্ সর্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ম্ ।
অখণ্ড ভূমা পূর্ণম্ সর্বধীসাক্ষিভূতম্
সচ্চিদানন্দঘন পুরুষোত্তম হংস সোঽহং ।।

(পরমতত্ত্ব)

গানের কথাগুলির মধ্যে প্রত্যেকের সত্য পরিচয়টি দেওয়া আছে। মানুষ শাস্ত্র পড়ে, সাধনভজন ও সাধুসঙ্গ ক'রে যে সত্যের পরিচয় পেতে চায়, জানতে চায় তা অন্য কিছু নয়—নিজেরই পরিচয়। নিজের মধ্যেই তা নিহিত আছে, নিজেকে ছেড়ে তা কখনও অন্যত্র পাওয়া যায় না। তার কারণ, ব্রহ্ম-আত্মসাগরে যত অভিব্যক্তি বা প্রকাশ তা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত। তার মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রকাশভঙ্গিমা বাইরের থেকে দৃষ্ট হলেও মূল উপাদান/বিষয়বস্তু এক। এই উপাদানের দৃষ্টিতে যে সত্যানুভূতি তাই হল 'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্'। আর বাইরের আকারের দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যার পরিচয় পাই তা হচ্ছে তার আভাস। আভাস নিয়ে জীবন আরম্ভ হয়, আভাস নিয়ে জীবন চলে, কিন্তু পরিপূর্ণ নিজের পরিচয় পায় না, শান্তি পায় না, মুক্তি আস্বাদন করতে পারে না, তাই মন নানা জায়গায় নানা ভাবে তার সন্ধান করে। সেই সন্ধান সবসময় সবার পক্ষে যথার্থ ভাবে হয় না। কাজেই নিজের পরিচয় মানুষ না-জেনেই এই দেহ ধারণ করে, আবার না-জেনেই দেহকে ছেড়ে কিছুকাল বিশ্রাম ক'রে আরেকটা দেহ নেবার চেষ্টা করে। এ সমস্ত কিছুরই বিজ্ঞান সিদ্ধ হয় শুধু নিজবোধ দিয়ে, আর কিছু দিয়ে হয় না।

নিজ অতিরিক্ত যত কল্পনা সেগুলি যে যথার্থ নয় তা-ই আজকের কথার মধ্যে পাওয়া যাবে। আজকের গানের পদগুলি এত শুদ্ধ যে এর কোনও প্রতিশব্দ হয় না। যে শব্দ শুদ্ধ তা শুদ্ধবোধকেই প্রকাশ করে আর যে শব্দগুলিতেএকটু মিশ্রণ বেশি তা সত্যকে প্রকাশ করতে পারে না। ঈশ্বরের প্রসঙ্গ শাস্ত্রের পাতায় পাতায় লেখা আছে, আত্মা/ব্রহ্মের কথাও লেখা আছে। তা অনুশীলনকালে আমরা মনে করি, এগুলি আমাদের মধ্যে নেই, এগুলি অর্জন করতে হবে। কিন্তু অর্জিত যে বিদ্যা তা ক্রিয়াসাপেক্ষ, চিন্তাসাপেক্ষ। সুতরাং চিন্তা এবং

কর্মের মধ্যে দিয়ে আমরা যা পাই তা কিন্তু চিরস্থায়ী হয় না। তপস্যার মাধ্যমে আমরা যা পাব তাও কিন্তু চিরস্থায়ী হবে না। যদি বল কেন? তাও তো মন দিয়েই আমরা করি। এ কিন্তু সবার কাছে পরিষ্কার হয় না। যাঁরা সেই সত্যের সঙ্গে নিজেকে অভিন্নরূপে অনুভব করেছেন তাঁদের কাছেই এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করা যায়। আর যারা শাস্ত্র পড়ে জপ-তপ-ধ্যান করে তারা কিছু অনুভূতি লাভ করেন এবং আরেক ভঙ্গিমায় সে সম্বন্ধে বলেন। তারা বলেন, সত্যকে লাভ করতে হবে অর্থাৎ তা লভ্য বস্তু। কিন্তু অনুভবসিদ্ধ পুরুষ বলেন যে, না, সত্য কখনও লভ্য বস্তু হতে পারে না! সত্য লব্ধ হয়েই আছে। সত্য কখনও বিভক্ত হয় না। সেইজন্য গানের মধ্যে প্রথমেই বলা হল, 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্।' সে কে? 'ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম পরম।'

আমরা যাঁকে ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম বলে ভাবি বা ধারণা করি তাঁর পরিচয় হচ্ছে সত্য জ্ঞান অনন্ত। তিনিই আবার সচ্চিদানন্দ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত নিষ্কল নির্মল নিরবদ্য নিরঞ্জন। কথাগুলি এত শুদ্ধবোধক যে এর কোনও বিকল্প শব্দ হয় না। কিন্তু ধর্মক্ষেত্রে আমরা বিকল্প বহুরকমের মত-পথের খবর পাই। যার যা পছন্দ হয় সে তাই নিয়েই মাতামাতি করে, কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে সে ভাবে, তাই তো হলটা কী! এত তো করলাম, কিন্তু চিত্ত তো শুদ্ধ হল না! শান্তি তো পেলাম না! আমার ভ্রান্তিভীতি তো কাটল না! সংশয় তো কাটল না! অজ্ঞান তো গেল না! তাহলে লাভ কী হল! আমরা লাভ-লোকসানের চিন্তা করি জীবনভর অর্থাৎ যে বস্তু পেলে আমাদের মন তৃপ্ত হবে, খুশি হবে এবং অনেক সমস্যার সমাধান হবে, সেই বস্তুকে আমরা খুঁজে বেড়াই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, নিজ অতিরিক্ত কল্পিত যে বস্তু আমরা কল্পনা করি তার দ্বারা সাময়িক ভাবে কিছু সমাধান হলেও পরিপূর্ণ ভাবে হতে পারে না।

অনাদিকাল হতে আরম্ভ করে মানবসভ্যতার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই মানুষ কতরকমের ভাবনা করেছে, চিন্তা করেছে, গবেষণা করেছে, ধ্যান-ধারণা করেছে, কিন্তু অনেক কিছু পেয়েও সে হা-হুতাশ করেছে। এক একজন মুনি জীবনভর তপস্যা করা সত্ত্বেও হঠাৎ তাঁদের ভিতর হতাশা জেগেছে। তখন তিনি হয়ত আরেক ঋষির কাছে গিয়েছেন সমাধানের জন্য। মুনি প্রবীণ ঋষিকে তাঁর মনের বেদনা জানিয়ে বলেছেন, এত বছর তপস্যা করে মনকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মন তো শান্ত হয় না! মন ঘুমিয়ে পড়ে ঠিকই মাঝেমাঝে, কিন্তু শান্ত তো হয় না! কথাগুলি মন দিয়ে তোমাদের শুনতে হবে। কিন্তু মনকে শান্ত করতে গেলে কী করতে হবে? প্রথমে অশান্তির কারণগুলো জানতে হবে। অশান্তির কারণ হচ্ছে নিজেরই কল্পিত কল্পনা। কল্পিত কেন? আত্মার বক্ষে আত্মাই শুধু প্রকাশ প্যায়, অনাত্মা প্রকাশ পায় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে অনাত্মা প্রকাশ পাচ্ছে, ভেদজ্ঞান প্রকাশ পাচ্ছে, বৈচিত্র্য প্রকাশ পাচ্ছে, তার ফলে আমাদের ভ্রান্তিভীতি, সংশয় আসছে এবং আমরা কষ্ট পাচ্ছি। আর কী হচ্ছে? আমরা হতাশায় ডুবে যাচ্ছি। প্রিয়জন আপনজন যাদের জন্য আমরা সারাজীবন পরিশ্রম করছি তাদের যখন সময় হবে সবাই চলে যাবে, কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করবে না।

একসঙ্গে তো আমরা কেউ আসিনি, আবার একসঙ্গে আমরা কেউ যেতেও পারব না। তাহলে আমাদের এই যে প্রিয়তাবোধ এর সীমা কতদূর পর্যন্ত? তাও সবার সঙ্গে সবার মেলে না। এই প্রিয়তাবোধের গভীরে কী আছে তা কিন্তু আমরা সবাই জানতে চাইও না,

চাইলেও সঙ্গে সঙ্গে জানাও যায় না। জাগতিক বিষয়বস্তুর মতোই আমরা সবকিছু ভাবি এবং মনে করি যে, সত্য লভ্য বস্তু অর্থাৎ তা পাওয়া যায়। ঈশ্বর নামক একটা বস্তু এনে বেশ করে ভাল করে সিন্দুকের মধ্যে আটকে রাখব তালাচাবি দিয়ে, যখন যা দরকার হবে সিন্দুক খুলে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেব, তারপর আবার আটকে রাখব। ঠিক এরকম যদি সত্য বস্তুটি হত তাহলে বোধহয় ঐ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তাকে একচেটিয়া করে নিজের করে রাখত, আর কেউ তার সন্ধান কোনওদিনই পেত না। কিন্তু সব চাইতে আশার ও আনন্দের কথা হচ্ছে প্রত্যেকের সাথেই সেই বস্তুটি আছে। তা কারও থেকে আলাদা নয়। দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের থেকে তা আলাদা নয়—জড়িয়ে আছে সবকিছুকে।

একজন সাধক 'একে' বলেছিলেন, বাবা তুমি এত আনন্দে আছ কী করে? আমার তো প্রচুর বয়স হয়েছে, কতরকম তপস্যা সাধনভজন করলাম, শাস্ত্রবচন পড়লাম, কিন্তু আমি আনন্দই খুঁজে পাচ্ছি না। মনের ভিতর কেমন যেন একটা বিষাদ ভাব! মনে হয় যে, কই কিছু তো পেলাম না। তুমি কী পেয়ে এত আনন্দে আছ? উত্তরে তাকে বলা হয়েছিল, তুমি তো নিজেকে আগে থেকেই আমি-র থেকে পৃথক করে ভাবলে, এখন আমি-র কথা তুমি কী করে নেবে? আনন্দ পাবার বস্তু নয়। আনন্দই হল সবকিছুর কারণের কারণ। আনন্দ হতেই সব কিছু জাত হয়েছে, আনন্দের মধ্যেই সবকিছু আছে, আবার আনন্দের মধ্যেই সব লয় হয়ে যাবে। আনন্দবোধের সঙ্গে সবকিছু যুক্ত হয়েই আছে। আনন্দ আর আনন্দের বোধ আলাদা নয়। আমাদের শিক্ষা, আমাদের সংস্কার, অভ্যাস, জীবনযাপন প্রণালী বিকৃত এবং আমরা সেই ভাবে ব্যবহার বা অভ্যাস করে তা আরও বেশি বিকৃত করে ফেলেছি যার জন্য আমরা সত্যকে আমাদের থেকে আলাদা করে ভাবতে শিখেছি, চৈতন্যকে আলাদা করে ভাবতে শিখেছি এবং অখণ্ডকে, আনন্দকে আমাদের থেকে পৃথক করে ভাবতে শিখেছি। অখণ্ড মানেই আনন্দ। আমরা মনে করি, তা যেন বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম বা কোনও কিছুর প্রাপ্তির মাধ্যমে আমাদের মধ্যে আসবে। এই হচ্ছে কল্পনা, এটাই হল অজ্ঞান। কাজেই নিজের ভিতরে চেতনা দিয়েই আমরা অজ্ঞানকে আগে মেনে নিয়েছি। চৈতন্য দিয়ে চৈতন্যকে মানিনি, সেই অভ্যাস আমরা করিনি। কী উপাদানে আমি গড়া, আমার পরিচয় কী—এই সব নিয়ে আমরা কখনও ভাবতে শিখিনি।

মানবের শিশু কিন্তু মানবই। আমগাছের চারাকে আমগাছই বলা হয়। ছোট আমগাছে আম ধরেনি তবুও তাকে আমগাছই বলা হয়। যে গরুর বাছুর হয়নি, দুধ দেয় না, তাকেও আমরা গরুই বলি। কাজেই যার আত্মজ্ঞান হয়নি সে কি ব্রহ্মের থেকে আলাদা? নিশ্চয়ই তা নয়। কিন্তু আমাদের গতানুগতিক শিক্ষা মূল সত্য থেকে আমাদের সরিয়ে দিয়েছে। আমরা ঈশ্বরকে, আত্মাকে, ব্রহ্মকে, ঠাকুরকে, মাকে, আল্লাকে যাই বলি আমরা তাঁকে আমাদের থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছি। তাঁকে অনুভব করার জন্য আমরা একটা পুজোর ঘর বা ঠাকুরঘর বানাই, সেখানে একটা পট বসাই, ঘট বসাই, ছবি বা মূর্তি বসাই—মনে করি এ-ই সব, মানে নিজের থেকে আলাদা something else নিয়ে আমরা মাতামাতি করি। অথচ সেই ঠাকুরের স্তবটা নিজের মধ্যে নিজেকে দিয়েই করব, নিজেই শুনব এবং মনে করব যে,

আমার স্তবটা এখন হল, একশো মাত্রার জপটা হয়ে গেল, হাজার মাত্রার জপ হয়ে গেল। আমারই মন কিন্তু আমাকে বলছে! জপও করলাম আমি, শুনলামও আমি, অনুভবও করলাম আমি। কারণটা কী জান? আমরা শৈশব থেকে আমাদের চারপাশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সঙ্গেই জড়িত অর্থাৎ চোখ দিয়ে আমরা রূপ দেখছি, কান দিয়ে শব্দ শুনছি, জিভ দিয়ে আস্বাদন করছি, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছি, ত্বক দিয়ে স্পর্শ নিচ্ছি—এই ভাবেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। সুতরাং এগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশি। এর বাইরে যে আরও কিছু থাকতে পারে তা আমরা ভাবতে শিখিনি। বয়স হয়ে গেলে তখন অনেক কারণেই আমাদের মনে হয়, এবার একটু দীক্ষা নিলে ভাল হয়! একটু ধর্মস্থানে, মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায়, দরগায় গেলে ভাল হয়! এবার একটু সাধুসন্তদের সঙ্গ করি, একটু শাস্ত্র পড়ি, স্তবস্তুতি পাঠ করি, একটু ভজন করি ইত্যাদি মনে হয়। কিন্তু কার জন্য? তোমার ভিতরে যে চৈতন্য তোমাকে ঘিরে আছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত, সমস্ত অনুভূতির সাড়া দিচ্ছে সে, সেই চৈতন্যকে দিয়েই অন্য একটা চৈতন্যকে তুমি অনুভব করছ। কিন্তু চৈতন্য দিয়ে চৈতন্য ছাড়া আর কিছুকে অনুভব করা যায় না। যদি বল কেন? এই যে আমি রূপ দেখছি, রূপটা কিন্তু একটা অনুভূতি। চৈতন্যই বলছে—এটা রূপ, এটা লাল, এটা নীল, এটা হলদে, এটা সবুজ ইত্যাদি। কিন্তু মন বলছে—না ঐটা না, এটা লাল, এটা আলাদা রং। তাই এই প্রসঙ্গে একটি উদগীত গানে আছে—

প্রাণ বলে সত্য আছে ভগবান মন বলে সে তো নাই।।
অহংকার কর্তা সেজে বাহাদুরি করে সকল কাজে
দম্ভ ভরে বলে আমি ভগবান নাহি মানি।
অভিমান অজ্ঞানে চলে শুধু ক'রে বড়াই।
ইন্দ্রিয়দল বলে সকলে করি কাজ সবে মিলে মোরাই।
আমরা ছাড়া কর্তা কে আর ভগবান কোথাও নাই।।
হৃদয় বলে সবই ভগবান মান কি না মান আছে প্রমাণ
যাঁর সত্তায় হ'য়ে সত্তাবান যাঁর মাঝে সব করে অবস্থান
যাঁর শক্তিতে সংসারেতে আছে মেতে জীবনে সবাই
সর্বভাবের উৎস শাশ্বত অচ্যুত সত্য ভগবান ইহাই।।
দেহরূপ যাঁর তাঁরই প্রাণ নাম ভাব মন যাঁর তাঁরই বোধজ্ঞান
তাঁরই প্রকাশ স্বভাব সমান সর্বজীবন আপন সন্তান।।
সর্ব প্রকাশে তাঁরই অধিষ্ঠান স্ববোধে পূর্ণ স্বয়ং প্রকাশমান
যাঁর প্রকাশ হয় জীবনে সদাই সত্য ভগবান ইহাই।।

(বাউল—দাদরা)

মনের দ্বন্দ্ব কোনওদিন ঘোচে না। জীবন শেষ হয়ে যায়, তখন মনের সংশয়, শঙ্কা, ভ্রান্তি সারাজীবনকে দুঃখে পরিণত করে দেয়। কিন্তু এই মনের নিজস্ব কোনও অস্তিত্বও নেই। বড় আশ্চর্যের বিষয় এগুলো! আমরা যে প্রাণ-মনের কথা ভাবি এদের কারও কিন্তু স্বকীয়

কোনও অস্তিত্ব নেই—শুধু কতগুলি মিশ্রণ, সেগুলো একত্র হয়ে এই ভাবে প্রকাশ পায়। Background-এ সেই চৈতন্যসত্তাই আছে, যার কোনও আকার-বিকার নেই, কোনও বিকল্প নেই এবং যা অবলম্বনশূন্য। তার মধ্যেই সবকিছু সিদ্ধ হয়। All positives and all negatives are possible owing to the presence of your central being, owing to the presence of your underlying essence, life-pervading truth which is ever-present in each and all individuals without any difference. The differences are in the senses and in the mind and not in the central being, not in the 'I' (Self) but in the sense of myness, in the sense of mind. Mind is the contradiction, embodiment of all contradictions, bundle of all thoughts–this or not this, that or not that, all pairs of opposite—good and bad, right and wrong, light and darkness, knowledge and ignorance, so and so, so and so. But all are possible owing to the presence of your real existence of Consciousness which symptomatizes as 'I' and without which no understanding is possible. This I is verily the Self-Divine (Absolute Reality). মন নাহি জানে, "কোঽহম্"—who am I? মন জানে না। Mind does not know what mind is, how can it know what others are? That is why mind is required to be cleaned up, is required to be schooled up, abated. But how? By the guidance of a perfectly experienced Person Who has transcended the mind, knowing fully the contradictory nature of the mind and Who is well established in His truly perfect nature which is 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্'—that means Truth, Knowledge and Infinity.

আমরা আনন্দ চাই, শান্তি চাই। আমরা মনে করি সেগুলো বোধহয় বস্তুর থেকে আসে, ব্যক্তির সংস্পর্শে ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে আসে, কর্মের থেকে আসে কিংবা প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে, তার থেকে সেগুলো আসে—এ সবটাই কিন্তু mental। আমরা যত contradiction দেখছি, অর্থাৎ দ্বৈত এবং বৈচিত্র্য যত অভিজ্ঞতা সবটাই কিন্তু মনের খেলা। এই মনের পশ্চাতে রয়েছে নিজের পরিচয়, সেখানে দুই নেই। এই যে এক-এর কথা তোমাদের কাছে মাঝে মাঝে বলা হয়, কারণটা কী? তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, তুমি eternally One। যদিও নিজের মন বৈচিত্র্য খোঁজে, দ্বৈত খোঁজে, নিজের সাথি খোঁজে, কিন্তু সাথির সঙ্গে সে constantly থাকতে পারে না। তাকে ঘুমের মধ্যে সাথিকে ছাড়তে হয়, সমাধির মধ্যে একবার প্রবেশ করলে সব সঙ্গই লীন হল, তখন নিজের সাক্ষিস্বরূপে তার স্থিতি হল। তখন "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।। বাচসাক্ষী প্রাণবৃত্তের্সাক্ষী বুদ্ধের্সাক্ষী, বুদ্ধিবৃত্তেশ্চ সাক্ষী চক্ষু শ্রোত্রাদি সর্ব ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ সাক্ষী সাক্ষী নিত্য প্রত্যগাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলোঽহম্।" এল এবার অহং—এ হল অহংদেব, অহংকার নয়। অহংকার কিন্তু মনেরই আরেকটি department, অহংদেব তা নয়। অহংদেব মানে পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তমের কথা শাস্ত্রের পাতায় আছে।

আমরা যে আমি ব্যবহার করি সেই আমি-র পশ্চাতে আরেকটি আমি আছে। প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে দুটো আমি আছে। একটা হচ্ছে দেহেন্দ্রিয়-মনের সঙ্গে যুক্ত—তা আভাসের আমি, অহংকারের আমি, অন্তঃকরণ স্বভাবের আমি, গুণের আমি, কাঁচা আমি। তা কিন্তু স্ববোধের আমি বা সত্তার আমি নয়। স্ববোধের আমি বা সত্তার আমি সবার পশ্চাতে, হৃদয়ের কেন্দ্রে অহংদেব পুরুষোত্তম পাকা আমি, বোধে বোধময় অমৃতময় অদ্বয় অব্যয়—that is the Real Self। তাই হচ্ছে ভগবান বা আত্মা। জন্মজন্মান্তরের তপস্যা সাধনা চিন্তা ধ্যান ধারণা বিচার ও ভক্তির মাধ্যমে মন যখন শান্ত হয়ে অন্তর্মুখী হয় তখন সেই আমি-র সঙ্গে পরিচয় হয়। কাজেই তাঁকে পাবে আপন হৃদয়গুহায়। কেমন করে? আপনভাবযোগে অর্থাৎ ভক্তিভরে তাঁকে আপন ভাবতে হবে। ইষ্টকে গুরুকে আপন যতক্ষণ না-ভাবা যাবে ততক্ষণ তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে না।

হৃদয় হল সমস্ত অনুভূতির কেন্দ্র। এই হৃদয় কোথায়? বুকের গভীরে আমরা দেখাই বটে, তা কিন্তু নয়! হৃদয় আমাদের সমস্ত সত্তা জুড়ে বসে আছে। এই হৃদয়বস্তুই কিন্তু আমাদের সব দিচ্ছে। আমরা যা ভুলে যাই এবং হারিয়ে ফেলি তা পুনরায় ফিরিয়ে দেয় হৃদয়। তা-ই আমাদের supply দেয়। The Real-I is the supplier of all demands of finite-I. সবকিছুই তাঁর কাছ থেকেই আসছে, কিন্তু তাঁর সন্ধান আমরা কেউ সহজে পাই না। তার কারণ, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ছুটছে বাইরের দিকে। এই ইন্দ্রিয়কে টেনে ভিতর দিকে আনা খুব কঠিন, তা অভ্যাস করতে হয় এবং মনকে সংযত করা দরকার, কারণ নাম-রূপ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে তা মলিন ও চঞ্চল হয়েছে। এই অস্থির চঞ্চল প্রমাথী মন পাগলা হাতির মতন, পাগলা ঘোড়ার মতন বিষয়পানে রূপ-নাম-ভাবের পিছনে চারদিকে ছুটে বেড়ায়। নাম-রূপাদি হল ইন্দ্রিয়ের বিষয়। মন তার গ্রাহক, সেইজন্য বহির্মুখী চঞ্চল ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে মন যুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় নাম-রূপের ঘরে। এই অসংযত অস্থির চঞ্চল বিষয়াসক্ত প্রমাথী মনকে শান্ত ও সংযত করা দুঃসাধ্য, কিন্তু অসম্ভব নয়। বিবেক বৈরাগ্যের অভ্যাসমাধ্যমে তা সম্ভব।

মন বাইরে পাগলা ঘোড়ার মতো খালি ছুটছে। কোথায়? রূপে-নামে-ভাবে—চারদিকে ছুটে চলেছে। ইন্দ্রিয়ের সাথে সাথে মন বাইরে চলে যাচ্ছে। মনকে লাগাম টেনে শান্ত করা খুব কঠিন। কিন্তু তারও নিশ্চয়ই ব্যবস্থা আছে। অর্জুনের এই ছিল প্রশ্ন যে, এই চঞ্চল অস্থির প্রমাথী মনকে কী করে সংযত করব? কী দিয়ে তাকে বাঁধব? এই যে প্রতি মুহূর্তে মন বাইরের দিকে ছুটছে তাকে শান্ত করব কী করে? শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, অর্জুন কথাটা সত্যিই বলেছ! কিন্তু একে বশে আনা যায় অভ্যাস আর বৈরাগ্যের দ্বারা। অভ্যাস আর বৈরাগ্য কী বস্তু? প্রতিদিন এই যে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলছি তা আমাদের অজ্ঞাতসারেই হয়ে চলেছে। তা যেন কীরকম একটা অভ্যাস! আপনা আপনিই হচ্ছে। তা যদি আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো প্রাণ শেষ হয়ে গেল। তখন প্রিয়জন এসে কোনওরকম আর সাহায্য করতে পারবে না। আমার কতখানি আয়ু, কতদিন বাঁচব সব আমার ভিতরে ঠিক করাই আছে। ডাক্তার এসে শত চেষ্টা করলেও, injection দিয়েও কিছুই করতে পারবে না। কাজেই এই যে নিজের ভিতরে নিজের সমস্ত সম্পদ নিহিত আছে তাকে আবিষ্কার করার নাম অধ্যাত্মবিদ্যা।

এই আবিষ্কার করার জন্য চেষ্টার নামও হচ্ছে অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ Spiritual Science। আর বহির্জগতে ছড়ানো বস্তুর থেকে নিজের পছন্দমতো প্রয়োজনমতো জিনিসকে সংগ্রহ করার নাম হচ্ছে প্রাকৃতবিদ্যা বা material science।

এই প্রাকৃতবিদ্যার ব্যবহারেই আমাদের চলে যাচ্ছে সারাজীবন। খুব কম লোকই অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চা করে এবং অধ্যাত্মবিদ্যার গভীরে অর্থাৎ অধ্যাত্মবিদ্যার মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের যে অভাব তা পূরণ করতে হলে নিজের মধ্যে আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে। তা কী? ঈশ্বরীয়বিদ্যা। অধ্যাত্মবিদ্যা হচ্ছে অন্তরের, অন্তঃকরণের বিদ্যা। বাইরে যেমন প্রাকৃতবিদ্যা, বস্তুবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা; অন্তরে তা জীববিদ্যা বা Spiritual Science বা Life Science। কেন্দ্রে অর্থাৎ হৃদয়ক্ষেত্রে হচ্ছে ঈশ্বরীয়বিদ্যা বা Divine Science। কাজেই সমস্ত জীবের হৃদয়েই ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মের বাস। এই কথা শাস্ত্রের পাতায় পাতায় লেখা আছে, মহাজনরাও এই কথাই বলে যান—হৃদয়ের গভীরে ঈশ্বরের বাস। হৃদয়ের দরজাটা বন্ধ করা আছে, তাই ধাক্কা মারতে হবে। ধাক্কা খেতে খেতে একসময় দরজাটা খুলে যাবে। যিশুখ্রিস্টও এই কথাই বলে গিয়েছেন তাঁর ভক্তদের যে, "Knock, Knock at the door and the door of the kingdom of Heaven will be opened unto you." অর্থাৎ হৃদয়কে ধাক্কা দাও, সেখানে আছেন প্রভু, তিনি দরজা খুলে বেরিয়ে আসবেন, তখন রেহাই পাবে। এই হৃদয়ের কথাই গানের মধ্যে প্রথমে বলা হয়েছে। কিন্তু 'এ' আরও অনেক কথা তোমাদের সামনে রেখেছে। হৃদয়ের পশ্চাতে তোমার আসল পরিচয় অর্থাৎ আত্মা/ব্রহ্ম—'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ সচ্চিদানন্দম্ নিষ্কলং নির্মলং নিরঞ্জনম্। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ।' তাঁর জড়ত্বই হতে পারে না, তাঁর মৃত্যুও হতে পারে না। তাঁ অপাপবিদ্ধ—তাঁকে পাপ স্পর্শ করে না। তাহলে সবাই যে আমরা ভাবনাচিন্তা করছি, মনে করছি যে, আমি তো অধম, আমার এই নেই, ঐ নেই, so and so, so and so —এগুলো সব কিন্তু মনের কল্পনা।

মন কল্পনা করতে ভালবাসে, তা-ই তার বিশেষত্ব। কিন্তু কল্পনার সমাধান করতে মন জানে না। তাই মনের হয় সংশয়, সন্দেহ, ভ্রান্তিভীতি—এগুলো মনের ধর্ম। মনের সাথে যুক্ত আছে অন্তঃকরণের আরেকটি ভাগ, তা হল বুদ্ধিবিজ্ঞান। এই বুদ্ধি নিশ্চয় করে না-দিলে মন অশান্তির মধ্যেই ডুবে থাকে। সেই বুদ্ধি এসে মাঝে মাঝে তাকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু বুদ্ধি যদি নির্মল না-হয় তাহলে এই বুদ্ধি দিয়েও আমি শান্তি পাব না। বুদ্ধিকে নির্মল করবে কে? নিশ্চয়ই তারও ব্যবস্থা একটা আছে। যাঁরা বুদ্ধির ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছেন অর্থাৎ বুদ্ধিকে যাঁরা যথার্থ ব্যবহার করতে শিখেছেন, খেয়ালখুশিমতো নয়, পছন্দমতো বুদ্ধির ব্যবহার নয়, সংযত ভাবে, তাঁরাই পরমবোধির সন্ধান পেয়েছেন। পরমবোধি লাগাম টেনে যা করাবার বুদ্ধিকে দিয়ে করিয়ে নেয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের বুদ্ধি মার্জিত ও সংযত নয়, তা মলিন বা দুষ্ট। সে মনের, ইন্দ্রিয়ের এবং দেহের তাঁবেদারি করে। যেখানে দেহ ইন্দ্রিয়ের তাঁবেদারি করবে, ইন্দ্রিয় করবে মনের, মন করবে বুদ্ধির এবং বুদ্ধি করবে পরমবোধির—তা নয়, সেই জায়গায় উল্টোটাই হয়ে চলেছে। তা-ই হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনে, কাজেই তাদের দেহাত্মবুদ্ধিই প্রধান।

সংসারে দেহই সর্বস্ব সবার কাছে। দেহটা নিয়েই সবার যত মাথাব্যথা। আর দেহের সংস্পর্শে যা আসে সে ঐ দেহের ভাবনা দ্বারা তাকে জড়িয়ে রাখতে চায়। কিন্তু দেহ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ইন্দ্রিয়-প্রাণের দ্বারা। ইন্দ্রিয়ও জানে না তার পরিচালক কে? কিন্তু আমরা দেখি দেহ-ইন্দ্রিয়কে চালায় প্রাণ আর মন। কিন্তু প্রাণ-মন নিজেকেও জানে না। তাদের চালায় কে? বুদ্ধিবিজ্ঞান। বুদ্ধিকে চালায় কে? প্রকৃতি। প্রকৃতিকে চালায় কে? পরমপুরুষ অর্থাৎ সেই পুরুষোত্তম পাকা আমি, যেই আমি-র কথা এখানে নানা ভঙ্গিমায় উল্লেখ করা হয়েছে। পরে আরও ব্যাপক ভাবে তা উল্লেখ করা হবে। কেননা প্রত্যেকের ভিতরে আমি দিয়েই আমিকে চিনতে হবে, বোধ দিয়েই বোধকে জাগাতে হবে, বোধ দিয়েই বোধের ব্যবহার করতে হবে, কল্পনা দিয়ে নয়। মনের ভিতরে আছে কল্পনা, বোধের কতগুলো আভাস, অর্থাৎ reflection. **Reflection cannot give you perfection.** Reflector রয়েছে reflection-এর পশ্চাতে। তোমার আমিকে সরিয়ে নিয়ে গেলে তোমার দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধির কোনও চেতনাই আর কাজ করবে না। কিন্তু এই স্ববোধের পাকা আমি-র সন্ধান যখন পাবে তখন দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি তোমার বশে এসে যাবে। এই আমি-র যে চর্চা তা মানুষ করে না, মানুষ অহংকারের চর্চাকে আমি-র চর্চা মনে করে, কিন্তু তা নয়। অহংকার gross object-কে নিয়ে অর্থাৎ স্থূল বহির্ভাগকে নিয়ে মেতে থাকে। সেইজন্য অহংকারের চাই অনেককিছু, এটা চাই, ওটা চাই, এটা নেই—না-থাকলেই তার মেজাজ খারাপ। কিন্তু তুমি যাকে আপন ভাবছ সে কিন্তু তোমার বাইরে নয়, তোমার হৃদয়ে সবসময়ই বর্তমান। বড় অদ্ভুত ঈশ্বরের মহিমা। তিনি হৃদয়ে থেকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে আমাদের চালাচ্ছেন, তা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোথায়? স্থূলের মধ্যে, তাই আমরা স্থূল ভাববোধ দিয়ে তাঁকে পূজা করি, স্থূল রূপে পূজা করি, স্থূল শব্দ দিয়ে পূজা করি। কিন্তু তাঁকে নিজের আপনভাববোধ দিয়ে আমরা পূজা করতে চাই না। আপনভাববোধ দিয়ে পূজা করতে গেলে তো নিজের মধ্যে নিজে তলিয়ে যাবে, ডুবে যাবে—তখন তো বাহির-অন্তর থাকবে না—'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং' হয়ে যাবে। একটা উদ্গীত ভজনে আছে—

আপন ভিন্ন নাহি অন্য কোনজন আপনার অন্তরে
আপনাতে আছে আপন স্বয়ং অন্তর বাহির পূর্ণ ক'রে।।
আপনস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মা সচ্চিদানন্দ অখণ্ড ভূমা
স্ববোধে আপন পূর্ণ স্বয়ং আপনাতে নিত্য বিহারে।।
আপন ছাড়া যা-কিছু ভাবে মন দ্বৈতবোধে সে করে যা গ্রহণ
সবই তার কল্পনা ক্ষণিকের স্বপন ভাসে তা অন্তরে ক্ষণিকের তরে।।
মনের ভাবনা বৈচিত্র্যকল্পনা নাম-রূপের ধারা বিলাসরচনা
আমি তুমি ইহা উহা নাম-রূপাদি যত ধারণা
আপনাতে ওঠে ভাসে ডোবে বারেবারে।।

মনোদয়ে জগতের উদয় মনোলয়ে জগতের লয়
মনোনাশ হয় জ্ঞান বিচারে যোগ ধ্যানে সমাধির গভীরে।।
কর্তা-করণ-কর্ম গুণের ধর্ম জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান মনের ধর্ম
মনাতীত অব্যক্ত অদ্বৈতের ঘরে নাম-রূপ দৃশ্যাদি সর্বশূন্য
দ্বৈতবিহীন আপনে আপন সমরস সুধাসাগরে।।
(বাউল—কাহারবা)

এই আপনবোধের কথাই সমস্ত অনুভূতির সার। প্রত্যেকের ভিতরেই আপন আছে, তাকে শুধু ধরিয়ে দিতে হয়। এই হল শিক্ষা এবং এই হল দীক্ষা। এছাড়া অন্যকিছু দিয়ে কিন্তু সেই আপনকে ধরবার রাস্তা নেই। আপনবোধ দিয়েই আপনকে ধরতে হবে। আপনবোধ জড়িয়ে আছে দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্তে সর্বত্রই বোধ দিয়ে। বোধে গড়া জীবন। আপনবোধ বড় অপূর্ব জিনিস! 'এ' গতানুগতিক ধর্মের কথা সবার কাছে বলেনি, কেননা তা মানুষ যথেষ্ট শুনেছে। এই আপনবোধ ছাড়া ধর্মের ব্যাখ্যা শাস্ত্রের পাতায় পাতায় প্রচুর আছে, সাধুসন্তগণ এগুলো শোনাচ্ছেন, কিন্তু জগতের কল্যাণ তো তাতে সাধিত হচ্ছে না, মানুষের ভ্রান্তি তো যাচ্ছে না এবং ভ্রম, ভীতি, অজ্ঞান, মোহ যাচ্ছে না। কিন্তু আপনবোধের গভীরে কিছুই থাকবে না, সেখানে শুধু বিশুদ্ধবোধ মাত্র বর্তমান। ঘুমের মধ্যে মানুষ অজ্ঞানের মধ্যে তলিয়ে যায়, সেখানে কোনও ভেদ থাকে না। জেগে উঠে সে বলে, ওঃ খুব ভাল ঘুম হয়েছিল, কোনও স্বপ্ন দেখিনি! All ignorance with bliss হল গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তির স্বরূপ।

সমাধি হচ্ছে all knowledge with bliss অর্থাৎ 'কেবল বোধোঽহম্ আনন্দোঽহম্ নিরন্তরম্।' কেবল বোধ অহম্ আনন্দ অহম্ নিরন্তরম্। এই কথাগুলি কিন্তু হৃদয়ের বাণী। এগুলি হচ্ছে আসল গুরুবাণী, আপ্তবাণী, সত্যের বাণী বা বেদবাণী। এই বেদবাণীকে অবলম্বন করে বেদাশ্রিত যারা তারা বেদস্বরূপে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ তারা বেদের স্বরূপকে নিজের সঙ্গে অভিন্নরূপে অনুভব করবে। তখন বলবে, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" "বেদাহমেতং"—আমি জানি। কাকে? "পুরুষং মহান্তম্"—সেই মহান পুরুষকে অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে জানি। "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—আদিত্য অর্থাৎ সূর্য যেমন সব কিছুকে প্রকাশ করে, সর্বপ্রকাশক, সেইরকম সর্বপ্রকাশক পুরুষোত্তম সূর্যের মতো জ্যোতিষ্মান, সবকিছুর প্রকাশক। "তমসঃ পরস্তাৎ"—অজ্ঞানের পরপারে, অজ্ঞানের অতীত, ভেদজ্ঞানের অতীত, নানাত্ব বৈচিত্র্যের অতীত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অতীত, মনাতীত। কিন্তু মনের অতীত কি কেউ যেতে চায়? রাত্রে ঘুমের মধ্যে অজ্ঞাতসারে চলে যায় একটুখানি। কিন্তু জ্ঞাতসারে কি কেউ যেতে চায়? কেউ না। তখন বলে আমার এই আছে, আমার ঐ কর্তব্য আছে, আমার এই দায়িত্ব আছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল। কয়েকজন বহুদূর থেকে 'এর' কাছে এসেছিল কারও কাছ থেকে শুনে। তাদের সঙ্গে বসার পরে তারা অনেক প্রশ্ন করল। তার পরে বলল যে,

বাবা আমাদের অজ্ঞানটা দূর করে দাও না! উত্তরে তাদের বলা হল, তোমাদের তো গুরু আছেন, গুরুর কাছে তোমরা বল না কেন? তারা বলল, গুরুর দেখাই পাই না, গুরুর সঙ্গে মিলতেই পারি না। উত্তরে তাদের বলা হল, সেকী কথা! গুরুর সঙ্গে যোগাযোগ হয় না? তখন তারা বলল, না, আমাদের গুরুর কাছাকাছি যেতে দেয় না! গুরুকে ঘিরে আছে একদল, তারা আমাদের যেতেই দেয় না তাঁর কাছে। তাদের বলা হল, দীক্ষা দেওয়ার সময়? উত্তরে তারা জানাল, তখন তো দীক্ষা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এখন তো আমাদের আর কাছেই যেতে দেয় না। তখন তাদের বলা হল, তাহলে তো মুশকিল হল! অজ্ঞান চলে গেলে করবেটা কী? তারা বলল, কেন, তাহলে তো মুক্ত হয়ে যাব! তাদের বলা হল, মুক্তি কি তুমি চাইছ? তাহলে তোমার নাতিপুতিকে কে দেখবে? তোমার বাড়িঘরের সবাইকে দেখবে কে? তারা বলল, তাদের তো একটু দেখতে হবে! তাহলে একটুখানি অজ্ঞান রেখে দিও! (তাহলে ভাব কীরকম কল্পনা আমাদের মনের ভিতর থাকে!) তাদের আরও বলা হল, দেখ তুমি ভুল বুঝছ! তুমি যদি সত্যিই অজ্ঞানমুক্ত হও তখন সবাইকে আপন বলে গ্রহণ করতে পারবে, যেমন তুমি নিজেকে দেখ ঠিক সেই ভাবেই। এর নাম আত্মজ্ঞান। তখন আরও বেশি সবাইকে ভালবাসতে পারবে—স্থূল দেহে নয়, ইন্দ্রিয়ে নয়, প্রাণে নয়, মনে নয়। তাহলে কী দিয়ে? সর্ববোধ দিয়ে একবোধকে বরণ করতে পারবে। শ্রীগীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে এটাই সারকথা। পুরুষোত্তমের ভজন কী দিয়ে করবে? 'সর্বভাবযোগে।' সর্বভাব দিয়ে সেই পূর্ণ অখণ্ড এক-কে বরণ করে নিতে হবে।

তোমাদের সামনে যখনই সময় সুযোগ হয় এই এক-এর কথা, আত্মার কথা, চৈতন্যের কথা বলা হয় একটু অন্য ভঙ্গিমায়। তার কারণ, যে ভঙ্গিমার সঙ্গে তোমরা পরিচিত সেই ভঙ্গিমা দিয়ে কিন্তু তোমরা এক জায়গায় আটকে আছ, আর এগোতে পারছ না। সেখান থেকে বেরোতে গেলে যা দরকার সেই কথাই তোমাদের সামনে বলা হচ্ছে। আমরা ফুলচন্দন তুলসী দিয়ে ঠাকুরকে পূজা করি। সেই ঠাকুরও কীরকম ঠাকুর? আমাদের মনগড়া বিগ্রহ, সে মাটিরই হোক, ধাতুরই হোক, কাঠেরই হোক বা পাথরেরই হোক বা পটই হোক, ঘটই হোক—তাঁকে আমরা মনে করছি, এই হচ্ছে ঠাকুর বা ঈশ্বর। লক্ষ্য বস্তুটা কিন্তু আমাদের চোখের সামনে চৈতন্য নয়। চৈতন্য হচ্ছে নিজের ভিতরে ব্যবহারের জিনিসটা। এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলে আমাদের গতানুগতিক যে ধারা বা convention তাতে আঘাত লাগে। সেইজন্য 'এ' কোনওরকম ভাবে সেদিকে না-গিয়ে একটা নূতন ধারায় সত্যের আলোকে মানুষের সামনে আত্মস্বরূপের পরিচয় রাখবার চেষ্টা করছে। কেননা মানুষ যখন শুনবে যে, সে যা অভ্যাস করছে সেগুলো ভুল-ত্রুটিতে ভরা তখন সে ঘাবড়ে যাবে। 'এ' সেগুলো বলে মানুষকে ঘাবড়িয়ে দেবার জন্য আসেনি, শুধু তাকে সচেতন করবার জন্যই এই কথাগুলি বলে চলেছে।

আমি-ই সমস্ত অনুভূতির সারবস্তু, সমস্ত কিছুর কেন্দ্র বা মূল এবং এই সত্যকে দিয়ে মানুষের সামনে এমন একটা প্রসঙ্গ রাখা হচ্ছে যা কোনও মত-পথের বিরুদ্ধে যাবে না অথচ কোনও মত-পথকে তোয়াজও করবে না। It is so self-sufficient, so perfect that it does not require any help or any support or subordinate or any duplicate.

কিন্তু আমাদের গতানুগতিক ধারাতে আমরা বস্তুকে নিয়েই মাতামাতি করছি। পূজাপাঠ সবকিছু বস্তুকে অবলম্বন করেই আমরা করে থাকি। কিন্তু 'এর' বক্তব্যের মধ্যে বস্তুর স্থান আদৌ নেই। আসল বস্তুটি আছে। তা কী? Eternal substratum. "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।।" সেই দেবতা সর্বভূতে নিহিত আছেন সর্বভূতের অন্তরাত্মারূপে অর্থাৎ সর্বভূতের সত্তা এবং অনুভূতি রূপে—not confined to a particular image, কোনও একটা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সীমিত নয়। এই কথা শুনে তারা বলল যে, সীমিত না-হলে আমরা ধরব কী দিয়ে? সীমিত বস্তুকে ধরলে সীমার মধ্যেই থাকতে হবে, অসীমকে ধরলে অসীমের মধ্যে থাকতে পারবে। সেইজন্য গোড়াতেই বলা হল, "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্"—এই হচ্ছে আরাধ্য বস্তু। "ন ইদং যদিদম্ উপাসতে"—আমরা যেভাবে উপাসনা করি সেই ভঙ্গিমায় উপাসনা নয়। তা কীরকম? "স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা।" যাঁকে কেউ জানে না, যিনি সবাইকে জানেন সেই চৈতন্যস্বরূপ হচ্ছে Real I। এই Real I-এর কোনও বিজ্ঞাতা নেই, তিনি সর্ববিজ্ঞাতা। তাই বলা হয়েছে "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"—এই বিজ্ঞাতার আর কোনও বিজ্ঞাতা নেই। তা Supreme Reality, the Absolute, the supreme personality of Godhead Absolute, Who stands as the head and shoulder of all spiritual leaders—প্রত্যেকের গুরুর গুরু অর্থাৎ পরমাত্মগুরু আত্মগুরু।

আত্মগুরুর উপরে আর কোনও গুরু নেই। আত্মগুরু প্রত্যেকের হৃদয়ে বাস করেন। কাজেই হৃদয়বোধ দিয়ে যখন কোনও কিছু ব্যবহার করা হয় that is the Knowledge of Oneness। মন দিয়ে যা ব্যবহার করা হয় তা Oneness নয়, manyness। তা হচ্ছে আমাদের মনের পছন্দমতো অর্থাৎ liking and disliking নিয়ে কারবার বা ব্যবসা। কারণ পছন্দকে maintain করতে হবে এবং অপছন্দটাকে সরাতে হবে। প্রত্যেকেই যদি তাই করতে যায় তাহলে প্রত্যেকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব থাকবে, মিল থাকবে না। কিন্তু কোন কথাটা দিয়ে আরম্ভ হবে? সত্য দিয়েই প্রত্যেককে আরম্ভ করতে হবে। সত্যের মধ্যে ভেদ নেই, জ্ঞানের মধ্যে ভেদ নেই। অনন্তের মধ্যে ভেদ কোথায়? অনন্ত মানে আনন্দ, আনন্দের মধ্যে ভেদ নেই। ভেদটা প্রকাশের মধ্যে আমরা দেখি ইন্দ্রিয় দিয়ে, কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় সীমিত বস্তু দিয়ে তৈরি। চোখ রূপ নেয়, চোখ শব্দ নিতে পারে না; কান শব্দ নেয়, রূপ নিতে পারে না; নাক ঘ্রাণ নেয়, শব্দ নিতে পারে না, রূপও নিতে পারে না; ত্বক স্পর্শ নেয় আর কিছু নিতে পারে না; জিহ্বা আস্বাদন করে, taste নেয়, আর কিছু নিতে পারে না, সেই taste-ও তার অদ্ভুত তা এই যে division, পঞ্চভূতে গড়া এই দেহ, পঞ্চভূত দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু ভূতনাথের সাক্ষাৎ কী করে পাবে? যে গুরু বা ইষ্টের জন্য তোমরা তপস্যা করছ, যাঁকে পেতে চাইছ, তিনি যে তোমারই নিজের স্বরূপ—তা যতক্ষণ আবিষ্কার করতে না-পারবে ততক্ষণ তুমি অন্ধকারেই থাকবে। বহুবার নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, মাতৃজঠরে প্রবেশ করতে হবে, দেহ নিয়ে আসতে হবে, তার পরে ভিন্ন ভিন্ন মত-পথের সঙ্গে যুক্ত থেকে

সাধনভজন করতে হবে। এক ঋষি আরেক ঋষিকে বলছে, যে "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি"—এমন কী বস্তু আছে যাকে জানলে সব জানা হয়ে যায়? তখন উত্তরে দ্বিতীয় ঋষি বলছেন, হ্যাঁ, আমি জানি। সেই সত্য বস্তুর খবর আমি জানি। তোমার যদি দরকার হয় আমি তোমাকে সেই সম্বন্ধে জানাতে পারি। তখন জিজ্ঞাসু ঋষি বললেন, আমি তো তা-ই জানতে এসেছি। তখন উত্তরে দ্বিতীয় ঋষি বললেন, সেই বস্তু হচ্ছে তোমার আত্মস্বরূপ অখণ্ড ভূমা অর্থাৎ your Absolute Self nature। সেই Absolute কী রকম? সেই Absolute-এর যে পরিচয় তা হচ্ছে 'অখণ্ড ভূমা একোঽহম্। অহম্ ঊর্ধ্বস্তাৎ অহং অধস্তাৎ অহং পশ্চাৎ অহং পুরশ্চাৎ অহং বামতঃ অহং দক্ষিণতঃ অহং অন্তঃস্থ অহং বহিঃস্থ অহং মধ্যস্থ অহং সর্বব্যাপী অখণ্ড ভূমা।' এই কথা শুনে জিজ্ঞাসু ঋষি বললেন—এ কী অভিনব কথা!

এই এক আমি-র কথাই 'এ' সবার সামনে রেখেছে, যার বিকল্প নেই, যে সবকিছুর মধ্যেই আছে, কিন্তু কোনও কিছুই তাকে অতিক্রম করতে পারে না। That I is the eternal background of all expressions of knowledge. That I is the essence of knowledge, that is Knowledge of Knowledge, Oneness of Knowledge /Knowledge of Oneness. তাকে তুমি ব্রহ্ম বল, আত্মা বল, ঈশ্বর বল এগুলো সব secondary, কারণ যে ব্রহ্ম সে-ই আত্মা, সে-ই আল্লা, সে-ই খোদা, সে-ই রাম, সে-ই কৃষ্ণ। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? সবকিছুই তাঁর পরিচয়। তাঁকে কিছু দিয়ে limit করা যায় না। কিন্তু আমাদের মন limit করে বসে আছে—এটা আমার, ওটা আমার—এই সব ভেবে। আমার যেই বলল আমি limited হয়ে গেল। কাজেই আমারযুক্ত আমি হচ্ছে জীব। জীব সবসময়ই আমারকে পোষণ করছে, আমারভাবকে নিয়ে মেতে আছে সারাজীবন। আমারকে ছেড়ে তার চলে না। আমার নামই সংসার। কিন্তু আমারটা যখন আমি-র মধ্যে মিশে যায়, আমি-র ভাগ বেশি হয় তখন জীব হয়ে যায় ঈশ্বর, 'জীব ঈশ্বর, ঈশ্বরই জীব'। তারপর আরও গভীরে যখন শুধু বিশুদ্ধ আমি হয়ে যায় তখন আমারশূন্য, তখন হয় ব্রহ্ম-আত্মা। "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ।।" তুমি তোমার পূর্ণস্বরূপকে ভুলে অপূর্ণস্বরূপ নিয়ে মাতামাতি করে দোহাই দেবার চেষ্টা যদি কর, justify করার চেষ্টা কর—এটা এই, ওটা so and so, তাহলে কিন্তু দেহ/সংসার কারাগারে বাস করতে হবে।

এমন কোনও দেবতা নেই যিনি তা হতে তোমাকে উদ্ধার করতে পারেন except your own Self. The Real I is the saviour of all. তাই দেবতাকে পূজা করার সময় আত্মগুরুর নির্দেশ হচ্ছে, 'ভজ মন স্বরূপ আপন'। 'দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ।' দেবতা হয়ে অর্থাৎ দেববোধে দেবতার পূজা কর। তবেই সেই পূজা সার্থক ও ফলপ্রদ হয়। অন্যথায় দেবতার পূজা করতে গেলে দেবতার গ্রাসের তুল্য হয়ে যাবে অর্থাৎ দেবতার কাছে বলি হয়ে যাবে। কে চায় নিজেকে দেবতার কাছে বলি দিতে? কেউ চায় না, কিন্তু হয়ে যায়। আমরা প্রত্যেকেই জীবভাবে দেবতার কাছে বলি হয়েই আছি। কেননা দেবতাদের দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি, we know not what is our subtle nature but we are gov-

erned by our subtle nature. That subtle nature is nothing but gods and goddesses (divine agents). ঐ gods and goddesses তাঁরাও কিন্তু মুক্ত নন, কেননা they are also governed by the central nature—ঈশ্বর। এই যে stage-গুলোর কথা বলা হল, এই stage-গুলো সবার ভিতরে আছে, কিন্তু সবাই সেই সম্বন্ধে সচেতন নয়। মানুষকে সচেতন করার জন্য এই formula-টা বলা হল।

অর্জুনকে বলা হয়েছিল যে, "বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ"। অর্থাৎ বাসুদেবই সব হয়েছেন—এই বোধ হয়েছে যাঁর, সেই মহাত্মা অতি দুর্লভ। এই কথাটাকে যদি আরও একটু সোজা করে বলা যায় তাহলে বাসুদেবের জায়গায়, "একোঽহম্ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ"। বাসুদেব শব্দ অর্থে, 'যস্য বাসঃ সর্বভূতেষু—য বসতি', প্রত্যেক ভূতে যিনি বাস করছেন তিনিই বাসুদেব। তাহলে সর্বভূতে যিনি বাস করছেন তাঁর সঙ্গে যাঁর পরিচয় হয়েছে তিনিই বাসুদেবের সন্ধান পেয়েছেন। এই বোধ যাঁর হয়েছে তিনি "স মহাত্মা সুদুর্লভঃ", অতি দুর্লভ সেই মহাত্মা যিনি সর্বভূতে এক ঈশ্বর-আত্মাকে পেয়েছেন নিজবোধে, অর্থাৎ He who realizes God or Self I in all and all in the same God or Self-I, তাকে আরও সোজা করে যদি বলা হয় তাহলে এই ভাবে বলা যায়—He who realizes Himself in all and all in Himself। তখন কী হবে? আরও সোজা করে বলা যেতে পারে—He who realizes the I-Absolute and all within that I-Absolute, is the greatest realizer। 'এর' বক্তব্যের মধ্যে কোথাও খাদ নেই। 'নাহি আছে মত, নাহি আছে পথ, নাহি আছে দলাদলি, আছে শুধু বোধে বোধে কোলাকুলি।' অর্থাৎ embracing all as One 'I', because 'I' is the eternal substratum, যা সবকিছুর মধ্যেই মিশে আছে।

আপন ঘর ছেড়ে পরের ঘরে যাওয়াটা হল ভ্রান্তি। তাই সাবধান করে বলা হয়েছে, 'যেও নারে মন আপনঘর ছেড়ে।' "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ"—আপনবোধে যদি তোমার দেহ নাশও হয় তা সর্বোত্তম। কিন্তু পরের ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে তুমি হয়ত আজকের দিনটা রেহাই পেলে, কালকে এসে ঐ পঞ্চভূত বলবে, দেহের সবকিছু আমাদের! দিয়ে দাও, নিয়ে যাব সব! তখন আর কে রক্ষা করবে? ভূতনাথকে নিয়ে পঞ্চভূত কিন্তু মাতামাতি করতে পারে না, ঐ একটু গাঁজা প্রসাদের জন্য ওত পেতে থাকে যদি একটু প্রসাদ পাওয়া যায়। সবাই প্রসাদের জন্য লালায়িত। প্রসাদ কী? একটু শান্তি।

একসময় অনেক বছর আগেকার কথা, গাঁয়েগঞ্জে 'এ' ঘুরত। ঘোরা 'এর' অভ্যাস। গত মহাযুদ্ধের সময়কার কথা। গাঁয়েগঞ্জে ছিল কামারশালা, ছুতোরদের বাড়ি, কামারদের বাড়ি। 'এ' তো ঘুরত সব জায়গায় সবার বাড়িতে বাড়িতে। 'এ' কামারশালায় গিয়ে দেখল যে, ওরা কাঠকয়লা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। আর একটা হাপর আছে তা দিয়ে হাওয়া দিচ্ছে, তার নিচে লাগিয়ে দিয়েছে, হাওয়ায় তার ভিতরে আঁচে আগুন জ্বলতে থাকে; হাওয়ায় তা দিয়ে বাতাস করে আর ওর মধ্যে লোহার কিছু দিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে লাল হয়ে যায় লোহাটা আগুনে। আর একটা লোহার নেহাই (anvil) আছে, anvil—লোহার

পিণ্ড। চিমটা দিয়ে ঐ লাল লোহাকে নিয়ে এসে নেহাইয়ের উপর ধরে আর দুজনে মোটা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হাতা, খুন্তি, দা, কুড়োল তৈরি করে। পেটানোর পর যখন লাল ভাব কমে কালো হয়ে আসে তখন তা সাঁড়াশি দিয়ে ধরে নিয়ে পাশে একটা মাটির গামলায় জলের মধ্যে ফেলে দেয়, তখন সোঁ করে একটা আওয়াজ হয়। ওর থেকে একটু ফেনার ভুড়ভুড়ি বের হয়, ঐটুকু হচ্ছে ওর শান্তি। মানে ঐ যে পেটাল, আবার আগুনে পোড়াল তারপর আবার পেটাল, তার পরে জলে দিল, ঐ এইটুকু একটু শান্তি, তার পরেই ওঠালো, উঠিয়ে আবার আগুনে দিল যতক্ষণ না shape ঠিক হয়ে যায়। আমাদেরও সেই আপনবোধ জাগার আগে পর্যন্ত প্রকৃতি ঐরকম করে পেটায়। এই মারের থেকে কেউ রেহাই পায় না। কিন্তু যে বিজ্ঞান 'এ' তোমাদের বলছে, সেখানে কিন্তু প্রকৃতিই নেই। পেটাবে কে কাকে? When you are above all, Onc, infinite, eternal One, there is no duality—কার সঙ্গে কার দ্বন্দ্ব হবে?

অদ্বৈতের কথা শুনলে অনেকের একেবারে নাক সিটকিয়ে আসে। তারা বলে, ও সব বাবা আমাদের জন্য নয়, আমরা দ্বৈতবাদে আছি বাবা! ঠাকুরকে নিয়ে থাকব, মাকে নিয়ে থাকব, গুরুকে নিয়ে থাকব! গুরু যে 'বল হরি হরি বোল' করে চলে গেলেন তোমার আগেই, আর গুরুকে কোথায় খুঁজে পাবে? কিংবা তুমিই চলে গেলে, গিয়ে জন্মালে অন্য কোথাও! হয়ত গিয়ে জন্মালে চিনে, জাপানে, রাশিয়ায়! সেখানে কোথায় গুরু আর কোথায় ঠাকুর! তখন বলে, আমাদের দাবি মানতে হবে! যাবে কোথায়! আমরা কষ্ট পাই নিজেকে ভুলে। নিজেকে ভুলে যখন অন্য জিনিস নিয়ে মাতামাতি করতে যাই তখনই কষ্টটা আসে। তাই বলা হয়েছে—মনের যে ভুল, তা তো মন নিজে শোধন করতে জানে না। অতীতে কত ভুল করে আমরা এসেছি, কিছুই মনে নেই। কোথায় জন্মেছিলাম, কী করেছি, কী না-করেছি—কিছুই মনে নেই। এই জন্মেও যা করছি কিছুই মনে থাকবে না। আরেকটা দেহ নিয়ে যখন আসব আরেক জায়গায় তখন নতুন নতুন লোকের সঙ্গে সম্পর্ক হবে, আবার তাদের নিয়ে ঘর সংসার পাতা হবে। দিনকয়েক চলবে খেলা তারপর আবার ভেঙে যাবে। তাই এই প্রসঙ্গে একটা উদগীত গানে বলা হয়েছে—

কেন ভুলিলে ওরে মন (তুমি)
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অমৃত স্বরূপ আপন।
আবার এসে হেথা নিলে ভোগের জীবন।।
যা চেয়েছ তাই পেয়েছ জান না তো তার কারণ
সাধ ক'রে পরলে গলে সগুণের বাঁধন।।
ভোগাসক্তির ফল দুর্গতি ভুগতে হবে জনম জনম
ছাড়বে না সে অত সহজে শুনবে না সে কোনও বারণ।।
মিলে পুনঃ সাধুসঙ্গে মন দোষগুণ সব কর বর্জন
ভোগাসক্তির কঠিন বাঁধন আপনি ছাড়বে তখন
মুক্ত স্বরূপের স্মৃতি আপন নিরন্তর হবে স্মরণ।।

থাকবে না আর ভ্রান্তি ভীতি মোহাসক্তি দুঃখ দুর্গতি
স্বভাবের সাধন ধর্মাধর্ম জন্ম মরণ ভেদপ্রতীতি।
আপনবোধে সবার সাথে হবে অভেদে মিলন
অন্তরে বাহিরে হবে শুধু সমদরশন
আপনে আপন পূর্ণ পরমে পরম
স্বয়ং-এ স্বয়ং সহজ এ আত্মসাধন।।

(কাফি— কার্ফা)

শরীরটা কত অপদার্থ বস্তু, তা জামাকাপড়ের মতো। তা পুরানো হয়ে গেলে জীর্ণ হয়ে যায়, তখন তাকে ছাড়তে হয়। এই প্রশ্নটা কি জাগে তোমাদের মধ্যে? মন ভুল করে এসে একটা দেহ নিয়েছে আবার সেই ভুলই করে যাচ্ছে। কোথা থেকে এসেছ, কোথায় যাবে, নেই কোনও ঠিকানা। কেন এসেছ? কিছুই জানা নেই। আমরা সবাই ঘরসংসার পাতি, যেমন শিশুরা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাঘর সাজায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খেলাঘর ভেঙে কর্মক্ষেত্রে চলে যায়। আবার সংসাররূপ খেলাঘরে প্রবেশ করে। এখান থেকেও কেউ কেউ ঘর সংসার ফেলে বেরিয়ে চলে যায়। তারা কোথায় যায়? আপনঘরে ফিরে যায়। সেই আপনঘরে হানাহানি খুনোখুনি নেই, দ্বন্দ্ব, ভেদ, ভুল বোঝাবুঝি, অশান্তি, দুঃখকষ্ট, ভাবনাচিন্তা নেই, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি নেই। তা কি তোমরা ভাবতে পার? So perfect is that state! আমরা justify করার চেষ্টা করি duty এবং responsibility-র দোহাই দিয়ে। These are all imaginary concepts যেগুলো product of ignorance। যখনই আমরা কোনও কিছু justify করার চেষ্টা করি তখনই আমরা অজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিই। জ্ঞানে justification নেই। আমাদের জ্ঞানাভাসের সঙ্গে সম্পর্ক, জ্ঞানের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই। অনেকে বলে, এরকম ভাবে চললে তো সংসার চলবে না! আরে সংসার তো একটা স্বপ্নবিলাস! স্বপ্নের মধ্যে এরকম আমরা অনেক কিছু দেখি। কালকে 'এ' স্বপ্নের প্রসঙ্গে বলবে, আজকে নয়, কেননা সময় permit করবে না।

এই যে কথাগুলো সবার জন্য বলা হচ্ছে তা কিন্তু শুধু নিজের সত্য পরিচয়ের জন্য, অন্য কিছুর জন্য নয়। Is there any God or not, is there any truth or not, is there any Reality or not—কোনওটাই 'এ' bother করছে না। আমিকে আমার খুঁজে পেতেই হবে, যে আমি শুধু আমি-ই, অন্য কিছু দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। তার জাত নেই, বর্ণ নেই, লিঙ্গ নেই, সম্প্রদায় নেই, দল নেই, মত-পথ নেই—all-perfect eternal One I, which is the background of all creations, সমগ্র সৃষ্টি যার বক্ষে ওঠে, ভাসে, ডোবে, আর যে সবসময় একই রকম থাকে৷ মনের আবির্ভাব-তিরোভাব আছে, কিন্তু এই মনকে নিয়েই তো সংসারের সমস্ত কিছু। আজকে সারা পৃথিবীব্যাপী মনের খেলা চলছে, কিন্তু সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন সংসার কোথায় থাকে? দেশ-কাল, কার্য-কারণ সব লয় হয়ে যায়। 'মনোদয়ে জগতের উদয়, মনোলয়ে জগতের লয়।' জগৎ চিত্তের মূলে ভাসছে অর্থাৎ

entire universe is the projection of mind। জগৎই মন,মনই জগৎ। কিন্তু মন নিজেকেই জানে না আর অপরকে জানবে কী করে? সে আন্দাজে অনুমান করে। এই অনুমান তো কখনও সত্য হয় না। কাজেই মন নিয়ে কারবার করে অজ্ঞান। অজ্ঞানের মধ্যে আছে অনুমান, অপমান ইত্যাদি আবার সম্মান, কিন্তু সমানটা নেই। সমান আমি-র মধ্যে আছে। I stands as the eternal substratum equally present in each and all.

প্রত্যেকেই আমিকে ব্যবহার করছে, in one form or other। কেননা আমি চৈতন্য, মন চৈতন্য নয়, চিদাভাস। মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ হল চিদাভাস। অন্তঃকরণ— করণ মানে ইন্দ্রিয়, medium, instrument যার মধ্যে দিয়ে চৈতন্য reflected হয়। অথচ আমরা 'আমার মতে', 'আমার মনে হয়'—এই কথাগুলো দিয়েই জীবনে চলি এবং ফাঁকি দিই। কিন্তু ফাঁকিটা বুঝতে পারি না আমরা। কেউ বুঝিয়ে দিলেও মানতে পারি না, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সেইজন্য গুরুগণ খুব বিচক্ষণ, তাঁরা একটা শব্দ বা মন্ত্র দিয়ে দেন এবং শিষ্যকে বলেন—এই মন্ত্র একটু জপ কর। জপ করতে থাক, আরও জপ কর। তাই করতে করতে অনেক সময় মনটা শান্ত হয়। That is a process no doubt কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ, কতগুলো জনম যে চলে যাবে তার ঠিক নেই। ততদিন কান্নাকাটি করতে হবে যতদিন না তোমার অজ্ঞানের বৃত্তিগুলি নাশ হয়। শেষে অখণ্ড ব্রহ্মাকারা/আত্মাকারা একটা বৃত্তি থাকবে, সেই একটা বৃত্তিকেও নাশ করে এগিয়ে যেতে হবে। কীরকম? অনেকেই হয়ত শ্মশানে শবদাহ করতে গিয়েছে। অনেকেই জানে যে, শবদাহ করতে গেলে লকড়ি দিয়ে শবকে সাজাতে হয়, তার উপরে বসাতে হয়, তারপর আগুন দিতে হয়। অনেক সময় তাপে মৃতদেহের ভিতরে যে বায়ু থাকে তাতে শরীর বেঁকে ওঠে। লোকে তখন মনে করে, এই রে এ ভূত বোধহয়! ব্যস্ চিৎকার করে ভয়ে পালায়। আর তখন শবদাহকারীরা লাঠি দিয়ে মৃতদেহকে পেটায়। তখন যাদের বাড়ির শব তারা খুব কান্নাকাটি করে। এই ভাবে তারা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আগুনকে ঠিক করে দেয় এবং শরীর থেকে বাইরের কাঠটাকে সাজিয়ে দেয়। তার পরে কী করে? সব হয়ে যাবার পরে ঐ লাঠিটাও আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়—that is the finishing touch!

তোমার গায়ে কাঁটা বিঁধেছে, আর একটা কাঁটা নিয়ে এসে কাঁটাটা তুলে তারপর দুটোই ফেলে দিলে। জ্ঞান (জ্ঞানাভাস) দিয়ে অজ্ঞানকে তাড়িয়ে বা সরিয়ে ঐ জ্ঞান-অজ্ঞান দুটোকেই ফেলে দিতে হয়। 'জ্ঞান অজ্ঞানাৎ পরাৎপর', অজ্ঞানের পরপারে, জ্ঞানেরও পরপারে প্রজ্ঞানস্বরূপ নিত্যবর্তমান। কিন্তু এই নিত্যবর্তমান প্রজ্ঞানের যে আমি তা হৃদয়ের গভীরে, একেবারে গভীরতম প্রদেশে অশেষসাক্ষিরূপে বিরাজমান। তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বোধের গভীরে রয়েছে as it is, untouched। তা অস্পৃশ্য, তাকে স্পর্শ করার কোনও উপায়ই নেই। So subtle it is, subtlemost, the subtlemost is untouched. তাকে স্পর্শ করার দ্বিতীয় কেউ সেখানে নেই। এই জ্যোতিঃস্বরূপ যে তার কাছে দ্বিতীয় কোনও বস্তু টেকে না, সব dissolve হয়ে যায়। "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।" অর্থাৎ সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি। "সূর্য কোটি প্রভাদীপ্তম্ চন্দ্র কোটি সুশীতলম্।" অর্থাৎ কোটি সূর্যের মতো তার

জ্যোতি, আর কোটি চন্দ্রের মতো যা শীতল ও শান্ত। আগুন সবকিছুকে পোড়ায় কিন্তু নিজেকে পোড়াতে পারে না। কাজেই যে আমি-র কথা বলা হল, সেই আমি হল প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ বিশুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। তা সবকিছুকে প্রকাশ করে, কিন্তু তাকে দ্বিতীয় কোনও বস্তু প্রকাশ করতে পারে না অর্থাৎ তা নিত্যাদ্বৈত ও স্বয়ংপ্রকাশ। তোমার ভিতরে যে আমি সেই আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, তা কিন্তু অহংকার নয়। অহংকার সসীম, তা মনের অধীন। দুটো আমি আমাদের মধ্যে আছে। এই দুই আমি-র কথা তোমরা শুনেছ ঠিকই, কিন্তু recognize করবে কী দিয়ে? যে আমি-র প্রশ্ন আছে সেই আমি অহংকার, আর যে আমি-র প্রশ্ন নেই সেই আমি হল অহংদেব বা আত্মারাম প্রাণারাম, অর্থাৎ যা কখনওই হারায় না, যার কোনও উদয়-অস্ত নেই, যার কখনও বিকার হয় না, যার কখনও কোনও প্রতিপক্ষ বা বিকল্প নেই। তা-ই হল প্রত্যেকের নিজের সত্য পরিচয়, অর্থাৎ আমি-র আমি পাকা আমি। এই আমি-র আভাস হল মন। তার কথা আগামীকাল বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হবে, যা পরিষ্কার করে তোমাদের বুঝিয়ে দেবে তোমাদের সত্য পরিচয়টা কী!

আমরা ব্যবহার করছি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহংকার, চিত্ত এবং বুদ্ধি। এগুলো দিয়ে আমরা জীবনকে ব্যবহার করছি। কিন্তু নিজের পরিচয়টা আমরা নিজেরা জানি না। সবসময়ই আমরা দেহের দিকেই বেশি গুরুত্ব দিই, কিন্তু দেহকে যে চালায় তার খবর জানি না। দেহের বিকার হলে ডাক্তারের কাছে ছুটি, ওষুধপত্র খাই বিকারকে শোধন করার জন্য। কিন্তু নিজের ভিতরে প্রাণই যে তাকে চালায় সে সম্বন্ধে আমরা ততখানি সচেতন নই। কাজেই আমাদের মধ্যে যে চৈতন্য তা দেহের ভিতরেও আছে, প্রাণেও আছে, মনেও আছে, বুদ্ধিতেও আছে, অহংকারেও আছে এবং চিত্তেও আছে, আবার দেহের বাইরেও আছে সর্বব্যাপী। এগুলো সবই কিন্তু মনের ব্যাপার। It is the mind alone which takes care of all these details from physical to vital, vital to mental, mental to intellectual, intellectual to universal where mind dissolves. That means individuality dissolves in the universal state.

When we think of our universal nature our individual nature becomes very weak and pales into insignificance. That is why we should think of the Absolute, then only our Absolute nature will dawn and reveal. If we think of the finite the finite will govern us. Why should we be governed by our finite nature—our imaginary nature, our physical body, vital, mental, intellectual, when our true nature is the eternal Substratum, the Background, the underlying Essence of all which pervades all, which makes everything revealed but nothing can reveal that eternal I? দু'দিন আগে ইদ্ ছিল। Id মানে Infinite Divine. Immortal Divine। Immortal Divine হল আমাদের আমি-র আমি, অহংকারটা নয় অহংদেব। "যস্য সন্নিধি মাত্রেন দেহেন্দ্রিয় মনোধিয়ঃ। বিষয়েষু স্বকীয়েষু বর্ত্তন্তে প্রেরিতা ইব। সৈব অন্তর্যামী অন্তরাত্মা ঈশ্বরঃ স্বয়ম্।।" অর্থাৎ যার সান্নিধ্যে এসে বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয় আপন আপন কাজে নিযুক্ত হয়, they engage themselves in their

scheduled work! Why? Out of fear, for the fear of non-existence they obediently follow the universal One and beyond, coming in contact with that background which is all luminous, which is the light of all lights, the eternal background, the eternal substratum, the substance which is the underlying essence of all beings and becomings.

যতরকম প্রকাশ সবকিছুর মূলে রয়েছে সেই অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ আমি বা পুরুষোত্তম। গীতার central কথাই হচ্ছে পুরুষোত্তম, পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষ কথা—সর্বভাব দিয়ে এই পুরুষোত্তমকে পূজা করার কথা অর্থাৎ 'all possible ideas are nothing but evolving expressions of the eternal I Absolute.' "একোঽহম্ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" "একোঽহম্"—Absolute I alone is I-Reality. That is the highest realization. "অহং ব্রহ্মাস্মি", "শিবোঽহম্", "সোঽহম্"—কাজেই জ্ঞানীদের মন্ত্রই হচ্ছে "সোঽহম্"। অর্থাৎ তাঁরা নিজেকে জ্ঞানস্বরূপ অনুভব করতে চান, অজ্ঞানস্বরূপ নয়। অজ্ঞানের মধ্যে gradation আছে, variation আছে, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ নিত্য একবস্তু, infinite One, It cannot be divided, It is indivisible One. সেইজন্য এই প্রসঙ্গে একটি উদ্গীত গানে প্রকাশ করা হয়েছে—

সোঽহং হংস হংস সোঽহং
অমৃতত্বের ভজন মুক্তি শান্তির সাধন।।
হংস জপে হয় চিত্ত শোধন
শুদ্ধ চিত্তে হয় ধ্যান সোঽহং সোঽহং।
সোঽহং ধ্যানে খোলে প্রজ্ঞানয়ন
অন্তরে আত্মবোধের হয় জাগরণ।।
সোঽহং ধ্যান আত্মজ্ঞানের বিজ্ঞান
আত্মবোধ সর্ববোধের পূর্ণ অধিষ্ঠান
আত্মবোধে হয় মুক্ত জীবন
অখণ্ডবোধের ভূমা দরশন।।
নিষ্কল নির্মল নিরবদ্য নিরঞ্জন
শাশ্বত অচ্যুত ব্রহ্ম আত্মা সনাতন
সচ্চিদানন্দঘন স্বানুভবদেব স্বয়ং
আপনে আপন পরমে পরম।।

(ভৈরবী—কার্ফা)

'স্ব অহং', 'অহং স্ব'—অজপা মন্ত্র, অর্থাৎ আমাদের আসল পরিচয়। 'সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ কেবলোঽহম্।' 'এ' আত্মবোধের ব্রহ্মবোধের বা আপনবোধের কথা বলছে—the Realization of all realization, Knowledge of all knowledge, not knowledge of

duality of persons, things, actions, results, space, time, causation; natural phenomena and natural events—all these are relative knowledge। But the Knowledge of Knowledge is the Supreme Reality, the Absolute, ever-present in each and all symptomatizing as I-Absolute and not ego. Ego is concerned with the physical body, with the vital, mental and intellectual, but I-Absolute, that is *Purushottama* is the substratum, the eternal background, the underlying essence of all, the life-pervading truth without which nothing can exist and nothing can be experienced. Knowledge and experience are One, i.e. Consciousness and experience are One, experience and I are but One. Because without I no experience is possible and without experience Consciousness cannot reveal. So Consciousness reveals as experience and as I. Then I-Absolute, Consciousness and the awareness, the Self-conscious awareness, all these are of the same One essence. 'নিত্যমেকং অদ্বিতীয়ম্', that is, it is eternally One without a second, secondless, flawless। There is no mind apart from the Self, but there is Self without mind.

এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হল, আমরা ego দিয়ে সংসার করে সারাজীবন কাটিয়ে দিই, কিন্তু তার পশ্চাতে কী আছে জানি না, ego দিয়ে সব solution আমাদের হয় না। We suffer because we follow the inner and outer nature but not the innermost central nature. If we follow our central nature all our sufferings will disappear. In the central nature there is no duality, so there is no conflict, there is no subject-object complex. It is the essence of all subject and object complex. That is why it is not only essential in our life but the only support without which our life cannot attain perfection, realization and immortality. The Knowledge Absolute is I-Absolute. I-Absolute is the Self-Divine. সেইজন্য 'এ' কোনও মত-পথের কথা এনে, conventional ধর্মজগতের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে বসেনি।

এখানে যা বলা হয় that is something new, original—the light which interpenetrates the gross, subtle, causal and supracausal; the outer, inner, central, transcendental and trans-transcendental. 'এ' stage-গুলোকে একটার পর একটা সাজিয়ে সবার সামনে রাখবে। It is upto you whether you appreciate it or not. There is a Self-light which cannot be denied. You can deny the entire universe but you cannot deny your own being, your own existence—Real I, in the presence of which you are alive, you are enjoying the life but creating problems after problems which cannot be solved by your inner mind, until and unless you take shelter in your central nature which is all-divine and you should rise above that. 'All Divine for All Time, as It Is.'

That means you are eternally divine. You are not a man as you are experiencing now. It is your mental concept, it is your dream conception. I will unfold the science of dream tomorrow. What is dream? All these are dreams that we experience in our day to day life, because nothing is permanent here. Everything is changeable just like the dream and dream objects. But what I present before you is eternal substratum wherein time is no time at all, space is no space at all, cause is no cause at all. Because that is the supreme Cause, the cause of all other causes which rules over all but nothing can enter there. "বাক্যমনাতীতম্", "বাকমনসোগোচরম্'—where mind, intellect and word cannot reach. That is your true Self which is the background of your intellect, mind, ego, mind-stuff, your vital and physical senses.

'এর' নিয়ম কিন্তু জাগতিক নিয়মের সঙ্গে মেলে না। কেননা জগৎ ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বাস করে, কিন্তু 'এ' যে কথাগুলো তোমাদের বলল তা ইন্দ্রিয়ের রাজ্যের খবর নয়, পুঁথিপুস্তকের খবর নয়। এগুলো মিশে যায় অখণ্ড আমিসাগরে (পাকা আমিতে), সেখান থেকে আর ফিরে আসতে পারে না। যেমন নদী সাগরে মিশে যায়, সাগর থেকে তখন আর ফিরে আসতে পারে না। ছোটবেলা থেকে 'এই আমিটা' সেই অখণ্ডকে খুঁজেছে, হৃদয়ের গভীরে তাকে পেয়েছে, সেখান থেকে আর আলাদা হয়ে ফিরে আসতে পারছে না। 'এর' কাছে কোনও মতপথ নেই—all else are insignificant, all are mental creations which appear as problems of life। আজকে জগৎ জুড়ে যত problem সবই mental। এই mental problem-এর solution হচ্ছে I-Absolute। If 'I' alone exists and all else are My own projection or reflection then nothing can stir me up, nothing can disturb me, nothing can overcome me, because 'I' is above all, beyond all. এখানে মৃত্যুরও মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে, কারণ মৃত্যু belongs to the mind and not to the Self। Self is unborn. Self is never born and never dies. There is no change in Self, in Pure Consciousness, in your Pure-I, Self-I, the Divine-I, the Absolute-I which stands as the ever-present I in each and every individual all over the world.

প্রত্যেকের ভিতরে আত্মা-আমি বাস করছে প্রত্যেকের আমি-র গভীরে, কিন্তু আমি তাকে জানে না, কেন না ego তাকে জানে না। Ego-কে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে কে? আত্মবোধের বাণী। 'এ' দিনের পর দিন এখানে বলতে আরম্ভ করলে তোমাদের ego কোথায় যাবে খুঁজে পাবে না আর! যে ego তোমাদের details বা diversities নিয়ে মাতামাতি করে সেই ego-ই থাকবে না, তো diversity কোথায় পাবে? গাঢ় ঘুমের মধ্যে তোমার জগৎ থাকে কি? The entire universe dissolves with the cessation of the mental and intellectual functions, the entire creation ceases to exist. আবার যেই মাত্র সে জেগে উঠল জগৎ জেগে উঠল। The world appears with the appearance of your

mind and the world disappears with the disappearance of your mind but when your mind dissolves altogether in *Samadhi* you will be identified with your all-perfect real nature—I-Absolute. আজকে গানের মধ্যে বলা হল—'আত্মা-অনাত্মার বিবেক-বিচারে মনোনাশ হয় সমাধির গভীরে/মনাতীত অব্যক্ত নিত্যাদ্বৈতের ঘরে নামরূপাদি সর্বদৃশ্য জ্ঞাতা জ্ঞেয়াদি সকলশূন্য/ দ্বৈতবিহীন আপনে আপন সচ্চিদানন্দ সাগরে।' আপনে আপন—এই আপনবোধের কথা আজকে তোমাদের সামনে রাখা হল। এই আপনবোধের কতখানি glory, যার distant reflection হচ্ছে universal appearance। 'এর' বক্তব্যের মধ্যে কোনও জায়গায় কোনও মতবাদ সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি—Reality as It is which stands as the underlying Essence of all theories, doctrines and theses. কী হবে মতবাদ দিয়ে? এগুলো সব imaginary conception of mind। কাজেই মনের যত প্রকাশ সেগুলো পড়ে থাকবে স্বপ্নের মতো এখানে, যখন জানবে যে, I-Absolute is the only Reality and all else are reflections! Reflection cannot overcome the reflector and you are the reflector, not the reflection. You are not slave of your mind, you are the master of all. তা কী করে অনুভূত হয় সেই বিজ্ঞান 'এ' সবার সামনে রাখছে—unconventional science, the unprecedented One।

অদ্বৈতবাদের কথা অনেক বলা আছে শাস্ত্রে ঠিকই, কিন্তু অদ্বৈতবাদী যারা তারা দ্বৈতবাদে খাবি খায়। 'এ' অদ্বৈতবাদকে ছাড়িয়ে নিত্য অদ্বৈতবাদের কথা বলছে। অদ্বৈতবাদও subject to change and modification, কেননা দ্বৈতবাদীরা খণ্ডন করছে অদ্বৈতবাদকে, অথচ নিজের আমিকে খণ্ডন করতে পারছে না কেউই—that is undeniable। তুমি জগৎকে deny করতে পার, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে deny করতে পার, দেবতাদের deny করতে পার, theory/ doctrine-কে deny করতে পার, কিন্তু নিজেকে deny করতে পারবে না। Who are you then? What is your real nature? What is your real identity? 'এ' সেই প্রসঙ্গই সবার সামনে পরিবেষণ করছে। Don't degrade yourself. "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।" আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করো না, আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার কর, By the help of upper Self which is Pure Consciousness you transcend your lower self, which is impure consciousness. Your upper Self is Real Self-I and lower self is ego or finite-I, impure-I. With the help of upper Self or Real-I you should overcome your ego-self, finite-I. By your Pure Consciousness you should rise above all your contradictions, all your misconceptions, all your misunderstandings that appear as the universal creation, the diversities of creation. All these are dreamlike experience but for the experience of this dreamless experience you require one perfect permanent experience and that verily you are, the Real Self-I. আজকে এখানেই সচ্চিদানন্দম্ সচ্চিদানন্দম্ সচ্চিদানন্দম্।

মন্তব্য ঃ

সপ্তম বিচারের পরিণামই হল অষ্টম বিচারের বিষয়বস্তু। অষ্টম বিচারের বৈশিষ্ট্যই হল নিজবোধের অর্থাৎ আপনবোধের সম্যক ব্যবহার দ্বারা জীবনের কল্পনামূলক মিশ্রবোধের ব্যবহারের শোধন। মিশ্রবোধ হল আমারবোধ প্রধান। আমারবোধের ব্যবহারে দেহেন্দ্রিয়-প্রাণের গুরুত্ব বেশি থাকে বলে তার দ্বারা সংসার জীবনের কার্যাদি নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু নিজবোধের বা শুদ্ধ আপনবোধের ব্যবহার সিদ্ধ হয় না। আমারবোধই হল মিশ্রবোধ, তার সঙ্গে যুক্ত আমিই হল চিদাভাস গুণাধীন—'কাঁচা আমি' বা জীবের আমি, অহংকার অজ্ঞানী অভিমানী। জীবের আমি স্বভাবদোষে আপনবোধসত্তার পরিচয় জানে না। আপনবোধসত্তাই হল শুদ্ধবোধসত্তা 'পাকা আমি'। হৃদয়ের কেন্দ্রে কূটস্থ সাক্ষিবোধরূপে তা বর্তমান। অদ্বয়বোধ হল তাঁর স্বরূপ। ঈশ্বরাত্মারূপে যাঁর কথা শোনা যায় তা জীবজগতের অধিষ্ঠানচৈতন্য যা সবার মূল সত্তা আত্মা। সাক্ষিবোধে এই আমি সবার হৃদয়ে নিত্যবর্তমান। আপনবোধ দিয়ে হয় তাঁর ব্যবহার এবং আপনবোধ দিয়ে হয় তাঁর নিত্যসম্বন্ধ। 'কাঁচা আমি' জীব আপনবোধের ব্যবহার দ্বারা "সোঽহং হংসঃ" মন্ত্রের সাধন দ্বারা 'পাকা আমি-র' সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তাঁর সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে যায়। তখন অখণ্ড একবোধ বা সমবোধ হল তাঁর পরিচয়। প্রত্যেকের মধ্যেই দু'টি করে আমি আছে—একটি বহির্ভাগের বৈচিত্র্য ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত 'কাঁচা আমি'। তা কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতারূপে সংসারবদ্ধ হয়ে জীবদশা ভোগ করে। তারই অন্তরে দ্বিতীয় আমি নিত্য শুদ্ধ মুক্ত আমি অখণ্ড ভূমা সাক্ষিবোধে অহংদেব 'পাকা আমি'। 'কাঁচা আমি' এই 'পাকা আমি-রই' প্রতিভাস। প্রতিভাস প্রতিভাসকের সঙ্গে নিত্যযুক্ত থেকেও ভেদজ্ঞানে দ্বৈতবোধে চ'লে কাল ও মৃত্যুর অধীনে আত্মবিস্মৃত হয়ে বাস করে। স্বভাবদোষে দ্বৈতবোধের অজ্ঞানমুক্ত হবার ইচ্ছা জাগে যখন, তখন সে 'পাকা আমি-র' সেবায় রত হয় আপনবোধে। তাঁর কৃপায় আপনবোধের ধর্ম লাভ ক'রে দ্বৈতভাববোধের প্রভাব মুক্ত হয়ে অমৃতময় শান্তিস্বরূপ অদ্বয়বোধে প্রতিষ্ঠা হয়। পাকা আমির সঙ্গে আপনভাববোধে যুক্ত না-হলে কাঁচা আমি অহংকারের শোধন হয় না। সেইজন্য জীবের আমি কাঁচা আমি নিজের অহংকার-অভিমান দোষে পাকা আমির বক্ষে যুক্ত থেকেও তাঁর পরিচয় জানে না। কাঁচা আমির অন্তরের ভাববোধ সবই কল্পনাপ্রধান। কল্পনা হয় নিজবোধের বিস্মৃতির ফলে। এই নিজবোধের স্মৃতি সদগুরুর কৃপায় শরণাগত কাঁচা আমি আপনবোধের ব্যবহারের মাধ্যমে লাভ ক'রে আপনার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপে অর্থাৎ পাকা আমির স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পাকা আমি হল *সচ্চিদানন্দঘন পুরুষোত্তম ব্রহ্ম-আত্মা সনাতন*। আমিতত্ত্ব হল তাঁর *যথার্থ স্বরূপ*। আমিতত্ত্বের কখনও কোনও বিকার বা রূপান্তর বা পরিণাম হয় না। পাকা আমি নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্ত নিত্যপূর্ণ নিত্যাদ্বৈত। আপনে আপন পরমে পরম স্বয়ং-এ স্বয়ং।

১৯/১২/০১

।। নবম বিচার ।।

ওঁ

বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং সদা গুরুং
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতম্ ।।
পরাৎপরং ধ্যেয়ং নিত্যমানন্দকারকং
হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্ ।।
স্ফটিক প্রতিমারূপম্ দৃশ্যতে দর্পণে যথা
তথা আত্মনি চিদাকারং সোঽহমিত্যুত ।।
আনন্দং আনন্দকারং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপম্
নিজবোধযুক্তং যোগীন্দ্রমীড্যম্ ভবরোগবৈদ্যং ।।
শ্রীমৎ পরব্রহ্ম গুরুং নমামি
শ্রীমৎ পরব্রহ্ম গুরুং স্মরামি
শ্রীমৎ পরব্রহ্ম গুরুং ভজামি
শ্রীমৎ পরব্রহ্ম গুরুং বদামি ।।

(গুরুমন্ত্র)

ঈশ্বর ভজন করেন গুরুকে আর গুরু ভজন করেন নিজের আত্ম-ব্রহ্মস্বরূপকে। জীব ভজন করে দেবদেবীকে, মহাগুরু পিতামাতাকে, শিক্ষাগুরু শিক্ষাদাতাকে। পিতামাতা, অন্নদাতা, জন্মদাতা গুরু—মহাগুরু, শিক্ষাগুরু, পরমগুরু। দীক্ষাগুরু পরাৎপরমগুরু—যাঁরা মুক্তির বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। পরমেষ্ঠীগুরু হচ্ছেন নিজবোধস্বরূপ। সবই শুধু বোধের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের পরিচয়। বোধসাগরে বোধের ঈক্ষণ হয়। এই ঈক্ষণ শব্দের ব্যবহার বাংলায় খুব বেশি পাওয়া যায় না—এটা সংস্কৃত শব্দ। ঈক্ষণ হচ্ছে স্ববোধবক্ষে, স্ববোধের যে স্বভাব, inherent power or inner nature, তার ভিতরে সহজাত একটা স্পন্দন ওঠে। তা হয়ে থাকে আনন্দের আতিশয্যে। তাই আনন্দের আতিশয্যে সে লীলায়িত হয় অর্থাৎ energized হয়, স্পন্দিত হয়। সৃষ্টির আদিতে কিছুই ছিল না। সৎ কী অসৎ তা নির্ণয় করার কোনও উপায়ই নেই। কিন্তু সৃষ্টি আরম্ভ হল আনন্দসত্তার বক্ষে অর্থাৎ অখণ্ডবোধস্বরূপ বা প্রজ্ঞানসত্তার বক্ষে। প্রজ্ঞান আর আনন্দ অভিন্ন, কেননা তা অখণ্ড ভূমা। অখণ্ড ভূমাসত্তা, বোধস্বরূপসত্তা, আনন্দস্বরূপসত্তার বক্ষে আনন্দের আতিশয্যে স্পন্দন ওঠে—এই হল আদি স্পন্দন। তা সৃষ্টির আগের কথা, মূলের কথা। এই স্পন্দন বাড়তে বাড়তে ছড়িয়ে পড়ে সত্তার বক্ষে। কিন্তু স্পন্দনের পর স্পন্দন যখন উঠতে থাকে তখন প্রতিটি স্পন্দনের ধারা ছড়িয়ে পড়ে

সৃষ্টি রূপে। সূক্ষ্মতম থেকে সূক্ষ্মতর, তার পরে সূক্ষ্ম—এই ভাবে আস্তে আস্তে স্থূলরূপ ধারণ ক'রে ঘনীভূত হয়। কিন্তু আদি কারণ আনন্দ। তা হল জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত বা অনুভূতি। জ্ঞানী ছাড়াও যোগী, ভক্ত ও কর্মী আছেন, যদিও মূলত সবাই অভিন্ন কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সবার একরকম ব্যবহার দেখা যায় না। তাঁদের সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন। জ্ঞানীদের মধ্যে আবার এক শ্রেণি আছেন, তাঁরা অজ্ঞানকেই সৃষ্টির কারণ বলেছেন। অজ্ঞান হল মায়া বা মিথ্যা—যা নেই অথচ আছে বলে প্রতিভাত হয়। বড় অদ্ভুত জিনিস। জ্ঞানের দ্বারা যেইমাত্র তুমি অজ্ঞানকে খুঁজতে যাবে দেখবে অজ্ঞানের কোনও অস্তিত্ব নেই। ছায়াটা আছে, যেই আলো নিয়ে এলে ছায়া কোথায় পালিয়ে গেল। অজ্ঞানে ভুল হয়, কিন্তু যেই জ্ঞান দিয়ে সেই ভুলটা তুমি লক্ষ্য করলে তখনই ভুলটা সরে গেল, কোথায় যে গেল আর খুঁজে পাবে না। সেই দৃষ্টিতে জ্ঞানীরা বলেন, মানুষের এই যে দুঃখ, তা অজ্ঞানজাত। যদি দুঃখের কারণটা জানা যায় তখন দুঃখটা আর থাকে না, কিন্তু দুঃখের কারণ সবাই জানতে পারে না। তার কারণ মানুষ সবকিছুর জন্য দায়ী করে অপরকে। নিজের দুঃখকষ্ট, ভাল-মন্দের জন্য দায়ী অপরে নয়, সে নিজেই।

নিজ অতিরিক্ত কোনও বস্তুর সত্তা নেই। এই প্রসঙ্গে ভজনের প্রথমেই বলা হয়েছে 'জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং যোগীন্দ্রমীড্যম্'। যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী পরমজ্ঞানী, তিনি নিজবোধযুক্ত। সেই পরব্রহ্মগুরুকে নমস্কার। তাঁকেই স্মরণ কর, তাঁকেই ভজন কর। তাঁর কথাই বলা হচ্ছে, অন্য কথা নয়। কিন্তু সংসারী মানুষ তো তা করে না। তাদের অন্যান্য কথা হচ্ছে সারাদিনের পুঁজি। তার পরে নিজের মনের কল্পনা তো আছেই। তার ফলে নিজের যা কিছু সুখ-দুঃখ তার কারণ যে সে নিজেই তা কিন্তু সে কোনওদিনও স্বীকার করবে না, জানতেও পারবে না। যখন সংসারের তাপে জর্জরিত হয়ে মানুষ এই দুঃখকষ্টের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য উপায় খোঁজে তখন অনুসন্ধানটা প্রথমে বাইরে করে, কিন্তু সেথায় কারণ খুঁজে না-পেয়ে নিজের মধ্যেই অনুসন্ধান করে। নিজের মধ্যে যাঁরা অনুসন্ধান করেন তাঁদেরই বলা হয় সাধক। আর যারা বাইরে অনুসন্ধান করে তারা ঘাতক। অর্থাৎ অপরকে দোষী করে নিজে রেহাই পেতে চায়। সংস্কৃতে তাদের বলা হয় ঘাতক। সাধক যিনি, তিনি নিজের মধ্যে যখন খোঁজেন, তখন দেখেন দোষগুলো সব নিজের মনের মধ্যেই রয়েছে, মনের বাইরে কোথাও নেই। যা-কিছু সবই তো নিজের মনের ভিতরেই আছে। তিনি তখন ভাবেন, মনের বাইরে তো আমি কিছুই চিন্তা করতে পারছি না! স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ঈশ্বর, আত্মা—কোনও কিছুই মনের বাইরে ভাবনা করা সম্ভব হচ্ছে না। সবই নিজের মনের মধ্যেই। মনটা কী বিরাট বস্তু! তা নিজের মধ্যে, বাইরে নেই! আমরা যে জগৎ বাইরে দেখছি, জ্ঞানীরা বলেন, বাইরে কিছু নেই, সবটা তোমার মনের মধ্যেই। তুমি জগৎ ছাড়িয়ে।

তোমার আসল পরিচয় হচ্ছে you are beyond universe। Universe is nothing but a vibrating expression of your inner being. তোমার অন্তঃকরণের একটা স্পন্দিত রূপ হচ্ছে এই বিশ্বজগৎ। এই সমস্ত সত্যের কথা সাধারণ মানুষ কোনওদিন শুনতে সুযোগ পায় না, আর শুনলেও মানতে পারে না তারা। কারণ তারা চোখের সামনে ইন্দ্রিয়

দিয়ে যা দেখছে তা অস্বীকার করবে কী দিয়ে? ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যা দেখি তা সত্য বলে আমরা যে মানি, তাও কিন্তু ষোলো আনা নয়, কাবণ প্রতি মুহূর্তে তা পাল্টিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্ন ভেঙে গেলে তখন মনে হয়, স্বপ্নদৃশ্য সত্য নয়! কিন্তু পরের দিন আবার যখন স্বপ্ন দেখে তখন পূর্বদিনের স্বপ্নের কথা ভুলে যায়, মনে থাকে না। তখন মনে হয়, গতদিন এরকম স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা তো মিথ্যা। কিন্তু দেখার সময় তাকেই সত্য মনে করছে। এই হচ্ছে মনের ধর্ম—সাধারণ মনের ধর্ম। কিন্তু সাধারণ মন ছাড়াও তো মনের মধ্যে একটা অসাধারণ মনের রূপ আছে। সেই যে অসাধারণ মনের রূপ তার সন্ধান কী করে পাওয়া যায়? যে মন দিয়ে আমরা বৈচিত্র্য দেখি, নানাত্ব-বহুত্ব দেখি তা দিয়ে এক-এর দর্শন হয় না। আপনবোধের দিক থেকে দেখতে গেলে আমরা বৈচিত্র্যকে খুঁজে পাই না, শুধু এক-কেই দেখতে পাই। 'এ' সেই মনের কথাই উল্লেখ করবে বেশি করে, কেননা বৈচিত্র্য দেখার মন তো চারদিকে ছড়িয়ে আছে। সবাই বলতে পারে, তা আমিও জানি! কিন্তু মন এই অনুভূতি পায় কার কাছে? মনের নিজস্ব কোনও সত্তা নেই, ধার করা সত্তা। এই সত্তা কার কাছ থেকে ধার করছে সে? তার পশ্চাতে বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি নির্ণয় করে দেয়—এটা এই, ওটা সেই—all positve, all negative নির্ণয় করে, কিন্তু একসময় একটার বেশি নির্ণয় করতে পারে না। তার কারণ বুদ্ধি একদেশদর্শী। পরমবোধির বা বোধস্বরূপের একেবারে নিকটের স্পন্দন, বোধসত্তার very nearer যে vibration তা-ই হল বুদ্ধি।

সমষ্টি বুদ্ধি হচ্ছে ঈশ্বর, আর ব্যষ্টি বুদ্ধি নিয়ে জীব। ব্যষ্টি বুদ্ধির মধ্যে অনেকগুলো বৃত্তি আছে। সেই বৃত্তিগুলি নিয়ে প্রত্যেকটি জীব জন্মের পর থেকে দেহনাশ পর্যন্ত চলাফেরা করে। এগুলো হচ্ছে তার সম্পদ, তার সুখ, দুঃখ, ভাবনা, চিন্তা যা-কিছু সব মনের বৃত্তি। কিন্তু এই বৃত্তিগুলো মনের মধ্যে যেমন ওঠে আবার মনের মধ্যেই লয় হয়ে যায়। সারাদিন এই বৃত্তিগুলো নিয়ে মানুষ চলে, কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা যা-কিছু করে আবার রাত্রিবেলা বিশ্রাম যখন করে তখন বৃত্তিগুলো নিজের মধ্যেই লয় হয়ে যায়। দিন আর রাতের এই হচ্ছে পার্থক্য। দিনের বেলা যে বৃত্তিগুলি ওঠে, রাত্রিবেলা সেগুলি আবার ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজকাল night duty যারা করে তাদের রাত্রিবেলাও সেই বৃত্তিগুলো চালাতে হয়। তার ফলে একটু অনিয়ম হয়। তাদের দিনেরবেলা তাহলে বিশ্রাম করতে হয়, বিশ্রাম করতে না-পারলে আস্তে আস্তে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনের দিক দিয়েও বিকার হয়, যার ফলে মনের ভ্রান্তি-ভীতি বেড়ে যায়। তার জন্য নানাবিধ মানসিক রোগ/বিকার আজকাল খুব বেড়ে গিয়েছে। মানুষ অনিয়ম অত্যাচার করতে করতে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে গেলে বিকার হবেই। ব্যাধির কারণ হচ্ছে নিজের খেয়াল না-রেখে অচেতন ভাবে চলা। সেভাবে যারা চলে তাদের কতগুলো মাশুল দিতে হয়। এই মাশুলই হল বিকার বা ব্যাধি। এই যে মনের প্রসঙ্গ আজকে কথার মধ্যে এসে পড়ল, এই সম্বন্ধে অনেক কথা বলার আছে। এই মন নিয়ে আমরা সবাই চলি। ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে ভ্রান্তি, ক্ষণে ভীতি। বেশ ভালই আছে হঠাৎ অকারণ একটা কথা শুনে শরীর

কাঁপতে আরম্ভ করল, মাথাটা ঘুরতে আরম্ভ করল, হয়ত পড়েই গেল। তারপর ডাক্তার ডাকতে হল। ডাক্তার দেখে বললেন, বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে! ভাল খাবার খেতে হবে। শরীরের সঙ্গে মনের সম্পর্ক তো আছে নিশ্চয়ই!

মন দুর্বল হলে শরীর দুর্বল হয়, শরীর দুর্বল হলে মন দুর্বল হয়। কিন্তু জীবমাত্রেই মনাধীন অর্থাৎ মনের অধীন, সে মনের অধিপতি নয়। মনের অধিপতি হলেন ঈশ্বর। এখানে মন বলতে গেলে মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত—সবটাকেই বোঝায়। কেননা এগুলো অন্তঃকরণেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। এক অন্তঃকরণ চার ভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ করে। একটা অংশে মন, একটা অংশে বুদ্ধি, একটা অংশে অহংকার, একটা অংশে চিত্ত। এক অন্তঃকরণের চতুর্বিধ কাজ। মানুষ মাত্রেই কারও বুদ্ধি একটু প্রখর, কারও মনটা খুব বেশি ভাবনাপ্রবণ, কারও অহংকারটা খুব তীব্র, কারও বা চিত্ত বেশ সতেজ—তা ভাবুক চিত্ত, আড়ালে আবডালে বসে ভাবে, প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকে, আকশের দিকে তাকিয়ে থাকে, গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকে, বনপ্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকে, নদীর পারে গিয়ে বসে থাকে—এই হল ভাবুক চিত্ত। এছাড়াও বহু প্রকার চিত্ত আছে। কিছু লোককে খেটে খেতে হয়, তাদের অত ভাবনা করলে চলবে না, পোষাবে না। এগুলো সবই কিন্তু মনেরই পরিচয়। আবার আরেক প্রকার মানুষ আছে যারা সংসারে সবকিছুর মধ্যেই নির্লিপ্ত, কোনও কিছুর মধ্যেই মাথা ঘামায় না। একেবারে সবকিছুতেই নির্লিপ্ত। পছন্দমতো বিষয়ে মন দেয় এরকম মানুষ ঘরে ঘরে আছে। কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত, অর্থাৎ সংসারের কোনও ব্যাপারে মাথা গলাতে রাজি নয়—এরকম মানুষ সংসারে বিরল। তার কারণ, তাঁর বিচারে এগুলো সব বিকারী, পরিণামী ও দুঃখপ্রদ। এগুলোর পিছনে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ দুঃখ সৃষ্টির কারণ নিজেই হবে। তাহলে দেখ, এই মনটা কতখানি উন্নত! তাতে আর পাঁচজনের হয়ত অনেক অসুবিধা হয়, তারা চায় সবাইকে টেনে নিচে নামিয়ে আনতে।

সংসারে খুব কম মানুষই আছে যারা অন্যের উন্নতি দেখলে আনন্দ পায়। বেশির ভাগই অন্যের উন্নতি দেখলে কষ্ট পায় এবং ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। তখন তারা দুঃখকষ্ট পায়, আর অন্যের কষ্ট দুঃখ ক্ষতি হলে খুব খুশি হয়। তখন তারা বলে—হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে, ও যেরকম লোক বেশ ভালই হয়েছে! কিন্তু লোকের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী—এরকম লোক সংসারে খুবই কম। তার চাইতেও কম সংখ্যক মানুষ হলেন তাঁরা যাঁদের সুখ-দুঃখ কোনওটাই স্পর্শ করে না। তাঁরা জানেন এই দুটো ভ্রমমাত্র। কারণ এগুলো আগন্তুক, এগুলো বাইরের কতগুলো ঘটনা, অবস্থা, পরিবর্তন ও বিকারকে অবলম্বন করে আসে আর যায়। কাজেই দেখ যে মনটাকে নিয়ে আমরা চলি, মনের ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই! ধর্মজগতে একদল লোক, তারা এরকম ভাব নিয়ে চলে, তাতে সংসারের আর পাঁচজনের অসুবিধা হয়, তারা তা বোঝে না। তাদের নিজেরটা হলেই হয়ে গেল ব্যস্! আবার বিজ্ঞান জগতে একদল আছে তারা বিজ্ঞান নিয়ে মাতামাতি করছে, বাড়ির লোকের সঙ্গে সম্পর্কই রাখে না। তার

ফলে বাড়ির লোকেরাও ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আর দার্শনিকরা তো উদাসীন। তাদের তো কথাই নেই। কিন্তু সংসারে তো সবাই বাস করছে। দিনকয়েকের জন্য সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হয়। যাঁরা একসঙ্গে থেকেও নির্লিপ্ত এরকম মানুষ কিন্তু খুব কম—সবকিছুর মধ্যে আছে অথচ কিছুর মধ্যেই নেই। এইরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু একেবারেই কি নেই? আছে। সবই মনে গড়া, মনে ভরা।

মন হচ্ছে আত্মচৈতন্যের প্রতিফলন। অন্তঃকরণ—করণ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়, অন্তরের ইন্দ্রিয়। এটা একটা প্রকাশমাধ্যম, যার মধ্যে বিশুদ্ধ আত্মসত্তা চৈতন্যসত্তা আনন্দসত্তা প্রতিফলিত, প্রতিবিম্বিত এবং প্রকাশিত হয়। চৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ। চৈতন্যের কিন্তু কোনও পরিবর্তন হয় না, চৈতন্যের ব্যবহারিক দিকটায় আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখি, মন দিয়ে দেখি যেন পরিবর্তন হয়েছে। এগুলো হচ্ছে মনের reading। কাজেই আমরা মনের মানুষ, মনের তোয়াজ করে চলি। মনে ভাল যা লাগল তা নিয়ে মাতামাতি করি এবং খারাপ যা লাগল তা পরিহার করি। পরিহার করতে না-পারলে তখন চটাচটি রাগারাগি করি। কাজেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—এই যে ছয় রিপু, তারা হল শত্রু, তা মনেরই বিকার, এগুলো সব মনের পোশাকি কর্মী। পোশাকি কর্মী মানে মন এগুলোকে পোষে। কী দিয়ে পোষে? তার ভাবনা দিয়ে পোষে—ক্রোধের ভাবনা, কামের ভাবনা, লোভের ভাবনা, মোহের ভাবনা, মদের ভাবনা এবং মাৎসর্যের ভাবনা। সংসারী মানুষের মধ্যে এগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ে, অবশ্য কমবেশি আছে, কিন্তু তা কোনও কথা নয়, তবু আছে। ক্রোধী কখনওই ভাবতে পারে না যে, মানুষের ক্রোধ থাকবে না। মোহগ্রস্ত যে সে ভাবতে পারে না যে মানুষের মোহ থাকবে না। লোভী ভাবে সবাই লোভী। কামুক ভাবে সবাই কামুক আর মদ-মাৎসর্য যাদের আছে তারা বলে, সবাই তো আমাদেরই মতো। তাহলে এই বৃত্তিগুলি আমাদের মধ্যেই থাকে, অবস্থা বিশেষে সেগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ে বাইরে। কিন্তু এরও পশ্চাতে যে নিজের পরিচয় তা এগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকলে পাওয়া যাবে না। তাই যাঁরা এগুলোর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বা এগুলোর থেকে দূরে থাকবার জন্য বা দূর করার জন্য, নির্মূল করার জন্য চেষ্টা করেন তাঁরাই হলেন সাধক।

'এ' শুধু point out করছে জিনিসটা। এই সাধকদের মধ্যে আবার অনেক gradation আছে। কারও কাম কম কিন্তু ক্রোধ বেশি, কারও ক্রোধ কম কিন্তু কাম বেশি, কারও কাম-ক্রোধ দুটোই আছে। এরকম (কোনটা না কোনটা) বেশি-কম দেখা যায়। কিন্তু এগুলো যে শত্রু—এই বোধটা কিন্তু মানুষের খুব কম। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—এই ছয়টি ইন্দ্রিয় হচ্ছে শত্রু, আমাদের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির কারণ। এগুলোরও আবার একটা কারণ আছে। সমস্ত কারণের পশ্চাতে রয়েছে অজ্ঞান। 'যদবধি অজ্ঞান তদবধি হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ।' অজ্ঞান পুষব আবার এদিকে অমৃতত্ব আস্বাদন করব—এই অবান্তর কল্পনা নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে, যেমন পাগলের গো বধে আনন্দ, মানুষেরও এরকম আনন্দ হয়। কিন্তু যারা এগুলোকে দূর করতে চেষ্টা করে তারা জানে যে অন্তরের একটি কুবৃত্তিকে দূর

করতে কত পরিশ্রম করতে হয়, তার মূল কত গভীরে। কত জন্ম সেই জিনিসের ব্যবহার করে এসেছে সে আর সংস্কার হিসাবে তা একেবারে tape recorded হয়ে আছে ভিতরে। ঠিক সময়মতো তা বেরিয়ে আসে। কাজেই এর থেকে রেহাই পাবার জন্য যারা অতীতে চিন্তা এবং সাধনা করেছিলেন সেই সমস্ত মহামানব জ্ঞানী পুরুষ সর্বযুগে সমান নন, বর্তমানে খুবই কম। কিন্তু তাই বলে যে মানুষের মুক্তির উপায় থাকবে না তা নয়। বহুরকম মুক্তির উপায় আছে, মানুষই তা আবিষ্কার করেছে। কিন্তু সেগুলো পালন করার মতো লোকের একান্ত অভাব। পালন না-করলে তো হবে না। স্কুলে ভর্তি হওয়া আজকাল খুব মুশকিল, মা-বাবাকেও পরীক্ষা দিতে হয় সন্তানের সঙ্গে। কিন্তু স্কুলে ভর্তি হলেই তো আর লেখাপড়া শেখা যাবে না। ছাত্রকে তো পরিশ্রম করতে হবে। প্রতি বছরই নূতন করে এক একটা শ্রেণিতে যখন সে ওঠে, তখন সেই শ্রেণির যে পাঠ্যপুস্তক সেগুলোকে সব তার শেষ করতে হয়। এই ভাবে স্কুলের গণ্ডি পার হতে হবে, কলেজের গণ্ডিও পার হতে হবে। কলেজেও ঠিক একরকম ভাবেই চলতে হবে। তার পরে কলেজের গণ্ডি পার হতে হবে। তার পরে যদি University-তে সুযোগ-সুবিধা পায় সেখানে গিয়েও আবার একইরকমভাবে মনের পরিশ্রম করতে হবে। সেই গণ্ডি পেরিয়ে আসলে তখন মোটামুটি একটা standard ধরি আমরা যে, ছাত্রটি B.A., M.A. পাশ করেছে।

B.A., M.A. পাশ কবলেই যথার্থ মানুষ হওয়া যায় না। B.A., M.A. পাশ করলেও তুমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের থেকে রেহাই পাবে না। তার জন্য তোমাকে পৃথক ভাবে পরিশ্রম করতে হবে, সাধনা করতে হবে। সেই সাধনা বর্তমান যুগের মানুষের পক্ষে সত্যিই সম্ভব নয়, তারা সময়ই পায় না। সময় নষ্ট করে তারা যথেষ্ট, প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অহেতুক সময় নষ্ট করে প্রায় almost all, সবাই। অনেকেই কাজের দোহাই দিয়ে বলে, সময়ই পাই না, কত কাজ! কিন্তু যারা কৃতসংকল্প দৃঢ়সংকল্প তারা কিন্তু ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সময় manage করে ফেলে। কল্পিত কল্পনা—শুধু কল্পনা নয়। তা নিয়ে মানুষ সংসারে বাস করে। সংসার মানেই কল্পনার বাহার। যেখানে কল্পনা নেই সেখানে সংসার নেই। কল্পনা ওঠে মনে, 'মনোদয়ে জগতের উদয়, আর মনোলয়ে জগতের লয়।' যখন সে ঘুমিয়ে পড়ল তখন মন লয় হয়ে গেল, জগৎও লয় হয়ে গেল। যেই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠল মন জাগল, জগৎও জাগল। কাজেই 'চিত্তের মূলে জগৎ ভাসে, জগৎ মূলে চিত্ত হাসে।' কালকে একটা গানের মধ্যে এ কথা বলা হয়েছিল। মনের মধ্যে মনের যত ভাবনা, বৈচিত্র্য কল্পনা সবই মনের বিলাসরচনা। বিলাসরচনা অর্থাৎ মনের এটাই খেলা। মনের খেলাঘরটাই তো সংসার। এই সংসার যে কত প্রিয় মনের কাছে তা বলে বোঝানো যাবে না। 'এ' কিন্তু কোনও ব্যক্তিকে টেনে আনেনি এখনও। প্রসঙ্গ ভাল করে মন দিয়ে না-শুনলে কিন্তু follow করা very difficult।

'এ' কোনও মুখস্থ বিদ্যা বলছে না। এটা একটা science। গবেষণার পরে ভিতরে জেগে ওঠে এই science। কাজেই মনই কর্তা। 'কর্তা-করণ-কর্ম গুণের ধর্ম, আর জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান

মনের ধর্ম। কিন্তু মনাতীত অব্যক্ত নিত্য অদ্বৈতের ঘরে নাম-রূপাদি জ্ঞাতা-জ্ঞেয়াদি সর্বভাবশূন্য।' যেখানে মন নেই সেখানে এগুলো থাকতেই পারে না। কিন্তু মন ঘুমিয়ে পড়ে আবার যখন জেগে ওঠে তখন পূর্বের মতো আচরণ করে। তাহলে কী উপায়? জন্মজন্মান্তর আমাদের তা ভোগ করতে হচ্ছে। প্রতিদিন একটা করে জন্ম হয়ে যাচ্ছে আমাদের আবার মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে কী হচ্ছে? ঘুমিয়ে পড়ছে মানুষ আবার জেগে উঠছে। জেগে উঠে আবার ঠিক সেই আগের মতো, আগের দিনের মতো চক্রের মধ্যে চলছে। এ ইতিহাস, তা recorded হয়ে আছে, তা কেউ deny করতে পারবে না। কিন্তু যে বিজ্ঞানের কথা 'এ' বলছে সেই বিজ্ঞানের মধ্যে এগুলো নেই। কেন? আত্মা আর অনাত্মা, জ্ঞান আর অজ্ঞানের বিচারে অজ্ঞান যখন থাকে না, অভাব হয়ে যায় অর্থাৎ মনের অভাব হয়, তখন 'জ্ঞান অজ্ঞানের বিচারে মনোনাশ হয় সমাধির গভীরে'। সমাধির মধ্যে প্রবেশ করে গেলে মনের বীজ নষ্ট হয়ে যায়। মন আর কল্পনা করতে পারে না। কল্পিত কল্পনা তখন তার কাছে অবান্তর বা meaningless মনে হয়। সমাধিবান পুরুষই প্রজ্ঞাবান পুরুষ। অর্থাৎ সমাধিস্থিতিতে প্রজ্ঞাস্থিতি হয় এবং প্রজ্ঞাস্থিতিতে অবিদ্যা-অজ্ঞানের নিরসন হয় বা একান্ত অভাব হয়। তাই বলা হয়, প্রজ্ঞাবান পুরুষের চিত্ত বা মন শুদ্ধ হয় অথবা নাশ হয়ে যায়। যাঁর প্রজ্ঞালব্ধ হয়েছে তিনি Knowledge of Knowledge-এ established। তার আগে পর্যন্ত কিন্তু মানুষকে মনের কল্পনা নিয়ে সংসারে চলতেই হবে। তার কল্পনা কিছু মিলবে, কিছু মিলবে না। যখন মিলবে তখন ভাল এবং না-মিললেই কিন্তু সে অসন্তুষ্ট। তখনই মনের বিকার আরম্ভ হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে দেহের বিকারও আরম্ভ হয়। কী অদ্ভুত বিজ্ঞান! কত জনম যে এই ভাবে চলে যায় তার হিসাব নেই। কিন্তু সংস্কারের মধ্যে সব গাঁথা থাকে। মানে হাজার হাজার বছর আগে একটা জীবন কোথায় কী ভাবে কী করেছে তারও সংস্কার সব recorded হয়ে থাকে। জীবন তো আরম্ভ হয়েছে বহু আগে থেকে, কেননা মানুষের চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে হয়— প্রত্যেক জীবকে। তার মধ্যে ত্রিশ লক্ষ স্থাবর, বিশ লক্ষ জঙ্গম—এই হল পঞ্চাশ লক্ষ। ভূচর নয় লক্ষ, খেচর একাদশ লক্ষ, উভচর হল দশ লক্ষ এবং চার লক্ষ হল মনুষ্য। 'এ' শুধু data-টা তোমাদের সামনে বলছে, যা না-জানার জন্য মানুষ তার খুশিমতো জিনিস চিন্তা করে সংসার করতে গিয়ে আর আসল বস্তুর হদিশ পাচ্ছে না। তা জানলে কিন্তু আর এই বিকার থাকবে না। কারণ অঙ্কের ভুলটা যেই তুমি ধরে ফেললে আর অঙ্কটা ভুল হবে না। আলোটা যেই জ্বালালে অন্ধকার আর থাকতে পারে না। সেইরকম যেই সত্য বা পূর্ণ জ্ঞানটা জেগে উঠল তখন অজ্ঞান তোমার পালিয়ে গেল, যেতে বাধ্য।

মনের পশ্চাতে যে বুদ্ধি, তারও পশ্চাতে আছে পরমবোধি, অর্থাৎ তোমার আসল আমি 'নিজবোধযুক্ত জ্ঞানমূর্তি'—সে-ই হচ্ছে পরমযোগী। কেননা সে যোগধ্যানে রত। সে অন্য কোনও ধ্যানে রত থাকে না। এমনকী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তিন প্রধান দেবতা—তাঁরাও সবসময় সাধনায় রত। ব্রহ্মা মালা জপ করছেন নিরন্তর, বিষ্ণু যোগনিদ্রায় আর মহেশ্বর

ধ্যানে রত। আর অন্য সমস্ত দেবতাগুলো কিন্তু মানুষেরই মতো। তারাও ঝগড়াঝাঁটি করছে, স্বার্থ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কেউ কম যায় না। মানুষ যেরকম, তার থেকে একটুখানি উন্নত তাঁরা! কেবল তাঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য মানুষের থেকে অনেক বেশি। কাজেই মনের রাজ্যে অনন্ত বিশ্ব রচিত হয়ে আছে। আমরা একটা বিশ্বেরই সম্পূর্ণ খবর জানি না। যারা দিল্লিবাসি তারা দিল্লির বাইরে কোথায় কী হচ্ছে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, জানতেও পারছে না। খবরের কাগজে একটু পড়ে, T.V.-তে একটু দেখে। আবার নিজের বাড়ির পাশের বাড়িতে কী হচ্ছে তাও সবাই জানে না। আরও কাছে নিজের মধ্যে, তার মাথার ভিতরে কী হচ্ছে, বুকের ভিতরে কী হচ্ছে, পেটের ভিতরে কী হচ্ছে কিছুই জানে না। অথচ সবাই বলে আমি কি জানি না? আমি জানি! কী অভ্যাস আমাদের জীবনের! 'কিছু না-জেনে জানার ভান করি, আর পদে পদে মার খেয়ে মরি।' 'এ' ভয় দেখাচ্ছে না কিন্তু কাউকে, সবার সামনে প্রত্যেকের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—স্ববোধ আর স্বভাব। স্বভাবে গড়া জীবনের সবকিছু, কিন্তু স্ববোধ পশ্চাতে শুধু background-রূপে আছে। এই স্বভাবের বাইরের দিকটা প্রকৃতি, ভিতর দিকটা স্বভাব। বাইরের দিকটা ইন্দ্রিয়ের দিক, স্থূল দেহের দিক এবং বাইরে যা কিছু আমাদের প্রয়োজন শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ, আমরা তা সংগ্রহ করছি ইন্দ্রিয় দিয়ে। কিন্তু স্বভাবের গভীরে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার নেই। যেমন ঘুমের মধ্যে যখন আমরা স্বপ্ন দেখি তখন কিন্তু আমাদের এই স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি সব ঘুমিয়ে থাকে। মন নূতন করে কতগুলি কল্পিত ইন্দ্রিয় তৈরি করে নিয়ে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করে।

'এ' আজকে স্বপ্ন রাজ্য সম্বন্ধে কতগুলি কথা বলবে। সেইজন্য আগে এই কথাগুলো বলে নিতে হল, তা না-হলে কিন্তু কথা follow করা খুব মুশকিল হবে। কারণ 'এ' শাস্ত্র পড়ে কারও কাছে ব্যাখ্যা করতে আসেনি, মুখস্থ বিদ্যা পড়ে কারওর কাছে শোনাতে আসেনি। কিন্তু যা সবার সামনে বলা হচ্ছে তা কিন্তু প্রত্যেকেরই আপন পরিচয়। প্রত্যেকে যদি এই পরিচয় পায় তখন কিন্তু সে অবাক হয়ে যাবে। কীরকম? যেমন স্বপ্নের মধ্যে ভাল-মন্দ সবরকমই মানুষ দেখে। স্বপ্ন দেখে যখন জেগে ওঠে তখন মেলাতে পারে না। জাগ্রৎ অবস্থার সঙ্গে স্বপ্ন মেলে না। তখন ভাবে, ইস্ যদি স্বপ্নটাই সত্য হত তাহলে কত না ভাল হত! আর যদি স্বপ্নটা খুব ভয়ংকর হয়, দুঃখের হয় তখন ভাবে, ইস্ বাঁচা গেল বাবা! ওটা যদি সত্যি হত তাহলে তো আমি গিয়েছিলাম! এগুলো হচ্ছে day to day experience আমাদের। কিন্তু আমরা কিছুই ধরে রাখতে পারি না। কেননা আমাদের মনের সেই প্রস্তুতির অভাব। মনের প্রস্তুতির অভাবের সঙ্গে আমাদের এই যে অভিজ্ঞতাগুলো হয় জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, অনন্ত অনন্ত ভাবের সঙ্গে আমরা চলি সবাই। আমরা কিছু ধরে রাখতে পারি না, কিন্তু আমাদের অন্তরে সব record হয়ে যায় সংস্কাররূপে। পরবর্তী জীবনে তার থেকে কিছু যখন আসে তখন অস্বীকার করে বসি। তখন বলি, আমি তো এরকম কিছু করিনি! এই জীবনেই আমরা সকালবেলারটাই বিকালে মনে রাখতে পারি না, তিনদিনের আগের অথবা ছয়দিনের আগের ঘটনাও আমরা ভুলে যাই। একমাসের আগেরটা তো আরও ভুলে যাই, একবছর আগেরটা কিছুই মনে থাকে না। এরকম করতে করতে অতীত তো মুছে যায়, পর্দা পড়ে যায়।

দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত এবং সবকিছু নিয়ে যে প্রকৃতি— এই আটটা অর্থাৎ অষ্টবিধা প্রকৃতির ষোড়শ বিকার। আটটা প্রকৃতি এবং তার ষোড়শ বিকার। ষোলোটা বিকার কী? পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ—এই হল ষোলোটা বিকার। আর অষ্টবিধা প্রকৃতি কী? পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। মতান্তরে সেই জায়গায় মন, বুদ্ধি, অহংকার তিনটি বসানো হয়—এই আটটি প্রকৃতি। তাহলে মনটা হচ্ছে প্রকৃতি, বুদ্ধিটাও প্রকৃতি, অহংকারটাও প্রকৃতি—এই আটটা প্রকৃতি দিয়ে আমাদের দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি সবকিছু তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে যা-কিছু বাড়তি আবার তার বিকার অর্থাৎ তার পরিণাম-ক্ষয়-নাশ এ সবকটা প্রকৃতিরই ব্যাপার। অর্থাৎ জন্ম, কিছুকালের জন্য স্থিতি, তার পরে বৃদ্ধি, পরিণতি, তার পরে ক্ষয় এবং সর্বশেষে নাশ। প্রত্যেকটি জীবকে এই ছয়টি বিকারের মধ্যে থাকতেই হবে। এমনকী অবতারপুরুষও যদি জগতে আসেন তাঁকেও এই ছয় বিকারের অধীনে চলতেই হবে। তাঁরা রহস্যটা জানেন বলে এগুলো নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু অন্যদের মাথা ঘামাতে হয়। জন্মের পরেই যদি সে মরে যায় তাহলে পাঁচটা বিকার তাকে ভোগ করতে হয় না। জন্মের পরে তার কিছুকাল থাকতে হবে, কিছুকাল বেঁচে থাকলে তার ভিতরে একটা বৃদ্ধি হবে, ক্রমশ একটু বাড়বে, growth হবে। Growth-টা আস্তে আস্তে হয়ে এক জায়গায় পরিণাম অর্থাৎ maturity হবে। Maturity হলে তারপর আর growth হবে না, আবার তখন decay হবে, ক্রমে ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে। ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে একসময় একেবারে বিনাশ হয়ে যাবে। This is the history of life. 'এ' কিন্তু এই ইতিহাসকে গুরুত্ব দেবার জন্য সবার কাছে বলতে আসেনি। এগুলো শুধু reference হিসাবে বলা হচ্ছে, তা না-হলে 'এর' বক্তব্যকে ঠিকভাবে follow করা খুব কঠিন হবে। কারণ তা intellectual কোনও jugglery নয়, exercise নয়। It is beyond intellect and mind! তা পরমবোধির ক্ষেত্রের ব্যাপার যেখানে মন-বুদ্ধির প্রবেশের অধিকার নেই। তবে মন-বুদ্ধিকে তৈরি করে নিলে সেখানে যাওয়া যায়। সেই প্রস্তুতি কী করে হবে? ঐ B.A., M.A. পাশ করলেই কিন্তু qualified হবে না। এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হবার qualification কিন্তু অন্যরকম।

বহির্জগতের কোনও কিছুর জন্য যখন আমরা কিছু করি তখন আমাদের শিক্ষা একরকম পদ্ধতিতে হয়। কিন্তু অন্তর্জগতে, নিজের গভীরে জীবনের আসল রহস্য জানার জন্য যখন কিছু করি তখন তার জন্য শিক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা। এই দুটি কিন্তু একরকম পদ্ধতির শিক্ষা নয়। একটা হচ্ছে বাইরের—সম্পূর্ণ প্রাকৃতবিদ্যা, material science, material knowledge, objective knowledge and knowledge of diversities i.e. relative knowledge। নিশ্চয়ই এই শব্দগুলোর সঙ্গে সবার পরিচয় আছে। কিন্তু যখন অন্তরের দিকে আমরা যাব তখন আসবে spiritual knowledge বা life science. What is life? গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন! 'যা জড়কে, নির্জীবকে, নিষ্প্রাণকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে তা-ই হচ্ছে জীবন।' এই জীবনই কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা নয়। জীবনের একটা সীমা আছে, তার একটা মাত্রা আছে, তার বাইরে সে যেতে পারে না। এই সীমা হল দেহ হতে বুদ্ধি পর্যন্ত অথবা জন্ম

হতে মৃত্যু পর্যন্ত। কিন্তু বাইরে থেকে যা তার কাছে আসে তার supply রূপে, সে কিন্তু তার কারণ জানে না। আমরা বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে যা পাচ্ছি অন্তরে প্রাণের কাছ থেকে, ইন্দ্রিয় কিন্তু এই প্রাণের খবর ভাল ভাবে জানে না। প্রাণের একটা সীমা আছে, limitation আছে। তার ধর্ম হল ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্ষয়-বৃদ্ধি, গতাগতি প্রভৃতি। প্রাণ দেহ- ইন্দ্রিয়কে পরিচালনা করে যার ফলে আমরা চলতে পারি, দেহকে চালাতে পারি, ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালনা করতে পারি। কিন্তু প্রাণ যদি নিস্তেজ হয় তাহলে আর পারা যায় না। বাতে ধরলে হাত paralyzed হয়ে যায়, হাতটা আর তুলতে পারা যায় না, হাত নাড়াতেও পারা যায় না। কাজেই প্রাণের বিকার যখন হয় তখন ইন্দ্রিয় আর চলে না। সেইজন্য প্রাণের আবার চর্চা করতে হয়। যদি স্থূল দেহের maintenance-এর জন্য প্রাণের চর্চা হয় তাহলে সেটা material science-এর পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু প্রাণের ঊর্ধ্বে যে মন তা কিন্তু প্রাণ হতে ভিন্ন। প্রাণের তো চেতনা নেই। তার ভিতরে চেতনের কোনও স্পন্দনও সে বোঝে না, কিন্তু তার ক্রিয়া আছে, automatic সে চলে। রাতে ঘুমের মধ্যে মশা কামড়ালে আপনিই হাতটা গিয়ে সেখানে পড়ে। সেটা সচেতন ভাবে নয়, অজ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার ঘুমের মধ্যে গালাগালি দেয়, কবিতা পাঠ করে— সবরকমই আছে। তা কিন্তু জ্ঞাতসারে হয় না। ঘুমের মধ্যে অনেকে কথা বলে চলে, বিড়বিড় করে, lecture দেয়—এরকম দেখা যায়।

প্রাণের দিক হল দেহের পশ্চাতে। তারও পশ্চাতে মন। কাজেই মনের কাছে সে কিছু সংগ্রহ করে, তারপর তা নিয়ে এসে ইন্দ্রিয়ের কাছে পৌঁছে দেয়। তার ফলে ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালনা করতে সুবিধা হয়। এই যে প্রাণের পশ্চাতে মন আছে, এই মনের নিজস্ব কোনও চেতনা নেই। তা প্রতিবিম্বিত একটা চেতনার অংশ। তাও আবার তিন গুণের মাধ্যমে বিভক্ত হয়ে নানা ভঙ্গিমায় প্রকাশ পায়, সেইজন্য মনের অনন্ত অনন্ত বৃত্তি। 'অনন্ত শিখার মতো আশাপাশে বদ্ধ মন'—তার কত কামনা, কত desire, কত কল্পনা, কত বিলাস। কতটুকু মেটে? তার 'সাধে ভরা চিত্ত, সাধ্য বড় সীমিত।' এই মনেরও দুটো দিক। একটা দিক প্রাণের দিকে, আরেকটা দিক মনেরও পশ্চাতে বুদ্ধির দিকে। সেখান থেকে সে supply পায়, তা নিয়ে এসে মনের দিকে ঠেলে দেয় অর্থাৎ অন্তরের থেকে বাইরের দিকে, তার ফলে বাইরের কার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয়। কোথায় কী রেখেছে, চাবিটা কোথায় রেখেছে, টাকাটা কোথায় রেখেছে অনেক সময় তা মনে থাকে না। ঐ বুদ্ধি ভিতরের থেকে supply দিলে তবেই মনে পড়ে, নতুবা মনে পড়ে না। এই মনেরও পশ্চাতে যে বুদ্ধির একটা অংশ সেই বুদ্ধি কী দেয়? তা নিশ্চয় করে দেয়—এটা এই, ওটা ঐ, this much। তার জন্য বুদ্ধির আরেক নাম হচ্ছে determinating faculty, অর্থাৎ যে faculty determine করে দিতে পারে, ascertain করে দিতে পারে, অংশবিশেষকে নিশ্চয় করে দিতে পারে, কিন্তু পুরোটা পারে না। 'একদেশদর্শী বুদ্ধি'—বুদ্ধি শুধু একটা জিনিসই নিশ্চয় করতে পারে, যখন যেখানে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই নির্ণয় করতে পারবে, তার বেশি পারবে না। কাজেই বুদ্ধির সমগ্রতা

সম্বন্ধে ধারণা নেই, শুধু অংশবিশেষকে নির্ণয় করতে পারে। কাজেই বুদ্ধির উপর নির্ভর করে যারা চলে তারাও partial, তাদেরও ভ্রান্তি হয়। কিন্তু বুদ্ধি যদি বোধির সঙ্গে যুক্ত হয় বা থাকে তাহলে কোনও ভ্রান্তি থাকে না। বুদ্ধির আরেকটা দিক তাহলে আরও পশ্চাতে। খুব complicated ব্যাপার! (হাতের পাঁচটি আঙুল পরিচালনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলেন। কনিষ্ঠা অঙ্গুলি থেকে আরম্ভ করে সব কটি আঙুলের বাহির ও ভিতরের সম্পর্ক দেখিয়ে তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য ও গুরুত্বকে সুন্দর ভাবে বোঝাবার জন্য প্রতিটি আঙুলের চারটি করকে নির্দেশ করে প্রসঙ্গকে ব্যক্ত করলেন।) 'এ' এখানকার (তর্জনীর মাথাকে ইঙ্গিত করে) পরমবোধির কথা বলছে। Try to follow Me. That is unconventional, unprecedented. এ নিয়ে মাতামাতি করা বা প্রশ্ন করা অবান্তর। মনকে ক্রমশ এই ভাবে আস্তে আস্তে পরমবোধিতে কী করে নিয়ে আসা যায় 'এর' বক্তব্যের মধ্যে সেই বিজ্ঞান বলা হচ্ছে। How to reach the real nature from the apparent nature! বহির্দেশ থেকে কী করে অন্তর হতে অন্তরের অন্তঃস্থলে অন্তরতম প্রদেশে একেবারে কেন্দ্র হতে কেন্দ্রতম প্রদেশে, কেন্দ্র হতে তুরীয়তে এবং তুরীয় থেকে তুরীয়াতীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় তা-ই বলা হচ্ছে। কাজেই outer, inner, central, তার পরে হচ্ছে universal/cosmic, তার পরে super-cosmic অথবা trans-cosmic, তার পরে আর মনের গতি নেই। সেখানে যেতে হলে শ্রবণের মাধ্যমে যেতে হবে ধাপে ধাপে, অন্য ভাবে তা সম্ভব নয়।

Super-cosmic-এর par excellence হল trans-cosmic। বক্তব্যকে follow করে যেতে হবে step by step। যেমন School final পাশ না-করে কেউ degree course-এ যেতে পারবে না। Forgery করে গেলেও ধরা পড়বে এবং শাস্তি পাবে। 'প্রকৃতিরও রাজ্যে আমরা এরকম অনেক ফাঁকি দিয়ে গিয়ে সাময়িক ভাবে একটুখানি মজা লুটি, তার পরে সাজাটা পেয়ে মজাটা বুঝি।' 'এ' সেইজন্যই step by step very consciously বিজ্ঞানসম্মত ভাবে জিনিসটাকে সবার সামনে রাখার চেষ্টা করছে, কেননা 'এ' ফাঁকি দিলে তো 'একেও' ফল ভোগ করতে হবে। ভোগই যদি থাকল আমার তাহলে ভক্তি আসবে কী করে? ভোগের গতি বন্ধ না-হলে ভক্তি আসবে না। ভোগের গতি রহিত হলে ভক্তি আসবে—এই হল ভক্তির definition। ভক্তি মানে আসক্তি নয়। আমার ভাললাগাকে maintain করাটা ভক্তি নয়, তা আসক্তি। জ্ঞানের কথা তো আরও কঠিন। কিন্তু 'এ' যে ভক্তির কথা বলছে তা কিন্তু পরমজ্ঞানের পরে যেখানে নিত্যলীলা হয়ে চলে। There Self in Self, Self of Self, Self from Self, Self for Self, Self by Self, Self with Self, Self to Self, Self on Self and beyond, and beyond beyond. Self-এর জায়গায় 'এ' Consciousness-কে বসাচ্ছে। Consciousness in Consciousness, Consciousness of Consciousness, Consciousness from Consciousness, Consciousness for Consciousness, Consciousness by Consciousness, Consciousness with Consciousness, Consciousness to Consciousness, Consciousness on

Consciousness and beyond, and beyond beyond. সেই জায়গায় I-কে বসালে I in I, I of I, I from I, I for I, I by I, I with I, I to I, I on I and beyond, and beyond beyond। এই হল 'এর' আবিষ্কার। 'এ' এই formula সবার সামনে পরিষ্কার করে রাখার চেষ্টা করছে। যারা interested তারা নিশ্চয়ই বুঝতে চেষ্টা করবে। তাদের মধ্যে formula-টা প্রবেশ করবে। আর যারা class-এর backbencher-এর মতো বসে একটু শুনে যাবে তাদের মাথায় কিন্তু তা ঢুকবে না। কাজেই এখানে সাধ্যকে বাড়াবার কথা বলা হচ্ছে, সাধকে বাড়াবার কথা বলা হয়নি। Not to maintain your desire but to rise above your desire, to transcend your desire which is the cause of your birth, disease, old age and death. কে চায় জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির চক্রের মধ্যে বারবার এসে ঘুরতে? কিন্তু আমি না-চাইলেই তো আর হল না, আমাকে তো সেই রাস্তা বের করতেই হবে যে রাস্তায় গেলে আর এগুলো আমাকে স্পর্শ করবে না। অর্থাৎ আমাকে আর চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে হবে না। চুরাশি লক্ষের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষের কথা বলা হয়েছে, তার পরে আসবে reptile, fish, bird—এগারো আর নয়, এই হল কুড়ি লক্ষ। পঞ্চাশ আর কুড়ি লক্ষ মিলে সত্তর লক্ষ হয়ে গেল, দশ লক্ষ পশুজীবন হতে আরম্ভ করে বানর পর্যন্ত, তার পরেই মনুষ্যজীবন চার লক্ষ। সব মিলিয়ে চুরাশি লক্ষ। কত জনম অতিক্রম করে সবাই এখানে এসেছে তা কারও জানা নেই! আরও কত জনম অতিক্রম করতে হবে তাও কারও জানা নেই।

যে বিজ্ঞানের কথা 'এ' বলছে তাতে এই দুটোকেই মুছে দিয়ে যাবে। All positive and negative nature will be washed out, will be deleted অর্থাৎ নাশ বা লীন হয়ে যাবে। তার কারণ জ্ঞান-অজ্ঞানের বিবেক বিচারে মনোনাশ হয়ে যায়। তার ফলে সমাধির গভীরে সমত্বতে অধিষ্ঠিত হবে। তখন শুদ্ধবোধস্বরূপে নিজেকে আবিষ্কার করবে যে ভাবে তা হল, you are Consciousness Absolute, you are Bliss Absolute, you are *Saccidananda Swarupa*। 'নাহি মাতা নাহি পিতা নাহি পুত্র নাহি সুতা (দুহিতা) নাহি বন্ধু নাহি বান্ধব।' তাহলে কে? সব এগুলো স্বপ্ন। কী অদ্ভুত! এটা জানা হয়ে যায় যখন যে এগুলো সব স্বপ্ন, তখন কী অনুভূতি হয় 'এ' সেই প্রসঙ্গে এবার বলবে। কেন স্বপ্ন? Why it is a dream? The universal creation is a dream. অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপের বক্ষে, ঈশ্বরের বক্ষে এটা একটা dream। ঈশ্বর কিন্তু এতে লিপ্ত নন, "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ"। ভগবৎ বাণী হল—প্রকৃতি এগুলো করছে, আমি করছি না কিছু। কিন্তু আমরা 'আমি, আমি' করে বলছি। তাহলে উপায়টা কী এখন? আমাদের ভ্রমকে দূর করতে হবে। যতবার 'আমি আমার' ব্যবহার করব ততবারই সংস্কার গেঁথে যাবে। তাহলে উপায়? নিশ্চয়ই উপায় আছে।

দেহের রোগের জন্য চিকিৎসক আছে, নানারকম specialist আছে। কিন্তু ভবব্যাধির চিকিৎসক কোথায়? World-fever-এর চিকিৎসক কোথায়? দেহের fever-এর না-হয় চিকিৎসা পেলাম। কতরকমের জ্বর আছে! তার জন্য চিকিৎসাও পৃথক পৃথক ভাবে হয়। আজকাল নানারকম ওষুধ বেরিয়েছে, tablet বেরিয়েছে, *injection* বেরিয়েছে—অনেক

কিছু। কিন্তু ভবরোগের ওষুধ কোথায়? অর্থাৎ যে রোগে আমরা বৈচিত্র্য দেখছি এক-এর মধ্যে, সেই রোগ সারবে কী করে? অর্থাৎ যেখানে বৈচিত্র্য থাকবে না, শুধু থাকবে একবোধ সমবোধ আপনবোধ। সেই এক-এর দৃষ্টি, সেই চোখ আমাদের কবে খুলবে যে চোখ খুলে গেলে আমরা সমস্ত রহস্যটা বুঝতে পারব? মনে কর নামকরা magician Jr. P. C. Sorcar এসে খেলা দেখাচ্ছে। Hall ভর্তি লোক। কতরকমের খেলা সে দেখাচ্ছে। সবাই একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছে খেলা দেখতে দেখতে। Really magic is a game which gives joy to others, প্রত্যেককে আনন্দ দেয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিভ্রান্তও করে দেয়। Because magic is not real, it is a game. Unreal-কে real দেখাচ্ছে, impossible-কে possible করে দেখাচ্ছে, that is magic। Not the audience, but only the magician knows the tricks. কিন্তু audience-এর মধ্যে যদি আরেকজন magician থাকে সে খেলা দেখবে আর হাসবে। কাজেই এই জগৎরূপ magic দেখাচ্ছেন জগৎ কর্তা ঈশ্বর। সবার হৃদয়ে বসে magic করছেন তিনি। আরেকজন এইরকম magician অর্থাৎ a realizer knows the tricks, He is not deluded। তিনি বিভ্রান্ত হন না এবং মোহিত হন না। তিনি কিন্তু জানেন যে, এগুলো সব খেলা, একটাও সত্য নয়।

এই Junior P. C. Sorcar-এর বাবা Senior P. C. Sorcar Europe/America-তে বহুবার গিয়েছিলেন খেলা দেখাতে। তিনি যখনই খেলা দেখাতেন হইচই পড়ে যেত। আর magic-এর ব্যাপারে Japan কিন্তু অনেক এগিয়ে। বড় বড় magician জাপানে প্রচুর আছে, কিন্তু P. C. Sorcar-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা কখনওই পারেনি। তারা যত খেলা দেখাত, P. C. Sorcar তার উপরে চলে যেতেন। P. C. Sorcar 1961/1962-তে একবার খেলা দেখাবার জন্য America-তে গিয়েছিলেন। তার খেলা দেখবার জন্য Hall ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এই খেলার আগে প্রচুর advertisement দেওয়া হয়েছিল। চারদিকে poster, banner, hoarding, placard, নানারকম ছবি বেরিয়েছিল। যারা ticket কেটে ঢুকতে পারেনি তাদের জন্য আবার পরে খেলা দেখাবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। যাই হোক, 'এ' একটা খেলার কথা বলবে তোমাদের। খেলাটা হচ্ছে—সামনের সারিতে নামকরা সমস্ত V.I.P., V.V.I.P.-রা বসেছিলেন। হঠাৎ একজনের দিকে P. C. Sorcar-এর নজর পড়াতে তিনি বললেন, please come here। তারপর তাকে বললেন, give me a dollar। তিনি পকেটে হাত দিয়ে একটা dollar বের করে দিলেন P. C. Sorcar-কে। Dollar-টা নিয়ে তিনি খেলা দেখাচ্ছিলেন। সবাই একেবারে one pointed attention দিয়ে magic দেখছিল। Magic দেখাতে দেখাতে দুটো dollar, তিনটে dollar, চারটেdollar, পাঁচটা dollar, ছয়টা dollar—এভাবে dollar-এ ভর্তি হয়ে গেল। What is the pulsation of the hall? বড় বড় সব scientist, philosopher, সব professor, educationist অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা ভাবলেন, এ তো অভিনব ব্যাপার।

P. C. Sorcar audience -এর উদ্দেশে বললেন, you just come here and test the dollar। এখন এখানেই 'এ' সেই প্রসঙ্গ শেষ করবে কেননা 'এর' বক্তব্য অন্যরকম। এই প্রসঙ্গে পরে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যাবে। The entire universe is a dream—এটা প্রমাণ করার জন্য এই উদাহরণ দেওয়া হল। P. C. Sorcar-এর team-এর মধ্যে অনেক members থাকত। তাদের নিয়ে তিনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খেলা দেখাতে যেতেন। বিরাট team, কাজেই বড় hotel ভাড়া নিতে হত। World-এর সব জায়গার লোক আছে তার team-এর মধ্যে। কী disciplined তারা! কী personality P.C. Sorcar-এর অথচ একটা শিশুর মতো তাঁর ব্যবহার!

Dollar-এর খেলাটা দেখাবার পরেরদিন সকালবেলা hotel-এ তিনি breakfast করছিলেন, হঠাৎ খবর এল যে নিচে কয়েকজন professor তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি ভাবলেন তাঁরা হয়ত কোনও programme-এর জন্য এসেছেন। তিনি তাদের breakfast table-এ নিয়ে আসতে বললেন এবং বেয়ারাকে তাঁদের জন্য breakfast তৈরি করতে বললেন। তাঁরা আসতে তিনি তাঁদের breakfast নিতে অনুরোধ করলেন। তারা বলল, আমরা breakfast করে এসেছি। তারপর তিনি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করাতে তারা breakfast করল। তারা চারটে থলে ভর্তি dollar নিয়ে এসেছেন। তারা P. C Sorcar-কে বললেন যে, professor Sorcar আপনার কাছে এসেছি আমরা। যে খেলা আপনি কাল দেখিয়েছিলেন সেই খেলার সত্ত্বটা আমাদের কাছে বিক্রি করুন। আপনি যত dollar চান তত dollar আপনাকে দিতে আমরা প্রস্তুত। এই কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন P. C. Sorcar, কিছুই বললেন না, চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, take it from here. I am a professional magician, not an amateur one. আমি ভারতবাসী, তার পরে আবার বাঙালি। বাংলার গর্ব আমার মধ্যে আছে। বিরাট বিরাট মনীষী বাংলাতেই জন্মেছেন। আমি তাঁদের কথা যখন ভাবি তখন মনে হয়, তাঁদের তুলনায় আমি অতি নগণ্য, insignificant আমার life। তাঁরা original কত জিনিস জগৎকে দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু আমি কিছুই দিতে পারিনি। তখন তারা বলল, ঐ সমস্ত কিছু আমরা বুঝি না। আমাদের ভোলাতে পারবেন না। আপনি বলুন কত dollar আপনার চাই? আমরা অনেক dollar নিয়ে এসেছি, আপনি বললে এখনই আমরা phone করে আপনাকে আরও dollar এনে দিতে পারি। আমাদের এই বিদ্যার copyright দিতে হবে, বিনিময়ে আপনার যত dollar চাই তত dollar দেব। তখন তিনি বললেন যে, আমার ধারণা ছিল যে America একটি সভ্যদেশ, শিক্ষিত দেশ এবং এখানে সবাই শিক্ষিত, well educated। কিন্তু তোমাদের কথা শুনে আমি disheartened হয়ে যাচ্ছি। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমাদের ব্যবহার দেখে! তোমরা আমাকে ঘুষ দিতে চাইছ? তারা বলল, না, আমরা টাকা দিয়ে বিদ্যাটা কিনে নিতে চাইছি। তখন তিনি বললেন, তার পরে? আমি ভিখারি হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব? ভারতবর্ষের মতো বিরাট ঐতিহ্যপূর্ণ দেশ, যেখানে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা চরম

পর্যায়ে হয়েছে, ব্রহ্মবিদ্যা আত্মবিদ্যা যে দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে সেই দেশের মানুষ আমি। আমি সেই বিদ্যার অধিকারী হতে পারিনি। আমি যাদুখেলা শিখেছি, সেই খেলা দেখিয়ে আমি সারা দেশদেশান্তর ঘুরে বেদের মতো পয়সা রোজগার করছি।

তারা বলল, তোমার ঐ কথায় আমরা ভুলছি না, বিদ্যার copyright আমাদের দিতে হবে! এই কথা শুনে তিনি হেসে ফেললেন। তিনি তাদের বললেন, দেখ আমি একজন magician, একটা খেলা দেখিয়েছি! কিন্তু এত কথা বলা সত্ত্বেও কিছুতেই তারা ছাড়বে না। So foolish we are! আমাদের চারপাশে এরকম magician-রা যথেষ্ট ভেল্কি দেখাচ্ছে। ইদানিং economical ভেল্কি দেখাচ্ছে, অর্থ কী করে রোজগার করা যায়—দুই নম্বর, তিন নম্বর, চার নম্বর, পাঁচ নম্বর, ছয় নম্বর, আট নম্বর ইত্যাদি। এসব শুনে 'এ'তো অবাক হয়ে গিয়েছিল। অবতারের উপরে মহা অবতার এসে গিয়েছে জগতে। মানে black money কী ভাবে বাড়ানো যায় তা তারা জানে—they know the tactics, the tricks। এরা সারা জগতে তোলপাড় কাণ্ড করে দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিকও যদি তুমি হও তবুও তুমি একজন ভিখারি। অজ্ঞান তোমাকে ছাড়বে না। ঐ টাকা দিয়ে অজ্ঞানকে তুমি দূর করতে পারবে না, শুধু আরাম কিনতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে এমন ব্যারাম আসবে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে, মানে কোটির মধ্যে থেকে চারজনকে বেছে আনলেও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

এবার ঘটনার শেষের অংশটা তোমাদের বলব। শেষে কিন্তু ঐ একটা dollar যার কাছ থেকে তিনি নিয়েছিলেন তাকে বললেন, তোমার dollar তোমাকে দিয়েছি। তিনি বললেন, you have not given me! আমি তো আশা করেছিলাম তুমি আমার একটা dollar-এর থেকে এতগুলো dollar বানালে, আমাকে আরও কিছু dollar দেবে। তুমি আমাকে যে একেবারে হতাশ করে দিলে। তখন তিনি বললেন, কেন? আমি টাকা রোজগার করতে এসেছি। আমার খেলা দেখার জন্য টিকিট বিক্রি হয়েছে। আমি সেই টাকা নিয়ে ভারতবর্ষে চলে যাব, আর তুমি আমার কাছে টাকা চাইছ? অবশ্য আমার কাছে যদি প্রার্থী হয়ে এসে কেউ কিছু চায় আমি আমার সাধ্যমতো তাকে কিছু দিই। তুমি যা চাইছ আমি তোমাকে তা দিয়েছি। তখনও সেই ভদ্রলোক বললেন, না তুমি তো দাওনি! তখন P. C. Sorcar বললেন, আচ্ছা পকেটে হাত দিয়ে দেখ তো! তিনি পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন dollar পকেটে ঠিক জায়গা মতোই আছে। দুজনের মধ্যে এত distance থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে যে dollar-টা পকেটে এল তা ভেবে দর্শকরা সবাই অবাক হয়ে গেল। সেই ভদ্রলোক বললেন, আমার কাছে একটাই dollar ছিল সেটা দিয়েছিলাম। তুমি তো সেই dollar-টা দিলে, কিন্তু তার সঙ্গে আরও কিছু আশা করেছিলাম। P. C. Sorcar বললেন, সত্যিই তুমি চাও? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ। এই ভাবে কথা দিয়ে তাকে কিছুটা ভোলাচ্ছিলেন। তারপর তাকে বললেন, আচ্ছা তোমার পকেটে যা আছে তা হাত দিয়ে দেখ। তিনি হাত দিয়ে দেখলেন সবকটা পকেট dollar-এ ভর্তি। Apparent nature-এ it appears to be real—this is a dream, a figment!

'এ' কোন dream-এর কথায় আসছে এবার তা বোঝ—this is a dream। 'এ' আজকের বক্তব্য শেষ করবে এমন এক জায়গায় যা শুনে তোমরা সত্যিই অবাক হয়ে যাবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই ছুটি কাটাতে ভাল ভাল জায়গাতে যায় বেড়াতে। বন্ধুবান্ধব, টাকাপয়সা সাথে নিয়ে বেড়াতে যায়। এরকম একটি team বেশ ভাল টাকাপয়সা সংগ্রহ করে বেড়াতে গিয়েছিল। প্রত্যেকেই ভাল চাকরি করে, young man. Juvenile spirit তো অদ্ভুত, তারা কারওকেই পরোয়া করে না। সারা জগতে সব জায়গাতেই তাই। তারা সকলে মিলে কাশ্মীরে গেল। কাশ্মীর খুব সুন্দর জায়গা, enjoyable। সেখানে গিয়ে তারা প্রাকৃতিক শোভা enjoy করছে। রাতে হোটেলে ভাল-মন্দ খাওয়ার পর তারা drink করে শুয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে একজন (suppose 'X' তার নাম) ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে।

শুধু এক জনম নয়, 'এর' অতীত অতীত জনমগুলো 'এর' সামনে calender-এর মতো clear। এখন যা আছে তা তো দেখা হচ্ছেই। মানুষের দুটো নয়ন আছে, আবার ঈশ্বরের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শিব ও তাঁর শক্তি—এঁদের তিনটি নয়ন। কিন্তু যাঁরা পরমজ্ঞানী তাঁদের "সর্বতো পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।" তাঁদের সর্বত্রই হস্তপদ, সর্বত্রই তাঁদের মস্তক ও চোখ। "সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্"—সর্ব ইন্দ্রিয় থাকা সত্ত্বেও সর্ব ইন্দ্রিয় বিবর্জিত।

'এর' স্থূল দেহের বাঁ চোখ দৃষ্টিহীন হয়েছে, ডান চোখ ক্ষীণ হয়ে চলাফেরা করার মতো অবস্থায় আছে। 'এ' দেখছে কোন চোখ দিয়ে? স্ববোধের চোখ দিয়ে। যে চোখ ইন্দ্রিয়ের অধীনে নয়, মনের অধীনেও নয়। অর্থাৎ 'বোধনয়নে হেরি আমি প্রতিক্ষণে অন্তরে বাহিরে উর্ধ্ব অধঃ মধ্য সামনে পশ্চাতে ডাইনে বামে পূর্ব পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণে ঈশান অগ্নি বায়ু নৈঋত কোণে। সর্বত্র প্রতি মুহূর্তে যা-কিছু ঘটে সবই আমি।' This is the all-pervading real existence I-Absolute। এই I হল—এক অর্থে চোখ (eye) এবং আরেক অর্থে হল আমি বা আত্মা। যাই হোক, যে ঘটনাটা বলা হচ্ছিল, সে স্বপ্নের মধ্যে দেখল যে, রাস্তায় চলতে চলতে তার পকেটমার হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে ফিরে এসে সে দেখল দরজায় তালা দেওয়া, তার স্ত্রী বাড়িতে নেই, বাচ্চারাও অন্য কোথাও বেড়াতে গিয়েছে। বাড়ির অন্যান্য লোকজনকে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে তারা কেউ কিছু বলতে পারল না। লোকটি মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। সে পথে পথে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে লাগল। তার পকেটে একটি পয়সাও ছিল না। পথ চলতে চলতে লোকটি রাস্তাই হারিয়ে ফেলল। এভাবে দু'/তিন দিন অভুক্ত অবস্থায় থেকে লোকটি শ্রান্তক্লান্ত হয়ে পড়ল। ঘুরতে ঘুরতে সে বহুদূরে এক শহরতলীতে এসে পৌঁছালো। রাস্তায় হঠাৎ তার সঙ্গে এক college friend-এর দেখা হয়। বহুদিন পর দুই বন্ধুর দেখা হওয়াতে পরস্পর পরস্পরের খোঁজখবর নিল। বন্ধুটি তার অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করল—আরে এ কী চেহারা করেছিস! তোর কী হয়েছে? লোকটি বলল—আর বলিস না! অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে, সে অনেক ব্যাপার! তার কথা শুনে বন্ধুটি বলল—আচ্ছা সেসব না-হয় পরে বলবি, এখন তুই আমার সঙ্গে চল। পথে চলতে

চলতে বন্ধুকে আরও বলল যে, সে চার/পাঁচ দিন কিছুই খায়নি। এই কথা শুনে বন্ধু বলল—সে কী রে! লোকটি সুখী প্রকৃতির ছিল এবং ভাল-মন্দ খেতে ভালবাসত। বাড়ি পৌঁছে বন্ধুটি তার স্ত্রীর কাছে লোকটির পরিচয় দিয়ে বলল—এ আমার পুরানো বন্ধু। আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়াশুনা করেছি। ষোলো বছর পর ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তারপর সে তার বন্ধুকে বলল—তুই আগে বাথরুমে গিয়ে স্নান সেরে জামাকাপড় বদলে আয়। তারপর স্ত্রীকে বলল—তাড়াতাড়ি ওকে খাবার দাও। খাওয়াদাওয়া শেষ হতে বন্ধুটি তাকে বলল—তুই শ্রান্তক্লান্ত, আগে একটু বিশ্রাম করে নে, পরে না-হয় তোর সঙ্গে কথা হবে। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের মধ্যে লোকটি আরেকটি স্বপ্ন দেখল। সে স্বপ্নের মধ্যে দেখল যে, সে পরীক্ষার হলে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। সব প্রশ্নের উত্তর সে ঠিকমতো দিতে পারছে না, কিছু পারছে, কিছু পারছে না। তখন সে নিরুপায় হয়ে পাশের ছেলেদের প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করে বলছে—ভাই এটা একটু বলে দে না! এই ভাবে পাশের ছেলেদের বিরক্ত করার জন্য invigilator তাকে তিন বার ধমক দেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পাশের কয়েকটি ছেলের থেকে চোথা (note) কোনও রকমে জোগাড় করে লিখতে শুরু করে। এদিকে পরীক্ষার সময় শেষ হয়ে যাওয়াতে invigilator তার থেকে উত্তরপত্র কেড়ে নিতে আসেন। সে তো কিছুতেই খাতা দিতে রাজি ছিল না, কারণ তখনও তার লেখা শেষ হয়নি। দু'পক্ষের মধ্যে খাতা টানাটানি হওয়াতে খাতা ছিঁড়ে যায়। খাতা ছিঁড়ে যাওয়াতে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে, কারণ ছেঁড়া খাতা তো invigilator জমা নেবেন না। এর মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র খাতা জমা দিয়ে চলে গিয়েছে। একটি ছেলে তখনও পরীক্ষার হলে উপস্থিত ছিল। সে এই ছেলেটির কাছে এসে তাকে বলল—ভাই কী হয়েছে তোর? আমিও খুব খারাপ পরীক্ষা দিয়েছি। বাড়িতে গিয়ে আজ আর কাউকে মুখ দেখাতে পারব না। চল তুই আর আমি অন্য কোথাও চলে যাই। আমার কাছে কিছু টাকাপয়সা আছে, তাতে বেশ ক'দিন চলে যাবে। তারা দু'জনে পরামর্শ করে বেরিয়ে পড়ল। তারপর তারা একটি হোটেলে ওঠে। সেখানে তারা খাওয়াদাওয়া সেরে মনের দুঃখে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমের মধ্যে লোকটি আরেকটি স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে সে দেখল যে, চাকরির জন্য সে এক জায়গায় interview দিতে গিয়েছে। Interview হয়ে যাওয়ার পরে সে চাকরিটা পেয়ে গেল। Interview দিতে অনেক ভাল ভাল candidate এসেছিল। সে ভেবে অবাক হয়ে গেল যে, এত যোগ্য candidate-দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে কী করে চাকরিটা পেয়ে গেল! চাকরির সুবাদে সে থাকবার জন্য একটা flat-ও পেল। সেই office-এর officer-এর এই নূতন ছেলেটির উপর নজর পড়ল। এই ছেলেটির সঙ্গে তিনি আলাপ করেন এবং কিছুদিন পরে ছেলেটিকে তার বাড়িতে dinner-এর জন্য invite করেন। ছেলেটি প্রথমে কিছুতেই রাজি ছিল না, কিন্তু officer-এর অনুরোধে তার বাড়িতে যেতে বাধ্য হয়। Officer তাকে আরও বলল যে, আমি young man-দের বড় ভালবাসি, কাজেই তোমাকে কিন্তু আসতেই হবে। লোকটি তার boss-এর বাড়িতে গেলে তার একমাত্র

কন্যার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ক্রমে তাদের মধ্যে ভাব হয় এবং দু'জনের বিয়েও হয়ে যায়। একদিন তারা দু'জনে cinema দেখতে যায় এবং ফেরার সময় হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়িতে ফিরে আসে।

তারা বাড়িতে ফিরে এসে শুয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়তে লোকটি আরেকটি স্বপ্ন দেখে। লোকটি স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেল যে, কতগুলি লোক এসে তাদের বাড়ির সামনে হামলা করছে। সে সেখানে উপস্থিত হল এবং তাদের মোকাবিলা করতে গেল। এই বাদবিতণ্ডার মধ্যে পড়ে লোকগুলি তাকে বেদম প্রহার করে এবং তার ফলে সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

এই অজ্ঞান অবস্থায় লোকটি আরেকটি স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মধ্যে সে দেখে যে, তাকে hospitalize করা হয়েছে। সে গুরুতর ভাবে আহত হবার ফলে সেখানে ডাক্তাররা তার একটি পা ও একটি হাত কেটে বাদ দেয়। এই ভাবে তার চিকিৎসা চলতে লাগল। হাত-পা হারানোর ফলে লোকটি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে। Hospital থেকে discharge হবার পড়ে সে উদ্ভ্রান্তের মতো পথ চলতে লাগল। এমন সময় এক ধর্মপরায়ণ সহৃদয় ব্যক্তির তার উপর নজর পড়ে। লোকটির করুণ অবস্থা দেখে সহানুভূতি জানিয়ে তাকে সে বলে যে, তোমার তো সত্যিই খুব কষ্ট! একটা হাত ও পা নেই! কয়েক বছর আগে আমার একমাত্র পড়ুয়া ছেলে অল্প বয়সে kidnapped হয়ে যায়। আমি এখন নিঃসন্তান। আমার প্রচুর টাকাপয়সা আছে। তুমি চল আমার বাড়িতে গিয়ে থাকবে। সেখানে তোমার কোনওরকম অসুবিধা হবে না।

সেই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে লোকটি আনন্দেই আছে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তার খুব যত্ন নেয় যাতে তার কোনওরকম অসুবিধা না-হয়। একদিন খাওয়াদাওয়া সেরে সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে সে আরেকটি স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মধ্যে দেখে যে, সে খুব গরিব হয়ে গিয়েছে। এমনই দুরবস্থা যে অন্নই জোটে না। একদিন সে দেখতে পেল কোনও এক বাড়িতে উৎসব হচ্ছে। খুব ধুমধাম করে উৎসব হচ্ছে, চারদিকে আলোর রোশনাই, বাজনা বাজছে, বহু লোকজনের সমাগম হচ্ছে। এত কিছু দেখে লোকটির মনের মধ্যে নেমন্তন্ন খাওয়ার সাধ জাগে। মনে মনে সে ভাবল, বহুদিন ভালমন্দ খাবার কিছুই তো খাই না, একবার এখানে গিয়েই দেখি! উৎসববাড়িতে লোকটি যেতে সেখানকার লোকেরা তাকে অপরিচিত মনে করে তার পরিচয় জানতে চায়। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল যে, এই লোকটি কে? এ কোথা থেকে এসেছে? তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে সে একজনের নাম উল্লেখ করে নিজের পরিচয় দেয়। তারা পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বলল—আচ্ছা, ঠিক আছে! তারপর লোকটি নেমন্তন্ন খেয়ে সেই উৎসববাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে।

রাস্তায় চলতে চলতে লোকটির খুব ঘুম পেয়ে যায় এবং শ্রান্তক্লান্ত অবস্থায় উপায়ান্তর না-পেয়ে সামনের একটি গাছতলায় বসে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সময় সে ঘুমের মধ্যে আরেকটি স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মধ্যে সে দেখে যে, সে এক রাস্তা দিয়ে চলেছে। রাস্তায় কিছু

লোক যেন কাউকে খুঁজছে। এই লোকগুলি যখন তাকে সামনে দেখতে পায় তখন তারা চিৎকার করে বলে ওঠে—আরে, এই লোকটিকে দিয়েই কাজ হবে! ওকে ধর! লোকটি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি, সে তাদের আচরণে অবাক হয়ে যায়। লোকগুলি এই লোকটিকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকে—এ সুলক্ষণ! একেই আমরা রাজা করব। এই বলতে বলতে তারা লোকটিকে তাদের রাজ্যে ধরে নিয়ে যায়। এই লোকগুলি আসলে এক বন্য জাতি। এদের leader বা রাজা গত হয়েছে। তাদের একজন সুলক্ষণ ব্যক্তির প্রয়োজন যে তাদের রাজা হতে পারে। লোকটি বাধ্য হয়ে তাদের রাজা হয় এবং বেশ কিছুদিন নিশ্চিন্তে সেখানে কাটিয়ে দেয়।

লোকটি অর্থাৎ রাজা একদিন ঘুমের মধ্যে আরেকটি স্বপ্ন দেখে। রাজাদের সাধারণত মৃগয়া করার অভ্যাস থাকে। লোকটি স্বপ্নের মধ্যে দেখল যে, সে মৃগয়া করতে গিয়েছে। বনের মধ্যে মৃগয়া করতে গিয়ে সে রাস্তা হারিয়ে ফেলে। পাঁচ/ছয় দিন অভুক্ত অবস্থায় কাটিয়ে সে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার নড়াচড়া করার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে কথা বলার শক্তিও ছিল না। গাছের তলায় লোকটি আশ্রয় নেয়। এমন সময় এক সাধু তাকে দেখতে পেয়ে মনে মনে ভাবলেন, একে দিয়ে কাজ হবে! অর্থাৎ লোকটিকে তাঁর শিষ্য বানাবার কথা ভাবলেন। সাধু লোকটির কাছে এসে বললেন—তুই তো অনেক কষ্ট পেয়েছিস! তোর খিদে পেয়েছে? তারপর তাঁর ঝোলা থেকে ফল মিষ্টি বার করে লোকটিকে দিয়ে বললেন—এগুলি তুই খেয়ে নে। খাওয়াদাওয়া সেরে স্নান করে আয়। তিনি লোকটিকে কাছেই একটি ঝরনার জলে স্নান করতে আদেশ দিলেন। লোকটি স্নান সেরে আসতে তাকে তিনি বললেন—আজ আমি তোকে মন্ত্র দীক্ষা দেব। এই মন্ত্র নিয়ে তুই এখানে বসে সাধন কর, যথাসময়ে আমি তোর কাছে এসে উপস্থিত হব। লোকটি নিবিষ্ট চিত্তে জপ করতে থাকে, কিন্তু সেই সাধু আর আসেন না। একদিন লোকটি মনে মনে ভাবল, আমি সাধনভজন করি! অনেকেই তো আমাকে ফল মিষ্টি দিয়ে যায়! রোজগারটা তাহলে মন্দ নয়, ভালই হয় দেখছি! তাহলে আমি নিশ্চয়ই সাধু হয়ে গিয়েছি! এখন থেকে তাহলে আমি দীক্ষা দেব। কিছুদিন পরে লোকটি দীক্ষা দিতে আরম্ভ করে এবং প্রচুর ভক্তশিষ্য হয় তার।

একদিন দীক্ষা দেবার আগে লোকটি ঘুমিয়ে পড়ে। সে স্বপ্নের মধ্যে দেখে যে, বহু লোক সমাগম হয়েছে। আর গুরু সেজে সে ভগবৎ প্রসঙ্গ করছে। এমন সময় সেখানে এক পাগল এসে উপস্থিত হয়। পাগল লোকটিকে উদ্দেশ করে বলল—তুমি নিজেই ভগবানকে দেখনি আর অন্যকে ভগবানকে দেখাবার কথা বলছ! লোকটির শিষ্যরা পাগলের উক্তিতে বিরক্ত হয়। তারা পাগলকে চলে যেতে বলে। পাগল যাবার আগে লোকটিকে আরও বলল—গুরু সেজে বসেছ! কিছুই তো শিখলে না, জানলে না! পরে তুমি ঠেলা বুঝবে! গুরু সেজেছ, গুরু সাজা পাবে! এই কথা বলে পাগল চলে যায়। পাগলের কথা শুনে লোকটি মনে মনে ভাবল, পাগল তো সত্যি কথাই বলেছে। আমি তো এখনও ভগবানকে পাইনি, কিন্তু এই লোকগুলিকে যে মিথ্যা কথা বলছি তার শাস্তি তো আমায় একদিন পেতে হবে, তখন আমি কী করব!

নানাকথা চিন্তা করতে করতে সাধুবেশী লোকটি একটি গাছের নিচে আশ্রয় নেয়। লোকটি ঘুমিয়ে পড়তে আরেকটি স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্নের মধ্যে দেখে যে, এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আকাশপথে চলেছেন। তাঁকে দেখে লোকটি ভাবল, এঁর পিছনে পিছনে গেলে জানতে পারব তিনি কোথায় থাকেন! তারপর সুযোগ বুঝে তাঁর কাছে দীক্ষাও নিয়ে নেব। এই সব ভাবছে আর জ্যোতির্ময় পুরুষকে সে অনুসরণ করে চলেছে। চলতে চলতে লোকটি একটি খাদের মধ্যে পড়ে যায়। তখন সে মনে মনে ভাবল, এ কী আমি তো খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছি, এখন কী করে উঠব! কোনওরকমে লোকটি একটি লতা ধরে উঠতে চেষ্টা করে। যখন সে কিছুটা ওঠে তখন তার খেয়াল হয় যে তা লতা নয়, একটি সাপ। তখন সে সাপকে ছেড়ে আরেক পাশে যাবার চেষ্টা করতে দেখে যে কিছু দূরে একটি বাঘ তাকে খাবার জন্য অপেক্ষা করছে। তখন লোকটি মনে মনে ভাবল যে, যদি খাদের ওপাড়ে চলে যাওয়া যায় তাহলে প্রাণটা বাঁচতে পারে! একটি গাছের ডাল ধরে ঝুলে ওপাড়ে যাবার চেষ্টা করছে লোকটি, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। যে গাছের ডাল ধরে লোকটি ঝুলছিল সেই গাছের গুঁড়িতে দু'টি ইঁদুর মাটি খুঁড়ছিল এমন ভাবে যে, যে-কোনও সময়ে গাছটি মাটিতে পড়ে যাবে। সেই সময় লোকটি দেখে যে গাছটিতে থোকা থোকা আঙুর ঝুলছে। তখন লোকটি ভাবল, জীবনটা তো এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু এখন তো খিদে পেয়েছে! তখন লোকটি আঙুরগুলি খেতে আরম্ভ করে। আঙুরগুলি খুব টক ছিল। এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে লোকটির হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতে সে দেখল যে, একটা খাটের উপর সে শুয়ে আছে। আমাদের প্রত্যেকের জীবন ঠিক তাই। দশটা স্বপ্ন অর্থাৎ একটির অন্তর্ভুক্ত আরেকটি এইরূপ দশটি স্বপ্ন সে দেখেছে। এর মধ্যে কোন স্বপ্নটা সত্য? আমাদের প্রত্যেকের জীবনই স্বপ্নে গড়া ও ভরা। স্বপ্নই হল স্বপ্নের কারণ-কার্য। কারণ-কার্য আবার অজ্ঞানজাত। সমগ্র জগৎসংসারই আত্মার বক্ষে তার স্বপ্নবিলাস, বৈচিত্র্যময় অনাত্মার খেলা। স্বভাব ও প্রকৃতির মাধ্যমে এই স্বপ্নবিলাস সাধিত হয়। এ সবই আত্মা অতিরিক্ত কল্পনার সমষ্টি, মিথ্যা মায়ার খেলা। সর্বব্যাপী অখণ্ড ভূমা এক সত্তাই সত্য, আর সবই তার প্রতিভাসমাত্র। তাই বলা হয়, ইন্দ্রজালবৎ/ঘটবৎ জীবজগৎ চিন্মাত্র সদাশিব আমি/আত্মা আমি পাকা আমি।

১৯৮৯-এ দিল্লি থেকে ঔরঙ্গাবাদ-পুনা হয়ে আবার বম্বেতে এসে বম্বে থেকে কলকাতায় ফিরে আসি। সাথে অনেকে ছিল। বড় একটা team নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। Trombay-তে Bhaba Centre-এ একটা programme arrange করা হয়েছিল। সেখানে সব scientist-রা বলেছিল যে, আপনি আপনার realization-কে scientific terms দিয়ে আমাদের সামনে বলুন, religious terms দিয়ে বলবেন না, তাহলে আমরা কিছু বুঝব না। সেখানে ভিতর থেকে এমন কতগুলো কথা এসেছিল যা শুনে সকলেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা time দিয়েছিল দেড় ঘন্টা। তিন ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে, hall ভর্তি লোক, ওরা যাবে cycling করে অনেক দূর। তারা দূরের থেকে এসেছে, daily passenger। রাত হয়ে গিয়েছে, তারা বাড়ি ফিরবে, কিন্তু কেউ আর উঠতে পারছে না। তাদের বলা

হল যে, 'এর' খুব-ভুল হয়ে গিয়েছে 'এ' ঘড়িটা তো দেখেনি, আর কথা বলতে বলতে খেয়াল হয়নি যে অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। তোমরা তো যাবে অনেক দূরে। কেউ কিন্তু কোনও ভয়-ভাবনার কথা কিছু বলল না। তারা বলল, আমরা ঠিক চলে যাব, আটকাবো না। সবাই চলে গেল, যারা local তারা কিছু রইল, তার পরে তারাও চলে গেল। পরেরদিন দেখা গেল বেলা দুটোর সময় ঐ সমস্ত scientist-দের মধ্যে অনেকেই এসেছে, প্রায় নয়জন। 'এ' নয়দিন Santacruz-এ শিবানী গুহর বাবার বাড়িতে ছিল। তারা এই নয়দিন ছিল, নয়দিনই daily দুটো থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত থেকেছে। Scientist-রা অনেক বই নিয়ে এসেছিল—Philosophy, Physics, Religion, Mathematics এরকম নানা বই। কথা প্রসঙ্গে তাদের বলা হয়েছিল, দেখ 'এ' মূর্খ! এই কথা শুনে তারা বলল, আপনি এমন কতগুলো জ্ঞানের কথা বললেন যার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। এ কথাগুলো আমরা বইয়ের সঙ্গে মেলাতে পারছি না। প্রসঙ্গের ভিত্তিতে তাদের আরও কিছু বলা হয়েছিল। তারা চুপ করে সমস্ত কথা শুনছিল, একটা কথাও কেউ বলেনি। অনেক রাত হয়ে যাওয়াতে তাদের বলা হল, আজকে এখানে থেকে যাবে? থাকলে কিন্তু আলাদা জায়গা দিতে পারব না, এই hall ঘরে তোমাদের থাকতে হবে। যে flat-এ 'এ' গিয়েছিল সেখানে মাত্র দুটি room, তা সত্ত্বেও সেখানে ন-দশজন লোক ছিল। তাদের থাকতে বলাতে তারা বলল যে, তারা ফিরে যাবে। তাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলে গেল সবাই।

পরদিন কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সময় স্টেশনে অনেকেই এসেছিল, রেলের অফিসারও অনেকে এসেছিল, কারণ রেলের recreation club-এ এরকম ভাষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে তারা জানিয়েছিল, আমরা জ্ঞানের অনেক বই পড়েছি, কিন্তু আপনার এই সমস্ত কথা কোথাও পড়িনি। আপনার কথা শুনে আমরা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। আপনার কথা দিয়ে আমাদের এমন করে দিলেন যে, এর পরে আর কোনটা সত্য বলব আমরা! 'এ' তখন তাদের প্রশ্ন করেছিল, বল কোনটা সত্য? তারা বলল, এমন ভাবে আপনি গল্পটা বললেন যে আমরা তা অস্বীকার করতে পারব না, একেবারে practical! আমরা সবাই এখানে স্বপ্ন দেখছি। 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) যে তোমাদের দেখছে, কথা বলছে তাও কিন্তু 'এর' কাছে স্বপ্ন—I know it is also a dream। তোমরা একটু পরে সবাই চলে যাবে, but I will remain as it is, তখন আর তোমরা এতজন থাকবে না। এক সময়ে ছিলে না, এক সময়ে এসে পড়েছ, আবার এক সময় চলে যাবে। এতগুলো অবস্থার মধ্যে which one is real? যখন কেউ ছিল না তখন hall-টা vacant ছিল without a single one। পরে একে-একে সবাই এসে এখানে উপস্থিত হল। পূর্ব অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করলে present-টাই সবার কাছে real মনে হবে। আবার যখন hall vacant হয়ে যাবে তখন the absence of people in the room will be revealed by the same light which is the witness of all—first absence, second presence and lastly again absence।

সৃষ্টির রহস্য হল—আদিতে সৃষ্টি ছিল না, মধ্যে সৃষ্টি হল এবং অন্তে সৃষ্টি থাকবে না। গীতাতে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।" অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, আদিতে কিছুই ছিল না, মধ্যে ব্যক্ত হল এবং অন্তে আবার অব্যক্ত। তোমার প্রিয়জন নিধন হয়ে যাবে, কেউই থাকবে না। কিন্তু কোনটা সত্য অর্জুন? অর্জুন এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। তুমি ছিলে না, হঠাৎ জন্মেছ, লালিত-পালিত হয়েছ, তারপর সংসার করছ। যখন সময় হবে তখন সবাই চলে যাবে, যারা থাকবে তারা কান্নাকাটি করবে। কোথা থেকে তুমি এসেছিলে আবার কোথায় চলে যাবে কেউ তা জানে না। 'কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, কোথায় যাব নাই ঠিকানা। এ জগৎটা যেন একটা মুসাফিরখানা।'

মানুষ গাড়িতে উঠে জায়গা নিয়ে ঝগড়া করে, কতকিছু করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর স্থিতি এসে গেলে দু-চারটে কথা বলতে বলতে গল্প করতে করতে tiffin carrier বেরোলো, তার পরে তা একে অপরকে দিল। তারপর খেয়েদেয়ে গল্প করতে করতে যার যখন নামার সময় হচ্ছে সে চলে যাচ্ছে। যখন কেউ চলে যাচ্ছে তখন আরেকজন তাকে বলছে—আহা! চলে যাচ্ছেন। তখন চোখে জল।

....কী খেলা খেলতে এসে ভবে
কী খেলা খেলিছ সবে
জান না তার আদি-অন্ত
মধ্য নিয়ে সবে আছ মেতে।
কী খেলা খেলিছ সবে....।।

(বাউল—কাহারবা)

এই আমারবোধ নিয়ে আমি যে সংসারে খেলে বেড়াচ্ছে তা কতক্ষণ থাকছে? কেন চিরকালের জন্য থাকছে না? না-থাকার কারণ কী? কে ভাবছে! যারা ভাবছে তারা কী দিয়ে ভাবতে পারছে? 'এও' তোমাদের মতো মানুষ, সুখে-দুঃখে গড়া জীবন। কিন্তু 'এর' কাছে একটি রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই সত্য cent percent original এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। সেইজন্য 'এ' আমি-র বিজ্ঞান তোমাদের সামনে পরিবেষণ করছে। আমার বিজ্ঞান সম্বন্ধে সবাই সচেতন to some extent, অর্থাৎ mineness বা myness সম্বন্ধে অনেক information পাবে, কিন্তু আমি-র অর্থাৎ I, the Witness of all, তার খবর অনেকেই জানে না। I or the Witness is nor the enjoyer, nor the experiencer and nor even the doer but the eternal Witness, the underlying essence or substratum. প্রত্যেকের মধ্যে Witness-এর একটা part আছে যা unattached, unalloyed, unmixed, the eternal substratum, the background of all, the underlying essence of all which lies behind all the panorama of creation—gross, subtle, causal and remains unaffected by all creations in the foreground! Background remains always the same, it is unaffected.

'এ' সেই আমি-র কথা বলছে যা প্রত্যেকের মধ্যে আছে, কিন্তু তোমাদের মন তা ঢেকে রেখেছে। মন-পর্দা দিয়ে তা ঢাকা আছে। সেই পর্দা না-সরালে তার সন্ধান পাবে না।

জীবত্ব ক্ষণিকের স্বপ্নমাত্র। এই স্বপ্নের প্রসঙ্গ নিয়ে নিশ্চয়ই তোমরা ভেবে দেখবে। অবশ্য অনেকেই এই বিষয় নিয়ে ভাববে না। তারা 'eat, drink and be merry' দলের লোক, শুধু মজা লুটতে ব্যস্ত। কিন্তু যখন opposite nature অর্থাৎ কর্মের ফল তাকে এসে গ্রাস করবে, তখন আর কোনও উপায় খুঁজে পাবে না। মানুষ কারণ সম্বন্ধে জানে না বলে কার্য দ্বারা সবসময় আক্রান্ত হয় এবং কার্যের চক্রের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়। Action without cause is not possible, but when you reach the cause state no action can touch you. কার্য কখনও কারণকে অতিক্রম করতে পারে না। আসল scientist সে-ই who is possessed by the sense of universal causation। 'এ' material scientist-দের কথা বলছে না, কারণ তারা limited কতগুলো জিনিস নিয়ে মাতামাতি করে এবং ধ্বংসের কারণ সৃষ্টি করে নিজেরাই হায় হায় করছে। যে বিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত অজ্ঞান, দ্বৈত, বৈচিত্র্য, মনের সকল স্তর অতিক্রম করে নিত্য অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় সেই বিজ্ঞানের কথাই তোমাদের কাছে প্রসঙ্গক্রমে পরিবেষণ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকরকম স্তরের বিজ্ঞানী আছে। অধ্যাত্মজগতের বিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেক রকম স্তরের বিজ্ঞানী আছেন। কিন্তু 'এ' এসব স্তরের কথা নিয়ে মাতামাতি করছে না। মূল কথা হল, You will hardly find one among the profounded sorts of scientific mind without a religious feeling of his/her own। The scientist is possessed by the sense of universal causation. The future to him/her is every bit as necessary as determined by the past. His/her religious feelings take the form of a rapturous amazement at the harmony of natural laws which reveal an intelligence of such superiority that when compared to it all the systematic thinkings and actings of human life appear or seems to be utterly an insignificant reflection. নিশ্চয়ই 'এর' কথাগুলোর অর্থ সবাই বুঝতে পেরেছে। 'এ' যে মূর্খ ও লেখাপড়া কিছুই শেখেনি তা কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু ভিতরে reveal করেছে সব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। যে stage-এ গেলে আর সেখান থেকে ফিরে আসা যায় না সেই stage-এ 'এ' প্রতিষ্ঠিত। After reaching that stage there is no return. যেমন নদী সাগরে মিশে গেলে আর ফিরে আসতে পারে না। I have merged in the Absolute. The Absolute reveals in Me and all these are nothing but the glory of the same One Absolute which lies in each of you as your true nature. This is the summum bonum of My sayings. 'এ' এই কথাকে নানা angle থেকে তোমাদের কাছে রাখছে। তোমাদের ভিতরকে illumine করার জন্য, enlighten করার জন্য, awaken করার জন্য এই তত্ত্ব তোমাদের সামনে পরিবেষণ করা হচ্ছে—What you are in Reality

and not what you are at present, i.e. what you appear to be. This is not your true identity. যা তুমি বর্তমানে তা তোমার সত্য পরিচয় নয়। 'এ' X-এর কথা দিয়ে সেইজন্য বলেছিল। এখানে সবাই এক-একজন X। কিন্তু এই তত্ত্ব very difficult, really very difficult! যারা চেষ্টা করছে তারা হাতড়াচ্ছে।

একজন একবার 'একে' বলেছিল, আপনি ভগবানের দর্শন পেয়েছেন? তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তুমি কি পেয়েছ? সে উত্তরে জানিয়েছিল, হ্যাঁ আমি তাঁর দর্শন পেয়েছি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি কী রকম? তোমার মতো কি? সে বলল, আমার মতো কেন হবে! আমি ভগবানকে দেখেছি। তখন তাকে প্রশ্ন করা হল, কোন ভগবানকে দেখেছ? সে উত্তরে জানাল, আমি কৃষ্ণকে দেখেছি। তাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হল, কী বেশে? সে বলল, রাখালবেশে। তখন তাকে বলা হল, তাহলে তুমি মুসলমানের ভগবানকে দেখনি, খ্রিস্টানের ভগবানকে দেখনি, পার্শীদের ভগবানকে দেখনি, জৈনদের ভগবানকে দেখনি, শিখদের ভগবানকে দেখনি, শাক্তদের ভগবানকে দেখনি, রামায়েতদের ভগবানকে দেখনি, শৈবদের ভগবানকে দেখনি, যোগীদের ভগবানকে দেখনি এবং জ্ঞানী ও কর্মীদের ভগবানকেও দেখনি। তাহলে তুমি কোন ভগবানকে দেখেছ? সে বলল, কৃষ্ণকে! তখন তাকে বলা হল, ভগবানের কি একটি মাত্রই রূপ? Is it only one? Can you prove it? তুমি তাঁর এক ঝলক দর্শন পেয়েছ। আর যারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গীসাথি ছিল এবং যারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল তাঁর living time-এ are they greater or are you greater? সে উত্তরে বলল, আপনি জ্ঞানবাদী মানুষ। তখন তাকে বলা হল, 'এ' কোনও বাদ-ই নয়, 'এ' কোনও কিছুই নয়—সব বাদ। আমি I। 'একোঽহম্ নিত্যম্'— এই এক কখনও পাল্টাবে না। এই এক-কে বাদ দিয়ে পৃথিবীর কোনও দেশের মানুষের ক্ষমতা নেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারে—সে মূর্খই হোক আর জ্ঞানীই হোক, ধার্মিকই হোক আর অধার্মিকই হোক, সাধুই হোক আর অসাধুই হোক, দেবতাই হোক আর ঈশ্বরই হোক বা অবতারই হোক। প্রত্যেককেই এই আমিকে ব্যবহার করতেই হবে। তোমাদের মধ্যে রয়েছে সেই এক আমি। কিন্তু আমি-র পরিচয় তোমরা জান না—this is the only thing to be recognized. তোমরা তা অহংকার দিয়ে মনে করছ, আমি কিন্তু অহংকার নয়। অহংকারের কী দুর্গতি হয় তা দশটা স্বপ্নের মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে।

Each and every individual have to suffer like this person who experienced ten dreams.'এ' দশটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু জীবনভর মানুষকে কত স্বপ্ন দেখতে হবে। এক একটি জীবন অসংখ্য স্বপ্নের ঘনীভূত রূপ। মানুষ চুরাশি লক্ষ জনম অতিক্রম করে তার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। প্রতি জন্মে মানুষ যে কত স্বপ্ন দেখে তার হিসাব নেই। সেই হিসাবে চুরাশি লক্ষ জন্মের স্বপ্নের সমষ্টি হল জগৎরূপ। সেই সকল স্বপ্ন জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সবকিছু অবলম্বন করে অখণ্ড আমি 'পাকা আমি-র' বক্ষে আমারবোধের স্বকল্পিত কল্পনাবিলাসের স্বপ্নের সমষ্টি। সেই স্বপ্নগুলি হল জীবনের সম্পদ। তার ভিত্তিতে মানুষের সাংসারিক জীবনের

অভিজ্ঞতার মান ও পরিচয় নির্ণিত হয়। স্বপ্ন-হল মনের কল্পিত সৃষ্টি বা বিলাসরচনা। মন তার কারণ জানে না। সেইজন্য স্বপ্নকেই সত্য মনে করে সে তার মধ্যেই জীবন কাটায়। মনের পশ্চাতে যে বিশুদ্ধবোধস্বরূপ আত্মা সে-ই হল পাকা আমি অহংদেব। তাঁ মনাতীত বলে স্বপ্নাতীত। মনের অন্তর্ভুক্ত হল গুণ-ভাব অবস্থাদি। তার সঙ্গে যুক্ত যে চৈতন্যের অংশ তা হল জীবচৈতন্য, অহংকার তার নাম। এই অহংকারই কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা সেজে জীবননাট্যে অভিনয় করে চলেছে। এই অহংকারের পশ্চাতে রয়েছে কূটস্থ সাক্ষিচৈতন্য আত্মারাম পাকা আমি। কাঁচা আমি পাকা আমি-র অংশ হলেও এবং পাকা আমি-র বুকে খেলে বেড়ালেও পাকা আমি-র পরিচয় জানে না। তাই কাঁচা আমিকে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির চক্রে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করতে হয় স্বভাবদোষে। তাই হল তার আত্মবিস্মৃতির ফল—জীবনবন্ধন। পাকা আমি-র শরণ নিলে এবং তাঁর আশ্রয়ে বাস করলে তাঁর কৃপায় কাঁচা আমি পাকা আমি-র ধর্ম অর্থাৎ সাক্ষিবোধে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তখন তার আর দ্বৈতবোধ বা জীবভাব থাকে না, অন্তঃকরণ মন-বুদ্ধির কার্যও থাকে না। সুতরাং মনোকল্পিত স্বপ্নেরও আর কোনও কারণ ও সম্ভাবনা থাকে না। শুদ্ধ আপনবোধই হল পাকা আমি-র স্বভাব ও ব্যবহার। এই আপনবোধে শুধু আত্মবোধই খেলে, আমারবোধ বা অনাত্মবোধ খেলে না।

'এ' তোমাদের ভয় দেখাচ্ছে না, শুধু তোমাদের আত্মার (পাকা আমি) আমিকে point out করছে যাতে তোমরা সচেতন হও। Don't forget that you are the same 'I' which is the witness of all duality, relativity, maniness (plurality) because It is the eternal Substratum of all, the Background of all and the underlying Essence of all. একটি ছবি আঁকতে গেলে একটা background-এর প্রয়োজন—canvas, paper বা wall যাই হোক। মনে কর তুমি একজন শিল্পী। Oil painting-এর মধ্যে তুমি কত কিছু আঁকতে পার—নদী, ঝরনা, পাহাড়, সাগর, মানুষ, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু একটা background না-থাকলে এগুলো আঁকা কি সম্ভব? 'এ' তোমাদের মধ্যে অবস্থিত সেই background-রূপী আমি-র পরিচয় সম্বন্ধে বলছে। এই background-এর দোহাই দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে কিন্তু তার ফল ভোগ করতে হবে! তুমি কারও বাবা, মা, পত্নী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন রূপে অভিনয় করলেও তুমি সত্য কেউ বা কারও নও। You are the Real-I, the Substratum, pure Witness Consciousness without which no designation is possible, no categorical function is possible and no life function is possible. এই হল তোমাদের সামনে 'এর' বক্তব্য। এই প্রসঙ্গ বার বার তোমাদের সামনে রাখার কারণ হল, যদি কখনও কথাগুলি মনে ধরে! আর যদি না-ধরে তবে যেমন ভাবে চলছ সেই ভাবেই চল।

যে ভগবান ছাড়া কারও কোনও অস্তিত্ব নেই, যিনি কারও কাছে ধরা দেন না, তিনি যে তোমার মধ্যে বসেই খেলছেন can you acknowledge it? Without acknowledgement how can you recongnize It? Without recognition how can you realize It? That Essence (Real-I) can be realized but cannot be

explained. কী দিয়ে comprehend করবে? তুমি নিজেই সেই Essence। আজ সবার মাঝে একটা magical game হয়ে গেল। কোনটা সত্যি তা নির্ণয় করতে হবে। এই যে সকলে এখানে বসে আছ এ-ও কিন্তু স্বপ্ন। I never consider all these as real. They are relative existence which are reflections of the same I which exists in you as infinite One. All finite expressions are dream. We are infinite in infinite, of infinite, from infinite, for infinite, by infinite, with infinite, to infinite, on infinite and beyond, and beyond beyond. That is the Real-I without which none of you can exist, not to speak of your characteristic feature of dream life.

তোমাদের কাছে পরিমাণ করবার কোনও যন্ত্র আছে কি? পরস্পরের মধ্যে ভেদ দেখা ছাড়া আর কিছু দেখবার যন্ত্র আছে কি তোমাদের? মানুষ অন্যের দোষ দেখতেই অভ্যস্ত এবং নিজের দোষ না-দেখে পরের দোষ দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তার পরে রাতে ঘুমিয়ে পড়ার পর স্বপ্ন দেখে। কাজেই হৃদয়পুরে বসে কে সোনার কাঠি ও রূপোর কাঠি নাড়ছে? এই সোনার কাঠি ও রূপোর কাঠি যে তোমাদের নিজেরই কল্পনা তা ভুলে যেও না। কল্পনা দিয়ে গড়া এই সংসার। কিন্তু কল্পনা কতক্ষণ টেকে? কোনও এক মস্তবড় জমিদার বাড়ির একজন member 'একে' প্রশ্ন করেছিল, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন? প্রশ্নটা আমার জিজ্ঞাসা করার ছিল, কিন্তু আপনার কথা শুনে আর প্রশ্ন করতে সাহস পাচ্ছি না। তখন তাকে বলা হল, সে কী! প্রশ্নটা কী? তখন সে বলল, আমাদের বিরাট জমিদার পরিবার, কিন্তু তা ছারখার হয়ে গেল কেন? তখন তাকে উত্তরে বলা হল, তুমি তাহলে কী শুনলে এতক্ষণ? যা সৃষ্টি হয়েছে তা তো ধ্বংস হবেই। আর যা সৃষ্টিই হয়নি তার নাশ নেই। Real-I সৃষ্টি হয়নি, অহংকার সৃষ্টি হয়েছে, ফলে তার নাশ আছে, তার বিকার আছে। অহংকার দেহ নিয়ে বাস করে, কাজেই দেহের সুখ-দুঃখ-জরা-ব্যাধি face করতেই হবে। একদিন সকলেই শিশুরূপে জগতে এসেছিল, ক্রমে বয়স হল এবং বৃদ্ধ হল। অনেকেই তখন আর একা একা চলতে পারে না। কিন্তু এই ভাবে তো কেউ আসেনি, সকলেই ছোট শিশু হয়ে জগতে এসেছিল। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। This is one aspect of our life, but this is not all real, it is just like a dream experience. আমি-র যখন জন্মই হয়নি তখন কী করে বার্ধক্য আসবে? এই দশটি স্বপ্নের মধ্যে 'এর' বক্তব্যের সার কথা সুন্দরভাবে দেওয়া হয়েছে। দেখ তোমরা নিজেকে খুঁজে পাও কী না! আর না-পেলে কী করতে হবে তাও বলে দেওয়া হবে। 'এ' তোমাদের ফাঁকি দিতে আসেনি, কারণ 'এ' professional man নয়। 'এর' কোনও মতলব নেই, কারণ 'এর' কোনও উদ্দেশ্য নেই। I am purposeless because I am not slave of mind. 'এর' কোনও mission নেই, সেইজন্য I have missionless mission। জ্ঞানীগুণীরা এই কথা শুনে বলেছে, এ তো meaningless কথা! উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, Yes, that which has got meaning must have some innings also. Innings হলে

পরে তুমি তো out হবে, পারবে না সামাল দিতে। কটা innings নিয়ে খেলবে! যাই হোক আজ এখানেই সচ্চিদানন্দ করা হল।

মন্তব্য ঃ

অষ্টম বিচারের পরিণামই নবম বিচারের বিষয়বস্তু। সচ্চিদানন্দ আত্মগুরুর বন্দনা দিয়ে নবম বিচার আরম্ভ হয়েছে। আত্মগুরু আত্মবোধের মহিমাই প্রকাশ করেন। আত্মবক্ষে আত্মার প্রকাশধারায় নিরন্তর স্ফুরণ হয়। এই স্ফুরণধারার মধ্যে আত্মজ্যোতি নিরন্তর প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলনের পূর্বাপর মানের মধ্যে স্ববোধ-আত্মার স্বভাব অভিনব ভাবে অভিব্যক্ত হয়। তার স্বভাবের অভিব্যক্তি ক্রমপর্যায়ে সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপে প্রকাশ পায়। স্ববোধ-আত্মার স্বভাবের এই হল বৈশিষ্ট্য। স্ববোধ-আত্মার স্বরূপ ও ধর্ম হল অখণ্ড ভূমা স্বয়ংপ্রকাশ সর্বসম, কিন্তু স্বভাবের স্বরূপ ও ধর্ম হল স্ববোধের প্রতিভাস বা আভাসের সামগ্রিক রূপ। অন্তঃকরণ তার নাম। এই অন্তঃকরণ এক হলেও চার ভাগে সক্রিয় হয়। মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত হল তাদের পরিচয়। এদের মধ্যে যে কোনও একটির মাধ্যমে অন্তঃকরণকে নির্দেশ করা হয়, তবু বুদ্ধি ও অহংকার এক পর্যায়ে ধরা হয় এবং মন ও চিত্তকে অন্য এক পর্যায়ে ধরা হয়। বর্তমান বিচারে মনকে দিয়েই অন্তঃকরণের প্রকাশবিকাশকে নির্দেশ করা হয়েছে।

মনরূপী স্বভাবের অভিনব লীলাবিলাসই হল বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ। মনের নিজস্ব কোনও সত্তা নেই, স্ববোধাত্মার প্রকাশজ্যোতি হল তার মূল। মনের সামগ্রিক বিলাসই হল কল্পিত কল্পনা। বাস্তবতা হল তার পরিণাম। মনের কল্পনাবিলাসই হল তার স্বরূপ ও লক্ষণ। জীবের হৃদয়ে জীবের স্বভাবরূপে মনের বিলাস জীবের বহির্সত্তা ও অন্তর্সত্তা রূপে সবসময়ই সক্রিয়। জীবের কেন্দ্রসত্তা হল স্ববোধসত্তা। স্ববোধসত্তার ব্যবহার আপনবোধে নিজবোধে সমবোধে একবোধে নিত্যপূর্ণ, কিন্তু স্বভাবের ব্যবহার সবই মনের কল্পিত বিলাস, ভাব-গুণযোগে চিদাভাসের অভিনয়। আত্মজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানসকল্পনাই হল স্বপ্ন। জীবের অনুভূতি সবই মানসকল্পিত স্বপ্নবিলাসমাত্র। স্বপ্নতত্ত্ব ও স্বপ্নের বিজ্ঞানই হল মনোধর্মের বিজ্ঞান, মানসবিজ্ঞান। জীবের সামগ্রিক অনুভূতি অর্থাৎ স্বভাবের অনুভূতি হল মানসকল্পিত ইন্দ্রজালবৎ স্বপ্নবিলাসমাত্র। ইন্দ্রিয়-মনের মাধ্যমে তা অনুভূত ও আস্বাদিত হয় সত্য, কিন্তু তা নিত্য স্থায়ী ও সত্যভিত্তিক নয়, তা অনাত্মা পর্যায়ের। অষ্টম বিচারে মনের বিজ্ঞানের স্বরূপকে স্বপ্নবিলাসরূপে কীভাবে অনুভূত হয় তার বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা পাওয়া যায়। স্ববোধাত্মা অতিরিক্ত সবাই মানসকল্পিত, স্বপ্নবৎ। সমগ্র বিশ্ব ইন্দ্রজালবৎ মানসকল্পিত স্বপ্ন সদৃশ। ইন্দ্রিয়-মন দ্বারা অনুভূত হলেও আত্মবোধের দৃষ্টিতে তা মিথ্যা। আত্মার বোধময় আমি একমাত্র সত্য, অনাত্মা মনের আমি-র অর্থাৎ অহংকারের অনুভূতিময় সবকিছুই অলীক কল্পনা মিথ্যা, একমাত্র আত্মার আমি-ই নিত্যসত্য সচ্চিদানন্দঘন অমৃত মুক্তি শান্তিস্বরূপ।

২০/১২/০১

।। দশম বিচার ।।

ওঁ

নমো নমস্তে গুরবে মহাত্মনে বিমুক্ত সংজ্ঞায় সদুত্তমায়
নিত্যাদ্বয়ানন্দ রসস্বরূপিণে ভূম্নে সদাঽপারদয়াম্বুধাম্নে
যৎ কটাক্ষ শশীসান্দ্র চন্দ্রিকাপাতধূত ভবতাপজশ্রমঃ
প্রাপ্তবানহমখণ্ডবৈভবম্ আনন্দমাত্মপদমক্ষয়ং ক্ষণাৎ
ধন্যোঽহম্ কৃতকৃত্যোঽহম্ বিমুক্তোঽহম্ ভবগ্রহাৎ
নিত্যানন্দস্বরূপোঽহম্ পূর্ণোঽহম্ ত্বদনুগ্রহাৎ
সচ্চিদানন্দস্বরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিতোঽহম্
যস্য কৃপয়া তস্মৈ স্বাত্মবোধরূপ পুরুষোত্তম গুরবে নমঃ ।।

(গুরুমন্ত্র)

জীবনে জ্ঞানলাভ করার জন্য গুরুর দরকার হয়। গুরু বিনা জ্ঞানলাভ হয় না। এই গুরুর অনেক স্তর আছে। একেবাবে বর্ণপরিচয় হতে আরম্ভ করে ব্রহ্ম-আত্মজ্ঞান লাভ অর্থাৎ ব্রহ্ম-আত্মস্বরূপের সঙ্গে নিজের অভিন্ন অনুভূতি/নিজ জ্ঞান—এই এক জ্ঞানেরই কতগুলি স্তর বিন্যাস। কাজেই গুরুর আসল স্বরূপ হচ্ছে অখণ্ড জ্ঞানমূর্তি। অখণ্ড হলেই তা আনন্দ হবে। কাজেই জ্ঞান এবং আনন্দ অভিন্ন। তার সঙ্গে পুরুষোত্তম অর্থাৎ শুদ্ধ অহং অভিন্ন। কাজেই বাইরে আমরা যে গুরুর সাহায্য নিই, সেই গুরুকে আবিষ্কার করতে হবে নিজের মধ্যে, নিজের আমি-র মধ্যে। কেননা গুরুর মধ্যেই সমস্ত দেবতা। কাজেই গুরুস্তবের মধ্যে বলা হয়েছে, "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ/গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।" গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম—তাঁর তো কোনও লিঙ্গ থাকতে পারে না। এখানে যে আত্মার কথা সবার কাছে বলা হয়, সেই আত্মগুরুই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু। কেননা আত্মা আর ব্রহ্ম অভিন্ন। অবশ্য ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্ম—এই তিন অভিন্ন হলেও ঈশ্বরের function জগৎকে নিয়ে। কারণ স্রষ্টা ও প্রভু তিনি। কাজেই জগতের ব্যাপারে ঈশ্বরকে যুক্ত থাকতে হয়। কিন্তু আত্মা নির্লিপ্ত। আত্মা আর ব্রহ্ম অভিন্ন বলে আত্মা নির্লিপ্ত, কিন্তু জীবভাবে প্রতিভাত।

জীবের মধ্যে যে আত্মা আছেন তাঁর সন্ধান জীবকে পেতে হলে এই গুরুর সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। যে গুরু আত্মার সন্ধান পেয়েছেন তিনিই শুধু আত্মার সন্ধান দিতে পারবেন, তা না-হলে কতগুলি ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে মানুষকে চলতে হয়। কত জনম চলতে হবে তার কোনও ঠিক নেই। জপ-তপ-ধ্যান-ক্রিয়াকলাপ এই নিয়েই জীবন কাটাতে হয়। কতগুলি

সাধন প্রণালী মানুষকে অভ্যাস করতে হয় যেমন—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি। এসবের সাধনা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু আত্মার বিজ্ঞানে আদিতে আত্মা, মধ্যে আত্মা, অন্তে আত্মা। আত্মার কোনও বিকল্প নেই। তোমার ভিতরে যে আমি আছে সেই আমি-র কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু তোমার ইষ্টের কল্পনার অন্ত নেই। 'এর' কথাগুলো যেন কেউ ভুল না-বোঝে। সেইজন্য আগেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, 'এর' বক্তব্য হল Science of Oneness-এর উপরে প্রতিষ্ঠিত, duality-র উপরে নয়। Duality-র উপরে প্রতিষ্ঠিত হলে পরে intellect বা mind বিকল্প চিন্তা করতে পারে, কিন্তু Oneness-এর উপরে mind বিকল্প চিন্তা করতে পারবে না।

গতকাল মন প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা হয়েছিল। জীব মনের অধীন, ঈশ্বর মনের প্রভু। কিন্তু জীবকে মনের ঊর্ধ্বে উঠতে গেলে ঈশ্বরকে/আত্মাকে ধরে উঠতে হবে। এখন উভয় ক্ষেত্রেই গুরুর দরকার। গুরুর সাহায্য না-হলে আমরা আমাদের মনের মল, মনের যে জড়তা, মলিনতা, দুর্বলতা, ভ্রান্তিভীতি কিছুতেই অতিক্রম করতে পারব না। অবশ্য সেইরকম সদ্‌গুরু হওয়া চাই, যিনি সমস্ত স্তরের সঙ্গে directly experienced। বই পড়ে, book knowledge নিয়ে গুরুগিরি করতে গেলে কিন্তু সেই আত্মগুরুর সন্ধান পাওয়া যাবে না। দ্বৈতবোধের গুরু তোমাকে একটা কথা বলবেন, নির্দেশ দেবেন—এই কর, সেই কর, কিন্তু রাস্তা আর দেখাতে পারবেন না। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে গুরুতত্ত্ব গুরুবাদ ভীষণ জটিল। কিন্তু আত্মবিজ্ঞান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যদিও সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যেই আত্মা নিহিত আছে, কিন্তু আত্মার মধ্যে সব নিহিত নেই, কেননা আত্মা ever-free, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন। এই আত্মা প্রত্যেকের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে নিহিত আছে। ইন্দ্রিয়-মন তাঁর নাগাল পায় না। ইন্দ্রিয়-মনের মধ্যে আত্মার থেকে চৈতন্যের ধারা প্রতিফলিত হয়, প্রথমে বুদ্ধির মাধ্যমে মনে, তারপর মনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তারপরে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যাঁরা আত্মজ্ঞানী তাঁদের কাছে এগুলো এত পরিষ্কার, এত direct যে তাঁদের দ্বিতীয় কোনও কিছুর support বা অবলম্বন নিতে হয় না।

ঈশ্বরের বিজ্ঞানের মধ্যে আমাদের কতগুলো স্তরের সাহায্য নিতে হয়। কেননা ঈশ্বরের অনেক agent আছে। সেই agent-দের সন্তুষ্ট না-করে তাঁর কাছে পৌঁছানো যায় না, যেমন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে department-এর অনেকের সঙ্গে দেখা ক'রে তাদের অনুমতি বা permission নিতে হয়। এগুলো হল official রীতিনীতি। কিন্তু আত্মা direct। Don't take My words otherwise—তা বার বার বলে দেওয়া হচ্ছে। 'এর' কোনও মতের বিরুদ্ধে বা কোনও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনও কথা নেই। Direct একটা experience সবার সামনে রাখা হচ্ছে। Try to follow Me and you will be able to acknowledge it first, then recognize it and finally realize it within you without any difficulty, because Self is already with you as your very central and transcendental Being, your underlying Essence, your background Con-

sciousness and the eternal support of all your understanding. যতরকম অনুভূতি আছে তার পশ্চাতে আত্মা সবসময়ই বর্তমান। কেননা আত্মা বিশুদ্ধ সৎস্বরূপ চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ। যদিও ঈশ্বর-আত্মার মধ্যে কোনও ভেদ নেই তবু ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক আছে, কিন্তু আত্মার সঙ্গে জগতের সম্পর্ক নেই। আত্মবিদ্যা যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা জগৎকে নিয়ে মাতামাতি করেন না। তাঁদের কাছে Divine I/Self is verily I-Reality and not ego। Ego is conditioned, ego is connected with the universal appearance. রূপ-নামের সঙ্গে যুক্ত হল ego। কিন্তু আত্মা unattached, unconditioned, behind all of them।

আত্মা সবকিছুর অতীত—সর্বাতীতম্। কাজেই তাঁর স্বরূপকে সবার সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে—কী করে মন তাঁর থেকে প্রতিবিম্ব সংগ্রহ করে তার কাজ সমাধা করে, কিন্তু যখন আর পারে না তখন সে হতাশ হয়ে যায়। তখন তার একটা সাহায্যের দরকার হয়। সে সাহায্যটা কার কাছ থেকে পাবে? বুদ্ধির কাছ থেকে। কারণ মনের পশ্চাতে বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি directly তা পায় বোধস্বরূপ আত্মার কাছে। কাজেই বুদ্ধিরও নিজস্ব কোনও চেতনা নেই। মনের তো নেই, ইন্দ্রিয়েরও নেই। সবই প্রতিফলিত হয়, প্রতিফলনের কতগুলো স্তর—reflected stages one after another। বুদ্ধি পরমবোধির অতি নিকটে বলে বুদ্ধির মধ্যে আত্মজ্যোতি (বোধ) প্রথমে প্রতিফলিত হয় বুদ্ধি সত্ত্বগুণজাত বলে। তা transparent। বোধের জ্যোতি প্রতিফলিত হয় তাতে। সেইজন্য বুদ্ধি appears to be intelligent, কিন্তু intellect has no real light of its own—নিজস্ব কোনও light নেই। তার মধ্যে যেভাবে light আসে তা অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার। Per second-এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে intellectual function-টা সাধিত হয়। এগুলো common man-এর কাছে খুব দুর্বোধ্য বিষয়। Analytical mind না-হলে এই জিনিস বোঝা সম্ভব নয়, খুব কঠিন।

বিজ্ঞানের বিজ্ঞান থেকে আরম্ভ হচ্ছে আত্মবিজ্ঞান। কিন্তু অজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং জ্ঞানাভাসের বিজ্ঞান দিয়ে আত্মার বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানা যাবে না। তা ঈশ্বরের ক্ষেত্র, কাজেই *Ishwara* is the ruler of the creation। কাজেই creation-এর মধ্যে যত কিছু function সবই ঈশ্বরের অধীন। সমগ্র প্রকৃতির অধিপতি হলেন ঈশ্বর। কিন্তু আত্মা স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম-আত্মা অভিন্ন, শুধু বোধে বোধময় অদ্বয় অব্যয় অমৃতময়। এই অদ্বয় অব্যয় অমৃতময় আত্মাকে মন দিয়ে ধরা যায় না। সেইজন্য মনকে হয় শান্ত করতে হবে, নয়ত মনকে তার অনুগত করে চলার অভ্যাস করতে হবে, অথবা মনকে তার মধ্যে লয় করে দিতে হবে বা লীন করে দিতে হবে। মন শুধু বৃত্তি নিয়ে চলে। মনের দশবিধ বৃত্তি। দশবিধ বৃত্তিগুলি হল—কাম অর্থাৎ desire; সংকল্প অর্থাৎ resolution; বিচিকিৎসা অর্থাৎ doubt, সন্দেহ, সংশয়; শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা অর্থাৎ regard, disregard; ধৃতি, অধৃতি অর্থাৎ fortitude, non-fortitude; তারপর হ্রী অর্থাৎ লজ্জা। কুকর্ম করতে গেলে অথবা কুচিন্তা বা কুভাবনা করতে গেলে লজ্জা আসে। সেইজন্য লজ্জাকে বলা হয় দৈবীশক্তি। তাই চণ্ডীতে মাতৃস্তবের মধ্যে বলা

হয়েছে, "যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা"। তা-ই মা। যাদের লজ্জা নেই তারা মায়ার ঘরে বা মায়ার অধীনে চলে। তাদের কাছে মাতৃকরুণা কখনওই আসবে না। তারা পেয়েও তা রাখতে পারবে না, বুঝবেই না। কাজেই হ্রী হচ্ছে মনের একটা বৃত্তি। আরেকটা বৃত্তি হচ্ছে ভী অর্থাৎ ভয়। আর ধী হচ্ছে মেধা। এই দশটা বৃত্তি দিয়ে মন গঠিত। এই ভাবে দশটা বৃত্তি দিয়ে অহংকার ও বুদ্ধি গঠিত। সবই আত্মবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। প্রয়োজন হলে সেগুলো পরে আলোচনা করা হবে।

একজন মানুষের M.A. পাশ করতে কত বছর লাগে! কিন্তু M.A. পাশ করলেই তো তার যোগ্যতা পূর্ণ হল না। তার পরে কর্মক্ষেত্রে এসে আবার নূতন করে তাকে training নিতে হয়, যেখানে কাজ করবে সেখানে। আর আত্মবিজ্ঞান একেবারে directly মানুষকে দেওয়া হচ্ছে। সবসময়ই আমরা সব জিনিসকে খুব short-cut করে আমাদের ইচ্ছামতো, প্রয়োজনমতো পেতে চাই। কিন্তু তা সম্ভব নয়, পাই না। পেলে আমাদের কোনও মূল্যবোধ আসবে না। We do not get everything that we desire. তার জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হয়। সংগ্রামের মাধ্যমে যে জিনিসটা পাওয়া যায় তার একটা value judgement আসে, কিন্তু সহজে যদি কিছু পাওয়া যায়, অর্থাৎ বিনা শ্রমে কিছু পেলে তার মূল্যবোধ আমাদের হয় না, কারওরই হয় না।

Self-Knowledge এমনই বস্তু যা কারও অপেক্ষা রাখে না। এখানে কার কী যোগ্যতা আছে না-আছে, কে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত, কে কোন মতাবলম্বী—এসব নিয়ে 'এ' মাথা ঘামায় না। 'এর' কাছে sun is one, so the Self-Sun is also One whose light and heat is necessary for each and every individual। আত্মাশূন্য কোনও জীবন হতে পারে না। আর আত্মার প্রয়োজন অস্বীকার করার সাধ্য কারও নেই। You can deny the entire universe, all details but you cannot deny your own existence! Because that is undeniable, that is unfathomable, infinite, indivisible and immeasurable. অর্থাৎ অপরিমেয় অগাধ অনন্ত অসীম অখণ্ড অবিভক্ত। বিভক্তির মধ্যে বাস করে আমরা খুব ধর্ম করি। আত্মবিজ্ঞান কিন্তু তা নয়। Each and every moment, each and every movement of your life is directed and experienced by the Self on Self—One Self without which no function of intellect and mind is possible. মন-বুদ্ধির কোনও কাজ সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরের কথা অনেকেই ভুলে যেতে পারে। কোটি কোটি লোক ঈশ্বরের ধার ধারে না। দিব্যি জীবন চলছে তাদের—ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকরি করে তারা বেশ আছে। আর যারা ঈশ্বর-ঈশ্বর করে মাথা খুঁড়ে মরছে তারা ঈর্ষায় জ্বলে মরছে। তারা ভাবে, এরা কুকাজ করছে, হীন কাজ করছে তবুও দিব্যি আছে। আর আমরা ভগবানকে এত ডাকছি, কিন্তু তবুও কষ্ট পেতে হচ্ছে! Sense of difference থাকবেই। কিন্তু আত্মবোধের সাধকের কাছে sense of difference থাকলে চলবে না, it must be given up। You must give up all sense of division. তার কারণ যা-কিছু

হয়ে চলেছে, all that is going on is the same One Self। একই আত্মা দ্বারা সব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সবকিছুর মধ্যেই প্রতিভাত হচ্ছে চৈতন্য—the same One Self who is indivisible even though to you all it appears to be divisible from the outer view point owing to the fault of your own intellect।

বুদ্ধি-মন ভ্রম দেখবেই, ভুল দেখবেই, ভেদ দেখবেই। তা না-হলে সংসার চলে না। কাজেই আত্মজ্ঞানী সংসারকেই মানেন না, সমসারকে মানেন। সমসারের মধ্যে ন্যাকামি চলে না। ওঃ ভুল হয়ে গিয়েছে, sorry!—এই সমস্ত কথা সমসারে চলবে না। আমি ভুলে যাই!—এই কথা বললে হবে না, all these are not allowed। ভুলে গেলে suffer করতে হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই আত্মবিজ্ঞানের chapter-গুলির সঙ্গে common man-এর কোনও পরিচয়ই নেই। প্রত্যেকেই 'আমি, আমি' বলে যে ব্যবহার করে তাও সেই আত্মারই প্রতিফলন—ego, অহংকার। তা দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধিতে বেশ রাজত্ব চালায়, কিন্তু নিজস্ব কিছুই নেই—পরস্মৈপদী, ফোকটে। তার কাছে favourable হলে খুব ভাল, আর unfavourable হলে মনে করে, একদম against-এ judgement এসে গেল! কিন্তু Self-এর মধ্যে দুই নেই, কাজেই কার বিরুদ্ধে কথা বলবে! That is why the Science of Oneness is the only science which can save the entire humanity from the present day calamities. বর্তমানে যে দুর্দিন, এর থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র আত্মজ্ঞান, আর কোনও panacea নেই। এই আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত যে ভাববোধের উপরে তারই নাম হচ্ছে সত্যবোধ বা আপনবোধ।

সত্যযুগ আত্মজ্ঞানীর কাছে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। সত্যযুগ হারায় না। আর অজ্ঞানীর কাছে দ্বাপর-কলি রাজত্ব করছে। এই আত্মবোধ মন তো ভুলে যাবেই, কারণ ভ্রান্তি হল মনের ধর্ম। কাজেই মনের দাস যারা অর্থাৎ জীব আত্মাকে ভুলে যাবেই। আত্মাকে তার ভাল লাগবে না। তার ভাল লাগবে ইন্দ্রিয়ের বোধ, intellectual চুলকানি। যাদের চুলকানি হয় চুলকাতে ভাল লাগে, চুলকে চুলকে ঘা হয়ে যায়। তখন ওষুধ লাগায়। কাজেই এই যে আমাদের sensual perception অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ যে বোধ তাকে আমরা গুরুত্ব দিই বেশি। That is the work of ignorance. ইন্দ্রিয়ের অধীন আত্মা নয়। ইন্দ্রিয় হচ্ছে মনের অধীন। ইন্দ্রিয়ের অধীন মনও নয়, মনের অধীন ইন্দ্রিয়। মন আবার বুদ্ধির অধীন। আর বুদ্ধি যদি মনের অধীন হয় তাহলে জীবের দুর্দশার আর অন্ত নেই। কিন্তু বুদ্ধি পরমবোধি আত্মার অধীন। আত্মা যদি বুদ্ধির অধীন হয় অর্থাৎ বুদ্ধি যদি আত্মার উপর রাজত্ব করতে যায় তাহলে সেই জীবনকে বহু দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। সংসারে মানুষের দৈহিক, প্রাণিক, মানসিক, বৌদ্ধিক দুঃখকষ্টের কারণ কিন্তু তার নিজের অহংকার। যে অহং দিয়ে জীবন আরম্ভ হয়েছে, তার মধ্যে যত প্যাঁচ আসছে তা কিন্তু অহংকারের জন্য। এই অহংকার বেছে পছন্দ অংশটুকু নেয়, বাকি অংশটুকু নেয় না। পছন্দ তার পাল্টায়, সব কিছু পাল্টায়। কিন্তু এই অহংকারের নিজস্ব কিছু নেই। তা দুঃখকষ্টের কারণ হয়। সে নিজে দুঃখকষ্টকে অতিক্রম করতে পারে না। সদগুরুর সাহায্য ছাড়া তা অতিক্রম করা যায় না। কিন্তু সদগুরুর সাহায্য পাবে কী করে?

সদগুরু তো কোনও দ্রব্যের বিনিময়ে কোনও কাজ করেন না, অর্থের বিনিময়ে কোনও কাজ করেন না বা বস্তুর বিনিময়ে কোনও কাজ করেন না। তার কারণ সদগুরু নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র, অর্থাৎ শুধু আপনবোধে তিনি চলেন, অন্যবোধে চলেন না। অন্যবোধে চলে অহংকার। সেইজন্যই দুঃখকষ্ট-জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির কারণ হয় সে। কাজেই যে বক্তব্য সবার সামনে প্রকাশ করা হচ্ছে তা হল জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির চক্রকে অতিক্রম করার বিজ্ঞান। সেখানে কোনও short cut process, sure success, made easy কিছু নেই। অনেকেই মনে করে তাই, কিন্তু সত্যিই নেই। আত্মজ্ঞানের কোনও বিকল্প জ্ঞান নেই। আত্মা অতিরিক্ত কোনও জ্ঞানও নেই। "ন বিদ্যা আত্মবিদ্যাৎপরম ন জ্ঞানম্ আত্মজ্ঞানাৎপরম ন সত্যম্ আত্মসত্যাৎপরম"—আত্মসত্যের পরে কোনও সত্য নেই। যাঁরা অবতার হয়ে আসেন, তাঁরাও ঐ আত্মার অধীনেই আসেন, আত্মার বাইরে আসেন না। কিন্তু আত্মার কথাটা অবতারের ভক্তরা মনে রাখে না। সেইজন্য তাঁদের ভগবান স্বয়ং বলা হয়েছে। ভগবান স্বয়ং কিন্তু সবাই—আত্মজ্ঞানের দৃষ্টিতে বলা হচ্ছে এই কথা,অহংকারের দৃষ্টিতে নয়। কারণ এক আত্মা ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নেই।

আত্মজ্ঞান দ্বিতীয় বস্তুকে স্বীকার করে না। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা অনেকে, তাদের নিয়ে তিনি অনেক লীলা করেছেন, অনেক কিছু করেছেন—শাস্ত্রের পাতায় তা লেখা আছে, শুনতে সবারই খুব ভাল লাগে। গল্প শুনতে সবার ভাল লাগে, তার উপর এরকম মহিমান্বিত গল্প হলে তো কথাই নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা পরিণত করা খুবই difficult। শ্রীকৃষ্ণ সখাদের নিয়ে বৃন্দাবনে লীলাখেলা করেছেন, অন্তত গল্প হিসাবে যা পাওয়া যায়। সদ্‌গুরু ছাড়া আর অপরের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। একজন ভাগবত পাঠক একদিন এসে বলেছিল যে, আমি ভাগবত পাঠ করে শোনাবো আপনাকে। উত্তরে তাকে বলা হল, বাবা 'এ' তো মূর্খ মানুষ, শাস্ত্র কিছুই বোঝে না। তুমি 'এর' কাছে যা বলবে তা কিছুই বুঝবে না। তুমি যখন ভাগবত পাঠ করে 'একে' শোনাবে তার আগে 'এর' চারটে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সেই প্রশ্নগুলি হল—ভাগবত পাঠ কে করে? কার জন্য করে? কেন করে? করার ফলে কী হয়? এই চারটি প্রশ্নের উত্তর 'এ' জানতে চায়। তখন সে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আপনি তো উপযুক্ত কথাই বললেন। এর উত্তর নিশ্চয়ই এটা দিয়েই আরম্ভ করতে হবে। সেই যে তিনি চলে গেলেন, আর 'এর' কাছে কোনওদিন এলেন না। কেন এলেন না, সে আর বলার উপায় নেই। যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ তো এদের নিয়ে অনেক লীলা করেছেন। সবাই খুব আনন্দ করেছে। অনেক গুণ যার আছে সে তো সবাইকে আনন্দ দিতেই পারে, যে ভাল গান জানে আনন্দ দিতে পারে, যে ভাল অভিনয় করতে পারে সে আনন্দ দিতে পারে, যে ভাল ছবি আঁকতে পারে সে আনন্দ দিতে পারে, যে ভাল খেলাধূলা করতে পারে সে আনন্দ দিতে পারে—খুব স্বাভাবিক, very natural। শ্রীকৃষ্ণের অনেক গুণ ছিল, তাই তিনি সবাইকে আনন্দ দিয়েছেন। অনেক ঘটনা, অনেক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দিন চলে যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন হয় তখন একরকম

কৃষ্ণ এবং দ্বারকাতে যখন যুদ্ধ হয় জরাসন্ধের সঙ্গে তখন কিন্তু আরেকরকম কৃষ্ণ। কাজেই সেই কৃষ্ণের সঙ্গে এই কৃষ্ণের অনেক কিছুই মেলে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যে কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণের সঙ্গেও বৃন্দাবনের কৃষ্ণের ভাবের মিল পাওয়া যায় না। অন্তত পণ্ডিতরা বা জ্ঞানীরা তাই বলেন। 'এর' কাছে কিন্তু এগুলো সবই অন্য কথা।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে এসেছিলেন। তখনকার আয়ু হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের অনেক বয়স হয়েছে। বড়ভাই বলরামের সঙ্গে তাঁর অনেক মতের অমিল ছিল। বলরাম অভিমান করে নিজের মতো এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতেন সর্বত্র। হঠাৎ একদিন শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞাননেত্রে দেখলেন, দাদা বলরাম যোগবলে দেহরক্ষা করলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের মনে হল, আমার তো লীলা সাঙ্গ করতেই হবে! (এরকম অনেকেই ভাবে যে আমার জীবন তো শেষ হয়ে এল, কী হল! এখন কী করি! তখন সবাইকে ডেকে বলে, দেখ হে! তোমরা শোন, আমার সময় হয়ে এসেছে তোমরা এই এই করো—তারপর কিছু উপদেশ দিয়ে যথাসময়ে দেহরক্ষা করে। অনেকে আছে এইরকম, একেবারে ঠিক ঠিক কথা অনুসারে দেহরক্ষা করে।) শ্রীকৃষ্ণ তা বুঝতে পারলেন, বুঝতে পেরে তিনি উদ্ধবকে ডাকলেন। উদ্ধব তাঁর ছোটবেলার সাথি, আত্মীয়, বন্ধু, সখা—সবকিছু। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের খুব ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন, উদ্ধব তোমাকে একটা গোপন কথা বলবার আছে, অথচ খুব সত্য কথা! আমার দেহ ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। তোমাকে কয়েকটা গোপন কথা, জরুরী কথা বলছি। এই কথা শুনেই তো উদ্ধব হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করল। ভক্তদের যা হয় আর কী! শক্তপোক্ত ভক্ত কিন্তু খুবই কম। এরকম ভক্ত যখন 'এর' কাছে এসে কাঁদে তখন তাদের বলা হয়, তোমরা ভগবানকে ভালবাস কতখানি তা তোমরাই বুঝবে, কিন্তু ভগবান এই মেদামারার কাছে কখনও দর্শন দেন না। শক্তপোক্ত হও! সেই অনন্ত অসীম রূপ নিয়ে তিনি তোমার কাছে আসবেন। এরকম নরম হলে তো চলবে না, গলে যাবে। কী করবে তুমি? কাজেই শক্ত হও! এই কথা অনেকেই পছন্দ করে না। অনেকেই বলে যে, উনি ভীষণ dry, অথচ আছে অনেক কিছু ওঁনার ভিতরে, কিন্তু ধরতে পারি না, বুঝতে পারি না, কিন্তু বড়ই শুকনো dry! আমাদের পছন্দ মতো নন! তা আর কী করা যাবে! ছাঁচ যার নেই তাকে ছাঁচে ফেলবে কী করে?

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে খুব কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি উদ্ধবকে বললেন, উদ্ধব শোন। কথাই শুনলে না, তুমি আগেই হাউ হাউ করে কাঁদছ? আগে শোন। উদ্ধব বলল, না, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না! তোমার আগে আমাকে পাঠিয়ে দাও। আমি কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। সে তো একেবারে পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন, শোন তোমাকে একটা নির্দেশ দিচ্ছি, তুমি মন দিয়ে শোন। তোমার এখনও অনেক আয়ু আছে, আমার আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে। তোমার অনেক কিছু বাকি আছে। আমার কাজ সব শেষ করে ফেলেছি। বাকিগুলো তোমাকে শেষ করতে হবে। সে বলল, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না! শ্রীকৃষ্ণ তখন তাকে বললেন, তুমি আমাকে এখনও পর্যন্ত পাওনি। কথাগুলো খুব মন দিয়ে শোন সবাই! তোমরা ভাগবত শোন,

ভাগবতকার ভাগবত পাঠ করে। তোমাদের চোখে জল আসে, মন গলে যায়, কিন্তু ঐ কালো ছেলেটার দর্শন পাওয়া যায় না! আর স্বপ্নে দর্শন পেলেও তা দিয়ে তো কোনও কাজ হয় না। খুব শুকনো কথাগুলো! পারো তো একেবার তাঁর কাছে গিয়ে বোলো 'একে' অভিশাপ দিতে। 'এ' সব দেবতার, সব সাধুসন্ত মহাত্মার অভিশাপ মাথা পেতে নিতে রাজি আছে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন, তোমাকে বদ্রীনারায়ণে চলে যেতে হবে। সেখানে নর-নারায়ণ নামে দুটো পাহাড় আছে। অতীত যুগে আমি সেখানে তপস্যা করেছি। সেখানে গিয়ে তোমাকে তপস্যা করতে হবে। তপস্যার গভীরে তুমি আমাকে পূর্ণ করে পাবে। এখন তুমি আমাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে পাচ্ছ। কথাগুলো মন দিয়ে শোন! ইন্দ্রিয়ের দর্শনকে তোমরা মনে কর আসল দর্শন। কৃষ্ণের সময়ে যারা তাঁর বিরোধিতা করেছে, শত্রুতা করেছে, তারা সবাই তাঁকে দেখেছে, সবার তো তাহলে উদ্ধার হয়ে যাবার কথা!

'এর' কথা শুনে ভক্তরা 'এর' উপর অসন্তুষ্ট হয়। ভক্তদের বলা হয়েছিল যে, দেখ, 'এ' ভক্ত বলতে কাউকেই খুঁজে পায়নি। সব ভোগে পোক্তর দল, সব ভোগে পোক্ত। ভগবানের ভক্ত ভগবান স্বয়ং নিজেই। দ্বিতীয় তাঁর সমান ভক্ত কেউ নেই। তার কারণ, আত্মা শুধু আত্মাকেই ভালবাসতে পারে, অনাত্মাকে ভালবাসে না, ভালবাসতে পারেও না। দ্বৈতভাব আত্মার মধ্যে নেই। ভগবান যদি আত্মা হয়ে থাকেন তাহলে তিনি 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং।' তাঁকে তো তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ ভালবাসতেই পারে না, কারণ তিনি আত্মা স্বয়ং। কথাগুলো মন দিয়ে শুনে রাখ! এখানে অন্য কোনও যুক্তি বা মত-পথের কথা নেই, 'এ' direct কথা বলছে। সমস্ত মত-পথ যেখান থেকে প্রকাশ পায়, সবকিছুর মূলে যা সত্যের সত্য, জ্ঞানের জ্ঞান, আনন্দের আনন্দ, প্রেমের প্রেম তা-ই 'এ' point out করছে। It is not mental or intellectual exercise or jugglery. তপস্যা করতে করতে তবে তুমি আমিতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করবে। সেখানে 'আমি-র আমি-র' সঙ্গে তোমার আমি অভিন্ন ভাবে মিলিত হবে। তখন তুমি 'একে' পূর্ণ করে পাবে। সাবাশ! That is the Science of Oneness, Knowledge of Oneness, Knowledge of Knowledge, not knowledge of persons, things, actions, results, space, time, causation. অর্থাৎ দেশ- কাল, কার্য-কারণ, ব্যক্তি এবং প্রকৃতির ঘটনাবলী—এগুলোর জ্ঞান কিন্তু আত্মজ্ঞান নয়। এগুলো হচ্ছে relative knowledge, objective knowledge। এগুলো গুণের অধীন।

'কর্তা-করণ-কর্ম গুণের ধর্ম, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান মনের ধর্ম। কিন্তু মনাতীত অব্যক্ত অদ্বৈতের ঘরে নাম-রূপাদি দৃশ্যসকল, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়াদি ভাবসকল সর্বশূন্য। তা দ্বৈতবিহীন আপনে আপন সচ্চিদানন্দসাগরে।' কালকে গানের মধ্যে এই কথাটা প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো সব স্বানুভূতির গান, revelation, সমাধির পরে প্রকাশ হয়েছে। এগুলো কবিতা রচনা করে সুর দিয়ে গান নয়। সেইজন্য এই গানগুলির মধ্যে নিহিত আছে সমস্ত শাস্ত্রের সার, সমস্ত অনুভূতির সার। একটা সময় আসবে যখন এই গানগুলি শাস্ত্ররূপে মানুষের কাছে প্রতিভাত হবে। শ্রীকৃষ্ণ অনেক বুঝিয়ে উদ্ধবকে পাঠিয়ে দিলেন। তাহলে উদ্ধব যে

কৃষ্ণকে সখারূপে পেয়েছিল তা কত percent কৃষ্ণের স্বরূপ? 'এ' মূর্খ, 'এ' এরকম কথা বলতেই পারে। আগেই বলে নেওয়া হয়েছে যে, 'এর' লেখাপড়া শেখা নেই। কাজেই মূর্খের সাত খুন মাপ। 'এ' শাস্ত্র জানে না, সাধনভজন নেই—কার জন্য সাধনভজন করবে? কেন করবে? 'এর' তো কোনও প্রয়োজন নেই। একটা প্রয়োজন থাকলে তবে তো তার জন্য ক্রিয়া করা যায়। এক সাধুর প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল, 'এ' তো অসাধু হয়নি, কাজেই সাধু হতে যাবে কেন? এই কথা শুনে সাধু বলেছিল, তুমি সাধনভজন কর না? উত্তরে তাকে বলা হযেছিল, 'এ' সাধনভজন করে না। 'এ' সাধনভজন করতে যাবে কেন? অসাধু হলে তবে তো সাধু হতে হয়। রোগ হলে সে না-হয় ডাক্তারের ওষুধ খায়, কিন্তু যার রোগ হয়নি সে কি ওষুধ খাবে? তখন সে বলেছিল, তোমার কথা তো খুব সত্যি ঠিকই, কিন্তু তুমি ধর্মজগতের কিছুই জান না। তখন তাকে বলা হল, তুমি তো জান, তুমি নিজে কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছ সত্যে? সত্য কথা বল, বুকে হাত দিয়ে বল। সত্যের সঙ্গে তুমি directly মোকাবিলা করেছ না কি ধার করা কথা সবাইকে বলে বেড়াও, কোনটা? তুমি মুখস্থ কথা বলছ, হৃদয়স্থ নয়।

অনেক গুণী লোক আছে তারা বেদ-বেদান্ত পরিষ্কার মুখস্থ বলতে পারবে। "ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা কবিত্বঞ্চ গদ্যং সুপদ্যং করোতি/গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং।" তাহলে এ গুরু কোন গুরু? আত্মগুরু সচ্চিদানন্দগুরু—যিনি সর্বগুরুর মূলে, সর্বগুরু যাঁর প্রতিভাস। এই রাম, কৃষ্ণ এঁদের মহিমা শাস্ত্রের পাতায় লেখা আছে। এগুলো যারা পাঠ করেন তারা লোককে আনন্দ দেবার চেষ্টা করেন। লোকে শোনে, হৃদয় গলে যায়, কান্নাকাটি করে। প্রিয়জনের বিয়োগ হলেও কান্নাকাটি করে। কারও কোনও দুর্ঘটনা ঘটলেও কান্নাকাটি করে, বাড়িতে কারও কঠিন রোগ হলেও কান্নাকাটি করে। আবার নিজের শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হলেও কান্নাকাটি করে। অবশ্য প্রেমভক্তির যে অশ্রু তার একটা বিশেষ লক্ষণ আছে, আর বেদনাজাত যে অশ্রু তারও একটা লক্ষণ আছে। সবই কিন্তু অনুভূতির গভীরে ধরা পড়বে, আন্দাজে নয়। এখন কেন উদ্ধবকে পাঠিয়ে দেওয়া হল? শ্রীকৃষ্ণকে তারা ভগবান বা আপনজন বলে মনে করছিল ঠিকই। আপনজন বলে মনে করতে গেলে তো নিজের সঙ্গে অভিন্ন সম্বন্ধ হতে হবে। কিন্তু তা তো তখনও হয়নি। যদি হত তাহলে পাঠাতেন না। ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে এক সম্বন্ধ। এখন ভগবান নিজেই যদি ভক্ত সাজেন তাহলে খুব সুন্দর কথা এবং তা হল যুক্তিসম্মত। তাহলে নিজেকেই নিজে অন্তে খুঁজে পাবে। কিন্তু ভক্ত যদি ভগবান অতিরিক্ত কেউ হয় তবে সে ভগবানকে কী করে পাবে? কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে তা নয়। জ্ঞান এবং জ্ঞানী অভিন্ন। এই সূত্র ধরে ভক্ত এবং ভগবান অভিন্ন, কিন্তু তা অভিন্ন হয় কি? ভক্তির চরমে গিয়ে তা হতে পারে, সেইজন্য 'এ' ভক্তিকে রেখেছে অদ্বৈতজ্ঞানের পরে। আসক্তিকে 'এ' ভক্তি বলতে রাজি নয়। অদ্বৈতজ্ঞান আগে হবে, তার পরে ভক্তি কী জিনিস বোঝা যাবে। আত্মার প্রসঙ্গ আজকে এসেছে। এই আত্মাকে আমরা সবাই ভুলে বসে আছি। আমরা patch work করে, ঘুষ দিয়ে, দক্ষিণা দিয়ে কিছু আদায়

করার চেষ্টা করছি—যার কাছ থেকে যা পাওয়া যায়। এক জায়গায় দীক্ষা নিয়েছে, আর পাঁচ জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে অর্থাৎ এই সাধু, ঐ সাধু, ঐ দরগা—যদি কিছু পাওয়া যায় কোথা থেকে। আত্মা তো পাবার বস্তু নয়, কেননা আত্মা তো হারায়নি। Self is never lost, কারণ হারিয়ে কোথায় যাবে? আত্মা যে all-pervading, তাঁর তো যাবার জায়গা নেই।

বস্তু হারায়। আমরা মন দিয়ে যা-কিছু কল্পনা করি অর্থাৎ ভিন্ন কোনও বস্তুর ধারণাই হচ্ছে মনের কল্পনা। 'আপন ছাড়া যা-কিছু ভাবে মন/দ্বৈতবোধে সে করে যা গ্রহণ/সবই তার ক্ষণিকের স্বপন/ওঠে ভাসে ডোবে অন্তরে ক্ষণিকের তরে।' কত কল্পনা মানুষের মনে জাগে! শৈশব থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কল্পনার শেষ নেই। 'মনের ভাবনা বৈচিত্র্য কল্পনা/নামরূপের ধারা বিলাসরচনা/আমি তুমি ইহা উহা যতরকম ধারণা/আপন ভিন্ন নেই অন্য কোনও জন আপনার অন্তরে।' In the Self, Self alone exists. But non-Self cannot exist without Self. Mind cannot exist without Consciousness but Consciousness is beyond mind. 'বাক্যমনাতীতম্', 'একোঽহম্ দ্বিতীয় নাস্তি।' আত্মা নিজের সঙ্গে নিজে খেলা করে, দ্বিতীয় কেউ নেই। এই হচ্ছে Science of Oneness, that *is ছিন্নমস্তা। ছিন্নমস্তার রূপ দেখলে মানুষ heart fail করে যাবে। কিন্তু 'এর' কাছে ছিন্নমস্তা* এত প্রত্যক্ষ যে কী বলব আর! Science of Oneness—আত্মার ধর্মই হল তাই। সেইজন্য "সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।" "সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।" "সর্বতঃ পাণিপাদং"—অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপের *সর্ব জায়গায়ই তাঁর হস্তপদ। তাঁর কোথাও যেতে হয় না। হাত পা দিয়ে মানুষ চলে, কিন্তু* তাঁর চলতে হয় না। "স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।"

চৈতন্য 'সর্বব্যাপী আকাশবৎ নিত্যপূর্ণোঽহম্ স্বচ্ছ স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ স্বতন্ত্র স্বসংবেদ্যম্ স্বানুভবদেবম্'। কাজেই তা ইন্দ্রিয়াদি নিরপেক্ষ অথচ তারই বক্ষে স্বভাবের তরঙ্গ, লহরী, বুদ্‌বুদাদি ভাসে। জলের তরঙ্গ, লহরীর জন্য সমুদ্রের মহিমা খর্বিত হয় না। কাজেই আত্মার বক্ষে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জগৎরূপ তরঙ্গ ভাসলেও আত্মার কি ক্ষতি হবে? কাজেই আত্মা জগতের উপর নির্ভরশীল নয়। জগৎকে স্বীকার করলে আত্মবোধকে স্বীকার করা যায় না। Very pertinent প্রশ্ন! খুব কঠিন, সত্যিই খুব কঠিন! কিন্তু direct জগৎকে স্বীকার করলে আত্মাকে আর স্বীকার করা যায় না। আর আত্মাকে স্বীকার করলে জগৎকে খুঁজে পাওয়া যায় না, no, never—এটা অনুভূতির কত গভীরের রহস্য! কিন্তু তা directly প্রকাশ করা হচ্ছে কেন? It is the Reality. Reality-তে আমার-তোমার কোনও division নেই, no partial treatment। সেখানে কোনও monopoly-র ব্যাপার নেই, দল-মত-পথের কোনও ব্যাপার নেই, doctrine নেই, theory, thesis নেই। কী আছে? শুধু 'ever spontaneous evolving expression of Self-I/I-Consciousness'. 'স্বয়ং-এ স্বয়ং, পরমে পরম, আপনে আপন'। আমিসাগরে আমি-র বোধে ওঠে, ভাসে, ডোবে, নৃত্য করে আমি। অন্য বোধ ধরে

হবে না। কাজেই যত জীবনই হোক তা শুধু আমি-রই প্রকাশ। জীবের নিজস্ব কোনও পরিচয় নেই আত্মা ভিন্ন। কিন্তু এই পরিচয় জীব খেয়াল করে না। কারণ "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রমারূঢ়ানি মায়য়া।।"—আত্মমায়াতে অর্থাৎ মন তার নিজের আমারবোধ দিয়ে মানুষকে ঘুরিয়ে মারে, ভ্রমের চক্রে ঘুরিয়ে মারে। বারে বারে তার এই ভ্রমই হয়। যা আত্মা নয় তাকেই সে আত্মা মনে করে, যা আপন নয় তাকেই সে আমার বলে দাবি করে। This is সংসার।

'এর' কথার মধ্যে কোথাও কোনও flaw নেই। কেউ এই কথাগুলো বুঝতে না-চাইতে পারে, বুঝেও কেউ স্বীকার করতে বা মানতে নাও পারে, কিন্তু তাতে 'এর' কিছু এসে যাবে না। সে নিজেই নিজের সঙ্গে foul game খেলবে। নিজের ভিতরে নিজের আত্মাকে অস্বীকার যে করে সে তো নিশ্চয়ই ভুলের মাশুল দেবেই। জিজ্ঞাসা যদি করা যায়, তুমি আত্মা না অনাত্মা? কেউ নিশ্চয়ই বলবে না, আমি অনাত্মা। নিশ্চয়ই বলবে আমি আত্মা। আত্মা যদি হও তাহলে অনাত্মার সেবা করছ কেন? একজন ধর্মগুরু 'একে' বলেছিলেন, বাবা, তোমার মতো এরকম ঠ্যাঁটা একমাত্র তুমিই স্বয়ং, দ্বিতীয় আর কেউ নেই! তোমার প্রতিটি কথায় কথায় অমৃত ঝবে অথচ তুমি কিছুতেই কারওকে অনুসরণ কর না। উত্তরে তাঁকে বলা হয়েছিল, কাকে অনুসরণ করব? আত্মার মধ্যে তো আত্মা একা আছে, অনাত্মাকে তো আত্মা অনুকরণ করে না এবং করতেপারেও না। আত্মা তো একা/One। This One is not man-made one, মনোরঞ্জিত বা মনোকল্পিত একটা one নয়, eternal One. This is "একমেবাদ্বয়ম্" যেখানে অদ্বয় এক, secondless One, unmanifested Self-revealed One, Self-abiding One, অর্থাৎ স্বয়ং-এ স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ং-এ স্বয়ংপ্রকাশ।

এই আত্মার কথাই তোমাদের সামনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে নানা ভঙ্গিমায়। কেননা সমস্ত ভঙ্গিমাগুলি আত্মাকে কেন্দ্র করে আত্মার চারধারে ওঠে, ভাসে, ডোবে বারেবারে। কিন্তু আত্মা ছাড়া নয় তারা কেউ। সেইজন্যই দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত এবং প্রকৃতির সবকিছুর মূলে যে আত্মা, সেই আত্মা হচ্ছে Real I, One which is non-dual। কিন্তু অহংকারের আমি বহু—অনন্ত। সমুদ্রের মধ্যে যতগুলি বুদ্‌বুদ্ ওঠে প্রতিটি বুদ্‌বুদ্ পৃথক। কেউ হারিয়ে যেতে চায় না, কিন্তু ফেটে গেলেই সাগরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল। আমরা আমাদের অহংকারকে কিছুতেই হারাতে চাই না—কেউ না। একেবারে আঁকড়িয়ে ধরে থাকতে চাই, deadbody-কে নিয়ে পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। অজ্ঞানের কীরকম প্রভাব দেখ! এই মায়াকে বা অজ্ঞানকে নিয়েই মানুষ থাকতে চায়। অর্থাৎ নিজ অতিরিক্ত ভাবনাই কল্পনা বা মায়া। তা-ই অজ্ঞান বা মন। মনকে উল্টো করলেই মন খতম। মন—অর্থাৎ ম-ন উচ্চারণ করতে করতে ন-ম হয়ে যায়। ন-ম অর্থাৎ জ্ঞানী বলেন, ন মম—আমার কিছু নেই। জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জরা, ব্যাধি, সুখ, দুঃখ নেই। তাহলে কী আছে? 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং' 'সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলোঽহম্ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত

অজর অমর অপাপবিদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলোঽহম্।' অজ্ঞান তাঁর কাছে কোথা থেকে আসবে? কিন্তু মন হল দাস। যারা কল্পনার রাজ্যে বাস করে তারা সংসারের মধ্যেই থাকে। ঘুমিয়ে পড়লে কিন্তু কল্পনা আর থাকে না, মনও থাকে না, সংসারও থাকে না। ঘুম ভাঙলেই আবার আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু জ্ঞানীর তো ঘুম ভেঙে যায়, তাঁর তো ঘুম হয় না। জ্ঞানী এক-এই জেগে থাকেন, এক-এই বাস করেন। দ্বৈতের ঘরে জ্ঞানী বাস করেন না। কাজেই আত্মবোধই হচ্ছে জ্ঞানীর লক্ষণ, অনাত্মবোধ জ্ঞানের লক্ষণ নয় এবং তার জন্য মন দায়ী।

মন কী কামনা করে? নিজ অতিরিক্ত অনেক কিছু—ওটা নেই! আচ্ছা ওরকম করলে কী রকম হয়! ওখানে গেলে কীরকম হয়! ওকে এটা বললে কীরকম হয়! এটা না-করলে কীরকম হয়! এই সব নিয়েই মন চলছে—sense of otherness, this is the nature of mind। কাজেই জ্ঞানী এই মনকে উল্টো করে দেন অর্থাৎ তাঁর মনোনাশ হয়। কী ভাবে? আত্মা অনাত্মার বিচার দ্বারা অনাত্মাকে নাশ করেন। তিনি মনকে বলেন, কাম তোমাকে আমি আর তোয়াজ করতে রাজি নই। "কাম জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ কিল জায়সে। ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি।।" হে কাম, আমি তোমার চাতুরি জেনে গিয়েছি। I know your secret. "সংকল্পাৎ কিল জায়সে"—তুমি সংকল্পের মাধ্যমে, through thought process, through resolution you spread out and try to cover all, try to follow the same process। সেই process নিয়েই তুমি চলছ। কাজেই আমি তোমাকে সংকল্পই করব না, দেখি তুমি চল কী করে! I wont allow you. আমি তোমাকে permit না-করলে, আমি তোমাকে sanction না-করলে তুমি কী করবে? How can you proceed? খোরাক দেব না তোমাকে, বিনা খোরাকে খাবে কী? তখন আপনিই কাম শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়।

কাম সংকল্পের দ্বারা জাত হয়। সংকল্প না-করলে কাম থাকে না। আর কাম একবার জাগলেই সে চাইবে সব জিনিসকে আপন করে নিজের অধীনে পাবার জন্য, possession পেতে চায়। আজকে সারা দুনিয়াতে খালি এই competition যে, কে কতটা possession নিতে পারে, টাকা, বিষয়সম্পত্তি, সবার উপর আধিপত্য করা, দেশের উপরে, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের উপরে। This is the condition going on. কামের কীরকম খেলা চলছে সর্বত্র! আর যখন প্রতিহত হচ্ছে তখন ক্রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাম প্রতিহত হলে হয় ক্রোধ। এই দু'টি হল মায়ার চর, জ্ঞানীর পরম শত্রু। কামের মূল হচ্ছে ইন্দ্রিয়-মনে। কাম প্রতিহত হলে ক্রোধ জাগে। ক্রোধের উদয় হলে তার প্রতিক্রিয়া হয় স্নায়ু ইন্দ্রিয় প্রভৃতির উপর। সেগুলোকে অভিভূত করে দেয়, অসাড় করে দেয়। তাকেই বলে সম্মোহ। সম্মোহের আধিক্যবশত স্মৃতিনাশ হয় অর্থাৎ বোধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ব্যাহত হয়। তার ফলে জীবনের নাশ নয়। কাজেই এই কাম ও ক্রোধকে নিরসন করতে গেলে ইন্দ্রিয়-মনের সংযম দরকার। সংযত ইন্দ্রিয়-মনে আত্মবোধের প্রকাশ সহজ হয়। আত্মবোধের উদয় হলে অনাত্মবোধের প্রভাব আর থাকে না। আত্মবোধের আবরণ যে অনাত্মা তা-ই হল 'আমার, আমার ভাব' বা কল্পনা। তার দ্বারা আমিবোধ

প্রতিহত হয়, ব্যাহত হয়। ইন্দ্রিয়-মনের সংযম বিচারপূর্বক সাধিত হলে অনাত্মা বা আমারবোধের প্রভাব কমে এবং আত্মার আমি স্বতঃস্ফূর্ত হয়। কাম বাধা পেলেই ক্ষেপে উঠবে।

প্রসঙ্গকে পরিষ্কার করে বলা যায়—কামের অনেকগুলো সহচরী আছে। ক্রোধ হল তার প্রধান। সঙ্গের থেকে আসে কাম। সঙ্গ হয় দ্বৈতবোধে। দ্বৈতবোধ হয় অজ্ঞান থেকে। সঙ্গের থেকে হয় কাম, কাম বাধা পেলে হয় ক্রোধ, ক্রোধের থেকে হয় সম্মোহ অর্থাৎ বেশি ক্রোধ হলে আমাদের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে কতগুলো secretion হয়, মাথার থেকে আরম্ভ করে পা পর্যন্ত, ভিন্ন ভিন্ন organ-এর মধ্যে কতগুলো secretion হয়। সেগুলো poisonous, তার ফলে সমস্ত system-কে তা affect করে। ক্রোধের পরে দেখবে একটা নিস্তেজ ভাব আসবে। তার মানে সমস্ত system-কে তা সঙ্গে সঙ্গে weak করে দেয়। ক্রোধের পরে ইন্দ্রিয়গুলি নিস্তেজ হয়, মন নিস্তেজ হয়, heart-এ palpitation হয়, তার ফলে মাথা ঘোরে, pressure বেড়ে যায়, tension বেড়ে যায় এবং organic কতগুলি disorder সৃষ্টি হয়। এই হচ্ছে ক্রোধের প্রতিক্রিয়া। তার মানে সম্মোহ আসছে। সম্মোহ এলে স্মৃতিভ্রম হয়ে গেল। তখন আর আত্মস্মৃতি জাগে না, বিষয়স্মৃতিও জাগে না, এই অবস্থাকে স্মৃতিভ্রংশ বলা হয়। অর্থাৎ তুমি কোনও জিনিস স্মরণ করতে পারছ না, বিস্মৃতি হয়ে যাচ্ছে, ভ্রান্তি এসে যাচ্ছে। ফলে কী হচ্ছে? স্মৃতিবিভ্রম। স্মৃতিভ্রষ্ট হলেই বুদ্ধিনাশ হয়ে গেল। বুদ্ধি আর রাজত্ব করতে পারবে না তখন। বুদ্ধিনাশ হয়ে গেলে শেষ হয়ে গেল। "ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।" সংসারে এই দৃশ্য দেখেও কিন্তু আমাদের চেতনা হয় না, আমরা তার মধ্যেই বাহাদুরি করি। অহংকারকে কেমন ভাবে আমরা পুষি 'আমার আমার বোধ' দিয়ে!

'আমারবোধকে' পোষা, সংসারকে পোষা, সংসারী হওয়া আর মনকে তোয়াজ করা এক কথাই। এখানে কিন্তু আত্মার সেবা হচ্ছে না। কিন্তু আত্মজ্ঞানী এগুলোকে স্বীকার করেন না। কেন করেন না? তাঁর কাছে আত্মা অতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই। In Reality Atmaa (I Consciousness) alone exists and no second entity. আমরা বৈচিত্র্য দেখছি শুধু মনের ভ্রান্তির জন্য। যাঁর মন স্থির বা শান্ত অর্থাৎ প্রজ্ঞা যাঁর স্থিত হয়েছে, স্থিতপ্রজ্ঞ যিনি, যাঁর ব্রাহ্মীস্থিতি হয়েছে তিনি কিন্তু এই বৈচিত্র্য দেখে বিচলিত হন না। All sensual perceptions are not real, they are delusive, illusory. Magician-এর magic-এর কথা কাল বলা হয়েছিল। Magic is enjoyable but unreal, so is the universal panorama, it is also a magical game. The Creator, the Master is playing the master game or magical game—যেখানে এক-এর মধ্যে বৈচিত্র্য দেখাচ্ছে। Oneness appears to be manifold, diversified—this is game, this is illusion in the light of Knowledge of Oneness. এখানে অনেকেই বলতে পারে যে, আপনি তো খুব বড় বড় কথা বলছেন, আমরা সংসারের জ্বালায় পুড়ে মরছি। 'এ' সংসারের picture-টা পাশাপাশি রাখছে। জ্বলে পুড়ে মরছ, কারণটা খোঁজ। কেন জ্বলবে, why? ভুলটা শোধন

কর। Find your mistake. ভুল অঙ্ক হলে ভুলটা শোধন কর, না-হলে নম্বর দেবে না। সদ্‌গুরু যদি আমার ভ্রান্তি দূর করতে না-পারলেন তবে তিনি কীসের সদ্‌গুরু!

আজকে তোমাদের সামনে 'এই শরীরটা' উপস্থিত হয়েছে, তোমরা দেখছ। কিন্তু 'এই শরীরটাকে' যে কত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে তা তোমরা জান না। 'একে' কত opposition face করতে হয়েছে জান? কিন্তু কারওকেই কখনও বলা হয়নি যে, তোর ক্ষতি হোক! যে যতই ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে, যতই 'এর' বিরুদ্ধে আচরণ করেছে, মন্তব্য করেছে, অপমান করেছে—শুধু বলা হয়েছে, তোর কল্যাণ হোক! তোর মঙ্গল হোক! তুই সুখে থাক! এ কথা শুনে তারা বলেছে, ইনি কীরকম! এইরকম ভাবে আমি তাঁকে অপমান করলাম অথচ তিনি আমার কল্যাণ কামনা করছেন! কী রকম মানুষ, কোনও তাপ-উত্তাপ নেই! আসলে রাগটা করব কার উপর? এই যে Oneness-এর কথা এতক্ষণ বলা হল তাহলে কি সবই ফাঁকি? সাধুসন্তরা বলেছেন, তুমি দীক্ষা দিচ্ছ না কেন? তোমার কাছে এত লোকজন আসে, এ কী করছ তুমি? উত্তরে তাঁদের বলা হয়েছিল, 'এ' কাকে দীক্ষা দেবে? দীক্ষা কাকে বলে 'এ' তা জানে না। 'এ' একেবারে সত্যিই মূর্খ। 'এ' কিছুই জানে না। তোমরা বল দেখি কাকে দীক্ষা বলে? 'এ' 'এর' থেকে ছোটও কারওকে পায়নি, আবার বড়ও কারওকে পায়নি। 'এ' কী করবে বল? সেইজন্যই তো 'এ' মূর্খ। তোমাদের মতের সঙ্গে 'এর' মিলবে না। তোমরা সংখ্যায় বেশি—গণতন্ত্র! 'এ' তো single। কিন্তু, 'যা কিছু আছে, আমার ছিল, আমার আছে, নই গো ঋণী আমি কারও কাছে।' 'এ' ঋণী নয়। ঋণ করলে ঋণ শোধ করতে হবে। 'এ' কার কাছে ঋণ করবে? 'এ' তো নিজেকে ছাড়া দ্বিতীয় কারওকে খুঁজে পায়নি। দ্বিতীয় কারওকে খুঁজে না-পেলে 'এ' কী করবে! তা বলতে পার, আমরা এতজন এখানে বসে আছি, কিন্তু আপনি কি আমাদের উদ্দেশ করে কথাগুলো বলছেন? আমিই বলছি, আমিই শুনছি। Here I stands alone. বোধের বক্ষে বোধই ওঠে, বোধই সেই বোধকে অনুভব করে, দ্বিতীয় কেউ নয়। বুদ্ধি কিন্তু আর মাথা গলাতে পারবে না। বুদ্ধির যতটুকু শক্তি তাও ঐ আমি-র কাছ থেকে পাওয়া। আবার যখন হারিয়ে যাচ্ছে তখন আমি-র কাছ থেকেই supply-টা আসছে।

যাই হোক, আত্মার কথা বলতে বলতে কালকে মনের কথা বলা হয়েছিল, আজকে আত্মার কথা একটুখানি বলা হল। মনে যে মল আছে, অর্থাৎ মনের যতরকম জারিজুরি এই আত্মার প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে তা আস্তে আস্তে কমে আসবে। তখন মানুষের দুশ্চিন্তা কমবে, দুর্ভাবনা কমবে—কারণ এগুলি হচ্ছে মনের parasite। এগুলো না-কমলে মন তো শান্ত বা স্থির হবে না। যোগীরা চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করার জন্য কতরকম ক্রিয়াকলাপ করেন—দেহের জন্য আলাদা, প্রাণের জন্য আলাদা এবং মন ও বুদ্ধির জন্য আলাদা আলাদা। দেহের জন্য কতরকম আসন, কতগুলি নিয়ম পালন করেন তাঁরা। আহার সংযম, নিদ্রা সংযম, সঙ্গ সংযম, কর্ম সংযম ইত্যাদি তাঁরা অভ্যাস করে থাকেন। প্রাণের জন্য প্রাণায়াম করেন, মনকে তাঁরা শাসন করেন, নির্জনে বসে মনকে শান্ত করেন, অর্থাৎ চিন্তাশূন্য হয়ে যান—এককথায়

relax করেন, একেবারে complete relaxation, no thoughts at all, তা good-ই হোক আর bad-ই হোক। আত্মজ্ঞপুরুষ বলেন, মুক্তির জন্য কেন সাধনা করব? আত্মা তো নিত্যমুক্ত, আমি তো আত্মা। কী সুন্দর কথা। আমি আত্মা। আমি কেন মুক্তির জন্য ভাবনা করব? আমি তো নিত্যমুক্ত। আমি দেহ নই, আমি ইন্দ্রিয় নই, আমি প্রাণ নই, আমি মন নই, আমি বুদ্ধি নই, আমি অহংকার নই, আমি চিত্ত নই, আমি প্রকৃতি নই, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলম্। তাহলে এগুলো কি আর দরকার নেই? আমার এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। তাই বলা হয়েছে—

> 'নাহং দেহো ন মে দেহো নাহং প্রাণো ন মে প্রাণঃ
> নাহং মনো ন মে মনো নাহং বুদ্ধিঃ ন মে বুদ্ধিঃ
> নাহং অহংকারো ন মে অহংকারো নাহং জীবো ন মে জীবত্বম্
> সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলম্ স্বানুভবদেব স্বয়ম্।।'

(আমিতত্ত্ব)

"কোঽহম্?" 'সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলোঽহম্।' মানে আমি দেহ নই, দেহ আমার নয়। কী সুন্দর কথা। আমি প্রাণ নই, প্রাণ আমার নয়। আমি মন নই, মন আমার নয়। আমি বুদ্ধি নই, বুদ্ধি আমার নয়, বুদ্ধিরও আমি নই। আমি অহংকার নই, অহংকারও আমার নয়, অহংকারেরও আমি নই। আমি চিত্ত নই, চিত্তও আমার নয়, চিত্তেরও আমি নই। আমি জীব নই, জীবত্বও আমার নয়। আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবল স্বানুভবদেব স্বয়ং। কিন্তু এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভাবনার মধ্যে তো অন্য ভাবনা নেই, তাহলে সংসার কী করে থাকছে? এখন তোমরা 'একে' প্রশ্ন করতে পার ঠকাবার জন্য বা 'একে' জব্দ করার জন্য যে, তাহলে আপনি আমাদের সামনে এতগুলো কথা বলছেন কেন? 'I' (Consciousness) is playing with Myself (I-Consciousness). Self (Consciousness) is playing with Self, not with non-self. Non-self 'এর' একটা কথাও নেবে না। Self নেবে, মন নেবে না। মন দিয়ে নিজে কায়দা করে যখন ব্যবহার করতে যাবে তখন ঠকে যাবে। কারণ আগেরটা পাবে না খুঁজে, পরেরটাও পাবে না। 'এর' অনেক কথাই অনেকে চুরি করে নিয়ে, ভাবের ঘরে চুরি করে ব্যবহার করতে গিয়ে আটকে গিয়েছে। এখন দোষ দিয়ে বলে, ওনার কথা শুনে এই করতে গিয়ে আমার এই হল! উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল—'এ' তো তোমাকে এই করতে বলেনি, তোমাকে কে বলল করতে? 'এ' তোমাদের তো কোনও direction দেয়নি। 'এ' তোমাদের সত্য পরিচয়টা শুধু বলে যাচ্ছে। 'এ' একবারও বলছে না, you have to do this or you don't do this। তা তো অহংকারের কাজ, কিছু করা অথবা কিছু না-করা is the function of অহংকার। You are not ego, then why should I give such a direction to you? যে দেয় দেবে, 'এ' তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

প্রথমেই গানের মধ্যে বলা হয়েছে, 'নমো নমস্তে গুরবে মহাত্মনে বিমুক্ত সংজ্ঞায় সদুত্তমায় নিত্যাদ্বয়ানন্দ রসস্বরূপিণে'—মানে the Highest Good। তাঁর উপরে আর good নেই,

'এ' সেই গুরুর কথাই বলছে। নিত্য অদ্বৈততত্ত্বায়—যিনি অদ্বয়তত্ত্বস্বরূপ; বিমুক্তায়—অর্থাৎ যিনি ever-free, যাঁর মুক্তির জন্য কিছু করতে হয় না; নির্গুণায়—তিনি গুণাতীত ভাবাতীত দ্বন্দ্বাতীত ভেদাতীত; যৎকটাক্ষ—যাঁর দৃষ্টিতে সব বোধমাত্র, অর্থাৎ বোধের দৃষ্টিতেই সব দেখেন; শশীসান্দ্র—চন্দ্রমা, অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদ যেমন স্নিগ্ধ, মনোরম, চারদিকে তাঁর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছে সবার উপরে, একই জ্যোতিতে সবাইকে তিনি জ্যোতিষ্মান করছেন, কমবেশি আলো দিচ্ছেন না; চন্দ্রিকাপাতধৃত—তাঁর জ্যোতিতে ভবতাপ অর্থাৎ world fever দূর হয়—আধিভৌতিক, অধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এসব। অর্থাৎ the light of Knowledge of Oneness dissolves all contradictions, all functions of manyness of mental thoughts and intellectual exercises। ভবতাপ অর্থাৎ ভবের এই যে চিন্তা, রূপ-নাম-ভাবের যে চিন্তা তা দূর হয়ে যায়। 'প্রাপ্তবানহমখণ্ডবৈভবম্' তার ফলে কী হচ্ছে? আমি আমার অখণ্ড বৈভবস্বরূপে অর্থাৎ অদ্বৈতস্বরূপে আমি নিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছি।

আত্মবোধের দ্বারা আত্মবোধই জাগ্রত হয়, অনাত্মবোধ জাগে না। Self-Knowledge reveals the Self-Knowledge alone and none else. 'ধন্যোঽহম্ কৃতকৃত্যোঽহম্ পূর্ণোঽহম্ ভবগ্রহাৎ'—অর্থাৎ ভবসাগরে যে হাঙর, মায়ারূপ যে হাঙর, অর্থাৎ ভ্রমরূপ যে হাঙর, ভ্রান্তিরূপ যে হাঙর, যা মানুষের দুঃখকষ্টের কারণ, এই অহংকাররূপ যে হাঙর তার থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছি আমি। অর্থাৎ আমি অহংদেব, আমি অহংকার নই। Follow Me, I am talking about your Real-I, not about your ego which is responsible for your mundane existence. তোমার পার্থিব জীবনের জন্য দায়ী হচ্ছে তোমার অহংকার। আর ঐ অহংকারের থেকে মুক্ত হবার জন্য যা প্রয়োজন তা হল তোমার আত্মদেব পুরুষোত্তম who is ever-free from all these demerits. It is formless. 'নিষ্ক্রিয়োঽস্মি, অবিকারোঽস্মি, নিষ্কলোঽস্মি নির্বিকল্পোঽস্মি নিত্যোঽস্মি নিরবলম্ব।' কথাগুলো খুব কঠিন। নিষ্ক্রিয়োঽস্মি—আত্মার কোনও কর্ম নেই। অবিকারোঽস্মি, নিষ্কলোঽস্মি—partless, I am not part at all, because I am indivisible One, the Absolute whole। নিষ্ক্রিয়োঽস্মি অবিকারোঽস্মি নিষ্কলোঽস্মি নিরাকার—I am changeless, I am the Absolute. Universe of innumerable numbers rises, dances, exists and dissolves just like the bubbles of the ocean. আমি-র বক্ষে অনন্ত অনন্ত বিশ্ব ওঠে, ভাসে, ডোবে। 'এ' সেই আমি-র কথা বলছে তোমাদের কাছে। দেবদেবীর আমি এবং সবার আমি তাঁর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

'এ' আত্মার আমি-র কথা বলছে। অ-তম—আত্ম (আত্মা)। তা নির্বিকল্প, কোনও বিকল্প নেই, alternative নেই এবং নির্দ্বয়—দুই নেই সেখানে। এই আমি 'কেবল অখণ্ড বোধোঽহম্ আনন্দোঽহম্ নিরন্তরম্'। 'কেবল অখণ্ড বোধোঽহম্'—এই অহংদেব কেবল বোধস্বরূপ আনন্দস্বরূপ অনন্ত মহান। এই আমিকে ভুলে থাকা মনের ধর্ম। এই মনের ধর্ম পালন করে যারা তারা সংসারী। আর আত্মার ধর্ম পালন করে যারা তাঁরা সমসারী। তাঁদের কিন্তু কোনও বিকার নেই। জাগতিক কোনও ঘটনা তাদের কিন্তু upset করে না। ভাবতে পার যে, কী

হারিয়ে আমরা কী নিয়ে আছি! আমরা অনেককিছু জানি, আবার অনেককিছু জানি না। লাভ কী হল তাতে? কাজেই এভাবেই আমাদের জীবন চলে। We know so many things, we know not so many things. তাহলে জ্ঞান আর অজ্ঞানের মধ্যে বাস করছি আমরা! No, rise above! You are not born, so you have no death at all or one who is not born has no change at all. One who is unchangeable is indivisible, infinite One. কথাগুলো follow কর! একটা মূর্খ মানুষ তোমাদের সামনে এসেছে, 'এ' তো লেখাপড়া শেখেনি। সে কী বলে যাচ্ছে! পার তো তোমাদের অধীত বা পঠিত জ্ঞান দিয়ে resist কর। 'এ' আপত্তি করবে না, 'এ' সব মেনে নেবে। Book-knowledge is undone. তোমার পার্থিব যে experience তা কোনও কাজে লাগবে না। কিন্তু এই আত্মজ্ঞান যখন লাভ করবে তখন দেখবে everything will be solved. Nothing can stir up your true nature which is absolutely One without a second. এক-কে কে নাড়া দেবে? Base-কে কে নাড়া দেবে? Substance-কে কে নাড়া দেবে? Essence-কে কে নাড়া দেবে, বল? কে ধরবে তাকে? কাজেই নিজেকে degrade করবে না। "নাত্মানমবসাদয়েৎ"—আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করো না, দেহস্থ করবে না, "দেহস্থোঽপি দেহাতীতম্"। তুমি দেহের মধ্যে থেকেও দেহাতীত। যেমন এই ঘরের আকাশ আর বাইরের আকাশের মধ্যে কোনও তফাত নেই। দেওয়াল ভেঙে দিলে কোনও তফাত থাকবে না—all are same. So is the Self within and so is the Self above and all around. The Consciousness is all-pervading, indivisible, nothing can make any division there. আর division তৈরি করলে তা বোধ দিয়েই করতে হবে, বোধ দিয়েই তাকে ব্যবহার করতে হবে।

You cannot go above your Consciousness. এই robust science-টা মানুষ ভুলে গিয়েছে। কত অবান্তর জিনিস education-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সত্য সেখানে ঢোকাবে না। কথাপ্রসঙ্গে একবার বলা হয়েছিল, ঠিক আছে বাবা চল, কোই বাত নেহী! A time will come when you will follow this. I know that each and every individual life in the world will have to follow this science one day in order to get rid of all the troubles in life. জীবনের সমস্ত রকম ভ্রান্তি, দুঃখকষ্ট সব কিছু অতিক্রম করার জন্য তোমাকে এই science নিতেই হবে। This is the only panacea, this is the only medicine which can save you from all sorts of calamities. কাজেই এই নিজবোধটাই তোমাদের সামনে পরিবেষণ করা হচ্ছে। তোমার মন কী করবে তুমি বুঝে দেখ! 'এ' কিন্তু এর বেশি কিছু বলবে না।

নিজবোধে অর্থাৎ স্ববোধে শুধু নিজবোধ বা আপনবোধই থাকে, অন্য বোধ থাকে না। এই নিজবোধ হল স্ববোধ, আপনবোধে হয় তার ব্যবহার। স্ববোধের প্রতিভাস হল স্বভাব, অন্তঃকরণ, মন/বুদ্ধি। স্বভাবের ব্যবহার হয় গুণ-উপাধিযোগে। সেইজন্য তার ব্যবহার বৈচিত্র্যময় হয়। আপনবোধে নয়, 'আমার-আমাব বোধে' তার ব্যবহার হয়। এই 'আমার-আমার বোধের' ব্যবহারে মনের প্রাধান্য বেশি থাকে বলে কামনা, কল্পনা, ভুলভ্রান্তি অধিক

থাকে। মনের ব্যবহারে ভাবের মিশ্রণ, ভুল, মিথ্যা ও অন্যথা থাকবেই। স্ববোধের ব্যবহারসিদ্ধির জন্য মনের পৃথক ব্যবহারিক ধর্ম পরিহার করতে হয়। তাহলে আত্মবোধ স্বতঃস্ফূর্ত হয়। গানের ভাষায় বলা হয়েছে—

ভুলো না মন ভুলো না স্বরূপ আপন ভুলো না।।
সদানন্দ চিদানন্দ প্রেমানন্দ স্ববোধ আত্মা
স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ অখণ্ড ভূমা।।
নির্বিকার নিরাকার নির্বিকল্প নিরবলম্ব
নিষ্কল নির্মল নিষ্ক্রিয় নিত্যাদ্বৈত নির্বাসনা।।
ভাবাতীত দ্বন্দ্বাতীত ভেদাতীত গুণাতীত
শাশ্বত অচ্যুত প্রশান্ত অমৃত
নিরাধার সর্বাধার সর্বাকার সর্বাত্মা
স্বানুভবদেব ঈশ্বর অক্ষর ব্রহ্মবোধলক্ষণা।

(বাগেশ্রী—ঝাঁপতাল)

মনের কাছে জোর করা হল না। মনের কাছে রাখা হল মনের স্বরূপ, তার কী করতে হবে তা-ই বলে দেওয়া হল। তোমরা সংসারে অনেক কিছু নিয়ে মাতামাতি কর। কিন্তু 'এর' কাছে যা শুনছ তা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু যার কণামাত্র যদি তোমাদের ভিতরে জাগে তাহলে তোমরা নিজেদের মুক্তস্বরূপ আনন্দস্বরূপ পূর্ণস্বরূপ অনুভব করতে পারবে, যার মধ্যে সত্যিই কোনও বিকল্প নেই। ছোট্ট গান—এগুলো হচ্ছে formula। এই formula-র মধ্যে দিয়েই এগুলো রেখে দেওয়া হচ্ছে। কার জন্য? পৃথিবীর সব মানুষের জন্য। 'এ' জাতি জানে না, বর্ণ জানে না, লিঙ্গ জানে না, সম্প্রদায় জানে না, মত-পথ জানে না। All these are meaningless to Me. These are all man-made. মানুষ অন্যের উপর আধিপত্য করার জন্য, rule করার জন্য, নিজেকে জাহির করার জন্য এগুলো সৃষ্টি করে অপরকে exploit করে চলেছে। তাই বলা হয়েছে, the entire humanity has been exploited by three classes of people. (1) So-called spiritual leaders, who have not realized the truth but talk of the truth and exploit the humanity in the name of duality and relativity, (2) So-called political leaders who never love the country and the countrymen but exploit them as much as they can during their lifetime and (3) So-called economists and businessmen who never love the country and countrymen, but talk of industry and its progressive development. They talk of social and economical advancement. But in reality they exploit the people. As a result of that they increase the price level of daily necessary commodities. Price level of everything at present is so high for the common people that they cannot manage to meet their daily expenses. There is depression of mind, there is disorder, indiscipline

and chaos in the society. All these motivated and self-interested leaders are the cause of sufferings and unhappiness of common people. All these happen owing to the lack of Self-Conscious Awareness. Only with the cultivation of Right Knowledge i.e. Self-Consciousness all such problems can be solved and overcome.

'এ' জানে যে এ কথা openly বললে, I will be beheaded। 'এ' বহুবার জগতে beheaded হয়ে চলে গিয়েছে। But I don't care. Crucifixion is the reward that man can give Me and I am ready to accept it. But in exchange of crucifixion যদি মানুষ সামান্য একটুখানি এই কথার মূল্য দিতে পারে তাহলে সে saved হয়ে যাবে। কীসের থেকে? এই world calamity, tension, মৃত্যুভয়, এই যে মানুষের ভ্রান্তি, অশান্তি, দুঃখকষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা ইত্যাদি থেকে। এগুলো সবই স্বভাব কল্পনা। কল্পিত কল্পনার জালে মানুষ জড়িয়ে আছে। এই জালের থেকে বেরিয়ে আসার this is the only panacea, আর কোনও রাস্তা নেই। "নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়"—এছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা নেই। এখানে 'এ' গুরুগিরি করতে আসেনি, কাউকে 'এ' exploit করতে আসেনি। তোমার ভাল লাগতে পারে, নাও লাগতে পারে—that depends upon your mind. But try to follow the essence of My words. This will not mislead you, delude you, but this will save you from your misunderstandings and from your lifelong sufferings. সেইজন্যই প্রতিদিন তোমাদের কাছে অল্প সময়ের জন্য বসে আত্মবোধের লীলা অর্থাৎ 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং' পরিবেষণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে একটি গানে আছে—

ওগো আপন আপনে আপন
ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম সনাতন।।
স্ববোধে স্বভাবে স্বভাবে স্ববোধে আপন
স্বানুভবসুধা কর আস্বাদন
সচ্চিদানন্দঘন সদসৎ বিলক্ষণ
শাশ্বত অচ্যুত অমল চিরন্তন।।
ওগো আপন স্বরূপ মম
অখণ্ড ভূমা পূর্ণ সর্বসম
অন্তর বাহির শূন্য অনন্য স্বয়ং
পরমতত্ত্ব নিত্যাদ্বৈত অকারণ কারণ।।
প্রশান্ত অনন্ত নিঃসীম নিস্পন্দন
নিষ্কল নির্মল নিরবদ্য নিরঞ্জন
সত্য জ্ঞানানন্দ সত্য অনুপম
নাহি হেয় উপাদেয় সত্য গগনোপম।।

(খাম্বাজ—কার্ফা)

আজকে এখানেই সচ্চিদানন্দ করা হচ্ছে।

মন্তব্য ঃ

দশম বিচারের বিষয়বস্তু হল জীবনে সদ্‌গুরুর একান্ত প্রয়োজন অনুসারে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর কাছ থেকে আত্মবোধের অনুশাসন প্রার্থনা করা এবং তার যথার্থ অনুশীলন দ্বারা আত্মবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। বোধময় আমিসত্তা বা আমিময় বোধসত্তার বক্ষে তার অবিরাম সত্তাস্ফূর্তি বোধের দৃষ্টিতে বা আমি-র দৃষ্টিতে অর্থাৎ আপনবোধের দৃষ্টিতে নিজেরই পরিচয়, আত্মার আমি-রই পরিচয়। কিন্তু বৈচিত্র্যময় প্রকাশের দৃষ্টিতে অর্থাৎ স্বভাব মনের দৃষ্টিতে মনের কল্পনাবিলাস। তাতে বৈচিত্র্যময় রূপ-নাম-ভাবের সর্বপ্রকাশই পরস্পর হতে পৃথক ও ভিন্ন বলে প্রতীত হয় ইন্দ্রিয়-মনের কাছে। প্রতি জীবের মধ্যে বোধের দ্বিবিধ প্রকাশ ও খেলা নিরন্তর হয়ে চলেছে। তাদের সমষ্টির এককরূপই হল জগৎসংসার। জীব তথা মানুষের মধ্যে স্ববোধসত্তা ও স্বভাবসত্তা নিত্য অভিন্ন ও এক হওয়া সত্ত্বেও তা জীবের কাছে সহজে অনুভবগম্য হয় না। মানুষের কাছে তার স্বভাবের বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্যবশত অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে ইন্দ্রিয়-মনের মাধ্যমে জীবের অহংকার স্বকল্পিত মনোবিলাসের অধীনে জীবন কাটায়। তা-ই হল তার সংসারধর্ম। সংসারযাত্রায় নিজ অতিরিক্ত মানসকল্পিত নাম-রূপের গুরুত্বই প্রধান। নাম-রূপের কল্পনা ও অনুভূতি ভ্রান্তিমূলক ও মিথ্যা। মন-বুদ্ধি তা বোঝে না, তাকে সত্য বলে ভাবে ও জানে। তার ফলে তাকে বহুবিধ দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। স্বভাবাধীন অর্থাৎ মনাধীন জীবনই হল দেহবদ্ধ সংসারী ভোগী জীব। অজ্ঞানজাত ভেদজ্ঞানই তার কারণ। স্বকল্পিত কল্পনাই হল তার অজ্ঞান। নিজবোধ বা আপনবোধ হল অভেদজ্ঞান। অভেদজ্ঞান হল সত্য শুদ্ধ আত্মা, ভেদজ্ঞান হল অনিত্য মিথ্যা অজ্ঞান অনাত্মা। অনাত্মপ্রীতি হল মনের ধর্ম এবং আত্মপ্রীতি হল স্ববোধের বা নিজবোধের ধর্ম। স্বভাব দ্বারা পরিচালিত জীবন অজ্ঞান বা অনাত্মার সেবায় রত থাকে, সতত দেহবুদ্ধি নিয়ে চলে সে। নিজের দিব্য অমৃত মুক্ত শান্তিস্বরূপ সে অনুভব করতে পারে না। তার অন্তরায় হল তার স্বভাবজাত অনাত্মপ্রীতি। অনাত্মপ্রীতি হয় দ্বৈতবোধে ভেদজ্ঞানে। আবার আত্মপ্রীতির অনুশীলন দ্বারা অর্থাৎ আপনবোধের অনুশীলন দ্বারা তার অনাত্মপ্রীতির নিরসন হয়।

আত্মপ্রীতির অনুশাসন আত্মজ্ঞগুরুর কৃপাতেই সিদ্ধ হয়। সেইজন্য সংসারে দেহসর্বস্ব জীবের হৃদয়ে যে নিজবোধরূপ আত্মা আছে তাঁর বোধ বা জ্ঞান লাভ করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় বা বিধানই হল আত্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁর উপদেশ অনুসারে চলা। তা হলে নিজের মন-বুদ্ধির প্রভাব হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব এবং আত্মবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজসাধ্য।

২১/১২/০১

।। একাদশ বিচার।।

অখণ্ড ভূমা পূর্ণং বিশুদ্ধ চিদ্ একরূপম্
বুদ্ধয়াদি সাক্ষী সদসৎ বিলক্ষণম্
অহং পদ প্রত্যয় লক্ষিতার্থম্
প্রত্যগ সদানন্দঘন ব্রহ্মাদ্বয়াস্মি অহম্
নিষ্কলং নির্মলং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্
শাশ্বতং সনাতনম্ অহংদেব পুরুষোত্তম।।

(ভূমাতত্ত্ব)

এই বিশুদ্ধ চিদ্ অর্থাৎ চৈতন্য, তার মধ্যে কোনও মিশ্রণ নেই। মিশ্রণ না-হলে সৃষ্টি হয় না। কাজেই সৃষ্টির কল্পনা একটা বিকল্প ভাবনা। কেননা আদিতে সৃষ্টি ছিল না, অন্তেও সৃষ্টি থাকবে না, মধ্যে যে সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় মানুষের হয় তা কল্পনা। কল্পনা না-করতে পারলে সৃষ্টি হয় না, যেমন খাঁটি সোনার সঙ্গে খাদ না-মেশালে গয়না তৈরি করা যায় না। বিশুদ্ধ চিদ্-এর সঙ্গে কী খাদ মেশানো হল? তা হল মায়া, শক্তি, প্রকৃতি, কল্পনা। সৎ-এর সঙ্গে এই মায়ারূপ খাদ না-মেশালে স্রষ্টা-সৃষ্টি হয় না, স্রষ্টার কাজে সাহায্য করার জন্য দেবদেবীদের উৎপত্তিও সম্ভব হয় না। তার পরে এই মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা কোনও কিছুই সম্ভব হয় না। সবই শক্তির gradation-এর সঙ্গে, কল্পনার gradation-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে চৈতন্য প্রতিভাত হয়। চৈতন্যের কিন্তু কোনও ক্ষতি হয় না। সেই চৈতন্য মানুষের মধ্যে আত্মারূপে, সর্ব বস্তুর মধ্যে সত্তারূপে সবসময়ই প্রকাশমান। তার মধ্যে শক্তির gradation, ভাবযুক্ত হয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

এই ভাব মূলত তিন প্রকার। সত্ত্বপ্রধান, রজোপ্রধান এবং তমোপ্রধান। সত্ত্বপ্রধানকে সাত্ত্বিক, রজোপ্রধানকে রাজসিক এবং তমোপ্রধানকে তামসিক বলা হয়। চৈতন্য বা জ্ঞানের সঙ্গে তমোগুণ যখন মিশ্রিত হয় তখন তা হয় জ্ঞেয় বা দৃশ্য। আমরা যে দৃশ্যগুলি দেখি বা আমাদের জানার যে বিষয়বস্তু—জ্ঞেয়, মানে object of knowledge তা হল তামসিক। সক্রিয়তা, কার্যাদি, প্রকাশাদি—এগুলো হল রজোগুণ। চৈতন্য বা জ্ঞানের সঙ্গে রজোগুণ যখন মিশ্রিত হয় তখন তা জ্ঞাতা বা কর্তা সেজে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। আর সত্ত্বগুণ হচ্ছে প্রকাশধর্মী। আবার চৈতন্য বা জ্ঞানের সঙ্গে সত্ত্বগুণ যখন মিশ্রিত হয় তখন তা জ্ঞানরূপে (জ্ঞানাভাস) প্রকাশ পায়। কাজেই সত্ত্বগুণ প্রকাশধর্মী, রজোগুণ ক্রিয়া ও বৈচিত্র্যধর্মী এবং তমোগুণ হল জড় বা অপ্রকাশধর্মী। এই তিন গুণের তিন ধর্ম চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত হলেই

প্রকাশ পায়, নতুবা নয়। কাজেই আমাদের যত কার্যাবলী সবই রজোগুণের কাজ, আর সবকিছুকে প্রকাশ করছে যা তা হল সত্ত্বগুণ। কিন্তু সত্ত্বগুণ তো নিজেকে নিজে প্রকাশ করতে পারে না, তা চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েই প্রকাশিত হয়। চৈতন্য কিন্তু গুণের সঙ্গে যুক্ত হলেও গুণমুক্ত। তা-ই মানুষকে আবিষ্কার করতে হবে। মানুষের মধ্যেই ত্রিগুণের প্রভাব অর্থাৎ তামসিক, রাজসিক এবং সাত্ত্বিক—সবই আছে। শুদ্ধসাত্ত্বিক মানুষ খুবই rare। তমোগুণীই হচ্ছে cent percent। সেইজন্য মানুষ দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বস্তু, বিষয়-আশয় ইত্যাদি নিয়ে রাতদিন মাথা ঘামায়। তার মধ্যে very few percentage হয়ত দু-একবার একটু ঈশ্বরের নাম করে বা একটু পূজা পাঠ করে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অতি নগণ্য সময়। রজোগুণীরা তো রাতদিন ভাঙাগড়ার কাজেই লেগে আছে। তারা কাজ নিয়েই মেতে আছে। সত্ত্বগুণীর balanced nature, তারা খুব rare। তাদের ভাঙিয়েই রজোতমোগুণীরা জীবন কাটায়।

সত্ত্বগুণ রজোতমোগুণকে অভিভূত না-করতে পারলে আবার রজোতমোগুণ তার মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। তাই দেখা যায় সংসারে ভাল লোকের উপরে কিছু তমোগুণী/রজোগুণী লোক ছল চাতুরির মাধ্যমে রীতিমতো আধিপত্য বিস্তার করে চলে। তমোরজোগুণী ব্যক্তি অভিমানী অহংকারী। সত্ত্বগুণীর অভিমান অহংকার কম। সত্ত্বগুণীর কতগুলি ব্যবহারিক লক্ষণ আছে, রজোগুণীরও আছে, তমোগুণীরও আছে। তমোগুণী জড়তাপ্রিয়, নিষ্ক্রিয়, মানে কর্ম নিজে না-করে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, অত্যধিক নিদ্রাপ্রিয় আর শোক-মোহগ্রস্ত, পরের দোষ দেখে বেড়ায় ইত্যাদি। রজোগুণী অহংকারী অভিমানী, সে যে-সমস্ত কাজকর্ম করে তার মধ্যে তার স্বার্থ হচ্ছে সবার আগে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থই প্রধান। তবে সত্ত্বগুণী লোক যে কাজ করে তার লক্ষণ আলাদা। রজোগুণীর অভিমান অহংকার ছাড়া থাকে লোভ, দম্ভ, গর্ব, হিংসা, দ্বেষ। এসব রজোগুণীর একেবারে মূল চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। আর সত্ত্বগুণী হচ্ছে শান্ত, ধীর, স্থির, সহিষ্ণু, নিস্পৃহ, নিরভিমান, নিরহংকারী, পরোপকারী, দয়ালু, শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসসম্পন্ন, বিনয়ী, নিষ্ঠাবান, নিরলস—এইরকম অনেকগুলি সত্ত্বগুণের, দিব্যগুণের অধিকারী সে। কাজেই সত্ত্বগুণী সব নিম্নবৃত্তির ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ চৈতন্যের মধ্যে এই গুণগুলি প্রতিফলিত হয় বা এই গুণের মধ্যে চৈতন্য প্রতিফলিত হয় যখন, তখন এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

সাধারণ মানুষের এই প্রসঙ্গে সচেতনতা থাকে না। তারা সব জিনিসের মজাটা চায়, ভালটা চায়, কিন্তু ভাল করার যোগ্যতা তাদের থাকে না। তাদের সাধ থাকে, সাধ্য থাকে না। সেইজন্য তাদের মন হয় অশান্ত, দেহ থাকে অসুস্থ। এগুলি সবই অশুদ্ধির লক্ষণ। শুদ্ধি বলতে যা বোঝায় তাতে তমোগুণ, রজোগুণ সক্রিয় হয় না, সত্ত্বগুণ এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণ সক্রিয় থাকে। এই প্রসঙ্গগুলি আলোচনা করার কারণ, আজকে বিশুদ্ধ চৈতন্যের কথা বলা হবে যে বিশুদ্ধ চৈতন্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় নেই। বই পড়ে বা কারও কাছে কোনও কথা শুনে বিশুদ্ধ চৈতন্যের বোধ জাগে না। তবে স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষের সঙ্গ দীর্ঘকাল করলে তবে

কিছুটা কাজ হয়, কিন্তু সেই সঙ্গ করার আবার কতগুলো নিয়ম আছে। পায়েসের মধ্যে হাতা ডোবানো থাকে কিন্তু হাতা পায়েস taste করতে পারে না, soup-এ ডোবানো spoon soup taste করতে পারে না। কাজেই শুদ্ধসত্ত্বগুণীর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে তার প্রতিফলন হয় না। এইরকম অনেক দেখা গিয়েছে যে, পঁচিশ/তিরিশ বছর গুরুর সঙ্গ করেছে, তার পরে সে-ই আবার গুরুকে বধ করবার জন্য plan programme করেছে, ধরাও পড়েছে। এই রকম case অনেক পাওয়া গিয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে তমোরজোগুণ প্রধান বলে তারা স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়, তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা কামনা পূরণ করতে চায়। তা তার সাধ্যের মধ্যে পড়ে না বলে অন্যের মাধ্যমে করিয়ে নিতে চায়। কিন্তু সত্ত্বগুণী অন্যের সাহায্য চায় না। সত্ত্বগুণী নিজের দ্বারাই নিজে কিছু করতে চায়। এই সত্ত্বগুণীর বিশেষত্ব। কেননা চৈতন্য যত তমোপ্রধান ততই চৈতন্য আবৃত বেশি। রজোগুণেও আবৃত, সত্ত্বগুণেও আবৃত, কিন্তু সত্ত্ব স্বচ্ছ বলে সেখানে কিছু প্রকাশ পায়।

আমাদের বুদ্ধি সত্ত্বগুণে তৈরি বলে বুদ্ধির মধ্যে চৈতন্যের কিছুটা আভাস প্রতিফলিত হয়। কিন্তু বুদ্ধির নিজস্ব কোনও জ্যোতি নেই, তাতে আভাস প্রতিফলিত হয়, reflected হয়। বুদ্ধি থেকে মনে প্রতিফলিত হয়, মন থেকে ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে। সাধারণ মানুষ এগুলো শুনলে বলে, ওগুলো আমাদের মাথায় ঢোকে না! আমরা এত বুঝি না! তাহলে সে কী বোঝে? তমোপ্রধান যে-সমস্ত জিনিস সেগুলো সে খুব সহজে বোঝে। কাজেই এই যুক্তি দিয়ে অনেকেই এই বিশুদ্ধ চিদ্, চৈতন্য বা জ্ঞানকে এড়িয়ে চলে জীবনে অথচ তার ফল পেতে চায়। কিন্তু তা তো হয় না। এর আগেরদিন বলা হয়েছিল যে শ্রীকৃষ্ণের দেহরক্ষার আগে তিনি উদ্ধবকে বদ্রীনারায়ণ পাঠিয়ে দিলেন, কেননা তার মধ্যে শুদ্ধির অভাব ছিল। সারাজীবন সে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করেছে, তা সত্ত্বেও চৈতন্যের অভাব ছিল। সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাকে তপস্যা করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। আমরা যে আমি ব্যবহার করি সেই আমি দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ও প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে—সারা বিশ্বের অধীন হয়ে আছে। এই চৈতন্য শুদ্ধ চৈতন্য নয়। শুদ্ধ চৈতন্য সবকিছুর পশ্চাতে আছে, তা supportless, নিরবলম্ব নিস্পৃহ। কারণ সেই চৈতন্য স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ বলে তার মধ্যে কোনও স্পৃহা নেই, desire নেই, desire free। কিন্তু মলিন চিত্তের অর্থাৎ চৈতন্য যখন মলিন, গুণাতীত বা গুণমুক্ত নয় তখন তার স্পৃহা থাকে, desire থাকে, অভিমান অহংকার থাকে।

আজকে বিশুদ্ধ চৈতন্যের কথা বলার উদ্দেশ্য হল 'এ' শুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মার কথা বলবে, অহংকার বা ego-র কথা নয়। 'এ' অহংদেব আত্মারাম প্রাণারামের কথাই বলবে। তাঁর অস্তিত্বে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি আপন আপন কার্যে রত হয়, অথচ তারা জানে না কার জন্য তা সম্ভব হচ্ছে—বুদ্ধিও জানে না, মনও জানে না, অহংকারও জানে না, ইন্দ্রিয়াদি তো জানেই না, দেহ আর জানবে কী করে? একটা প্রসঙ্গ ধরেই বিষয়বস্তুকে পরিবেষণ করতে হয়। এখানে প্রথমদিন থেকেই 'এ' একটাই প্রসঙ্গ রেখেছে, সেই প্রসঙ্গ হল মানুষের আত্মার

আমি, পূর্ণের আমি, অখণ্ডের আমি, সত্যের আমি, এক আমি, অদ্বয় আমি-র কথা। তা অবলম্বন করে 'এ' প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ আলোচনা করেছে। বুদ্ধিমান অনেকেই মনে করে যে, বুঝে ফেলেছি। এই হল বুদ্ধির বিকার। কারণ বুদ্ধির সাধ্য নেই যে তা পরমবোধকে বুঝতে পারে। কারণ বুদ্ধির নিজস্ব কোনও চৈতন্য নেই, ধার করা চৈতন্য, অর্থাৎ reflected light নিয়ে তা চলে। প্রত্যেকের জীবন চলে reflected light-এ, অন্তঃকরণও চলে reflected light-এ। আত্মা কিন্তু কোনও ক্রিয়া করে না, কারণ আত্মার মধ্যে রজোগুণের কোনও অস্তিত্বই নেই। 'এ' এই কথাগুলোকে গুছিয়ে সবার সামনে রাখছে যাতে বুদ্ধি ভুল করে উল্টোপাল্টা না-বোঝে। কারণ বুদ্ধি ভুল বুঝবেই, বুদ্ধির তো নিজস্ব কোনও চৈতন্য নেই। তার ভিতরে যেটুকু চৈতন্যের প্রতিফলন হয় তা মনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও বেশি মলিন হয়। কাজেই রাতদিন মন তাকে dictate করছে—এও চাই, তাও চাই, এ নেই, তা করতে হবে। বুদ্ধি দিতে পারছে না বলে মন ক্ষেপে যায়। প্রসঙ্গটা ভারি interesting! এগুলো reflection, real নয়।

সত্যিকারের সত্য-জ্ঞান-আনন্দ হচ্ছে নিজের আমি-র গভীরে, বাইরে নেই। বাইরে সবটাই gross। আমরা যা দেখছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তা সবই scene, অর্থাৎ সবই হচ্ছে object. Object সবসময়ই তামসিক। আমরা তামসিক বস্তু দেখেশুনে মনে করি অনেক জেনে ফেলেছি। মানুষের জ্ঞান মিশ্র—দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সঙ্গে যুক্ত আছে বলে মিশ্রিত। মিশ্রণ হয়ে আছে বলে তা শুদ্ধ জ্ঞান নয়। সুতরাং মানুষ তার মন-বুদ্ধি দিয়ে কখনওই কোনও জিনিসের পূর্ণ সমাধান করতে পারে না। নিজের সাধ্যে যখন কুলোয় না তখন অন্যের কাছে জিজ্ঞাসা করে, অন্যের সাহায্য নেয়, অন্যের কথা শুনে চলবার চেষ্টা করে, তার পরে খায় আরেক ডিগবাজি। তখন বলে, তোর কথা শুনে আমি এই করলাম, কিন্তু কিছুই হল না! অর্থাৎ তখন অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়। নিজে যে পারল না, নিজের সাধ্যের যে বাইরে, তা কিন্তু সে একবারও স্বীকার করে না। এই ভাবে মানুষ জন্মজন্মান্তর অনন্তকাল এই ভবচক্রে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরে বেড়ায়। এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হলে তাকে শুদ্ধবোধের চর্চা করতে হবে।

শুদ্ধবোধের চর্চা কী ভাবে করতে হবে তা মানুষের জানা নেই। সে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করতে পারে, সেখান থেকে words collection করতে পারে, কতগুলো বই পড়ে information সংগ্রহ করতে পারে, কিন্তু that is not pure knowledge। তা তো reflected knowledge, relative knowledge, secondhand knowledge. Firsthand knowledge হল সে নিজে স্বয়ং, নিজের ভিতর থেকে তা প্রকাশ পাবে। অনধীত বিদ্যা অর্থাৎ যা পাঠ করা বিদ্যা নয়, শ্রুত বিদ্যা নয়—তা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ বিদ্যা। এখানে এসেই বুদ্ধিমানদের মাথা গুলিয়ে যায়। তারা রেগে যায়, ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তারা বলে, আমাদের recognize-ই করছে না! Intellect is a reflection as it is Sattvic by nature, it has got the power to catch the light of the Consciousness and it becomes to some extent conscious, that is why it is intelligent. "যস্য সন্নিধি

মাত্রেন-দেহেন্দ্রিয় মনোধিয়ঃ বিষয়েষু স্বকীয়েষু বর্ত্তন্তে প্রেরিতা ইব। সৈব অন্তর্যামী অন্তরাত্মা ঈশ্বরঃ স্বয়ম্।" By the constant association of Consciousness mind/intellect etc., the inner sense catches the light of the Consciousness and becomes to some extent shining or intelligent. That is why intellect and mind can understand a little which is mere reflection of Knowledge. বস্তু সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করার যোগ্যতা মন-বুদ্ধির আছে, কিন্তু সত্য সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই। কাজেই এহেন জীবনযাপন করে মানুষকে যে কত জনম চলতে হবে তা বলা কঠিন, তবে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, এই যে আমরা ধর্মকর্ম করছি, মন্দিরে যাচ্ছি, পূজাপাঠ করছি, এর কি কোনও ফল নেই? তা তর্কের বিষয় নয়। তার ফল আছে কী নেই তা সে নিজেই তো বুঝতে পারে। সে কতগুলি ক্রিয়াকলাপ করে ঠিকই, কিন্তু তার বুদ্ধির মধ্যে তো তার প্রতিফলন হতে দেখা যায় না, জীবনে তো তার প্রতিফলন হতে দেখা যায় না। দীর্ঘকাল একই অভ্যাস করেও সে যেই তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়। পরে অবশ্য একটা অহংকার তৈরি হয়, অভিমান তৈরি হয় যে, আমি ধর্মকর্ম করি, আমি অমুক সংঘের সঙ্গে যুক্ত, অমুক আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত, অমুকের আশ্রিত, so and so। But that cannot save a man from the sufferings of ignorance. এই কথাগুলি কিন্তু কাউকে attack করার জন্য বলা হচ্ছে না। 'এ' শুধু statement of fact-টাই রাখছে এই কারণে যে, এই বক্তব্য বলতে গেলে একটা bright side-কে এবং একটা dark side-কে focus করতে হয় in order to show the right path।

আমরা যে ধর্মচর্চা করি শৈশব থেকে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাতে আমাদের মধ্যে কত percent লোক সেই ধর্মের ফলটা নিজে অনুভব করে অপরকেও অনুভব করাতে সাহায্য করতে পারে? এটা একটা প্রশ্ন, খুবই জটিল প্রশ্ন, কিন্তু তা avoid করা চলে না। কোনও একটা বড় সম্প্রদায়ের এক সাধুর সঙ্গে একসময় 'এর' যোগাযোগ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, বাবা তুমি কেন দীক্ষা দাও না? তোমার কাছে এত লোক আসে, দীক্ষা পেলে তো তাদের অনেক উপকার হত। তখন তাঁকে বলা হল, দীক্ষাটা কী বস্তু? 'এ' নিজেই তো তা জানে না। তিনি বললেন, সে কী কথা! তুমি এভাবে নিজেকে কেন আড়াল করে রাখছ, লুকিয়ে রাখছ? উত্তরে তাঁকে বলা হল, তুমি কথাটা যে বললে, justify করতে পারবে যে 'এ' নিজেকে লুকিয়ে রাখছে? তুমি তো অনেককে meet করেছ, দীক্ষা দিয়েছ। কিন্তু শিক্ষা দিয়েছ কি তাদের? কী শিক্ষা দিয়েছ? তুমি যে সম্প্রদায়ের সেই সম্প্রদায়ের গোটা কয়েক কথা তাদের শুনিয়েছ, কয়েকটা বই পড়তে দিয়েছ, this much! কানে একটা শব্দ দিয়ে দিয়েছ—এই পর্যন্তই! এই দীক্ষাকে কিন্তু 'এ' কোনওদিনই ছোটবেলা থেকে মানতে পারেনি। সেই জায়গায় 'এ' যে দিনের পর দিন মানুষের কাছে বোধের কথা বলে যাচ্ছে তা কি greater দীক্ষা নয়? তিনি বললেন, formal দীক্ষাটাও তো হওয়া চাই! তখন তাঁকে বলা হল, formal বলতে কী mean করছ তুমি? School, College-এ ভর্তি হতে গেলে form fill up করে একটা student bonafide student হল, তাই না? আত্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

কোনও bonafide student হয় না, registration করার দরকার হয় না, form fill up করার দরকার হয় না, কেননা আত্মা is beyond any thesis, doctrine and theory। এই উত্তর শুনে কিছুক্ষণ মুখের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি বললেন, তুমি তাহলে দীক্ষাকে মান না! তাঁকে বলা হল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই মানি। কিন্তু দীক্ষা মানে কী? দীক্ষার অর্থ তুমি 'একে' বল, তার পরে 'এ' আরেকটা কথা তোমাকে বলবে। সৃষ্টি করতে গিয়ে ঈশ্বর কল্পনা করেছেন, কল্পনার মধ্যে তিনি নিজেই প্রবিষ্ট হয়েছেন। "একোঽহম্ বহুস্যাম্।" আমি বহু হব। সৃষ্টি করতে গিয়ে এই সংকল্প তাঁর ভিতর জেগেছিল। That is imagination. সংকল্প মানেই thought, thought মানেই মনের বৃত্তি—মনেই প্রকাশ পেল। কিন্তু এই thought প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কী করলেন? বহু হব—এই ভাবনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তারপর প্রত্যেকটি প্রকাশের মধ্যে নিজে প্রবেশ করলেন। এই কথা শাস্ত্রের পাতায় লেখা আছে।

তারপর তাঁকে বলা হল, এর কিছু বুঝতে পেরেছ? তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, তিনি কী করে প্রবেশ করলেন? তার আগে প্রবেশ করেননি? উত্তরে বলা হল, হ্যাঁ, তিনি সৃষ্টি করেই তার ভিতরে প্রবেশ করলেন। যেমন তুমি ঘর বাড়ি তৈরি করে তারপর ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর। তখন তিনি বললেন, এরকম ভাবে বুঝি ঈশ্বরকে প্রবেশ করতে হয়েছে সবার মধ্যে! তুমি ভীষণ জট পাকিয়ে কথা বল! তখন তাঁকে বলা হল, হ্যাঁ 'এ' জট খুলেছে বলেই জট পাকাতে পারে, কিন্তু তুমি জট খুলতে পারবে না, সে সাধ্য তোমার নেই। ঈশ্বর কোনও কিছুর মধ্যে প্রবেশ করেছেন—এ কথা বলার অর্থ তিনি আগে প্রবেশ করেননি, তাই তো! তাহলে মানুষের মতো ধর্ম এসে গেল তাঁর মধ্যে। বাড়িটা তৈরি হয়েছে, তিনি এখনও গৃহপ্রবেশ করেননি, এই তো! তখন তাঁর সঙ্গে আর যারা ছিল তারা উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। তারা বলল, বাবাঠাকুরের কথা কিন্তু খুব সোজা, আমরা বুঝি না। তখন তাদের বলা হল, তিনি সর্বব্যাপী বলে কোথাও প্রবেশ করার অপেক্ষা রাখেন না। আকাশ তো সর্বব্যাপী, তুমি কুঁড়েঘর করলেও তার মধ্যে আছে, আর মাটির ঘর করলে তার মধ্যেও আছে, প্রাসাদ, পাথরের ঘর কর, একটা ছোট্ট কৌটো তৈরি কর তার মধ্যেও আছে, এমনকী একটা কীটপতঙ্গ, মানে tiniest creature তার মধ্যেও তা রয়েছে। তার মানে all-pervading existence does not require to appear and disappear. It has no appearance and disappearance. So is the Consciousness, Consciousness does not require to vacate or enter. It remains 'as It is'. Because It is Infinite Self which does not require to move. তার মধ্যে movement-টা appear করছে গুণের দ্বারা। "বিষয়েষু স্বকীয়েষু বর্ত্তন্তে প্রেরিতা ইব।" গুণের মধ্যে গুণ যুক্ত হয়ে গুণের খেলা হয়ে চলেছে। তাতে চৈতন্যের কিছু পরিবর্তন নেই। আমরা এই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আর এই ঘরে ঢুকলে আকাশের কোনও পরিবর্তন হবে না। So is the nature of Consciousness! তখন সেই সাধু বললেন, আমরা তো এরকম দীক্ষার অর্থ কোথাও পাইনি! আমরা

অন্যরকম দীক্ষার অর্থ পেয়েছি। তখন উত্তরে তাঁকে বলা হল, তা তো একটা condition, দীক্ষা তো condition নয়। ঈশ্বর যে বহু হয়েছেন তাতে তিনি conditioned হয়ে যাননি। Water remains always the same, it is not changed by its appearance. So the Consciousness also with its appearance and disappearance remains the same. তা বোঝাবার জন্যই 'এ' আমিতত্ত্বের কথা বলছে।

আমিতত্ত্বকে বাদ দিয়ে কোনও অনুভূতিই সম্ভব নয়। এর অর্থ অহংকার নয় কিন্তু, যদিও প্রত্যেক মানুষ অহংকার দিয়ে কাজ করে। অহংকার বিশুদ্ধ নয়, অহংকার যার দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে তার কথাই গানের প্রথমেই বলা হয়েছে—'বিশুদ্ধ চিদ্ একরূপম্ বুদ্ধয়াদি সাক্ষী', constant তাঁ witness হিসেবে রয়েছে। 'সদসৎ বিলক্ষণম্' অর্থাৎ মানুষের যে সৎ-অসৎ একটা ধারণা বা কল্পনা আছে, সৎ-অসৎ মানে real আর unreal, তা থেকে বিলক্ষণ, এর থেকে আলাদা বা স্বতন্ত্র। চৈতন্য কারও সঙ্গে মাখামাখি করে ভাব করতে যায় না, পিরিত করতে যায় না, কারও সঙ্গে শত্রুতাও নেই। তা অহংকারের কাজ। অহংকার ভাব করবে তার পছন্দমতো লোকের সঙ্গে আবার দ্বন্দ্ব বা ঝগড়া করে তার থেকে আলাদা হয়ে যাবে। That is the nature of ego. Ego is not Pure Consciousness, in fact, a reflection, reflected part. চৈতন্য তো সবকিছুর মধ্যে প্রকাশ হয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। দীক্ষা তো চৈতন্যই দিয়ে দিয়েছে। সকলের মধ্যে কি চৈতন্য নেই? তুমি তাদের কী চৈতন্য দেবে? Who are you to give Consciousness to them? চৈতন্য কখনও বিভক্ত হয় না। বিভক্ত হয় চিদাভাস অর্থাৎ reflection, reflection-এর মধ্যে various gradation হতে পারে। কাজেই সৃষ্টি হচ্ছে reflection-এর part, সেখানে gradation-এ ভরা। কিন্তু Pure Consciousness-এর মধ্যে কোনও gradation নেই, It is 'বিশুদ্ধ চিদ্ একরূপম্', It is entirely free from all duality, It is homogeneous by nature, not heterogeneous। চিদাভাস অর্থাৎ reflection of Consciousness is heterogeneous।

'আকাশবৎ চিদ্ একরস'—এই হল অখণ্ড আমি, আত্মা-ব্রহ্ম-ঈশ্বর। কল্পনা করে আমরা কী করছি? মুণ্ডু লাগাচ্ছি, হাত লাগাচ্ছি, নিজের মতো করে ভাবছি। 'এ' এর বিরোধিতা করছে না। 'এ' শুধু statement of fact সবার সামনে রাখছে। So long as you are attached to these ideas you cannot realize your original state. স্বঘরে, নিজের ঘরে, নিজবোধে প্রবেশ করতে গেলে তোমাকে ভাবাদি বাইরে বাদ দিয়ে রেখে আসতে হবে। কাজেই জগৎ জুড়ে খেলা হচ্ছে স্ববোধের বক্ষে স্বভাবের খেলা। এই স্বভাবের মধ্যেই অনন্ত অনন্ত variation। তার মধ্যে this or that, not this or not that, liking-disliking, aggreable-unaggreable, pleasant-unpleasant—প্রচুর খেলা হয়ে চলেছে, অর্থাৎ এ বড়, এ ছোট, এ ভাল, এ মন্দ, so and so, so and so। এগুলো স্বভাবের খেলা, not স্ববোধের খেলা। স্ববোধে নিত্য এক One আমি, একবোধের খেলা। 'এ' একবোধের খেলার কথা এখানে প্রথম থেকে আরম্ভ করেছে যেখানে দ্বিতীয় কারও কোনও মতবাদ চলবে না।

তার কারণ এক-এর কোনও duplicate নেই। আত্মা যে অবিভক্ত, আত্মা কখনও দ্বৈতভাব নিয়ে থাকে না। তাঁ সবসময়ই এক-এ ছিল, এক-এ আছে এবং এক-এ থাকবে। আত্মা-ব্রহ্ম অভিন্ন। সুতরাং আত্মার কথা বলে 'এ' ব্রহ্মের কথায় চলে যাচ্ছে এবং ultimately ব্রহ্মের কথাতেই থাকবে আত্মার কথা দিয়ে। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে জগৎকে স্বীকার করলে তুমি আত্মবোধে আসতে পারবে না। যেইমাত্র জগৎকে তুমি স্বীকার করলে সেইমাত্র বৈচিত্র্য বা দ্বৈতকে স্বীকার করলে। আত্মার মধ্যে দ্বৈত অসিদ্ধ। 'এ' গানের মধ্যে দিয়ে এই কথাগুলিকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে। কারণ এই গানগুলো হচ্ছে 'এর' সূত্র, ব্রহ্মসূত্র, আত্মসূত্র। এগুলো মুখস্থ বিদ্যা থেকে আসে না, হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে এসেছে। তমোপ্রধান, রজোপ্রধান যে জীবন, এই জীবনকে সত্ত্বপ্রধান করে শুদ্ধসত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছে দেবার জন্য তা প্রকাশ করা হয়েছে। এই কথাগুলোর মধ্যে রয়েছে অভিনবত্ব, রয়েছে সম্পূর্ণরূপে শক্তির পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য এবং মৌলিকতা, অর্থাৎ originality। কিন্তু এ কোনও মতবাদ নয়। This is not a doctrine, not a theory, nor even a thesis, because Self is beyond doctrine, theory and thesis. Anything other than Self is antithesis to the Self.

বিকল্প কোনও চিন্তা বা কথা দিয়ে তোমরা আত্মবোধে আসতে পারবে না। এবার নিজের অহংকারকে নিজেরা কতখানি সংযত করতে পার বা না-পার তা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখবে। না-পারলেও বলা হয়েছে, তোমরা ঈশ্বরকে তো ভাবতে পার, কারণ সৃষ্টি যখন আছে স্রষ্টাকে ভাবতে পার। আত্মাকে কিন্তু সহজে ভাবতে পারবে না, অথচ আত্মার ভাবনাই সব চাইতে সহজ। কারণ ঈশ্বরকে তুমি কোথাও পৃথক ক'রে খুঁজে পাবে না। কিন্তু আত্মা তোমার সাথেই রয়েছে। ঈশ্বরকে পেতে হলে তোমাকে universal outlook তৈরি করতে হবে। কিন্তু আত্মা অণুতম বস্তুর মধ্যেও রয়েছে। কেননা অণুর অস্তিত্বটাই, সত্তাটাই আত্মা। কাজেই বিশুদ্ধ চিদ্ সর্বব্যাপী সর্বধারী সর্বজ্ঞ মহান। এই 'একোঽহম্' (আত্মার আমি) ঊর্ধ্ব অধঃ মধ্যে পূর্ণ অর্থাৎ সমস্ত দিক, সমস্ত স্থান, সমস্ত কাল, সমস্ত কার্যের অধিষ্ঠানরূপে রয়েছে। সেইজন্য এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছিল যে, নিকৃষ্টও আমি,উৎকৃষ্টও আমি; মৃত্যুও আমি, অমৃতও আমি; কারণ অমৃত আর মৃত্যু আমি-র বক্ষে ওঠে, ভাসে, ডোবে, খেলা করে, কিন্তু আমি আমি-ই থেকে যায়। এই আমি মানে Pure Consciousness—the infinite ocean of Consciousness designated as infinite I। "একো হি দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা/কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ। বাচসাক্ষী প্রাণবৃত্তের্সাক্ষী বুদ্ধের্সাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তেশ্চসাক্ষী চক্ষু শ্রোত্রাদি সর্বেন্দ্রিয়ানাঞ্চ সাক্ষী। সাক্ষী নিত্য প্রত্যগাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলোঽহম্।" এই যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবল আমি, এই আমি-ই ব্রহ্ম-আত্মা। ঈশ্বরও কিন্তু এই আমিই, কিন্তু সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত আছেন বলে তিনি গুণাধীশ, গুণাধীন নন। জীব গুণাধীন, আত্মা-ব্রহ্মের মধ্যে কোনও গুণ নেই, তাঁ গুণাতীত। This is the difference! বুঝতে পারি না বললে কিন্তু তোমার জীবন

মানবে না। জীব কিন্তু গড়িয়ে গড়িয়ে চলবেই, সে মার খাবে, ঘা খাবে, তারপর বেরিয়ে আসতে চাইবেই। আজকে তুমি না-চাইতে পার, দু'দিন পরে তোমাকে চাইতেই হবে। কেননা কে বসে বসে মার খেতে চায়! মৃত্যুকে অতিক্রম করতে চাইবেই তুমি একদিন।

মৃত্যু তৈরি হয়েছে গুণের দ্বারা, গুণ যেখানে নেই মৃত্যু সেখানে নেই। কিন্তু এই গুণ আছে কোথায়? 'শক্তির খেলা যদবধি গুণের খেলা তদবধি।' খুব কঠিন ঠাঁই! কিন্তু যে আত্মবোধের কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু গুণাতীতম্ ভাবাতীতম্ দ্বন্দ্বাতীতম্ ভেদাতীতম্। এর আগে গত তিনদিন যা বলা হয়েছে, শেষের দিনেও বলা হয়েছে 'ভুলো না মন ভুলো না বোধস্বরূপ আপন', তারই পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু আজকের বক্তব্য এসেছে। কিন্তু এই মন হচ্ছে আভাস। এই আভাসের কোনও যোগ্যতা নেই, সাধ আছে, desire-এ ভরা, কিন্তু সাধ্য নেই, মার খেয়ে মরছে সাধ্য নেই বলে। চোখের সামনে দেখছে আরেকজন পারছে, কিন্তু নিজে পারছে না। অমুককে প্রশংসা করছে, আমাকে করছে না, আমাকে অবজ্ঞা করছে—তার ভিতরে এই সব complex খেলা করছে। এই গুণের ঘরে এরকম হবেই, কিন্তু এগুলো অতিক্রম করার জন্য একটা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে জীবনে উন্নতি করার জন্য প্রচেষ্টা, অজ্ঞানকে দূর করার প্রচেষ্টা। অজ্ঞানজাত যত কিছু আছে জীবনে—দুঃখকষ্ট, ভাবনাচিন্তা, শোক, মোহ, ভ্রান্তি, ভীতিকে অতিক্রম করার একটা চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু তমোরজোগুণের মধ্যে থেকে এই চেষ্টা করেও কিন্তু সহজে সফল হওয়া যায় না। তাহলে সবটাই কি বৃথা যাবে? না, তখন যারা জিনিসটা একটু বুঝতে পেরেছে তারা বলছে, আসলে আমাদের এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণটি হচ্ছে বেশি সাহায্যকারী। সুতরাং তমোরজোগুণকে কমিয়ে সত্ত্বগুণকে বাড়াও।

মানুষ যে ধর্মচর্চা করে তার মূলে হল এই সত্ত্বগুণকে বাড়িয়ে দেওয়া, কিন্তু মানুষ তাও জানে না। সত্ত্বগুণ বাড়িয়ে তার পরে শুদ্ধসত্ত্বগুণে যাওয়া এবং তার পরে গুণাতীত হওয়া। কিন্তু মানুষ তো এখনও তমোরজোগুণের মধ্যেই রয়েছে, সত্ত্বগুণ বাড়াচ্ছে না। তার ভিতর দিব্যগুণ খেলছে না, আসুরিক গুণ খেলছে। স্বার্থপরের মতো সে জীবনযাপন করছে। দিব্যগুণ অর্জন হলে স্বার্থ থাকে না। স্বার্থকে ত্যাগ করতে ও বিসর্জন দিতে হয়। সেইজন্য দিব্যভাবের মধ্যে সমর্পণের কথা আছে। দেবতার ভাবনা ভেবে তবে দেবতার পূজা করতে হয়। "দেবং ভুত্বা দেবং যজেৎ।" (সত্ত্বগুণ দিয়ে সত্ত্বগুণকে ব্যবহার করতে হয়, বোধ দিয়ে বোধকে ব্যবহার করতে হয়।) দেবতা হয়ে দেবতার পূজা কর। নতুবা দেবতার পূজা করলে কোনও শুভ হবে না। দেবতা কী করে হওয়া যাবে? দেবভাবনার দ্বারা নিজেকে আগে ভাবিত করে নাও। আমাদের ভাবনাটা শুদ্ধ নয়, মন হচ্ছে ভীষণ মলিন। এই মনই কিন্তু আমাদের বন্ধনের কারণ, আবার সাত্ত্বিক মন হলে সেই মনই মুক্তির কারণ হবে। কিন্তু আগে সাত্ত্বিক মন তো বানাতে হবে। সেইজন্যই স্তব, স্তুতি, মন্ত্রপাঠ, জপ, কীর্তন, ভজন এগুলি করার উদ্দেশ্য হল সত্ত্বগুণকে বাড়ানো। সত্ত্বগুণ বাড়াবার জন্যই কতগুলো নূতন নিয়ম পালন করতে হয় আহারে, বিহারে, চলনে, বলনে, সবকিছু ব্যবহারের মধ্যে একটা নিয়মনিষ্ঠা মেনে চলতে হয়

তমোরজোগুণকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। সেইজন্য যারা সত্ত্বগুণ বাড়াতে চায় তাদের জীবনে আসে কতগুলো নূতন নিয়মচর্চা, যেমন নিদ্রা কমিয়ে ফেলতে হয়, কাজ কমিয়ে ফেলতে হয়, বাইরের সঙ্গ কমিয়ে ফেলতে হয়, আড্ডা মারা কমিয়ে ফেলতে হয়, বাজে কথা বলা, গল্প করা কমিয়ে ফেলতে হয় এবং যে-সমস্ত সঙ্গের থেকে মনের ভিতরে উত্তেজনা আসে, বিরক্তি বাড়ে, ক্রোধ বাড়ে, অভিমান বাড়ে, হিংসা বাড়ে, দ্বেষ বাড়ে তা পরিহার করতে হয়। তা না-হলে সত্ত্বগুণ আসবে না। কাজেই ব্যবহারিক ধর্ম অর্থে এই অর্থই বোঝায়। সেইজন্য ব্যবহারিক ধর্ম না-হলে কিন্তু আভ্যন্তরীণ ধর্ম আসবে না। আবার আভ্যন্তরীণ ধর্ম ঠিকমতো তৈরি না-হলে ব্যবহারিক ধর্মও ঠিকমতো হবে না।

'এর' কথাবার্তাগুলো কিন্তু গতানুগতিক ভাবের সঙ্গে খাপ খায় না বলে একটু অন্যরকম শোনায় ঠিকই, কিন্তু উপায় তো নেই। কেননা গতানুগতিক কথাই যদি 'এ' শিখত তাহলে সেই কথাই বলত। কিন্তু সেই কথা বলা হচ্ছে না, তার কারণ গতানুগতিক কথার সঙ্গে 'এর' সম্পর্ক নেই। ধর্মজগতের অনেকেই এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, দেখ ছোটবেলা থেকেই কতগুলি জিনিস লক্ষ্য করা হয়েছে। যে পরিবারে এই দেহ জন্মগ্রহণ করেছিল সেই পরিবারেও এই জিনিস লক্ষ্য করা হয়েছে। এই দেহের যিনি গর্ভধারিণী জননী তিনি নানারকম ব্রত নিয়মাদি পালন করতেন। মাসের মধ্যে সাতদিনও দুবেলা তিনি খেতেন না অথচ ভোর চারটে থেকে আরম্ভ করে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তিনি অনলস পরিশ্রম করতেন সংসারের কাজে। তখন সস্তার দিন। এখনকার মানুষেব কাছে সেই দিনের কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। সেই সস্তার দিনেও কিন্তু অনেক সময় square meal জোটেনি 'এর' এবং তার জন্য 'এ' নিজেকে blessed মনে করে। এক-এক সময় ভাবি যে, 'এর' মতো ভাগ্যবান পৃথিবীতে বোধহয় আর কেউ নেই। কেননা 'এ' দুঃখের মধ্যে জাত হয়েছে, দুঃখকে আপন করে বরণ করে নেওয়ার একটা সুযোগ 'এ' পেয়েছে যার ফলে দুঃখ আর 'একে' কোনওদিনও অতিক্রম করতে পারবে না। This is My discovery, original discovery.

'এ' সখের ধর্ম করেনি। দুঃখের নিবৃত্তির জন্য 'এ' মাতামাতি করেনি। সমগ্র দুঃখকে একত্র করে দেখবার চেষ্টা করেছে এবং Almighty-র কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যে, তোমার সৃষ্টির রাজ্যে সৃষ্টি করতে গিয়ে তোমার যে মল বেরিয়ে পড়েছে, সেই দুঃখরূপ মল তুমি যদি আর কোথাও রাখতে না পার তাহলে 'এই জীবনের' মধ্যে ঢেলে দাও। Unconventional prayer কিন্তু, কোনও দেবতাও তা নেবেন না, সাধুসন্তও নেবেন না, ঈশ্বরও নেবেন না। তোমার সমস্ত দুঃখ 'এর' উপর ঢেলে দাও। তুমি নিশ্চিন্তে সৃষ্টিকার্যে রত রও যাতে তোমার কোনও কষ্ট না-হয়। ঈশ্বরের চোখেও জল এসেছিল এই কথা শুনে। তাঁর মনে হয়েছিল যে, অনেক ভক্ত আমার জন্মেছে পৃথিবীতে, কিন্তু তুমি নিজেকে কিছুতেই ভক্ত বলে পরিচয় দাও না ঠিকই, এই রকম প্রার্থনা কেউ আমার কাছে কোনওদিন করেনি। তবে তুমি যখন এই প্রার্থনা করলে, আমিও তোমাকে এই কথাই বলছি যে তোমার আমি-র বাইরে

আমি কোনওদিনই যাব না। আমি ঈশ্বর নই, আমি 'আমি'। কিন্তু ঈশ্বর 'এর' আমি-র মধ্যের আমি। কেননা এটা তাঁর স্বীকারোক্তি। 'এ' তাঁর কাছে কিছুই চায়নি, শুধু চাওয়া হয়েছিল দুঃখ, ফলে তিনি নিজেকেই দিয়ে দিয়েছেন। This is unconventional discovery. 'এ' গুরু নয়, দীক্ষা দিতেও 'এ' আসেনি। কিন্তু আমি-র স্বরূপ 'এ' প্রকাশ করছে যা সবচাইতে essential factor, all kinds of দীক্ষা যেখানে dissolved হয়ে যায় সেখানে আর পৃথক করে দীক্ষার প্রয়োজন থাকে না। বহুজন এরকম দীক্ষিত এসে বলেছে যে, আমরা দীক্ষা নিয়েছি, অনেক জপ-তপ-ধ্যান করেছি, কিন্তু আপনার এখানে এসে দেখলাম অগাধ, তার কোনও তল নেই, অফুরন্ত। দিনের পর দিন আপনি এই যে বলে যাচ্ছেন, যতই শুনি ততই অবাক হয়ে যাই। বেদ-বেদান্ত যেন জীবন্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। কীসের জ্ঞান নিয়ে, দু পাতা বই পড়ে আমরা মাতামাতি করছি। তাদের উত্তরে বলা হয়েছিল, দেখ, এখানে ভগবানের ভক্ত ভগবানই স্বয়ং। 'এ' দ্বিতীয় কারওকে জানে না, কেননা God alone exists। একমাত্র ঈশ্বর সত্য, আর সব অনিত্য। ঈশ্বরের ভক্ত একমাত্র ঈশ্বর স্বয়ং নিজেই। একজন মস্ত বড় ভক্ত এই কথা শুনে কেঁদে ফেলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাবা, তুমি আজকে যে কথা শোনালে তা খণ্ডন করবার মতো কোনও বিদ্যা আমি শিখিনি এবং পড়িওনি। আমরা সবাই ভক্ত সাজি, ভক্ত কিন্তু আমরা কেউ নই।

উত্তরে তাঁকে বলা হয়েছিল, নিজের আমিকে আমরা ভালবাসি না। ঈশ্বরকে ভালবাসব কোত্থেকে? ঈশ্বরকে ভালবাসতে গেলে রাধার মতো হতে হবে, সীতার মতো হতে হবে। জনম দুঃখিনী সীতা, দ্রৌপদীর মতো হতে হবে, কৃষ্ণ যাঁর সখা। এগুলি তোমরা বইতে পড়, জীবনের মধ্যে সেই জিনিসকে উপলব্ধি করতে হলে কী দরকার? সেই জ্ঞানচক্ষু কোথায়? কী দিয়ে দেখবে? বইয়ের পাতা মুখস্থ করে তো কোনও কাজে লাগবে না। হৃদয়ের দ্বার তো বন্ধ। কামনা, কল্পনা, স্বার্থ, অহংকার, অভিমান দিয়ে একেবারে বেশ করে পূর্ণ করে রেখে দিয়েছ, rust পড়েগিয়েছে। হৃদয়ে বাস করেন ঈশ্বর, কিন্তু হৃদয়ের দরজা যে বন্ধ। যিশুখ্রিস্ট এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, "Knock, Knock, Knock at the door and the door of the kingdom of Heaven will be opened unto you". আমরা সখের ধর্ম করি, মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় গিয়ে মনে করি খুব ধর্ম করছি। দুর্গা পূজার সময় দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছিল। সবার চোখে জল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে 'এ' তা লক্ষ্য করেছে। সবাই খুব কাঁদছে আর মাকে বলছে, মা তুমি চলে গেলে আমাদের ফেলে! আবার তো আসবে! তাই 'এই দেহের' জনককে একবার বলা হয়েছিল যে, বাবা এই বাল্যশিক্ষা আর ক'দিন চলবে? তখন 'এ' নিতান্তই বালক। সারাজীবনই বাল্যশিক্ষাই কি পড়বে মানুষ? (প্রতিবছর প্রতিমা পূজা হচ্ছে, চলে যাচ্ছে, এ যেন নেশাখোরের নেশার মতো আর কী! যখনই ছিলিমটা পেল একবার টান দিয়ে নিল।) এটা কি ধর্ম? বাবার পাশে আরও অনেকে ছিলেন। তারা বাবাকে বললেন, তোমার ছেলে তো দেখছি একেবারে....। বাবা তাদের বললেন, ওর প্রশ্নের উত্তর

দেওয়ার মতো সাধ্য আমার নেই। কিন্তু ও কোথা থেকে এই প্রশ্ন পাচ্ছে আর কেনই বা বলছে তাও বুঝবার মতো সাধ্য আমাদের নেই। তিনি কোনওদিন বাধা দেননি। শেষে যখন পারতেন না তখন বলতেন, দেখ রে তোর এই কথার জবাব দেবার মানুষ নেই! তোর এই প্রশ্নের উত্তর তুই নিজের মধ্যে নিজেই খুঁজে পাবি। কথাটা সত্যে পরিণত হয়েছে। মানে পিতৃবাক্য যে সত্য 'এ' তার প্রমাণ পেয়েছে। কেননা পিতৃমন্ত্রে আছে—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব দেবতাঃ।" এই পিতা আত্মারই পরিচয়। আত্মাই পিতারূপে আসেন। আত্মাই তপস্যা করে। "জ্ঞানময় তপঃ"—Self energizm, পিতা তাপ ও তাপী। তাপ সৃষ্টি করেন যিনি তিনিই পিতা। পিতা সন্তানের মধ্যে তাপ সৃষ্টি করে দিয়ে যান, আর মা তা পালন করেন, গর্ভে ধারণ করে সেই তাপকে মা পোষণ করেন। একদিন 'এই শরীরের' বাবাকে এই সমস্ত কথা বলা হয়েছিল। এই কথা শুনে বাবা শুধু মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, কিছুই বললেন না। তিনি জানতেন অনেক কিছু 'এর' সম্বন্ধে....।

যাই হোক, বক্তব্য হচ্ছে যে, বাল্যশিক্ষা মানে আমরা ধর্মের ওই গতানুগতিক নিয়মের গণ্ডির মধ্যেই চলেছি, বংশানুক্রমে চলছে একই ধারা। কিন্তু বাহ্য দেশের থেকে তা কবে অন্তর্দেশে নিয়ে যাওয়া হবে? বাইরে থেকে ধর্মকে অন্তরে নিয়ে যাওয়া হবে কবে—অন্তর থেকে কেন্দ্রে এবং কেন্দ্র থেকে তুরীয়তে? This is the culmination. বাল্যশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে যেমন আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলি, primary থেকে middle primary, higher primary, secondary, higher secondary, তার পরে আস্তে আস্তে আরও উপরের দিকে যাই। তার পরে degree course, master degree আমরা complete করি। বাল্যশিক্ষা মিশে তার মধ্যে dissolve হয়ে যায়। Outer customary rules of our religious acts should be transformed to the next higher one step by step and ultimately it will culminate into the Knowledge of Oneness. কিন্তু একটা class-এ যদি সব ছাত্র fail করে থাকে বছরের পর বছর তখন তাকে কী বলে? তা আমরা সবাই তো বাল্যশিক্ষা নিয়ে fail করে বসে আছি। সব fail মারা ছাত্র আমরা! আবার আমরা ধর্ম করছি—অথচ ওখানেও fail করে বসে আছি!

এক সাধু বলেছিলেন যে, ধর্মজগতে 'এর' কথা বিপ্লব নিয়ে আসবে। তাকে বলা হয়েছিল, বাবা তুমি উল্টোপাল্টা কথা বলছ বটে, 'এর' ওই সমস্ত কোনও উদ্দেশ্য নেই। 'এ' বিপ্লব বোঝে না। 'এর' বক্তব্য হচ্ছে, আলো-ছায়ার খেলা চলছে জগৎ জুড়ে, আলোটা জ্বালালে ছায়া চলে যায়—very simple factor, কিন্তু ছায়ার দিকে চলে গেলে আলো আর ধরা যায় না। আলো বাইরে কোথাও নেই। এই প্রসঙ্গে একটা dialogue আছে, তা এখন স্মৃতিতে এসে গেল। একবার আলোচনাকালে চুপচাপ বসে শোনার পরে একটা কথাই 'এ' শুধু বলেছিল শেষের দিকে, 'যখন বাইরের আলো নিভে যায়, বাইরের সবকিছুকে কে প্রকাশ করে? পেঁচা তো তার ভিতরের আলো প্রকাশ করতে পারে না, পেঁচা তো চোখ বন্ধ করে

থাকে। সূর্য তো বিষয়ী লোকের ভিতরে ঢুকে কিছু সুবিধা করতে পারে না।' 'এর' কথাগুলো খুব crude। সূর্যের সঙ্গে আরও কিছু চাই, সূর্যের আলো দিয়ে কোনও জিনিসকে দেখতে গেলে চোখও থাকা চাই। আবার চোখ থাকলেই হবে না, মনের আবার সেই চোখকে ব্যবহার করতে জানা চাই—এটা আমি দেখছি, এই আলোটা আছে, চোখ আছে আমার। সেই চোখকে ব্যবহার করার জন্য মন আছে। তিনটের একত্র যোগাযোগ হলে তবেই কোনও জিনিসকে দেখা সম্ভব। তাহলে বস্তুকে দেখার জন্য তিনটে জিনিস দরকার। যদি এটা না-থাকে, বস্তু না-থাকে তাহলে দেখব কী করে? আর যদি এই আলো না-থাকে তাহলেও দেখব কী দিয়ে? চোখ আছে বটে, মনও আছে। আবার যদি চোখই আমার না-থাকে, অথচ বস্তু আছে এবং আলোও আছে তাহলে কি দেখা যাবে? সবই মন দিয়ে শুনছে। যখন সূর্যের আলো থাকবে না, চাঁদের আলোয় দেখব সব। যখন চাঁদের আলোও থাকবে না, আঁধার রাতে আমি জগতের বৈচিত্র্যকে দেখব কী দিয়ে? মনের আলো দিয়ে। মনের আলো অর্থাৎ যখন মনও থাকবে না, তখন কী দিয়ে দেখব? তখন দেখার জন্য দ্রষ্টা আর দৃশ্য কেউই থাকবে না, শুধু আমি একা থাকব। That is *Samadhi.*

তারা বলল, তুমি এগুলো জানলে কোত্থেকে? উত্তরে বলা হল, জানার বিষয় নয়, আমি-ই তাই। আমি মানে চৈতন্য। চৈতন্য সবসময়ই বর্তমান, তার বর্তমানতার জন্য দ্বিতীয় কোনও বস্তু আবিষ্কার বা আমদানি করতে হয় না কোনও জায়গা থেকে, দেশ-কাল-কার্যকে আনতে হয় না। দেশ-কাল-কার্য তার উপর নির্ভরশীল। প্রসঙ্গক্রমে বলা হল, এমন একটি বস্তু হচ্ছে চিৎতত্ত্ব—চৈতন্য যার কখনও অভাব হয় না; যার কখনও বিকার হয় না; যার কোনও আকার নেই, part নেই অর্থাৎ অখণ্ড; যার মধ্যে কোনও ভাগ নেই অর্থাৎ অবিভক্ত; কোনও অংশ-অংশী নেই; যার মধ্যে কোনও ক্রিয়া নেই অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়; যার কোনও বিকল্প বা substitute নেই; যা অবলম্বনশূন্য, অবলম্বন নেই অর্থাৎ supportless। কিন্তু জগতের অন্য সব বিষয়ে বা ব্যাপারে তোমার support দরকার। সেখানে ক্রিয়া, আকার ও বিকার আছে। এই যে প্রসঙ্গগুলো তোমাদের সামনে রাখা হচ্ছে তা কোনও মুখস্থ বিদ্যা নয়; এগুলো কোনও ধার করা বিদ্যা নয়। এই বিদ্যার অধিকারী হলেই তুমি আপনস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে, অর্থাৎ 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং' স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। দুই এসে আর তোমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারবে না। তোমার ভিতরে কোনও ভ্রান্তি ভীতি সৃষ্টি করতে পারবে না; কোনও বিকার সৃষ্টি করতে পারবে না; কোনও পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারবে না। 'এ' সেই 'আমি-র' কথাই বলছে, অর্থাৎ আত্মার কথাই বলছে। Without the Witness Self-I nothing can exist and nothing can function.

আত্মার সান্নিধ্যে এসে সবাই সক্রিয় হয়, সবাই অস্তিত্ববান হয়। কিন্তু আত্মা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত বলে তাঁর কোনও support-এর দরকার হয় না। বিশুদ্ধ চিদ্‌রূপী যে 'আমি' তা অবলম্বনশূন্য। তাই গানের প্রথমেই বলা হয়েছে—'বিশুদ্ধ চিদ্ একরূপম্ বুদ্ধ্যাদি সাক্ষিভূতম্ সদসৎ বিলক্ষণম্।' সদসৎ সেখানে নেই অর্থাৎ তদতিরিক্ত কিছু নেই, বিলক্ষণ অর্থাৎ distinct

from real and unreal, 'অহং পদ প্রত্যয় লক্ষিতার্থং প্রত্যগ সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলম্'। অর্থাৎ আমিবোধরূপ প্রত্যয়ের implied meaning, আমি-র implied meaning হল সৎ, তার মানেই চিৎ, তার মানে 'আমি'। 'আমিই' হল 'একরূপম্ বুদ্ধয়াদি সাক্ষী সদসৎ বিলক্ষণম্'। 'অহং পদ প্রত্যয় লক্ষিতার্থং' অর্থাৎ এই আমি পদের মর্মার্থ প্রত্যগাত্মা সচ্চিদানন্দ কেবল। প্রত্যগাত্মা, অর্থাৎ innermost Self, the inmost Consciousness, the underlying Essence, life-pervading Truth, the Background of all, the eternal Substratum। সর্বাধিষ্ঠানম্ অদ্বয়ম্ অব্যয়ম্। অর্থাৎ indestructible, indivisible, secondless। বারবার এই কথাগুলো সামনে রাখা হচ্ছে মনকে অ-মন করার জন্য, না-হলে তো মন ফোঁস করবে। মন অ-মন হলে ফোঁস করার মতো মনের আর সেই সাধ্য থাকবে না, মন আপনিই নত হয়ে যাবে।

আমরা নমস্কার করার জন্য হাত জোড় করি, কপালে ঠেকাই, হাঁটু গেড়ে প্রণাম করি এবং হাঁটু গেড়ে, হাত রেখে, চোখ বন্ধ করে কপালে ঠেকাই। এক অঙ্গের প্রণাম, দুই অঙ্গের প্রণাম, তিন অঙ্গের প্রণাম, চার অঙ্গের প্রণাম, পাঁচ অঙ্গের প্রণাম, ছয় অঙ্গের প্রণাম, সাত অঙ্গের প্রণাম এবং অষ্টাঙ্গের প্রণাম। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম অর্থাৎ আটটা অঙ্গকে একত্র করে যে প্রণাম তাকেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলা হয়। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে কেন? অর্থটা কী? অর্থাৎ সবকিছুকেই তখন মেনে নেওয়া হল। নিজেকে তার মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হল—অবগাহন করা হল। কিন্তু কীসে? সর্বসমক্ষে সবার সাথে নিজের এই পৃথক অস্তিত্বকে আটটা অঙ্গের মাধ্যমে অষ্টবিধা প্রকৃতিকে, তারপর সমগ্র প্রকৃতিকে এবং সর্বশেষে পরমপুরুষের পায়ে আপনাকে আহুতি দেওয়া। এই হল অষ্টাঙ্গ প্রণামের তাৎপর্য। কিন্তু এই তাৎপর্য বোধে না-খেললে তা তো dry action হয়ে গেল, শুকনো ক্রিয়া হয়ে গেল—কোনও কাজে লাগবে না। সারাবছর পড়াশুনা করে না কিছু ছেলে, কিন্তু পরীক্ষার আগে নস্যি অথবা সিগারেট নিয়ে রাত্রিবেলা পড়তে বসে, *whole night* পড়াশুনা করে। তখন পড়ছে আর ঝিমোচ্ছে। অর্থাৎ এই ভাবে পড়াশুনা করে—$\triangle$ABC be a triangle, ABC a triangle, ABC....a triangle, AB.... triangle....! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সব উল্টোপাল্টা পড়ে চলেছে। এতে কি কোনও কাজ হবে? আমরাও পুজা করতে গিয়ে স্তবস্তুতি করছি, কিন্তু মন থাকছে একদিকে আর মুখের কথা যাচ্ছে আরেকদিকে। সামনে বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে আছি বটে, কিন্তু বিগ্রহকে দেখছি না, মনের ভিতর কিন্তু খেলছে অন্য চিন্তা। এতে কি কোনও উপকার হবে?

কাজেই এই যে বাল্যশিক্ষার কথাটা বলা হল তাতে অনেকেই খুব অসন্তুষ্ট হবে 'এর' উপরে। অনেকেই বলেছিল, আপনি ধর্মশিক্ষা কি মানেন না? অনেকের প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল, হ্যাঁ শিশু বাল্যশিক্ষা পড়বে, কিন্তু দাদু আর পিতাও কি বাল্যশিক্ষা পড়বে? তখন উত্তরে তারা বলেছিল, হ্যাঁ আপনি বড় shrewd। তখন তাদের বলা হয়েছিল, হ্যাঁ তোমাদের সব কথাই 'এ' মানতে রাজি আছে, কিন্তু তুমি ও তোমরা তো 'এর' একটা কথাও মানতে পারছ না। I accept all of you as My Self, but can you accept Me as your Self? This is a point! 'এ' আগেই বলে নিয়েছে, জগতে যত নিকৃষ্ট আছে তাও আমি আবার

যত উৎকৃষ্ট আছে তাও আমি। যা তোমরা 'একে' বলবে তাই 'এ' মেনে নেবে। যত ভাববৃত্তি আছে মনের সবের মধ্যেই আমি আছি। আমি জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম, পাপ- পুণ্য—যা-কিছু আছে সব আমি, কারণ সবটাই তো চৈতন্যের খেলা। 'এ' তো মেনে নিয়েছে, কিন্তু আর কেউ তো মানতে চায় না।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। কুম্ভমেলাতে সর্ব সম্প্রদায়ের সাধুরাই আসেন পুণ্যস্নানের জন্য। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের camp তৈরি হয়, আখড়া তৈরি হয়। কুম্ভমেলা শুরু হবার বহু পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। পুণ্যতিথিতে স্নানপর্ব শেষ হয়ে যাবার পরে অধিকাংশ সাধুই আপন আপন স্থানে চলে যায়, কিছু সাধু থাকে। স্নানযাত্রা শেষ হয়ে যাবার পরে বেশ কিছু সাধু মেলার এক জায়গায় কয়েকদিন ছিল। তাদের মধ্যে প্রবীণ-নবীন সবরকম সাধুই ছিল। তারা যথানিয়মে অভ্যাসমতো আপন আপন স্থানে ও আসনে জপ-তপ-ধ্যানাদি সাধন করত। অনেকেই রাত্রি জেগে ধ্যান করত, কেউ জপ করত, কেউ পাঠ করত, আবার কেউ বিশ্রাম করত। তারা কেউ নিজ আসন ছেড়ে অন্য কারও স্থানে বা আসনে যেত না। সেখানে প্রতিদিনই সকালে সাধুরা সাধন সমাপ্ত করে স্নানাদি কর্মের জন্য তৈরি হত। কিন্তু একটি অদ্ভুত চাঞ্চল্যকর ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রতিদিনই তারা লক্ষ্য করত। তা হল—প্রত্যেকের লোটা, চিমটা, কম্বল নিজেদের আসনের পাশেই রাখা থাকত। কিন্তু সকালে উঠে দেখত যে সেই জায়গায় অন্যের লোটা, কম্বলাদি রয়েছে। কী করে যে আসত তা কেউই বুঝতে পারত না। সাধুদের মধ্যে এই বিষয়ে বচসা ও কলহ হয়, তারা পরস্পরকে দায়ী করে, কিন্তু কেউই তার যথার্থ কারণ বুঝতে পারে না। কী করে একজনের দ্রব্য আরেকজনের কাছে চলে যায় তা কেউই ধরতে পারছে না ও বুঝতেও পারছে না। একজনের জিনিস আরেকজনের কাছে পাওয়া যায়—এই নিয়ে সাধুদের মধ্যে বিরাট অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন নবীন সাধু মিলে পরামর্শ করে যে তারা রাত্রে ধ্যানের ভান করে বসে থাকবে এবং লক্ষ্য করবে যে কে এই কাজ করে। তারা পরপর দু/তিনদিন দেখতে পায় যে তাদের দলের প্রবীণতম যে সাধু তিনি চুপিচুপি চারদিক দেখে একজনের লোটা, চিমটা প্রভৃতি দ্রব্য আরেকজনের কাছে রেখে সাবধানে নিজ স্থানে চলে যান। দু/তিনদিন পরে অন্যান্য সাধুরা বয়স্ক সাধুদের ক'জনকে সঙ্গে নিয়ে সেই প্রবীণ সাধুর কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে প্রণাম করে প্রতিদিন যে ঘটনা ঘটে তা তাকে জানিয়ে প্রতিবিধান চায়। প্রবীণ সাধু সব কথা শুনে খুব দুঃখ প্রকাশ করেন, আক্ষেপ করেন এবং তাদের জানান যে সাধুদের পক্ষে এই কাজ অত্যন্ত গর্হিত ও এই কাজ সাধুদের শোভা পায় না। তারপর আগন্তুক সাধুরা তার কাছে প্রতিবিধান চায়। উত্তরে তিনি বলেন—সাধুকে তার দোষ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বিচারপূর্বক ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দ্বারা তা শোধনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করতে হবে। তাহলে তার পূর্ব অভ্যাসজাত দোষ মলাদি সব শোধন হবে। এই হল সাধুর দোষমুক্তির বিজ্ঞান....।

....সাধু দু'জন মহান্ত মহারাজের এই কীর্তিকলাপ সকালবেলা উঠে অনেককেই বলে দেয়। ক্রমশ কথাটি মহান্ত মহারাজের কানেও গেল যে, তাঁর এই হীন কাজের কথা সবাই জেনে গিয়েছে। তিনি তখন কেঁদে ফেলে সকলের কাছে স্বীকার করলেন যে, জ্ঞানপথে

এতদিন সাধনভজন করা সত্ত্বেও অতীত অতীত কোনও জন্মের এই সংস্কার থেকে তিনি এখনও মুক্ত হননি। অতীতের কোনও জন্মে কর্মসংস্কারবশত তিনি সাধুদের এক একটি জিনিস লুকিয়ে রাখতেন। এরটা তার কাছে এবং তারটা এর কাছে—এ রকম ওলটপালট করে রেখে দিতেন। সাধুদের সঙ্গে মহান্ত মহারাজের কথোপকথন এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রধান কিছু সাধু একত্র হয়ে সাহস করে মহান্ত মহারাজকে বলল, মহারাজ নমস্কার! কুশল তো সব? মহান্ত মহারাজ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তখন তারা তাদের সমস্যার কথা জানিয়ে বলল, মহারাজ আপনি তো জানেন সবই, আমাদের একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। মহারাজ বললেন, বাতাও ক্যেয়া সমস্যা হ্যায়? সাধুরা পুরো বৃত্তান্ত জানিয়ে বলল যে, আমাদের রোজই এরকম ঘটনা ঘটছে। আমাদের মধ্যে তো শোভনীয় নয়, সাধুদের মধ্যে এই দোষটা থাকা কি ঠিক? মহান্ত মহারাজ বললেন, হ্যাঁ, ইয়ে তো বহুত বুরী বাত হ্যায়! আফসোস কী বাত হ্যায়, ইয়ে তো নেহী হোনা চাহিয়ে! তখন তারা মহারাজকে আরও বলল, ভিতরে কী মনোভাব থাকলে এই রকম কার্য কেউ করতে পারে? তিনি বললেন, দেখো, ইয়ে সংস্কার কী বাত হ্যায়, জন্মজন্মান্তর কা সংস্কার রহ যাতা হ্যায় সবকে ভিতর। ইয়ে সংস্কার হী কাম করতা হ্যায়! সংস্কার কে প্রভাব সে কাম চলতা হ্যায়। আদমী তো আচ্ছা হ্যায়, পড়ালিখা আদমি হ্যায়, বুদ্ধিমান হ্যায়, লেকিন উসকে স্বভাব মে কুছ না কুছ গলতি রহ যাতা হ্যায়। সাধুরা তখন তাঁকে প্রশ্ন করল, লেকিন উসকো হটানে কে লিয়ে ক্যেয়া করনা চাহিয়ে? তিনি বললেন, হটানে কে লিয়ে অভ্যাস, বিচার, বৈরাগ্য—য়হী জরুরত হ্যায়, অউর দুসরা কোই রাস্তা নেহী হ্যায়। তখন সাধুরা আবার প্রশ্ন করল, ক্যেয়া আপ মে অ্যায়সা কোই দোষ হ্যায়? তিনি বললেন, হাঁ, জরুর হ্যায়। মুঝমে ভী অ্যায়সা হী এক দোষ হ্যায়। সাধুরা তখন আবার প্রশ্ন করল, ক্যেয়া দোষ হ্যায় আপকা? তিনি অকপটে দোষ স্বীকার করে বললেন, দেখো বেটা, হাম কিসি না কিসি জনম মে চোর থে, লেকিন ওহ চোরি কা সংস্কার আভিতক রহ গয়া। রাত মে হাম ধ্যান করতে হ্যায়, জপ করতে হ্যায়, সব কুছ করতে হ্যায়, লেকিন বিচ বিচ মে হমারা সংস্কার ইতনা প্রধান হো যাতা হ্যায় কী হম সম্ভাল নেহী পাতে। হম জানতে হ্যায় কী ইয়ে কাম বুরা হ্যায়, হম উসকো হটানে কা কোসিস ভী করতে হ্যায় লেকিন সফল নেহী হো পাতে। হম সংস্কার কো হটানে কে লিয়ে বিচার করতে হ্যায়, সোঁচতে হ্যায়, লেকিন থোড়া সা সংস্কার আভি ভী রহ গয়া, পুরা নেহী গয়া। হমারা বাত তো তুম লোগো কো শুনায়া, অব তুম লোগ মুঝে আপনা আপনা দোষকে বারে মে বাতাও।

তখন প্রত্যেক সাধুই চুপ করে রইল, কোনও কথা কেউ আর বলে না। শরম কী বাত হ্যায় না! এই মহান্ত মহারাজ নমস্য কেননা তিনি তাঁর দোষ স্বীকার করেছেন সবার সামনে, কিন্তু অন্য সব সাধুরা সর্বসমক্ষে দোষ স্বীকার করতে পারেনি। তাদের মধ্যেও তো এইরকম কিছু দোষ তো নিশ্চয়ই রয়েছে। অনেকেই নিম্ন সংস্কারে ভরা, কিন্তু কেউ স্বীকার করবে না। এই জন্যই ঘটনাটি বলা হল।

'এ' জন্মজন্মান্তরের সংস্কার সবার সামনে তুলে ধরছে, কিন্তু 'এর' কাছে যারা জিজ্ঞাসা নিয়ে আসে তারা কিন্তু নিজেদের দোষ স্বীকার করে কোনও কথা বলে না—একেবারে চাবি দিয়ে আসে। তুমি না খুললে কী হবে বাবাধন, 'এর' কাছে তো সব T.V.-র মতো পরিষ্কার! কী করবে? সাধুরা তখন 'একে' বলেছিল, আপ তো সব জানতে হ্যায়, আপ হমলোগো কে লিয়ে কুছ কিজিয়ে। তখন তাদের বলা হল, ঠিক হ্যায়, বিচার করো ব্যাঠকে। তখন তারা বলল, ক্যায়সে বিচার করে হমলোগ? উত্তরে তাদের বলা হল, তুম লোগো কা কোই ব্যাধি বিকার হুয়া ক্যেয়া? কোই doctor-কে পাস গয়া ক্যেয়া? উনহোনে কোই দাওয়াই দিয়া? তুমলোগ অগর দাওয়াই নেহী লোগে, কোই নিয়ম নেহী মানোগে, নিয়ম মে নেহী চলোগে তো ক্যায়সে হোগা? তুম অগর নেহী করোগে তো তুমহারা বিকার, ব্যাধি ক্যায়সে যায়েগা? এ্যায়সে তো নেহী হো সকতা! লেকিন একহী দাওয়াই হ্যায় ইসকা মেরে পাস। তুমহারা যো আত্মা হ্যায় ওহ্ বাহার সে তুম খরিদ নেহী সকতে, কিসি সে লে ভী নেহী সকতে। ওহ্ আত্মা যো তুম খুদ হো ওহ্ চিজ হমকো দক্ষিণা মে দে দো, হম তুরন্ত তুমকো মুক্ত কর দেঙ্গে। লেকিন হম পয়সা নেহী মাঙ্গতে কিসি সে, না হী বিষয় সম্পত্তি মাঙ্গতে হ্যায়। সব কা যো আত্মা হ্যায় ওহ্ চিজ হাম কো দে দো। এ কথা শুনে এক সাধু বলল যে, বাবা ইয়ে তো আপনে বহুত কঠিন বাত বতায়া! হমারা আত্মা আপকো ক্যায়সে দে? তখন তাদের বলা হল, অগর তুম নেহী দে সকতে হো তো মেরী আত্মা লে লো। হমারা আত্মা লে লো, হম কো মান লো তুমহারে হর চিন্তা মে, হর কাম মে। তুম নেহী হো ম্যায় হুঁ, হাম লে লেঙ্গে সব, তুমহারে সারে গলতিয়া হম লে লেঙ্গে। অউর বাত মত করো। জীবধর্ম এ্যায়সা হী হোতা হ্যায়। ওহ্ হামেশা আপনে কো অলগ মানতে হ্যায়, আপনে কো উত্তম মানতে হ্যায় অউর সব কা দোষ দেখতে হ্যায়। ম্যায়নে তুমহে উল্টা সাধন বাতায়া—সব কো আত্মা মানলো, অউর দোষ দেখো খুদ কা। হম সবকো আত্মা মানতে হ্যায় অউর দোষ দেখতে হ্যায় খুদকা (আত্মাকে)। এই প্রসঙ্গে একটি গানে আছে—

ওরে মানুষ ভাই
তোমার আপন কথা তোমারে শুনাই।
পরদোষ দেখো না পরগুণ গেয়ো সদা।
নিজদোষ দেখে চল নিজগুণ গেয়ো না।
অপরকে দিও মান নিজে মান নিও না।
নিজে মান নিলে তোমার বাড়বে অভিমান
অপরকে করবে অপমান সামাল দিতে পারবে না।

(বাউল—কাহারবা)

কথাগুলো বহু বছর আগে একটা ভজনের মধ্যে প্রকাশ হয়েছিল। কথাগুলোর মধ্যে কী আছে তা বোঝবার চেষ্টা কর! আমরা সর্বদা পরদোষ দেখি, নিজের দোষ দেখি না। সকলেই নিজের গুণ গাই, পরের গুণ গাই না। মান নিই নিজে ফলে অভিমানটা বাড়ে, আর অন্যকে করি অপমান। এই হল জীবধর্ম। কিন্তু আত্মার ধর্ম স্বতন্ত্র। একটা গানে বলা হয়েছে—

আপনে আপন স্বরূপ আপন সর্বসম সত্তা নিরুপম।।
সচ্চিদানন্দঘন অখণ্ড পূর্ণ স্বানুভবদেব স্বয়ং পুরুষোত্তম
অক্ষর ঈশ্বর পরাৎপরম অদ্বয় ব্রহ্ম আত্মা সনাতন।।
অনাদি তত্ত্ব সত্য জ্ঞানামৃত কারণ
প্রশান্ত অনন্ত অমল চিরন্তন।।
শাশ্বত অচ্যুত নিত্য অদ্বৈত আপন নিষ্কল নির্মল নিরবদ্য নিরঞ্জন
স্ববোধে স্বভাবে স্বভাবে স্ববোধে আপন
সমরসসুধা পানে সদা মগন।।

(পিলু—কাহারবা)

শুধু আপনবোধের কথাই তোমাদের কাছে রাখা হচ্ছে। আপনবোধ মানেই আত্মবোধ, আত্মবোধ মানেই Knowledge of Oneness, Oneness of Knowledge, Consciousness of Consciousness, Knowledge of Knowledge। তুমি তার মধ্যে তোমার যাকে খুশি বসাতে পার, that is the real nature of your Ishta, your Thakur, your Guru, your Maa, your Atmaa, your Brahma, your Ishwara, God, Allah— যা-কিছু তুমি বসাবে তা শুধু তোমারই পরিচয়। বোধের ঘরে বোধের সন্ধান পূর্ণ করে মেলে। তখন কী আনন্দ, যে আনন্দ জগতে সবকিছু ভোগ করেও সম্ভব নয়, সমস্ত joy of all enjoyment turn pale into insignificance। জগতে সব চাইতে চমৎকারিতা এবং আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য হল discovery of one's own Self-Knowledge। আত্মবোধের আবিষ্কারের চাইতে উত্তম আবিষ্কার আর কিছু হতে পারে না। The awareness of Self-Consciousness, Self-realization is the highest achievement in life. There is nothing superior to the awareness of Self-Consciousness or Self-realization. That is, I-Reality is the Self, I-Reality is the Consciousness Absolute, I-Reality is the Bliss Absolute, I-Reality is 'All Divine for All Time, as It Is'. What remains rest?

আমাদের মধ্যে দুটো আমি আছে। একটা কাঁচা আমি এবং আরেকটা পাকা আমি। কাঁচা আমি অহংকার, তা দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধির সঙ্গে জুড়ে আছে, সংসারের যা-কিছু তাই নিয়ে মাতমাতি করছে। আর পাকা আমি পশ্চাতে থেকে তা দেখছে, শুধু observe করছে witness বা সাক্ষী হিসাবে। পাকা আমি হচ্ছে আমি-র আমি। আর কাঁচা আমি হচ্ছে আমার আমি। পাকা আমি হচ্ছে অহংদেব এবং কাঁচা আমি হচ্ছে অহংকার। এই অহংদেবই হচ্ছে পুরুষোত্তম ভগবান। পুরুষোত্তম—the supreme personality of Godhead Absolute. তুমি তাঁকে ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর-আল্লা-খোদা যা ইচ্ছা বলতে পার, it is upto your choice and selection of the term। সেই পরিচয়টা শোন—

এই যে আমি সবার মাঝে সবার আমি এই আমি যে।।
অখণ্ড এক বোধসত্তা বোধে বোধময় স্বভাবে কত বোধ হয়
প্রকাশ করে সে আপনারে কত বেশে কত দেশে
নামরূপের কত সাজে বিশ্বমূর্তি ধ'রে আছে।।
পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভগবান
আনন্দ আতিশয্যে লীলাকারণ বিশুদ্ধ মানবদেহ করে ধারণ
প্রেমঘন স্ববোধ আপন স্বভাব বোধে করে আচরণ
নির্গুণ সগুণ জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশ করে মহিমা আপন
কথায় ও গানে চিন্তায় ও কাজে।।
বিশ্বজগৎ নামরূপের আধার অস্তি নাস্তি বিভূতি আমার
অন্তরের অনুভূতি কারণ তাহার অখণ্ড বোধের বক্ষে আমার
সবাই তারা নিত্য বিরাজে।।

(আশাবরী—তেওড়া)

'এ' তোমাদের আসল পরিচয়ের কথা বলল। Your Real I is Brahman/Atman or Ishwara. That lies at the core of your heart. হৃদয়ের গভীরে তাঁর বাস। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি"। উপনিষদেও বলা হয়েছে, "যো দেব নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।" হৃদয়গুহাতে নিহিত ব্রহ্ম-আত্মা। কিন্তু কীভাবে? বিশুদ্ধ বোধস্বরূপরূপে, আমি-র আমিরূপে, পাকা আমি রূপে, অহংদেবরূপে, পুরুষোত্তম ভগবানরূপে। তোমার পরিচয় পুরুষোত্তম ভগবান। বর্তমানে তোমরা যে পরিচয় দিচ্ছ so and so, so and so, all these are reflection only, যেমন সূর্যের অনেক প্রতিবিম্ব ঝিকমিক করছে জলের উপরিভাগে—তাকানো যায় না, চোখ ঝলসে যায়। ঐ light-টা reflected হয়ে ঘরে এসে পৌঁছে আয়নার মধ্যে reflected হয়ে দেওয়ালে পড়ছে, দেওয়ালও গরম হয়ে যাচ্ছে। তাহলে reflection-এরও transmission power আছে, কিন্তু that is not real। তোমার এই অহংকার real নয়। এই যে জীবধর্ম, যা পালন করছ তোমরা দেহাত্মবুদ্ধি নিয়ে, 'আমি, আমি' করছ, তা real নয়। তা স্বপ্নবৎ, স্বপ্ন দেখছ। আগের দিন স্বপ্নতত্ত্ব ও তার বিজ্ঞানের কথা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। আর অস্বীকার করতে পারবে না, তবে হ্যাঁ 'একে' মানা তো সম্ভব নয়, কারণ নিজের আমি বা অহংকার তাহলে কোথায় থাকবে? অহংকারকে কে ছাড়তে চায়? তা refugee-দের মতো বেশ করে বাসা বেঁধে বসেছে, তা সহজে ছাড়বে না। আইনকানুন দিয়ে তাকে তুমি জব্দ করতে পারবে না। কারণ Supreme court-এর judge-এরও ঐ অহংকার আছে—যাবে কোথায়! একমাত্র অহংদেবের কৃপায় তা সম্ভব হয়। তিনি তো বলছেন, either you accept all or you reject all। কিন্তু reject করতে তো তোমরা পারবে না, accept করে নাও। 'মেনে, মানিয়ে চল।' জীবনে যা-কিছুর সঙ্গে meet করছ তা-ই আমি। মান, মানতে হবে। তোমার

সুখ, দুঃখ, ভাবনা—যা-কিছু সবটাই সেই আত্মা স্বয়ং। আত্মাই তুমি, সেইজন্য তোমাতেই তুমি। এখানে আত্মার জায়গায় তুমি বসানো হল। তোমাকে জড়িয়ে তোমার চারপাশে তোমার বৃত্তিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা ছাড়বে কেন? তুমি না করলেই তারা শুনবে কেন? আবার এসে ধাক্কা দেবে। যাবে কোথায়! 'এর' বক্তব্যের মধ্যে কিন্তু কোনও জায়গায় flaw রেখে কথা বলা হয়নি। তবে তোমার মন কিন্তু খুব চতুর, দারুণ চতুর। সে কিন্তু ঠিক পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, কিছুতেই মানবে না। এই প্রসঙ্গে একটি গানে বলা হয়েছে—

(অভিমানী মন) নিত্যপূর্ণ একের মহিমা
মানে না মানে না মানে না অভিমানী মন।।
স্বভাব তার ভোগেচ্ছা কাম ভোগে রত অবিরাম
অখণ্ডরে খণ্ড করে চায় পেতে সে ইচ্ছা মতন।।
অদ্বৈতে করে দ্বৈত ভাবনা অভেদে করে ভেদরচনা
নাম রূপের বিশ্বকল্পনা দেহবুদ্ধি ভোগবাসনা
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি যন্ত্রণা দুঃখের কারণ।।
অক্ষর ঈশ্বর ব্রহ্ম আত্মা শাশ্বত সনাতন
সত্য জ্ঞান আনন্দ প্রেম ভূমা সুখ শান্তি পরম।
নাহি সেথা কর্তা ভোক্তা নাহি সেথা জ্ঞেয় জ্ঞাতা
জ্ঞানামৃত সমরসসার স্বতঃস্ফূর্ত নিরুপম।।

(খাম্বাজ—ঝাঁপতাল)

কিছুতেই মানবে না। কাজেই যতই জপ-তপ কর না কেন, তা কিন্তু একটা স্বার্থের জন্য করা হয়। খালি বলছে, ভগবান দাও, দাও, দাও! কত জনম যে তিনি দিয়েছেন, কত যে পেয়েছ, এখন তা ফিরিয়ে দিতে যদি বলেন, পারবে কি দিতে? ছোটবেলা থেকে তো কম পাওনি! Supply তো যথেষ্ট দিয়েছেন। Can you return them? কিছুই দিতে পারবে না! তখন বলবে, ভগবান সব ফুরিয়ে গিয়েছে, কী করব? তুমি তো দয়ালু, তুমি নিজগুণে ক্ষমা করে দিও। আরে তিনি তো ক্ষমা করেই আছেন! তোমার আত্মা তো তোমাকে বরণ করে, বুকে ধরেই রেখেছে। তুমি শুধু তাঁর কথা ভাব না, নিমকহারামি কর। এত ungrateful যে তাঁর কথা ভাবতে গেলে তখন অজুহাত দেখাও, ওঃ ঘুম পাচ্ছে! শরীরটা ভালো লাগছে না! অমুকখানে যেতে হবে, ওকে আসতে বলেছি, so and so, এত formalities! এই হল সংসার! কিন্তু 'এ' তোমাদের কাছে সংসারের জায়গায় সমসারের কথা বলেছে, that is Reality as It is। এখানে কোনও বস্তু Reality-র বাইরে নেই, but that can be appreciated only by Self-Knowledge। সংসারে কাঁচা আমি আমারভাববোধে সবকিছু জানে ও মানে। তার কাছে বৈচিত্র্যময় আমারবোধই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সে আমারবোধকেই আপনবোধ মনে করে। কিন্তু আপনবোধের মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য থাকে না। তা সবসময়ই সমবোধে একবোধে অদ্বয়বোধে নিত্যসিদ্ধ।

মন্তব্য ঃ

সমস্ত কিছুর সত্য একমাত্র আত্মবোধে। 'ব্রহ্মবোধে জগৎ সত্য, জগদ্বোধে তা আবৃত'— জগদ্বোধে কিন্তু ব্রহ্মকে পাবে না, কোত্থাও পাবে না। ঐ বাল্যশিক্ষা পাঠ করতে পার, তার বেশি এগোবে না। আত্মশিক্ষা তাতে আসবে না। কাজেই অজ্ঞানকারণকে দূর কর। একমাত্র আমিবোধে তা grasp করে নাও। তোমরা জান না তাই তোমরা নিজেদের খুব দুঃখী মনে কর। কিন্তু জীবনে তোমাদেরই পাশে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁদের তোমরা ছবিতে দেখ, তাঁদের জীবনের লক্ষ ভাগের একভাগ দুঃখও আমরা কেউ পাই না। তবু আমরা বলি, আমি দুঃখী! আমার কত কষ্ট, কত দুঃখ! অর্থাৎ সত্যিই প্রত্যেকেই justify করার চেষ্টা করে যে, তার দুঃখই সবার চাইতে বেশি। কিন্তু সমস্ত দুঃখটাই যে আমি-রই প্রকাশ এই জ্ঞান কবে হবে? বিরাট হৃদয়টা কবে খুলবে— all verily is I-Reality, there is none apart from Me। আমি-র বাইরে কেউ নেই, চৈতন্যের বাইরে কেউ নেই। অহংদেব সমস্ত দেবতার একীভূত বা ঘনীভূত মূর্তি। ভক্ত বলছে, প্রভু যখন ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমায় দেখি তখন তোমায় দেখি বিশ্বরূপে। আর যখন মন দিয়ে তোমায় দেখি তখন দেখি তুমি আড়ালে। তখন আমি কর্তা-ভোক্তা সেজে খেলা করি। আর যখন বুদ্ধি দিয়ে তোমায় দেখি তখন সংশয়ে পড়ি এবং মনে করি, তাই তো কোনটা তুমি? কোন রূপটা সত্যি, কোন নামটা সত্যি, কোন ভাবটা সত্যি? তখন তোমার আসল রূপ নির্ণয় করতে পারি না। কিন্তু যখন স্ববোধে তোমাকে দেখি তখন দেখি আমি-ই তুমি এবং তুমি-ই আমি! বাঃ ক্যেয়া বাত হ্যায়! আমি-ই তুমি, তুমি-ই আমি। 'ত্বম্ অহম্ অহম্ ত্বম্।' "একমেবাদ্বয়ম্"—নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবল। 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ স্বসংবেদ্যম্ স্বানুভবদেবম্।' আজকের মতো এখানেই সচ্চিদানন্দ করা হচ্ছে, আবার কালকে বলা হবে। কালকে এই আমিবোধের প্রসঙ্গ ধরে আমিবোধের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এবং একীভূত হওয়ার আরও বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে। সর্বব্যাপী অখণ্ড ভূমা আমিতত্ত্বের বক্ষে আমিরই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি সকল আমির অর্থাৎ স্ববোধের তথা আপনবোধের সত্যমহিমাকে আপনিই তা আপনবক্ষে প্রকাশ ক'রে আপনিই তা ধারণ করেন, বরণ করেন এবং তাকে আপনার আপনবোধে মিলিয়ে নেন। পাকা আমির এই আপনবোধের ধর্ম—স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। তার অন্যথা বা ব্যতিক্রম কখনওই সম্ভব নয়। নিত্যাদ্বৈতের বক্ষেই নিত্যাদ্বৈতই স্বয়ং আপনবোধে আপনাকে অনুভব করেন। তা-ই হল স্বানুভূতির পরিচয়। স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষ নিত্য অদ্বৈত এই আপনবোধের বিজ্ঞানকে সদগুরু বেশে আবির্ভূত হয়ে আপনার অভিন্ন অংশ জীবভাব অর্থাৎ অহংকারের কাঁচা আমিকে আপনার মধ্যে আত্মসাৎ করে নেন। এই ভাবেই নিত্যাদ্বৈতের নিত্যলীলা স্ববোধে আপনবোধে আপনবক্ষে নিরন্তর হয়ে চলেছে। আপন অতিরিক্ত কল্পনা ও ভাবনার মাধ্যমে আমিসত্তার অনন্ত অনন্ত প্রকাশ ব্যষ্টি আমির হৃদয়তে পাকা আমি আপন মহিমাকে আপনবোধে জাগিয়ে দেন।

২৬/১২/০১

।। দ্বাদশ বিচার ।।

ওঁ বন্দেঽহং স্বানুভবদেবম্
সর্বদেব দেব পুরুষোত্তম সচ্চিদানন্দঘন।
ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম পরম শাশ্বত সনাতন
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হরিহর পরাৎপরম্।
নিষ্কল নির্মল নিরঞ্জনম্ স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংপূর্ণ
সর্বসমদেব অনুপম অদ্বয় অব্যয় প্রিয়তমোত্তম।।

(ভৈঁরো—ত্রিতাল)

যে কথাগুলি প্রকাশ হল তা নতুন যুগের মানুষের জন্য নতুন ভঙ্গিমায় বলা হল— শাস্ত্রে যে কথাগুলো ব্যক্ত করা হয়েছে। এই কথাগুলো দিয়ে জীবনকে রাঙিয়ে নাও, জীবনকে পূর্ণ করে নাও। ভগবান স্বয়ং সত্যস্বরূপ কলিযুগে এসে এই কথাগুলি প্রকাশ করে যাচ্ছেন। ভগবানের মহিমা গুণের দ্বারা আবৃত হয়ে গিয়েছে বলে মানুষ এত কষ্ট পাচ্ছে—দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, প্রাণিক ইত্যাদি। তার পরে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের মতবিরোধ বা দ্বন্দ্ব তো আছেই। কলিযুগে মানুষের স্বভাবে যে-সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় তাতে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের অংশ খুবই কম। আজকাল গুরুজনদের সেবা করা বা শ্রদ্ধা করার ভাব খুবই কম। একেবারে যে নেই তা বলা হচ্ছে না,-খুব কমসংখ্যক মানুষের মধ্যেই তা রয়েছে। মানুষের মধ্যে মিথ্যার আচরণটাই বেশি। সেইজন্য ভুল-ভ্রান্তি-ভয় মানুষের মধ্যে বেশি দৃষ্ট হয়। তা ছাড়া রোগ-শোক তো আছেই। এগুলোর একমাত্র কারণ হল, আমাদের ভিতরে যিনি বসে আছেন, অর্থাৎ আমাদের আত্মসত্তা ভগবান নারায়ণ—তাঁকে হরি বল, রাম বল, কৃষ্ণ বল, বুদ্ধ বল, আমরা সর্বতোভাবে তাঁকে মানি না। তিনি আমার তোমার সবার ভিতরে বসে আছেন আমার/তোমার সত্তা ও শক্তি রূপে। তাঁকে বাইরে আমরা মানতে আরম্ভ করতে পারি ঠিকই—পূজাপাঠ, স্তবস্তুতি করে, কিন্তু এগুলো তো নিজেকে দিয়ে আরম্ভ করতে হয়। একটা মন্ত্র পড়তে গেলেও নিজেকেই উচ্চারণ করতে হবে ও ভাবতে হবে। তা-ই আবার নিজের মধ্যে নিজেই অনুভব করবে। স্তব করলেও তা নিজের কানে এসে নিজবোধের মধ্যে এসে প্রবেশ করবে। জপ-ধ্যানের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ আমাদের আসল পরিচয় রয়েছে আমাদেরই হৃদয়ের গভীরে, কিন্তু অন্তঃকরণ তা ঢেকে রেখেছে। অন্তঃকরণের দোষ নেই, তা ঢেকে রাখার কারণ হচ্ছে অতি প্রিয় বস্তুকে আমরা যত্ন করে রাখি। বাড়িতে দামি বা মূল্যবান জিনিসকে, খুব বেশি প্রিয় জিনিসকে আমরা সযত্নে রাখি। সেইজন্য আমাদের এই দেহের ভিতরে অতি সযত্নে রক্ষিত আছেন আত্মারাম প্রাণারাম পুরুষোত্তম ভগবান।

তিনি যুগে যুগে লীলা করেন এসে। তিনি বলেন, আমাকে ভুলে যেও না। সবকিছু কর, সংসার কর, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। সংসারটা তাঁরই একটা বিশেষ রূপ। বিশ্বরূপটা তাঁরই একটা বিশেষ রূপ। বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে তিনি অনুস্যূত হয়ে আছেন, কেননা তিনি যে সর্বেশ্বর হরিহর আত্মারাম প্রাণারাম প্রিয়তমোত্তম। প্রিয়তম বস্তুটি হল তা-ই যাকে আমরা আপন বলে ব্যবহার করি। অতীব আপন তিনি, তিনি নিকটতম প্রদেশে আছেন, অর্থাৎ আমাদের আমি-র মধ্যে আমি-র আমি/পাকা আমি হয়ে বসে আছেন। সেই পরমদেবতাই হলেন জীবনদেবতা। তিনিই পরমাত্মা পরমেশ্বর পরব্রহ্ম সনাতন। তাঁর মহিমার অন্ত নেই। অখণ্ড অনন্ত মহিমা তাঁর। সব নিয়ে তিনি পূর্ণ। এই হচ্ছে তাঁর অভিনব মহিমা, তাঁর মধ্যে কোনও জিনিসের অভাব নেই—অপূর্ণতা নেই, স্বল্পতা নেই। সবকিছুকে তিনি প্রকাশ করে নিজবক্ষে ধারণ করে বসে আছেন। এই কথাগুলো খুব মন দিয়ে না-শুনলে পবের কথাগুলো তোমরা বুঝতে পারবে না। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে জন্মের পর থেকে তার দেহ যতদিন পর্যন্ত সচল বা সক্রিয় থাকে ততদিন তার মধ্যে কতরকম ভাবের প্রকাশ হয়। ভালব যে কতরকম স্তর, কতরকম বৃত্তি, মন্দের যে কতরকম বৃত্তি, কতরকম চিন্তাভাবনা—সব নিয়ে একটা মানুষের মধ্যে অনন্ত ভাবের বৃত্তি খেলে। সমস্ত ভাবের বৃত্তিগুলো যদি পৃথক করে তার সামনে ধরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে দেখবে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি গোপাল খেলে বেড়াচ্ছে তোমার চারপাশে, একটি গোপাল নয়।

বৃন্দাবনে গোপীরা এক কৃষ্ণকেই পৃথক পৃথক করে নিজেদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল। প্রত্যেকেব সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ খেলেছেন। তা আর কিছুই নয়, প্রত্যেকের মধ্যে আত্মারূপে তিনি বিরাজমান, তিনিই প্রিয়তম। 'এ' আরও ছোট করে বলছে যে, প্রিয়তমোত্তম। মানে তাঁর চাইতে বেশি প্রিয় আর কেউ হতে পারে না। তিনিই তোমার প্রাণারাম। তোমার শরীরের অণু-পরমাণুর মধ্যে সবকিছুকে তিনিই পরিচালনা করছেন। আমাদের মন কতটুকু তা খেয়াল রাখে বল? প্রতিটি প্রাণের স্পন্দন, আমাদের অনুভূতির প্রত্যেকটি স্পন্দন, সব তিনিই প্রকাশ করছেন। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। তাঁর প্রকাশধারা হচ্ছে তাঁর সন্তান, আপন সন্তানকে ভালবেসে উজাড় করে তিনি নিজেকে ঢেলে দিচ্ছেন। কেননা তিনি লীলাময় পুরুষ। তিনি কার সঙ্গে লীলা করবেন? তাঁর মধ্যে তো তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। দু'জন হরি, দু'জন শিব ও দু'জন ব্রহ্মা তো হয় না। কিন্তু তিনি কী করলেন তাহলে? তিনি দেখলেন যে, এই শিবের শিবত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মাত্ব—তা-ই হল আমিতত্ত্ব। পরমতত্ত্ব আমিবোধ, যে আমিবোধ সর্বপ্রকার ভাববোধকে ধারণ করে রেখেছে। এই আমি-র নামই হচ্ছে আত্মা।

আপনবোধ আত্মা, আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মাই ঈশ্বর। এই ঈশ্বরই সবকিছুকে প্রকাশ করে ধারণ করে রেখেছেন। তিনি ধর্মস্বরূপ। আমাদের মধ্যে ধর্মরূপে তিনি সমস্ত বৃত্তিকে—শুভ-অশুভ, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ সবকিছুকে ধারণ করে রেখেছেন। তা ব্যাখ্যা করতে গেলে কিন্তু শেষ করা যাবে না। একটা নিকৃষ্ট ব্যক্তির মধ্যেও তার সমস্ত ভাবকে তিনিই ধারণ করে

রেখেছেন। একদিন রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে এক শহরতলীতে কয়েকটি কুকুর দেখতে পেলাম। 'এ' দেখল যে, কুকুরগুলোর একটা করে পা নেই, কারও দুটো পা-ই নেই, কিন্তু তবুও তারা খেলছে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে 'এ' নিজের মধ্যে ডুবে গেল, অর্থাৎ 'এর' বাহ্য চেতনাটা লুপ্ত হয়ে গেল কিছু সময়ের জন্য। যখন হুঁশ ফিরে এল তখন 'এ' দেখল, 'এর' চারপাশে কয়েকজন লোক 'এর' মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী ঘটেছিল তখন সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না, একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়েছিল যার জন্য এরা অবাক হয়ে 'এর' মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। 'এ' যখন একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠবার জন্য তৈরি হচ্ছিল তখন তারা বলল, আপনি একটু বসুন! আপনি কি অসুস্থ? উত্তরে তাদের বলা হল, না তো! তারা বলল, হ্যাঁ, আপনি অসুস্থ! তখন তাদের বলা হল যে, 'এ' যে অসুস্থ তা তো 'এ' বুঝতে পারছে না! তখন তারা বলল, আপনি ওরকম ভাবে কেঁদেছিলেন কেন? তখন তাদের বলা হল, কই 'এ' তো কিছু জানে না! তারা বলল, আপনার কান্না শুনেই তো আমরা সব এলাম! তখন তাদের বলা হল, 'এর' তো কিছু মনে পড়ছে না। (খুব অদ্ভুত লাগছিল তখন নিজেকেই)

তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সমস্ত বিষয়টা এক এক করে স্মৃতিতে ভেসে উঠল। তখন তাদের বলা হল, দেখ, তোমাদের কাছে এর কারণ বললে তোমরা হয়ত বিশ্বাস করবে না! এখানে বোধহয় কয়েকটা কুকুর ছিল। তারা বলল, হ্যাঁ, কুকুরগুলোকে তো আমরাও এখানেই দেখেছি, কিন্তু কোথায় যেন চলে গেল! তখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, কুকুরগুলোকে কি তোমরা রোজই দেখ? তারা বলল, না, এই আজকেই প্রথম দেখলাম। তারপর তাদের বলা হল, দেখ এই কুকুরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম কারও একটা পা নেই, কারও বা দুটো পা-ই নেই, কিন্তু তবুও তারা খেলছিল। ওদের দেখতে দেখতে 'এ' ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারা বলল, আপনার কান্না শুনেই আমরা এসেছি! অনেক insist করাতে তখন তাদের বলা হল যে, দেখ, তোমরা এ সব বিশ্বাস করবে না, কারণ তোমরা তো শিক্ষিত মানুষ। 'এ' নিজেকেই তাদের মধ্যে দেখল। এ যেন তখন কুকুরের বাচ্চাগুলোর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়েছে, তাদের মতো 'এর'ও যেন পা নেই—তাদের মতোই যেন 'এ' খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে আর খেলছে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে 'এ' যেন ঘুমিয়ে পড়ল। তারা এই কথা শুনে বলল, তা কি কখনও সম্ভব? উত্তরে তাদের বলা হল, তা তো বলতে পারব না। কিন্তু ঘটনাটা এরকমই ঘটেছে। এইরকম ঘটনা বহুবার, একাধিকবার অনেক জায়গায় অনেকরকমভাবে ঘটেছে।

একবার শিয়ালদহ স্টেশনে রাজমহলে যাবার জন্য অনেকের সঙ্গেই উপস্থিত ছিলাম। সকলেই platform-এ দাঁড়িয়ে, সময় আছে বলে অনেকেই গল্পগুজব করছিল। সময় হতে 'একে' first class কামরায় নিয়ে গেল। First class-এ তখন একটা করে বগি থাকত, তার মধ্যে অনেকগুলি compartment থাকত, সামনে একটা common corridor থাকত এবং দুই প্রান্তে দু'টো করে চারটি toilet থাকত ঠিক AC Two Tier-এর বগির মতো। কোনওটাতে আবার দুটো করে berth, কোনওটাতে চারটে করে berth—এপাশে, ওপরে, নিচে। পুরো

first class কামরা book করা হয়েছিল। দলবেঁধে অনেকেই গিয়েছিল, প্রায় ষোলো/ সতেরোজন। তার মধ্যে কয়েকজন মাও ছিলেন, তারাও যাচ্ছেন। সঙ্গে ফল, মিষ্টি অনেক কিছু নেওয়া হয়েছিল। 'একে' একটা lower berth দিয়েছিল, সেখানে বিছানা করে দেওয়া হয়েছিল। 'এ' আপন মনে জানালার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। হঠাৎ একটু খেয়াল হতেই দেখলাম দরজার দিকে একটি মাতৃমূর্তি—চৌদ্দো/পনেরো বছরের হবে, পা পর্যন্ত তার চুল। ছোট একটা তোয়ালে তাঁর গায়ে জড়ানো ছিল। তাঁর চোখগুলো টানাটানা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভিতরে যা দেখবার দেখে নিলাম। সে একেবারে compartment-এর মধ্যে ঢুকে এসেছে। 'এও' বিছানার থেকে উঠে তাঁকে মা সম্বোধন করে পরনের কাপড় তাঁকে দিয়ে দিল। তখন 'এ' জামা গায়ে দিত না। প্রায় বিশ বছর 'এ' জামা গায়ে দেয়নি। তবে কাপড়ের আঁচলটাই কাঁধে থাকত, শীত-গ্রীষ্ম সবসময়ই। তাঁর গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিতেই সে খিল খিল করে হেসে উঠল। তার পরের ঘটনা 'এর' আর খেয়াল নেই। এই দৃশ্য অনেকেই বাইরে থেকে দেখছিল। কিন্তু যারা 'এর' সঙ্গে ছিল তারা গাড়িতে কারওকে উঠতে দেখেনি, তারা gate-এর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পর ননীবাবু এবং অন্যান্য সকলের খেয়াল হতে গাড়ির ভিতরে উঠে এল। তারপর মায়েদের মেয়েটিকে ফল মিষ্টি দেওয়ার কথা বলা হল। ফল মিষ্টি দেওয়াতে সে হাত পেতে তা নিল, কিন্তু ননীবাবু যখন তাকে টাকা ও কাপড় দিতে গেলেন তখন সে কিছুই নিল না। শুধু 'এর' দেওয়া পরনের কাপড়টা সঙ্গে নিয়ে হাসতে হাসতে গাড়ি থেকে নেমে গেল। 'এ' তো উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোনও হুঁশই নেই, একদম সমাধিস্থ। পরে অনেকেই 'একে' বলেছিল যে, platform-এ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁকে আর দেখতে পাওয়া যায়নি। গাড়ি তখন দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে। তারপর 'এ' প্রকৃতিস্থ হতেতারা 'একে' কাপড় পরিয়ে দিল। সেদিন সারারাত একটা অদ্ভুত ভাবের মধ্যে 'এ' ছিল। তার পরে তিনপাহাড়ে যখন গাড়ি থেকে নামানো হল তখন দেহের কোনও চেতনা নেই। Guard বাধ্য হয়ে train-কে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখল। Train ছেড়ে দিতে হবে, সেজন্য নিজেদের গাড়ি নিয়ে এসেছে, গাড়ি করে সকলকে নিয়ে যাবে রাজমহলে। ওই অবস্থায় ধরাধরি করে train থেকে 'একে' কোনওরকমে নামানো হয়। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করল খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে তখন দু'দিকে শুধু ধানক্ষেত দেখতে পেলাম। খুব সুন্দর পরিবেশ। তখন ভোরবেলা, সূর্য সবে উদিত হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর খেয়াল হতে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ভোর হয়ে গিয়েছে। যারা সঙ্গে ছিল তারা 'একে' জানাল যে, এখন আমরা রাজমহলে যাব আধঘন্টার মধ্যে। যাই হোক, এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আমাদের মধ্যে যে দেবতা আছেন, ঈশ্বর আছেন তা আমরা জানতে পারি বিশেষ বিশেষ অধিকারী পুরুষের সঙ্গ করলে। কিন্তু ওইটুকু জানলে তো হবে না, মানুষের মধ্যে সেই দেবত্বকে জাগিয়ে তোলা, ঈশ্বরত্বকে জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে ঈশ্বরকোটি পুরুষদের ধর্ম।

ঈশ্বরকে কে জাগাবে? আত্মাকে কে জাগাবে? আত্মা তো নিত্য জাগ্রত ভগবান। তাঁকে কি জাগানো যায়? তবু মানুষ গতানুগতিক ভাবধারায় চলতেই অভ্যস্ত। মন্ত্র জাগরণ, দেবতার

মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা, এগুলো কতগুলো বাহ্যিক নিয়মের মধ্যে পড়ে। প্রাণশূন্য কোনও সৃষ্টি নেই। অতি জড় বস্তুর মধ্যেও প্রাণ নিহিত আছে। সেই প্রাণের হয়ত আধার বা দেহ সব জায়গায় উপযুক্ত ভাবে তৈরি হয় না। সবাই জানে যে, কাঠের মধ্যে ঘুন ধরে অর্থাৎ একরকম পোকা কাঠের মধ্যেই তৈরি হয়। কাগজ স্তূপাকার করে রেখে দিলে, পুরানো বইপত্রের মধ্যে উঁইপোকা হয়। ধান, গম, যব, ডাল, সুজি, আটা, ময়দা পরিষ্কার পাত্রের মধ্যে রেখে দিলে কিছুদিন পরে খুললে দেখা যায় যে তার মধ্যে পোকা হয়ে গিয়েছে—নানারকম shape-এর পোকা। অর্থাৎ অব্যক্তের মধ্যে যে প্রাণ থাকে সেই প্রাণ আস্তে আস্তে ব্যক্ত হয়, রূপ ধারণ করে। এই কথা শুনে কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা অব্যক্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি। মায়ের জঠর হতে জন্মগ্রহণ করার আগে আমরা অব্যক্তের মধ্যেই থাকি, আমাদের দেহ থাকে না। কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা,পশুপাখি, দেবতা সবার ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য। অব্যক্ত থেকে আস্তে আস্তে ব্যক্ত হয়ে রূপ ধারণ করে, কেননা প্রাণের খেলা খেলবে বলে। প্রাণের খেলার মধ্যে হার-জিত তো নিশ্চয়ই থাকে। খেলার মধ্যে হার-জিত থাকবেই। মানুষ কিন্তু কেউ হাবতে চায় না, জিততেই চায়। হেরে গেলে মন খারাপ হয়ে যায়।

ঈশ্বর হারতে চান, তিনি হেরে আনন্দ পান, কিন্তু মানুষ জিতে আনন্দ পায়। দেবতারা দিয়ে আনন্দ পান এবং মানুষ নিয়ে আনন্দ পায়। মানুষের মধ্যে আবার ধীরে ধীরে দেবতার ভাব আসে। তখন তারা দিয়ে আনন্দ পায়। প্রত্যেকের বাড়িতে মা-বাবা আছেন, গুরুজনরা আছেন, তারা কিন্তু একসময়ে নিজেরা নিয়েছেন যখন ছোট ছিলেন। তখন নিজের ভাগটা কারওকে ছাড়েননি, নিজেরাই নিয়েছেন, তার পরে যখন বড় হয়ে সংসারে প্রবেশ করলেন, মা-বাবা হলেন তখন তারা তাদের ছেলেমেয়েদের, নাতি-নাতনিদের সব দিয়ে আনন্দ পেয়েছেন—নিজের ভাগেরটাও·দিয়ে আনন্দ পান। এ বড় অভিনব! তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। দেবত্বকে কী করে দেখতে হয় 'এ' তার কয়েকটি নমুনা বলছে। মন্দিরের দেবতা নড়েচড়ে না, কিন্তু এই জীবন্ত দেবতা, যাদের নিয়ে আমরা চলছি তাদের কী করে মানা যায় এবং জানা যায় সেই বিজ্ঞানই সবার সামনে বলা হচ্ছে। দেখ, অনেকেই ঘরে গোপালের ছবি রাখে, বালক রামের ছবি রাখে এবং দেবদেবীর ছবি রাখে, মহাপুরুষদের ছবি রাখে, মূর্তিও রাখে, তাঁদের সাজায়, পোশাক পরায়, ভোগারতি দেয়। নিজেদের মতো করেই তাঁদের ভাবে। তাঁদের শয্যা দেয়, স্নান করায়, খাওয়ায়। অনেকে বলবে, এগুলো মাথা খারাপের লক্ষণ। না, তা প্রাণেরই খেলা। আমরা বাইরে থেকে সবাই বুঝি না বলে আমরা তা মানি না, কিন্তু যাঁরা এগুলি করেন তাঁরা এর মধ্যেই প্রাণের সাড়া পান। লোকে বিশ্বাস করবে না যে, একটা ছোট্ট মূর্তি যদি জীবন্ত হয়ে নাচে, চারপাশে ঘোরে, কথা বলে, আদর নেওয়ার জন্য কোলে লাফিয়ে পড়ে— এগুলো সত্য। এগুলো কিন্তু স্বপ্ন নয় সম্পূর্ণ, যদিও অদ্বৈতের দৃষ্টিতে তা কিন্তু স্বপ্ন। কিন্তু জাগতিক দৃষ্টিতে সবই প্রাণবন্ত। যদিও এই প্রাণ আর অদ্বৈতের প্রাণের মধ্যে তফাতকিছু নেই, এ কথা 'এ' অন্য ভঙ্গিমায় অনেক জায়গায় বলেছে। প্রতিদিন

জীবন নয়। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে যা সম্ভব হচ্ছে—চলাফেরা, ওঠাবসা, কথা বলা, সুখ-দুঃখ বা ভাবনাচিন্তা সবকিছুর মধ্যেই চেতনার প্রকাশ বা প্রাণের প্রকাশ। যা আমাদের ভাল লাগে আমরা তাই নিয়ে মাতামাতি করি, আর যা ভাল লাগে না তা আমরা পরিহার করি। কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের ভিতরে এমন একটা বোধ জাগে যখন ভাল লাগা আর ভাল না-লাগা, দুটোর মধ্যেই আমরা সমান থাকতে পারি। তখন ঈশ্বরের মহিমা আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। ঈশ্বরের ভাষায় ঈশ্বর বলেছেন যে, আমি সমস্ত ভূতের মধ্যেই, সব প্রকাশের মধ্যেই সমান ভাবে রয়েছি। সুখেও আমি, দুঃখেও আমি, জন্মের মধ্যেও আমি, মৃত্যুর মধ্যেও আমি, জাগ্রৎ অবস্থায়ও আমি, ঘুমের মধ্যেও আমি, নিষ্কর্মের মধ্যেও আমি এবং কর্মের মধ্যেও আমি।

একথা শুনে অনেকে বলেছে যে, এ কথা তো আমরা মানতে পারব না। আমাদের যা ভাল লাগে না তা আমরা পরিহার করব। উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, তুমি যা পরিহার করছ তা কিন্তু আরেকজনের কাছে খুব প্রিয়, আবার সে যা পরিহার করছে তা তোমার কাছে হয়ত প্রিয়। তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী? আমরা যথার্থ ভাবে পরিহার করার মতো কিছু খুঁজে পাই না। পরস্পরের সঙ্গে ভাবের কিছু তফাত হয়, কিন্তু মূলত সব একই থাকে, সমান থাকে। কেউ করছে plus, কেউ করছে minus। যে minus করছে তার minus-এর অংশটা আরেকজন গ্রহণ করে plus করে নিচ্ছে, আবার আরেকজনের minus-এর অংশটা আমরা হয়ত অনেকে গ্রহণ করে তা plus করে নিচ্ছি। কাজেই ঈশ্বরের এই লীলার মধ্যে শুধু plus আর minus-এর খেলা, অর্থাৎ নেওয়া আর দেওয়া। দেখ আমাদের যে প্রাণ চলছে অন্তরে, ভিতরে এই প্রাণও কিন্তু তা-ই করছে। বাইরে থেকে শ্বাস নিচ্ছে অর্থাৎ oxygen নিচ্ছে, আবার ভিতর থেকে carbon dioxide ছেড়ে দিচ্ছে। অতি অদ্ভুত খেলা! শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া আমাদের খেয়াল করতে হয় না, তা আপনা আপনিই হয়ে চলেছে। প্রাণরূপে বসে ঈশ্বর কী ভাবে আমাদের ধারণ করে রেখেছেন! দেবতা বা ঈশ্বরকে সর্বত্র সর্ব অবস্থায় কী ভাবে দর্শন করা যায় 'এ' সেই বিজ্ঞানই তোমাদের বলছে। তোমার কাছে আত্মীয় প্রিয়জন এলে তাদের নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তুমি আনন্দ কর। তার পরে সে চলে গেল। তখন বিষাদ, মনটা খারাপ হয়ে গেল। তখন মনে হয়, ইস, এতদিন পরে এসে চলে গেল, একটু থাকল না! তিনিও যখন এসেছিলেন খুব আনন্দ পেয়ে গেলেন, যাওয়ার সময় তারও মন খারাপ হয়ে গেল। এই আসা-যাওয়ার মধ্যে কিন্তু উল্টো ফলও আছে। আমাদের অপ্রিয়জন যদি বাড়িতে আসে তখন কিন্তু আর আনন্দ হয় না। তখন সবাই ভাবে, কখন যাবে রে বাবা! আর যে সহ্য করতে পারছি না! সে তখন গেলে বাঁচে। এই অবস্থা। তাহলে দেখ, ভিতরে ভাব কী ভাবে এই plus আর minus-এর খেলা খেলছে। দুটোই কিন্তু ভাব। ভাব মানে বোধ বা চেতনার এক বিশেষ আভাস, সে যে এসেছে এ একটা অনুভূতি, সে যে আছে তাও অনুভূতি, ভাল লাগাটা একটা অনুভূতি, ভাল লাগছে না—এও অনুভূতি, সে চলে গেলে ভাল হয়—এও

একটা অনুভূতি। কতগুলো অনুভূতির বৃত্তি পরপর সাজানো আছে, যেমন নানারকম রং-এর bulb সাজানো আছে। 'এ' সেই বিজ্ঞানটা তোমাদের বলছে। তা খুব কঠিন, কিন্তু 'এ' তা সহজ করে জলের মতো করে সবার সামনে রাখছে।

দেখ, যখন কোনও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন তখন অনেকেই তাঁকে বুঝতে পারে না, মানতে পারে না, তাঁর কীর্তিকলাপকে সমর্থন করতে পারে না। তাঁর দেহরক্ষার অনেক পরে মানুষ তাঁর জয়গান গায়, তাঁর কথা বলে, আলোচনা করে, পাঠ করে, তাঁকে নিয়ে নানারকম গবেষণা হয়, তাঁর নামে অনেক গান রচনা হয়, তাঁর ছবি-মূর্তি পূজা করা হয় ইত্যাদি। কিন্তু দুর্গাপুজোর সময় আমরা কী দেখি? তা মহাপূজা, মহাশক্তির পূজা। নিশ্চয়ই সবাই লক্ষ্য করেছ যে, দুর্গাপুজোর সময় সেখানে কিন্তু লক্ষ্মী পূজার আগে অলক্ষ্মীর পূজা করতে হয়। অসুরের পূজা, পশুরাজ সিংহেরও পূজা হয়, তারও মন্ত্র আছে। তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, শক্তির যতগুলি প্রকাশভঙ্গিমা আছে তা যখন আমরা গ্রহণ করছি বা বরণ করছি তাকেই আমরা পূজা বলছি। এই পূজা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে হয়ে চলেছে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে যদি দেখি একজন সুন্দর স্বাস্থ্যবান পুরুষ যাচ্ছে তখন আমরা বলি, বাঃ লোকটার স্বাস্থ্যটা কী সুন্দর। এও কিন্তু পূজা। একটা সুন্দর বাচ্চা ছেলেকে দেখে আমরা বলি, 'আঃ কী সুন্দর ছেলেটা! এও পূজা। 'এ' ঈশ্বর দর্শন করতে করতে কোথায় পৌঁছে গিয়েছে সেই কথাই তোমাদের সামনে রাখছে। 'এর' কাছে এক ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই। অতি নিকৃষ্ট ভাবে যে 'এর' কাছে এসেছে তাকেও আপন বলেই গ্রহণ করা হয়েছে, কেননা এই অভ্যাস 'একে' টেনে নিয়ে গিয়েছে। তাতে 'এ' যে আনন্দ পেয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই আনন্দের আদি-অন্ত নেই। অনেকেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে যে, অনেকে অন্যকে খাইয়ে আনন্দ পায়, বসিয়ে যত্ন করে খাওয়াতে ভালবাসে। এরকম অনেকে আছে। আবার যারা খেতে পারে এরকম লোক দেখলে পরে তারা বলে, ওঃ ও বেশ খেতে পারে! ওকে খাইয়ে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়! এও কিন্তু পূজা। আবার এক একজন কথা বললে তারা বসে মন দিয়ে শোনে, আপত্তি করে না, বিরোধিতা করে না। এও পূজা।

একবার 'একে' একটা দুষ্টু ছেলে, club-এর ছেলে বলেছিল, আমরা যে আড্ডা মারি তাও কি পূজা? তাকে উত্তরে বলা হয়েছিল, হ্যাঁ বাবা তাও পূজা। চৈতন্য দিয়ে যা কিছু গ্রহণ করা, বরণ করা হয় এবং জানা যায় তা-ই পূজাপদবাচ্য। হঠাৎ ধাক্কা খেলে যেরকম হয় সেরকম আঁতকে উঠেছিল ছেলেটি এই কথা শুনে। ওর দলের লোকেরা 'একে' পরে বলেছিল, আরে, কী বলছেন উনি! তাদের বলা হয়েছিল, হ্যাঁ, 'এ' ঠিক কথাই বলছে। তখন তারা প্রশ্ন করল যে, আমরা যে অখাদ্য কুখাদ্যগুলি খাই তাও কি পূজা? উত্তরে বলা হল, হ্যাঁ, তাও পূজা। এখানে অনেকেই আছে যারা 'এর' এই কথা সমর্থন করবে না—তাও কিন্তু পূজা। মন্ত্রের মধ্যে একটা negative part আছে এবং একটা positive part আছে। একটা দেওয়া এবং আরেকটা নেওয়া। কাজেই আমাদের সমস্ত জীবনটাই হচ্ছে একটা পূজা, সমস্ত পূজার

কতগুলি series। জেগে উঠে এই যে রূপকে দর্শন করছি, সূর্যোদয় হচ্ছে, বাতাস বইছে, শীতল হাওয়াতে শিহরণ জাগছে, ভাল লাগছে—এই সমস্তটাই কিন্তু পূজা। এক কথায়, বোধ দিয়ে বোধের যথার্থ ব্যবহাব, সচেতন ব্যবহার মাত্রেই পূজা পদবাচ্য (অভিনব সংজ্ঞা)। পূজার ফল কী? পূজার ফল হল তৃপ্তি বা আত্মপ্রসাদ, সুখানুভূতি, চিত্তের প্রসন্নতা, একটা আনন্দ। সূক্ষ্ম ভাবে এই আনন্দের একটা প্রকাশ হচ্ছে বিশ্বাস। তাই আমরা একই জিনিস বারবার করি ওই বিশ্বাসে। খাওয়া হতে আরম্ভ করে, দর্শন হতে আরম্ভ করে, সবকিছুই বার বার করি। যখন এই ভাবগুলো আমরা হারিয়ে ফেলি তখন বিশেষ কোনও জীবনের মধ্যে এসে আবার এমন কতগুলি প্রকাশ হয় যেগুলো অবলম্বন করে আমরা আবার এই আনন্দকে নূতন করে পেয়ে বিশেষ ভাবে জীবনে ব্যবহার করতে পারি। ভগবান বলছেন, আমার থেকে আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং আমার ভক্তের যে ভক্ত সে আমার অতীব প্রিয়। কথাটা কিন্তু খুব গভীরের! বর্তমানে পৃথিবীতে মনস্তত্ত্ব নিয়ে মানুষ অনেক গবেষণা করছে, মানবিকতা নিয়ে অনেক রকমের আলোচনা ও গবেষণা হচ্ছে। কিন্তু এই যে দুটি কথা, ভক্ত আমার অতীব আদরের বা প্রিয় এবং ভক্তের ভক্ত আমার কাছে তার চাইতেও প্রিয়—এই কথা কেন বলি আমরা? why? তা কী করে সম্ভব? এই প্রসঙ্গে জনৈক ভক্ত 'একে' প্রশ্ন করাতে সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে উত্তর এল, বাবার কাছে তার ছেলে প্রিয়, কিন্তু ছেলের ছেলে অর্থাৎ নাতি আরও বেশি প্রিয়। তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তখন এক পণ্ডিতমশাই বললেন, আপনি কি বেছে বেছে এই সমস্ত উদাহরণগুলিকে সংগ্রহ করেছেন আমাদের দুর্বল মনকে আঘাত করার জন্য? উত্তরে তাকে বলা হল, না বাবা, আমরা এগুলোকে হারিয়ে বসে আছি, আমরা ভুল করি। তা শুধু মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বললেন, আপনার কথা শুনলে ভাল লাগে কেন জানেন? আপনি অনর্গল বলে যান এবং কঠিন সংস্কৃত শ্লোক উল্লেখ না-করে বেশ সোজা ভাবে আমাদের বোঝার মতো করে বলেন।

তখন উত্তরে তাকে বলা হল যে, যখন পণ্ডিতরা আসে তখন ভিতর থেকে ওগুলো বেরোয় আপনা থেকে, কেননা তাদের তো এরকম খাবার দিতে হবে। বড়ছেলে বহুদিন পরে প্রবাস থেকে এসেছে, মা তাকে নিশ্চয়ই শুধু দুধ ভাত খাওয়াবেন না। তার জন্য একটু মাছ-মাংসের ব্যবস্থা করবেনই। 'All Divine for All Time, as It Is' কী ভাবে তোমাদের সামনে সত্য আপনবোধে put করা হচ্ছে দেখ! ঈশ্বর কিন্তু সর্বাবস্থায় ঈশ্বরই আছেন। তুমি কিন্তু সর্বাবস্থায় তুমি—রাগ কর, ক্রোধ কর, অভিমান কর, কান্নাকাটি কর, হাস, বিরক্ত হও, চুপ করে থাক বা সক্রিয় থাক, এক তুমি-ই রয়েছ। তুমি পাল্টাবে না, ভাবগুলো শুধু পাল্টাচ্ছে। নিজের মধ্যে নিজের ভাব বহুবিধ প্রকারে বা ভঙ্গিমাতে যখন প্রকাশ পায়, সেই সব একত্র করলে হয় বিশ্ব। ছোট শিশুর কাছে বিশ্বের কোনও concept নেই। শিশু বড় হচ্ছে, তার ভাব বাড়ছে, সে জানছে কতগুলো plus, কতগুলো minus। সেগুলো নিয়ে সে ক্রমশ বড় হচ্ছে, সংগ্রহ করছে। তখন তার কাছে আস্তে আস্তে বিশ্বটাও তৈরি হচ্ছে, ছড়িয়ে

পড়ছে। একজন মহাপুরুষের কাছে এই বিশ্ব অতি ছোট জিনিস! অনন্ত বিশ্ব আছে। যেমন রান্না করতে গেলে মায়েরা পাঁচফোড়ন নিয়ে রান্না করতে বসে। পাঁচফোড়নে পাঁচটা ফোড়ন একসঙ্গে মেশানো আছে। আজকাল দোকানদাররা কিন্তু পাঁচফোড়নটা ঠিকমতো দেয় না। তারা তিন ফোড়ন দিয়ে দেয়, তার মধ্যে আবার ময়লা থাকে, অনেক কিছুই থাকে। বাড়িতে পৃথক পৃথক ফোড়ন কিনে নিয়ে এসে পাঁচফোড়ন বানিয়ে নিলেই ভাল হয়।

পাঁচফোড়নের মাহাত্ম্য কী? যে খাদ্য রান্না করা হবে তা যেন রুচিকর হয়। তা খেতে যেন ভাল লাগে তাই পাঁচফোড়ন ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণেশ্বরে যোগীন মা, গোলাপ মা এরা সারদা মায়ের সঙ্গে একটা ছোট ঘরে থাকত। সেই ঘরে একজনই শুতে পারে না, তার মধ্যে আবার তিনজন/চারজন! তার মধ্যে আবার কতগুলো সিকে থাকত যার মধ্যে সব জিনিস রাখা থাকত। এই তো সংসার। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের কতগুলো বিকার ছিল, আমাশা ছিল খুব। তখন তো এখনকার মতো attached bathroom-এর ব্যবস্থা ছিল না। গাঁড়ু নিয়ে জঙ্গলে যেতে হত আর কী! গামছা নিয়ে প্রায়ই তাঁকে যেতে হত। নহবতখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তিনি শুনতে পেলেন যে সারদা মা কাউকে বলছেন, পাঁচফোড়ন যে ফুরিয়ে গিয়েছে! একটু পাঁচফোড়ন এনে দিবি? তখন একজন বলছে, আরে ও আজকে আর লাগবে না! পাঁচফোড়ন ছাড়াই আজকে রান্না করে দাও, কিছু এসে যাবে না। এই কথা ঠাকুরের কানে যেতেই তিনি বললেন, কী বললে গা? পাঁচফোড়ন ছাড়া কী করে হবে! না না এক পয়সার পাঁচফোড়ন নিয়ে এস, যেখানে যা দিতে হয় তা না-দিলে ঠিক হয় না।

একজন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ বলছেন, তা নিয়ে এস, ও ছাড়া হবে না। তিনি সংসারী ছিলেন না? রামকৃষ্ণদেবের ভক্তের দল এই কথা শুনে বলেছিল, আপনি তো কথামৃত পড়েননি, কিছু শোনেনওনি তাহলে আপনি এগুলো বলছেন কী করে? উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, সে অন্য কথা, এগুলো নিয়ে তোমরা তো মাথা ঘামাও না, 'এ' কি ভুল বলেছে? তখন তারা বলল, না একেবারে ঠিক, খাঁটি কথা, আমরা তো এগুলো পড়ি কিন্তু ভাবি না। আপনি যেভাবে বলেন আমরা তো সেভাবে ভাবি না। তখন তাদের বলা হল, সমস্ত জিনিসেরই যথার্থ ব্যবহার জানতে হয়। যিনি দিতে পারেন তিনিই তো দেবমানব। জীবনে সমস্ত জিনিসের ব্যবহার জানেন তাঁরা। যার অভিমান আছে তার অভিমানকে কমিয়ে দেন, আর যার অভিমান নেই তার অভিমান বাড়িয়ে দেন। তখন তারা বলল যে, কী রকম? 'এ' তোমাদের দু'একটি ঘটনা বলছে, তোমাদের জানা কথা, কিন্তু তোমরা তার মর্মার্থ জান না। যে-সমস্ত ছেলেরা দক্ষিণেশ্বরে আসত ঠাকুরের কাছে তাদের মধ্যে অনেকরকম gradation ছিল। সেই সমস্ত নিজবোধের দৃষ্টি দিয়ে দেখে যাকে যা বলার তাকে তা-ই বলা হত। ছেলেরা আবার নালিশও করত। তারা বলত, জানেন ও এই করছে! ও তাই করছে! তো একজন আরেকজনের নামে নালিশ করে জানাল, ও না আজকে ছিপ দিয়ে অনেক মাছ তুলেছে! মাছগুলোকে বড়শি দিয়ে ধরে নিয়ে গেল। রামকৃষ্ণদেব এই কথা শুনে সেই ছেলেটিকে

বললেন, ওরে তাই করেছিস না কী? সে বলল, তাতে কী হয়েছে, খাব না? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ খাবি তো। কিন্তু এটা কী করলি? তখন সে বলল, "অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দস্বরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।।" এই কথা শুনে তিনি বললেন, ওরে সর্বনাশ! তুই তো আবার দেখি আরও উপরে চলে গিয়েছিস। তুই ভোক্তাও না, ভোজ্যও না, ভোজনও না—তাহলে তুই কী? সে বলল, আমি আমি, আমি আত্মা। তখন রামকৃষ্ণদেব তাকে বললেন, তোকে আর তাহলে জ্ঞান দেওয়া যাবে না! শিষ্য বলল, না, আপনার যা দেবার দেবেন, আপনারটা আমি হারাব কেন? তখন তিনি বললেন, রাখবি কোথায়? সে বলল, জায়গা আপনি করে দেবেন। আর আমরা হলে কী বলতাম? ও রাখব এখন কোনও রকমে! আরেকবার নৌকা করে বাগবাজার থেকে কয়েকজন ছেলে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে। তারা মাঝিকে পয়সা দিতে গিয়ে একটা অচল দু'আনা পয়সা দিয়েছে। মাঝি তখন তাদের বলছে, এই পয়সা চলবে না, অচল। তারা মাঝিকে বলল, পয়সা অচল নয়, এই পয়সা আছে নিতে হবে। ঝগড়াঝাটি হওয়াতে মাঝিকে ধরে তারা খুব মারলো। তাদের মধ্যে নরেন ছিল। নরেনের তা দেখে খুব খারাপ লাগল।

এই ছেলেগুলোকেই কয়েকদিন আগে ঠাকুরের কাছে নরেন নিয়ে এসেছিল। তারা মাঝেমধ্যেই দলবল নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আসত। প্রথমে তাদের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেব দেখা করতে চাননি। নরেন তখন রামকৃষ্ণদেবকে বলেছিল, আপনি তো বলেন যে সবার মধ্যে ভগবান আছেন, তাহলে এদের সঙ্গে দেখা করবেন না কেন? ওই সমস্ত আপনার বুজরুকি কথা চলবে না। এরা আমার বন্ধু, আমার সঙ্গে এসেছে, এদের সঙ্গে আমি খেলাধূলা করি, এদের সঙ্গে দেখা করুন। তখন তিনি বলেছিলেন, তুই তো জানিস না সবকিছু, তুই তো খালি তর্ক করিস। তোকে এখন কী বলি বল দেখি! নরেন বলেছিল, আপনি আমাকে নিয়ে এত মাতামাতি করেন তাহলে এদের নিয়ে কেন করবেন না? তখন তিনি বলেছিলেন, তা সবার সঙ্গে কি তা করা যায় রে? তখন নরেন বলেছিল, তাহলে আপনি কীসের ভগবানের কথা বলেন? তখন তিনি বলেছিলেন, তুই এ কী কথা বলছিস! তুই তো এত পড়াশুনা করেছিস! সব মানুষ কি সমান? ছোট আছে, বড় আছে, সবরকম আছে। কী রে তাই না! তখন নরেন আর কোনও উত্তর দিতে পারল না। যাই হোক, সেদিনকে তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করেননি বলে নরেন খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিল যে, আর আসবই না দক্ষিণেশ্বরে। তার পরে গঙ্গাতে মাঝির সঙ্গে ওদের ঝগড়াঝাঁটি দেখে আবার ছুটে এল দক্ষিণেশ্বরে। সে রামকৃষ্ণদেবকে বলল, আমাকে ক্ষমা করুন! রামকৃষ্ণদেব বললেন, কী করেছিস? তখন সে বলল, আপনাকে সেদিন অনেক কটু কথা বলে গিয়েছি। আমি তখন বুঝতে পারিনি যে, আপনি সবই জানেন, বুঝতে পারেন। এখন তা বুঝতে পারছি। রামকৃষ্ণদেব বললেন, কী করে বুঝলি? নরেন বলল, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, এই ছেলেগুলি তমোভাবাপন্ন। ওরা মাঝিকে মারল, অচল পয়সা নিতে জোর করল এবং তাকে পয়সাও দিল না। পার হয়ে এল আর তাকে মারল। আমার এখন খেয়াল

হল আপনি কেন ওদের সঙ্গে দেখা করেননি। তখন ঠাকুর হাসলেন। নরেন আরও বলল, এই রকম দিব্যদৃষ্টি তো সবার থাকে না, আপনার আছে। ঠাকুর বললেন, তোরও আছে তবে ঢাকা, ঢাকনা খুলতে গেলে তো তোরা আপত্তি করিস। তাই তো মুশকিল। দেখ না সেদিনকে তুই আপত্তি করলি, আজকে এসেই তোর খেয়াল হল যে তুই ভুল করেছিস। এই ভাবে ধাপে ধাপে তৈরি করতে হয়েছিল ছেলেদের। অবশ্য তারা তৈরি হবার জন্যই এসেছিল।

সবাইকে তৈরি করা যায় না, এক সুরে আনা যায় না। তা সত্ত্বেও কিন্তু সবার সামনে একটি কথাই বলা হচ্ছে যে, plus-এর ঘরেই থাক আর minus-এর ঘরেই থাক, সে শিশুই হোক আর বৃদ্ধই হোক সত্যের প্রকাশ কিন্তু সত্যই হবে। পণ্ডিতরা প্রশ্ন করেছে যে, আপনার এই কথার কিন্তু প্রমাণ দেওয়া যাবে না। উত্তরে তাদের বলা হয়েছে, প্রমাণ নিয়ে তো 'এ' কারবার করে না। তবে তোমার ছোট ছেলেকে কি মানুষের ছেলে বলবে না কি বাঘের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা, বিড়ালের বাচ্চা বলবে? তখন তারা আর কোনও কথা বলে না। তাকে আরও প্রশ্ন করা হয়েছিল, তোমার বাড়িতে যে গরু পুষছ সবকটা গরু কি দুধ দেয়? তিনি বললেন, না, একটাও দেয় না। তখন তাকে বলা হল, তাহলে সেগুলোকে কি গরু বল না? আর যেগুলো দুধ দেয় সেগুলোকেই কি গরু বল? তাদের মধ্যে তফাতটা কী? বাগানে আমগাছ আছে, একটা আমগাছে আম হয় না আর তিনটেআমগাছে আম হয়। যেটাতে আম হয় না সেটাকে কী বলবে? আমগাছ না জামগাছ বলবে? তিনি বললেন, গুরুজি আপনি তো ন্যায়ের উপরের ন্যায় বলছেন। তখন তাকে বলা হল, তাতে কী হয়েছে? মেনে নেওয়াটা কি ন্যায় নয়? মেনে না-নেওয়াটাই তো অন্যায়। এক ক্ষেত্রে মানবে, আরেক ক্ষেত্রে কেন মানবে না? তোমার বাড়িতে তোমার বাবা-মা-ই বুঝি একমাত্র বাবা-মা, আর ঘরে ঘরে যে বাবা-মা আছে তারা কি বাবা-মা নয়? কী যুক্তি দেবে তোমরা? ঈশ্বর একটা মাত্র রূপের মধ্যেই সীমিত নন। তবে হ্যাঁ, বিশেষ একটা রূপে তিনি প্রকাশ হয়ে তাঁর নির্বিশেষ স্বরূপকে প্রকাশ করবার জন্য জীবনব্যাপী পরিশ্রম করে যান। তাই ওই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ঐ যুদ্ধক্ষেত্রেও অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাতে হয়েছিল। কেননা বিশ্বটা যে হরিরই রূপ, ঈশ্বরের রূপ, আত্মাই স্বয়ং—তা না-দেখালে অর্জুন মানতে পারছিল না। কিন্তু আমরা সবাই তো অর্জুনের ক্ষেত্রে পৌঁছাইনি। আমরা চারদিকে যে বিশ্ব দেখি তা কি সেই বিশ্ব নয় যা অর্জুন দেখেছিল?

শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় বাসুদেব অর্থাৎ আত্মা যা সর্বভূতের হৃদয়ে বাস করে। বাসুদেব কথাটির দুটি অর্থ, বসুদেবের পুত্র বাসুদেব, বাসুদেবের আরেক অর্থ হল—প্রকৃতির অনেক বড় বড় শক্তি। তার প্রকাশগুলো সবই বাসুদেব। চৈতন্যের বা দেবতার যে আমি সমস্ত জীবনের মধ্যেই বাস করছে চৈতন্যরূপে আমিরূপে বোধরূপে তা-ই বাসুদেব। "সর্বভূতেষু যঃ বসতি, যঃ নিবসতি। বাসুদেব সর্বভূতানাং হৃদ্‌দেশে বসতি"। বাসুদেব সর্বভূতের হৃদয়ে বাস করেন। কে সেই বাসুদেব? চৈতন্য আত্মা বা আমি। অর্থাৎ বোধময় আমি, আমিময় বোধ (চৈতন্যময় আমি, আমিময় চৈতন্য)। এই দৃষ্টি আমাদের আবৃত। আমরা বাসুদেব

বলতে গেলে ওই একটা মাত্র রূপকেই বুঝি। ঐরকম একটা সীমিত রূপে কী করে বিশ্বাতীত হতে পারে? এই যুক্তি কিন্তু আর তারা নিতে পারে না। তাই তাকে বলা হল যে, দেখ, পাণ্ডিত্য করছ কর, কিন্তু মানুষকে ভুল বুঝিও না। মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে প্রসারিত করতে সাহায্য কর, সঙ্কুচিত করো না, তাহলে তুমি নিজেও কষ্ট পাবে। আজকে যাকে তুমি সঙ্কুচিত করে দেবে, সে যখন তোমাকেও আবার সঙ্কুচিত করবে তখন কী করবে? কাজেই বড় বা মহৎ হতে গেলে উদার হতে হয়। সেইজন্য দেখা যায় মা-বাবা যখন বৃদ্ধ হয় তখন তারা আরও বেশি উদার হন। তারা তাদের ছোট শিশুদের প্রতি, নাতি-নাতনির প্রতি ভীষণ উদার। সেখানে কড়া নন। অথচ নিজের ছেলে-মেয়েকে খুব শাসন করেছেন—কিন্তু নাতি-নাতনিকে মারেন না। নাতি-নাতনি তাদের ঘাড়ে চেপে বসছে, কোলে চেপে বসছে, কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। এগুলো কতগুলো বাস্তব উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, কারণ 'একে' তো সবদিকই দেখাতে হবে!

যে দেবতা সমস্ত বস্তুর মধ্যে মিশে থাকতে পারে তা হল চৈতন্য। দেখ যাকে আমরা মৃত্যু বলছি, সেই মৃত্যুর মধ্যেও কিন্তু বোধরূপে তিনি বসে আছেন। মৃত্যুটা কী? একটা বোধের বৃত্তি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে হয়—আমরা সাধারণত মৃত্যুকে ভয় পাই, আবার অনেকেই মৃত্যুকে ভয় পায় না, তারা মৃত্যুকে বরণ করে এবং আহ্বানও করে। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার মধ্যে আছে, "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।" শ্যাম মানে ভগবান। তিনি মরণকে শ্যামের সমান বলেছেন। কবির দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছে, সবার সেই দৃষ্টি নেই। মানুষ যে ঘুমায়, তা কী ভাবে হয় সেটা কিন্তু অনেকেরই জানা নেই। খুব কম লোকই তা জানে। ঘুমটা কী ভাবে হয় তা পরীক্ষা করার জন্য 'একে' অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে—কী ভাবে ঘুমটা আসে, তা কী ভাবে ঢেকে দেয়ে চেতনাকে। মৃত্যুকেও 'এর' দুবার মোকাবিলা করতে হয়েছে। কেননা দুবার 'এ' দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। বেরিয়ে গিয়ে 'এ' দেখল যে আশেপাশে সব দাঁড়িয়ে আছে, সবাই কান্নাকাটি করছে। 'এ' একেবারে ছাদ ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল—শূন্য মার্গে ছুটছে একেবারে রকেটের মতো। 'এ' চন্দ্র সূর্যকে ভেদ করে চলে গেল। বিজ্ঞানীরা এ কথা শুনে প্রশ্ন করেছিল, সূর্যকে আপনি ভেদ করলেন কী করে? উত্তরে 'এ' বলেছিল, দেখ, তোমরা বিজ্ঞানী, বস্তু নিয়ে তোমরা চর্চা কর। কিন্তু বস্তুর মৌলিক উপাদানটা কী তা তোমরা জান না। তোমরা বল matter, element, কিন্তু element-টা এল কোত্থেকে? জড় বস্তু এল কোত্থেকে? তখন তাদের বলা হল, দেখ সূর্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব কম। আমরা কতটুকু জানি? এই দেশের মুনি ঋষিরা ধ্যানের গভীরে সূর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন, সূর্যও অনেক সময় যজ্ঞক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং মহাভারতে কর্ণ পর্বের মধ্যে উল্লেখ করা আছে যে সূর্যদেব কর্ণের পিতা। কর্ণের কাছে সূর্যদেব উপস্থিত হয়ে তাকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু অর্জুনের পিতা হলেন ইন্দ্র। কাজেই ইন্দ্র হচ্ছেন আবার দেবতাদের অধিপতি, কাজেই সূর্যদেব সেখানে কী করবেন

ইন্দ্রের শক্তির কাছে! ইন্দ্র ছল করে কর্ণের কবচ কুণ্ডল নিয়ে গেলেন। এগুলো কাহিনি। এর ভিতরের অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান একমাত্র realizer ছাড়া অপরের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তা গল্প হিসেবে শুনতে ভাল লাগে ঠিকই।

আমাদের জীবনটা বাহ্য দৃষ্টিতে দেখতে খারাপ নয়, কিন্তু তা যদি analysis করা যায় তাহলে জানা যায় যে, কতগুলো বোধের বৃত্তির সমষ্টি একত্র করে এক একটা জীবন। যিনি বোধের বৃত্তিগুলোকে দেখতে পান তিনি হচ্ছেন সর্বজ্ঞপুরুষ আত্মজ্ঞপুরুষ ব্রহ্মজ্ঞানী। একদিন যোগের কথা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, অনেকেই এসেছিলেন, যোগপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ডাক্তারও ছিলেন। দেহের ভিতরে আমাদের শক্তি কী ভাবে ঘুমিয়ে থাকে, কী ভাবে জাগে, যোগের বিজ্ঞানে তা বলা হয়েছিল। সেখানে সুষুম্নার কথা, ইড়া পিঙ্গলার কথা বলা হয়েছিল, কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ও তার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গ শুনে অনেকেই বলেছিলেন, আপনার কথা শুনে বাড়িতে গিয়ে বই ঘাঁটাঘাটি করে দেখলাম যে শুধু শব্দগুলোই পেলাম, কিন্তু অর্থ বুঝলাম না। তখন তাদের বলা হয়েছিল, ঠিক অর্থ বুঝতে গেলে একজন অর্থবেত্তা পুরুষের কাছে তোমাকে যেতে হবে। সর্ববিদ্যা শিখতে গেলে একজন যোগ্য শিক্ষকের কাছে, অধিকারী পুরুষের কাছে যেতে হয়। তখন তারা বলল যে, আমাদের তো বয়স হয়ে গিয়েছে, চাকরি করি, সময় কখন? উত্তরে বলা হল, ওর মধ্যেই তুমি/ তোমরা পারবে। শিক্ষার জন্য কোনও দেশ-কাল বা বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। তুমি যখন যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থায় তুমি নতুন করে কিছু গ্রহণ করতে পার।

নূতন করে কিছু গ্রহণ করার নামই শিক্ষা। নূতন করে কিছু গ্রহণ করে তুমি সেই জিনিসটা দখলে পেলে তা যখন আবার এক একজনের কাছে ফিরিয়ে দেবে তা-ই হল দীক্ষা। তাহলে এক হাতে নিয়ে আরেক হাতে আমরা দিতে পারি। দেখ একজন পড়াশোনা করছে, অ-আ-ক-খ শিখেছে, a-b-c-d শিখছে, দুই/চারটে শব্দ বানান করে পড়তে শিখছে, তার পরে পদ বা শব্দকে একত্র করে নিয়ে একটা বাক্য তৈরি করতে শিখেছে—এই করে করে সে class V-এ উঠেছে। তার ছোট ভাইকে সে আবার অ-আ-ক-খ শেখাচ্ছে। একদিকে সে নিজে শিখছে, আরেক দিকে সে অপরকে শেখাচ্ছে। তাহলে একভাবে নিচ্ছে, আরেক ভাবে দিচ্ছে। এ কথা শুনে তারা বলল, আপনি এত গুছিয়ে কী করে এই সমস্ত বলতে পারেন? উত্তরে তাদের বলা হল, তোমরাও তো দেখছ, 'এ' একা দেখছে তা তো নয়, তোমরাও তো দেখছ। জীবনটাকে তোমরা প্রথমেই বড় উল্টোপাল্টা ভাব, সেইজন্যই শিক্ষার দরকার হয়। ঈশ্বর কখনও একটা বস্তুর মতো প্রাপ্তব্য নন। কোনও জিনিসের মতো তাঁকে pocket-এ পুরে রেখে দেব তা নয়। ঈশ্বর হচ্ছেন আমাদের ভিতরের সম্পদ, অর্থাৎ আমাদের সত্তা-শক্তি, আমাদের দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত—এই সবগুলো নিয়ে যে চৈতন্য খেলছে তাঁর সঙ্গে আমাদের অভিন্ন সম্বন্ধ। কাজেই ঈশ্বর কখনও হারান না, হারায় বস্তু-সামগ্রী বা দ্রব্য। কিন্তু ঈশ্বর সমগ্র সত্তাকে ধরে আছেন, হারাবেন কী করে? আরে দেহটা যখন অকেজো হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল

তখনও তিনি আছেন। হয়ত ইন্দ্রিয় জানে না, মন জানে না, বুদ্ধি জানে না, অহংকার জানে না, কিন্তু তিনি ভিতরে বসে আছেন, প্রাণের স্পন্দন তখনও চলছে ধুক ধুক করে। ঘুমিয়ে পড়লেও তখনও কিন্তু প্রাণ ঠিক চলছে। মৃত্যুর মধ্যেও কিন্তু প্রাণের অংশ থাকে। এ প্রসঙ্গ আরেক দিকে চলে যাবে, আজকে হয়ত তা বলা সম্ভব হবে না। যখন কেউ মরে যায় তার পরেও দেখা গিয়েছে আবার তার প্রাণ জেগে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে death certificate হয়ত দিয়েছেন ডাক্তার, পরে তিনি সেই মৃত ব্যক্তির মধ্যে চৈতন্য যখন জেগে উঠেছে দেখেছেন তখন মহা মুশকিলে পড়ে গিয়েছেন। সেইজন্য এখনকার ডাক্তাররা death certificate আর আগের মতো ওই বয়ানে লেখেন না, অন্যরকম ভাবে লেখেন। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে তারপর সৎকার করার অনুমতি দেন। এমন এমন ঘটনা ঘটেছে যে একজনকে কবর দেওয়া হয়ে গিয়েছে, তারপর দেখা গিয়েছে কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তি জীবিত রয়ে গিয়েছে। এই সমস্ত record আছে। তার পরে তাকে আবার কবর খুঁড়ে তুলে আনা হয়েছে। তখন দেখা গিয়েছে যে সে তখনও জীবিত। তাহলে এই হল আমাদের ধারণা, অর্থাৎ আমাদের অনুভূতির অভাব!

কেউ মারা গেলে আমরা দেহকে অনেক সময় ফেলে দিই। জলে ডুবে মারা গেলে সেই দেহ ফুলে ওঠে, পচে যায়। কিন্তু সেই দেহের মধ্যে আবার পোকা তৈরি হয়। কোত্থেকে এল তারা? একটা dead body-র মধ্যে কোত্থেকে এল? এক ডাক্তারকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ডাক্তার can you define it? ডাক্তার বলেছিলেন, no we don't know! মায়ের জঠরে সন্তান কী ভাবে বেড়ে ওঠে এ বিজ্ঞান বড় অদ্ভুত! সেই অব্যক্ত থেকে শিশু দেহ ধারণ করে কী ভাবে এল? কয়েকটা combination, পিতার বীর্য আর মাতার রক্ত অর্থাৎ sperm আর germ-এর combination। এর মাধ্যমে কী করে একটা body তৈরি হয় can anybody define it? কিন্তু হয়, অস্বীকার করবে কী করে! This is divine. কেননা দুটোর মধ্যেই চেতনা আছে। অতি সূক্ষ্মতম ভাবে সেখানে, exist করছে। চেতনার দুটি বিন্দু দু'ভাবে একসঙ্গে মিলিত হয়ে আরেকটা বড় unit তৈরি হয়েছে। Unit হয়ে তা আস্তে আস্তে বিকাশ হচ্ছে। মায়ের দেহ থেকে সে রক্ত নিচ্ছে। সেখান থেকে আস্তে আস্তে তার ভিতরে মাংস, অস্থি, স্নায়ু সব তৈরি হচ্ছে। ধীরে ধীরে দেহ তৈরি হচ্ছে। Very scientific ও methodical, miracle-এর মতো! সৃষ্টিটাই হচ্ছে একটা magical game, the magical game of eternal Consciousness। তা উঠছে, ভাসছে, ডুবছে সমুদ্রের জল তরঙ্গের মতো। কী অদ্ভুত! আট মাস, নয় মাস, দশ মাস পরে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে সেই শিশু। আস্তে আস্তে বাড়ছে, ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে— growing, ever-growing। Ever-growing—এই হচ্ছে ব্রহ্মের ধর্ম। ব্রহ্ম শব্দটি বৃংহণ ধাতু থেকে এসেছে। অর্থাৎ ever-growing—so we are। আমরা ছিলাম কীটানুকীট, in and through evolution process, বিবর্তনের মাধ্যমে আস্তে আস্তে আমরা মানুষের স্তরে এসে পৌঁছেছি। এই মানুষের স্তরেই আমাদের মধ্যে দেবত্ব, অতিমানবত্ব, ঈশ্বরত্ব, পরমেশ্বরত্ব, আত্মত্ব, ব্রহ্মত্ব প্রকাশ হবে—তার অপেক্ষায়

আছে। কাজেই বলা হয়েছে কাউকে হেয় করো না। তোমার যেমন জীবনের মূল্য আছে, সেইরূপ প্রত্যেকটা individual জীবনের সমান মূল্য, because the same Godhead exists in all of you and aspiring to reveal with Its full glory। আপন মহিমায় তিনি প্রকাশিত হবেন। তাই দেখা যায় একটা শিশু কী ভাবে বড় হচ্ছে, আমরা কেউ জানি না যে সে কী হবে, পরবর্তীকালে দেখা গেল সে একটা মস্ত বড় scholar, বড় দার্শনিক হল, বিজ্ঞানী, কবি অথবা বড় শিল্পী হল। অবাক কাণ্ড! সারা পৃথিবীকে সে মাতিয়ে তুলল। কোথায় ছিল তার এই শক্তি অদৃশ্য অব্যক্ত মায়ের গর্ভে?

এই ভারতবর্ষে মাতৃমহিমা হচ্ছে সর্বোত্তম। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কেন? এর উত্তরে বলা যায়, মা হচ্ছেন সর্বংসহা, শক্তি ও সত্তার combination, ক্ষমাঘন মূর্তি এবং সর্বভাব প্রসবিতা। প্রকাশ করার ক্ষমতা যাঁর আছে তিনিই মাতা, সর্বস্তরে তিনি ছড়িয়ে আছেন—motherhood exists everywhere in the creation। এই মাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন এই দেশের মনীষী, মুনি, ঋষিরা। তাই মা হচ্ছেন আরাধ্যা, বাবা হচ্ছেন আরাধ্য। তাই গুরুতত্ত্বের মধ্যে 'এ' প্রকাশ করেছে যে, গুরু খুঁজতে তোমাদের আর অন্য কোথাও যেতে হবে না। তোমাদের ঘরেই গুরু রয়েছেন মাতা-পিতারূপে। মা-বাবা হলেন মহাগুরু। এই মহাগুরুকে অবজ্ঞা করে তুমি যত বড় গুরুর আশ্রয়েই থাক কোনও ধর্মলাভ হবে না। এই মা-বাবার ঋণ শোধ করা যায় না। ভগবান মা-বাবা রূপে সংসারে ঘরে ঘরে রয়েছেন। তাই বলা হয়েছিল যে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ মন্দিরে? ঘরে গিয়ে দেখ জীবন্ত দেবতা মাতা-পিতা, শিব-দুর্গা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম, রাধা-শ্যাম, one in two, two in one বিশ্রাম করছেন। এরাই জীবন্ত দেবতা। অবজ্ঞা করো না তাদের। 'এর' কথার মধ্যে কোনও flaw নেই। অনেকে বলে যে, আপনি খুব emotional। উত্তরে তাদের বলা হয়, 'এর' motion-টা eternal, finite নয়, অনাদিকাল জগতে 'এ' চলছে তো! 'এর' তা স্মৃতির মধ্যে আছে, হারায়নি। Motion না-থাকলে চলবে কী করে? I-Reality is not a static principle, জড়বস্তু নয়।

জড়ত্ব হচ্ছে আমারই একটা unit, প্রকাশের এক ধারা। কিন্তু মানুষকে যে শ্রদ্ধা করতে শেখেনি তার কাছে divnity dead। মানুষকে আগে ভালবাসতে হবে, নিজের মতো করে ভালবাসতে হবে, আর কারও মতো নয়, তবে মানুষের মধ্যে অতিমানবত্ব আসবে। অতিমানবের মধ্যে আসবে দেবত্ব, তার মধ্যে আসবে ঈশ্বরত্ব, তারপরে সেই পরব্রহ্ম পরমতত্ত্ব আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়বে। 'এ' অনেকবার এই কথা বলেছে যে, প্রতি ঘরে ঘরে সেই রামকৃষ্ণ, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু জন্মাবেন সত্যযুগ এলে। সত্যযুগে আসার জন্যই প্রস্তুতি দরকার। কী ভাবে প্রস্তুত হবে? মারামারি কাটাকাটি করে? অপরকে ছোট করে? অপরের নিন্দা করে? না, তা আমাদের দুর্বলতা, disease to hate others, to degrade others—it is a disease। আমি যেমন নিজেকে ভালবাসি তেমন প্রত্যেককে ভালবাসতে হবে, অপরকে আমি আমার মতো করে তো অন্তত ভালবাসতে পারি। তার বেশি প্রয়োজনও হয় না। মা-বাবা সন্তানকে

নিজের মতো করে ভালবাসে বলে মা-বাবার এত মহিমা সারা পৃথিবীতে। যদি জন্মের পর গলা টিপে তারা মেরে দিত তাহলে বাঁচতে পারত কোনও শিশু সন্তান? এই যে godly nature in father mother, তারা সন্তানকে যে লালনপালন করে বড় করে তুলছে তার পরে সন্তানের কি duty নয় যে মা-বাবাকে দেখতে হবে? মা-বাবার ঋণ কেউ শোধ করতে পারবে না। আমাকে অব্যক্ত থেকে অদৃশ্য থেকে যাঁরা এই জগতে নিয়ে এসেছেন, এই দেহ দিয়েছেন, দেহকে লালনপালন করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, মানুষ করেছেন, আমাদের কর্তব্য তাদের দেখা—কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা উচিত। এখানে হচ্ছে দেবে আর নেবে। গীতাতে ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে—"প্রসবিষ্যধ্বমেতম্"। By fostering each other man attains his true divine nature which is immortal, non-dual, infinite and eternal.

তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরাই দেবতা। দেবতাকে তুমি দেবে, দেবতা তোমাকে দেবে। মা-বাবাকে যদি আমি শ্রদ্ধা না-করি, আমার সন্তানও আমাকে শ্রদ্ধা করবে না। কাজেই be cautious, কী সুন্দর ধারা! 'এ' সহজ করে বলছে যে, ঈশ্বরত্ব, দেবত্ব আমাদের জীবনের মধ্যে কী ভাবে ছড়িয়ে আছে প্রতি পদেপদে। এটা তর্কের বিষয় নয়, অনুধাবন করার বিষয়, অনুভব করার বিষয়। অনুভূতি দিয়েই বলা হচ্ছে, অনুভূতি দিয়েই তা অনুভব করতে হবে। এই অনুভূতি প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। নিজের সন্তানকে যে ভগবৎ বোধে নিতে পারে তার মতো মহান কে? আর যে সন্তান নিজের বাবা-মাকে ভগবান মানতে পারে তার চাইতে মহান কে? 'এ' কাউকে তীর্থক্ষেত্রে যেতে বলছে না, যে যায় তাকে বারণও করছে না। কিন্তু ছোট্ট কয়েকটা কথা তোমরা মনে রেখ—তোমার বাড়ির মতো শ্রেষ্ঠ আশ্রম কোথাও নেই। তোমার দেহের মতো সুন্দর মন্দির আর কোথাও নেই। তোমার মনের মতো পূজারি আর কেউ নেই। আর তোমার মধ্যে সেই প্রজ্ঞানঘন চৈতন্যসত্তার মতো বড় দেবতা আর কেউ নেই। 'এ' সমস্ত ধর্মের সারকে তোমাদের সামনে বলছে—very living, touching, directly enjoyable, understandable, but not imaginary। এই ভাব ও বোধে প্রতি ঘরে ঘরে শান্তি আসবে এবং দিব্য সন্তান আসবে। তারা শুধু ঘরকে উজ্জ্বল করবে না, নিজের দেশকেও উজ্জ্বল করবে।

একজন/দু'জন রামকৃষ্ণ নিয়ে 'এ' তৃপ্ত নয়, একজন/দু'জন বুদ্ধ-যিশুকে নিয়েও 'এ' তৃপ্ত নয়। 'এ' বোধের দৃষ্টিতে দেখেছে যে, লক্ষ লক্ষ রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু আসবেন। সত্যযুগে প্রত্যেকেই সেই স্তরে উঠবে, অর্থাৎ সত্যের স্তরে যেখানে সচ্চিদানন্দ টগবগ করে প্রত্যেকের মধ্যে প্রকাশ পাবে। It is possible এবং তার জন্যই এই কথাগুলো প্রকাশ হয়ে চলেছে। এতে 'এর' কোনও কৃতিত্ব বা বাহাদুরি নেই—it is for one and all। প্রত্যেকের জন্যই, don't forget, don't degrade yourself, নিজেকে অপদস্থ করো না। নিজেকে কখনও ছোট ভাববে না এবং নিজের অহংকারকে সবসময় গুণীজ্ঞানীর সেবায় রাখবে, মহতের সেবায় রাখবে। এই কথাটা মনে রাখা খুব প্রয়োজন, তা না-হলে মহত্ব প্রকাশ পাবে না।

একটা বীজ বুনলে পরে জল দিতে হয় যাতে তা পোকামাকড়ে না-খায়, পাখিতে না-খায়, পশুপাখিতে না-নষ্ট করে, তার জন্য তার চাবধারে একটা বেড়াও দিতে হয়। এইরকম জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়তে গেলে আমাদের কতগুলো বেড়া দিতে হয়, কতগুলো guard দিতে হয়। কিন্তু কী দিয়ে? চৈতন্যের বেড়া, আপনবোধের বেড়া। আপনবোধের বেড়ার মধ্যে ভিন্ন বোধের কেউ ঢুকতে পারে না।

ছোট্ট একটা ঘটনা বলছি তোমাদের। মা-বাবা সাধারণত ভীষণ কড়া বা রাগী হয়। একজনের সন্তান হয় না, বহু বছর পরে তার এক সন্তান হল। সেই সন্তান তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাড়ির মধ্যে একেবারে তুমুল কাণ্ড করে, জিনিসপত্র ভেঙেচুরে সব তছনছ করে। মা এসে দেখল সে নোংরা পায়ে কাদামাটি মেখে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। মা যেই লাঠি নিয়ে এল অমনি ছেলে মাকে বলল, সাবধান! আমার বন্ধু, এদের তুমি মারতে পারবে না! 'এ' ছোট্ট একটা practical example দিল তোমাদের কাছে। মায়ের তো স্নেহপ্রবণ মন, মারবে কাকে? মা ছেলেকে বলল, তুই যে বিছানাটা নষ্ট করলি! ছেলে বলল, তুমি ধুয়ে দিও, আমি যখন মলমূত্র ত্যাগ করে তোমার কোলে উঠি তখন তো তুমি আমাকে মারো না? কিন্তু দাদা যখন জুতো পায়ে ঘরে ঢোকে দাদাকে বকো কেন? See, অতটুকু শিশু সে observe করেছে! কিন্তু তাই বলে কি শাসন করবে না? নিশ্চয়ই করবে। মা-বাবার শাসনের background-এ থাকে মঙ্গলকল্যাণ কামনা। কিন্তু সবার তো সেরকম থাকে না। পিতামাতা আর গুরু এঁরাই সবসময় চান তাঁদের সন্তান, আশ্রিত শিক্ষার্থী যেন তাঁদের চাইতেও বড় হয়। সন্তান বড় হলে মা-বাবা আনন্দ পান, তাঁদের বুকটা ভরে ওঠে। আর গুরু যখন দেখেন তাঁর শিষ্য যথার্থ ভাবে তৈরি হয়েছে তখন তিনিও আনন্দ পান। এই আনন্দ কিন্তু অপরে সহ্য করতে পারে না।

আজকের প্রসঙ্গ 'এ' কিন্তু খুব হাল্কা করে নিয়ে এসেছে। তার কারণ কালকে 'এ' খুব কড়া dose-এর প্রসঙ্গ বলেছিল। আজকের প্রসঙ্গ সেইজন্য মিঠা করে নিয়ে আসা হল, কিন্তু রোজ রোজ মিঠা খেলে তো কৃমি হবে আবার। যাই হোক, এই যে নিজের ভিতরে নিজের মাহাত্ম্য তা আমাদের মধ্যে নানানরকম অবস্থার মাধ্যমে তৈরি হয়। কিছু শোক, মোহ, ভ্রান্তি, ভয়, দ্বন্দ্ব—এগুলোর মধ্যে দিয়ে তা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। কেননা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে সমতা ছড়িয়ে পড়ে। আমরা ছোটবেলা থেকে কতবার অসুখে পড়ি—পেটের অসুখ, জ্বর, মাথাব্যথা, সর্দিকাশি ইত্যাদি। এগুলো না-হলে আমাদের body-র metabolism, তার nerves, cell, atom, muscle এগুলো পুষ্ট হয়ে তৈরি হতে পারত না। কাজেই contradiction বা বিরুদ্ধ অবস্থা একান্ত প্রয়োজন। এই কথা বললে হয়ত অনেকেই তা accept করতে পারবে না। 'এই জীবনটা' দুঃখ দিয়ে গড়া, দুঃখ দিয়ে ভরা। আর দুঃখের মতো এত আপন 'এর' আর কেউ নেই। দুঃখ এসে 'একে' বারবার সাবধান করে দিয়েছে, আর সুখ আরাম এসে 'একে' ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। 'এ' বলেছে, না তোমরা এখানে থাক। রাধাকৃষ্ণের বিরহের মধ্যে একটা কথা আছে। দু'জনের মধ্যে অনেক কাহিনি প্রকাশ পেয়েছে। কখনও রাধা অভিমান করে, কখনও বা কৃষ্ণ অভিমান

করে। যখন রাধা অভিমান করে তখন কৃষ্ণ রাধার কাছে যায় তাঁর মান ভাঙাতে। রাধার সখীরা খুব কড়া, অর্থাৎ ললিতা সখী, বৃন্দা সখী ইত্যাদি। আবার তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীও আছে যেমন চন্দ্রাবলী ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রেমের খেলার মধ্যে এগুলো না-থাকলে প্রেমের গুরুত্বই প্রকাশ পায় না। শ্রীকৃষ্ণ রাধার মান ভাঙাতে গিয়েছেন, তখন রাধার সখীরা বলছে যে, 'রাধাকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না বধু! ওখানেই থাক। মন-মুকুরে আপন ছবিখানি দেখ।' অর্থাৎ তুমি কী mood নিয়ে এসেছ দেখ। কী সুন্দর কথা, আহা! দেখ তুমি কী mood নিয়ে এসেছ। নিজেকে দেখ একবার।

অত সহজে পারবে না তাঁর (রাধা) সঙ্গে meet করতে। পরীক্ষা দিতে হবে। প্রত্যেকেই আমরা পরীক্ষা দিয়ে এগিয়ে চলছি জীবনে, পরীক্ষার শেষ নেই, কেননা যোগ্যতা তৈরি হল কী না তা কী করে প্রমাণ পাবে পরীক্ষা না-দিলে? Fail করব লক্ষ বার ঠিকই, আর fail করা ছাত্র 'এর' মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই। 'এ' যে কতজনম কতবার fail করেছে তার হিসাব নেই। হেরে যাওয়ার মধ্যে 'এর' আনন্দ, জেতার মধ্যে আনন্দ নেই। এখন যদি বল তার কারণ কী? 'এর' আনন্দ দিয়ে কথা। এই আনন্দের জন্য 'এ' সবকিছু minus করতে রাজি আছে। কিন্তু আনন্দকে minus করতে রাজি নই। কারণ আনন্দ শুধু আনন্দের জন্যই, দুঃখের জন্য নয়। আমি শোক করব, দুঃখ করব কেন? এই আনন্দ হচ্ছে আদি কারণ, অর্থাৎ সবকিছুর কারণ। আনন্দের মধ্যেই সবকিছুর প্রকাশ, আনন্দের দ্বারাই সব প্রতিপালিত হচ্ছে, আবার আনন্দের মধ্যেই সব লীন হচ্ছে। দেখ, কথাটা যুক্তি দিয়ে বলতে গেলে, প্রমাণ দিয়ে বলতে গেলে কতগুলো উদাহরণ দিতে হয়। প্রত্যেক বাড়িতেই মায়েরা বিবাহের পরে অনেক আশা নিয়ে সংসার বাঁধে। মেয়েরা লেখাপড়া শেখে, কাজকর্ম শেখে, তার পরে বিয়ে হয়, শ্বশুরবাড়ি যায়, অনেক আশা নিয়ে সংসার বাঁধে। তার পরে সবচেয়ে বড় আশা হল একটি সন্তান লাভ। সেই সন্তানের জন্য তারা মানত করে। অনেক কিছু কল্পনা করে, প্রার্থনা করে। ভগবানের কাছে বলে, সন্তান হচ্ছে না, একটা সন্তান দাও। সন্তান তো আসল। সন্তানকে ধারণ করল মা। মা সন্তান প্রসব করল, তার জন্য তাকে অসম্ভব যন্ত্রণা ভোগ করতে হল।

একজন ডাক্তারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ডাক্তার তুমি তো অনেক রকম operation করেছ, বল তো কোন operation-এ সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়? সে কয়েকটা কথা বলল। 'এ' তখন বলল, ডাক্তার সন্তান প্রসবের সময় মায়েরা যে কষ্টটা পায় তা হচ্ছে জীবনের ভিতর একটা ভীষণ pertinent point। এত কষ্ট পায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার মুখটি একবার দেখবে বলে—এই সবচেয়ে বড় আনন্দ মায়ের কাছে। 'এ' কিন্তু sentimental কথা বলছে না, খুব practical কথা বলছে। যদি মা সন্তানের মুখ দেখতে না-পায়, যদি দেখে মৃত সন্তান, তাহলে মা পাগল হয়ে যায়। তখন তার অবস্থা বড় pathetic। এই যে মা গর্ভে সন্তান ধারণ করে, তাকে প্রসব করে, আনন্দের জন্যই করে। সৃষ্টি আনন্দের জন্যই। আবার আরেকটি সন্তান গর্ভে ধারণ করছে, তাকেও প্রসব করছে—তা কার পক্ষে সম্ভব? প্রাণী জগতে ঈশ্বর নিজেকে অদ্ভুত ভাবে প্রকাশ করেছেন, কেননা তিনি বেদনার ভূমিতে বেদকে প্রকাশ করবেন

বলে, অর্থাৎ জীবনে অমৃতত্ব মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করবেন বলে, প্রজ্ঞানস্বরূপকে অজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করবেন বলে, আনন্দস্বরূপকে নিরানন্দের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করবেন বলে। 'এর' কথাগুলো কিন্তু ক্রমশ strong হয়ে যাচ্ছে। Contradiction is a must, দুঃখটা must, ব্যথা, বেদনা ছাড়া বেদ জাগবে না। কথায় আছে, 'কষ্টে কেষ্ট মেলে'। কষ্ট কেন? শ্রীকৃষ্ণের জন্মটাই তো কষ্টের। তাঁর জীবনটাই তো কষ্টেব। তিনি সিংহাসনে বসবার সুযোগ পেয়েও সিংহাসনে বসলেন না। তিনি কংসকে বধ করে কংসের সিংহাসনে বসলেন না, কংসের পিতাকে বসিয়ে দিলেন। বসুদেব সম্বন্ধে অন্যান্য জায়গায় নানা ভাবে ব্যাখ্যা আছে। শাস্ত্রকাররা শাস্ত্রমতে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সাধুসন্তরা তাঁদের মতো করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এগুলো 'এর' মধ্যে খেলছে। তিনি তো কখনও হারাননি, তিনি তো আপনবোধের গভীরে তাঁর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছেন, অর্থাৎ হৃদয়ের গভীরে। সেখানে তো তিনি সিংহাসনচ্যুত হননি। তিনি বাইরের সিংহাসনে বসে কী করবেন! দেখ 'এ' কৃষ্ণের পরিচয় দিচ্ছে আরেক ভঙ্গিমায়—

সচ্চিদানন্দঘন সর্বসম সর্বেশ্বর হরিহর নারায়ণ
সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর ভগবান নারায়ণ।।
স্ববোধে স্বভাবে খেল তুমি স্বয়ং
সবার হৃদয়ে তব আসন
নিত্য তুমি সেথা কর বিচরণ
অহংদেব সনাতন তব নাম পুরুষোত্তম।
সচ্চিদানন্দঘন স্বসংবেদ্য স্বানুভব স্বয়ং
আপনে আপন পরমে পরম স্বয়ং-এ স্বয়ং।।
সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর ভগবান
জীবন সারথি নারায়ণ।।

(ভজন)

এই নারায়ণকে কোথায় দেখবে? এর উত্তর দ্বিতীয় গানের মধ্যে পাওয়া যাবে।

ঐ দেখ ঐ তব হৃদয়াকাশে
আত্মসূর্য তব স্বমহিমায় বিরাজে।
তাঁর জ্যোতির আলোকে সবই ভাসে
অন্তরে বাহিরে স্ববোধ সাজে।।
প্রতিভাস তার মানস বিকাশে
সৃষ্টির কল্পনা গড়ে মনোরাজ্যে।
তার প্রতিফলন হয় ভ্রান্তিবিলাসে
দেহ ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া মাঝে।।

স্ববোধলীলার অভিলাষে
আত্মজ্যোতি খেলে স্বভাব ঐশ্বর্যে।
স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব স্ববোধ সকাশে
আত্মারামের আত্মানন্দ প্রীতিমাধুর্যে।।
সর্বব্যাপী অখণ্ড সম্বিদাকাশে
সম্বিৎ লহরী ওঠে ভাসে সম্বিৎ সাজে।
সম্বিৎস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মা স্বয়ং ভাসে
জ্ঞ-স্বরূপে স্বানুভবদেব বিরাজে।।
স্ববোধে স্বভাবের লীলা অভিনয়
স্বভাবের পরিচয় আপনবোধে হয়।
আপনবোধের অধিষ্ঠান হৃদয় মাঝে
স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বানুভব সাজে।।

(কালেংড়া—ত্রিতাল)

তোমাদের হৃদয়েব প্রভু হৃদয়ে নিত্য বিরাজে। তিনিই তোমার ইষ্ট, আত্মা, গোপাল, বালক রাম, শিব, আল্লা, খোদা, গড্, মহম্মদ— যাই তুমি বল কিছু এসে যায় না। কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে আমাদের কাবও কোনও অস্তিত্ব নেই। আমাদের সুখে-দুঃখে তাঁকে জড়িয়েই বসে আছি, তিনি আমাদের জড়িয়ে আছেন। এরকম ভাবে কেউ ভালবাসে না গো! তিনি প্রিযতমোত্তম। একটা নিকৃষ্ট জীবন, যাদের আমরা বলি পাপী-তাপী, তাকেও তিনি আপনবক্ষে ধারণ করে রেখেছেন, আলিঙ্গন করে আছেন। এমন প্রেমিক আর কে হবে বল তো? 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং।' 'এর' বক্তব্যের মধ্যে কঠিন কিছু নেই। 'এ' কারওকে ছোট-বড় করে কিছু বলতে আসেনি। প্রত্যেকের আপন পরিচয় হল নিজের ভিতরে যে চৈতন্য, নিজের ভিতরে যে আনন্দ, নিজের ভিতরে যে প্রেম—এই হল ঈশ্বরের লক্ষণ। তাই দিয়েই তাঁকে ধরবে, তাঁকে ভালবাসা দিয়ে পাওয়া যায়, আবার অভিমান দিয়েও পাওয়া যাবে, ক্রোধ দিয়েও পাওয়া যায়। জরাসন্ধ, কংস তাঁকে অভিমান বা ক্রোধ দিয়ে পেয়েছিল। শিশুপাল সারাজীবন তাঁর সঙ্গে শত্রুতাই করল, কিন্তু যখন সুদর্শন চক্র দিয়ে তার মুণ্ডুটি কেটে দেওয়া হল তখন তার ভিতর থেকে আত্মা জ্যোতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ভীষ্ম এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, এ কী দেখলাম জনার্দন! তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, ঠিকই দেখেছেন আপনি, আপনি প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ। হ্যাঁ, সবই তো আমি। কাজেই তোমাদের আমি ছোট নয়। তোমরা নিজেকে কখনও হেয় মনে করো না। চরমতম দুঃখের মধ্যেও জেনে রেখ তুমি ভাগ্যবান, কেননা তোমাকে তখনও তিনি ধরে বসে আছেন, তোমাকে তিনি ছাড়েননি। তিনি চেতনারূপে দুঃখকেও প্রকাশ করছেন। আস্তে আস্তে দেখবে তার মধ্যে থেকেই দুঃখ বা ব্যথা সরে গিয়ে বেদ জেগে উঠবে। 'একে' তো তিনি কিমা কাটা

করেছেন। মাংসের দোকানে কিমা কাটা দেখেছ? কসাইরা ধারাল কাটারি দিয়ে মাংস কুঁচিকুঁচি করে কেটে ফেলে। 'এর' রন্ধ্রে রন্ধ্রে অণু-পরমাণুর মধ্যে বেদনা দিয়ে একেবারে ভরে দিয়েছেন। তখন মাটিতে শুধু গড়াগড়ি দেওয়া হত, কিন্তু একবারও মুখ ফুটে বেরোয়নি যে, আর পারছি না। তুমি এবার রক্ষা কর। কেননা 'এ' তো বেদনাই চেয়ে নিয়েছে তাঁর কাছে। কারণ সমস্ত সাধনার ওখানেই শেষ।

কী আর সাধনভজন করবে 'এ'! সমস্ত বেদনা যিনি বরণ করতে পারেন তাঁর কাছে এমন কোনও দিব্যশক্তি নেই যা absent থাকে। কাজেই ঈশ্বর 'এর' আপন, তোমাদের আপন, সবার আপন। এই আপনতার গান তোমরা দিনের পর দিন শুনছ, তাঁর মহিমার কথা শুনছ, নিজেকে কখনও ছোট মনে করো না। তুমি কী ভাবে আছ, কী করছ এগুলো insignificant, you have got Consciousness, that is the sign of the presence of divinity—don't forget that। দেহকে নিয়ে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই তিনি খেলতে পারেন। কত জামাকাপড় পরাচ্ছ, কিন্তু তাতে কী এসে গেল! মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্যথা-বেদনায় ভরা। কিন্তু এই বেদনাকে ধারণ করে রেখেছে তোমার আমি। কে তোমার অহংকার? Don't forget that it is the sign of Almighty. প্রভুর অর্থ হল প্রকৃষ্টরূপে তিনিই সব হয়েছেন। What you are? You are the example of the Lord. তিনিই তোমার মতো রূপ ধারণ করেছেন, তিনি এরকম যে হতে পারেন তা দেখাবার জন্য। That is His glory. তোমার সেখানে পৃথক কোনও অস্তিত্ব নেই, কারও কোনও পৃথক অস্তিত্ব নেই। Each and every individual is an example of the Almighty Lord. This is the august proclamation. কী আর সাধনভজন করবে? শাস্ত্রের পাতা মুখস্থ করে কী করবে যা অন্তর দিয়ে মানতে পার না? জানতে গিয়ে মানুষ জানোয়ার হয়ে গিয়েছে, মানতে কেউ শেখেনি। শৈশব থেকে যে এত তাঁর কাছ থেকে পেয়েছ তার জন্য তো কৃতজ্ঞতাবোধ জাগেনি। আরে, যিনি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছেন, কষ্টরূপে সেখানে তো গুরু এসে তোমাকে শেখাচ্ছেন যে, কষ্টটা কী! Conventional way-তে তোমরা যেভাবে ধর্মকর্ম কর তার সঙ্গে 'এর' কোনও পরিচয় নেই। কিন্তু 'এর' বক্তব্যের সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো কোনও school নেই, কোনও সাধক এসে মোকাবিলা করতে পারবেন না। তিনি তো তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সাধনভজন করছেন।

You cannot maintain your self-existence, you cannot seperate yourself from others—never! বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেকের কাছে তুমি ঋণী। You have to pay for that. কাজেই আমরা ভুলটা কোথায় করি জান? আমরা নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্বকেই বজায় রাখতে চাই সবার থেকে পৃথক করে। That is ignorance. আসলে কিন্তু ignorance বলে কিছু নেই। যদি বল এটা কী? উত্তরে বলা যেতে পারে এটা তাঁরই খেলা। এটাকেও মানতে হবে। Yes, there cannot be any single expression or existence in the creation other than the Lord Himself. That is the Self which is

all-pervading Reality, ever-present in each and every expressions of the creation. এই কথা যে মানে না তার বিদ্যাবুদ্ধির কোনও মূল্যই নেই। মুখস্থ করা বিদ্যা যে কোনও কাজে আসবে না। হৃদয়ে ফিরে এস। হৃদয় বলে মান, আর মন বলে জান। কী জানবে? কাকে জানবে? What is the object of knowledge? Is it not the Self? If anything other than the Self is the object of knowledge then it is insignificant, meaningless, worthless. সেইজন্য জ্ঞানবাদী সাধক কিন্তু বস্তুকে আত্মার থেকে পৃথক করেননি। তাহলে তিনি বলতে পারতেন না যে, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।

আমরা সব জিনিসের মূল্য দিই নিজেকে বাদ দিয়ে। এখানে আমরা ভুল করছি ওই জায়গাতেই। নিজেকে দিয়ে তার পরে কর, তবে তা perfect হবে, নতুবা perfect হবে না। আমরা ওই শব্দ উচ্চারণ করে মন্ত্রের গুরুত্ব দিচ্ছি, ক্রিয়াকলাপকে গুরুত্ব দিচ্ছি, বিগ্রহকে গুরুত্ব দিচ্ছি, মূর্তিকে গুরুত্ব দিচ্ছি অথচ living person ঘরে যে কষ্ট পাচ্ছে, তার দিকে একবারও তাকিয়ে দেখছি না। এই rebel child rebel করেছে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে যে, so called ধর্ম is not ধর্ম at all, it is distorted কর্ম। ওই ক্রিয়াকলাপ ধর্ম নয়। ধর্ম হল তা-ই যা সবকিছুকে ধারণ করে রাখতে পারে, and that is your Self which sustains all, all your feelings, all your thought processes, all your actions and their results—তা সব ধারণ করে বসে আছে। You cannot deny that. You can deny everything, but you cannot deny your own existence which is One with the Absolute. কীসের সাধনভজন করবে? একবার তাঁকে অস্বীকার করে তারপর আবার তাঁকে সাধতে যাবে? Is it not foolishness? সব যিনি হয়েছেন তাঁকে না-মেনে একটা particular form-কে নিয়ে, particular একটা কিছুকে নিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়ার কোনও অর্থ নেই। সংসারের সবাই কষ্ট পাচ্ছে, রান্নাবান্না কিছু হল না, খাওয়াদাওয়া কিছু হল না, office-এ কেউ যেতে পারল না—অথচ মানুষ ধর্ম করছে! এই ভাবে চলতে চলতে আজকে সমাজের এই অবস্থা হয়েছে। শুধু কতগুলো মতবাদ তৈরি হয়েছে—false identity, কিন্তু right identity তা নয়। এর মধ্যে দিয়ে যেইমাত্র তুমি সবকিছুকে accept করলে তখন তোমার right identity এসে গেল।

"একোঽহম্ সর্বমিতি", "সর্বাত্মকোঽহম্", "সর্বশূন্যোঽহং", "সর্বাতীতোঽহং"—তবেই এই অহংকারের মূল্য বুঝতে পারবে। অহংকার দিয়ে তা বোঝা যায় না? অহংটা কার? এই অহংকার কার? প্রশ্ন করলে কী জবাব দেবে? অহংটা হচ্ছে Absolute-এর। আদি-অনাদি যিনি তিনিই তোমার আমি, কিন্তু তিনি তোমার অহংকার নন। তিনি তোমার অহংকারের পশ্চাতে থেকে অহংকারকে supply দিচ্ছে তার প্রয়োজনীয় জিনিস। কাজেই অহংকার তো একটা তুচ্ছ বস্তু। এটা যিনি point out করে দিতে পারেন তাঁর চাইতে পরমবন্ধু আর কে আছেন? যিনি তোমাকে হাতে ধরে নিয়ে তোমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিচ্ছেন তিনিই পরমবন্ধু। তুমি রাস্তাও জান না, পথও চেন না, কিছুই জান না। তোমাকে তিনি নির্দেশ দিয়ে বলে দেন

যে, এই ভাবে চল! এই ভাবে এগিয়ে যা! এই যে আমি তোর আমি-র মধ্যে বসে আছি। তোর সুখের মধ্যে সুখরূপে প্রকাশ হয়েছি, দুঃখের মধ্যে দুঃখরূপে প্রকাশ হয়েছি। সর্ব অনুভূতিরূপে আমিই আমাকে প্রকাশ করছি, আমি অনুভূতির সার। তোমরা নিজেদের সত্য পরিচয় সম্বন্ধে একটুখানি শুনলে, তা ভুলে যেও না। একটু মনে রেখে চলতে অভ্যাস কর, তাহলে দেখবে যে ভগবানের কথা তোমরা পড়, শোনো, সেই ভগবান কী রকম কথা বলেন, কী রকম সাড়া দেন! আজকে এখানেই সচ্চিদানন্দ করতে হবে।

মন্তব্যঃ

একাদশ বিচারের পরিণাম হল দ্বাদশ বিচারের বিষয়বস্তু। দ্বাদশ বিচারের পরিণামে ত্রয়োদশ বিচার আসবে। বোধময় আমিসত্তা ও আমিময় বোধসত্তার বক্ষে নিরন্তর বোধের যে অভিব্যক্তি হয়ে চলেছে তার ব্যবহার ও অনুভূতি প্রকাশকের দৃষ্টিতে অখণ্ড পূর্ণ অদ্বয় আমিবোধ। তাকেই পাকা আমি বলা হয়। আপনবোধে হয় তার ব্যবহার। আবার প্রকাশের দৃষ্টিতে তা দ্বৈত নানাত্ব-বহুত্বরূপে প্রতীত হয়। নানাত্ব-বহুত্ব বৈচিত্র্যবোধ গুণ/ভাবের সংমিশ্রণেই হয়ে থাকে। দ্বৈতবোধের দৃষ্টি বলতে মিশ্রবোধের দৃষ্টিকেই নির্দেশ করে। শুদ্ধবোধ নিত্য অদ্বৈত, সবসময় তা সমবোধে পূর্ণবোধে প্রকাশ পায়। এই অদ্বৈতবোধের বক্ষে তার নিরন্তর প্রকাশের পূর্বাপর সম্বন্ধ ধরে যা প্রকাশ পায় ও অনুভূত হয় তা-ই হল মিশ্রবোধের সমষ্টি। এই মিশ্রবোধে হয় জগৎসৃষ্টি ও তার ব্যবহার। জীবনের অন্তরে ও বাইরে এই মিশ্রবোধের ব্যবহারই হল প্রধান। প্রতিটি জীবনের মধ্যে অদ্বয়বোধসত্তা কেন্দ্রে ও তুরীয়তে শুদ্ধবোধে স্ববোধে নিত্য অধিষ্ঠিত। অন্তরে ও বাইরে তা শক্তিরূপে, স্বভাবরূপে ও প্রকৃতিরূপে নিরন্তর সক্রিয় ও অনুভূত হয়। স্বভাবপ্রকৃতির প্রকাশবিকাশই জীবনের মধ্যে অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত ও অনুভূত হয়। স্বভাবের অনুভূতি হল বৈচিত্র্যময় নাম-রূপের অনুভূতি। তা সর্বতোভাবেই মনোপ্রধান অর্থাৎ চিদাভাসের কল্পিত কল্পনার বিলাস। তার অনুভূতি হল বৈচিত্র্যপ্রধান ভেদজ্ঞানের অনুভূতি, দ্বৈতবোধের অনুভূতি, বাস্তবতার অনুভূতি। দ্বৈতবোধে জগৎ সত্য, আত্মবোধ বিস্মৃত, ব্যষ্টিবোধ প্রধান। তা-ই হল অনাত্মবোধ। ব্যষ্টিবোধ হল কাঁচা আমি, দেহাত্মবুদ্ধি তার লক্ষণ। অনাত্মা দেহাত্মবোধের বৈশিষ্ট্য হল ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সংশয়, ভ্রান্তি, ভীতি, শোক, মোহ, জন্ম, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি। কাঁচা আমি হল স্বভাবের আমি। স্বভাবের বিবর্তন অনুসারে তার শোধন ও সংস্কার হয় স্ববোধ-আত্মা পাকা আমি-র অনুগ্রহে। তার ফলে কাঁচা আমি স্বভাবের দোষগুণ মুক্ত হয়ে স্ববোধের পাকা আমি-র সঙ্গে মিশে তদ্‌ধর্ম প্রাপ্ত হয়।

২৭/১২/০১

।। ত্রয়োদশ বিচার ।।

ওঁ

সত্যম্ সত্যম্ সত্যমেতি সত্য সাধনম্।
জ্ঞানম্ জ্ঞানম্ জ্ঞানমেতি জ্ঞান সাধনম্।
আনন্দম্ আনন্দম্ আনন্দমেতি আনন্দ সাধনম্।
আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি চ পরস্পরং রমন্তি
আনন্দং প্রযন্ত্যাভিসংবিশন্তীতি।
সর্বমানন্দম্ সর্বমানন্দম্ সর্বমানন্দম্
আনন্দময় সর্বজীবনম্ ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম পরম।।

(তত্ত্ববিজ্ঞান)

মানুষের জীবনের একটা ইতিহাস আছে। মানুষ তার নিজের ইতিহাসকে আবিষ্কার করতে গিয়ে জগতের ইতিহাসকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে। আবার জগতের ইতিহাসকে আবিষ্কার করতে গিয়ে নিজের ইতিহাসকে নিজে খুঁজে পেয়েছে। সেই ইতিহাস কী? সৃষ্টির যে আদি, অর্থাৎ সমস্ত জিনিসের প্রকাশের দিক দিয়ে আমরা একটা মূল খুঁজে বের করতে চাই। তার কারণ মূলের সঙ্গে পরিচিত হলে আমাদের সবরকম অভাব, অভাবজনিত যত রকম কার্য অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-কষ্ট—সবকিছুর রহস্য জানা যাবে। সবকিছুর মূল রহস্যকে একত্র করে জানতে গেলে আমাদের যা সব থেকে বেশি সাহায্য করে তা হল সংস্কৃত ভাষায় তত্ত্ব। অর্থাৎ যা হতে 'তৎ' জাত হয়েছে। 'তৎ' মানে becoming, বৈচিত্র্যাদি। বৈচিত্র্যের মূলকে ধরতে পারলে আমাদের জীবনের সমস্ত রহস্য উদঘাটিত হবে। তা-ই ভারতের ঋষিদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় ছিল। এখনও সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে বিশেষ ক'রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধকদের কাছে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। এই যে আমরা দর্শন করি, ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখি এর মাধ্যমে স্থূল বস্তুর একটা পরিচয় অর্থাৎ মোটামুটি উপরিভাগের একটা পরিচয় পাওয়া যায়—ইন্দ্রিয় দিয়ে যা পাই। আরেকটা দর্শন হচ্ছে অন্তরদর্শন। অন্তরদর্শন হয় মন দিয়ে, যা আমরা ভাবনার মাধ্যমে, চিন্তার মাধ্যমে, ধ্যানের মাধ্যমে জানতে পারি। আরেকটা দর্শন হল সামগ্রিক দর্শন, অর্থাৎ যা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। এই দর্শন কিন্তু চেষ্টাসাপেক্ষ নয়, তা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত।

এই স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত যে দর্শন, তার সঙ্গে পরিচয় সবার সহজে হয় না। এমনকী মুনি ঋষিদের মধ্যেও সবার হয়নি, কারণ সব মুনি-ঋষিরা তত্ত্ববেত্তা ছিলেন না, যদিও তাঁরা

তত্ত্বের সন্ধান করেছেন। তত্ত্ববেত্তা বলতে তাঁদেরই বোঝায় যাঁরা নিজেকে সৃষ্টির অণু-পরমাণুর মধ্যে অর্থাৎ অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একীভূত ভাবে অনুভব করতে পেরেছেন। তাঁরাই তত্ত্বদর্শী, তাঁরা কোনও সৃষ্ট বস্তুকে নিজ হতে পৃথক করে দেখেন না, জানেনও না। সবটাই আপনবোধে অভিন্নরূপে অনুভব করেন। এর নামই হচ্ছে ঋষিদৃষ্টি। ঋষি শব্দটি ঋষ্ ধাতু থেকে এসেছে। ঋষিদৃষ্টির অর্থ হল, যে বোধ সর্বব্যাপী অর্থাৎ উর্ধ্ব-অধঃ-মধ্যে, সামনে-পশ্চাতে, ডাইনে-বাঁয়ে, অন্তরে-বাইরে— সবকিছুকে বোধময় করে দেয় সেই বোধ। ইংরাজিতে বলা যায়, that is of homogeneous nature, not heterogeneous. Heterogeneous হচ্ছে অন্তরে-বাইরে সবকিছুকে পরস্পরের থেকে পৃথক পৃথক করে দেখা। আমাদের ভারতবর্ষ এমন একটা মহান আবিষ্কারের দাবি রাখে যা হল discovery of Oneness। তা-ই সহজ করে 'এ' সকলের কাছে বলেছে—Oneness of Knowledge/Knowledge of Oneness, Oneness of Science/Science of Oneness. Knowledge of Knowledge and not knowledge of persons, things, actions, results, space, time, causation, events, natural phenomena etc. কার বক্ষে হচ্ছে এগুলি? কে সেই মহান পুরুষ যাঁর বক্ষে তাঁর নিজেরই মহিমা ছড়িয়ে পড়ছে অভিন্নরূপে? তাই প্রশ্ন করেছেন ভিন্ন ভিন্ন ঋষি পরস্পরের সঙ্গে মিলে একত্র হয়ে যে, এই বিশ্বের কারণ কোথায়? সমগ্র সৃষ্টির কারণ কোথায়? আমাদের জীবনের কারণ কোথায়? আমাদের জীবনের অনুভূতির কারণ কোথায়? জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির কারণ কোথায়? মৃত্যুর অতীত কী আছে? অমৃতত্ব কোথায়? 'কিম্ কারণং ব্রহ্ম'। এই যে কার্যব্রহ্ম যিনি কার্যরূপে প্রকাশ হয়েছেন অর্থাৎ God in action, তাঁর কারণ কোথায়? গবেষণা বলে একেই। তা কী ভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে সেই কথা 'এ' বিজ্ঞানদৃষ্টিতে পরিষ্কার ভাবে বলবার চেষ্টা করছে।

'এর' কোনও পড়াশুনা নেই, শুধু ভিতর থেকে আপনা থেকে যা প্রকাশ হয়ে পড়ে তা-ই সকলকে পরিবেষণ করা হচ্ছে। এ এক অভিনব ব্যাপার যা সবার কাছে একটা বিরাট জিজ্ঞাসা। Revelation does not depend on any condition and limitation. But our preparation always depends on our assertion, search, enquiry, the grace and blessings from above and all around. যে দর্শন কথাটা বলা হল, সেই দর্শন কোনও static principle নয়। তা হল the basic substratum, the background of all, the ultimate resource, the underlying essence of all, the permanent truth, the source of all—central, inner and outer manifestations। পরমতত্ত্বস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ বলে স্বয়ংপ্রকাশতা তার ধর্ম অর্থাৎ the Absolute Being, the be-ness of the Being is the real nature of the Being. Be-ness কী? তা spontaneous becoming, স্বয়ংপ্রকাশ। Being-এর আপনবক্ষে becoming হয়ে চলেছে, কেননা স্বয়ংপ্রকাশতা তার ধর্ম, যেমন সূর্যের ধর্ম heat and light। Heat and light cannot be separated from the sun and the sun cannot be separated from its heat and light. So is the true nature of the Being, Being without becoming and

becoming without Being do not exist. এই জন্য খুব সহজ করে বলা হয়েছে যে, Being without becoming manifests not and becoming without Being exists not। তা সম্ভবই নয়। এই যে দর্শন তা বিজ্ঞানময়—স্বভাবতই বিজ্ঞানময়। এই বিজ্ঞান কিন্তু আমাদের Physics, Chemistry, Mathematics বা Zoology, Geology, Astrology এই সমস্ত কিছু নয়। এগুলো তো fractional ব্যাপার, Being-এর যে becoming nature তা বিজ্ঞানময়। সৃষ্টির আদিতেও তা ছিল, কারণ তা স্বয়ংপ্রকাশ। সেই তত্ত্বস্বরূপ এমন নয় যে, তার ভিতরে প্রকাশের অভাব আছে, তা কিন্তু নয়—তা স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংসিদ্ধ, Self-perfect, Self-existent, Self-evident, Self-abiding, Self-luminous, Self-effulgent।

একটা মাত্র শব্দ দিয়ে কথা বলতে গেলে পণ্ডিতরা তর্ক করবে। কিন্তু ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সেই কথার প্রতিধ্বনি আসছে বহু কথা দিয়ে, যার জন্য পণ্ডিতরা 'একে' বলেছে, যখন তুমি বলতে আরম্ভ কর এত স্ফূর্তিভাব তোমার কোত্থেকে আসে? আমরা একটা/দুটো word দিয়ে sentence complete করি আর তুমি অনর্গল ভাবে বলে চল। উত্তরে তাদের বলা হয়েছে, তা হচ্ছে revealing nature-এর characteristics। এই ভাবেই বেদ-বেদান্ত revealed হয়েছিল। ঋষিদের মধ্যে যে ঋষিদৃষ্টি তা একেই বলা হয়—*the eye of wisdom*, the Knowledge of Oneness। কাজেই তত্ত্বের আরেকটি নাম হচ্ছে প্রজ্ঞানঘন বা প্রজ্ঞান, অর্থাৎ supreme intelligence বা Wisdom Absolute। তা সবসময়ই বিজ্ঞানময়। নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নির্বিকল্প নির্বিকার নিরাকার যে ব্রহ্ম-আত্মা তিনি বিজ্ঞানময় হয়ে ঈশ্বর হয়েছেন, প্রজ্ঞানব্রহ্ম বিজ্ঞানময় হয়েছেন। এই বিজ্ঞানময় থেকেই জ্ঞানময় হয়েছেন এবং জ্ঞানময় থেকে অজ্ঞানময় হয়েছেন। এই সূত্রটি 'এর' ভিতরে জেগেছিল কীভাবে তা বলছি শোন। 'আনন্দাতিশয্যেন প্রজ্ঞানময় ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ৈব। বিজ্ঞানময়ব্রহ্ম/ঈশ্বর জ্ঞানময়ৈব জীবময়ৈব, জ্ঞানময় ঈশ্বর-জীব অজ্ঞানময়ৈব অজ্ঞানাৎ নাম রূপাদি বিশ্বসৃষ্টি প্রসূত' (প্রস্যুয়তে) প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এই কথা শুনে পণ্ডিতরা বলেছে, তুমি এগুলো বল কী করে? উত্তরে বলা হয়েছে, এটা আমার স্বভাব। আপনা থেকেই তা প্রকাশ হয়ে চলেছে। প্রত্যেকের ভিতরে এই স্বভাব latent রয়েছে। এই বক্তব্য শুনতে শুনতে তাদের ভিতরে তা kinetic হয়ে যাবে, energized হয়ে যাবে, তার ফলে তার ভিতরে consummation of all কর্ম-যোগ-জ্ঞান-ভক্তি আপনা থেকেই প্রকাশ হবে। তা assert করার অপেক্ষায় থাকে না। In this process at the end of কলিযুগ সত্যযুগ reveal করবে। এই হল সত্যযুগের revelation-এর science। তা কোনও individual ব্যক্তির perfection-এর বিজ্ঞান নয়।

আমরা শাস্ত্রের পাতায় পাই কর্মবিজ্ঞান, ধর্মবিজ্ঞান, যোগের বিজ্ঞান, ভক্তির বিজ্ঞান, ধ্যানের বিজ্ঞান, তন্ত্রের বিজ্ঞান, কুণ্ডলিনী জাগরণের বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের বিজ্ঞান। এগুলোর consummation অর্থাৎ যা-কিছু প্রকাশ হয়েছে সবকে নিয়ে সেই পরমতত্ত্বস্বরূপ অদ্বয়স্বরূপ, তা হল 'ন চ একং তদন্যং দ্বিতীয়ং কুতঃ স্যাৎ।' এক-ই যেখানে নেই সেখানে দুই কোত্থেকে আসবে? কিন্তু আমরা তো তা সহজে বুঝতে পারছি না। তা যদি আমাদের সামনে তিনি স্বয়ং

demonstrate না-করেন তাহলে পরে তা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। সেই demonstration তিনি তো নিরন্তর দিয়েই চলেছেন। তিনি তো স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি কতগুলি agent বানিয়ে রেখেছেন, নিজেই সেই রূপ ধারণ করে, যেমন চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদি, জ্যোতিষ্মণ্ডল তাঁর জ্যোতিতেই প্রকাশিত হচ্ছে। তার পরে আসছে অনন্ত জীবজগতের ইতিহাস। সবগুলোর total পরিচয় নিয়ে সেই ইতিহাসে আমরা কী পাচ্ছি তার আদি-মধ্য-অন্তে? অনন্ত তাঁর পরিচয়। কিন্তু সৃষ্টি যখন বলা হয়েছে তখন তার একটা আদি নিশ্চয়ই আছে। যেখানে সৃষ্টি নেই সেখানে আদি-মধ্য-অন্তের কোনও প্রশ্ন নেই। তাই গীতাতেও বলা হয়েছে এই কথা, "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।। অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।" হে অর্জুন তুমি কার জন্য শোক করছ? তোমার মতো বীরের পক্ষে তা শোভা পায় না। "নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।" It does not behove you. You should not behave like this! তুমি বীর, কার জন্য শোক করছ? গীতার ভিতরে যদি মূল্যবান কথা কিছু খুঁজে পাওয়ার ইচ্ছা কারও থাকে, কয়েকটি শব্দ দিয়ে তা ধরা যায়।

গীতা হচ্ছে একটা বিজ্ঞানগ্রন্থ। এই বিজ্ঞান কিন্তু Absolute-এর বিজ্ঞান, প্রাকৃত বিজ্ঞান নয়, সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত কোনও বস্তুর আদি-মধ্য-অন্তের বিজ্ঞান নয়, ইতিহাস বা তার বর্ণনা নয়। এটা হচ্ছে পরমতত্ত্বস্বরূপের বিজ্ঞান, প্রজ্ঞানময় ব্রহ্ম-আত্মার বিজ্ঞানময় রূপ। তার মধ্যে সমস্ত কিছুই included। গীতা 'এ' পড়েনি। অনেকেই বলে, তাহলে তুমি কোত্থেকে এগুলো বলছ? উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, 'আমি-র' স্বরূপটাই তাই। স্বয়ংপ্রকাশ স্বরূপই হল 'আমার' স্বরূপ। প্রত্যেকের ভিতরেই এই স্বরূপ লুকিয়ে আছে। এই হল 'এর' reading। সবার সামনে তা-ই বলা হচ্ছে। You are not different from that Absolute nor that Absolute is different from you. It is the august proclamation of the Absolute. নব যুগের নববার্তা প্রত্যেকের জন্য। তোমার দেহ জাত হয়েছে বটে, কিন্তু তুমি জাত হওনি, তোমাকে অবলম্বন করে দেহ জাত হয়েছে। যেমন এখানকার ভূমিকে অবলম্বন করে, আকাশকে অবলম্বন করে এই ঘরটা তৈরি হয়েছে। দেহটাও একটা ঘর, এর মধ্যে অনেকগুলো room আছে, compartment আছে, যেমন এই building-এর মধ্যে অনেকগুলো compartment আছে। এই প্রজ্ঞানব্রহ্ম বিজ্ঞানময় হল, তারপর বিজ্ঞানময় থেকে জ্ঞানময় হল—এই জ্ঞান হচ্ছে আভাস, ক্রমশ reflected হয়ে পড়ছে নিজেরই বক্ষে। Reflection-এর পরে reflection হতে হতে, এই subtlemost থেকে subtler, subtler থেকে subtle, subtle থেকে gross-এ এল, আবার gross থেকে dissolved হয়ে subtle থেকে subtler এবং subtler থেকে subtlemost হয়ে যাচ্ছে। This is the cycle. এর নাম ধর্মচক্র। এই ধর্মচক্রের ইতিহাস কিন্তু ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়েছে।

বিদেশিরা 'একে' বারবার প্রশ্ন করেছে যে, তুমি ভারতবর্ষের উপরে যে এত কথা বলছ তার significance-টা আমরা সঠিক জানি না, তুমি একটু clear করে বল। উত্তরে তাদের

বলা হয়েছিল, দেখ প্রতিটি শব্দের চারটে করে meaning আছে। একটা outer, তারপর inner, তারপর central এবং সর্বশেষে transcendental। এই চতুষ্পাদের সঙ্গে যাঁর পরিচয় হয়েছে তিনিই হলেন ব্রহ্মিষ্ঠ। ব্রহ্মবিদের মধ্যেও কিন্তু চারটে ভাগ আছে, যথা— ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্‌বর, ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান এবং ব্রহ্মিষ্ঠ। অর্থাৎ truth-এর outer appearance, truth-এর inner nature, truth-এর central nature, truth-এর absolute nature, মানে totality of truth সম্বন্ধে যিনি জ্ঞান লাভ করেছেন তিনিই হলেন ব্রহ্মিষ্ঠ। সেই Absolute নিজেকেই নিজে প্রকাশ করতে গিয়ে রূপ ধারণ করেছেন, the Absolute becomes personified out of bliss—'আনন্দাতিশয্যেন'। এই আনন্দই হল মূল উপাদান। প্রত্যেকেই আনন্দে গড়া, আনন্দে ভরা জীবন সবার, কিন্তু আমরা সেই আনন্দকে ঠিক পরিপূর্ণ মাত্রায় আস্বাদন করতে পারছি না। কতগুলো flaw আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে। সেগুলোকে সরিয়ে দিলে, আকাশ clear হয়ে গেলেই হয়ে যাবে, flight আর late হবে না, তাড়াতাড়ি ছাড়বে। দেহ একটা ঘুড়ির মতো। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ঘুড়ি ওড়ায়। অনেকরকমের ঘুড়ি আছে। এই ঘুড়ির বিজ্ঞান হচ্ছে এই সৃষ্টির বিজ্ঞানেরই একটা part। এই দেহ যেন একটা ঘুড়ি, এর একটা frame আছে, একটা ছাউনি আছে, ভিন্ন ভিন্ন part-এ তালি দেওয়া আছে। ঘুড়ির উপরে একটা সুন্দর ভজন আছে—

এ দেহঘুড়ি কে বানাল রে কামলা রইল কই
এমন সুন্দর ঘুড়ি দেখে ধাঁধা লেগে রই।।
হাড়ের কামানি ঘুড়ি চামড়ার ছাউনি
সারা অঙ্গে আছে ঘুড়ির তালি দেওয়া সই।।
চোদ্দপোয়া ডোর দিয়ে ঘুড়ি উড়ালো
সজনীরে সঙ্গে পেয়ে সে উড়িতে শিখিল।
উড়িতে উড়িতে ঘুড়ি যায় বহু দূর
যার হাতে তৈরি ঘুড়ি তারই হাতে ডোর।
ঘুড়ির প্রভু ঘুড়ি ওড়ায় ভেবে অবাক হই
অন্তরে শুনি তার বাণী মাভৈঃ মাভৈঃ।।
ঘুড়ির সাজে স্বয়ং আপনারে প্রকাশিল
আপন মহিমাদি স্বয়ং প্রকাশ করিল।
তার তুলনা নাই রে তার তুলনা নাই
এমন সুন্দর ঘুড়ি দেখে ধাঁধা লেগে রই।।

(বাউল—কাহারবা)

আজ পর্যন্ত সৃষ্ট জগতে যতরকম সৃষ্টি হয়েছে, human constitution is the most complicated constitution। অর্থাৎ স্রষ্টার অভিনব সৃষ্টি হল মানবজীবন, একেবারে তাঁর prototype। ঈশ্বর তাঁর নিজের মতো করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে নিজেকে

তিনি পরিপূর্ণ ভাবে reveal করবেন। কাজেই "সবার উপরে মানুষ সত্য"—কবির এই উক্তি অতি বড় সত্য। তার কারণ মানুষের মধ্যে ঈশ ভরা আছে সমগ্র মান যুক্ত করে। এই ঈশকে মেনে যে চলতে পারে সে-ই সত্যিকারের মানুষ। প্রতিটি পদে ঈশ, "প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং।" অমৃতে ভরা এই বিশ্বজগৎ। কিন্তু অমৃত কী? চৈতন্য আনন্দ, চিদানন্দ। কত gradation তার, কত মান! সমস্ত মান দিয়ে যিনি সব কিছু আপন করে বরণ করে নিতে পারেন তিনিই মহান। To know and embrace all as one's own Self is the perfect realization and all else are mere preparation. Realization does not spare anything, it is spontaneous and not assertive. আমাদের intellectual understanding assertive। কাজেই প্রজ্ঞানময় ব্রহ্ম বিজ্ঞানময় হয়ে জ্ঞানময় হল। তার পরে অজ্ঞানে এল কেন? আধার চাই বা পাত্র চাই যে, আনন্দকে ধারণ করার জন্য আধার চাই। আধার মানে যার মধ্যে আনন্দকে ধারণ করে রাখা যায় ব্যবহারের জন্য। Electricity সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তা ব্যবহার করতে গেলে আমাদের cable চাই। কাজেই এই দেহ-cable যদি না-বানানো যায় তাহলে চৈতন্যের সবরকম demonstration দেওয়া সম্ভব হবে না। কী গুরুত্বপূর্ণ কথা! Intensified purpose of the Lord, all comprehensive conception, the totaliy of all ideas!

Idea অর্থাৎ (I + dea) I-কে দিয়ে সমস্ত I-কে অর্থাৎ আমি দিয়ে সমস্ত আমি-আদির প্রকাশকে একত্র করে নিয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করছেন প্রত্যেকটি আধারের মধ্যে। Each and every individual is a living example of the universal mechanism, that is why the terms macro and micro are important, অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর পিণ্ডাণ্ড। পিণ্ডাণ্ড হচ্ছে individual body, আর ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে universal body—the same mechanism and it has been discovered by the ancient great Rishis who declared the Oneness of Knowledge—'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। এর তাৎপর্য অর্থাৎ ব্রহ্ম হতে পৃথক বা আলাদা করে কোনও জগৎ নেই, কোনও বস্তুকে চৈতন্যের থেকে আলাদা করা যায় না (অখণ্ড বোধময় আমি/আমিময় বোধ অতিরিক্ত কোনও কিছুই সম্ভব নয়)। How can you distinguish it, recognize it without the Consciousness which lies within you as I? And you are verily that Consciousness alone and nothing else. That is why you are able to recognize everything—outwardly, inwardly and centrally. বোধের দ্বারাই বোধকে আবিষ্কার করা যায়। কালকে তোমরা খুব সহজ কথা শুনেছ অনেক, আজকে কিন্তু সব জিনিসের গভীরের দিকে যেতে হচ্ছে। কাজেই খুব rapt attention দিয়ে না-শুনলে, অনেক কথা miss হয়ে গেলে আর link up করতে পারবে না।

এই যে প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্ঞান (জ্ঞানাভাস) এবং অজ্ঞান সম্বন্ধে বলা হল, তা হল 'এর' বক্তব্যের একেবারে fundamental point। অজ্ঞানেই হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জ্ঞানের lowest

unit হচ্ছে পরিদৃশ্যমান object বা বিষয়বস্তু। কাজেই এই visible universe-টা হল অজ্ঞানমূর্তি। ব্রহ্মের চতুষ্পাদ হল—প্রজ্ঞান ব্রহ্ম, বিজ্ঞান ব্রহ্ম, জ্ঞান (জ্ঞানাভাস) ব্রহ্ম, অজ্ঞান ব্রহ্ম। এর সঙ্গে কী কী জিনিসের সম্পর্ক আছে তা 'এ' খুব সংক্ষেপে বলে যাচ্ছে। Very tough subject! এই প্রজ্ঞানের মধ্যে কী আছে? This is conscience, বিজ্ঞান হল prescience, তারপর life science বা science, তারপর nescience। বাহ্যদৃষ্টিতে বিপরীতক্রমে nescience, life science, prescience এবং conscience অর্থাৎ divine science। তা-ই হল ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব—conscience itself। যাঁর বিবেক জেগেছে তাঁর ভিতরে বোধ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ হয়। বিবেক কী? তা এক অভিনব জিনিস, যার অভাবে আমাদের ভিতরে ভেদজ্ঞান অর্থাৎ sense of division, differentiation, distinction, isolation এবং separation এগুলি প্রকাশ পায়। বিবেক সেগুলোকে সব বরণ করে নেয়, সংহরণ করে নেয়।

সংহার শব্দের চারটি অর্থ আছে। একটা অর্থ হল ধ্বংস করা। দ্বিতীয় অর্থ হল, 'সং' মানে মিথ্যা অলীক কল্পনা নাম-রূপাদি—তাকে আপনবোধে বরণ করা। তৃতীয় অর্থ হল, আপন অতিরিক্ত সবকিছুকে মিথ্যা জ্ঞানে পরিত্যাগ করা। চতুর্থ অর্থ হল, সবকিছুকে সমত্বে বা সমানে পর্যবসিত করা—গ্রহণ করা, ব্যবহার করা ও অনুধাবন করা। সর্বের পুঁটলিটা ছড়িয়ে গিয়েছে, সবগুলিকে আবার গুটিয়ে নিয়ে আসা। অর্থাৎ সৃষ্টি unfold ক'রে আবার তা foldup করা। এই বিজ্ঞান জানা হয়ে গেলেই মৃত্যুকে আর কেউ ভয় পাবে না। কেননা মৃত্যু হল eventual, খেলার একটা part । যেমন খেলতে গিয়ে হেরে যাওয়াটা একটা খেলার part, কিন্তু তাও শেষ নয়। মৃত্যুটাও একটা rest, periodical rest, partial rest। Nothing to fear about! ভয় পাওয়ার কিছু নেই! Science of Oneness, i.e. Knowledge of Oneness will remove all your doubts, all your fears, tears, all your contradictions and ignorance. Ignorance শব্দের অর্থ হল যা সবকিছুকে প্রকাশ করতে পারছে না। কাজেই এই nescience হল অবিদ্যা, জড়বিদ্যা, তা শুধু স্থূলের ধর্ম বা প্রকৃতিকেই নির্দেশ করে। এখানে science মানে life science অর্থাৎ জীববিদ্যা। সেখানে চেতনা work করছে, কিন্তু চৈতন্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়নি। সেই জীবের মধ্যে চেতনা আছে, কিন্তু চৈতন্য (Pure Consciousness/Self) প্রকাশ পায়নি। সেইজন্য একটি গানে আছে, "আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্যময়ী"। খুব ছোট্ট কথা, কিন্তু গভীর এর রহস্য।

আমাদের চৈতন্য জাগাবার জন্য আমরা কতরকম চেষ্টা করছি শৈশব থেকে জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে, কখনও বাধ্য হয়ে, কখনও বা স্বেচ্ছাকৃত ভাবে। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সবকিছুর মাধ্যমে আমাদের ভিতরে চৈতন্যের ক্রমশ unfoldment বা বিকাশ হয়ে চলেছে। যতক্ষণ সমস্তকিছুকে embrace করতে না-পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত চলবেই এই process । এই হচ্ছে অন্তরবিজ্ঞান। কেন্দ্রবিজ্ঞানে এসে তা prescience হয়, কারণতত্ত্বকে আগে জানা হয়েছে। কাজেই সেই ক্ষেত্রে এলে অভী হয়ে যাবে। তা আত্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্র, ঈশ্বরবিজ্ঞানের ক্ষেত্র,পরমার্থের ক্ষেত্র, পরমেশ্বর পরমাত্মা পরব্রহ্মের ক্ষেত্র। 'এ' এবার বিজ্ঞান প্রসঙ্গে

আরেকটি কথা বলে নিয়ে তারপর পরবর্তী বক্তব্যটা রাখবে এবং তার ফলে তা অপরের পক্ষে বুঝতেও সুবিধা হবে। এখানে (নিজের হাতের চারটি আঙুল ও চারটি আঙুলের চারটি করকে নির্দেশ করে—কনিষ্ঠার চারটি কর, অনামিকার চারটি কর, মধ্যমার চারটি কর এবং তর্জনীর চারটি করকে নির্দেশ করে অর্থাৎ ষোলোটি করকে নির্দেশ করে অজ্ঞান-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানতত্ত্বকে সংক্ষেপে নির্দেশ করলেন) চারটে স্তর দেখানো হয়েছে, প্রত্যেক স্তরকে এক একটি আঙুলের মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে। আঙুলের মধ্যে চারটে কর আছে, সব মিলিয়ে ষোলোটা হচ্ছে, অর্থাৎ ষোলোকলা পুরুষ এবং ষোড়শী মাতা। শক্তিতত্ত্ব দিয়ে দেখতে গেলে আমরা মাকে ষোড়শী মাতা বলি, মানে ষোলোকলা পূর্ণ যেমন পূর্ণিমার চাঁদ, সেখানে পরিপূর্ণ প্রকাশধর্মী।

জ্ঞানসত্তা সূর্যের মতোই পূর্ণ। একটু আগে আঙুলের মাধ্যমে তোমাদের অনেক সূক্ষ্ম বিষয়ে বলা হয়েছে, তা খুব লক্ষণীয় জিনিস। *Knowledge of Knowledge* শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের একটি ইংরেজি গ্রন্থ। *Knowledge of Knowledge*-এর মধ্যে উপরোক্ত প্রসঙ্গ 'এ' খুব clear করে বলেছে। রূপের ঘর, নামের ঘর, ভাবের ঘর, বোধের ঘর সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। রূপের ঘরের মধ্যেও আবার চারটে ভাগ আছে। এই রূপের মধ্যেও রূপ, নাম, ভাব, বোধ আছে। খুব attentively তা শুনতে হবে! রূপের ঘরে রূপের রূপ, রূপের নাম, রূপের ভাব, রূপের বোধ; নামের ঘরে নামের রূপ, নামের নাম, নামের ভাব, নামের বোধ; ভাবের ঘরে ভাবের রূপ, ভাবের নাম, ভাবের ভাব, ভাবের বোধ এবং বোধের ঘরে বোধের রূপ, বোধের নাম, বোধের ভাব, বোধের বোধ। তাহলে প্রথম ঘরটা সবই রূপের, দ্বিতীয় ঘরটা সবই নামের, তৃতীয় ঘরটা সবই ভাবের এবং চতুর্থ ঘরটা সবই বোধের। রূপের ঘরের বোধ হচ্ছে চার নম্বর, নামের ঘরের বোধ হচ্ছে আট নম্বর, ভাবের ঘরের বোধ হচ্ছে বারো নম্বর এবং বোধের ঘরের বোধ হচ্ছে ষোলো নম্বর—এখানে ষোলোকলা পূর্ণ। 'This I' is talking from the point of I-Reality. পৃথিবীর scientist-দের, দার্শনিকদের এবং ধার্মিকদের সামনে 'এ' এই বিজ্ঞান রাখছে। If they follow this with an unbiased and unprejudiced mind then they will discover their own Self without going through rigorous Sadhana or spiritual practices. এই যে বোধ, এই বোধ হল 'পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরমাত্মা নিরঞ্জন', অর্থাৎ 'the Absolute I'—'অখণ্ড বোধময় আমি অথবা অখণ্ড আমিময় বোধ', উভয়ই Absolute Reality-র সত্য পরিচয়। সেইজন্য ব্রহ্ম ও পরমাত্মার পরিচয় প্রজ্ঞানঘন বলা হয়েছে। তা-ই আবার তত্ত্বের দৃষ্টিতে সচ্চিদানন্দঘন বলা হয়েছে। এসবই স্বানুভবসিদ্ধ বিষয়, কেবলমাত্র বুদ্ধির অনুমান নয়। এই 'I' / 'পাকা আমি' সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে আছে। রূপের ঘরে রূপের I, নামের ঘরে নামের I, ভাবের ঘরে ভাবের I এবং বোধের ঘরে বোধের I, সবই এক 'I' অর্থাৎ 'পাকা আমি সত্তার' বক্ষে তার প্রকাশবিভূতি। এই যে ষোলোটা ভাগ বলা হল, এগুলি একটু মন দিয়ে শুনলে এবং বোঝবার চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে, তা একটা পুরো mathematical হিসাব। Because only Mathematics is the perfect and accurate

science which can demonstrate the truth of the creation. সেইজন্য অঙ্ক শাস্ত্রের এত গুরুত্ব, অঙ্ক ছাড়া কোনও বিজ্ঞানই হয় না।

অঙ্ক কোত্থেকে এল? সংখ্যা থেকে এসেছে। সংখ্যা সাংখ্যজ্ঞানের থেকে এসেছে। সাংখ্যজ্ঞানের ব্যবহারিক রূপ হচ্ছে সংখ্যা। বড় অদ্ভুত বিজ্ঞান! যাই হোক 'এ' সেদিকে যাবে না। 'এর' বক্তব্য হল, প্রত্যেকের ভিতরে বোধরূপী আমি কী ভাবে খেলা করছে। আমি মানেই চৈতন্যসত্তা, the Consciousness Absolute, the Knowledge Absolute, the Wisdom Absolute। তাকেই সংস্কৃতে বলে সম্বিৎস্বরূপ চিদ্‌স্বরূপ। কাজেই সম্বিৎ বা চিৎ প্রকাশ হতে গিয়ে, ভাবের সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়ে, শক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়ে কতগুলি division-এ বিভক্ত হয়ে পড়ে। বাইরে তা হচ্ছে পরিপূর্ণ অচিৎ, অর্থাৎ এই অজ্ঞানটা হল অচিৎ। জীব হল চিৎ ও অচিৎ-এর মিশ্রণ বা combination। সেইজন্য জীব কিছু জানে এবং কিছু জানে না। আমরা অনেক কিছু জানি এবং অনেক কিছু জানি না। বাইরে অচিৎ, তার অন্তরে চিদাচিৎ, তার অন্তরে কেবল চিৎ এবং তার অন্তরে পরাচিৎ। জীবের দেহ এবং তার বাইরে সবই অচিৎ, জীবের অন্তরে স্বভাব হল চিদাচিৎ মিশ্রণ, তার কেন্দ্রসত্তায় স্ববোধে চিৎ এবং তুরীয়তে পবাচিৎ। চিদাচিৎ-এর মধ্যে অচিৎ-এর ভাগ জীবনের মধ্যে যাদের বেশি তারা অজ্ঞানের প্রভাবে চলে। যাদের চিৎ-এর ভাব অধিক তারা অনেক বেশি উন্নত, তাদের জীবন সম্পূর্ণ অজ্ঞানমুক্ত না হলেও তারা ধীর, স্থির ও প্রাজ্ঞ। তারা সহজে মুষড়ে পড়ে না, upset হয়ে যায় না। এই জন্যই চিৎ-এর ভাগ তাদের ভিতরে বেশি পাওয়া যায়। তা আরও বাড়লে, চিৎ প্রধান হলে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবে। চিদ্‌স্বরূপ ঈশ্বর আত্মা চিদাত্মা চিদেশ্বর চিন্ময়ীমাতা। 'চিদম্বরম্ সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'।

এই যে শব্দগুলি আমরা ব্যবহার করি, এর যথার্থ অর্থবোধটা আমাদের হয় না। আমরা মন্ত্র পাঠ করি, কিন্তু মন্ত্রের অর্থবোধটা হয় না বলে মন্ত্র জাগ্রত হয় না। মন্ত্রার্থ ভাবনার দ্বারা মন্ত্রকে উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু তা আমাদের কে শেখাবে? মন্ত্রের অর্থ ভাবনা করতে গেলে প্রত্যেকটি শব্দের অর্থবোধ জানা চাই, তার ব্যবহারিক অর্থ, তার derivative অর্থ, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অর্থ, ঈশ্বরীয় অর্থ এবং ব্রহ্ম-আত্মবোধের অর্থ বা আপনবোধের অর্থ জানা চাই। সেইজন্য আপনবোধ দিয়ে সব জিনিসকে জারিত করে সবার সামনে পরিবেষণ করা হচ্ছে। প্রত্যেকেরই একটা আপনবোধ আছে, প্রত্যেক individual-এর। Every individual has got some sense of oneness, ownness, তার স্বকীয়তা and that should be enlightened। তা mechanical practice-এর দ্বারা সম্ভব নয়। Mechanical practice দীর্ঘকাল অভ্যাস করতে করতে এই জাতির মধ্যে আজকে ঘুণ ধরে গিয়েছে। যারা পূর্ববঙ্গ থেকে refugee হয়ে এসেছে তারা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে যে, কী হারিয়ে তারা কী পেয়েছে এবং কী পেয়ে কী হারিয়েছে। কাজেই আমাদের মধ্যে greater number of people have experienced the loss and gain in life to some extent। কিন্তু তা আরও বেশি focus করতে গেলে 'একে' জীবনের লাভ-ক্ষতির একটা খতিয়ান দেখাতে হবে যে,

আমরা কী লাভ করি আর আমাদের কী লোকসান হয়। In reality we gain nothing, we lose nothing. কিন্তু মনুষ্য সমাজে 'এর' এই কথা মানবার মতো মানুষ খুব কম আছে। কিন্তু 'এ' তা একেবারে অঙ্কের মতো করে prove করে দেবে, কেননা এগুলোর সঙ্গে 'এ' মিশে আছে বলে। This is not a subject of intellect. Intellect একটা subject-কে define করে, একটা object-কে define করে, কিন্তু Real I subject-object নয়, it is the essence —what I am in Reality and not what I am in appearance।

সবার মধ্যেই একটা আমি আছে, তার appearance হচ্ছে দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত, কিন্তু you are above all these. But how to realize it? 'এ' সেই বিজ্ঞানই সবার সামনে রাখছে—it is not sectarian, nor even fanaticism, it is that truth which reveals all your positive and negative aspects, gross, subtle and subtler। কিন্তু আমরা তার হিসাব রাখতে পারি না, কেননা সেই training-টা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, সেই ছকটা হারিয়ে ফেলেছি—we have lost that। 'এ' তা-ই সবার সামনে আবার ধরিয়ে দিচ্ছে। Your inner nature, central nature will pick it up, because you are made up of the same one substance. You will attain nothing anew, you will realize nothing anew, you will get no God other than your own Self. Self has fashioned Itself in manifold nature. সেইজন্য আমরা বাইরে বহু দেবদেবী, বহু রকম ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাই। এসব গাঁথা আছে আপন হৃদয়ে।

হৃদয় সর্ববিদ্যার কেন্দ্র, কেননা হৃদয়ে বাস করছেন ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম স্বয়ং। সেখান থেকে সব স্ফুরিত হচ্ছে অন্তরের মাধ্যমে বাইরে আবার বাইরে থেকে অন্তরের মাধ্যমে সেখানে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে centrifugal movement and centripetal movement of life। সৃষ্টি অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়ে এসে আবার অব্যক্তে মিশে যাচ্ছে, এক-এর থেকে বেরিয়ে এসে বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে আবার এক-এ মিশে যাচ্ছে। এক-এর থেকে যখন বেরিয়ে আসছে it is centrifugal movement, আবার বহুত্ব থেকে যখন এক-এ যাচ্ছে then it is centripetal movement. Centripetal movement মানে কেন্দ্রানুগ আর centrifugal হল কেন্দ্রাতিগ। The movement from the centre towards the outer circumference or outer nature and the movement from outer nature to the central nature and thereafter to the transcendental One. তা কোনও sectarianism নয়, doctrine নয়, তা হল essence of all doctrines, all theses and all theories। শাস্ত্রে কতগুলো record আছে, কিন্তু সেই record কাজে লাগাবার মতো যোগ্য অধিকারীর একান্ত অভাব। বাল্যশিক্ষা নিয়ে কালকে আলোচনা করা হয়েছিল। 'একে' অনেকে তা নিয়ে challenge করে বলেছে, আপনি ধর্মকে আঘাত করছেন। উত্তরে তাদের বলা হয়েছে, ধর্মকে 'এ' আঘাত করেনি। ধর্মকে বোঝাবার জন্য ধর্মের কতগুলি gradation দেখানো হচ্ছে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে। সেই বিদ্যা গিয়ে কোথায় পৌঁছায়? যে

অ-আ-ক-খ পড়ছে আজকে, সে আস্তে আস্তে first book, second book শেষ করে আরও গভীরে যাচ্ছে, lower primary থেকে middle primary, তার পরে higher primary, তার পরে secondary, higher secondary—এই ভাবে ছাত্র graduation শেষ করে তারপর post graduate হয়ে বেরিয়ে আসছে। তার পরে আবার আরও উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করছে, যেমন PRS, Ph.D ইত্যাদি। কাজেই প্রাথমিক স্তর থেকেই সে আরম্ভ করছে। খুব মন দিয়ে কথাগুলো শুনলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, 'এর' কথার মধ্যে কোনও flaw নেই, কারণ সবকিছুর মধ্যে আমি মিশে আছে বলে I can utter the words without any hesitation and limitation।

আমরা যে ধর্ম আচরণ করি তা হচ্ছে alphabetical স্তরের, অর্থাৎ পূজা-পার্বণ, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি। কিন্তু সারাজীবন এই alphabetical stage-এই রয়ে গেলাম আমরা। ওই montessori class বা class I/II- এ ভর্তি হয়ে ছাত্র যদি তিনবার fail করে তাহলে তাকে আর উপরের class-এ promotion দেওয়া হয় না। আমরা সমাজের কোন স্তরে পড়ে আছি? কী ধর্মবিজ্ঞান চর্চা করছি আমরা? এর পরবর্তী স্তরে যদি আমরা না-যাই promotion পেয়ে তবে তো chaos সৃষ্টি হবে। সবাই যদি একই স্তরে থাকে তাহলে তো chaos সৃষ্টি হবে। একটা class-এ যদি সব ছেলে fail করে, তাহলে নিচের class থেকে যারা promoted হয়ে সেই class-এ উঠবে তাদের manage করবে কী করে? আমাদের ধর্মের প্রথম step-এই chaos সৃষ্টি হয়ে আছে। তাই এত হানাহানি, কাটাকাটি, মারামারি—কারওর বাবার ক্ষমতা নেই তা খণ্ডন করতে পারে। কোনও মহাপুরুষই এসে তা পারবেন না। আমাদের move করে যেতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে, একটা স্তর ছেড়ে দিয়ে যখন অন্য স্তরে যাবে তখন আরেক দল এসে আগের স্তর cover করবে। এটা যেন relay race-এর মতো। আমরা relay race দেখি, কিন্তু তার তাৎপর্য বুঝি না। একটা class থেকে আরেকটা class-এ যেতে হলে চৈতন্যকে মানতে হবে, অর্থাৎ মান-হুঁশ। হুঁশকে মেনে চলতে হবে আমাদের। হুঁশ is Consciousness, the only substratum, হুঁশ is the base। মান হল gradation বা classification. That is not permanent, substance is permanent. Design pattern যা খুশি হোক না কেন, substance প্রত্যেকেরই দরকার।

এই প্রথম স্তর থেকে আমরা তার পরের স্তরে গেলে অন্য দল এসে পূর্ব স্তরটি cover করবে। সারাজীবন আমরা একই স্তরে পড়ে রয়েছি। অবশ্য এই জিনিস নিয়ে বহু তর্ক বিতর্কের প্রশ্ন উঠেছে। তখন বলা হয়েছিল, দেখ 'এ' তর্ক করার জন্য আসেনি। তর্কটা 'এর' subject নয়। 'এর' প্রকাশ করা নিয়ে কথা, তুমি গ্রহণ করতে পার বা না-পার, তাতে 'এর' কোনও ক্ষতি নেই। The sun gives the light and heat, whether we accept it or not তা কিন্তু সূর্য দেখতে আসবে না। The sun will not take any account of this. সেই রকম 'এ' এই বিজ্ঞান সবার সামনে রাখছে—কে কতখানি গ্রহণ করতে পারছে বা না-পারছে তার account 'এ' নেবে না, কেননা it depends upon his or her own nature। কে নিজে কতখানি খাবে নেমন্তন্ন বাড়িতে তা তার উপরে নির্ভর করছে। বহু পদ

রয়েছে, যার যা ভাল লাগছে সে তা-ই খাচ্ছে, অনেকে খাচ্ছেও না, অনেকে আবার এক পদ খেয়েই চলে যাচ্ছে। কাজেই সব জিনিসকে relish করতে হলে আমাদের সেইরকম preparation-এর দরকার। এই preparation-এর নামই হল শিক্ষা। সেইজন্য ঋষিরা প্রথমেই রেখেছিলেন শিক্ষাকে। বেদের ছ'টা অঙ্গ হল—শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, কল্প, ছন্দ, জ্যোতিষ। এর অর্থ কী? বেদ মানে জ্ঞান। এই জ্ঞানের দুটো part আছে, একটা হচ্ছে শব্দ ব্রহ্ম, আরেকটা হচ্ছে রূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ একটা আত্মব্রহ্ম ও আরেকটা অনাত্মব্রহ্ম, একটা প্রজ্ঞানব্রহ্ম ও আরেকটা বিজ্ঞানব্রহ্ম। প্রজ্ঞানব্রহ্ম তত্ত্বময়, বিজ্ঞানব্রহ্ম তথ্যময়। প্রজ্ঞানব্রহ্ম নিত্যপূর্ণ নির্গুণ সত্য অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ এবং বিজ্ঞানব্রহ্ম হল লীলাময় সক্রিয় সগুণ শক্তি উপাধি যুক্ত। ঈশ্বরস্রষ্টা প্রভু বিভু বিধাতা, অনন্ত জীবজগৎ হল তাঁর স্বভাবমহিমা। শব্দ ব্রহ্ম বোধের দিকে যাচ্ছে, রূপ ব্রহ্ম মনের দিকে অর্থাৎ আমরা মন দিয়ে তা enjoy করছি, সূক্ষ্মতর রূপ পর্যন্ত enjoy করছি। কিন্তু শব্দ ব্রহ্মকে আর পরে enjoy করা যায় না, জ্যোতিকে enjoy করা যায় না, তার মধ্যে মিশে যাওয়া যায়।

দুই প্রকার সমাধি আছে— শব্দানুবিদ্ধ ও রূপানুবিদ্ধ। বোধের সমত্বে স্থিতির নাম সমাধি। আমাদের বহিরংশ হল রূপময়, অন্তরে প্রাণ হচ্ছে আমাদের এই চিদাচিৎ প্রাণ। অন্তঃকরণ—তার মধ্যে কিছুটা জড়ভাব, কিছুটা চেতনভাব। আরও গভীরে গেলে অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধির গভীরে গেলে সেখানে এই চিৎ-এর কিছু অংশ রয়েছে, reflection of Consciousness directly in the intellect। Intellect is the first ground on which the background Consciousness reveals or manifests or reflects. Intellect owing to its transparent nature, that is Sattvic nature catches some light of the Consciousness and becomes intelligent. এই হচ্ছে বুদ্ধির তাৎপর্য। সেইজন্য বুদ্ধির মধ্যে দুটো ধর্ম পাওয়া যায়, একটা objective এবং আরেকটি subjective। ঈশ্বর কিন্তু all subjective, আর ব্রহ্ম-আত্মা হচ্ছে super subjective or transcendental। কথাগুলো খুব কঠিন নয়, কিন্তু শুনতে শুনতে clear হয়ে যাবে। তখন original বা bright shape নেবে (শুনতে শুনতে 'শ' 'স' হয়ে যাবে, 'শোনা' 'সোনা' হয়ে যাবে। সোনা হল original, bright, lustrous)। তার মানে it will attain the splendour of all lights। You are the light of all lights, this will reveal in you. There is no Self apart from you and no God apart from the Self. আত্মা অতিরিক্ত তুমি নও, আবার আত্মা অতিরিক্ত কোনও ঈশ্বরও নেই। ঈশ্বর-আত্মা একই তত্ত্ব। এরও উর্ধ্বে হল পরমাত্মা পরব্রহ্ম সনাতন, i.e. your supreme I, Absolute I, transcendental I—I without a second, অর্থাৎ secondless I। ঈশ্বরের মধ্যে দ্বৈতভাব আছে, কেননা তিনি স্রষ্টা। জীবের মধ্যে আছে বহুত্ব, দ্বৈত নয়, manyness and plurality। জীবের plurality, ঈশ্বরের দ্বৈত বা duality আর ব্রহ্ম-আত্মার হচ্ছে non-duality. All the divine glories remain latent in man.

মানুষের যে আমি সেই আমি সবসময়ই বাইরের জিনিসের উপর গুরুত্ব বেশি দেয়। মানুষের মধ্যে যারা একটুখানি বেশি সচেতন, অর্থাৎ যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যবশত চৈতন্যের জ্যোতি প্রকাশ পাচ্ছে তারা স্থূলকে বেশি গুরুত্ব না-দিয়ে সূক্ষ্মকে গুরুত্ব দেয়। আর

যারা আরও বেশি advanced তারা সূক্ষ্মকে ছেড়ে দিয়ে সূক্ষ্মতরের মধ্যে মনোনিবেশ করে, তারা শুধু ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে থাকে। যাঁরা মহাসাধক তাঁদের কাছে জগতের অন্য জিনিসের গুরুত্ব খুবই কম। আর যাঁরা আরও গভীরে চলে গিয়েছেন তাঁরা জগৎই খুঁজে পান না। একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ বলছেন, জগৎ কোথায়? আমি তো শুধু ব্রহ্মকেই দেখতে পাচ্ছি, আত্মাকে দেখতে পাচ্ছি! চৈতন্যকে দেখতে পাচ্ছি! চৈতন্যে গড়া, চৈতন্যে ভরা সবকিছু! আর অপরপক্ষ বলছে, কই ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম কোথাও নেই তো! আমি তো দেখছি রূপ-নামের খেলা! এখন এই তত্ত্ব বুঝতে গেলে নিশ্চয়ই এর বিজ্ঞান লোকের সামনে রাখতে হবে। সেই বিজ্ঞান কী রকম শোন—

সর্বসমবোধের স্বরূপ পরমাত্মা আপন
সর্ববোধের অধিষ্ঠান স্বানুভবদেব স্বয়ং।।
নাহি কোথাও জগৎ সংসার ব্রহ্ম আত্মা ভিন্ন
অনুভবসিদ্ধ জগৎ সংসার কেবল ব্রহ্ম আত্মাই পরম।।
ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্বে নাহি ভিন্ন কার্য-কারণ
কারণশূন্য হয় না কার্য তথা কার্যশূন্য কারণ।
কার্য-কারণ তত্ত্ব অভিন্ন ব্রহ্মই তার সারমর্ম
ব্রহ্মবক্ষে জগৎরূপে ব্রহ্মই আছেন স্বয়ং।।
ব্রহ্মবোধে জগৎ সত্য জগদ্বোধে তাহা আবৃত অজ্ঞান কারণ
ব্যাপ্য ব্যাপকতা মিথ্যা সর্ব ব্রহ্ম আত্মা সত্য অনুশাসন।
পরমতত্ত্ব হলে জ্ঞাত অজ্ঞানজাত ভেদজ্ঞানের হয় নিরসন
ব্রহ্ম-আত্মজ্ঞান অজ্ঞানমুক্ত অসিদ্ধ সেথা বিশেষ্য বিশেষণ।।

....

এই জগৎ সম্বন্ধে গবেষণা তো কম হয়নি, খুঁজে কী পাওয়া যায়? বিজ্ঞানীরা যদি গবেষণা করতে থাকে একটা matter-কে নিয়ে, তবে analysis করতে করতে একটা জায়গায় গিয়ে দেখবে কিছুই নেই, অব্যক্ত। That is the cause state. বুদ্ধি দিয়ে cause-এর উপরে যাওয়া যায় না। Buddhi is the product of primal cause, Buddhi is the effect and the secondary cause as well. Therefore effect cannot overcome the cause. কার্য-কারণ, কারণ-কার্য, কিন্তু কার্য-কারণতত্ত্ব যাঁর বক্ষে খেলে তিনি supreme। সেইজন্য বুদ্ধির নিজস্ব কোনও জ্যোতি নেই। বুদ্ধি পরমবোধিতে ডুবে যায় যখন, তখন বোধস্বরূপ স্বতঃস্ফূর্ত হয়। সমাধির গভীরে তা সাধিত হয়। সেখানে আপন ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই। 'স্বয়ং-এ স্বয়ং, পরমে পরম, আপনে আপন।' এই কথাটা বুদ্ধিমানরা মন দিয়ে বা বুদ্ধি দিয়ে সহজে appreciate করতে পারবে না। এই প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে তাদের এগিয়ে যেতে হবে। বই পড়ে বা book knowledge দিয়ে পারবে না। কেননা আত্মা কখনও পঠিত বিদ্যার বা অর্জিত বিদ্যার অধীন নয়, শ্রুত বিদ্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

সেইজন্য আত্মা বা ঈশ্বর প্রসঙ্গে তত্ত্ববিজ্ঞান শ্রবণই হল verbal testimony। এটাই হচ্ছে একমাত্র উপায়। কিন্তু তা শোনবার সৌভাগ্য ক'জন পায়? জগতে সব চাইতে দুর্লভ বস্তু কী? প্রথম হল মনুষ্য জনম। তার পরে দুর্লভ কী? একটা robust, strong male body। তার চাইতে superior কী? সেই male body যদি জ্ঞান চর্চায় রত হয় তা-ই superior। কিন্তু কোন জাতীয় জ্ঞান? বেদজ্ঞান। তার থেকে superior কে? যিনি বৈচিত্র্যের জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন, সৃষ্টির রহস্য কিছুটা জেনেছেন। A person who is conversed in vedic literature and scriptures, অর্থাৎ শুধু versed হলে হবে না। "ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা কবিত্বঞ্চ গদ্যং সুপদ্যং করোতি/গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং"।। অতএব গুরু কে? কেবল জ্ঞানমূর্তি। "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" তাহলে গুরু হচ্ছেন কেবল জ্ঞানমূর্তি। "ব্রহ্মানন্দং আত্মানন্দং সর্বানন্দং সচ্চিদানন্দং পরম সুখদং কেবল জ্ঞানমূর্তিম্ দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্ একং নিত্যং বিমলমচলম্ সর্বধীসাক্ষিভূতম্।" 'দ্বন্দ্বাতীতং', অর্থাৎ সেখানে দুই নেই বলে দ্বন্দ্ব নেই। 'গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।' অর্থাৎ বেদান্তবাক্য "তত্ত্বমস্যাদি"-র নিগূঢ়ার্থ হল তুমিই সেই ব্রহ্ম আত্মা সনাতন। আকাশের মতো স্বচ্ছ ব্যাপ্ত নির্মল স্বয়ংপ্রকাশ।

বেদান্তের পরমবাণী হল, "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তুমিই সেই, Thou art that (That Thou art)। That is the highest teaching of the *Vedanta* in and through which the perfect realizer enlightens His surrendered devotees. শরণাগত ভক্তকে তিনি "তত্ত্বমসি" বিদ্যা দিয়ে inspire করে বলেন, তুমিই সেই। তুমি যাঁকে জানতে চাইছ তা তুমি নিজেই স্বয়ং। আগে বলা হয়েছিল, এই সৃষ্টির কারণ কী? ব্রহ্মের কারণ কী? সুখ-দুঃখের কারণ কী? "তত্ত্বমসি"—তুমিই সেই কারণ। Thou art the cause of all causes, that is the highest discovery. When you become the cause of all effects you are not affected because cause is not affected by any effects or works. কারণে পৌঁছে গেলে কার্য আর তোমাকে কিছু করতে পারবে না। কারণস্বরূপে নিজেকে আবিষ্কার করতে হবে। তাই প্রত্যেককে বলা হয়েছে যে, দেখ নিজেকে তুমি কার্য ভেব না তাহলে কারণ করবে অন্যকে। তখন কিন্তু তুমি আর কোনও দিনই এগোতে পারবে না। নিজেকে কারণে নিয়ে যাও। I am the cause of all. You discover yourself. Recognize your cause, you are the cause of all, you are the cause of creations, you are the cause of destruction, you are the cause of all evils, you are the cause of all good—then who will touch you? It stands as One, unaffected, unrivalled.

এই কারণকে জানবার জন্য পাশ্চাত্য দেশ থেকে যে বিজ্ঞানীরা এসেছিল তারা বলেছিল যে, আমরা কারণকে জানতে চাইছি, কার্য তো অনেক কিছু করেছি। তোমাদের কাছে আমরা material science শিখতে আসিনি। তুমি আমাদের সাংখ্যের দর্শন, তন্ত্রের বিজ্ঞান, বেদান্তের বিজ্ঞান বল। We want to learn the essence of those sciences. তাহলে বিজ্ঞানী কী

খুঁজছে? বিজ্ঞানীর মধ্যে কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে সচেতনতা আসছে, তারা alert হচ্ছে। তাই তারা বিজ্ঞানের বিজ্ঞানকে সন্ধান করছে। ধর্ম শব্দের তত্ত্বগত অর্থ হল—the 'Science of Oneness' that which sustains all। ধর্ম মানে হচ্ছে যা সৃষ্টির আপামর সমস্তকিছুকে—ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম এবং বৃহৎ হতে বৃহত্তম পর্যন্ত সবকিছুকে ধারণ ক'রে রেখেছে। কে ধারণ ক'রে রেখেছে? Self-Knowledge। তা-ই হচ্ছে সুধর্ম, the 'supreme sustaining principle' which sustains all, irrespective of caste, creed, sects, sex, faith, distinctions etc. তাহলে দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্মের একটিমাত্র অর্থ i.e. Self-Knowledge। তাই বলা হয়েছে, you will hardly find one among the profounded sorts of scientific minds without a religious feeling of his own। The scientist is possessed by the sense of universal causation. By the sense of universal causation the scientist is always trying to discover the universal cause—the cause of the universe. The future to him is every wit as necessary as determined by the past. Past determines the present and future and present determines the future, that is why everything is necessary as determined by the past. His religious feelings take the form of a rapturous amazement at the harmony of natural laws which reveal an intelligence of such superiority, when compared to it all the systematic thinkings and actings of human life appear utterly as an insignificant reflection.

আজ মানুষের সমস্ত চিন্তার ধারাকে বিভীষিকার সামনে উপস্থিত করেছে আমাদের material science যা আমরা সবচাইতে বেশি দেখতে পাই। আমাদের progressive development-এর বড় জিনিস নিয়ে আমরা গর্ব করি। আধুনিক বিজ্ঞানে শিক্ষিত আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা বহুবার এসে 'একে' challenge করেছে। তারা বলেছে, এই তো আপনাদের God-কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল! তখন উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, very good, I appreciate you, but the sad thing is that you cannot appreciate Me। I have that courage to embrace you knowing fully that you are wrong. You are undeveloped, your brain is not matured, still I appreciate you because I am dwelling in you as your I, hence I cannot reject you, I know love, not the science of rejection. 'এর' কাছে Love-এর অর্থ অন্যরকম। Love—e-টা হচ্ছে বাইরে বা শেষে। বিপরীতক্রমে সাজালে হয় Evol। 'এ' এখান থেকে ভিতরের দিকে যাচ্ছে। Eternal virtue of Lord কী? তা হল Oneness। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা এই কথা শুনে অবাক হয়ে বলেছিল, তুমি সব নিয়ে কী খেলা খেলছ? উত্তরে 'এ' বলেছিল, this is the game of Oneness, game of life, 'The Sportful dramatic sameside game of Self-Consciousness'। Sameside game of Self-Consciousness is ছিন্নমস্তা মা। তিনি নিজের মুণ্ডু কেটে নিজেই রক্তপান করছেন। তিনি কাউকে মারছেনও না, নিজেও মরছেন না। This is the Science of Oneness. ভয় দিয়ে ভয়কে দূর করার জন্য মা

ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন। কেননা ভয়কে কী দিয়ে দূর করবেন? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন বিশ্বরূপ দেখার পরে সে ভয় পেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল, তুমি এই রূপ সংবরণ কর!

উপনিষদে ঋষিরা বলেছেন, ভয় মানেই অজ্ঞান, আর ভয় যে পায় সে অজ্ঞানী। এবার নিজেরা বুঝবার চেষ্টা কর যে, তোমরা কোথায় নিজেকে ফেলে রেখেছ! অজ্ঞানের মধ্যে ফেলে রেখেছ কেন? Why should you become ignorant? তুমি ভয় পাবে কাকে, when you are all? তুমিই নিজেই তা স্বয়ং। 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং।' তোমার দেহ জামাকাপড়ের মতো, এই দেহ যে কতবার পরেছ, কতবার যে ছিঁড়ে গিয়েছে, কতবার যে ফেলে দিয়েছ তার শেষ নেই। এখানে যদি 'এ' একশোটা মাটির ঘট রাখে তবে প্রত্যেকটি ঘটের মধ্যে কিন্তু একই আকাশ থাকবে। বাইরেও আকাশ আবার ঘটের ভিতরেও আকাশ। যদি ঘটগুলিকে ভাঙা হয় তবে আকাশ কি ভেঙে যাবে? তাহলে আমাদের দেহ নষ্ট হয়ে গেলে যখন আগুনে পুড়িয়ে ফেলে তখন কি আমাদের ভিতরের আমি পুড়ে যায়? আমি অহংদেব পাকা আমি। তার স্বরূপ 'আকাশবৎ স্বচ্ছ নির্গুণোঽহং নিষ্ক্রিয়োঽহং নির্বিকল্প নিরঞ্জন নির্বিকার নিরাকার নিত্যমুক্ত আত্মা নির্মল অহং আকাশবৎ সর্ববহিরন্তর্গতম্ অচ্যুত সর্ব উপাধি বিবর্জিতম্ নাম রূপাদি ভেদরহিতং সর্বভাবশূন্যং সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলম্।' 'এ' এই মন্ত্র সবার সামনে রাখছে। তুমি মৃত্যুর অধীন নও। তুমি দুঃখকষ্ট নিয়ে মাতামাতি করছ—এটা তোমার মনের একটা বিলাসিতা। You are not slave of your mind, you are the master of your mind. Rise up, get up and say I am not the slave of my mind. তোমরা দেহচর্চা করার জন্য জন্মাওনি। I am not born to suffer only trains of miseries. কিন্তু এই মূল সত্যটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে নেই। ধর্মজগতেও এই শিক্ষা কেউ দেয় না। গতানুগতিক ক্রিয়াকলাপ শিখে কী হবে আমাদের? Mechanical-ভাবে 'হরি ওঁ' উচ্চারণ করে কী হবে? হরি যদি একজন ব্যক্তি হয়ে থাকেন তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কতটা difference! ধর্ম যদি difference শিক্ষা দেয় তবে সেই ধর্ম কখনও কাউকে রক্ষা করতে পারে না।

একজন ধর্মগুরু একবার 'একে' বলেছিলেন, বাবা, তুমি দেখছি সব যেন একেবারে washed out করে ফেলেছ! উত্তরে তাঁকে বলা হয়েছিল, yes, I want the Oneness, I want the Self। আত্মাকে বিশ্বাস কর, অনাত্মাকে বিশ্বাস করো না। অনাত্মা হল manyness, diversities and plurality। তোমাকে তা arrest করে রেখে দিয়েছে বাইরের জগতে। Why should you remain like that? Come out of it, rise up. "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।" আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার কর, বোধ দিয়ে বোধকে তুলে ধর, পাকা আমি দিয়ে কাঁচা আমিকে তুলে ধর। একটা জায়গায় কাঁটা বিঁধলে আমরা আরেকটা কাঁটা দিয়ে সেই কাঁটাকে তুলে দু'টো কাঁটাই ফেলে দিই। জ্ঞান দিয়ে অজ্ঞানকে প্রকাশ করে জ্ঞান-অজ্ঞান দুটোই ফেলে দাও। মড়া পোড়ানোর সময় চিতার মধ্যে dead body-তে আগুন ধরিয়ে দেবার পর লাঠি দিয়ে খোঁচায় অনেক সময়, কেননা dead body কখনও কখনও বেঁকে ওঠে। মৃতদেহের মধ্যে বায়ু থাকে। তাপ পেলে তা বেঁকে ওঠে, আর লোকে তখন মনে

করে ভূত এসেছে। কী conception আমাদের। লাঠি দিয়ে dead body-কে ভাল ভাবে খোঁচানোর পর তা যখন আগুনে পুড়ে যায় তখন সেই লাঠিটাও শেষে আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়। এগুলো practical example। জীবনটা practical, সেখানে বসে অসাড় কতগুলি স্বপ্ন চিন্তা করলে আমাদের চলবে না। আমাদের দুঃখ-কষ্টগুলো বিলাসিতা, তা face করতে হবে। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কী বলেছিলেন? ওই বিষাদের মধ্যে থেকে শ্রীকৃষ্ণ তাকে টেনে তুলেছিলেন। তার জন্য আঠারোটা অধ্যায় তাঁকে বলতে হয়েছিল। কী বলেছিলেন? "শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ।। তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ঃ নরঃ।।" হে ভারত, এগুলোকে তুমি ignore কর, সহ্য করে ignore করে যাও। এগুলোকে গুরুত্ব দিও না। শীত-উষ্ণ বাইরের থেকে আসে, ভিতর থেকে তা জাগে না, ঠাণ্ডা বাইরের থেকেই অনুভব কর। তুমি এগুলোকে face কর, কিন্তু upset হয়ে যেও না, don't get upset। কারওর কাছে yield করবে না। মাথা যদি নত করতে হয় তবে সেই অখণ্ড পূর্ণ এক-এর কাছে মাথা নত কর। Surrender yourself to the Almighty, Who is the truth of all truths, Who is Self-abiding in all as I Absolute. Surrender your all concepts to your infinite Self-Knowledge. বোধসত্তার কাছে সমর্পণ কর তোমার মন-বুদ্ধিকে, then and then only you are saved।

জেনে রেখ, তোমার মনই দুঃখ-কষ্টের কারণ, মনই তোমার এই বন্ধনের কারণ আবার বন্ধন থেকে উদ্ধারের কারণও এই মনই। কোন মন? ঊর্ধ্ব মন, upper mind, the mind which is enlightened by the realizer। একজন realizer যেই mind-কে enlightened করে দিলেন তখনই সেই মন নিজে তো উদ্ধার পেলই, আবার অপরকেও সে উদ্ধার করতে পরিপূর্ণ ভাবে সক্ষম হল। তাই তোমাদের সামনে Knowledge of Oneness-এর প্রসঙ্গ 'এ' রাখছে, you get yourself enlightened and enlighten others with the same light। একটা প্রদীপ দিয়ে লক্ষ প্রদীপকে জ্বালানো যায়। প্রত্যেকটা প্রদীপের আলো কিন্তু সেই same one light। There is no difference in the light and heat of the candles. Similarly 'এ' supreme I দিয়ে সমস্ত I-কে enlightened করে দিয়ে বলছে, you are the same One light, same One I, you are the same One Self, same One God of all, you are the master of all, you are the soul of all, you are the truth of all, all means, all the diversities experienced through your senses and mind। Mind আর senses নিয়ে গেলে জগৎই থাকে না। সেইজন্য গানের মধ্যে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

বোধসত্তা আমির কোলে বোধের আভাস মন খেলে
মনের বিস্তার জীবজগৎ অজ্ঞান অনাত্মা তাকে বলে।।

....

(বাউল—কাহারবা)

বোধের স্বরূপ কিন্তু সবসময় homogeneous, মন কিন্তু heterogeneous। তুমি homogeneous nature-এ গড়া, তুমি কেন heterogeneous-কে serve করবে? জগৎ হল মনের বিকার, মনের ঘরে জগৎ ভাসে—'চিত্ত মূলে জগৎ ভাসে, জগৎ মূলে চিত্ত হাসে।' কী রকম? মনের যত বৃত্তি তত রূপ ও নাম। ঘুমের মধ্যে মনের বৃত্তি থাকে না—রূপ-নাম থাকে না, জগৎও থাকে না। কাজেই মন যখন ডুবে যায়, অর্থাৎ with the dissolution of the mind the universe dissolves or disappears। কিন্তু আত্মবোধে এ সমস্ত কথার প্রয়োজন থাকে না। তোমার মধ্যে তুমি তোমার আমি নিয়ে কিন্তু শৈশব থেকেই চলছ, দ্বিতীয় কাউকে কিন্তু তার মধ্যে তুমি ঢুকতে দিতে পার না। কারণ সেখানে জায়গা নেই, there is no seat for second entity। আসন তো সেখানে একটিই। হৃদয়ের গভীরে একমাত্র আমি-ই প্রবেশ করতে পারে, আর কেউ প্রবেশ করতে পারে না। সেই আমি-ই সেখানে নিত্য প্রবিষ্ট হয়েই আছে—সেই আমিই আত্মা। তাঁর থেকে প্রকাশ হয়েছে অন্তঃকরণ, অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত। আর মানুষ এগুলোরই সেবা করে চলেছে রাতদিন। তারপর দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। 'এ' যে কথাগুলো বলছে তা নিশ্চয়ই অনেকের মনই appreciate করতে পারবে না। 'এ' এখান থেকে সেই vibration টের পাচ্ছে। আবার অনেকে আগ্রহ নিয়ে ভাবছে, কী করে এগুলো সম্ভব হবে! আমি তো এতদিন এভাবে ভাবিনি! আরেকজন আবার ভাবছে যে, কথাগুলো শুনতে তো ভালই লাগছে, কিন্তু জীবনের মধ্যে তা প্রতিফলিত করব কী করে? আমার তো এত problem, এত সমস্যা। কিন্তু সব imagination! If you love God then you have to love your Self first. নিজেকে যে ভালবাসেনি সে ঈশ্বরকে কোনওদিনও ভালবাসতে পারবে না। সেইজন্যই বলা হয়েছে, 'ঈশ্বরের ভক্ত একমাত্র ঈশ্বর স্বয়ং, আত্মার ভক্ত আত্মা স্বয়ং।' অনাত্মা আত্মার ভক্ত হতে পারে না।

Mind cannot be the devotee of the Self, Self is the only devotee of Self. সেইজন্য উপনিষদে বলেছে, "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।" অর্থাৎ পতি যে পত্নীকে ভালবাসে, পত্নী যে পতিকে ভালবাসে তা দেহের জন্য নয়। যদি তা-ই হত তাহলে dead body-কে নিয়ে মানুষ মাতামাতি করত, খুব আদর করত। যেই প্রিয়জন dead body হয়ে গেল তখন একটু কান্নাকাটির পরে ভাবে, তাড়াতাড়ি কী করে তা বাড়ির থেকে বের করে দেওয়া যায়। তখন গাছের ডাল কাটছে, dead body-কে পোড়াতে হবে, লোককে ডাকছে, গোবর জল ছেটাচ্ছে যাতে অমঙ্গল না-হয়। প্রিয়জন যখন dead body হয়ে গেল তখন সে অশুদ্ধ হয়ে গেল। See the mental conception! কী নিয়ে বাস করছি আমরা! কিন্তু উভয়ের মধ্যে আত্মা আছে বলেই আত্মা আত্মাকে ভালবাসে। সেই ভালবাসা দেহের জন্য নয়, প্রাণের জন্য নয়, মনের জন্য নয়। পুত্রকে পিতা ভালবাসে পুত্র ও

পিতার মধ্যে আত্মা অভিন্ন বলে। যদিও তা পরিপূর্ণ ভাবে জ্ঞাত নয় সে, অজ্ঞাতসারেই একে অপরকে ভালবাসছে—এটাই আত্মার বিশেষত্ব। সে বিত্তকে ভালবাসছে বিত্তের মধ্যে আত্মা আছে বলে। "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ। বাচো সাক্ষী প্রাণবৃত্তেশ্চ সাক্ষী, বুদ্ধেসাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তেশ্চ সাক্ষী। চক্ষু শ্রোত্রাদি সর্ব ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ সাক্ষী। সাক্ষী নিত্য প্রত্যগাত্মা পুরুষোত্তমোহহম।।" এক আমি সমস্ত ভূতের মধ্যে বিরাজিত, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আমি অনুস্যূত হয়ে আছে। 'I' pervades all, 'I' sustains all as Consciousness, as I-Absolute.

অহংকারের মধ্যেও বোধময় আমি আছে, ত্বংকারের মধ্যেও বোধময় আমি আছে। মন-বুদ্ধি-চিত্ত-ইন্দ্রিয়াদি আপন আপন কার্য করছে যেহেতু তাদের মধ্যে বোধময় আমি আছে বলে। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" The entire nature performs her all activities with Me as the supervisor behind all, with the supervision of My existence—আমার অর্থাৎ বোধময় আমি-র অস্তিত্ব সেখানে আছে বলে, নতুবা কিছুই সম্ভব নয়। কাজেই সৃষ্টির কতগুলো দিক আছে। তার মধ্যে বিশেষ দুটো মতবাদ হল, 'সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ' এবং আরেকটা হল 'দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ'। 'সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদে' সৃষ্টির মধ্যে আমিময় বোধের দৃষ্টিকে বের করতে হবে। আমি কোথায় নিহিত আছি? আপন গুহায়। "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।" তোমার হৃদয়কে বাদ দিয়ে তুমি ইন্দ্রিয়ের পরিচর্যা করছ কেন? Why do you give so much importance to your senses which are mere instruments, servants or attendants? এর বেশি তাদের পরিচয় নেই। আর ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে যদি মন না থাকে তাহলে ইন্দ্রিয় useless হয়ে যাবে, কিছুই করতে পারবে না। তার সঙ্গে মন যুক্ত হলে তবেই তা কাজ করতে পারবে। মন ইন্দ্রিয়ের থেকে message-টা নিয়ে বুদ্ধির কাছে দেয়, বুদ্ধি তা নিয়ে পরমবোধির কাছে দেয় যেখান থেকে আবার বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে মন ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরে প্রকাশ পায়। ১ সেকেণ্ডের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে total function-টা হয়। তার ফলে আমরা শুনতে পারি, দেখতে পারি, বুঝতে পারি যে অনুভূতি খেলছে—function of Consciousness within। কিন্তু সমাধির গভীরে ইন্দ্রিয়াদি ও মন উভয়ের কাজই বন্ধ থাকে—সেখানে শুধু বোধে বোধে বোধময়। আত্মার চাইতে বড় বন্ধু আর কেউ নেই। "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।" কোন বন্ধু? যে বন্ধু তোমাকে সবসময় অদ্বৈতবোধে রক্ষা করে সেই বিবেক বন্ধু, গুরু বন্ধু, আত্মগুরু। আর যে তোমাকে দ্বৈত এবং বহুত্বের মধ্যে নিয়ে যায় সে যত প্রিয় আপনজনই হোক, সে তোমার শত্রু। এই প্রসঙ্গে একটি উদগীত গানে বলা আছে—

বন্ধু আমার সখা আমার আপন সে যে সবার আপন
সে যে সবার আত্মা স্বয়ং সচ্চিদানন্দ অনুপম।।
আপনবোধে খেলে বেড়ায় স্বয়ং সবার হৃদয় তাঁর আসন
আপন ছাড়া নয় কভু সে আপন ছাড়া হয় না আপন
বিশ্ব আত্মা বিশ্ববন্ধু বিশ্বপ্রাণ বিশ্বমন।।

আপনবোধের বিলাস জীবন দেশ কাল কার্য কারণ
আপনাতে আপন পূর্ণ স্বয়ং অ-ভেদাভেদে চিরন্তন।
প্রকাশ বিকাশ বন্ধু আত্মার স্বতঃসিদ্ধ সত্তাস্ফুরণ
বোধে বোধময় অদ্বয় অব্যয় সত্তা আপন সনাতন।।

(বাউল—কার্ফা)

আমার আত্মাই হচ্ছে আমার একমাত্র বন্ধু for all time। আমি ঘুমিয়ে থাকলেও তাঁ কিন্তু আমাকে পাহারা দিয়ে রাখছে, রক্ষা করছে। কোন বন্ধু এইভাবে তোমায় রক্ষা করবে? কোন প্রিয়জন করবে এমন? কাজেই আপন আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার জন্য শুধু কয়েকটা কথা তোমাদের সামনে রাখা হল। দিনের পর দিন এই বিজ্ঞান শুনলে তুমি আপনিই আপনবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এর জন্য তোমার সাধন করার কোনও প্রয়োজন নেই, আত্মা স্বয়ং নিজেই জেগে উঠবে। তার কারণ আত্মা সদা জাগ্রত। যাঁর ভিতর জাগবে সে ওই একটি candle দিয়ে লক্ষ candle-কে জ্বালিয়ে দেবে। 'এ' আত্মবোধ দিয়েই আত্মবোধকে জাগিয়ে দেবে। সব আত্মবোধে বা একবোধেই থাকবে, সব দেবদেবী ঈশ্বর আত্মবোধের মধ্যেই লয় হয়ে যাবে। আমিবোধসত্তায় আমিবোধের বিলাস নিরন্তর খেলে বেড়ায়। তাদের পরিচয় আমিবোধেই সিদ্ধ হয়। আমিবোধসত্তায় আমিবোধের অভাব সম্ভব নয় কখনও। গানের ভাষায়—

আমি পাই না খুঁজে কোনও দেবতারে আপন হৃদয় গভীরে
আপনারে ছেড়ে পাইনা কিছুই কোনও দেবতারে আপন হৃদয় গভীরে।।
বাহিরের যত নাম রূপ হেরি সবেতে আছি আমি চিরতরে
সবার মাঝে আছি আমি আমির মাঝে আছে সবে
সমবোধে এক করে হৃদয় গভীরে স্বানুভূতি সাগরে।

(আত্মতত্ত্ব)

তোমার প্রকাশ জগৎ, জগতের প্রকাশ তুমি নও। এই কথাগুলো শুনতে একটু অন্যরকম লাগবে। কিন্তু 'এ' বেকার কথা বা মন গড়া কথা বলছে না কারওর কাছে। লাগবে এ সুর তোমার মনের গভীরে, কিন্তু তখন 'এই রূপটা' হয়ত থাকবে না। 'এ' অতীতেও বহুবার এসে এই কথাই লোকের কাছে বলে গিয়েছে। সেই সুর ধরে অনেকে এগিয়ে গিয়েছে, আবার অনেকে পারেনি। পারতে হবেই সবাইকে, আপন ঘরে ফিরে যেতেই হবে সবাইকে। মৃত্যুর দাস হয়ে জন্মজন্মান্তর কে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি ভোগ করতে চায় বল? কিন্তু এত বোকা হয়ে গিয়েছে সবাই যে এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না।

যে-সকল ভেড়া পাহাড়ে চরে বেড়ায় তারা পাহাড়ি ঝরনার জল খেতে যায়। সেখানে আবার অন্য বন্য হিংস্র জন্তুজানোয়ারও জল খেতে যায়। একদিন একদল ভেড়া পাহাড়ি ঝরনার জল খেয়ে কাছাকাছি চরে বেড়াচ্ছিল। সেই সময় একটি সিংহী সেই ঝরনায় জল খেতে আসে। সেই সিংহীর গর্ভে বাচ্চা ছিল। দু-একদিনের মধ্যেই হয়ত বাচ্চা প্রসব করত,

এমন অবস্থায় সে সেখানে জল খেতে আসে। কাছাকাছি ভেড়ার দল চরে বেড়াচ্ছে দেখে সে স্বভাববশত খাবার লোভে লাফ দিয়ে একটি ভেড়াকে ধরতে গিয়ে পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি বাচ্চা প্রসব করে সিংহীটি মরে যায়। সিংহীর বাচ্চাটি ভেড়ার দলের সঙ্গে মিশে যায়। সিংহীর বাচ্চাটি ভেড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের মায়ের দুধ খেয়ে বড় হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে মাঠে ঘাস খেতে শেখে। এই ভাবে সে ভেড়ার দলেই বড় হতে লাগল। ভেড়াদের সমানই সিংহ শাবকটি বড় হয়ে উঠছে। একদিন পাহাড়ে চরে বেড়াবার সময় অন্য একটি সিংহ দূর থেকে ভেড়ার দলে এক সিংহ শাবককে ভেড়াদের সঙ্গে ঘাস খেতে দেখে অবাক হয়ে ভাবল, আমাদের যারা খাদ্য তাদের দলে আমাদের জাতের একটি সিংহ কী করে মিশে গিয়েছে এবং ঘাস খাচ্ছে! তাকে যেভাবেই হোক আমাদের দলে নিয়ে আসতে হবে। সিংহটি তাকে তাকে থাকে ও সুযোগ খোঁজে, কিন্তু ভেড়ার দল তা বুঝতে পেরে পালিয়ে যায়, সেই সঙ্গে সিংহ শাবকটিও দৌড়ে পালিয়ে যায়। ব্রহ্মের প্রকাশ জীব বা মানুষ এখন ভীতু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সিংহের একমাত্র লক্ষ্য হল সিংহ শাবককে উদ্ধার করা। যতবারই চেষ্টা করে সে ভেড়ার দলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। ভেড়া সাধারণত খুব ভীতু প্রাণী, দল বেঁধে থাকে ও চলে। ওদের নিয়ম হচ্ছে দলের প্রথমে যে যেদিকে যায়, অন্যরাও সেদিকে ছোটে। সেইজন্য বলা হয়, গড্ডলিকা স্রোতের মতো ভেড়ার দল দলের প্রথমভাগে যে চলে তাকে অনুসরণ করে চলে। কয়েকদিন চেষ্টা করার পর সেই সিংহ একদিন সিংহ শাবকটিকে ধরে ঝরনার পারে নিয়ে আসে। সিংহ শাবকটি ভয়ে জড়সড় হয়ে কাঁপতে থাকে। যেমন তত্ত্বকথা বা ঈশ্বরব্রহ্ম কথা শুনলে majority of people ভয়ে পালায়। তারা বলে, তাড়াতাড়ি চল, convert করে ফেলবে! আবার অনেকে বলে, আমার সংসার আছে, অনেক দায়িত্ব আছে, কাজেই এখন ওসব সম্ভব নয়! বৃদ্ধ হয়ে গেলে তখন না-হয় মালা জপা যাবে। এখন আমরা মজা লুটি—eat, drink and be merry!

সিংহটি গর্জন করে (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সিংহের মতো গর্জন করলেন) সেই সিংহ শাবককে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, সে সিংহ, ভেড়া নয়। এরকম ভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর সিংহ শাবকটি তার সত্য পরিচয় জানতে পারে। তখন সিংহ সেই সিংহ শাবককে হাড্ডিসহ কাঁচা মাংস খেতে দেয়, কিন্তু অনভ্যাসে সে তা খেতে পারছিল না। সে অনায়াসে ঘাস খায়। সিংহ সেই সিংহ শাবককে ধরে জঙ্গলে নিয়ে যায়। অন্যান্য সিংহ শাবকদের সঙ্গে কয়েকদিন থেকে সে ধীরে ধীরে কাঁচা মাংস খেতে শেখে এবং বড় সিংহদের মতো হুংকার দিতে শেখে। তখন সে আর ঘাস খায় না, অন্য জন্তু মেরে খেতে শিখেছে। সে তখন তার স্বধর্ম ফিরে পেয়েছে। এতকাল সে ভেড়ার দলে থেকে ভেড়ার ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন ভেড়ার ধর্ম ভুলে সে নিজ ধর্মে ফিরে এল। সিংহটি তাকে উদ্ধার করল ও তার স্বধর্মে ফিরিয়ে আনল। This is the function of a true realizer. তাঁর সঙ্গ করলে তোমার ভিতরের অজ্ঞান, সংস্কার, ভয়, ভ্রান্তি, ভেদজ্ঞান দূর হয়ে যাবে। তোমরা যেই অদ্বৈততত্ত্ব একটুখানি আস্বাদন করবে তাতেই ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং দ্বৈতবাদের পূর্ণ অবসান হবে।

'এ' তোমাদের সামনে মতবাদ ও দ্বৈতবাদের কথা বলছে না, তোমাদের নিজস্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করবার জন্য যা দরকার তা-ই শুধু বলে যাচ্ছে। দরকার হলে 'এ' লক্ষবার দেহ নিয়ে আসবে পৃথিবীতে। This is My Dharma, the Science of Oneness। 'এ' তোমাদের দেবদেবীতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, তার বিরুদ্ধে কিছু বলছেও না, সবই তো আমিবোধসত্তায় আমি-রই প্রকাশ। কাজেই আমি কী করে সেগুলোকে অস্বীকার করব? কিন্তু এই আমিতে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত গুরু শিষ্যকে আগলে রাখেন। পিতা-মাতা যেমন সন্তানকে চায় well established দেখতে, গুরুও সেইরকম চান শিষ্যকে তাঁর গদীতে বসাতে, আর আত্মজ্ঞপুরুষ চান আত্মজ্ঞানে সকলে প্রতিষ্ঠিত হোক, সবাই আত্মার জয়গান করুক। আত্মজ্ঞানী কারওর কাছ থেকে দক্ষিণা নেন না। তিনি বলেন, আমায় তুমি কী দক্ষিণা দেবে? তুমি যতদিন দেহে থাকবে ততদিন শুধু আত্মার জয়গান গেয়ে যাবে। তা-ই আমার যথার্থ দক্ষিণা হবে। এইরকম প্রেমের মানুষ আর পাওয়া যাবে না! তিনি চান না কিছু তোমার কাছে, শুধু বলেন, তুমি একবার হরি বল! কী প্রেম! কলসির কানা দিয়ে নিতাইকে পাষণ্ড জগাই-মাধাই মেরেছিল। কিন্তু তিনি তাদের বলেছিলেন, মেরেছ ঠিক আছে, শুধু একবার তোমরা হরি বল! আরেকবার মারো, কিন্তু একবার হরি বল! What is the significance? একটা life দিয়ে demonstrate করে গেলেন। আর আমরা so-called education নিয়ে মাতমাতি করে ঘুরে বেড়াই। Christ-কে crucifix করল, কিন্তু কই তিনি তো তাদের অভিশাপ দিলেন না, বরং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন যাতে তাদের তিনি ক্ষমা করেন। তাদের শাস্তি দেবার জন্য একবারও ঈশ্বরকে বললেন না। তিনি বলেছিলেন "Oh! father, thou art the embodiment of forgiveness. All your children don't know what they are doing. Please forget and forgive them, pardon them'" কী অপূর্ব কথা!

ওইরকম অবস্থায় এমন প্রার্থনা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছিল—জীবন্ত একটা মানুষকে crucifix করা হয়েছে, কাঠের মধ্যে কাঠের frame-এ হাতের মধ্যে পেরেক দিয়ে পুঁতছে, পা দুটোকে একত্র করে পেরেক পুঁতে দিয়েছে, রক্ত ঝরছে, কিন্তু তিনি তখনও একই কথা বলছেন। This is the perfection, this is the realization, this is the glory of Godhead Absolute. প্রত্যেকের ভিতরে এই Godhead আছে, let that Godhead rise up, reveal and make your life blessed, all blissful, all peaceful and all truthful —সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও। আজকের গানটার মধ্যে তাই বলা হয়েছে, 'সত্যম্ সত্যম্ সত্যমেতি সত্য সাধনম্। জ্ঞানম্ জ্ঞানম্ জ্ঞানমেতি জ্ঞান সাধনম্। আনন্দম্ আনন্দম্ আনন্দমেতি আনন্দ সাধনম্।' কী অপূর্ব! আনন্দে গড়া জীবন সবার। ভুলে যেও না যে, তুমি দুঃখের অধীন নও, দুঃখ তোমার imaginary concept। জগতে যা-কিছু ঘটনা ঘটছে সব কিছুই mental, imaginary, all these are only apparent nature। সমুদ্রের উপরিভাগে জল এইরকম তরঙ্গায়িত হচ্ছে, রূপায়িত হচ্ছে, but this is not the true nature of the ocean। তার নিচে গেলে দেখবে সব শান্ত, স্থির, অখণ্ড, অচঞ্চল, homogeneous, only outwardly

you are heterogeneous। কিন্তু মন এই heterogeneous nature-এর সঙ্গে দীর্ঘকাল থেকে ওই সিংহ শাবকের মতো আপনস্বরূপ ভুলে গিয়েছে। তাকে টেনে নিয়ে আসতে হবে।

তোমার পূর্ণতার স্মৃতি যদি জাগে তখন সর্ব দ্বৈতভাব হতে মুক্ত হবে। তখন তুমি বুঝতে পারবে যে, তুমি কে, কে তোমার, কাদের নিয়ে তুমি ঘর করছ! ঘুমের মধ্যে তো কেউ থাকে না, জেগে উঠলেই আরম্ভ হয়ে যায় শাসন, তা না-হলে কথা শোনা, তার পরে কান্নাকাটি করা, আড়ালে গিয়ে একটু চোখ মোছা, আয়নার সামনে গিয়ে দুঃখ করা, ঠাকুরের ছবির মূর্তির কাছে গিয়ে বলা, ঠাকুর তুমি আর কত কষ্ট দেবে? কতদিন আর রাখবে? এইবার শরীরটা নিয়ে চল। All these are imagination! অনেকেই এই কথা শুনে বলতে পারে যে, তুমি তো একটা dry hearted man, তোমার মায়া, মমতা নেই, feelings নেই! উত্তরে তাদের বলা যেতে পারে, ঠিকই বলেছ, 'এর' এক আছে। সেই আনন্দ কখনও হারায় না। তোমাদের তো আনন্দ হারিয়ে গিয়েছে। এবার কী করবে? আনন্দ চাই, না চাই না? তোমাদের তো মৃত্যুভয় আছে। 'এ' তো অমৃতস্বরূপ, কাকে ভয় করবে 'এ'? মৃত্যু তো 'একে' স্পর্শ করতে পারে না, 'এর' মৃত্যুরও মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। Death has become dead by the Knowledge of Oneness. Therefore duality has disappeared. Imagination cannot work there. 'এর' কথার মধ্যে কিন্তু কোনও জায়গায় 'এ' কোনও flaw রাখছে না, তবে হ্যাঁ এই কথার series চলতে থাকবে, আবার সময় সুযোগ পেলে তোমাদের সামনে এই প্রসঙ্গ বলা হবে। আবার তোমাদের মনের মধ্যে 'এ' আত্মবোধের candle জ্বালিয়ে দেবে, candle নিভে যাচ্ছে ঠিকই, আবার জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। যে candle জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরের দিন আবার তা নিভে যাচ্ছে। কিন্তু আবার 'এ' তা জ্বালিয়ে দেবে, শেষ পর্যন্ত eternal light জ্বলবে। তখন তুমি ভাববে, আরে এতদিন খালি স্বপ্ন দেখেছিলাম। সত্যিই তো, এতদিন তাহলে কী করলাম? যখন চৈতন্যদেবকে কোনও একজন বলেছিল যে, তুমি হরি হরি করে কাঁদছ, কিন্তু হরি তো তোমার জন্য কাঁদেননি! তিনি উত্তরে তাকে বলেছিলেন, কে বলেছে এই কথা? হরি এত কাঁদা কেঁদেছেন যে আমি তার এক বিন্দুও কাঁদতে পারছি না। আহা কী সুন্দর কথা। আমি তো তাঁর মতোই কাঁদতে চাইছি। বিষ্ণুপ্রিয়াও এই কথা বলেছিলেন—আমার চোখের জল যে সব শুকিয়ে গেল সখী! রাধাও ঠিক একই কথা বলেছিলেন বৃন্দাকে যে, আর কাঁদতে পারছি না, কান্না যে আসছে না! কোথায় গেল আমার চোখের জল? আমি যে গোবিন্দ গোবিন্দ করে আর কাঁদতে পারছি না! তোমরা ভুল করো না।

ভাগবত তোমরা যে শোন সেটা একটা পর্ব, একটা অঙ্গ। তার পরেরটা কিন্তু তোমরা শোন না। Apparent nature-এর বিষয়ে তোমরা exoteric-টা শোন, কিন্তু esoteric-টা শোন না। ভাগবত হল Science of Oneness। প্রাণের ধারা কেন্দ্র থেকে বাইরে বৈচিত্র্যময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে—তা-ই হল 'ধারা' শব্দের তাৎপর্য। সেই ধারা যখন উল্টো হয়ে কেন্দ্রের দিকে, একবোধ বা সমবোধের দিকে যায় তখন তা-ই হল রাধা। তখন সে শুধু কেন্দ্রের দিকেই ছুটছে, আর কোনও কথা শুনছে না। বর্ষায় যখন প্লাবন হয় তখন জলে চারদিক

ভেসে যায়, কোনও বাধা মানে না। তা তোমরা অনেকেই হয়ত দেখেছ। কী দারুণ ব্যাপার! Flood হলে বাইরে যত জমির আল আছে সব একাকার করে দেয়। তখন কোনটা কার জমি তা বোঝবার উপায় থাকে না, মাপবারও উপায় থাকে না। এইরকম যাঁর হৃদয়ে flood of Consciousness হয়েছে তাঁর মধ্যে distinction কোত্থেকে থাকবে? How can distinction be proved? তাঁর সামনে সারা পৃথিবীর মানুষ একত্র করে নিয়ে এলেও তিনি বলবেন, I am whatever I am in Reality and not what you think of and should remain the same as It is for all time. Space, time, causation—all these are expressions of My own Self, My own Consciousness. I am not subject to them. They are My expressions, they are in Me, of Me, from Me, for Me, by Me, with Me, to Me and they are not beyond Me.

তোমার সুখ-দুঃখ তোমাকে কেন্দ্র করে, তুমি সুখ-দুঃখের অধীন নও—সুখ-দুঃখ গুণের খেলা, মন তার কর্তা-ভোক্তা, আমি তার সাক্ষী মাত্র। যদি সুখ-দুঃখকে তুমি অতিক্রম করতে না-পার তাহলে তোমার শিক্ষা-দীক্ষা যা-কিছু আছে all are futile, কোনও মূল্য নেই সে সবের। কেন তুমি পারবে না? শিশুরা অনেক সময় বলে, আমি পারছি না, আমি করব না অঙ্ক, আমি পড়ব না। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আস্তে আস্তে তৈরি করা হচ্ছে, কালে দেখা গেল he is a master mathematician। প্রত্যেকের ভিতরেই সেই অমর আত্মা বিদ্যমান। তোমার birth right রয়েছে Self-Knowledge লাভ করার জন্য। Why should you miss that opportunity? Why should you lose it? Why should you forget it? কেন? কার কথায়? আজকে সমাজ বা society নিয়ে আমরা মাতামাতি করি। সমাজ বা society কোথায়? যখন মানুষ অন্নকষ্টে মারা যায়, কই society এগিয়ে এসে তো কিছু করে না! বেঁচে থাকার জন্য তাদের উপর tax বসায় soceity! কীসের society? 'এ' সেই society-র স্বপ্ন দেখে যেখানে tax নেই, অর্থাৎ tax-free society, no tax at all। কে কার উপর tax বসাবে? কেনই বা tax বসাবে? প্রকৃতির দেওয়া দান, কাজেই প্রত্যেকেরই right আছে। Government তৈরি হচ্ছে, মানুষের থেকে tax নিচ্ছে, what nonsense! মানুষকে সূর্যের তাপ, বাতাস, জল প্রকৃতির দান গ্রহণ করতে দেবে না, তার জন্য tax দিতে হবে। এই কী সভ্যতা? এটা শিক্ষা নয়। কিন্তু 'এ' অজ্ঞানীদের মতো rebel করেনি, 'এ' rebel করেছে নিজের ভিতরে। নিজের মন-বুদ্ধির সঙ্গে rebel করে সেগুলোকে দাবিয়ে 'এ' নিজস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়েছে। 'এ' তোমাদের সামনে শুধু সেই কথাই রাখবার চেষ্টা করছে। যখন সময়সুযোগ পাওয়া যায়, যেখানে 'এ' যায় 'এর' এই শুধু একমাত্র বক্তব্য, অন্য কিছু নয়।

'এ' কারওকে দীক্ষা দেয় না। দীক্ষা বলে যদি কোনও science থাকে তবে 'এ' যা বলে যাচ্ছে that is the supreme Diksha। তোমার Oneness of Knowledge, Knowledge of Oneness, the Science of Oneness, the Knowledge of Knowledge, তা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, monopoly নয়। কেউ যদি মনে করে যে, সবার উপরে কর্তৃত্ব করব, গুরুগিরি করব, সবাইকে exploit করব—তা কখনও সম্ভব নয়। 'এ' সেই

শুরু নয়। 'এ' আপনবোধের ধর্মকে গেয়ে বেড়ায়। দেখা যাক আপনবোধ জাগে কী জাগে না। হয়ত তার জন্য সময় লাগবে। কলিযুগ এসে গিয়েছে। মানুষ degraded হয়ে গিয়েছে, সে সত্যের থেকে বেরিয়ে এসেছে। 'এ' এই কলিযুগ থেকে সত্যযুগে নিয়ে যাবে মানুষকে। কী করে? By the Knowledge of Oneness which does not depend on any secondary knowledge. Any secondhand knowledge, book knowledge is not real Knowledge. যদি book knowledge-এর বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে হয় তবে আপন হৃদয়ের গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।

সর্ববিদ্যার কেন্দ্র যেখানে তা হল হৃদয়। হৃদয় দিয়েই হৃদয়কে 'এ' জাগাবে। হারানো ধন ফিরিয়ে দেয় যে তা-ই হল হৃদয়, অর্থাৎ Knowledge of Oneness gives you the light of Oneness, আর কোনও জ্ঞান দিতে পারবে না, তা সম্ভবও নয়। এই বিজ্ঞানজগৎ ধ্বংস হতে বাধ্য। The present day science—তা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের ঋষিরা অনেক গবেষণা করেছিলেন। The love for power never says enough, until and unless it turns to destruction. শক্তি দিয়ে কখনও তুমি পূর্ণতায় পৌঁছোতে পারবে না, কারণ শক্তির মধ্যে শুধু variation আছে। Oneness-এ আসতে হলে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। 'এ' simply কথাগুলো বলে যাচ্ছে। Don't forget that this is the science of all other sciences. This is the Knowledge of Knowledge, not knowledge of persons, things, actions, results, space, time, causation. দেশ-কাল, কার্য-কারণ, ব্যক্তি-কর্ম-কর্মফল এগুলো প্রকৃত জ্ঞান নয়। এগুলো secondhand knowledge, limited knowledge । আর 'এ' যা বলছে তা হল জ্ঞানের জ্ঞান, that which transcends all। তোমার অমর আত্মাকে তুমি ভুলে বসে আছ, আর মৃত্যুর অধীন হয়ে দুঃখকষ্ট ভোগ করছ। Why? এদিকে M.A., PRS, Ph.D. পাশ করে বসে আছ, কিন্তু বন্ধনদশা ভোগ করছ কেন? কী হবে এই জ্ঞান দিয়ে? যার কাছে যাচ্ছ তাকে তোষামোদ করছ, আরেকজনের কাছে গিয়ে বলছ, ভাই এ কাজটা আমার করে দে না। এ আমি পারছি না। কিন্তু এমন করবে কেন? Why? You are the king of all other kings, because Self is the only Reality which is of homogeneous nature or character and which transcends all. All else are different reflections of the one and the same Self Itself. You are verily that Self, you are not the reflection. You are neither physical body nor you have a physical body, you are neither senses nor you have senses, you are neither mind nor you have a mind, you are neither ego nor you have an ego, you are neither intellect nor you have an intellect, you are neither *Jiva* nor you have *Jivatvam*. You are the essence of all, the revealer of all, the illuminator of all; all are illumined by your own light.

"যস্য সন্নিধি মাত্রেন জ্ঞানং সম্পদ্যতে তদা"— যাঁর সান্নিধ্যে আসামাত্র জ্ঞান জেগে ওঠে। তিনি কে? তিনি জ্ঞানস্বরূপ, "যস্য বোধোদয়েতাবৎ স্বপ্নবৎ ভবতি ভ্রমঃ"—অর্থাৎ

যেই বোধ জেগে উঠলে সবই স্বপ্নবৎ বা মিথ্যা বলে অনুভূত হয়, তা-ই হচ্ছে জ্ঞানের জ্ঞান। সেইজন্য বলা হয়েছে, 'ব্রহ্মবোধে জগৎ সত্য জগদ্বোধে ব্রহ্ম আবৃত অজ্ঞান কারণ'। তুমি নিজেকে অজ্ঞানের অধীন মনে করবে কেন? নিজেকে প্রশ্ন কর। তুমি এগুলো সরিয়ে দিলে কী দেখবে? গুণের উপাধি ভেদ সৃষ্টি করে। যত ভেদ দেখছ সবই উপাধিগত। উপাধি সরে গেলে কিন্তু ভেদ নেই, গাঢ় ঘুমের মধ্যে আমাদের মন বৃত্তিশূন্য হয়ে যায়। তখন 'ভেদাতীতং দ্বন্দ্বাতীতং ভাবাতীতং গুণাতীতং নিত্যম্ একবোধে প্রতিষ্ঠিতম্'। সেইজন্য নিদ্রাকেও এক প্রকার সমাধি বলা হয়েছে। সেখানে বীজ থাকে বলে আবার নেমে আসতে হয়, কিন্তু সমাধির গভীরে অর্থাৎ সুষুপ্তির উর্ধ্বে মনের বীজটি নাশ হয়ে যায়। কীসের দ্বারা? By the light and heat of the Knowledge. তার কারণ সুষুপ্তি হল অজ্ঞানের স্তর, সমষ্টি অজ্ঞানের স্তর। সেইজন্য আমরা ঘুম থেকে উঠে বলি, ওঃ খুব ভাল ঘুম হয়েছে! কিছুই জানতে পারিনি!—it is not knowing state, কিন্তু blissful state।

আজকে আনন্দ দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে, আনন্দ ছাড়া কোনও স্তরও নেই। কিন্তু তার মধ্যে অজ্ঞানের প্রভাব আসতে পারে, যেমন আজকে কুয়াশাতে সূর্যের আলো আবৃত হয়েছিল, সেইরকম অজ্ঞান এসে আনন্দকে ঢেকে দিতে পারে, তখন নিরানন্দের খেলা চলবে। কিন্তু that is not Reality, it is appearance, তা হল পরিদৃশ্যমান। কিন্তু তুমি তো দ্রষ্টাও নও, কেননা তোমার আসল স্বরূপে নাহি কর্তা, নাহি ভোক্তা, নাহি জ্ঞেয়-জ্ঞাতা। তাহলে কী আছে? সেখানে স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানানন্দধারা অবিরাম বয়ে চলেছে। তাই একটি গানে প্রকাশ পেয়েছিল—

কোথায় এক কোথায় বহু খুঁজে না পাই,
আপন আনন্দে আপনার মাঝে সদা ঘুরে বেড়াই।।
নাহি মোর আপন পর, নাহি ভেদাভেদ জীব ঈশ্বর
অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দসাগর আদি অন্ত নাই।।
কোথা আমি কোথা তুমি স্বপ্নবিলাস মাত্র,
আমি আমার তুমি তোমার কল্পনা মনের দিবারাত্র।
নাহি রূপ নাহি নাম নাহি ভাব নাহি বৈচিত্র্যের জ্ঞান
আছে শুধু স্বানুভূতি মাত্র পুরুষোত্তম শান্তিনিধান।
সত্যস্বরূপ অদ্বয় আমিতে দ্বৈত এসব কিছু নাই।।
নাহি বক্তা বাচ্য বাচন নাহি শ্রোতা শ্রুতি শ্রবণ
স্বসংবেদ্য স্বানুভূতি চিদানন্দধারা বইছে সদাই।।

(কেদারা—দাদরা)

তোমরা অনাত্মা না আত্মা? তোমরা আনন্দশূন্য বা চৈতন্যশূন্য কি? ক্ষমতা আছে কারও উত্তর দেওয়ার? পারবে না। কতগুলো গতানুগতিক অভ্যাস নিয়েই তোমরা চলছ।

কিন্তু এই অভ্যাসগুলো ভেসে যাবে চিদানন্দধারায়। ভুলে যেও না, ঈশ্বর একটা limited idea নয়, আত্মা কোনও মানসিক বা কল্পিত কল্পনা নয়। যদি বাস্তব কিছু থেকে থাকে, that is the Knowledge of Knowledge, কেননা সেই দেশেই সবাই বাস করছে। কোথায়? জ্ঞানসাগরে। 'বাস তব যস্মিন্ দেশে তদেব বাস্তবম্'। তুমি বাসুদেবস্বরূপ, কেননা তুমি তোমার নিজের মধ্যেই নিজে বাস করছ। তুমি কি নিজ অতিরিক্ত কিছুর মধ্যে বাস করছ? কার মধ্যে তোমার আমি আছে? তোমার মধ্যেই তোমার আমি আছে। আমিশূন্য হয় না আমি।

আজকে কথা বলতে বলতে আরেকটা chapter এসে যাচ্ছিল, তা বলতে আরম্ভ করলে থামা মুশকিল হবে। তোমাদের যদি খিদে পায় তাহলে তোমরা আবার খাবার খেতে চাইবে। তখন ভগবান পিতা, ভগবান মাতা তোমাদের খাবার দেবেন। কী খাবার দেবেন? অমৃতত্ব বা চিদানন্দধারা, অন্য কিছু নয়। 'এ' তোমাদের গতানুগতিক ধর্মের প্রসঙ্গে কিছুই বলেনি। অনেকেই অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছে যদি একটুখানি হরিকথা শোনা যায়, যদি একটু রামের কথা, শিবের কথা, গুরুর কথা, মায়ের কথা শোনা যায়। এগুলির সারাৎসার কথাটিই তোমাদের সামনে বলা হল, যার মধ্যে সবাই আছে। আত্মাশূন্য রামও নেই, মাও নেই, শিবও নেই, হরিও নেই, গুরুও নেই, কেউই নেই। তাহলে আত্মার কথাই সবাইকে শোনাই। সবাই পেয়ে যাবে আপনকে, আপন ছাড়া তো দ্বিতীয় কেউ নেই। এই কথাটি গানের মধ্যে তোমরা আজ শুনলে—'আপন ভিন্ন আপন হয় না, আপন ছাড়া আপন হয় না। আপনতাই আপন ধর্ম'। আপন ধর্ম হল the Science of Oneness, which is of homogeneous nature and not heterogeneous। এই কথাগুলির মর্মার্থ নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে খেলবে, আর তার ফল তোমরা নিশ্চয়ই পাবে, কেননা যে আমি তোমাদের সামনে এই কথাগুলো প্রকাশ করছে সেই আমিই তোমাদের মধ্যে অনাদিকাল যাবৎ রয়েছে। যেদিন থেকে তোমরা পৃথক আমি নিয়ে খেলছ সেদিন থেকেই ওই আমিরই একটা অংশ নিয়ে তোমরা খেলছ। You are not beyond that I. That Real I exists in each and every individual I. এই আমিতত্ত্ব প্রত্যেকের কাছেই সব চাইতে প্রিয় এবং আপনবস্তু, প্রিয়তমোত্তম—শুধু প্রিয়তম নয়, প্রিয়তমোত্তম। তাহলে আজকে এখানেই সচ্চিদানন্দ করা হল।

মন্তব্য ঃ

ত্রয়োদশ বিচারের বিষয়বস্তু—নিজবোধের বক্ষে নিজবোধের যে বিলাস হয় তার একদিক হল কেবল সত্তাময় আমিবোধ এবং অপরদিকে হল শক্তিময় আমারবোধ। উভয়ের মিলন অভিব্যক্তি হল জীবন। প্রতি জীবনের মধ্যেই শক্তির স্বভাব অনুসারে বৈচিত্র্যমুখী প্রবণতার আধিক্যই অধিকমাত্রায় দৃষ্ট হয়। তা সম্ভব হয় অখণ্ড পূর্ণ বোধময় আমিসত্তার নিত্য অস্তিত্ব ও বর্তমানতার ফলে। সত্তার আমি নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত নিত্যপূর্ণ নিত্যনির্বিকার। তার কোনও বিকল্প বা উপস্থিতির অভাব কখনওই সম্ভব নয়, ভূমা আমিবোধে তা নিত্যসিদ্ধ নিত্য সত্যবোধের উপাদান। স্ববোধ বা আপনবোধে তা স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপ্রকাশমান। কিন্তু শক্তির দিক থেকে আমারবোধে তা স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপ্রকাশমান। কিন্তু শক্তির দিক থেকে আমারবোধে

যা-কিছু প্রকাশ পায় আমি-র বক্ষে তা হল স্ববোধসত্তার স্বভাবের পরিচয়। এই স্বভাব স্ববোধসত্তার প্রতিভাস বা প্রতিফলন। প্রতিভাসের ধর্ম স্ববোধবক্ষে বৈচিত্র্যবিলাস প্রকাশ করে। স্ববোধবক্ষে তা-ই হল স্বভাবের লীলাবিলাস, অর্থাৎ স্ববোধাত্মার বক্ষে তার স্বভাবশক্তির অভিনব ইন্দ্রজালবৎ স্বপ্নবিলাস। তার পরিণামই হল অদ্বয় বোধসত্তা আত্মার আমি-র বক্ষে দ্বৈত স্বভাবশক্তির চিত্তাকর্ষক ভ্রান্তিমূলক যাদুখেলার কলাকৌশল। এসবই আত্মার বক্ষে অনাত্মার ক্রিয়াচাতুরি। তা দেশ-কাল, কার্য-কারণ সাপেক্ষ রূপ-নাম-ভাবের সমন্বয়ে চিদাভাসের বা জ্ঞানাভাসের বৈচিত্র্যময় প্রকাশবিভূতি। গুণ-ভাবযোগে প্রতি প্রকাশের সঙ্গে প্রতি প্রকাশের ভেদ বা পার্থক্য সৃষ্ট হয় কল্পনার মাধ্যমে।

অনাত্মার কল্পনাবিলাস আত্মার বক্ষে নিরন্তর অভিব্যক্ত হয় বলে ভ্রান্তিবশত সেগুলোকে আত্মারই প্রকাশ বলে জীব মনে করে। আত্মা-অনাত্মার ভেদ জীব বুঝতে পারে না। আত্মস্মৃতি বিস্মৃত হয়ে অনাত্মার স্মৃতি নিয়ে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে স্বভাবের সংস্কার অনুসারে মিশ্রবোধের প্রভাবে ভেদজ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞানের অনুভূতিকেই সে সত্য মনে করে নিজ বুদ্ধিদোষে। স্ববোধের আমি-র অনুগ্রহ ব্যতীত স্বভাবের আমি বা জীবের আমি তার সত্য পরিচয় জানতে পারে না। ভ্রান্তিবশত মিথ্যাবোধের মধ্যেই তার জন্ম, কর্ম, ধর্ম, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতি সাধিত হয়। এই মিশ্রবোধের প্রভাব মুক্ত হতে গেলে তাকে অদ্বয় অবিমিশ্র শুদ্ধ পাকা আমিবোধের শরণাগত হয়ে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর অনুগ্রহে স্ববোধ বা আপনবোধের বিজ্ঞান শুনবার সুযোগ পায় সে। তা শুনে জীবনে তা অনুশীলন করার অভ্যাস আরম্ভ হয়। তার ফলে তার স্বকল্পিত দ্বৈত স্বভাববোধের প্রভাব কেটে যায়, অদ্বয় আপনবোধে প্রতিষ্ঠা হয়, তার স্ববোধের আমি বা আত্মার আমি জেগে ওঠে। সে আপন সচ্চিদানন্দস্বরূপের স্বধর্ম ফিরে পায় অর্থাৎ অখণ্ড পাকা আমি-র সঙ্গে তাদাত্ম্যসিদ্ধ হয়। আমিবোধে সে তখন সবকিছু দেখে, শোনে, জানে ও অনুভব করে। এই আমি পূর্বাপর পূর্ণ এক আমি-ই স্বয়ং। এই অখণ্ডভূমা পূর্ণ অদ্বয় আমি পাকা আমি হল পরম তত্ত্বস্বরূপ। তাঁর স্বয়ংপ্রকাশতা হল তাঁর তথ্যস্বরূপ। তথ্য কখনও তত্ত্বশূন্য হয় না। আর তত্ত্ব তো স্বয়ংপ্রকাশ। সুতরাং তত্ত্বস্বরূপে তথ্যের কোনও স্বতন্ত্র বা পৃথক অস্তিত্ব বা সত্তা সম্ভব নয়। এই বোধ স্বয়ংপ্রকাশ এবং স্বয়ংপূর্ণ বলে তার কোনও ব্যতিক্রম বা প্রত্যব্যয় হয় না।

তত্ত্বের প্রকাশকে যেমন তথ্য বলা হয় তেমনি তথ্যের সত্য পরিচয় হল তত্ত্ব। তত্ত্বের যেমন স্বরূপ হল প্রজ্ঞানঘন, সেইরূপ তথ্যের স্বরূপ হল বিজ্ঞানঘন। তত্ত্ব ও তথ্যের অভিন্নস্বরূপ ধারণ করে আছে উভয়ের অখণ্ড সত্তা আমিতত্ত্ব। এই আমি সবকিছুকে প্রকাশ ক'রে তার অধিষ্ঠান রূপে সবকিছুকে ধারণ করে রাখে। সেইজন্য তারই নামান্তর হল সুধর্ম অর্থাৎ তত্ত্ব হল প্রজ্ঞানঘন, তথ্য হল বিজ্ঞানঘন এবং উভয়ের ঐক্য বা অভিন্নতা হল স্বানুভূতিস্বরূপ আমি বা ধর্ম। এই ধর্ম হল সুধর্ম। এই সুধর্ম রূপে আমি সর্ব সত্তা-শক্তির অধিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞান ও সাক্ষী স্বয়ং। আমিতত্ত্ব সর্বতত্ত্বসার—সর্বতত্ত্বের সত্তা শক্তি বিজ্ঞান অধিষ্ঠান কার্য ও ফল। সবই আমিতে আমি-র দ্বারা আমিবোধে নিত্যসিদ্ধ।

২৮/১২/০১

।। চতুর্দশ বিচার ।।

ওঁ

হৃদয়ের প্রভু সবার আত্মারাম স্বয়ং
আত্মারাম স্বয়ং প্রাণারাম স্বয়ং ।।
সচ্চিদানন্দঘন পুরুষোত্তম
আত্মারাম স্বয়ং প্রাণারাম স্বয়ং ।।
জীবনের নিত্যসাথী সবারই আপন
জীবনের নিত্যসাথী আত্মারাম প্রাণারাম
সচ্চিদানন্দঘন পুরুষোত্তম ।।

(আত্মভজন)

বহির্জগতে ইন্দ্রিয় সবসময়ই ভাল জিনিসটা পেতে চায়। শ্রেষ্ঠ বস্তু সে চায়, রূপে, নামে, ভাবে। অন্তর্জগতেও আমাদের মন আনন্দ পেতে চায়, সুখ পেতে চায়। প্রকৃতির নিয়মে আমরা দেখতে পাই, বাইরে যেমন পরিবর্তন নিরন্তর ঘটে যাচ্ছে রূপ-নামের মধ্যে, অন্তরেও আমাদের ভাবের রূপান্তর হয়, ভাবান্তর হয় প্রতি মুহূর্তে। কাজেই আমাদের মধ্যে যে মনের চিন্তা, কল্পনা, ভাবনা, ধারণা—এগুলোর মধ্যেও ভাবের পরিবর্তন ঘটে। যার জন্য দেখা যায় একই ব্যক্তি কখনও হাসিখুশি আছে, আবার পরমুহূর্তেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল বা অভিমান করে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে বিশেষ দু-চারটে কথায় হোক বা কারওর ব্যবহারেই হোক আবার সে হাসিখুশি হয়ে গেল। কোনও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে একটা সুখবর এলে তার দুশ্চিন্তা কমে যায়। এইরকম প্রত্যেকের জীবনেই অন্তরে এবং বাইরে এই ভাববোধের রূপান্তর হয়ে চলেছে। এই ভাববোধের রূপান্তর নিয়েই সংসার। যেখানে রূপান্তর নেই, ভাববোধের স্থিতি অবস্থা, সেখানে সংসার নেই। যেমন গাঢ় নিদ্রা কিংবা মূর্ছা অবস্থায় অথবা মৃত অবস্থায়—এই তিনটে অবস্থার মধ্যে সংসারের কোনও বৃত্তি ভিতরে খেলে না। আরেকটি অবস্থা হল সমাধি।

সমাধির স্তরে যখন চিত্ত পৌঁছে যায় তখন সেখানে চিত্তের মধ্যে কোনও ক্রিয়া থাকে না। চিত্ত বৃত্তিশূন্য হয়ে যায়। নিদ্রার মধ্যেও তা হয়, কিন্তু নিদ্রায় মন অজ্ঞানের মধ্যে থাকে, আর সমাধিতে মন প্রজ্ঞানের মধ্যে অবস্থান করে। অজ্ঞান আর প্রজ্ঞান হল দু'টি বিপরীত প্রান্ত। একটা হচ্ছে বহির্দেশ এবং আরেকটা হচ্ছে একেবারে কেন্দ্রকে ছাড়িয়ে তুরীয় পর্যায়ে। সাধারণ মানুষের কাছে এগুলো কথার কথা, তার বোধের মধ্যে কিন্তু এগুলো খেলবে না,

যদিও এই বোধটা তার ভিতরে পরিপূর্ণ মাত্রায় আছে। সেই বোধের চর্চা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবার হয় না। বাড়িঘরে, কর্মক্ষেত্রে কোনও জায়গাতেই বিশেষ ভাবে হয় না। সংসারে, বাড়িঘরে এবং কর্মক্ষেত্রে যা হয় তা হল এই সংসারেরই বিশেষ আরেকটা দিক। তার কারণ বিকারী ভাববোধগুলো মানুষ ব্যবহার করে অভ্যস্ত এবং সেগুলোকেই সে সত্য বলে মনে করে। কাজেই সুখ-দুঃখ, ভাবনাচিন্তা এগুলোকেই মানুষ সত্য মনে করে। এটাই তাদের কাছে practical বা বাস্তব। কিন্তু যে কথা সবার কাছে বলার জন্য এই আয়োজন করা হয়েছে, অর্থাৎ এখানকার ভাষণ, তা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই কথা শুনে কার মনে কতখানি দাগ কাটে বা কার মনে কতখানি তা রেখাপাত করে বা সেই সম্বন্ধে সচেতনতা জাগে তা প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে দেখবে।

আমাদের ভাবের সঙ্গে বহির্জগতের সম্বন্ধ। কিন্তু অন্তরকে ছাড়িয়ে কেন্দ্রজগৎ এবং তুরীয় জগতের সঙ্গে আমাদের ভাবের সম্বন্ধ সবার হয় না। তাতে ধর্মক্ষেত্রগুলি খুব বিশেষ সাহায্য করে না, কর্মক্ষেত্র তো করেই না। আর জীবনে মানুষ যেভাবে চলতে অভ্যস্ত সেখানে নিজেকে তৈরি করে নেবার মতো সচেতনতা খুব কম সংখ্যক লোকের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। তবুও কিছু কিছু মানুষের চিন্তাধারা সূক্ষ্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এই জগতে আমরা যা দেখছি, এর অতীত যে একটা জগৎ আছে সেই সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্য তারা চেষ্টা করে, ভাবে এবং সেই অনুরূপ নিজেকে তৈরি করার জন্য যা প্রয়োজন— সাধনভজনই হোক আর যা-কিছুই হোক তা তারা নিয়মিত ভাবে অভ্যাস করে। সেইজন্য সংসারের মধ্যে দেখা যায়, যাদের একটু ধর্মকর্মের দিকে মন বেশি তাদের কিন্তু সংসারের অন্য পাঁচজন খুব ভাল ভাবে নিতে পারে না। তার অবশ্য কারণ আছে। 'এ' কিন্তু all negative, all positive সবকিছুই তোমাদের সামনে রাখছে। এই দুটোর ঊর্ধ্বে যা সেই বিষয়েও 'এ' বলবে। বক্তব্যের মধ্যে সবই থাকে। মুশকিল হচ্ছে আমাদের মন তৈরি নয় বা প্রস্তুত নয় এবং ইচ্ছুকও নয়। একটা ভাল জিনিস দেখে যে সে তা appreciate করবে এবং মেনে চলবে সেই যোগ্যতা সবার মধ্যে থাকে না। সেইজন্যই উত্তমপুরুষ, পুরুষোত্তম কথাটা আজকে গানের মধ্যে এসে গেল। এই পুরুষোত্তমের উপরেই আজকে কথা বলা হবে।

যে শ্রেষ্ঠ বস্তুকে আমরা পেতে চাই তার মাপকাঠিটা কোথায়? অমুকে বলেছে সুতরাং আমারও চাই, এক জায়গায় তা দেখে এলাম, সুতরাং আমারও চাই, আমার মনে ভাল লাগল তাই নিয়ে এলাম—এটাই কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের বিচার নয়। কাজেই বাইরের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার যথার্থ ও পূর্ণ নয়। ভাল একটা জিনিস দেখে তা নিয়ে এলে, সুন্দর গোলাপফুল ফুটেছে দেখে তা তুলে নিয়ে এসে ফুলদানিতে রাখলে, পরেরদিনই পাপড়ি ঝরে গেল। শ্রেষ্ঠ বস্তু সে চয়ন করেছে তার বুদ্ধি দিয়ে ঠিকই, কিংবা অন্য কোনও ক্ষণভঙ্গুর জিনিস বাড়িতে এনে রাখল, কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল তা fade হয়ে আসছে। বাগানে ফুল ফুটলে দেখতে ভাল লাগে, কিন্তু অনেকের মনে তা ভাল লাগে না, সে ফুলটাকে তুলে নিয়ে এসে ফুলদানিতে রাখতে চায়, পকেটে রাখে ইত্যাদি। আসল কথা হল, আমাদের মনের যে চিন্তাধারা, তার

পছন্দ বা বিচার যে পর্যায়ের তা সম্বন্ধে সবার ধারণা সমান নয়। এ কথাগুলো শোনার পর তোমাদের নিশ্চয়ই সেই সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হবে। মানুষের চোখ আছে রূপ দেখার জন্য। রূপ বলতে গেলে কিন্তু বর্ণ বা colour-কে বোঝায়। Colour মানেই light। অর্থাৎ আমাদের চোখের ভিতরে যে function-টা হয় তা light-এর function। এই light দিয়েই আমরা light-এর যত variation বা রূপ দেখি এবং অনুভব করি। এই চোখের জ্যোতিও আমাদের সবার সমান নয়। আমরা সব জিনিস সমান ভাবে দেখি না, কতগুলি common জিনিস দেখি, আবার কতগুলি দেখি যা common নয়। বেশি দূরের দৃষ্টিও সবার থাকে না। আজকাল তো খুব কম লোকেরই দূরের দৃষ্টি থাকে। তার পরে পছন্দ অনুযায়ী আমরা দেখি, যেমন কারও গাঢ় বর্ণ পছন্দ বেশি, dark colour-টা পছন্দ বেশি, কারও বা bright, কারও বা light colour পছন্দ। কাজেই এগুলো দিয়ে কিন্তু একটা বিচার ধরা পড়ে। Dark colour হল তামসিক। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে তামসিকতার প্রয়োজন বেশি হয়। কোথায়? আবরণের জন্য। আবৃত করবার জন্য বা ঢাকার জন্য একটা ঢাকনার প্রয়োজন হয়। Dark colour-টা ঢেকে দেয়। যেমন চোখ খারাপ হয়ে গেলে ডাক্তাররা sunglass পরতে বলেন, goggles পরতে বলেন। তাতে চোখ ঢেকে দেয়। তখন dark colour-টা প্রয়োজন হয়। কিন্তু রাত্রে যদি কোনও বাতি না-থাকে বাড়িতে, আলো না-থাকে তাহলে অসুবিধা হয়।

'এ' প্রসঙ্গের পাশাপাশি কয়েকটা উদাহরণ বলছে, কেননা প্রসঙ্গটা খুবই সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম প্রসঙ্গ বোঝাবার জন্য এবং যোগ্যতা বাড়াবার জন্য 'এ' এই কথাগুলো বলছে। কারণ মানুষের মনের সেই যোগ্যতা খুবই কম। যোগ্যতা কম বলেই মানুষের মধ্যে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য—এই ছয়টা ভাব খেলে। যোগ্যতা থাকলে কিন্তু তা খেলবে না। বারবার দেহ ধরে এসে আমরা এই যোগ্যতা বাড়াবাড় জন্য সুযোগ পাই, কিন্তু সেই সুযোগের আমরা সদ্ব্যবহার করি না। আমাদের এই যে পছন্দ বলে একটা বস্তু আছে, তা আমাদের অন্তরায় হয়। খুব কম লোকের পছন্দই হচ্ছে উচ্চস্তরের। বেশিরভাগ লোকের পছন্দই base level-এর। Aesthetics-এর একটা কথা আছে যে, 'বর্ণাধম ইতরে জনঃ'। মানে ইতর ব্যক্তি অর্থাৎ uncultured, uneducated ব্যক্তিরাই dark colour বা bright colour পছন্দ করে। আর যারা refined nature-এর, অর্থাৎ educated তারা দেখা যায় light colour-এর পক্ষপাতী। এগুলো চোখের ক্ষেত্রে বলা হল। চোখের ক্ষেত্রে আরও বিষয় আছে। একদল মানুষ আছে যারা দিনের বেলায় বাইরে যায় না, রাত্রিবেলা বেরোয়। পাখিদের মধ্যেও এক class পাখি আছে যারা দিনের বেলায় বেরোয় না, রাত্রিবেলায় বেরোয় যেমন প্যাঁচা, বাদুড় প্রভৃতি। এরা দিনের আলো সহ্য করতে পারে না। তারা নিশাচর। পশুদের মধ্যেও এক শ্রেণী আছে যারা নিশাচর।

'এ' কিন্তু analysis-টা খুব scientific way-তে করছে, এখানে ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে কিছু বলা হচ্ছে না। কিন্তু emotional nature বা sentimental nature-এর লোক যারা তারা হয়ত কথাগুলোর ভুল অর্থ ভাববে, ধরবে এবং অনুভব করবে। সেইজন্য

সাবধান করে বলা হচ্ছে যে, শুধু নিজেকে তৈরি করার জন্য যেরূপ অনুভূতি একান্ত দরকার সেই বিজ্ঞানই 'এ' সবার সামনে রাখছে। তা কাউকে attack করার জন্য নয়, কাউকে তা দিয়ে কষ্ট বা দুঃখ দেবার জন্য বলা হচ্ছে না। মানুষের যে বিকারগুলি থাকে, 'এর' কথার মধ্যে দিয়ে সেগুলো অনেকটা focused হয় বলে অনেকেই বলেছে যে, আপনি যা বলছেন তা কি আমাকে লক্ষ্য করে বলছেন? উত্তরে তাদের বলা হয়েছে, তুমি কি তাই মনে করছ? তোমাকে তো 'এ' চেনে না, যদি চিনত তাহলে বলতে পারত। 'এও' তোমাকে চেনে না, তুমিও 'একে' চেন না। তবে কথাপ্রসঙ্গে তুমি হয়ত এ কথাটা বলছ ঠিকই, তবে 'এর' বক্তব্য বিষয়গুলি একটা বিজ্ঞান। সূর্য যেমন আলো দিচ্ছে, সেই আলোতে সবার কিন্তু সমান কাজ হয় না। কেউ আলোটা বেশি পছন্দ করে, কেউ কম পছন্দ করে। যার যেরকম প্রয়োজন সে সেরকম ভাবে আলোকে ব্যবহার করে। আলো মানেই হচ্ছে light। এই light মানেই হল বোধ/আমি। এর থেকে চলে যাব কিন্তু Consciousness-এ। কেননা Consciousness ছাড়া কোনও light-ই হয় না এবং আমি ছাড়া Consciousness-এর ব্যবহারও হয় না।

Consciousness-এর আরেকটা প্রতিশব্দ হল light। Light মানেই colour। Colour-এর মধ্যে যেটা bright colour, সেই colour-টা হচ্ছে revealing। গাঢ় রং বা Dark colour-টা obscuring অর্থাৎ আবরণ শক্তি, তা concealing, covering, ঢেকে দেয়, আবৃত করে দেয়, আর bright colour-টা খুলে দেয়। যত bright হবে তত বেশি clear ও exposed হবে তত বেশি expanded হবে, ছড়িয়ে যাবে। আমরা জগতে এই শব্দটা খুব বেশি শুনতে পাই। সৃষ্টির মধ্যে শব্দই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, তার কারণ শব্দ দিয়েই সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, ধ্বংসও হবে এই শব্দ দিয়েই, আর maintain-ও হচ্ছে শব্দ দিয়ে। This is the science, imagination নয়। একেবারে সর্বোত্তম স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত— এগুলি হল কতগুলি বোধের বৃত্তি, আর কিছু নয়। জগৎ হল কতগুলো বোধের বৃত্তির সমষ্টি, অন্তত 'এ' যা দেখতে পেয়েছে, ধরতে পেরেছে তা-ই সবার সামনে বলছে। এই কথাগুলো না-বোঝার মানুষই বেশি, বোঝার মানুষ খুব কম। কাজেই আমাদের মধ্যে এই যে শ্রবণশক্তি, সেই শ্রবণের মধ্যেও কিন্তু অনেক gradation আছে। কারও কারও বিকট শব্দই পছন্দ, আবার বিকট শব্দে অনেকের কান কালা হয়ে যায়, কানে তালা লেগে যায়। কারও হয়ত সূক্ষ্ম শব্দটা খুব পছন্দের, আবার কারও সূক্ষ্ম শব্দ ভাল লাগে না। সংসারে বিকট শব্দই অধিকাংশ মানুষ ভালবাসে। মানুষ জোরে শব্দ না-শুনলে বলে, কী হচ্ছে, বাড়িয়ে দাও। বাড়িঘরে দেখা যায় কারও কারও গলার শব্দ খুব moderate, কারও কারও abnormal, কারও বা rough ও hoarse voice—সবরকমই আছে। কিন্তু এই বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ যখন এল তখন বিজ্ঞান এগুলো নিয়ে কী ভাবে চর্চা করে অর্থাৎ শব্দ এবং রূপ, রূপ আর নাম—তা জানা প্রয়োজন।

জগতের সবকিছুকে analysis করলে রূপ আর নাম—এই দুটো জিনিস পাওয়া যাবে। রূপের variation, নামের variation এবং শব্দের variation-ই পাওয়া যায়। এই দুটোর

মধ্যে কিন্তু বোধেরই কতগুলো degree আছে। তা যাঁরা জানতে পারেন তাঁরা রূপকেও control করতে পারেন এবং নামকেও control করতে পারেন। এই controlling power যাঁদের মধ্যে জেগে যায় তাঁরা হয়ে যান যোগী। আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাই, আমাদের চোখের জ্যোতির ক্ষমতা সীমিত, কিন্তু সেই সীমার মধ্যেও অনেকগুলো gradation আছে। সবাই কিন্তু সেই একই সীমার রূপ নিতে পারে না। কানের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। এই দুটি ইন্দ্রিয় কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কও খুব close। এই দুটোরই centre কিন্তু brain। এই চোখ খারাপ হলেও তা brain-এর সঙ্গে connected এবং শ্রবণশক্তি খারাপ হলেও তা brain-এর সঙ্গে connected। দৃষ্টিশক্তি আর শ্রবণশক্তি দুটোরই কেন্দ্র brain। তা connect করছে মন। এই প্রসঙ্গ খুবই সূক্ষ্ম, সেই প্রসঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যে detail-এ বলা মুশকিল। তবু যেটুকু বলা সম্ভব তা প্রসঙ্গক্রমে বলা হচ্ছে। মানুষ চোখে যা দেখে তা হচ্ছে light-এর কতগুলি wave অর্থাৎ electromagnetic wave of light। পরস্পরকে সমর্থন করা, সমর্থন না-করা, তার পরে কোনও জিনিসকে ঠিক মানা, না-মানা ইত্যাদি এবং আমাদের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য যে excitement হয়, তার reaction নানারকম ভাবে হয়। তার ফলে physiological কতগুলো disorder সৃষ্টি হয়। তখন আমাদের শরীরের মধ্যে নানারকম বিকার দেখা দেয়।

জেনে রেখ, আত্মজ্ঞানেব বাইরে কোনও জ্ঞান নেই। সর্বজ্ঞানই আত্মজ্ঞানের কতগুলি projection। আত্মজ্ঞানকে বাদ দিয়ে আমরা অন্যান্য জিনিস নিয়ে মাতামাতি করি। সেইজন্য আমাদের জীবনে balance আসে না, আসে disorder, depression, excitement, nervousness, debility এবং দেহের নানারকম organic imbalance। সবকিছুর মূলে রয়েছে wrong understanding, ভুল বোঝাবুঝি, অজ্ঞানের কতগুলো প্রভাব। রূপের ক্ষেত্রে যেমন electromagnetic wave হল light, নাম বা শব্দের ক্ষেত্রে তেমন acoustic wave আছে। বিজ্ঞানীরা এই দু'টোকে ধরে খুব গভীর গবেষণা করছে এবং এই দুটোর সাহায্যে তারা সূক্ষ্ম অনেক জিনিস দেখবার এবং জানবার চেষ্টা করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে। সাধারণ মানুষের light-এর wave এবং sound-এর wave গ্রহণ করার maximum capacity হচ্ছে যথাক্রমে সেকেণ্ডে পঁচিশ হাজার কোটি থেকে পঁচাত্তর হাজার কোটি এবং বত্রিশ থেকে বত্রিশ হাজার। তার আগে বা পরে মানুষের নেবার ক্ষমতা নেই। যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করেন বা যোগীপুরুষ, যাঁরা মনকে সংযত করেছেন বা concentrate করেছেন অর্থাৎ ধ্যান অভ্যাস করেছেন এবং যাঁদের ভিতরে শুদ্ধাভক্তি জেগেছে তাঁরাই একমাত্র সর্বপ্রকার রূপ ও শব্দ গ্রহণ করতে সমর্থ। শুদ্ধাভক্তি খুব কমলোকের মধ্যেই দেখা যায়। সত্ত্বগুণের অভাবে শুদ্ধাভক্তি জাগে না। তমোরজোগুণের প্রাধান্য থাকলে শুদ্ধাভক্তি জাগে না। 'এ' ভক্তির সন্ধান জ্ঞানেরও পরে পেয়েছে। আর তার আগে যে ভক্তি তা হল আসক্তি, নিজের পছন্দেরই একটা gradation। তা fluctuate করে, স্থায়ী হয় না। কিন্তু ভক্তি হল স্থায়ী বস্তু। এই electromagnetic wave of light-এর ধারণশক্তি vary করে, তা differ করে man

to man. Sound wave-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। Sound-এর ক্ষেত্রে acoustic-wave-এর মাধ্যমে sound-টা ধরা পড়ে। এই ক্ষেত্রেও বত্রিশের নিচে ধরা পড়ে না, আবার বত্রিশ হাজারের উপরেও ধরা পড়ে না। যাঁরা যোগী, যাঁদের মন সংযত হয়েছে, বুদ্ধি সংযত হয়েছে, অহংকার প্রশমিত হয়েছে তাঁরা কিন্তু বত্রিশের নিচের শব্দও গ্রহণ করতে পারেন এবং বত্রিশ হাজারের উপরের শব্দও গ্রহণ করতে পারেন। রূপের ক্ষেত্রেও পঁচিশ হাজার কোটি থেকে নিচে এবং পঁচাত্তর হাজার কোটি থেকে উপরের আলোর তরঙ্গ গ্রহণ করতে পারেন। অতি দুর্লভ অধিকারী পুরুষ একেবারে শব্দশূন্য রূপশূন্য শুদ্ধ বোধের আমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। তাঁরাই হলেন তত্ত্বজ্ঞপুরুষ পুরুষোত্তম বা উত্তম পুরুষ পাকা আমি ব্রহ্ম আত্মা সনাতন স্বয়ং। অনুরূপ ক্রমে বিপরীত ভাবে উর্ধ্বদিকেও ঠিক এরকম সম্ভব। প্রসঙ্গটির বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় বলে শুধুমাত্র উল্লেখ করা হল। শিক্ষিত মানুষ বা সভ্য মানুষের কাছে এই কথাগুলো খুব ধাক্কা দেবে। সেইজন্য যোগীদের কাছে অজ্ঞান বলে কোনও বস্তু থাকে না। তাঁরা ত্রিকালজ্ঞ অর্থাৎ তিনকাল সম্বন্ধে জ্ঞাত—অর্থাৎ অতীতে কী হয়ে গিয়েছে, ভবিষ্যতে কী হবে তা বর্তমানের মতো তাঁরা একটা level-এ দেখতে পান। Human mind কী বিচার করবে, কী হিসাব করবে, যারা ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট? এগুলো হল বিকার বা ব্যাধি।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য—এই ছয়টা হল ব্যাধি। এই ব্যাধিকে দূর করার জন্য কোনও ডাক্তার চিকিৎসা করেন না এবং ওষুধও দেন না। এই ছয়টা রোগের variation হল আমাদের দেহের মধ্যে নানাবিধ রোগ। কাজেই মনকে যাঁরা অন্তর্মুখী করতে পারেন, কচ্ছপের মতো ঝট করে গুটিয়ে নিতে পারেন তাঁরাই রোগমুক্ত হতে পারেন। কচ্ছপ যখন বাইরে চলতে গিয়ে বাধা পায় বা তাকে কিছু আক্রমণ করে তখনই সে হাত-পা-মুখ গুটিয়ে নেয় ভিতরে। তাকে তখন আর বাইরে পাওয়া যায় না। যোগীও প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে সংযত করে তার থেকে মনকে একেবারে গুটিয়ে ভিতরে নিয়ে যান। কাজেই তাঁর কাছে জগতের যত বীভৎস রূপ বা সুন্দর দৃশ্য এবং বিকট ও সুন্দর শব্দই হোক না কেন তা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর কাছে এগুলো সব স্বপ্ন দৃশ্য বস্তু এবং স্বপ্নশূন্য চিত্ত তাঁর অধিগত বলে স্বপ্নদৃশ্য বস্তুগুলোকে তিনি magical game-এর মতো দেখেন। কাজেই এই যে সূক্ষ্ম শব্দ বা দৃশ্য তার মানে এক জায়গায় বসে তিনি পৃথিবীর কোন কোণায় কী হচ্ছে তা দেখতে পান এবং কোথায় কী হচ্ছে তা শুনতেও পান। এই যোগ্যতা মানুষের মধ্যে নিহিত আছে, কিন্তু তা কেউ তৈরি করে না। আমাদের খাওয়া, পরা, থাকা, দেহের আরাম ইত্যাদি নিয়ে আমরা রাতদিন সময় কাটাই। সারা জগতের মানুষই তাই। এই চক্র চলছে সহস্র সহস্র বছর ধরে, লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে। এর নাম দিয়েছে মানুষ সভ্যতা। কোনও জিনিসকে ব্যবহার করতে গেলে তার বিনিময়ে কিছু দিতে হয়, খরচা করতে হয়, না-হলে সুযোগসুবিধা পাওয়া যায় না।

'এ' সেই সভ্যতার কথা বলছে যে সভ্যতাতে অর্থ লাগে না, তা পরমার্থের ব্যাপার। সেখানে অর্থের কোনও কারখানা নেই। সেই অর্থ হল নিজের আসল স্বরূপ যা সমস্ত অর-

গুলোকে, অর্থাৎ সমস্ত প্রকাশগুলোকে ধরে আছে। অর + থ = অর্থ, এই হল অর্থের তাৎপর্য। 'এর' কথার মাঝখানে এলেই বুঝতে পারবে যে তোমাদের নিজেদের মন-ইন্দ্রিয়গুলি কত নিচু স্তরের। 'অর' মানে হল সমস্ত প্রকাশ—রূপে-নামে-ভাবে যত প্রকাশ আছে সবই বোধের 'অর'। যেমন cycle-এর একটা চাকা থাকে। চাকাটা হল এই স্থূল জগৎ, তার area-টা দেখাচ্ছে। চাকা বা wheel-এর কেন্দ্রে মাঝখানে একটা nave থাকে, তার থেকে spoke-গুলি rim-কে ধরে রেখেছে, এগুলোকে বলে 'অর'। রথের চাকা, cycle-এর চাকা, car-এর চাকা—এই যে চাকাগুলোর কথা বলা হল, এই চাকাগুলো control করছে কে? Control করছেন চালক, প্রভু, নিয়ন্তা—subject of life।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমাদের শরীরের সর্বাঙ্গ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুতোর মতো স্নায়ুতে ভরা, তার সংখ্যাও কিন্তু 'এ' খুঁজে পেয়েছে। ডাক্তারদের মতে তার সংখ্যা হল বাহাত্তর হাজার। কিন্তু স্বসংবেদ্য স্বানুভূতির বিজ্ঞানদৃষ্টিতে 'এর' কাছে তার সংখ্যা হল বাহাত্তর কোটি বাহাত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার দুশো এক। This is My reading. এই জন্য অনেকের কাছে 'একে' বহু কথা শুনতে হয়েছে। তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, 'এ' প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে কথা বলবে, কিন্তু তুমি দেখ তোমার ভিতরে সেই সম্বন্ধে কোনও idea আছে কী না। যদি না-থাকে তাহলে তুমি যে প্রতিবাদ করলে তা রক্ষা করবে কী দিয়ে? তোমার পুঁজিটা কতটুকু? রূপের ঘরের তুমি কতটুকু খবর রাখ? নামের ঘরের তুমি কতটুকু খবর রাখ? ভাবের ঘরের তুমি কতটুকু খবর রাখ? সবই যদি তোমার নিজের পরিচয় হয়ে থাকে তাহলে তোমার বাইরে আর কেউ তো নেই। You will find none other than your own Being/Self. তুমি যা দেখছ তার মধ্যে তোমার আত্মাকেই তুমি দেখছ, কিন্তু তুমি চিনতে পারছ না। অথচ নিজের অহংকার দিয়ে অনেক কিছুই তোমরা বল।

নিজের পরিচয় যতক্ষণ আমরা জানতে না-পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জন্ম হয়নি। 'এ' কথাপ্রসঙ্গে এই কথাটা বলে ফেলেছিল একদিন। তখন পণ্ডিতরা 'একে' বলেছিল যে, আপনি এগুলো কী সব অবান্তর কথা আমাদের শোনাচ্ছেন। উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, হ্যাঁ 'এ' অবান্তর, বান্তর শুধু তোমরা। জন্ম কী? জন্ম কোথা থেকে হয়েছে? আত্মা বা ব্রহ্মের কি জন্ম হয়েছে? ব্রহ্মাণ্ড কথাটা যে উচ্চারণ কর তা এল কোথা থেকে? তা কীসের অণ্ড? ব্রহ্মের অণ্ড! ব্রহ্মের আবার ডিম হয় না কি? কাজেই এই কথাগুলো বুঝবার জন্য মানুষের একটা প্রস্তুতি থাকা দরকার। Class-এ ভর্তি হলেই কিন্তু পড়াশুনা হয় না। Professor বা teacher-এর কথাগুলি না-শুনলে, খালি বই পড়ে কিন্তু সব জিনিস বোঝা যায় না। কেউ বাড়ির অন্দরমহলের কাজ করে, কেউ বা বহির্মহলে কাজ করে। কেউ বা অন্দরমহলে ফাইফরমাশের কাজ করে, কেউ বা অভ্যাসবশত নিজের কাজ নিজেই করে। আবার কেউ বা শুধু সাক্ষী রূপে বসে থাকে ও দেখে। অনেকরকমের gradation আছে। এমন মানুষও আছে যে কী না বহির্মহল আর অন্দরমহলের সব কাজই নিজেই করে। কিন্তু তার জন্য সে grudge করে না, অভিযোগ করে না, অনুযোগ করে না এবং প্রতিবাদও করে না। তার কারণ সে

নিজেই তাই। কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে? This is Self-Knowledge. তা আমরা সবাই ব্যবহার করতে পারি। কেননা এই Self-Knowledge আমাদের কোনও কারখানা থেকে আনতে হবে না, কোনও স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আনতে হবে না। তা নিজের মধ্যেই রয়েছে, প্রত্যেকের পরিচয়ই তাই। কাজেই যত worst আছে, আর যত best আছে সবটাই নিজেরই পরিচয়। কিন্তু এটা আমরা মানতে পারি কি? আমরা তো ফোঁস করি পদে পদে যখন পছন্দ হয় না। শ্রেষ্ঠ বস্তুকে চয়ন করে কে? অহংকার। অহংকার তার পছন্দমতো জিনিসকে রূপের থেকে নেবে, নামের থেকে নেবে, ভাবের থেকে নেবে, অমুককে ভাল লাগে, অমুককে ভাল লাগে না, অমুকটা ভাল লাগে, অমুকটা ভাল লাগে না ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো হচ্ছে আমাদের বিকার বা disease, ease নয়। Ease মানে স্বচ্ছন্দতা অর্থাৎ স্বাভাবিকতা। আর disease হল অস্বাভাবিকতা, সেখানে স্বচ্ছন্দতা থাকে না। নিজের পছন্দ cut করে দিল। কিন্তু যা cut করল তা তাকে কোনও না কোনও জন্মে এসে আবার ঠিক গ্রহণ করতেই হবে, রেহাই নেই। কেননা তা যে তারই অংশ।

নিজেকে বাদ দেবে কী দিয়ে? কাজেই আত্মজ্ঞান বলে যা আছে তা সবই আমি-ই। এটাই হল আত্মজ্ঞান। যা-কিছু জগতে আছে সবই আমি বা আমি-রই পরিচয়, অর্থাৎ একবোধ বা সমবোধের পরিচয়। All the changes, all the causes, all the actions, all the results are nothing but different expressions of the One and the same Consciousness which verily I am. That is Purushottam. গানের ভিতরে পুরুষোত্তম কথাটি দিয়ে শেষ করা হয়েছে। উত্তম পুরুষ, পুরুষ শব্দের অর্থ হল, পুরেতে (দেহে, আধারে, ঘরে, হৃদয়ে) বাস করেন যিনি। আবার পুরুষ শব্দের আরেক অর্থ হল, পূর্ণতা প্রকাশ করেন যিনি। কাজেই অর্থবোধ না-হলে সমস্ত প্রকাশকে তিনি control করবেন কী দিয়ে? আমরা শুধু avoid করি, যা পছন্দ হয় না তা পরিহার করি। তাহলে আমাদের অপছন্দটা হচ্ছে একেবারে maximum, পছন্দ হচ্ছে সীমিত। এটাই হচ্ছে অহংকারের criterion। অহংকার সীমিত অংশকে নেয়, পুরোটা গ্রহণ করে না, করতে পারেও না। পুরোটা নিলে তো অহংদেব হয়ে গেল, পুরুষোত্তম হয়ে গেল। 'এ' আরেক দিক দিয়ে কথাকে নিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে, অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে আমরা কী করে পাব। অহংকারকে তো প্রত্যেকেই প্রায় নিয়ে বসে আছে, কিন্তু পুরুষোত্তমকে আমরা কী করে পাব? যিনি উত্তমপুরুষ তিনি সবকিছুর মধ্যে বাস করেন, সব কিছু পূর্ণ করে তিনি প্রকাশ করেন। এই হল হৃদয়।

হৃদয় হল তাঁর আসন। কিন্তু আমরা হৃদয় কেটে তো তাঁকে বের করতে পারি না। তাহলে তিনি কোথায়? আমাদের মধ্যে হৃদয়ের যে ধারণা তা ঠিক নয়। আমরা হৃদয় বলতে গেলে মনে করি একটা organ, যেমন kidney, heart, brain ইত্যাদি। কিন্তু হৃদয় সবকিছুকে ধারণ করে রেখেছে, তা সবকিছুর কেন্দ্র। হৃদয় কথাটা বারবার উচ্চারণ করলে এর অন্যরকম অর্থ পাওয়া যায়। অর্থাৎ হারানো বস্তুকে যে সবসময় ফিরিয়ে দেয় তা-ই হল হৃদয়। কী হারিয়ে যায়? আমাদের আত্মস্মৃতি অহংকার হারিয়ে ফেলে আর অহংদেব তা মিলিয়ে দেয়।

আমরা আত্মজ্ঞান হারিয়েছি অহংকারের জন্য। অহংকার সীমিত করে সব জিনিসকে চিন্তা করে, ধারণ করে, পোষণ করে, পালন করে এবং তা নিয়েই থাকতে চায়। সেইজন্য অহংকার কষ্ট পায়। কেননা স্বল্প যে বস্তু তা ক্ষয়িষ্ণু হবেই। যা অল্প তার নাশ আছে, কিন্তু ভূমার নাশ নেই, অখণ্ডের নাশ নেই। অল্পকে নিয়ে বাস করে অহংকার, সেইজন্য অহংকার সবসময়ই অভাবের মধ্যেই থাকে। অভাবে থাকে বলেই তার কষ্ট। কিন্তু এই অভাব দূর করবে কী করে? এই কথাগুলোর মধ্যে negative, positive দু'টি যেমন আছে, তাকে আবার কেন্দ্রীভূত করে দেবার কথাও আছে। সেইজন্য অসম্ভব রকমের attention ছাড়া এই কথাগুলোকে ধরে রাখা বা বোঝা খুব মুশকিল। কী ভাবে চঞ্চল মন আমাদের অহংকারকে পোষণ করে! কিন্তু তার জন্য তাকে খুব একটা বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। অহংকারের ঊর্ধ্বে যেতে হলে তাকে পরিশ্রম করতে হবে, কেননা সসীমকে ছাড়িয়ে তাকে অসীমের দিকে যেতে হবে, অখণ্ডের দিকে যেতে হবে, পূর্ণতার দিকে যেতে হবে। তাকে আপনবোধ দিয়ে সবকিছুকে গ্রহণ করতে হবে। যার জন্য এখানে বলা হয়েছে যে, দুঃখকে আপন করার জন্য 'একে' একসময় কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। দুঃখকে গ্রহণ করা হয়েছে এই বোধে—ও আমার মা, ও আমার আত্মা, ও আমার গুরু। মানুষ struggle করে একরকম ভাবে, কিন্তু 'এ' ছোটবেলা থেকে সংগ্রাম করেছে আরেকরকম ভাবে, যার ফলে বেদনাগুলো একত্র হয়ে বেদন হয়েছে অন্তরে, তার পরে বেদ জেগে উঠেছে। It is a new way of realization. সবারই যে এইরকম হতে হবে তা নয়।

সচেতন হবার জন্য যা যা দরকার সেই point-গুলো সবার সামনে রাখা হচ্ছে, যদিও সবার মন তা গ্রহণ করবে না। সে বেছে শুধু তার মনেরমতোটুকুই নেবে, তার পছন্দমতোই সে গ্রহণ করবে। কিন্তু নিজেকে কী করে ভাগ করবে? অহংকার দেহ দিয়ে ভাগ করে, ইন্দ্রিয় দিয়ে ভাগ করে, প্রাণের বৃত্তি দিয়ে ভাগ করে, মনের বৃত্তি দিয়ে ভাগ করে, চিত্ত দিয়ে ভাগ করে, বুদ্ধি দিয়ে ভাগ করে—এইরকমভাবে ভাগ ভাগ করে আর একত্র করতে পারে না। এই হল অহংকারের সব চাইতে বড় দোষ। Ego can divide, can reject but cannot unite and accept everything as one or as a complete whole. যতক্ষণ পর্যন্ত আমি-র সঙ্গে যুক্ত না-হবে অর্থাৎ বোধের সঙ্গে সব জিনিসের যোগ না-হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু স্বানুভূতি খেলবে না। অহংকারের মধ্যে যেটুকু বোধ আছে ঠিক সেটুকুই খেলবে, তার বেশি খেলবে না। অহংদেব অর্থাৎ পুরুষোত্তম, আমি-র আমি অখণ্ডবোধ নিয়ে আছে বলে সমস্ত জিনিসকেই প্রকাশ করতে পারে। তা প্রকাশ করে নিজেই স্ববোধে ধারণ করে রেখেছে। কাজেই এই বোধস্বরূপের কেন্দ্রই হল হৃদয়। অনন্তকাল তার অধীনে অনন্তকার্য, সবকিছুকে প্রকাশ করছে এই বোধ। কাল কী? ক্রিয়াকে, কর্মকে ধরে রাখে যে শক্তি তার নাম কাল। কর্মের কারণ এবং কার্যকে ধরে রাখে যে তা হল কাল। কালকে নিয়ন্ত্রণ করেন যিনি তিনিই হলেন কালী।

কালীপূজা করে মানুষ, 'কালী, কালী' বলে কিন্তু কালীর তত্ত্ব যথার্থ বোঝে না। আর না-বুঝে পূজা করলে তো তার যথার্থ ফল পাওয়া যাবে না। খাবার জিনিস খেয়ে যদি হজম

করতে না-পার তাহলে তো তোমার পুষ্টি হবে না। হজম করার অর্থ হল সব এক-এতে এসে মিশে এক হয়ে যাওয়া (manyness reduces to Oneness, diversities to unity, Oneness and identity)। আমাদের ভিতরে যে বোধের জ্যোতি তা বাড়াতে গেলে আমাদের কী করতে হবে? লেখাপড়া কেন শিখি আমরা? শৈশব থেকে অ-আ-ক-খ থেকে আরম্ভ করে নানারকম বিষয়চর্চা করে আমরা ভিতরে সেই বোধের বৃত্তিগুলোকে বাড়িয়ে তুলি সসীমের থেকে। সেই বৃত্তি বাড়তে বাড়তে আমাদের কী হয়? ঐ যে একটু আগে অনুভূতির সীমার কথা বলা হল, আমরা ঐ সীমার মধ্যে এসে পৌঁছে যাই অর্থাৎ রূপ ও নামের অনুভূতির বৃত্তি সীমিত। তার বাইরে যেতে গেলে আমাদের আরেকরকম ভাবে জীবনযাপন করতে হবে। সেটা কী? আমাদের গতানুগতিক জীবনের সঙ্গে কতগুলো নিয়মের অভ্যাস বা চর্চা করতে হবে নূতন ভাবে এবং সংযত ভাবে। জীবনে মানুষের ধৈর্য, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতা সবার সমান থাকে না—কারও বেশি থাকে, কারও কম থাকে, আবার কারও বা আদৌ থাকে না। সংসারে তারাই নিপুণ যাদের ধৈর্য, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রবল। তারাই সংসারকে ধরে রেখেছে—'সংসার স্থিতিকারিণী বিদ্যাশক্তি'। আর সংসারে উৎপীড়ন, উত্তেজনা এবং বিকার সৃষ্টি হচ্ছে অবিদ্যাশক্তি মায়ার জন্য। বিদ্যাশক্তির নাম মহামায়া ও পরাবিদ্যাশক্তির নাম যোগমায়া।

'এ' সেই বিজ্ঞানের কথা বলছে যেই বিজ্ঞান একসময়ে ঘরে ঘরে চর্চা হবে, অবিদ্যার জায়গায় বিদ্যা প্রধান হবে। সেই বিদ্যাশক্তি সব জিনিসকে control করবে। এই বিদ্যাশক্তিই হল ঈশ্বরীয়শক্তি। আর অবিদ্যাশক্তি হল মায়াশক্তি, তা হল প্রাকৃতশক্তি। প্রাকৃতশক্তি আমাদের ভিতরে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য—এগুলোকে প্রকাশ করে এবং আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, স্বার্থ, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব দ্বন্দ্বমূলক প্রভৃতি ভাবগুলি বাড়িয়ে দেয়। আমরা যে বিদ্যার চর্চা করি তার দ্বারা কিন্তু এগুলো যায় না। সেইজন্য দেখা যায় যে B.A., M.A. পাশ করেও কিন্তু সেই একই তিমিরে মানুষ থেকে যায়। আমাদের ধর্মবিজ্ঞান যদিও এই অবিদ্যাকে সরাবার জন্য অনেকরকম বিধান আবিষ্কার করেছে, কিন্তু তা ব্যবহার করে বর্তমানে মানুষ বিশেষ উপকার পাচ্ছে না। অবশ্য তার অনেকগুলো কারণ আছে। তার প্রথম কারণ হল, মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারে না, teamwork করে কাজ করতে রাজি নয়। যারা teamwork করে কাজ করতে পারে তারা এই অভাব বলে যেই জিনিসটা সৃষ্টি হয় অজ্ঞানের থেকে, তা দূর করতে সমর্থ হয়। অভাব হল মনের স্বকল্পিত বিশেষ একটা ধারণা। শুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে এই কল্পিত অভাব বিদূরিত হয়। শুদ্ধ বুদ্ধি হল সাত্ত্বিক বুদ্ধি। সাত্ত্বিক পুরুষকারের মাধ্যমে তমোরজোগুণের প্রভাব প্রশমিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে কল্পিত অভাবও নিরস্ত হয়। সাত্ত্বিক পুরুষকারের মাধ্যমে স্বকল্পিত অবিদ্যা মায়াজাত দ্বৈতবোধের সম্যক নিরসন হয়। আপনবোধের ব্যবহার দ্বারা অদ্বয়বোধের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত হয়....। অবিদ্যা অজ্ঞানজাত সর্ববিধ আবরণ অন্তর থেকে বিদূরিত হয়। অন্তঃকরণ তখন আর দ্বৈতবোধের পরিসেবা না-করে অদ্বয়বোধের প্রকাশমাধ্যম হয়। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরাও অধিকতর সচেতন হয়ে

তাদের বিজ্ঞানচর্চায় এগিয়ে চলেছে। এখন থেকে একশো বছর আগে বিজ্ঞানের এই পরিস্থিতি ছিল না। এখন ঘরে বসে মানুষ দূরকে অনেক কাছে পেয়েছে। তার অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস যা একান্ত ভাবে দরকার তা readymade পাচ্ছে। মানুষের মন অন্তরে-বাইরে দুদিকে খেয়াল রেখে তার balanced ব্যবহারের ফলে এই জিনিস develop করছে।

Progress-টা আসে balanced ব্যবহারের ফলে। ঘরে যারা কাজ করে তাদের বাইরের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে হয়। আর বাইরে যারা কাজ করে তাদের ঘরের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে হয়। যার জন্য বলা হল, বাহির এবং ঘর (অন্তর) দুটো যদি সমানভাবে develop করে তাহলে কিন্তু আমাদের সর্ব কর্ম যোগে পরিণত হবে, যোগ আবার জ্ঞানে পরিণত হবে এবং জ্ঞান থেকে আসবে ভক্তি। সেই ভক্তি কী রকম? তা আমাদের এই অসংযত মনের পক্ষে ধারণা করা খুব কঠিন। যথার্থ ভক্তিতে নিজের ভিতরে ভোগ করবার কোনও বৃত্তি থাকবে না। 'ভোগের গতি রহিত হলে আসবে ভক্তি।' ভোগটা কী? ঐ যে আমরা পৃথক করে কিছু পেতে চাইছি! 'অহংকার করে ভোগ, ত্বংকার করে ত্যাগ, আর পুরুষোত্তম গ্রহণও করেন না, বর্জনও করেন না, তর্জনও করেন না এবং গর্জনও করেন না। তাঁর নিত্য সমদরশন। অর্থাৎ তিনি সাক্ষিরূপে সব দেখেন।' কিন্তু তা তো অনেক উন্নত অবস্থার কথা। ব্রহ্ম কোনও কাজ করে না, আত্মা কিছু করে না। তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর যে existence that is enough for the central nature, inner nature and outer nature। ঈশ্বরের অস্তিত্ব কার উপরে নির্ভর করছে? সেই ব্রহ্ম-আত্মার উপরে। তাঁ নিত্য স্থির—"নিত্য সর্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।" অর্থাৎ তাঁর কোনও গতি নেই, গতাগতিরহিত বা গতিশূন্য। আকাশেরও কোনও গতি নেই। ব্রহ্ম হচ্ছে চিদাকাশ চিদম্বরম্ সম্বিদাকাশ। এই ভূতাকাশ দিয়ে কিন্তু তা কল্পনায় আনা মুশকিল। কিন্তু এই আকাশ দিয়েই তাঁকে নির্দেশ করা হয় উপলব্ধির সুবিধার জন্য। আকাশ যেমন স্বচ্ছ, নির্মল, সর্বব্যাপী ও অখণ্ড, বোধসত্তাও ঠিক এরকমই—just like that sky, it is infinite One, all-pervading, transparent and all-perfect। তাঁর এই perfection-এর জন্য, অখণ্ডতার জন্য, পূর্ণতার জন্য দ্বিতীয় কোনও বস্তুর প্রয়োজন হয় না। That verily is Purushottam.

এই পুরুষোত্তম হল সৎ, অর্থাৎ সবসময়ই বর্তমান; চিৎ অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশমান; আনন্দ অর্থাৎ পূর্ণ। এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ যা নিজের পরিচয় তা-ই হচ্ছে পুরুষোত্তমের পরিচয়, অহংদেব পাকা আমি-র পরিচয়। সেই পরিচয় যে কী করে পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে 'এ' ভিন্ন ভিন্ন দিন কিছু কিছু কথা বলছে যাতে তোমাদের মনের ভিতরে আস্তে আস্তে সেই কথাগুলির ছাপ পড়ে এবং তার সত্যস্মৃতি জেগে ওঠে। শোনা কথাটা মনে পড়ে, দেখা জিনিসটা মনে পড়ে। এই ভাবে একটা স্মৃতি বা memory তৈরি হয়। এই কথাগুলোর থেকে ভিতরে একটা memory তৈরি হবে, স্মৃতি তৈরি হবে। সেই স্মৃতি ব্যবহার করে তা মানুষ অনুভব করবে। তাই শ্রুতি হচ্ছে সর্বোত্তম বিদ্যা। পরাবিদ্যার নাম হচ্ছে শ্রুতি। তা হল বোধের ঘরে বোধের বিজ্ঞান। সেইজন্য আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় হল দর্শনেন্দ্রিয় থেকে শ্রেষ্ঠ। কোন ইন্দ্রিয়ের থেকে

কোন ইন্দ্রিয় যে শ্রেষ্ঠ তাও কিন্তু আমরা জানি না। কেন না এই শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দেবতা হচ্ছে সর্বদিক—all directions, all corners of the creation, সে-ই হল দেবতা। আর চোখের দেবতা হচ্ছে the sun,সূর্য। সূর্য সবকিছুকে প্রকাশ করছে। চোখও আমাদের সবকিছুকে প্রকাশ করছে। 'এ' আজকে সেই প্রসঙ্গে আসবে না। সমস্ত অধ্যাত্ম অনুভূতি শুধু এইটুকুর (চোখকে নির্দেশ করে) মধ্যে আছে, সর্বাঙ্গে যেতে হবে না, শুধু এটুকুর মধ্যেই নয়, একটা চোখের মধ্যেই আছে। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ অতি সূক্ষ্ম এবং জটিল, তা মাথায় সহজে ঢুকবে না। তার পূর্বের স্তর সম্বন্ধে কিছু কথা বলা হলে তবেই অনেকদূর এগোতে পারবে মানুষ।

আমাদের অনুভূতির সীমা যদি আমরা শুধু বত্রিশ হাজার সূক্ষ্ম ভাব বৃত্তির মধ্যে রেখে দিই, যেমন গতানুগতিক সারা পৃথিবীর মানুষ রেখেছে, তাতে কিন্তু কোনও বিশেষ ফল হবে না। তাদের মধ্যে ক'জন মানুষ এই সীমার বাইরে যেতে পারছে? যদিও বা কেউ যায় তা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু যখন সে এমন কোনও মানুষকে দেখে তখন ভাবে, হায় হায় আমি তো এর কাছে গিয়ে কূল পাচ্ছি না! তখন সে বাধ্য হয়ে তা মানে, এমনিতে সে মানতে রাজি নয়। 'একে' বহু লোকই মানতে রাজি হয়নি। কিছু কিছু লোক যারা মানছে তারা অনেকেই বাধ্য হয়ে মেনেছে। তারা 'একে' দেখে ভেবেছে, ওঁনার ব্যাপারটা অন্যরকম, আমরা গতানুগতিক যা দেখি তেমন নয়! অথচ ওঁনার কাছে এমন অনেক দুর্বোধ্য জিনিস আছে, এগুলো উনি পেলেন কোথা থেকে? বাধ্য হয়ে তারা একটুখানি মানে, কিন্তু এই মানাতে 'এ' কিন্তু একটুও gratified নয়। 'এ' চাইছে সে নিজেকে মানুক ঠিক ততখানি, তার চাইতেও বেশি করে। এই আমিকে আবিষ্কার করুক তার নিজের আমি-র মধ্যে সমস্ত দোষ-গুণ রহিত হয়ে, free from all merits and demerits—'neither this nor that, neither that nor this, but all at ease'। কী করে? আজকের গানটার মধ্যে সেই ইঙ্গিত দেওয়া আছে।

এই গানগুলো হচ্ছে formula। এই formula-কে মানুষ বুঝতে পারছে না, মানুষ তা চর্চা করতে রাজি নয়। কথাগুলোর মধ্যে কী আছে তা কেউ ভাবতে চায় না। সুরটাও তো sound, কথাটাও sound, তার সঙ্গে সংগীত হয় কখন? শব্দ তালের সঙ্গে যখন যুক্ত হয়, লয়ের সঙ্গে যখন যুক্ত হয় তখন তা একটা নূতন রূপ ধারণ করে। সব শব্দই কিন্তু শ্রুতিমধুর নয়। ঐ যে বলা হল, common people-এর কাছে বিকট শব্দটাই প্রিয়। তার প্রমাণ হল, দেওয়ালির সময় যে বাজিগুলো ফাটানো হয়। আগে কিন্তু এই নিয়ম ছিল না। দেওয়ালিতে বা দীপাবলীতে আলো জ্বালাবার কথা। তা হল work of fire or light। দুর্গাপুজোর সময় থেকে আমরা কী দেখছি? মাতৃপক্ষ। মাতৃপক্ষ কীসের জন্য? দেবতাশক্তি তখন আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে, সেই সময় শক্তি নিস্তেজ হয়, তাকে সক্রিয় করার প্রয়োজন হয়। শীতের আধিক্যে শৈত্যের জন্য, তাপের অভাবে সব জড়ীভূত হয়ে যায়। 'এ' সংক্ষেপে বলছে কথাগুলো। সেইজন্য শীতকালে মানুষের জড়তা বেড়ে যায়, নিস্তেজ হয়ে আসে। সেই কারণে activity বাড়াতে হয় শীতকালে। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা সেইজন্য বেশি পরিশ্রমী।

তারা শীতকে face করে maximum। আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকেদের গরমে perspiration বেশি হয়, ঘর্ম বেশি হয়, তার ফলে তারা অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তাই তারা ঘুমায় বেশি। তারা যে ভাত খায় বা যে খাবার খায় তাতে ঘুমটা বেশি আসে এবং কর্ম করে কম। 'এ' statement of fact বলছে, কারওকে লক্ষ্য করে কিছু বলা হচ্ছে না। কিন্তু অনেকেই হয়ত নিজের সঙ্গে তা মিলিয়ে ভাববে যে, আমি তো এগুলোর মধ্যে পড়ছি, তাহলে আমাকে উদ্দেশ করেই উনি কথাগুলো বলছেন! যদি তা-ই সে বোঝে তাহলে সে নিশ্চয়ই সাবধান হবে আরও বেশি।

এই যে পিতৃপক্ষের পরে মাতৃপক্ষ আরম্ভ হল, তার মানে শক্তি তখন নিজেকে expand করছে। সেইজন্য শক্তির পূজাগুলি আরম্ভ হয় মহালয়া থেকে। শক্তির পূজা—male God নয়, female Goddess। এই মহালয়া থেকে আরম্ভ হল upto সেই নীলের পূজা ও চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত। তার পরে আবার male God-এর পূজা আরম্ভ হয় নীলের পূজা থেকে। এর পিছনে বিরাট বিজ্ঞান রয়েছে যা কি না বিজ্ঞানজগতের লোকেদের মাথাতেই ঢুকবে না, ধর্ম তো বাদ দেওয়াই হল। এই কথাগুলো স্মরণ করাবার জন্যই এখানে মাঝে মাঝে আসতে হয়, ফলে সেই কথাগুলো মানুষ শুনতে পায়। তাই হল মানুষের কাছে সবচাইতে বড় grace from the Almighty. Grace মানে ঐ যে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করা, তা নয়, কোনও তুকতাক বা ক্রিয়াকলাপের ব্যাপার নয়, তা যথার্থ grace নয়। Grace হল তোমাকে এই যে বোধের আলো দেওয়া হচ্ছে—that which is the essence of all understandings, যার অভাবে মানুষকে দুঃখকষ্ট বা দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে। Right understanding থাকলে তোমার কিছুই ভোগ করতে হবে না, at ease আসবে সবকিছু। এই যে মাতৃকাশক্তির, সব দেবদেবীর পুজো, তার মানে ক্রমশ সূর্য দক্ষিণের দিকে হেলে যাচ্ছে সেই মহালয়ার পর থেকে, আর উত্তরদিকে ঠাণ্ডাটা বেড়ে যাচ্ছে। উত্তরে হচ্ছে হিমালয়, মানে সেখানে শৈত্য বাড়ছে। তার ফলে শীতের যে প্রভাব, শীতের হাওয়া এসে সবকিছুকে cover করছে, সবকিছু জড়ীভূত হয়ে যাচ্ছে। এই প্রাণের চেতনাও কিন্তু নিস্তেজ হয়ে আসছে এবং অনেক প্রাণী আছে যারা শীতকালে একেবারে জড়সমাধিতে অর্থাৎ জড়ীভূত হয়ে যায়। তখন তাদের প্রাণের স্পন্দন কমে যায়। তাকেই pseudo বলছে এই জন্য যে, বরফের মধ্যে অনেক প্রাণী ঢাকা পড়ে যায়, মরে যায় না কিন্তু সব, কিছু মরে এবং কিছু থাকে। আবার যেই সূর্যের উত্তরায়ণে তাপে বরফ গলে তখন তারা আস্তে আস্তে অন্য জায়গায় চলে যায়। সাপ, ব্যাঙ—এরকম অনেক প্রাণী আছে যারা বরফের মধ্যে তিন মাস তো থাকতেই পারে, চার মাসও পারে, পাঁচ মাসও পারে।

এরকম মানুষও আছে। এই কথা সভ্য মানুষ বিশ্বাস করবে না। এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁরা হিমালয়ে বাস করেন, যাঁদের কোনও বস্ত্র নেই শরীরে, কোনও বস্তুই নেই তাঁদের। তাঁরা বরফের মধ্যে বাস করেন। তাঁদের ঘুম খুব কম, তবে কখনও কখনও শরীরটাকে যদি নাড়াতে হয় তবে একটু বরফ খুঁড়ে নেন এবং কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকেন। আমাদের মতো আরাম, বিছানা কল্পনারও বাইরে। কিন্তু তাতে এই mean করে না

যে তা হলেই যেন perfection হবে, not that। তাঁরা একটা capacity অর্জন করেছেন, যেমন ঠাণ্ডাকে সহ্য করা ইত্যাদি। আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে গেলে সবরকম দুঃখকে বরণ করতে হবে। তোমরা কল্পনায় আনতে পারবে না তাঁদের কঠোর তপস্যা। তিব্বতে যে লামারা থাকেন তাঁরা কঠোর তপস্যা করেন। যে লামা হয় অর্থাৎ Lamahood একটা কঠোর তপস্যার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়। এখনকার মতো অমুককে দীক্ষা দিয়ে দিল, তার পরে সন্ন্যাস দিয়ে দিল—ওই রকম ব্যাপার নয়। মানে শীত আর গ্রীষ্ম এই দুটোকে সহ্য করার জন্য কঠোর তপস্যা করে, যিনি গুরু তিনি শিষ্যকে এই ভাবে তৈরি করেন। তাকে ঠাণ্ডার বিভিন্ন মাত্রায় রেখে তৈরি করে নেন। Zero degree থেকে আরম্ভ করে শিষ্যকে বিভিন্ন temperature-এ তৈরি করেন। সেই zero degree-তে তো বরফ এমনিই জমে যাবে। সেই বরফের মধ্যে তাকে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হবে। প্রথমে তিন ঘণ্টা, তার পরে ছয় ঘণ্টা, তার পরে বারো ঘণ্টা, তার পরে আঠারো ঘণ্টা, তার পরে চব্বিশ ঘণ্টা। তার পরে আরও below temperature-এ শিষ্যকে তৈরি করে নেন। মানে বরফে ঢাকা যেমন মাছ আমরা রাখি ঠিক সেরকমভাবে। সাধনভজন করে মানুষ! আবার গরমের মধ্যে কীরকম ভাবে থাকে তারা জান? ঐ lukewarm থেকে আরম্ভ করে boiling temperature পর্যন্ত, তার পরে আরও heat বাড়িয়ে দেন। তাতে ফোসকা পড়ে যাবে শরীরে। এই ভাবে তিন ঘণ্টা থেকে আরম্ভ করে ছয় ঘণ্টা, বারো ঘণ্টা, আঠারো ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টা গরমের মধ্যে রাখেন। চব্বিশ ঘণ্টার পরে যদি মরে যায় তাহলে সে unfit, disqualified, আর তা না-হলে সে qualified। এখানে কোনও খাতির নেই, কোনও favouritism নেই। সে যখন সহ্য করে বেরিয়ে এল, ভাব তার ভিতরে কী পরিমাণ শক্তি conserved হল। জগৎকে সে যে জ্ঞান দেবে সেই স্বার্থ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, পুড়ে গিয়েছে বা শেষ হয়ে গিয়েছে। স্বার্থ বলে কোনও বস্তু নেই তাঁর কাছে। অথচ for the well being of all people, জগতের সবাব জন্য সে নিজেকে dedicate করছে—"বহুজনহিতায়চ বহুজনসুখায়চ"। কী অপূর্ব! ভাবতে পারা যায় না! তাঁরা মুক্তির ধার ধারেন না। কারণ মুক্তি হল একটা কল্পনামাত্র তাঁদের কাছে। ভাবতে পার! আমরা যে কোথায় পড়ে আছি, কোন তিমিরে অন্ধকারে টিমটিম করে জোনাকি পোকার মতো, আর তাই নিয়ে রাতদিন কতরকম আমাদের মানসিক অশান্তি, দৈহিক অশান্তি। এটা সভ্যতা নয়।

পূর্ণতা হল full of light যেখানে দুঃখবোধ থাকবে না, কষ্টবোধ থাকবে না, যা ভাবাতীত দ্বন্দ্বাতীত ভেদাতীত গুণাতীত শাশ্বত প্রশান্ত অনন্ত অচ্যুত। প্রশান্ত মানে একেবারে শান্ত, tranquil and pacific। আকাশের মতো শান্ত সমাহিত, "নিশ্চলোঽয়ং সনাতনঃ"। এই আমি কী? নিশ্চল অচল অটল। ব্রহ্মের আমি অচল অটল under all circumstances, তার বক্ষে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ওঠে ভাসে ডোবে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না তার। কাজেই এই যে সহ্যশক্তি দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধির, সমস্ত জিনিসকে সহ্য করে সে অনুভব করছে যে—I am in everything। সহ্যশক্তি কোথা থেকে আসবে? I am the heat, I am the cold। সবটাই আমি। 'এ' কয়েকটা ছোট ছোট example বলছে, সবটা সবার কাছে বলা সম্ভব নয়।

দেহ থেকে যখন দুবার 'এ' বেরিয়ে গিয়েছে মাথা ভেদ করে, একটা light যেন বেরিয়ে গেল, আমি যেন বেরিয়ে যাচ্ছি। শয্যার চারপাশে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, কান্নাকাটি করছে, কিন্তু 'এ' ঘরের দেওয়াল ছাদ ভেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে উপরের দিকে just like a rocket. This is My personal experience. Rocket-এর মতো বেরিয়ে যাচ্ছে, উপরে rocket-এর মতো উঠছে তো উঠছেই। এসব কেউ বিশ্বাস করবে না! সূর্যের মধ্যে দিয়ে 'এ' ভেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কী light সূর্যের! কী তাপ! সে সম্বন্ধে তোমাদের আর কী বলব! তার মধ্যে দিয়ে 'এ' চলেছে। নক্ষত্রলোকে সাতাশটা নক্ষত্র আছে। এই সাতাশটা নক্ষত্রকে control করে চাঁদ। আবার চাঁদকে control করে সূর্য। এ খুব জটিল বিজ্ঞান! যাই হোক, এই সাতাশ নক্ষত্রের মধ্যে সব চাইতে দূরে এবং সবচাইতে বড় যে নক্ষত্র, তার নাম জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র। সেই জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের জ্যোতি আমাদের এই পৃথিবীতে আসতে অনেক আলোকবর্ষ লাগে। আলোকবর্ষ মানে light year ব্যাপারটা সবাই বুঝবে না, যারা বিজ্ঞান চর্চা করে তারা হয়ত একটু বুঝবে। সূর্য ছাড়াও অন্যান্য নক্ষত্রের যে light আমরা পৃথিবী থেকে দেখছি তার আমাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই কারণ নক্ষত্রগুলোর সবার দূরত্ব পরস্পরের থেকে পৃথক। সেই দূরত্ব অতিক্রম ক'রে এই light পৃথিবীতে এসে পৌঁছোতে সময় লাগে অনেক। এই নক্ষত্রগুলির আলো পৃথিবীতে আসতে যে সময় লাগে তার হিসাব light year দিয়েই নির্ণয় করা হয়। কোনও কোনও নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে পৌঁছোতে হাজার, লক্ষ, কোটি বছরও লাগে। সূর্যের মতো কয়েক লক্ষ সূর্য এই জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের মধ্যে রেখে দেওয়া যায়। এগুলো মানুষকে বোঝানো খুবই কঠিন! How is it possible? It is difficult to explain! যদি বুঝবার মতো কারও সেই ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকে তবে সে নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে follow করতে পারবে। যেভাবে 'এ' follow করেছে, সেভাবেই follow করবে সে। এই জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের কাছে গিয়ে 'এ' থেমে গেল এবং 'এর' সঙ্গে সঙ্গে আরও তিনটে light 'একে' guide করে নিয়ে চলল। তাদের সঙ্গে 'এও' চলছে, কেউ কাউকে কিন্তু কোনও রকমভাবে ব্যবহার করছে না। তারা 'এর' পাশেই রয়েছে। সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ থাকবার পর আবার ফিরে আসা হল, ঠিক সেই পথেই যে পথে যাওয়া হয়েছিল। সেই পথে আস্তে আস্তে নেমে এসে আবার 'এই দেহের' মধ্যে প্রবেশ করা হল। সবাই তখন কান্নাকাটি করছিল। কিন্তু যখন আবার 'এই শরীরে' pulsation জেগে উঠল তখন চোখের পাতা কাঁপছিল, জিভটা নড়ছিল, অন্য কোনও sensation বোধ হচ্ছিল না, কিন্তু 'এ' পূর্ণ সচেতন। এটা 'এ' কী দিয়ে বোঝাবে সবাইকে?

'এ' কিন্তু কিম্ভূতকিমাকার কোনও কথা তোমাদের কাছে বলছে না, কোনও miracle-এর কথাও বলছে না। This is direct experience, যা ঘটেছে ঠিক তা-ই বলা হচ্ছে। এরকম দুবার হয়েছিল। যাই হোক, 'একে' অনেকেই প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি সূর্যের মধ্যে জ্বলে পুড়ে গেলেন না? আপনি সূর্যের মধ্যে কী করে গেলেন? উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, 'এ'

সূর্যের সঙ্গে identified হয়ে গিয়েছিল। আর 'এ' যে পথে গিয়েছিল তা শীতল পথ অর্থাৎ সূর্যের মধ্যে একটা শীতল পথ আছে। সূর্য হচ্ছে একটা অগ্নিপিণ্ড, আগুনের মধ্যে জল আছে। এই যে পাঁচটা ভূত অর্থাৎ আকাশ, বাতাস, অগ্নি, জল, পৃথিবী—এগুলো সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, এগুলোকে আমরা দেখতে পাই না। তা পরস্পর মিলিত হয়ে স্থূল পঞ্চভূত তৈরি হয়েছে। সেই স্থূল পঞ্চভূত থেকে আর কী কী হয়েছে? তার সঙ্গে তিন গুণ রয়েছে। আকাশ যা সূক্ষ্ম, সেই আকাশকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সূক্ষ্ম পঞ্চভূত অতীন্দ্রিয়। পঞ্চীকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে তা স্থূল পঞ্চভূতে পরিণত হয়। এই পঞ্চীকৃত পদ্ধতি হল—সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে দুই ভাগে বিভক্ত করে তার এক ভাগকে ভিত্তি করে অন্য ভাগের এক অষ্টমাংশকে যোগ করে স্থূল পঞ্চভূত তৈরি হয়। যথা—দ্বিধা বিভক্ত সূক্ষ্ম আকাশের একভাগের সঙ্গে অর্থাৎ সূক্ষ্ম আকাশের ১/২ + সূক্ষ্ম বায়ুর ১/৮ + সূক্ষ্ম অগ্নির ১/৮ + সূক্ষ্ম জলের ১/৮ + সূক্ষ্ম পৃথিবীর ১/৮ = স্থূল আকাশ। এইভাবে অন্যান্য সূক্ষ্ম ভূতগুলি স্থূল ভূতে পরিণত হয়। এটা অঙ্কের বিষয়। স্থূল পঞ্চভূতে তৈরি এই স্থূল জগৎ। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে তৈরি সূক্ষ্ম জগৎ। জীবের স্থূল দেহ স্থূল পঞ্চভূতে গঠিত, সূক্ষ্ম দেহ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে গঠিত এবং কারণ দেহ সমষ্টি অজ্ঞান অব্যক্ত। কিন্তু আত্মা দেহাদি সর্ব গুণ-উপাধিমুক্ত।

এই স্থূল জগৎ দেখবার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো তৈরি হয়েছে কী করে? সূক্ষ্ম ভূতের থেকে। সূক্ষ্ম আকাশ এই পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশে তৈরি অর্থাৎ পঞ্চভূতের সঙ্গে সত্ত্বগুণ যুক্ত হয়ে হয়েছে আমাদের মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ। আর প্রত্যেকটি ভূতের সাত্ত্বিক অংশ থেকে তৈরি হয়েছে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, যেমন আকাশের থেকে তৈরি হয়েছে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়, বায়ু থেকে তৈরি হয়েছে আমাদের স্পর্শনেন্দ্রিয়, অগ্নি থেকে তৈরি হয়েছে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়, আর জল থেকে তৈরি হয়েছে আমাদের রসনা বা tongue আর পৃথিবীর সূক্ষ্মসাত্ত্বিক অংশ থেকে তৈরি হয়েছে ঘ্রাণেন্দ্রিয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় হল শব্দ, স্পর্শনেন্দ্রিয়ের হল স্পর্শ, দর্শনেন্দ্রিয়ের হল রূপ, রসনার হল রস এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের হল গন্ধ। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হল যথাক্রমে কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা। তার রাজসিক অংশ থেকে আবার কী তৈরি হয়েছে? সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সমষ্টি রজোগুণ যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে পঞ্চপ্রাণ এবং পৃথক পৃথক সূক্ষ্মভূতের রাজসিক অংশে তৈরি হয়েছে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় যথা আকাশের রাজসিক অংশ হতে বাক্, বায়ুর রাজসিক অংশ হতে পাণি, অগ্নির রাজসিক অংশ হতে পাদ, জলের রাজসিক অংশ হতে উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) এবং পৃথিবীর রাজসিক অংশ হতে পায়ু (মল-মূত্র দ্বার)। আবার সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সমষ্টির তামসিক অংশে তৈরি হয়েছে স্থূল দেহ ও পৃথক পৃথক সূক্ষ্মভূতের তামসিক অংশে তৈরি হয়েছে পঞ্চতন্মাত্র, যথা—আকাশের শব্দ, বায়ুর থেকে স্পর্শ, অগ্নি থেকে রূপ, অপ্ থেকে রস, পৃথিবী থেকে গন্ধ। আকাশের রাজসিক অংশ থেকে তৈরি হয়েছে আমাদের প্রাণশক্তি,

বায়ুর রাজসিক অংশ থেকে তৈরি হয়েছে কর্মেন্দ্রিয়। অগ্নির রাজসিক অংশ থেকে তৈরি হয়েছে আমাদের ভিতরের digestive power, জলের রাজসিক অংশ থেকে তৈরি হয়েছে আমাদের kidney-র function এবং stomach function। তামসিক অংশ থেকে তৈরি হয়েছে আমাদের স্থূল দেহ। এইরকম combination-এর একটা হিসাব আছে। সেগুলো বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে।

আমি-র পরিচয় জানা হয়ে গেলে অহংকার আর প্রধান থাকে না। তখন সেই আমি সবকিছুর সঙ্গে অনায়াসে মিশতে পারে, চলতে পারে, কোনও কিছুই তাকে অতিক্রম করতে পারে না। তবে জগতের কল্যাণের জন্য কোনও মহাপুরুষ যদি চান কিছু করতে তবে তিনি করতে পারেন, আবার যদি না-চান, কিছু না-করেন—দুটোই সমান তাঁর কাছে। কেউ করেন, কেউ করেন না। কিন্তু করেন না বলে অনেকে আবার অভিযোগ করে, অথচ যারা অভিযোগ করছে তারা কিন্তু এর বিন্দু বিসর্গ কিছুই বোঝে না। তারা শুধু স্বার্থটা বোঝে। তারা মনে মনে অভিযোগ করে, কেন দেবেন না? তাঁর আছে যখন তখন দেবেন না কেন? তোমার থাকলেই কি তুমি দেবে? কতটুকু তুমি দেবে? Out of pity তুমি হয়ত ছিটেফোঁটা কারওকে দেবে, কিন্তু তুমি কি সবটাই দেবে? কাজেই এই যে আমাদের কর্ম, দান, ধ্যান এটাও সীমিত। এর মধ্যে আবার তিন প্রকার আছে—তামসিক, রাজসিক এবং সাত্ত্বিক। এই প্রসঙ্গ খুব কঠিন নয়, কিন্তু সময়সাপেক্ষ, অত সময় তো পাওয়া যাবে না। এই যে শ্রেষ্ঠ বস্তু আমরা চয়ন করি, তার আসল মাপকাঠিটা কোথায় পাওয়া যাবে? শৈশব থেকে আমাদের পছন্দ অনুযায়ী আমরা চলি প্রত্যেকেই। এই পছন্দ বাড়তে থাকে, আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে যায়, আরেকটা নূতন জিনিস পছন্দের মধ্যে আসে। কিন্তু এই পছন্দ করতে করতে শেষ পর্যন্ত কবে আসবে সেদিন, যেদিন চাইব আমি পূর্ণ করে অখণ্ডরে? খণ্ডকেই চাইছি আমরা প্রতিমুহূর্ত। কাজেই 'এর' বক্তব্য হল Absolute-কে নিয়ে, বিশ্বকে নিয়েও নয় বা universal-ও নয়, transcendental এবং তারও উপরে trans-transcendental—'নিত্য অদ্বৈতম্'। সেখানে কোথায় জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি স্পর্শ করবে তোমাকে?

এই কথাগুলো শুনে ভয় পেয়ে যেও না। এগুলো হারিয়ে বসে আছ সবাই, ভুলে বসে আছ সবাই, তাই মার খাচ্ছ। ভুলটা ভাঙতেই হবে। না-চাইলেও তোমাকে ভুল আপনিই ভাঙাবার জন্য ব্যবস্থা করবে কে? মহাপ্রকৃতি ছাড়বে না! ঘুরিয়ে মারবে তাকে, যেমন অর্জুনকে বলা হয়েছিল, তুমি যুদ্ধ করবে না? যুদ্ধ তোমার স্বভাব করিয়ে নেবে, যাবে কোথায়! তুমি ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্মেছ, ক'টা বাণ খাবে খাও না। বিপক্ষ যখন তীর ছুঁড়ে তোমাকে জর্জরিত করবে তখন তুমি যুদ্ধ করতে বাধ্য হবে বাঁচবার জন্য। আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থা। যখন বিপদে-আপদে পড়ি তখন আমাদের পছন্দ ছুটে চলে যায় কোথায়। এক পরিবারে একজন লোকের কতগুলো শুচিবাই ছিল, যেমন অনেকেরই থাকে। সেই শুচিবাইয়ের

জন্য পরিবারের সবাই খুব মুশকিলে পড়ত। অনেকরকম বাই থাকে মানুষের। এরকম একজন লোকের একটা বাই ছিল, মানে mania ছিল। সেইজন্য বাড়ির লোকেরা খুব মুশকিলে পড়ত। শেষপর্যন্ত তারা বিচার করে দেখল যে, একসঙ্গে থাকা সত্যিই মুশকিল। এই বাইয়ের জন্য কী হল শেষে? বাড়ির লোকেরা সব বিভক্ত হয়ে গেল, ভাগ হয়ে গেল, পৃথক হয়ে গেল। সংসারে আমাদেরও ঠিক এইরকম এক একজনের এক একরকম বাই থাকে। এটাই হল অবিদ্যা যা সংসারকে ভেঙে দেয়। আবার বিদ্যা যা সংসারকে গড়ে তা হল সংসার স্থিতিকারিণী। তা হল ঈশ্বরীয়শক্তি বা দিব্যশক্তি। আর অদিব্যশক্তি হল মায়াশক্তি। এই অবিদ্যাশক্তি কীরকম? তামসিক আর রাজসিক। বিদ্যাশক্তি হল সাত্ত্বিক এবং পরাবিদ্যা হল শুদ্ধসাত্ত্বিক। প্রত্যেকের ভিতরে এই জিনিসগুলো সাজানো আছে স্তরে স্তরে। সাধনভজন করতে করতে এক একটা করে স্তর খুলে যায়। কাজেই এক এক স্তরে কিছুটা capacity বাড়ে, তাকেই বলা হয়েছে সিদ্ধি। সিদ্ধি মানে partial perfection, not integral or absolute perfection. Absolute perfection-কে বলা হয় পরাসিদ্ধি। সাধনসিদ্ধিকে যখন সাধক সমর্পণ করে দেয় তখনই পরাসিদ্ধি লাভ হয়। তা কেউ দিতে চায় না, নিজে ব্যবহার ক'রে বাহাদুরি নিতে চায় এবং পরিণামে যোগভ্রষ্ট হয়ে অশেষ দুর্গতি ভোগ করে।

এই যে সাধুসন্তরা সাধনভজন করে যা লাভ করেন তা আবার জমা দিয়ে দিতে হয়, কিন্তু অনেকেই তা করেন না। এত কষ্ট করে সিদ্ধি লাভ করলেন আর তা ব্যবহার করবেন না। লোককে দেখিয়ে লোকের কাছে কৃতিত্ব নেবেন না। কিছু করতে পারার বৃত্তি পরাসিদ্ধির মধ্যে থাকে না। Absolute perfection-এ কখনও এইরকম স্বার্থের কথা থাকে না, অহংকারের কথা থাকে না—সেখানে অহংদেব নিত্যবর্তমান। Everything verily is I-Reality—কাকে দেখাবে? কী দেখাবে? কার জন্য করবে? কী করবে? কেন করবে? When He himself or She herself is the only Reality! কথাগুলো কতখানি গভীরে চলে যাচ্ছে তা ভাববার চেষ্টা কর। Outer, inner ছেড়ে, central ছেড়ে একেবারে transcendental-এর দিকে যাচ্ছে। আমরা ঘুমিয়ে আছি। কোথায়? ঘুমঘোরে। একটা গানে আছে—'শোন শোন মন আর কতজনম ঘুমঘোরে থাকবে অচেতন।' আমরা অচেতন হয়ে আছি। জড় বস্তুর সেবা করছি অচেতন বলে। চেতন হলে চেতন বস্তুর সেবা করব। চেতন বস্তু কী? তা হল Consciousness। জড় বস্তু মানে matter। কাজেই ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলে, 'তোমার চরণ ছাড়া করো না মোরে।' এটা একটা স্তরের ভক্তি। ভগবানের চরণ ছাড়া হবে কী করে? ভগবানের চরণ তো সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, everywhere, He is all-pervading। তাঁর চরণ ছাড়া হব—এটাও তাহলে একটা কল্পনা। ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলে—'সেদিন আমার কবে হবে তারা, তারা তারা তারা বলে দু'নয়নে বইবে প্রেমধারা।' Cataract operation-এর পরে অনেকের চোখ দিয়ে সমানে জল ঝরে। তারাও তো মাঝে মাঝে 'তারা, তারা' বলে, তাহলে তারা তো নিশ্চয়ই সেই ভক্তির স্তরে পৌঁছে গিয়েছে!

একজন 'একে' একবার বলেছিল যে, বাবাঠাকুর তুমি কি আমাদের আঘাত না-দিয়ে কথা বলতে পার না? উত্তরে তাকে বলা হয়েছিল, না, 'এর' কাছে এই আঘাতের অর্থ অন্যরকম। আনন্দসাগরে আনন্দই শুধু লীলা করে, ওঠে, ভাসে, ডোবে। একটা আনন্দের তরঙ্গের সঙ্গে আরেকটা আনন্দের তরঙ্গ এসে যখন স্পর্শ করে তা একটা আঘাত। তখন সে বলল, তুমি কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাও। তখন তাকে বলা হল, হ্যাঁ চল। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনকে রাঙিয়ে নিয়ে তুমিও চল। দেখ 'এ' কোথায় বাস করে। এই তো কৃষ্ণের বাঁশির ডাক। কিন্তু তা কে শোনে। সেই গোপী কই যে সেই স্বর শুনে গৃহ ছেড়ে সেই দিকে ছুটবে। মনের গতি বাইরের থেকে কেন্দ্রের দিকে ছুটবে কখন? সবার মনের গতি কেন্দ্রের থেকে বাইরের দিকে। কারণ সংসার তো বাইরে, অন্তরে তো সমসার। সমসার আসবে কোথায়? কখন? তাই কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন যে, গোবিন্দ তোমাকে কী আর বলব, তুমি তো অন্তর্যামী, সবই জান। তবু তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, কী তোমার প্রার্থনা? তখন কুন্তী বলেছিলেন, তুমি আমাকে সবসময় দুঃখের মধ্যে রেখ, খুব দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে রেখ। এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, সে কী পিসিমা। তুমি আমার কাছে একটা ভাল জিনিস চেয়ে নেবে তা নয় তুমি আমার কাছে এ কী চাইলে? তখন কুন্তী বলেছিলেন, হ্যাঁ এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। কৃষ্ণ তো প্রথমে তা দিতে কিছুতেই রাজি নন। তিনি কুন্তীকে বোঝালেন, আমি সারাজীবন তোমাকে দুঃখ দিতে পারব না। এ তুমি কী বলছ! তখন কুন্তী বললেন, তাতে কী এসে গিয়েছে! গোবিন্দ আমি ভেবেচিন্তেই বলেছি। দুঃখের মধ্যে থাকলে তোমাকে মনে থাকবে, আরামে বা সুখের সময় তোমাকে আমি ভুলে যাব। এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের তখন অদ্ভুত লাগছিল এই ভেবে যে, এইরকম প্রার্থনা তো আমার কাছে কেউ কোনওদিন করেনি। তাহলে তোমরা ভেবে দেখ মানুষের মনের কতরকম গতি।

সবই কিন্তু সেই অখণ্ড সাগরেই আছে। ব্রহ্ম-আত্মার বক্ষ ছাড়া কেউ নেই, কিন্তু সেই বক্ষে থেকেও দেখ কী কাণ্ডকারখানা। কাজেই এই যে আমাদের জীবনের পরিচয়, তা যেন একবিন্দু জলের মতো। কারণ সাগরবক্ষে তরঙ্গ লহরী ওঠে, ভেঙে চুরে বুদ্‌বুদ্ সাজে কিছুক্ষণ থাকে, তারপর লয় হয়ে যায়। বুদ্‌বুদ্ কিন্তু সাগরের বক্ষেই থাকে, কিন্তু সাগরকে সে জানে না। এই জীব কিন্তু পরমাত্মা শিবের বক্ষেই আছে, কিন্তু তাঁর সত্য পরিচয় সম্বন্ধে অবগত নয়। শক্তির বক্ষেই সে আছে, কিন্তু শক্তিকেও সে জানে না। 'মুখে সে নানাকথা বা মা, মা বলে বটে, কিন্তু অন্তরে তার cinema।' কাজেই কোনও ফল হয় না। অন্তরেও মা, মুখেও মা—এই দু'টো তো এক সুরে আসে না। কাজেই ঐ যে পছন্দটা তা ভাঙতে ভাঙতে গিয়ে কোথায় চলে যাবে। তা সেই বিরাটের সঙ্গে মিশে যাবে। বিরাটের থেকেও সে চলে যাবে। অর্থাৎ আমরা যেগুলো শক্তিরূপে দেখি এগুলো জ্ঞানের বক্ষে জ্ঞানেরই স্ফূর্তি, আবার

জ্ঞানেই-তার পরিসমাপ্তি। All matter will reduce to energy or power, and all energy will meet and culminate into Consciousness again. পরিপূর্ণ এই গতিকে দর্শন করার মানেই হচ্ছে ধর্মদর্শন। ধর্মচক্র কথাটা আমরা শুনি। ধর্মচক্র কী? কে ধারণ করে রেখেছে কাকে? ধর্ম তা ধারণ করে রেখেছে। আত্মা আত্মাকেই ধারণ করে রেখেছে। অনাত্মা বলে তো কিছু নেই। কিন্তু মন জানে অনাত্মা আছে, কেননা মনের সীমা ও অভাববোধ আছে। সেইজন্য আত্মাকে সে অনাত্মারূপে দেখে, নিজেকে সে বিভক্ত বা ভাগ ভাগ রূপে দেখে, আনন্দকে সে নিরানন্দরূপে দেখে, শান্তিকে সে অশান্তিরূপে দেখে, অমৃতকে সে মৃত্যুরূপে দেখে, জ্ঞানকে সে অজ্ঞানরূপে দেখে, নিত্যকে অনিত্যরূপে দেখে এবং পূর্ণকে অপূর্ণরূপে দেখে। এই হল অহংকার আর মনের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ জীবের বিশেষত্ব। সেইজন্য তার steering-টা ঘুরিয়ে দেন কে? আত্মজ্ঞগুরু। তিনি বলেন, দেখ আমি কোথায় আছি! সেইজন্যই অখণ্ড 'পাকা আমি-র' জয়গান তোমাদের সামনে করা হচ্ছে।

সব দেবতা এই 'আমি-র' মধ্যে মিশে আছে। গুরুস্তবে আছে—"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।" Guru is the embodiment of all gods and goddesses. সব দেবদেবীর ঘনীভূত রূপ হচ্ছেন গুরু। কিন্তু সেই গুরুকে মনুষ্যবোধে যখন দেখা হয় তখন তাঁকে আর গুরু বলে যথার্থ ভাবে মানা হয় না। তখন মনে হয়, তিনি আমাদেরই মতো একজন। মুশকিল হয়ে যায় তখনই। যেমন নিজেকে আমরা আত্মারূপে ভাবতে পারি না, সেইরকম গুরুকেও আমরা একজন লৌকিক গুরু, teacher বা কুলগুরু—এইরকম ভাবি। কী ভাবে form-এর মধ্যে, স্থূলের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি, অথচ আমাদের ভিতরে বিক্ষেপ-আক্ষেপ জেগে উঠছে শুধু স্থূলের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িয়ে আছি বলে। গাঢ় ঘুমের মধ্যে কিন্তু আক্ষেপ-বিক্ষেপ থাকে না, কেননা স্থূলতা সেখানে থাকে না। 'এ' ঘুমের স্তরকে point out করছে, কিন্তু সেই স্তর সম্বন্ধে বলা 'এর' লক্ষ্য নয়। তা শুধু বুঝবার সুবিধার জন্য বলা হচ্ছে। ঘুমকেও ছাড়িয়ে যেতে হবে। কোথায়? যেখানে ঘুমকেও ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে, ঘুম যেখানে ঘুমিয়ে আছে। কোথায়? অখণ্ড চৈতন্যের মধ্যে। ঘুম আর সেখানে ঘুম নেই। অর্থাৎ 'আমি-র আমিতে' কোনও বিকার নেই। সেখানে কোনও দ্বৈতভাব নেই, ভাবান্তর নেই, ভেদ নেই। কাজেই সেখানে দ্বন্দ্ব নেই। দুই থাকলে তো দ্বন্দ্ব হয়। তাহলে সেই অবস্থা ছেড়ে আমরা কোথায় এসে বাস করছি ভাব!

বাংলাদেশ যখন ভাগ হয়নি, অর্থাৎ হিন্দুস্থান-পাকিস্থান ভাগ হয়নি তখন বাংলাদেশে অনেক জমিদার ছিলেন। জমিদারি প্রথা ছিল তখন, বড় বড় জমিদার ছিলেন। বিরাট বিরাট সমস্ত রাজা মহারাজা জমিদার ছিলেন। তারা রাজ্য ও জমিদারী হারিয়ে যখন কলকাতা শহরে এসেছেন, তাদের পরিবারের লোকেরা যখন সেই গল্প করে এখনকার লোকেরা তা বিশ্বাসই করে না। তারা ভাবে, ধুর বাজে কথা, ওসব গল্প। আমরা যখন কোনও ভাল কথা

শুনি তা আমরা সবাই মানতে পারি না বা নিতে পারি না। সেইরকম যখন original কোনও realizer জগতে আসেন, তাঁর জীবদ্দশায় মানুষ তাঁকে নিতে পারে না, কারণ তা conventional নয়, তিনি unconventional। তাঁর ভিতরে এমন কতগুলো original জিনিস প্রকাশ পায় যা সবার মধ্যে দেখা যায় না, কাজেই তাঁকে নিতে পারে না সাধারণ মানুষ। কিন্তু যারা miracle দেখায় তাদের কাছে কিন্তু বহু মানুষ যায়। কেননা miracle দেখলে তা মানুষের মনকে খুব তাড়াতাড়ি আকর্ষণ করে। তারা ভাবে, ওটা পাওয়ার বস্তু, যদি কিছু পাওয়া যায়।

'অঘোরী' নামে একটা সিনেমা তৈরি হয়েছিল। *অঘোরী* সিনেমার মধ্যে ভয়ংকর সব কাপালিকদের দেখানো হয়েছিল। সেই সিনেমা তৈরি করেছিল সঙ্গীতা নায়ার বলে একজন মারাঠী মহিলা। তার স্বামী কিন্তু রাজস্থানী। খুব risk নিয়ে সিনেমাটা তৈরি হয়েছিল। অঘোরী তান্ত্রিকরা কাঁচা নরমাংস খায় বিনা দ্বিধায়। তোমরা যেমন মাছ মাংস খাও তারাও ঐরকম কাঁচা মাংস খায়। হয়ত dead body জলে ভেসে যাচ্ছে তা তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। তারা সর্বসংস্কারমুক্ত। হয়ত মল ত্যাগ করে নিজেই তা খেয়ে ফেলল। আপাতদৃষ্টিতে এসব দেখে বীভৎস মনে হবে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখবে একটা সুন্দর গন্ধে চারদিক যেন একেবারে ভরে গিয়েছে। তারা হল embodiment of all miracles। যেমন বীভৎস তেমন সৌন্দর্য—সবই আছে তাদের কাছে। তারা অনেককিছু করতে পারে। তারা নিজের চেহারা বা রূপ পাল্টাতে পারে। 'এ' তখন Bombay-র অন্তর্ভুক্ত Thane-তে Indal Company-র Finance officer তাপস রাজদেরকর ও জেসমিন রাজদেরকরের flat-এ কিছুদিনের জন্য গিয়েছিল। P. C. Lahiri (বাপি) তখন Bombay-তে posted ছিল। সঙ্গীতা নায়ার অঘোরপন্থী তান্ত্রিকদের সঙ্গ করে খুব influenced হয়েছিল। তাদের সঙ্গে সঙ্গীতার সহজ সম্বন্ধ তৈরি হয়েছিল। কাজেই সঙ্গীতার মধ্যে অঘোরীদের কিছু প্রভাব এসে পড়েছিল। সেইকথা জেনে অনেকেই তার সঙ্গ করতে ভয় পেত। সঙ্গীতা নায়ার বাপির কাছে 'এর' কথা শুনে 'এর' সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং পরে বাপির কাছে ঠিকানা নিয়ে 'এর' সঙ্গে দেখা করতে আসে তার স্বামী ও অন্যান্য দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে। 'এর' খবর পেয়ে সঙ্গীতা নায়ার 'এর' সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে আসবে শুনে সবাই ভয়ে অস্থির। যারা দ্বিধা বোধ করছিল তাদের বলা হল, তোমরা ভয় পেও না। কী করবে 'একে'। 'এর' তো নাশের কোনও ভয় নেই, কারণ মৃত্যুটাও তো আমি-ই। কাজেই মৃত্যু তো 'এর' থেকে আলাদা কোনও বস্তু নয়। কিন্তু কে মানবে এই কথা। যাই হোক, ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত, তারা সবাই সচেতন হয়ে আছে, মানে এমনভাবে বসার ব্যবস্থা করেছে যাতে 'এর' কাছে সে না-আসতে পারে। খুব interesting ব্যাপার।

সে একসময় এসে উপস্থিত হল, তার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল। তার আগে আরও কয়েকজন এসেছিল 'এর' কাছে। সেখানে কথাবার্তা চলছিল, এমন সময় সঙ্গীতা নায়ারের

husband কথাবার্তার মধ্যে বলে বসল, আপনি এত উঁচু স্তরের কথা বলেন অথচ আপনার এখানে মাত্র কয়েকজন লোক আসে। আর আমরা এমন সব জায়গায় যাই যেখানে লোক গোনা যায় না, এত অসংখ্য লোক। কিন্তু সেখানে তো এই জাতীয় কথা নেই, বিষয়-আশয়ের কথাই বেশি হয়। তখন তাকে বলা হল, এর কারণটা কি তোমার একান্তই জানতে হবে? তখন সে বলল, কারণটা না-জানলে তো অসোয়াস্তি বোধ করব। উত্তরে তাকে বলা হল, ঠিক আছে তাহলে শোন। বহুজন যেখানে যায় সেখানে বহুজনের একটা স্বার্থ থাকে, কারণ থাকে। সেই স্বার্থ যাতে চরিতার্থ হয়, পূর্ণ হয়, সিদ্ধ হয়, কার্যকরী হয় তার জন্য সেখানে লোক ভিড় করে। যেমন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ছাত্রসংখ্যা অনেক বেশি, তাদের পাশ করার উদ্দেশ্য হল, পাশ করলে বিদ্যালাভ হবে, career তৈরি হবে এবং টাকা রোজগার করতে পারবে। এই ambition নিয়ে তারা আসে। কিন্তু তুমি M.A. পাশের পরে যখন P.R.S., Ph.D পড়তে যাবে, তখন সেখানে দেখবে কোনও বছর হয়ত একজন student-ও নেই। যত higher-এ যাবে তত সংখ্যা কমে যেতে থাকবে।

এই কথা শুনে সে বলল যে, ঠিক বুঝতে পারলাম না। তখন তাকে বলা হল, বুঝতে পারলে না। তুমি এক কড়াই দুধ, একমণ দুধ জ্বাল দিচ্ছ। একমণ দুধের volume-টা কড়াই ভর্তি, কিন্তু তা যদি তুমি খোয়া ক্ষীর কর কতটুকু হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই কমে যাবে। সেইরকম অজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা অজ্ঞানকে দেখি বাইরে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু জ্ঞান যে অজ্ঞানের অনেকগুণ বেশি, সেটা কিন্তু অজ্ঞান জানে না। আমরা সেইজন্য বহির্বিশ্বে, এই স্থূল দৃশ্য যা দেখি তা-ই সব মনে করছি। মানে তা যে আমাদের আসল সত্তার infinitesimal part of the infinitesimal one unit of Consciousness—এ কথা শুনে অনেকেই অবাক হয়ে যায়। তারা বলে যে, এগুলো কী করে সম্ভব? উত্তরে তাদের বলা হয়েছে, মনে করো তোমাদের পাশের বাড়ির ছেলেটা ছোটবেলায় দুষ্টুমিতে সারা পাড়াকে মাতিয়ে রাখত। সবাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছ এক সময়। সেই ছেলেটা কয়েকবছর পরে যখন একটা company-র managing director হয়ে গেল, তখন তা কী তোমরা আগে ভাবতে পেরেছিলে কোনওদিন? কী করে তা সম্ভব হল? তখন সে বলল, হ্যাঁ এরকম ঘটনা ঘটে ঠিকই। তখন তাকে বলা হল, সবই তো তাই, ঘটনার মধ্যে দিয়ে হয়ে যাচ্ছে। তুমি একসময় কোথায় গিয়ে পৌঁছে যাবে তা তুমি নিজেই এখন বুঝতে পারছ না।

আসলে তোমার যে real nature তার কোনও পরিবর্তন হয়নি, মানে তুমি জন্মাওনি। মানবে কি এই কথা? মানবে না। কেননা আত্মা-ব্রহ্মের কোনও জন্ম নেই। জন্ম না-থাকলে তাঁর কোনও কার্যও নেই, কার্য না-থাকলে কর্মফলও নেই, মৃত্যুও নেই। তাহলে জন্ম-মৃত্যু কর্ম-কর্মফলশূন্য আত্মাকে আমরা ক'জন বিশ্বাস করি, ক'জন মানি। কিন্তু আত্মবাদীর কাছে গেলে তিনি তোমাকে এই বোধ পদে পদে ধরিয়ে দেবেন। তুমি কতখানি গ্রহণ করতে পারবে বা না-পারবে তা প্রথমে বুঝতে পারবে না। আরম্ভ করলে আস্তে আস্তে তখন দেখতে পাবে

যে, আরে এ তো সোজা। তখন তো বুঝতে পারিনি। অর্থাৎ নিজেকে সবথেকে সহজ করে পাবে। তা পাওয়ার জন্য তোমাকে বেগ পেতে হবে না। অন্য বস্তু বা নিজ অতিরিক্ত কোনও কিছুকে পাওয়ার জন্য তোমাকে কত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। নিজেকে পাওয়ার জন্য তোমাকে কি পরিশ্রম করতে হবে? তুমি তো নিজরূপে আছই। You exist as what you are in Reality. কিন্তু তোমার imaginary যে wants, কল্পিত যে অভাব তা পূরণ করার জন্য তোমাকে কত পরিশ্রম করতে হচ্ছে—এখানে যেতে হচ্ছে, সেখানে যেতে হচ্ছে, এটা আনতে হচ্ছে, ওটা আনতে হচ্ছে। সব নিয়ে তোমার কল্পিত বস্তুটা হয়ত পেলে। দিনকয়েক পরে দেখা যাবে তা ভেঙে গেল। আজকে খুব গভীরের বিষয় বলা হল। খুব সোজা কথা দিয়ে অর্থাৎ ঘরোয়া কথা দিয়ে আজকের বক্তব্য পরিবেষণ করা হল। এই কথা দিয়ে আস্তে আস্তে 'এ' একটা জায়গায় যাচ্ছিল যে জায়গাটায় গেলে খুব interesting ব্যাপার ছিল। তবে কালকে আবার কী প্রসঙ্গ আসবে তা তো 'এ' জানে না, 'এ' তো কোনও মুখস্থ কথা বলে না, ভিতর থেকে যা বেরোবার তা-ই বেরোবে। আজ এখানেই সচ্চিদানন্দ করা হল।

মন্তব্য ঃ

ত্রয়োদশ বিচারের প্রতিফলন হল চতুর্দশ বিচার। এই বিচারের বিষয়বস্তু ত্রয়োদশ বিচারের মূল উপাদানের এক নব রূপায়ণ বা অভিব্যক্তি। ত্রয়োদশ বিচারে সত্তার বক্ষে শক্তির লীলায়িত রূপের বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে যা বলা হয়েছে তার তাৎপর্যকে অবলম্বন ক'রে চর্তুদশ বিচারের বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। জীবনে মানুষ শক্তির প্রাধান্যেই চলে সত্তার বক্ষে থেকেই। শক্তির রহস্যে ভরা প্রকাশাদিতে সে অভিভূত হয়ে চলে। সেইজন্য সত্তার যথার্থ পরিচয় সে সহজে অনুধাবন করতে পারে না। শক্তির উৎকর্ষকে ধরে নিজ সত্তার পরিচয় সে জানতে পারে। সে জীবনে বহির্জগতের সঙ্গে অধিক সংশ্লিষ্ট থাকে বলে বহির্জগতের রূপ-নামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম রূপ-নামকেই পেতে চায় আপন ক'রে। অন্তরেও সে ভাবের শ্রেষ্ঠ বা উত্তম যা তা-ই সে পেতে চায়। কিন্তু জীবনের বাইরে এবং অন্তরে অনুভূতির বিষয় রূপ-নাম-ভাব সবই বিকারী, পরিণামী ও অনিত্য বলে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু যা মানুষ খোঁজে তা স্থায়ী নয়, পূর্ণ নয়। মনের স্তরে বৈচিত্র্য বেশি। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু, উত্তম বস্তু যথার্থভাবে পাওয়া যায় না। মানুষের আত্মপ্রীতি অপেক্ষা বস্তুপ্রীতি বেশি। সেইজন্য বহির্জগতে বিষয়ের প্রতি মানুষের সম্বন্ধ ও কার্যাদি বেশি। আপাতমনোরম বিষয়াদি নিয়েই মানুষ মেতে থাকে এবং পরিণামে সে কষ্ট পায়। মন চিদাভাসে গড়া, দেহেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মন সক্রিয় হয় এবং তার পছন্দমতো জিনিস পেতে চায় বা ভোগ করতে চায়। তার চাহিদা বেশি, সবচাইতে ভাল বা শ্রেষ্ঠ বস্তুকে সে চায় কিন্তু পায় না। কারণ তার সাধ বেশি ও সাধ্য কম। ইন্দ্রিয়ের সাধ্যও সীমিত। তাদের বিষয়াদিও পৃথক পৃথক। তাদের নিয়েই মনের সংসার। বাইরের বিষয় এবং অন্তরের বিষয়ের মধ্যে ভাবের পার্থক্য অধিক। এই ভেদ বা পার্থক্য মনের কল্পিত এবং তা-ই হল তার অশান্তির কারণ।

জীবনে সর্ববিধ ব্যবহার সিদ্ধ হয় অহংকারের (অন্তঃকরণ) মাধ্যমে। অহংকার নিজ অতিরিক্ত বিষয়কে কল্পনা ক'রে পেতে চায়, পৃথকভাবে ব্যবহার করে তার কল্পিত মানের গুরুত্ব অনুসারে। অহংকার হল কাঁচা আমি, তা-ই হল জীবের পরিচয়। সে নিজ অতিরিক্ত জগৎকে অন্তরে-বাইরে দৃশ্যরূপে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহার ক'রে অভ্যস্ত বলে নিজের যথার্থ পরিচয় জানতে পারে না। দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা বেশি বলে তার নিজস্বরূপের যথার্থ পরিচয় সে জানতে পারে না। নিজস্বরূপের পরিচয় আছে আপন হৃদয়গুহায়। অহংদেব আত্মারাম পুরুষোত্তম হল তাঁর পরিচয়। এই অহংদেব পুরুষোত্তম হল পাকা আমি। হৃদয়ের গভীরে তাঁর অধিষ্ঠান, আপনবোধে হয় তাঁর ব্যবহার। আপনবোধে সবই আপন, অন্যবোধ তাতে থাকে না। পাকা আমি-র বোধ অদ্বৈতবোধ এবং কাঁচা আমি-র বোধ হল দ্বৈতবোধ। দ্বৈতবোধের ব্যবহার হয় ইন্দ্রিয়-মনের মাধ্যমে পৃথক পৃথক ভাবে। কাঁচা আমি দ্বৈতবোধে গড়া ও দ্বৈতবোধে ভরা। পাকা আমি অদ্বৈতবোধে গড়া ও অদ্বৈতবোধে ভরা। দ্বৈতবোধ বৈচিত্র্যপ্রধান নানাত্ববহুত্বপ্রধান। আবার অদ্বৈতবোধ হল সমবোধ একবোধ ও আপনবোধ। তা নিত্য পূর্ণ অখণ্ড স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রমাণ। এই অখণ্ড আমিবোধ দিয়ে তার পরিচয় সবসময় প্রকাশ পায়। এই আমিবোধের বিজ্ঞানে আমারবোধ পৃথক ক'রে থাকে না। অখণ্ড পূর্ণ আমিবোধসাগরে তার যতরকম অভিব্যক্তি আছে তাতে পাকা আমি স্বয়ং বিদ্যমান। সেইজন্য তাঁকে আমিময় বোধ বা বোধময় আমি পুরুষোত্তম বলা হয়। তাঁর কোনও বিকল্প নেই, প্রতিপক্ষ নেই, প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সে সচ্চিদানন্দঘন স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ 'স্বয়ং-এ স্বয়ং, পরমে পরম, আপনে আপন'। পাকা আমি-র স্বরূপ প্রজ্ঞানঘন সচ্চিদানন্দ। তা সর্বসম স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ নিত্যাদ্বৈত। তাঁকে পুরুষোত্তম বলা হয়। এই পুরুষোত্তম তাঁর সর্ব প্রকাশের অনাসক্ত সাক্ষীমাত্র। কেবল অখণ্ড একরসসার। সর্ব গুণ ভাব উপাধি রহিত দেশ কাল কার্য কারণের অতীত নির্বিকার নিরাকার নিরলম্ব। দ্বৈত ভাববোধের সর্বপ্রকাশের অশেষ সাক্ষী। এই পাকা আমি-র কোনও আমার বোধ নেই অর্থাৎ স্বভাব প্রকৃতির ঊর্ধ্বে সবার অধিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠা, সবারই সাক্ষী স্বরূপ। বোধে বোধময় অদ্বয় অব্যয় অমৃতময় এই আমিসত্তা পরমতত্ত্বস্বরূপ পরমাত্মা পরব্রহ্ম। স্ববোধে আপনবোধে এই আমি নিত্য পূর্ণ। তাঁর মধ্যে তাঁরই স্বপ্রকাশ ধর্ম সমগ্র প্রকাশের ধারক বাহক পরিবেশক। তা-ই হল তাঁর স্বভাব শক্তির বৈশিষ্ট্য। স্বভাব শক্তির সর্ববিধ অভিব্যক্তি অন্তরে স্বভাব ও বাইরে প্রকৃতি রূপে প্রকাশ পায়। সবই আমি-র বক্ষে আমি-র প্রতিভাস মাত্র। প্রকৃতির মধ্যে আমি ইন্দ্রিয় বোধে, স্বভাবের মধ্যে আমি মনবুদ্ধির বোধে অভিব্যক্ত আর স্ববোধের মধ্যে আমি স্বয়ং।

১৬/১/০২

।। পঞ্চদশ বিচার।।

ওঁ

আনন্দঘন শ্যাম
তু মেরে জীবন কা জীবন প্রাণারাম।।
মেরে প্রীতম তু সবকো উরমে তু আত্মারাম
দিব্যমহিমা আপনা প্রেমসে প্রকাশো ভগবান।।
সৌম্য সৌম্যতর সুন্দর মধুর মনোহর নয়নাভিরাম
তু মেরা মন কা মন প্রাণ কা প্রাণ তু মেরে শান্তিনিধান।।
তু পরমাত্মা ভক্তকে দিলমে তুহি প্রেম ভক্তি বিজ্ঞান
যোগীকা আত্মধ্যান তু জ্ঞানীকা তুহি সত্য ব্রহ্মজ্ঞান।।

(পিলু—আদ্ধা)

শ্যামের কথা দিয়ে আরম্ভ করা হচ্ছে কারণ শ্যামল সবল সুঠাম। শ্যামল অর্থাৎ প্রাণবন্ত। উপনিষদে এক জায়গায় শ্যাম ও শ্যামলের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা আছে আত্মজ্ঞান প্রসঙ্গে। আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে এখানে যে কথা বলা হয়েছে, সেই কথাগুলো উপনিষদের সারাৎসার। অর্থাৎ বেদের যে সার অংশ তাকেই বলা হয় বেদান্ত। বেদান্তের যে সার অংশ তা-ই হল আত্মজ্ঞান, Self-Knowledge, অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান। কিন্তু বেদবাদী আর বেদান্তবাদী—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। বেদবাদীরা কর্মকাণ্ড অর্থাৎ ত্রিগুণের বিষয় নিয়ে তাদের জীবনচর্চা। কর্ম ত্রিগুণের বিষয়েই হয়, গুণাতীতে কর্ম নেই। সেইজন্য গীতাতেও উল্লেখ করা হয়েছে, "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।" হে অর্জুন, তোমাকে নিস্ত্রৈগুণ্য হতে হবে, গুণাতীত হতে হবে। বেদের মধ্যে কর্মকাণ্ড আছে, কর্মকাণ্ডের মধ্যে মানুষের কামনা পূরণের জন্য বা তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য বহুবিধ কর্মের বিধান দেওয়া আছে। সেই সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্যই হল, কর্মকর্তার অভীপ্সা পূরণ, তার চাহিদা পূরণ, তার কামনা পূরণ, প্রার্থনা পূরণ ও ভোগ চরিতার্থ করা—তা স্থূল হোক, সূক্ষ্ম হোক বা সূক্ষ্মতর হোক। কাজেই বেদবাদী অর্থাৎ কর্মবাদী হচ্ছে ভোগবাদী। আর জ্ঞানবাদী হচ্ছেন মুক্তিবাদী।

কর্মই যখন জীবনে বন্ধনের কারণ, এই কর্মের অতীত কী করে যাওয়া যায়, সেই জ্ঞানের চর্চা জ্ঞানবাদীরা করেছেন। সেই জ্ঞান কিন্তু পুঁথিগতবিদ্যা নয়। তা ধ্যানাবস্থিত অর্থাৎ ধ্যানের গভীরে মন প্রবেশ করলে যে জ্ঞান লাভ হয় সেই জ্ঞান হল আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, সত্যজ্ঞান, প্রজ্ঞান—অখণ্ড-পূর্ণজ্ঞান। এই অখণ্ড পূর্ণজ্ঞানের কথা আমরা সাধারণত

শুনতে পাই না মানুষের কাছে। আমরা আপেক্ষিক জ্ঞানের কথা শুনতে পাই, বস্তুর জ্ঞানের কথা শুনতে পাই, ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান, কর্মবিশেষেব জ্ঞান, ঘটনাবিশেষের জ্ঞান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিপর্যয়ের জ্ঞান বা কোনও দুর্ঘটনার জ্ঞান—এই নিয়েই জগৎ মুখরিত। যত newspaper, নাটক, নভেল, সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পের উপরে পুস্তক আছে সেসবই হল relative knowledge, অর্থাৎ যা ইন্দ্রিয় দিয়ে মানুষ অনুভব করে সেই জ্ঞানের কথা। আর এখানে (কালীবাড়িতে) ক'দিন যে কথা বলা হয়েছে বা যে-সমস্ত বই প্রকাশিত হয়েছে 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) কথার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি সবই হল অতীন্দ্রিয় জগতের জ্ঞান, অর্থাৎ লোকোত্তর জ্ঞান, বাক্যমনাতীত জ্ঞান। এই জ্ঞানের মধ্যে বাক্য-মন প্রবেশ করে না অথচ সেই জ্ঞান বাক্য-মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়। কীরকম বাক্য-মন? সংযত বাক্য-মনের মধ্যে। অসংযত বাক্য-মনের মধ্যে তা প্রকাশ হবে না, হলেও জানতে পারবে না।

জীবনে দুঃখ-কষ্ট যা-কিছু সকলের মধ্যে বর্তমান আছে, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির মূল বা কারণ হল তার কাম বা সংকল্প। এই কাম আবার অজ্ঞান হতে জাত। অজ্ঞান হচ্ছে কল্পনা। নিজ অতিরিক্ত কল্পনাকেই বলা হয় অজ্ঞান। সেই কল্পনা মনসাপেক্ষ, অর্থাৎ মানসবৃত্তির মাধ্যমে জাত হয়, সক্রিয় হয় ও ফলবতী হয়। কাজেই কর্ম আসে মনের কামনা থেকে। কর্ম করতে গেলে একজন কর্তার দরকার হয়। কর্তৃত্বও আসে সেখান থেকে। তাহলে কাম-কর্ম-কর্তৃত্বই হল বেদের কর্মকাণ্ডের প্রধান বিষয়, কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ড বেদান্ত/উপনিষদের প্রধান বিষয় তা নয়। তার প্রধান বিষয় হল আত্মজ্ঞান/ব্রহ্মজ্ঞান—অখণ্ড প্রজ্ঞান সচ্চিদানন্দ ভূমা অহংদেব পাকা আমি (পুরুষোত্তম)। বেদের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে তন্ত্র যে বিকাশলাভ করেছে তার মধ্যেও কর্মের প্রাধান্য অর্থাৎ ক্রিয়াকলাপই বেশি। যদিও তন্ত্রবিদ্যা শক্তিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, পরিণামে তা জ্ঞানসত্তার সঙ্গে অভিন্নরূপে সিদ্ধ হয়। সেইজন্য তন্ত্রবিদ্যায় পূর্ণসিদ্ধদের অনুভূতি শাক্ত অদ্বৈতবাদরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বেদের সঙ্গে তার কিছু পার্থক্য আছে। তা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শুদ্ধজ্ঞানের প্রসঙ্গ। শুদ্ধজ্ঞানই হল ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর-সত্য। ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক আছে ঠিকই, কেননা তিনি স্রষ্টা। তার কারণ ঈশ্বরের যে উপাধি বা স্বভাবপ্রকৃতি তা শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অর্থাৎ গুণেরই চরম উৎকর্ষ। কিন্তু জীবের মধ্যে সেই শুদ্ধজ্ঞান সুপ্ত বা আবৃত, জীবের গুণ হচ্ছে তমোরজোপ্রধান মলিন সত্ত্ব।

তমোগুণের বৈশিষ্ট্য হল, তা নিষ্ক্রিয়, নিষ্প্রভ, নিস্তেজ। নিদ্রা, আলস্য, জড়তা, মোহ, আসক্তি, ভ্রান্তি, ভীতি—এগুলো হচ্ছে তমোগুণের লক্ষণ। রজোগুণের ধর্ম হল সক্রিয়তা। কার্য, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, আধিপত্য, দম্ভ, দর্প, গর্ব, অভিমান, স্বার্থ—এগুলো হল রজোগুণের লক্ষণ। সত্ত্বগুণ প্রকাশধর্মী। রজোতমোগুণের প্রকাশধর্ম নেই। তা নিজেকেও প্রকাশ করতে পারে না, অপরকেও প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু তার ভিতরে ক্রিয়া আছে। ক্রিয়া আর প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রকাশ হচ্ছে light, কিন্তু ক্রিয়াটা light নয়। সত্ত্বের মধ্যে প্রতিফলিত হয় আত্মচৈতন্য, তাই সত্ত্বের প্রকাশগুণ বেশি। সেইজন্য সত্ত্ব হচ্ছে প্রকাশধর্মী,

অর্থাৎ রজোতমোকে তা প্রকাশ করে। সত্ত্ব না-থাকলে রজোতমোগুণ প্রকাশ হতে পারে না। সত্ত্বও রজোতমোর থেকে আলাদা বা পৃথক হয়ে থাকতে পারে না। তিন গুণের মধ্যে একটা chain আছে। এক একটা এক এক সময় প্রধান হয় ঠিকই, কিন্তু কোনওটাকে ছেড়ে কোনওটা সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা হয়ে থাকতে পারে না। এই তিন গুণের অতীত একটা গুণ আছে, তা হল শুদ্ধসত্ত্বগুণ, যা সত্ত্বগুণের উপরে। সেখানে তমোরজোগুণ প্রধান নয়, অভিভূত। সেই শুদ্ধসত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হলেন ঈশ্বর অর্থাৎ বিশুদ্ধচৈতন্য। সেইজন্য ঈশ্বর সৃষ্টি ক'রেও বন্ধনে পড়েন না। সৃষ্টির মধ্যে জীবও সৃষ্টি করে, কিন্তু সে মোহমায়াগ্রস্ত। তমোরজোগুণ দ্বারা সে অভিভূত হয় বলে তাকে বন্ধন ভোগ করতে হয়।

ঈশ্বরকে বন্ধন ভোগ করতে হয় না। আর ঈশ্বরের উর্ধ্বে হচ্ছে ব্রহ্ম-আত্মা। তাঁ গুণাতীতম্ ভাবাতীতম্ দ্বন্দ্বাতীতম্। এই তিন গুণের নামান্তরই হল ভাব। প্রত্যেকটির ভাব স্বরূপত পৃথক হলেও, পরস্পরের থেকে পৃথক হতে পারে না। পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের একটা দ্বন্দ্ব হয়। তমোগুণ চায় প্রাধান্য পেতে, রজঃ ও সত্ত্বকে দাবিয়ে রাখতে। আবার রজোগুণ চায় তমোগুণ ও সত্ত্বগুণকে দাবিয়ে রাখতে। সত্ত্বগুণ চায় প্রাধান্য, অর্থাৎ প্রকাশ হতে, কিন্তু তমোরজোগুণ তাকে বাধা দেয়। অথচ তমোরজোগুণের স্বরূপকেও প্রকাশ করে সত্ত্বগুণ। এই তিন গুণের মধ্যে পরস্পরের প্রাধান্যের জন্য দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে। যখন সত্ত্বগুণ প্রধান হয় তখন মানুষের মধ্যে কী কী লক্ষণ প্রকাশ পায়? উদ্যম, উৎসাহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, সহজভাব, সতেজতা, দান, দযা এবং নিস্পৃহতা অর্থাৎ নিষ্কামতা। এই তিন গুণের উর্ধ্বে ওঠার জন্য যা দরকার তা হল শুদ্ধসত্ত্বগুণ। অনুভবসিদ্ধ পুরুষের সঙ্গ না-করলে তা লাভ হয় না। নিজের খেয়ালখুশি মতো ক্রিয়াকলাপ, কর্মকাণ্ড করে তা পূর্ণ হয় না। পূজাপাঠ সবই তো ক্রিয়াকলাপের পর্যায়েই পড়ে অর্থাৎ মানুষ যা-কিছু করে সবই তন্ত্রভিত্তিক। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এখন খুব একটা প্রচলিত নয়। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এখন কমে গিয়েছে। বিশেষ এক শ্রেণির মধ্যেই তার চর্চা আছে, সবাই তা জানে না। কিন্তু তন্ত্রের প্রাধান্য আমাদের পূজাপাঠের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা-ই এখন প্রচলিত। তন্ত্র ও বেদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তফাত আছে যা সাধারণ মানুষ বোঝে না। বেদের মন্ত্র আর তন্ত্রের মন্ত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তন্ত্রের মধ্যে সবই ক্রিয়াপ্রধান। ক্রিয়াপ্রধান হলে সেখানে শক্তি প্রধান কিন্তু জ্ঞান অপ্রধান। জ্ঞান অপ্রধান হলে সেখানে মোহ-আসক্তি থাকবে এবং মোহ-আসক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভ্রান্তিভীতিও থাকবে। সেইজন্য সংসারে মানুষ তমোরজোগুণের অধীন হয়ে বাস করে।

খুব কম লোকের মধ্যেই সত্ত্বগুণের কিছু প্রকাশ দৃষ্ট হয়, তাও খুব দৃঢ় ভাবে ও ব্যাপক ভাবে নয়। যাদের মধ্যে তা পাওয়া যায় তারা লক্ষণীয়। তাদের মধ্যে প্রকাশ পায় দয়া, মায়া, অপরকে মান দেওয়া, শ্রদ্ধা করা এবং ভক্তি-বিশ্বাসের মাত্রা তাদের মধ্যে অনেক বেশি। তাদের অন্তর শান্ত, ধীর, স্থির এবং বিরুদ্ধ অবস্থা মোকাবিলা করতে সহজেই সমর্থ। তারা অভিভূত হয় না ও বিব্রতবোধও করে না। অপরকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে তারা

সাহায্য করে। তাদের হৃদয় খুব নরম, গরম নয়। তারা অভিমানী কম, অর্থাৎ তাদের মধ্যে অহংকার, দম্ভ, অভিমান খুবই কম। তারা কোনও গর্ব অনুভব করে না। তারা ভাল কাজ করেও প্রশংসা নেয় না। তারা অপরের প্রশংসা করে, কিন্তু নিজে প্রশংসা নেয় না। কেউ প্রশংসা করলে তারা খুব সংকোচ বোধ করে এবং নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায়। এগুলো হল সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্য। এই গুণের প্রকাশ হলেও কিন্তু সব হল না। এর ঊর্ধ্বে যেতে হলে, এই গুণকে ছাপিয়ে যেতে হলে তাকে আরও বেশি অন্তর্মুখী হতে হবে। শুদ্ধসত্ত্বগুণ কিন্তু এই সমভাবকে সবসময় পোষণ করে। সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান, জ্ঞান-অজ্ঞান, ভাল-মন্দ এগুলোকে তারা খুব সহজে অতিক্রম করতে পারে, অথচ অপরে তা পারে না। এদের সংস্পর্শে থেকেও কিন্তু অনেকে এই গুণ অর্জন করতে পারে না। তাও দেখা গিয়েছে। তাহলে আমাদের সত্ত্বগুণকে বাড়াবার জন্য যদি কর্ম না-হয় তাহলে সংসারে অঘটন ঘটবে এবং সংসারে নিম্নগতিটা খুব বেশি হবে। বর্তমান যুগে তা-ই বিশেষ ভাবে দেখা যায়। সংসারে নিম্নগতি অর্থাৎ তমোরজোগুণের প্রাধান্য অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য তাদের মধ্যে কম। শুদ্ধসত্ত্বগুণের তো প্রশ্নই ওঠে না। যদিও বা কারও ভিতর তা প্রকাশ হয় কে তাকে চিনবে? তাকে তমোগুণী মনে করে তার মতো, রজোগুণী মনে করে তার মতো সব, সত্ত্বগুণী অনেকটা তার মতোই ভাবে, অথচ শুদ্ধসত্ত্বগুণী কারওর মতো করে ভাবে না। তার ভাবনা স্বতন্ত্র। সে সম্পূর্ণ নিজবোধে বা নিজের বিচারে চলে, কারও বিচার সে follow করে না। সেইজন্য দেখা যায় সাধুসন্তদের সঙ্গ করেও অনেকে উপকৃত হয় না। অবশ্য সাধুসন্তদের মধ্যে কোন গুণের প্রাধান্য কার বেশি তাও সবাই বুঝতে পারে না। সংসারী মানুষের মধ্যে প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি, কারণ সংসারী মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যপ্রীতিই বেশি, তমোরজোগুণের প্রাধান্য বেশি। তাদের এই স্বভাবপ্রকৃতির থেকে ঊর্ধ্বে ওঠাতে গেলে অর্থাৎ স্বভাবকে মার্জিত করতে গেলে যে-সমস্ত বিদ্যা অনুশীলনের দরকার তা প্রবর্তন করে দিয়ে যান যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ অধিকারী পুরুষ। কিন্তু তাও খুব বেশি কার্যকরী হয় না, অল্প কিছু লোকের মধ্যেই তা কাজ করে, বাকি লোকেরা ফাঁকি দিয়েই চলে।

চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে মানুষ তার জীবিকা অর্জনের জন্য যা প্রয়োজন তা ক'রেও যথেষ্ট সময় তার থাকে। এই সময়টাকে সে পরিপূর্ণ ভাবে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু তা সে করে না। কারণ তার মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য থাকাতে তার কর্ম হচ্ছে ঢিলা, অর্থাৎ 'হচ্ছে হবে, হচ্ছে হবে, হচ্ছে হচ্ছে, হবে হবে, হবে কাল, হবে পরশু, একদিন তো হবেই হবে, আর না হয় না-হবে, কী আর করা যাবে।' এই হচ্ছে তমোগুণী লোকের মনের ভাব। রজোগুণী চেষ্টা করে, চেষ্টা করার পরে যখন পারে না তখন আপশোস করে, ক্ষেপে যায়, বিরক্ত হয়, অভিমান করে, কিন্তু আবার চেষ্টা করে—এই ভাবেই তার চলতে থাকে। যদি কোনও কর্মে কৃতকার্য বা সফল হয় তাহলে তার অভিমান আরও বেড়ে যায়, আর যদি বিফল হয় তাহলে তার ক্রোধ বাড়ে। দু'দিকেই রজোগুণীর কতগুলি বিকার প্রকাশ পাবেই।

সত্ত্বগুণী কোনও কর্মে বিফল হলে আপশোস করে না, সে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করতে থাকে এবং জয়-পরাজয়কে সমানবোধে নেবার চেষ্টা করে, মান-অপমানকে সমানবোধে নেবার চেষ্টা করে— একপক্ষ সে নেয় না। তমোরজোগুণী একপক্ষ নেয়, তার পছন্দমতো পক্ষকে বেছে নেয়, সে সম্বন্ধে গতকাল কিছু বলা হয়েছিল।

প্রসঙ্গগুলি খুবই tough, এত সূক্ষ্ম বিষয় যে একদিন/দু'দিন শুনলেই একেবারে সব হয়ে যাবে তা নয়। এই বিজ্ঞান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ হল অন্তঃকরণের বিজ্ঞান, যা বাইরের বিজ্ঞান, বাইরের কর্ম বা বাইরের জ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। মানুষ চেষ্টা করে আবার ভুলও করে। কতগুলি চেষ্টা ভুল ক'রে করে, কতগুলি চেষ্টা হয়ত ঠিকমতো করতে গিয়ে পুরোটা পেবে ওঠে না। তার কারণ সে নিজেই অন্তরায় সৃষ্টি করে। যখন অভ্যাস করতে করতে কিছুটা তার দখলে আসে, সেই সময়ে তাকে পরিশ্রম করতে হবে, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ যখন প্রধান হয়, তখন যদি সে পরিশ্রম না-করে তাহলে তমোরজোগুণকে বশে আনা যায় না। তমোগুণ যখন প্রধান তখন সে কিছুই করতে পারবে না, রজোগুণ প্রধান হলেও পারবে না। এগুলো নিজের মধ্যে নিজেকে study করতে হয়, তবে এগোনো যায়। ধর্মজগতে প্রবেশ করতে গেলে কতগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া আছে, শুধু কতগুলি dead action বা প্রক্রিয়া অভ্যাস করলে উপকার পাওয়া যায় না। ক্রিয়াকলাপের থেকেও একটা জ্ঞান হয়, কিন্তু সেই জ্ঞান খুব সীমিত। মানুষকে বেঁচে থাকতে গেলে তো কিছু ক্রিয়াকলাপ করতেই হয়। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে কর্ম করা হচ্ছে, কেন কর্ম করা হচ্ছে, কার জন্য কর্ম করা হচ্ছে—এই প্রশ্নগুলি নিজের মধ্যে নিজেকে করতে হয়। আমি কর্মটা কার জন্য করছি? দেহের জন্য না ইন্দ্রিয়-প্রাণের জন্য না পারিপার্শ্বিকতার জন্য না অপর কারওর জন্য? কিন্তু মুখে আমরা বলি, ঐ ঈশ্বরের জন্যই তো কাজ করছি আমি। এগুলো কিন্তু ফাঁকিবাজির কথা। এটা ধরা পড়ে কাদের কাছে? যাঁরা সত্ত্বগুণ এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের কাছে।

মানুষের সাধারণত কথার সঙ্গে কাজের মিল কম থাকে। বেশিরভাগ মানুষই যে কর্ম করে সেই কর্মের সঙ্গে তার চিন্তা, কথা ও আচরণের মিল থাকে না এবং আচরণের সঙ্গে চিন্তা, কথা ও কর্মেরও মিল থাকে না। কথার সঙ্গেও আচরণ বা নিজের ব্যবহারের মিল থাকে না। বাক্য, মন আর ব্যবহার—এই তিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বাক্যটা ব্যবহারের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু বাক্যের একটা স্বতন্ত্র গতি আছে। আর ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যা-কিছু আচরণ করি তারও একটা স্বকীয়তা আছে। প্রত্যেকেরই তো একটা চিন্তার জগৎ আছে। আমরা যা চিন্তা করি তা সবসময় প্রকাশ করি না। আর যা প্রকাশ করি তার সঙ্গে যদি আমাদের আচরণের কোনও মিল না-থাকে তাহলে কতগুলি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত কারণে অনেকে অনেকরকম বিচার করে আমাদের জীবনযাপন সম্বন্ধে কতগুলি code বানিয়ে গিয়েছেন, নৈতিক মানকে, নীতির সঙ্গে যুক্ত ক'রে জীবনের যে দৈনন্দিন চর্চা তাকে তারা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সত্ত্বগুণীর কায়-মন-বাক্যের ব্যবহারে সমতা থাকে, রজোতমোগুণীর সমতা থাকে না।

আমাদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য, দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত অর্থাৎ বহির্প্রকৃতি এবং অন্তর্প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ও প্রকাশের জন্য যে জিনিস একান্ত প্রয়োজন তা হল ethical and moral কতগুলি code, নীতিগত কতগুলি মান, যা বাদ দিলে আমাদের কর্ম-আচরণ-ব্যবহার কোনওদিনই শুদ্ধ হবে না। আবার সেগুলি অভ্যাস করতে গিয়েও কিন্তু আমরা একটা চক্রের মধ্যে পড়ি, অর্থাৎ মনে করি এটাই বুঝি সত্য। আর যারা তা মেনে চলে তারা মনে করে, আমরাই একমাত্র যোগ্য আর সবাই অযোগ্য। অভিমান আর অহংকারের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রকাশ না-হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানের মহিমা উপলব্ধি করা যায় না। জ্ঞান বলতে গেলে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিকেই সাধারণত সবাই মনে করি, কিন্তু তা নয়। বুদ্ধি প্রকৃতিজাত বলে প্রকৃতির অধীন, সেখানে আত্মা বা জ্ঞানের যে প্রতিফলন হয় সেই প্রতিফলনের জ্যোতিতেই বুদ্ধি সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে জ্ঞানের কিছুটা প্রকাশকে ধারণ করতে পারে। কাজেই বুদ্ধির মধ্যে reflected হয় Self-Knowledge এবং বুদ্ধি সেই Knowledge-এর কিছুটা আভাস রাখতে পারে। যার যেরকম রাখার যোগ্যতা সেই অনুযায়ী তার ভিতরে অনুভূতি খেলে। কিন্তু এই বুদ্ধিকে মার্জিত করতে পারলে এই বুদ্ধির মধ্যেই আত্মার প্রতিফলন হতে পারে। এই বুদ্ধিকে মার্জিত করা খুব কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আমাদের অধ্যাত্মবিদ্যা, ধর্মবিজ্ঞান, আত্মবিজ্ঞান সেই বিষয়ে প্রচুর বিধান দিয়েছে, কিন্তু সেই বিধানগুলি যথার্থ মানা ও অভ্যাস না-হলে তার ফল পাওয়া যায় না। অনেকেই ধর্মশাস্ত্র একটু পড়েই মনে করে, ঐ তো ধর্মের মধ্যে এই লেখা আছে! বুদ্ধি দিয়ে সে একটা conclusion ক'রে নিল, সিদ্ধান্ত ক'রে নিল এবং মন্তব্য করল। বেশিরভাগ লোকই ঠিক তাই। কিছু শুনে কিছু প'ড়ে তারা একটা conclusion ক'রে ফেলে যে এটা এই, ওটা ওই। এই হচ্ছে বুদ্ধির দোষ।

বুদ্ধি একদেশদর্শী, বুদ্ধি কখনও সামগ্রিক ভাবে সবকিছুকে মানতে বা গ্রহণ করতে পারে না। এই যে পছন্দমতো বিশেষ অংশকে সে গ্রহণ করে, তার ফলে সমগ্রতার ধারণা বা বোধ তার হয় না। বুদ্ধি কিন্তু তা বোঝেও না। কাজেই বুদ্ধিমান যারা তারা নিজেরা মনে করে, আমরাই শ্রেষ্ঠ, আর সব নিকৃষ্ট। কিন্তু বুদ্ধির যে সীমা তা হচ্ছে রূপ-নাম-ভাব পর্যন্ত, তার উপরে বুদ্ধি যেতে পারে না। রূপ-নাম-ভাবের অতীত যে সত্য তা তো গুণাতীত। রূপ-নাম-ভাব তো গুণের অধীন। কাজেই তিন গুণের অতীতে যাওয়ার কথাই হচ্ছে অধ্যাত্মবিদ্যার নির্দেশ। গুণাতীত ভব—তুমি শুদ্ধসত্ত্বগুণের অধিকারী হও। সাধারণ মানুষ বলে, তোমার মঙ্গল হোক, কল্যাণ হোক, তুমি সুখী হও ইত্যাদি, ইত্যাদি আশীর্বাদ করে। কিন্তু সাধনজগতে অনুভবসিদ্ধ পুরুষরা বলেন, গুণাতীত ভব, নিস্ত্রৈগুণ্য ভব, ভাবাতীত ভব, দ্বন্দ্বাতীত ভব, শুদ্ধসত্ত্ব ভব, স্বস্থ ভব। সুস্থতা থেকে হয় স্বাস্থ্যবোধ অর্থাৎ স্বস্থবোধ—সুস্থতা আসে স্ববোধে। সুস্থতা আসবে স্বস্থ হলে অর্থাৎ স্ববোধে প্রতিষ্ঠিত হলে হবে সুস্থ, তার আগে সব অসুস্থ। প্রতি মুহূর্তে অসুস্থ হচ্ছে সে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিকারে ভরা। 'জগৎসংসার যেন just like a dustbin! এখানে মন মাছির মতো ভ্যান ভ্যান করে রাতদিন।' এই সংসার হচ্ছে একটা dustbin। কিন্তু কাদের কাছে? জ্ঞানীদের কাছে।

জ্ঞানীরা সাধারণ মানুষের আচরণ দেখে ভাবেন, মানুষ এ কী করছে!-মানুষ কী ভাবে তমোরজোগুণের মধ্যে জড়িয়ে বসে আছে! তাকে প্রেরণা দেবার জন্য উপদেশ দিয়ে বোঝাতে গেলে ক্ষেপে ওঠে। "উপদেশ হি মূর্খানাং প্রকোপায়েৎ ন শান্তয়ে"—মূর্খকে উপদেশ দিতে গেলে মূর্খ ক্ষেপে যায়, উপদেশ নেয় না তারা। কিন্তু এই মূর্খদের সদ্‌গতি কী ক'রে হবে? সেই প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে, তাদের প্রকৃতি ধীরে ধীরে তৈরি হবে বহুজনম ধরে। কীরকম? উপমাটা খুব সুন্দর! যেমন পাহাড়ের উপর থেকে বিরাট বিরাট বরফের চাক অর্থাৎ avalanche গড়িয়ে পড়তে থাকে নিচের দিকে। তা পাথরের উপর পড়লে পাথর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেই পাথরের টুকরোগুলো সব নিচের দিকে নেমে আসে গড়াতে গড়াতে। শেষে যখন বেলাভূমিতে পড়ে অর্থাৎ নদীর bed-এর মধ্যে, সাগরের bed-এ এসে পড়ে, গড়াতে গড়াতে মসৃণ হয়ে আসে, একেবারে নিটোল। Machine-এও এত fine বা নিটোল হয় না। প্রকৃতির মাধ্যমে এই refinement হয়। আর যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ যা করে তাতে কিন্তু খুঁত থেকে যায়। তাহলে আমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রকৃতির মাধ্যমে যদি হয় তাহলে কতদিনে তা হবে? কোনও নিশ্চয়তা নেই, উপায়ও নেই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা নির্দেশ দেওয়া আছে, উপায় নেই বলা চলে না। সেই নির্দেশ হল, অভ্যাস আর বৈরাগ্যের দ্বারা চর্চা করলে তা সম্ভব হয়। অভ্যাসও থাকবে, বৈরাগ্যও থাকবে। সেই অভ্যাস কী ক'রে হবে? একজন অভিজ্ঞ লোকের অধীনে শিক্ষানবিশ হয়ে চললে। নিজের খেয়ালখুশি মতো চললে হবে না, কারণ বৈরাগ্য তাহলে আসবে না। সংসারে নিজের থেকে বৈরাগ্য কারওরই আসে না—বড়জোর ভিতরের ঘর থেকে বাইরের ঘর এবং বাইরের ঘর থেকে ভিতরের ঘর, তা না-হলে পাড়ায় একটু ঘুরে এল—এই বৈরাগ্য! একে বলে মর্কট বৈরাগ্য। তা কিন্তু নয়। বৈরাগ্য মানে 'আমার ভাব' আমাদের ভিতরে যে আছে তা পরিহার করা—এই হল যথার্থ বৈরাগ্য। কিন্তু সেই বৈরাগ্য তো একদিনে তৈরি হয় না। একটা ছোট শিশু সবেমাত্র জন্মালো, তারপর সে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে, একটা বীজের থেকে গাছ, ফুল, ফল যেভাবে হয়! সেইরকম একটা জীবনের মধ্যে জ্ঞানফল তৈরি হতে তাকে অনেকগুলো জনম বা দেহ পাল্টে আসতে হবে, অনেক বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। কত জনম কত দুঃখ ভোগ ক'রে তাকে আসতে হয়! সেগুলির হিসাব দিলে কিন্তু মানুষ একেবারে অবাক হয়ে যাবে। তখন বলবে যে, এত কষ্ট আমাকে পেতে হবে?

একমুহূর্তে যে ব্রহ্মজ্ঞান হয় সেই ব্রহ্মজ্ঞান নেবার মতো যোগ্যতা তো তার তৈরি হয়নি, দিলেও তো সে নিতে পারবে না। তার সাধ অনেক, কিন্তু সাধ্য নেই—সাধ্য সীমিত। সাধ্য বাড়াতে হবে! সাধ্য বাড়াতে গেলে তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। কর্মকাণ্ডকে base ক'রে এগোতে হবে ঠিকই, কিন্তু কতখানি এবং কী ভাবে? সেই কর্মের বিজ্ঞান মহাপুরুষরা যেটুকু ধরিয়ে দিয়ে যান তার বাইরে নয়। কিন্তু সেই কাজই বা ক'জন ঠিকমতো সুষ্ঠুভাবে করতে পারে? সেখানে তার নিজের ব্যক্তিগত যে চিন্তা, সাধ, আহ্লাদ তা-ই এসে তাকে ঘিরে ধরে। এই প্রসঙ্গে অনেকেই অনেকরকম প্রশ্ন করে। সংসারী মানুষরা একসময় 'একে' খুব প্রশ্ন

করত। তাদের উত্তরে যা বলা হত তা শুনে অনেকেই খুশি হত না। 'এ' তো তাদের মনগড়া কথা বলে তোয়াজ করত না। 'এ' তাদের বলেছে, না, আমি তো তোমাদের certificate দিতে আসিনি। তোমাদের certificate যে দেবার সে দেবে। 'এ' যা করছে যদি তা follow করতে পার কর, না-হলে করো না। সূর্য আলো দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কারওকে বেশি-কম দিচ্ছে না। যার যেরকম প্রয়োজন সেভাবেই সে আলোকে ব্যবহার করছে। কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে ফলাফলের দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরা দেখি যে, আমরা সবাই সমান নই। কাজেই একই ধর্ম বহুজন যখন আচরণ করছে, বহুরকম তার ফল সৃষ্টি হচ্ছে—একরকম নয়। এই জন্যই সংসার যেন 'গোলকধাঁধার' মতো। কিন্তু এর থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা একটাই। 'নিজেকে জানে যে, সর্বদুঃখ অতিক্রম করেছে সে।''আমি কে, কে আমার—এই বোধ হয়নি যার, মুক্তি নেই তার।' মুক্তি হল সমস্ত বিকারের উর্ধ্বে, যেখানে গুণের কোনও ক্রিয়া নেই। দেহ-ইন্দ্রিয় সেখানে যন্ত্রবৎ চলে, কর্তৃত্ব সেখানে নেই। আমরা বলি, আমি কর্ম করি, চিন্তা করি, ভাবনা করি। কিন্তু জ্ঞানীগণ বলেন, আমি কিছু করি না, আমি কিছু করতেই পারি না। কেননা কর্তৃত্ব হল প্রকৃতির, কর্তৃত্ব আত্মার নয়। আত্মা কখনও কর্তা হয় না। কিন্তু জীব মাত্রেই জানে, আমি কর্তা। এই আমি হল অহংকার। অহংকার হল প্রকৃতিজাত। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ"—প্রকৃতিই সর্বকর্ম করে, আমি কোনও কর্ম করতে পারি না, কারণ আমি হল শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ, আর অহংকার হল তমোরজোগুণযুক্ত জ্ঞানাভাস। তা-ই হল জীব।

জীবত্ব যদি পরিহার করতে হয় তাহলে আমাকে জ্ঞানাভাসের চর্চা করলে চলবে না, জ্ঞানস্বরূপের চর্চা করতে হবে। জ্ঞানস্বরূপ আর জ্ঞানাভাসের মধ্যে কিন্তু অনেক তফাত আছে। এই প্রসঙ্গে কিছু কথা আগেই বলা হয়েছে। আজকের প্রসঙ্গ হচ্ছে শ্যাম ও শ্যামলকে নিয়ে, অর্থাৎ যা চিরসবুজ, প্রাণবন্ত, জীবন্ত। তা মৃতপ্রায়, দুর্বল বা নিস্তেজ নয়। এই যে কথাগুলো বলা হল, সেই কথাগুলোর তাৎপর্য যাতে ভিতরে খেলে সেইজন্যই কিন্তু কথাগুলো বলা হচ্ছে, কারওকে ছোট-বড় ক'রে নয়। এই কথাগুলোর তাৎপর্য প্রত্যেকেরই অনুভব করা প্রয়োজন। তার কারণ আমাদের জীবত্ব অতিক্রম করতে হবে। জীবদশাকে ছেড়ে আমাদের শিবভাবে বা শিববোধে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শিব শব্দের অর্থ হল অখণ্ড চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ সত্যস্বরূপ। এই কথাগুলো আমরা ব্যবহার করি, কিন্তু এর অর্থবোধ মাথায় খেলে না। অর্থবোধ না-হলে কিন্তু আমাদের বিকার কাটবে না। কাজেই যে মন দিয়ে আমরা নাম-রূপের চিন্তাভাবনা করতে পারি রাতদিন, সেই মন দিয়েই নাম-রূপের অতীতে যেতে হবে। তাহলে দুটোর তফাত বোঝা যাবে ঠিক। একটা স্থূল, একটা সূক্ষ্ম, একটা সূক্ষ্মতর এবং আরেকটা সূক্ষ্মতম। আমরা যদি সূক্ষ্মতমের চিন্তা করি তাহলে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম আর স্থূল আপনিই সরে যাবে। "কোঽহম্", অর্থাৎ আমি কে? "কুতঃ আয়াত", অর্থাৎ কোথা হতে এসেছি? "কিম্ মম", অর্থাৎ আমার কী আছে? "কস্যোঽহম্", অর্থাৎ আমি কার? এই প্রশ্নগুলোর জবাব আমরা কোথায় পাব? আমরা তো প্রশ্ন তৈরি করে রেখেছি নাম-রূপের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখে।

জ্ঞানীর কাছে গেলে তিনি নিজস্বরূপ সম্বন্ধে-কী বলেন? 'কেবল অখণ্ডবোধোঽহম্ আনন্দোঽহম্ নিরন্তরম্।' আমি অহংদেব, কেবল অখণ্ড বোধস্বরূপ আনন্দস্বরূপ, আর কোনও পরিচয় আমার নেই। অখণ্ড বোধ আর আনন্দ এই যে পরিচয়টা, তা মনে রাখতে গেলে আমাকে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত এই কথাটা স্মরণে রাখতে হবে। 'স্মরণং স্মরণং নিত্য স্মরণং'—এটা লোকে ভজনে উচ্চারণ করে, কিন্তু তার মর্মার্থ কেউ ভাবনা করে না। তার কারণ বোধকে আমরা যেভাবে ব্যবহার করব সেভাবেই সে রূপ নেবে। এটা হচ্ছে বোধের একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যে কোনও ভাবের সঙ্গে যুক্ত হোক, সেই ভাবের রূপ নিলেও বোধ কিন্তু তার স্বরূপতা হারায় না। বোধ যেমন ছিল ঠিক তেমনই থাকে। এই যে গানের মধ্যে বলা হল—'তু মেরে জীবনকা জীবন প্রাণারাম / মেরে প্রীতম তু সবকো উরমে তু আত্মারাম।' অর্থাৎ সবার হৃদয়ে 'তুহি আত্মারাম'। আত্মারামের কাজ কী? তাঁ সাক্ষিচৈতন্য, মিশ্রচৈতন্য নয়। সবার হৃদয়ে তুমি সাক্ষিচৈতন্যরূপে বিরাজমান—কর্তারূপেও নয়, ভোক্তারূপেও নয়। সাক্ষী কোনওদিকেই কিন্তু অভিভূত হবে না—হলে আর সাক্ষিভাব থাকে না। কাজেই 'মেরে প্রীতম তু', অর্থাৎ তুমি আমার সবচাইতে প্রিয়তম। কেননা তোমার মতো প্রিয় বস্তু আমার আর কিছু নেই। গানের মধ্যে প্রিয়তমোত্তম কথাটা বলে দেওয়া হয়েছে। তা মানুষের মাথায় না-ঢুকলে তো এগুলোতে কোনও কাজ হবে না। কেন প্রিয়তমোত্তম বলা হয়েছে? প্রিয়তম কথাটা সবাই ব্যবহার করে। কিন্তু প্রিয়তমোত্তম কথার অর্থ কী? মানুষের সবচাইতে প্রিয় বস্তু হল তার ব্যষ্টি সত্তা। তাকে রক্ষা করার জন্য, পুষ্ট করার জন্য সে আজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করে। ব্যষ্টি আমি-র কাছে তার আমিই সবচাইতে প্রিয়। এই আমি কেন প্রিয় হল তা সে জানে না, কারণ এই ব্যষ্টি আমি অহংকার হল গুণভাবমিশ্রিত মলিন আমি বা সসীম আমি। তা বিকারী ও পরিণামী, কারণ তা প্রকৃতিজাত। এই আমি কাঁচা আমি অজ্ঞানী জ্ঞানাভাস। তার কেন্দ্রে অর্থাৎ এই আমি-র হৃদয়ে নিহিত যে অবিমিশ্র কূটস্থ সাক্ষিচৈতন্য তা-ই হল পাকা আমি অহংদেব আত্মারাম ব্রহ্ম ঈশ্বর পুরুষোত্তম ভগবান, সর্ব দ্বৈতমল বিবর্জিত নিত্য অদ্বৈত নিষ্কল নির্মল নিরঞ্জন সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা স্বয়ং 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং'। সেইজন্যই তা প্রিয়তমোত্তম, সবার নিত্য পূর্ণ দিব্য অমৃত আপন সত্তাস্বরূপ স্বয়ং। 'মেরে প্রীতম তু সবকো উরমে'—সবার হৃদয়ে 'তুহি আত্মারাম'। কাজেই আত্মা হল কেবল বোধস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। সেইজন্য আনন্দঘন শ্যাম, শ্যাম মানেই আত্মা।

'এ' কোনও মতবাদের কথায় আসছে না। তত্ত্বের দিক দিয়ে 'এ' কথাগুলো বলছে। *Tattva* does not compromise with any theory, thesis or doctrine but Itself is the essence of all of them. সবার হৃদয়ে যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে তত্ত্বত কারওর কোনও বিরোধ নেই, দ্বন্দ্ব নেই। কেননা তিনি শ্যামল সবল, দ্বন্দ্ব হলেই দুর্বল হয়ে যাবে। তাঁর তো কোনও প্রতিপক্ষ নেই, প্রতিদ্বন্দ্বী নেই ও বিপক্ষ নেই। আনন্দ দিয়ে প্রসঙ্গ শুরু করা হয়েছে, কারণ নিরানন্দের কোনও প্রশ্নই আসে না। অখণ্ড হলেই আনন্দ। সবসময় অখণ্ড না-হলে শুদ্ধ ভাব হয় না, খণ্ডের মধ্যে শুদ্ধ ভাব নেই। 'অখণ্ড আনন্দোঽহম্ কেবল বোধোঽহম্

নিরন্তরম্' কেবল শব্দের অর্থ হল omni, Absolute। সেখানে কোনও বিকল্প নেই। তাহলে আমি-র পরিচয় হল, I am the Knowledge Absolute and Bliss Absolute. I am not individual. আমি জীব নই। শিব শব্দের অর্থও কিন্তু the Absolute—the Highest Good, the Supreme Truth and Beauty। সেইজন্য গানের মধ্যে বলা হয়েছে—'নহি আমি জীব কভু নহি গুণবদ্ধ। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আমি নিত্য পূর্ণ সদাশিব।' নিত্যপূর্ণ সদাশিব। সদাশিবের অর্থ কী? Good Absolute, eternally Absolute. 'নহি আমি জীব কভু নহি গুণবদ্ধ/শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আমি নিত্য পূর্ণ সদাশিব/অদ্বয় ব্রহ্ম আত্মা আমি ঈশ্বর অক্ষর ভূমা অখণ্ড/সচ্চিদানন্দঘন আমি স্বতঃস্ফূর্ত পরমতত্ত্ব।'

'আমি' হল পরমতত্ত্ব। আমি অমুক চন্দ্র অমুক—কোনও উপাধি, বিশেষণ বা adjective সেখানে আর চলবে না। 'আকাশসম নির্মল আমি নিষ্ক্রিয় নির্বিকল্প।' আকাশের কোনও ক্রিয়া নেই, তা নিষ্ক্রিয়। আমার অর্থাৎ আমির কোনও অবলম্বন নেই, support দরকার হয় না। 'আকাশসম নির্মল আমি নিষ্ক্রিয় নির্বিকল্প/নির্বিকার নিরাকার আমি নিরবলম্ব।' নির্বিকার, অর্থাৎ বিকার নেই। নিরাকার, অর্থাৎ কোনও আকার নেই। নিরবলম্ব, অর্থাৎ কোনও অবলম্বন নেই। 'কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব শূন্য ভাবাতীত দ্বন্দ্বাতীত/প্রশান্ত অমৃত আমি শাশ্বত অচ্যুত।' এই কথাগুলো যদি 'এ' এক-এক করে বলতে আরম্ভ করে তবে সারারাত চলে যাবে। কিন্তু সেটুকু গ্রহণ করবার মতো মন তৈরি না-থাকলে কেউই এখানে বসে থাকবে না। তা তো একদিনে হয়নি। কিন্তু যখন হয়েছে তখন কী অনুভব করেছি যে, না-হওয়াটা স্বপ্ন এবং হওয়াটা স্বপ্ন নয়? যাদের হচ্ছে না তারা স্বপ্ন দেখছে—জাগতিক বা কাল্পনিক। তাদের কত সাধ, সেগুলো পূরণের স্বপ্ন। যেগুলো আছে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের স্বপ্ন ইত্যাদি, so and so। তাকে শাস্ত্রে বলে যোগক্ষেম। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি হল যোগ আর প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ হল ক্ষেম। কিন্তু শুদ্ধ আমি-র মধ্যে এগুলো কোথায়? সেইজন্য বলা হয়েছে—'প্রশান্ত অমৃত শাশ্বত অচ্যুত/নাহি মোর জন্ম মৃত্যু নাহি মোর উদয় অস্ত।' অর্থাৎ আসা-যাওয়া নেই। 'নাহি মোর জন্মমৃত্যু নাহি উদয় অস্ত/ক্ষয় বৃদ্ধি বিবর্জিত আমি গতাগতি রহিত।' 'স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংপ্রভু অনন্ত বিভু নিত্যাদ্বৈত/স্বানুভবরসসিন্ধু সারাৎসার আত্মতত্ত্ব।' স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রভু আমি অনন্ত বিভু নিত্যাদ্বৈত। বোধানন্দ রসসাগর আমি সারাৎসার আত্মতত্ত্ব। এই আত্মতত্ত্বই হল সচ্চিদানন্দঘন পরমতত্ত্ব ঈশ্বর ব্রহ্ম পরমাত্মা অহংদেব পাকা আমি।

এই যে কথাগুলি বলা হয়েছে এর অর্থ হল, 'আমি-র' মধ্যে এগুলো নেই। জন্ম-মৃত্যু নেই—"নাহং জাতঃ ন প্রবৃদ্ধৌ ন নষ্টো দেহোস্যোক্তা প্রাকৃতাঃ সর্ব ধর্মাঃ কর্তৃত্বাদি চিন্ময়স্য অস্তি নাহংকারস্য এবহি আত্মন্যো মে শিবোঽহং সর্বাতীতোঽহং।।" অর্থাৎ আমি জাত হইনি, আমার কোনও বৃদ্ধি নেই। "নাহং জাতঃ ন প্রবৃদ্ধৌ ন নষ্টো", অর্থাৎ আমি জাত নই, আমার কোনও ক্ষয়ক্ষতি ও নাশ নেই। "*দেহোস্যোক্তা প্রাকৃতাঃ সর্ব ধর্মাঃ*" অর্থাৎ এগুলি প্রকৃতিজাত দেহের ধর্ম, আমি তো দেহ নই। দেহের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, জরা আছে, ব্যাধি আছে, ক্ষয় আছে, নাশ আছে। আমি কেবল এসবের সাক্ষিমাত্র। এই সাক্ষী আমি শুধু বোধমাত্র। সেখানে

"দেহোস্যোক্তা প্রাকৃতাঃ সর্ব ধর্মাঃ" অর্থাৎ চিদাত্মা আমি-র কোনও কার্য নেই। দেহের ধর্মগুলি হচ্ছে প্রকৃতির ধর্ম, কর্তৃত্ব দিয়ে প্রকৃতি যে চলে সেই ধর্ম, তা চিন্ময় আত্মার ধর্ম নয়, অহংকারের ধর্ম। Pure Consciousness is beginningless and endless, but everything in the creation has beginning and end.

প্রকৃতিজাত অহংকারের উদয়-অস্ত আছে, আবির্ভাব-তিরোভাব আছে। এই অহংকার দেহাত্মবুদ্ধিযুক্ত। দেহ ছাড়া অহংকার সক্রিয় হতে পারে না। দেহের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে থাকে, কারণ তা পাঞ্চভৌতিক। আত্মার কোনও দেহ নেই এবং অহংকারও নেই। আত্মা হল অখণ্ড শুদ্ধ চৈতন্যসত্তা, সর্বপ্রকাশের সাক্ষী। অহংকার আত্মারই আভাস, কিন্তু দেহের সঙ্গে তার স্বভাবজাত সম্বন্ধ। গুণভাবের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে অহংকার সসীম ও দেশ-কাল, কার্য-কারণের অধীন। আত্মা গুণাতীত ভাবাতীত দ্বন্দ্বাতীত বলে সর্ববিধ ভেদের অতীত, দেহ হতে বুদ্ধি পর্যন্ত সর্ব উপাধিবর্জিত, নাম-রূপাদি ভেদরহিত, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি ষড়্‌ভাবশূন্য, অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ। অহংকার ও আত্মার মধ্যে মূলত পার্থক্য এই ভাবে অনুভূত হয়। আত্মার অহংকার নেই বলে দেহের সঙ্গে কোনও সম্পর্কও নেই। পাকা আমি আত্মার আমি অহংদেব নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। সেইজন্য বলা হয়েছে, পাকা আমি আত্মার আমি দেহাতীত সর্বাতীত। "দেহ অন্নস্তাৎ ন মে দেহ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি কাস্যাদি লয়াদয়ো। অপ্রাণো হি অমনা শব্দাদি বিষয়াসঙ্গ নিরিন্দ্রিয় তয়া ন চ।" অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি অনাত্মার ধর্ম অহংকারকে ব্যবহার করে ভ্রান্তিবশত আত্মার আমিতে তা আরোপিত ও কল্পিত হয় মনের দ্বারা। সেই কল্পনাজাত ফল মন ভোগ করে। 'আমি' শুধু সাক্ষিরূপে উপস্থিত থাকি। শব্দাদি বিষয়ের সঙ্গে আত্মার কোনও সম্বন্ধ নেই।

আমাদের মধ্যে দুটি সত্তা বা দুটি আমি আছে। একটি আমি অহংকার কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের মাধ্যমে জড়িয়ে আছে—মান, অভিমান, দম্ভ, দর্প, গর্ব, সুখ, দুঃখ, কষ্ট, ভাবনাচিন্তা সব অহংকারের বা কাঁচা আমি-র। 'পাকা আমি' শুধু বসে দেখে, সে নিস্পৃহ অনঙ্গ অসঙ্গ সর্ববিধ দ্বৈতভাবাদিরহিত নিত্যবর্তমান। তার মনও নেই, প্রাণও নেই। সুতরাং সর্ববিধ মন-প্রাণের যে ধর্ম তা তাতে শূন্য। অহংকারের পশ্চাতে এই পাকা আমি নিত্য সাক্ষিরূপে বর্তমান থাকলেও কাঁচা আমি অহংকার তাকে জানে না এবং মানেও না। কাঁচা আমি অহংকার প্রকৃতিজাত গুণভাবের দ্বারা পরিচালিত হয় বলে সেগুলি তার কাছে সত্য বলে অনুমিত হয়। প্রকৃতি কাজ করে অহংকারের মাধ্যমে। সেইজন্য মানুষের মধ্যে 'আমার ও আমি ভাবের' ব্যবহার অভ্যাসবশতই হয়ে থাকে। আসল 'আমি' কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা নয়—এই কথা মনে রাখার জন্যই তা বারবার উল্লেখ করা হয়। অহংকার যা করে তা সে নিজেই সব বোঝে না, তার ভুলভ্রান্তিও সে নিজে জানতে পারে না অন্যে জানিয়ে না-দিলে। অহংকার যেমন কর্তৃত্বভাব দিয়ে কর্ম করে সেইরূপ ভোক্তৃত্বভাব দিয়ে তা আবার ভোগ করে। স্বকৃত কর্মের ফল ভোগকালে অহংকার বুঝতে পারে না যে, এই ভোগ তারই সৃষ্টি। সুখভোগে তার স্পৃহা বেশি, কিন্তু দুঃখভোগে তার আপত্তি। সুখ-দুঃখ ভোগ স্বকৃত কর্মের ফল। তা অবশ্যই সকলকে

ভোগ করতে হয়। কর্মফলশূন্য হলে কোনও ভোগই থাকে না। কর্মফল শূন্য হয় কী করে? এর উত্তর গানের মাধ্যমে বলা হয়েছে—

গুরু এবার কৃপা করে তোমার অঙ্ক শেখাও মোরে
শেখাও মোরে তোমার নামতা আগে পরে শুদ্ধ করে।।
শেখাও মোরে সাংখ্যতত্ত্ব তোমার নিত্যবোধে যুক্ত করে
অহংকার অভিমানের বিয়োগ হয় কেমন করে।।
কেমন করে পূর্ণবোধে থাকবো আমি গুণের ঘরে
গুণাতীত তুরীয়স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হবে মোর কেমন করে।।
ভাগফল শূন্য হয় গুরু কোন বোধে থাকলে পরে
মুক্তি শান্তি পাবার তরে আছি তোমা পরে নির্ভর করে।।
সগুণের খেলা খেলেও গুরু কেমনে থাকো তুমি নির্বিকারে
নির্গুণে সগুণে কেমন করে থাকো তুমি চিরতরে।।

(পূরবী—তেওড়া)

গুরু তোমার সেই অঙ্ক শেখাও আমাকে যে অঙ্ক শিখলে বিয়োগের ফল বিয়োগ হয় না, গুণের ফল গুণ হয় না, ভাগের ফল শূন্য হয়। সেই সাংখ্যতত্ত্ব জ্ঞানের তত্ত্ব তুমি আমায় শেখালে আমাকে আর তথ্য ও পথ্যের পিছনে রাত-দিন মেহনত করতে হবে না। গুণের ঘরে থেকেও তুমি কর্ম কর গুণাতীতবোধে কী করে? সর্ববিধ দ্বৈতের মধ্যে থেকেও তুমি অদ্বৈত নির্বিকার সম শান্ত পূর্ণ থাক কেমন করে? তুমি না-শেখালে জানব আমি এসব কেমন করে? ভজনের মাধ্যমে এসব তত্ত্বপূর্ণ গান পরিবেষণ করা হয়েছে। সবাইকে গানের কথাগুলির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বা মর্মার্থ বিশেষ করে ভাবতে বলা হয়েছে। তাহলে তার অন্তর্নিহিত রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে। প্রত্যেকের স্ববোধে চিদাত্মাগুরু নিত্যবর্তমান। স্বভাবের মাধ্যমে তাঁকে কী ভাবে ধরা যায়, দেখা যায় ও জানা যায় সেই রহস্যটি নানা ভঙ্গিমায় সবার সামনে বলা হচ্ছে। বাজারে কতগুলো readymade খাবার পাওয়া যায়। তা কিনে এনে বাড়িতে একটু গরম করে নিয়ে ব্যবহার করতে হয়। গরম না-করলে তার প্রতিক্রিয়া বা বিকার হয়। লোকে সাধুসন্তদের সঙ্গ করে তাঁদের কাছ থেকে যে সৎপ্রসঙ্গ সংগ্রহ করে আনে তা নিজের মধ্যে ব্যবহার করার যে পদ্ধতি তা স্ববোধে সচেতন ভাবে করতে হয়। তা-ই হল জাবর কাটা। সচেতন ভাবে তা ব্যবহার করতে গেলে অন্তরের ভাববোধের একাগ্রতা দরকার হয়। তার ফলে অন্তর্বোধের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় বোধের জ্যোতির মাধ্যমে। বোধের জ্যোতি ব্যবহারের ফলে অন্তরে তাপের সৃষ্টি হয়। তা-ই হল তপস্যার মর্ম কথা।

অন্তরে বোধ দিয়ে, তাপ দিয়ে ব্যবহার করলে তবেই তপস্যা হয়। বোধের তাপে ব্যবহার করলে অন্তরে তা গরম হয়, অর্থাৎ অন্তরে বোধের বিকাশ হয়। তার ফলে অবিদ্যা-অজ্ঞানজাত তমোরজোগুণের শোধন হয়। তমঃ-এর জড়তা কাটে অন্তরে, বোধের expansion হয়, অন্তর্বোধের বিকাশে অর্থাৎ স্বভাবে সত্ত্বগুণের বিকাশে। তমোগুণের rigidity, stiffness,

inertness, passivity, dullness, inactivity এবং রজোগুণের projection-জনিত restlessness, movement, agitation, desire, wrath, diversities, differences প্রভৃতি পরিশোধিত হয়। তার ফলে সত্ত্বপ্রধান গুণভাবের বিস্তার হয় অন্তরে, বিকাশপ্রকাশ বাড়ে। তপস্যা বিনা এসব সম্ভব হয় না। সদ্‌গুরুর নির্দেশ ও তত্ত্বাবধান ব্যতীত তপস্যা ফলবতী হয় না। তপস্যার ফল নিজে ভোগ করলে তার প্রতিক্রিয়া হয়। তার ফলে তপভ্রষ্ট, যোগভ্রষ্ট বা পতন হয়। তপস্যা অহংকার দিয়ে আরম্ভ হয় সত্য, কিন্তু সেই অহংকার সত্ত্বগুণী অহংকার। সত্ত্বগুণী সাধক তপস্যার ফল গুরুকেই সমর্পণ করে দেয়। রজোগুণী নিজে তপস্যার ফল ভোগ করতে চায়, সেইজন্যই তার পতন হয়। তমোগুণীর তপস্যা ভোগ ও নিদ্রা।

তপস্যার ফল অর্থাৎ সিদ্ধি সদ্‌গুরুর কৃপাতেই লব্ধ হয়। সেই সিদ্ধি গুরুচরণে সমর্পণ করতে হয়। তা-ই হল আসল গুরুদক্ষিণা। রজোগুণী সাধক তপস্যার ফল গুরুকে না-দিয়ে নিজে রাখে ও নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে বলে তার ফলভোগ তাকে করতে হয়। সত্ত্বগুণী অকর্তাবোধে কর্ম করে বলে কর্মের ফল তাকে স্পর্শ করে না। সোজা কথায়, অহংকার দ্বারা কৃতকর্মের ফল অহংকারকেই ভোগ করতে হয় এবং ত্বংকার দ্বারা কৃতকর্মের ফল সাধককে ভোগ করতে হয় না। সত্ত্বগুণী সাধক ত্বংকারের ভজন করে ঈশ্বরের প্রীতিনিমিত্ত এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণী সাধক অহংদেব আত্মারামের ভজন করে। আজকে যে আনন্দঘন শ্যাম ভজনটি করা হল তা ত্বংকারের ভজন। এই ভজনের শেষে অহংকার চলে গিয়ে কী করে অহংদেবের আমি উদয় হয় তারই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রথম অংশের বক্তব্যের বিষয়বস্তু, বাকি অংশ পরের দিন শেষ হবে। অহংকার ত্বংকারের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে কী করে অহংদেবে পরিণত হয় অর্থাৎ কাঁচা আমি কী করে পাকা আমিতে পরিণত হয় তা খুব রহস্যপূর্ণ এবং দুর্বোধ্য বিষয় সাধারণ মানুষের কাছে। সমষ্টি ও ব্যষ্টির কথা পূর্বে বলা হয়েছে। প্রতি ব্যষ্টিই সমষ্টির মধ্যে জাত ও স্থিত। এই সমষ্টি সত্তা-শক্তি হল Universal Being and becoming। ব্যষ্টি সত্তা-শক্তি তার মধ্যেই জাত ও তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ব্যষ্টি ভাববোধ নিজেকেই জানে না আর সমষ্টি ভাববোধকে জানার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের যে ব্যষ্টি ভাববোধ তার দ্বারা সমষ্টি ভাববোধকে জানতে পারি না, কিন্তু মানতে পারি। মানতে না-পারলে জানতেও পারা যাবে না।

পরস্পর দু'টি ব্যষ্টি আমি-র মধ্যে মূলত বা স্বরূপত এক আত্মা থাকলেও স্বভাবপ্রকৃতির দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্যই সর্বাধিক অনুমিত হয়। ব্যষ্টি আমি নিজ হতে অপরের এবং অপর হতে নিজের যে ভেদ বা পার্থক্য সেটাই জানে। তা পরস্পরের মধ্যে অভেদ বা ঐক্য সম্বন্ধ জানেও না এবং মানেও না। সেইজন্য অহংকারী অভিমানী কাঁচা আমি নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা মহৎ কাউকে মানতে পারে না এবং জ্ঞানীগুণীর গুণ মর্যাদা দিতে পারে না। অপরের মধ্যে নিজ অপেক্ষা শ্রেয় গুণভাব বোধকে না-মেনে অভিমানবশত অপরের দোষদর্শনই করে বেশি। এই সকল দোষ থেকে মুক্ত হবার যে ঔষধ বা উপায় তা বস্তুসাপেক্ষও নয়,

ব্যক্তিসাপেক্ষও নয়, তা হল অবিমিশ্র শুদ্ধবোধ। তা-ই হল সম্বোধি, সর্ববিস্মরের একমাত্র মহৌষধ। আপনবোধে হয় তার ব্যবহার। এই আপনবোধের ব্যবহার দ্বারা নিজের স্ববোধস্বরূপের স্বভাবজাত অন্তরায়গুলিকে দূর করা সম্ভব। আপনবোধের ব্যবহার মানে সমবোধের ব্যবহার, অদ্বয়বোধের ব্যবহার, এক আমি-র ব্যবহার। তার দ্বারা দ্বৈতবোধের ব্যবহারের সর্ববিধ দোষত্রুটি নির্মূল হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে—By the remembrance of one's own Self which is ever-pure Knowledge Absolute and Bliss Absolute, one can transcend all contradictions, conditions, limitations, troubles and miseries of life। অর্থাৎ আত্মভাবনার দ্বারাই অনাত্মভাবনাকে অতিক্রম করা সর্বাপেক্ষা সহজ। সেইজন্য পুনঃ পুনঃ বলা হয়, নিজের আত্মবোধকে স্ববোধস্বরূপকে অন্তরে-বাইরে সতত স্মরণ করে চলতে অভ্যাস কর। প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্তে, প্রতি কাজে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে সর্বতোভাবে আমরা যদি ঈশ্বরাত্মাকে স্মরণ করি তাহলে অনাত্মপ্রীতি, অনাত্মার প্রভাব, তার যে ফল—এ সবই নিবৃত্ত হবে। আত্মবোধের দৃষ্টিতে অনাত্মপ্রীতি থাকে না, আত্মপ্রীতি থাকে, যেমন অনাত্মার দৃষ্টিতে অনাত্মপ্রীতি থাকে, আত্মপ্রীতি থাকে না। অনাত্মার প্রীতিতে আত্মপ্রীতি আবৃত থাকে, আবার আত্মপ্রীতিতে অনাত্মার প্রীতির অস্তিত্বই থাকে না। অনাত্মপ্রীতি হয় মলিন মনে তমোরজোভাবযোগে। আত্মপ্রীতি হয় শুদ্ধবোধে সমবোধে আপনবোধে অদ্বৈতবোধে। তাতে গুণভাবের একান্ত অভাব থাকে। যতক্ষণ মনাধীন জীবন ততক্ষণ অনাত্মার প্রাধান্যে দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। স্ববোধের ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত। মনের বিষয়প্রীতি হল অনাত্মপ্রীতি। আর বোধের প্রতি বোধের প্রীতি হল আত্মপ্রীতি। মনের বিষয় অনাত্মা, কিন্তু আত্মা নয়। অপরপক্ষে বোধের বিষয় আত্মা, মন নয়।

কাজেই 'আনন্দঘন শ্যাম তু মেরে জীবন কা জীবন প্রাণারাম।। মেরে প্রীতম তু সবকো উরমে তু আত্মারাম। দিব্যমহিমা আপনা প্রকাশো ভগবান।। ....তু মেরা মন কা মন প্রাণ কা প্রাণ তু মেরে শান্তিনিধান।।' হে আত্মারাম, প্রাণারাম, আনন্দঘন শ্যাম আমার শান্তির কেন্দ্রে তুমি। শুধু প্রীতম নও, প্রিয়তমোত্তম—'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং।' বাইরে একটা মূর্তি মাত্র হলে তুমি আমার শান্তিধাম হতে পার না। তাই আত্মভজনকে ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। কারণ অনেকেরই অভিযোগ যে, বাবাঠাকুর তো শুধু জ্ঞানের কথা বলেন, ভক্তির কথা তো বলেন না। ভক্তিপ্রসঙ্গে বাবাঠাকুরের ধারাবাহিক যে আলোচনা তা তারা শোনেনি। তাহলে এরকম কথা তারা বলতে পারে না। ভক্তিকে বাবাঠাকুর যে কত গভীরে অনুশীলন করেছেন সেই প্রসঙ্গে আজকে বেশি কথা বলা চলবে না। তবে সংক্ষেপে বলি সেই ভক্তি আমাদের গতানুগতিক ভক্তির সঙ্গে মিলবে না। তা হল অদ্বৈতের ভক্তি। দ্বৈতের ভক্তিতে স্বার্থ থাকে, আসক্তি থাকে, ভেদভাবনা থাকে, তার ফলে বিকার থাকে। অদ্বৈতের ভক্তি হল Oneness of Knowledge and Knowledge of Oneness, Science of Oneness of man, God and universe, এক কথায় Knowledge of Knowledge। সেই বোধের স্বরূপ কখনও বিচ্যুত হয় না, তা কেন্দ্রবোধের সঙ্গে অভিন্নভাবে একাত্মভাবে নিত্যবর্তমান।

তাই সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা বোধরূপতয়াহি আত্মনঃ স্বাত্মবোধরূপ পুরুষোত্তমোহং।" তাকে একটু ঘুরিয়েও বলা হয়েছে—"স্ববোধেন অন্যবোধেচ্ছা" ইত্যাদি। প্রথমটি হল "স্ববোধে" সপ্তমী বিভক্তি এবং দ্বিতীয়টিতে "স্ববোধেন" তৃতীয়া বিভক্তি। অর্থাৎ আপনবোধের দ্বারাই আপনবোধ স্বয়ংসিদ্ধ স্বয়ংপূর্ণ। বক্তব্যের তাৎপর্য হল, আপনবোধে অন্যবোধ থাকে না, আপন বোধস্বরূপ আত্মা স্বয়ং পুরুষোত্তম। তাতে বোধের স্বয়ংপ্রকাশতার মধ্যে বোধের কোনও ব্যতিক্রম হয় না। এই আপনবোধে আপনাকে দেখা-শোনা-জানা হল অদ্বৈতের ভক্তি। অর্থাৎ বোধ দিয়ে বোধকে ব্যবহার করার নামই হল ভক্তি। এইরূপ কথা যতই শুনবে ততই নূতন মনে হবে, কঠিন মনে হবে। কঠিন মনে করিয়ে দিচ্ছে তোমার মন অহংকার। এগুলো যে আপনিই আত্মার কাছে চলে যাচ্ছে স্ববোধের ধর্ম অনুসারে তা কিন্তু অহংকার বুঝতে দেবে না। সে তোমাকে দেহের মধ্যে টেনে আনবে, ইন্দ্রিয়-প্রাণের পর্যায়ে নিয়ে আসবে, তোমার অভিমানকে বাড়িয়ে দিয়ে, গর্ব, দর্প, দম্ভের মধ্যে নিয়ে এসে পরদোষ দর্শন করাবে। সে কিছুতেই নিজেকে হারাবে না এবং কিছুতেই তোমাকে কেন্দ্রে যেতে দেবে না।

এমতাবস্থায় একমাত্র সহায় হলেন আত্মগুরু। যাঁর হৃদয়ে আত্মজ্ঞান জেগে উঠেছে তিনিই আত্মগুরু। তিনি প্রত্যেকের নিজের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করিয়ে দেন। তিনি আবার আমি-র আমিতে যে আত্মা আছে তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত বলে তাঁর কথাই সবাইকে শুনিয়ে দেন এবং তদ্‌বোধে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে দেন। সবার মন-বুদ্ধি-অহংকারের মধ্যে, অর্থাৎ অন্তরের চিদাভাসের মধ্যে তাঁরই আভাস খেলে। এ কথাও তিনি সবাইকে বলেন 'আমিকে কেন্দ্র করে আমি-র চারধারে খেলি আমি, আমি-র মহিমা প্রকাশ করে, অনন্ত অনন্ত ভাবে নামে রূপের মাঝারে। এসবের মধ্যে ব্যক্ত হয়েও আমি অব্যক্ত। আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ সাগরে।' In each and every individual, 'I' ever exists as the Background of all, as the Substratum of all, as the underlying Essence of all, as the life-pervading truth of all. এইরূপ বোধে তোমার আমি-র মধ্যে আমাকে যখন তুমি আমিবোধে পাবে তখন তোমার 'আমিবোধই' স্বতঃস্ফূর্ত হবে এবং আমারবোধ সরে যাবে। অন্যথা তা হবার নয়। ধর্মজগতে সবাইকে যে ইষ্টচিন্তা, গুরুচিন্তা করতে বলা হয় তার তাৎপর্য সবাই বোঝে না। তা হল নিজবোধ দিয়ে, স্ববোধ দিয়ে সর্ববোধের ব্যবহার। অর্থাৎ এক-এর বোধকে এক-এর বোধ দিয়ে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, বহুর বোধ দিয়ে নয়। আমারবোধ দিয়ে আমিকে ব্যবহার নয় এবং আমিবোধ দিয়ে আমার ব্যবহার নয়। তা হল আমিবোধ দিয়ে আমি-র ব্যবহার। তাই বলা হয়েছে, জগতে আছে শুধু একটি মাত্র আমি অখণ্ডভূমা অহংদেব। "একোঽহং দ্বিতীয় নাস্তি।" "মত্তঃ পরতর নান্যৎ কিঞ্চিৎ অত্র অস্তি বিশ্বং সত্যং বাহ্যং বস্তুং মায়া উপক্লৃপ্তং। আদর্শ অন্তর্ভাসমানস্যতুল্যং মদ্‌যৎদ্বৈতে ভাতি তস্মাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পুরুষোত্তম কেবলোঽহং।" অর্থাৎ একমাত্র আমিই আছি, দ্বিতীয় কেউ নেই। আমি অতিরিক্ত জগৎরূপে যা প্রতিভাত হয় তা মনোমায়ার সৃষ্টি, কল্পনামাত্র। তা দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিম্বের মতো আমাতে আমার দ্বারাই প্রতিভাত হয়। আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পুরুষোত্তম স্বয়ং। "স্বেনৈব পূরিতং

সর্বং" অর্থাৎ "ময়ৈব পুরিতং সর্বং"—আমার দ্বারাই সব পরিপূর্ণ। "ময়ৈব সকলং জাতম্। ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তস্মাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মাত্মাদ্বয় কেবলোঽহং।" অর্থাৎ আমাতে সব জাত, আমাতেই সব প্রতিষ্ঠিত, আবার আমাতেই সব লীন হয়ে যায়। এই আমিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-আত্মা অদ্বয় স্বয়ং। "ন মত্তঃ হেয়তর কশ্চিৎ ন মৎসম কশ্চিৎ ন তু মত্তঃ পরতর কশ্চিৎ।" অর্থাৎ আমাতে আমা অপেক্ষা হেয় বা নিকৃষ্ট কেউ নেই, আমার সমানও কেউ নেই এবং আমার থেকে শ্রেষ্ঠও কেউ নেই। এই হল নিত্যাদ্বৈত অহংদেব পাকা আমিপরমাত্মা পুরুষোত্তমের পরিচয়। This is the Science of Oneness, Knowledge of Oneness/Oneness of Knowledge and Knowledge of Knowledge— 'জ্ঞানস্য জ্ঞানং প্রজ্ঞানস্বরূপম্ কেবলম্।' আপনবোধে তার ব্যবহার স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত। আত্মার ব্যবহার আপনবোধেই নিত্যসিদ্ধ, অপরবোধে বা অন্যবোধে নয়। মন-অহংকার ভেদজ্ঞান দ্বারা অপরবোধে ভিন্নবোধে পৃথকবোধে অনাত্মার ব্যবহার করে। অথচ "জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞানম্ যস্মান্ন ভিন্নম্।" অর্থাৎ আত্মা হতে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান ভিন্ন নয়। "যস্য স্মরণমাত্রেণ জ্ঞানং সম্পদ্যতে তদা।" জ্ঞানের স্মরণমাত্র জ্ঞানই জাত হয়। "তস্মৈ শ্রীজ্ঞানাত্মগুরবে নমঃ।" জ্ঞানাত্মা গুরুকে নমস্কার। এখানে গুরু আর আত্মা অভিন্ন অদ্বয় একতত্ত্ব। গুরু আত্মা অতিরিক্ত বা আত্মা গুরু ছাড়া সম্ভব নয়। উভয়ই এক অখণ্ড ভূমাস্বরূপ, সেইজন্যই অখণ্ড আনন্দঘন। আনন্দঘন শ্যাম, আনন্দরস রাম, আনন্দঘন আত্মা। গানের ভাষায় বলা হয়েছে, আত্মারাম প্রাণারাম।

আত্মার বিজ্ঞান প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষের বিশেষ জ্ঞান/অনুভূতি থাকে না। তোমাদের কাছে সেই প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে কিন্তু তোমাদের পূর্বে ধারণা ভালভাবে ছিল না, বর্তমানেও ভাল ভাবে নেই। এ কথাগুলো তোমাদের আপন সম্পদ, আপনসত্তার সত্য পরিচয়। এগুলি সচেতনভাবে ব্যবহার করলে তার তাৎপর্য ও ফল তোমাদের অন্তরে আপনিই প্রকাশিত হবে। সেইজন্য সূত্রে বলা হয়েছে—"যস্য স্মরণমাত্রেণ জ্ঞানং সম্পদ্যতে তদা।" অর্থাৎ যাঁকে স্মরণ করলেই জ্ঞান জেগে ওঠে। তা কী? তা কিন্তু জ্ঞান অতিরিক্ত কিছু নয়, জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং। জ্ঞানের স্মরণ দ্বারা জ্ঞানই জাগে, অজ্ঞান জাগে না। মন দিয়ে যে যা ভাবে তা-ই তার মনে উদিত হয়। ভাবনা অনুযায়ী হয় বোধের প্রকাশবিকাশ। নীল ভাবনার দ্বারা অন্তরে নীলবোধ জেগে ওঠে, লাল ভাবনার দ্বারা লালবোধ জেগে ওঠে, সেইরূপ সত্য ভাবনার দ্বারা অন্তরে সত্যবোধই জাগবে, অন্য কিছু নয়। আবার আনন্দ ভাবনার দ্বারা অন্তরে আনন্দবোধই জাগবে, নিরানন্দবোধ জাগবে না।

ভাবনার মাধ্যমে অন্তরে ভাববোধের উদয় হয়—এ কথা এখন পরিষ্কার হল। এবার ভাবনার মাধ্যমে আত্মানুশীলনের কয়েকটি পদ্ধতি পরপর বলা হচ্ছে, তা তোমরা মন দিয়ে শোন এবং নিরন্তর তা অভ্যাস করার চেষ্টা কর। (১) 'সত্যস্বরূপ কেবলোঽহম্, (২) চিদ্/বোধস্বরূপ কেবলোঽহম্, (৩) আনন্দস্বরূপ কেবলোঽহম্, (৪) নিত্যস্বরূপ কেবলোঽহম্, (৫) মুক্তস্বরূপ কেবলোঽহম্, (৬) অখণ্ডস্বরূপ কেবলোঽহম্, (৭) অনন্তস্বরূপ কেবলোঽহম্,

(৮) অদ্বৈতস্বরূপ কেবলোঽহম্, (৯) ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম অদ্বয়ম্ স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব কেবলোঽহম্। (১০) অখণ্ড ভূমাদেবোঽহম্, (১১) সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলোঽহম্, (১২) প্রজ্ঞানব্রহ্ম আত্মা অহম্, (১৩) অহংদেব আত্মারাম প্রাণারাম পুরুষোত্তমোঽহং, (১৪) স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ অয়ং আত্মা পরব্রহ্ম, (১৫) মত্তঃ পরতর নান্যৎ কিঞ্চিৎ অত্র অস্তি বিশ্বং প্রতিভাস মে কেবলম্, (১৬) মত্তঃ সর্বম্ অহমেব সর্বম্ ময়ি সর্বম্ সনাতনোঽহম্ অক্ষর নিত্য পরমাত্মা আত্মসংশ্রয় ব্রহ্মসংজ্ঞা আত্মসংজ্ঞা আদি চ মধ্য চ পরতঃ পুমাণ।' এই মন্ত্রগুলি হল নিত্য অদ্বৈত সিদ্ধ মন্ত্র। তা যে যতখানি অনুশীলন করবে সে তদনুরূপ ফল পাবে। জাগ্রৎ অবস্থায় ওঠা, বসা, বিশ্রাম করা (শয়ন করা), চলাফেরা, কাজকর্ম করা—সর্ব অবস্থাতেই এই সকল নিত্যশুদ্ধ সিদ্ধ মন্ত্র সর্বোত্তম ফলপ্রদ।

এই পূর্বোক্ত সর্বার্থসিদ্ধি উত্তম ফলপ্রদ অমৃত বাক্স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন অশুদ্ধ মন-অহংকার অভ্যাস করবে না। সে দেহবুদ্ধি নিয়ে চলে ব'লে অনাত্মসেবী, ইন্দ্রিয়-মনের প্রীত্যর্থে নাম-রূপের সেবায় এবং কল্পিত ভাববোধের ব্যবহারে সতত ব্যস্ত থাকে কর্তব্য ও দায়িত্বের দোহাই দিয়ে। তা প্রিয়বোধে ব্যবহার করতে সে অভ্যস্ত এবং অপ্রিয়বোধে ও অজ্ঞেয়বোধে আপন সত্যস্বরূপকে ভুলেই আছে। তার এই আত্মবিস্মৃতির কারণ হল অনাত্মপ্রীতি। এই অনাত্মপ্রীতি অবিদ্যা-অজ্ঞানেরই ফলস্বরূপ। তার প্রতিক্রিয়াদি জীবনে দুর্ভোগরূপে ভোগ করতে হয় এবং দেহবুদ্ধির দ্বারা এই দুর্ভোগাদি অনুভূত হয়। তা ভোগের মাধ্যমে একদিকে বিকারের মাত্রা কমে সত্য, আরেকদিকে বিকারের মাত্রা বাড়েও। সেইজন্য দেখা যায় উন্নত পর্যায়ের সাধুসন্ত মহাত্মাদের মধ্যে জীবনে সংস্কারজাত প্রারব্ধ ভোগের উদয় হলে তা তাঁরা স্বীকার করে নেন, সরিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করেন না। কিন্তু সাধারণ সাধুসন্তগণ তা নিরাময় করার জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হন। লৌকিক দৃষ্টিতে শেষোক্ত দলকেই সমর্থন সবাই করবে, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে প্রথম দলের সমর্থনই গ্রাহ্য, কারণ আত্মবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আত্মা অকর্তা-অভোক্তা কেবল সাক্ষিদ্রষ্টামাত্র। কর্ম করে প্রকৃতি জীবের অন্তরে বসে। জীবের মধ্যে কাম-কর্ম-কর্তৃত্ব হল প্রকৃতির স্বভাবজাত। স্বভাবের অন্তরে এসে নিরন্তর সে তা সম্পন্ন করছে। নিষ্ক্রিয় আত্মা কেবল সাক্ষিরূপে তা দর্শন করছে, আত্মা তাতে লিপ্ত হয় না, লিপ্ত হয় তাঁর আভাস অন্তরের স্বভাব (অন্তঃকরণ চতুষ্টয়—মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত)।

স্বভাবপ্রকৃতি সংকল্পমাত্র অর্থাৎ কল্পনার দ্বারা জীবজগৎ সৃষ্টি ক'রে তা স্বভাবের মাধ্যমে আস্বাদন করে এবং পরিণামে আত্মার সঙ্গে মিশে যায়। আত্মজ্ঞানী মহাত্মাদের স্বভাব শুদ্ধ হয়ে যায় বলে তাঁদের অন্তঃকরণে মল থাকে না। তাঁরা সংকল্পমাত্র সব সাধন করতে পারেন সত্য, কিন্তু তা তাঁরা না-করে জগৎকল্যাণে ব্রতী হন। তাঁদের মধ্যে যে কর্ম হয় তা অকর্তা-অভোক্তাজ্ঞানে হয়ে থাকে। তাঁরা নিজের স্বার্থে কোনও কর্ম করেন না। নিজ স্বার্থে কর্ম হল অহংকারকৃত কর্ম। অহংকার সবসময়ই স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে স্বকাম চরিতার্থ করতে বা নিজের আরাম/সুখের জন্য যে কর্ম করে তার মধ্যে তার ফলাশা পূর্ণমাত্রায় থাকে বলে তার কর্মের

ফল শুভ-অশুভ যা-ই হোক, তাকেই ভোগ করতে হয়। এই কর্মফল ভোগের জীবনই হল সংসারজীবন বা গার্হস্থ্য জীবন। তাই সংসারীদের মধ্যে দেখা যায় তার সংস্কারজাত স্বভাবের কর্ম আচার-ব্যবহারের মধ্যে, পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের মানের ভেদ, তারতম্য বা পার্থক্য। সাধারণ মানুষের জীবন চাওয়া-পাওয়া নিয়ে তৈরি হয়। চাহিদা পূরণের জন্য সে কর্ম করে, কর্মফল অনুকূলে এলে খুশি হয় এবং প্রতিকূলে গেলে দুঃখ পায়। প্রকৃতিজাত কর্মের মধ্যে কর্তৃত্বের প্রাধান্য বেশি থাকে বলে তার ফলেও প্রতিক্রিয়া ও বিকার থাকবেই। অহংকারজাত কোনও কর্মই প্রতিক্রিয়া ও বিকার শূন্য হয় না। অনাত্মপ্রীতির ফলে আত্মবিস্মৃত জীব প্রকৃতির অধীনে চলে এবং প্রকৃতিজাত কর্মকে ও কর্মফলকে নিজের কর্ম ও কর্মফল মনে করে অহংকারবশত। তাই বলা হয়েছে, "অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাঽহমিতিমন্যতে"। "প্রকৃতি ক্রিয়তে কর্মাণি সর্বশঃ নাহং।" অর্থাৎ প্রকৃতিই সর্বকর্ম করে, আমি কোনও কর্ম করি না। আমি সাক্ষিমাত্র—এই হল আত্মবোধ। অনাত্মবোধ হল—আমি কর্তা-ভোক্তা প্রভৃতি। কাজেই পাকা আমি ও কাঁচা আমি-র ব্যবহারের মধ্যে বিশেষভাবে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা হল, কাঁচা আমি দেহাত্মবুদ্ধিযুক্ত আমারবোধযুক্ত দেহাসক্ত দ্বৈত অভিমানী অহংকারী জীব; অপরপক্ষে পাকা আমি হল সর্ববিধ দেহ-গুণভাব-উপাধিবর্জিত, নাম-রূপাদি ভেদরহিত, ষড়্‌বিধ পরিণামশূন্য (উৎপত্তি/জন্ম-সাময়িক স্থিতি-বৃদ্ধি-পরিণাম-ক্ষয়-অপক্ষয় বা নাশ), দ্বৈতভাববোধরহিত। দ্বৈতভাবের বিলাসে স্বভাবের যে পরিণাম হয় তার ফলে অষ্টবিধা প্রকৃতির ষোড়শ বিকার হয়। সব মিলিয়ে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব দ্বৈতবোধে সিদ্ধ। তার মধ্যে পঞ্চভূত ও তিন গুণ মিলে হল অষ্টবিধা প্রকৃতি। ষোড়শ বিকার হল পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ মন বা বুদ্ধি। এছাড়া পঞ্চভূতের দ্বারা পঞ্চকোষ গঠিত, তিন গুণ দ্বারা গঠিত তিন দেহ—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং তিন বোধের অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। এসবই দ্বৈতবোধের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু অদ্বৈতবোধের পাকা আমিতে এসবের একান্ত অভাব। পাকা আমি বিশুদ্ধ চিৎমাত্র প্রজ্ঞানঘন। সেই অর্থে জগৎ হল স্বকল্পিত প্রকৃতির স্বপ্নবিলাস স্বপ্নরচনা ইন্দ্রজালবৎ ঘটবৎ, মনই তার সেবক। 'মনোদয়ে জগতের উদয়, মনোলয়ে জগতের লয়।'

দ্বৈতদৃষ্টিতে জগৎলীলা হল মিশ্রবোধের লীলা। মিশ্রবোধ অর্থে ভাব-নাম-রূপ-উপাধিযুক্ত যে চৈতন্য। এই চৈতন্যের নাম হল অপরাবিদ্যা, দ্বৈতভাবযুক্ত বোধ। অপরপক্ষে অদ্বৈতবোধ হল নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ সমবোধ বা একবোধ। দ্বৈতবোধে অনাত্মা জগৎ সিদ্ধ, কিন্তু অদ্বৈতবোধে ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম সিদ্ধ। সেইজন্য দেখা যায় সংসারীদের মধ্যে অনাত্মপ্রীতির আধিক্যের জন্য আত্মপ্রীতি দুর্লভ। অনাত্মার সেবায় সংসারীরা জীবন কাটায়। তাদের ধর্মকর্ম সবই দ্বৈতবোধে সাধিত হয়। দ্বৈতবোধের প্রভাবে চলতে অভ্যস্ত বলে মানুষ অদ্বৈতবোধের সত্য মাহাত্ম্য, তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তারা তাদের চাহিদা পূরণের জন্য সবসময়ই সচেষ্ট থাকে। তাদের অশুদ্ধ চিত্ত কামাহত, অসংখ্য সাধে পূর্ণ, কিন্তু সাধ্য তাদের সীমিত। সাধ পূরণের জন্য তারা অন্যের সাহায্য পেতে চায়, কিন্তু সবসময় পায় না। তাদের

মধ্যে অনেকেরই ধারণা, সাধুসন্ত মহাত্মারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী, সুতরাং তাঁদের কাছে সময় সুযোগ পেলে সংসারী বিষয়ী লোকেরা যাতায়াত করে। ভণ্ড সাধুরা এ সমস্ত সংসারীদের কথার ছলে ভুলিয়ে অনেককিছু করে দেবার আশ্বাস দিয়ে টাকাপয়সা, বিষয়সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। অবশ্য যথার্থ সাধুর সন্ধান সবাই পায় না। যথার্থ সাধু মানুষের অজ্ঞান মোহ জীবনবন্ধনের কারণ নির্মূল করতে সাহায্য করেন। তিনি শুদ্ধ আত্মবোধের সাহায্যে তাদের চিত্তকে প্রথমে শোধন করে দেন। তার জন্য কিছু সৎ ক্রিয়া অভ্যাস করতে নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ যথার্থ অনুশীলন করে মানুষ আত্মবোধের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং সেইভাবে সে প্রযত্নশীল হয়।

ঈশ্বরবাদী যাঁরা, তাঁরা ঈশ্বরের গুণ কীর্তন মাহাত্ম্য অনুশীলন ক'রে অপরকেও তদ্‌বোধে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁরা দ্বৈতবোধের বিজ্ঞান দ্বারা শরণাগত আশ্রিত ভক্তজনদের ঈশ্বরপ্রীতির নিমিত্ত জীবনযাপন ও কর্ম করতে অনুপ্রাণিত করেন। আত্মবাদীগণ বা ব্রহ্মবাদীগণ অদ্বয়বোধের বিজ্ঞানকেই অনুশাসন করে থাকেন উপযুক্ত আধার বুঝে। অদ্বয়বোধের বিজ্ঞান সাধারণের কাছে বোধগম্য হয় না বলে দ্বৈতবোধের দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ করে অদ্বৈতবোধের অনুশীলন করতে হয়। এই কথাগুলি কেবলমাত্র স্বরূপ অনুধাবন করার জন্য এবং তা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বলা হল। মূল বক্তব্য বিশ্লেষণের পূর্বে কেবলমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং মূল বক্তব্য আমিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য অনুধাবনের সুবিধার জন্য সংক্ষেপে কিছু কথা সূচনা রূপে বা প্রাক্‌কথনরূপে বলা হয়।

যথার্থ সন্তমহাত্মাদের কথা উল্লেখ করে যা বলা হয়েছে তা সকলের কাছে সুবোধ্য না-হলেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সাধুসন্তের কাছে লোকের ভিড় হয়—একথা পূর্বে বলা হয়েছে। লোকমুখে অনেক কথাই রটে যায়। 'এ' নিজে লোকালয়ের মধ্যে থেকেও কাউকেই কিছু জানতে দেয়নি প্রথমে, নিজের ভাবে নিজেই চলেছে। আস্তে আস্তে কার কাছে কী শুনে যে লোক সমাগম শুরু হয় তা প্রথমে 'এ' বুঝে উঠতে পারেনি। লোকসমাগম যখন বাড়তে থাকে তখন তাদের বলা হয়েছে যে—তোমরা লোকমুখে ভুল শুনে ভুল ক'রে 'এর' কাছে এসেছ। 'এ' সাধুসন্ত গুরু নয়। 'এ' খেটেখুটে নিজে খায়, নিজের ভাবে নিজে চলে। গতানুগতিক জীবনের সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক না-রাখলে নয় সেটুকুই আছে। 'এ' উপাধিযুক্ত কেউ নয়। তোমাদের চাহিদা পূর্ণ করবার কোনও শক্তি 'এর' নেই। 'এ' আপনবোধে আপনাতে মিশে আছে, অন্য খবর কিছু জানে না। 'এ' চাহিদা পূরণের কোনও সাধনা করে না। তোমরা যে শান্তি পেতে চাইছ তা চাহিদাপূরণের মাধ্যমে পাবে না। চাহিদা ছাড়াও জীবন আছে—তা হল 'না-চাওয়া, না-পাওয়ার জীবন'। 'এ' সেই ভাববোধে চলার অভ্যাস করেছে। তা যদি তোমরা শুনতে চাও তাহলে সেই কথা 'এ' বলতে পারে। তোমরা যাঁর কাছে এসেছ তাঁর কিন্তু কোনও মতলব নেই। 'এ' নিজ অতিরিক্ত কারওর ভজনা করে না, কেননা 'এর' কোনও চাওয়া নেই। চাইতে গেলে নিজ অতিরিক্ত কারও কাছে যেতে হবে, চাইতে হবে, হাত পাততে হবে এই বলে যে, আমার এটার অভাব, এটা আমার নেই, আমায় এটা দাও। না-

পেলে মন রুষ্ট হবে। এরকম বহু বিরুদ্ধ অবস্থার মোকাবিলা করতে হয়েছে একসময়—সে সব কথা থাক। এই আমি-র মধ্যে এমন একটা আমিবোধ জেগে উঠেছে যে আমি গতানুগতিক আমি-র মতো (অহংকারের আমি-র মতো) চাওয়া-পাওয়া ভাব নিয়ে চলে না। 'আমি আমার মধ্যেই আছি, আমিবোধে আমি-র দ্বারাই আমি পরিপূর্ণ।' "আত্মন্যেব আত্মনা সর্বং পরিপূর্ণম্।" "স্বেনৈব সর্বং পরিপূর্ণম্।" "ময়ৈব সর্বং পরিপূর্ণম্।" সেই আমি তাদের যেমন বলেছিল তোমাদেরও বলছে শোন—"স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা (ন অন্য) বোধরূপ তয়াহি আত্মনঃ। স্বাত্মবোধরূপ পুরুষোত্তমোহং।" অর্থাৎ স্ববোধে আপনবোধে অন্য কোনও বোধ থাকে না। বোধস্বরূপ আত্মা স্বয়ংপূর্ণ। সেই স্বয়ংপূর্ণ আত্মবোধস্বরূপই পুরুষোত্তম। আমিতত্ত্বকে কত সহজ সরল ভাবে রাখা হল! যাদের অভিমানী মন তারা কিন্তু 'এই আমি-র' কথা নেবে না। তাই গানের ভাষায় বলা হয়েছে—

অভিমানী মন নিত্যপূর্ণ একের মহিমা
মানে না মানে না মানে না অভিমানী মন।।
স্বভাব তার ভোগেচ্ছা কাম ভোগে রত অবিরাম
অখণ্ডরে খণ্ড ক'রে চায় পেতে সে ইচ্ছামতন।।
অদ্বৈতে করে দ্বৈত ভাবনা অভেদে করে ভেদরচনা
নাম-রূপের বিশ্বকল্পনা দেহবুদ্ধি ভোগবাসনা
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি যন্ত্রণা দুঃখের কারণ।।

আর একটা গানে আছে—

অখণ্ড আমিতত্ত্বের কোন তুলনা নাই কোন তুলনা নাই
মহাশূন্যে আমির মাঝে আছি আমি নিত্য একাই।।
আমিতে পূর্ণ আমির বাস আমির জন্য আমি হতে আমির প্রকাশ
আমির দ্বারা জানি আমি আমাকেই মানি আমি
সগুণ নির্গুণে আমি আবার নির্গুণগুণী স্বয়ং আমি।।
আমির মাঝে খেলি আমি নিত্যাদ্বৈত পরমতত্ত্ব ইহাই
আমির কোন দ্বৈত নাই আমির মাঝে আছি আমি একাই।।

(বাউল—কাহারবা)

অভিমানী মন আমিতত্ত্বের সত্যকে/মহিমাকে অর্থাৎ পূর্ণ এক-এর মহিমাকে মানে না। এই অভিমানী মনের দোসর অহংকার, চিত্ত তার স্মৃতিভাণ্ডার, বুদ্ধি কর্ণধার। এই অভিমানকে সরাবার জন্য যা একান্ত প্রয়োজন, কার্যকরী ও ফলপ্রদ তা সবার সামনে রাখা হয়েছে। তুমি মনের অধীন নও, বুদ্ধির অধীন নও, অহংকারের অধীন নও, চিত্তের অধীন নও, অর্থাৎ তুমি অন্তঃকরণের দাস নও—স্বভাবের দাস নও। স্বভাবের দাস হলে তোমাকে দেহবুদ্ধি নিয়ে

দেহের সেবায় রত হয়ে দিন কাটাতে হবে। তুমি স্বভাবের অর্থাৎ অন্তঃকরণের প্রভু বিভু স্ববোধাত্মা। স্ববোধাত্মা অহংদেব পাকা আমি।

স্ববোধাত্মার আমি-র পরিচয় হল—

নহি আমি জীব কভু নহি আমি গুণবদ্ধ
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আমি নিত্যপূর্ণ সদাশিব।।
অদ্বয় ব্রহ্ম আত্মা আমি ঈশ্বর অক্ষর ভূমা অখণ্ড
সচ্চিদানন্দঘন আমি স্বতঃস্ফূর্ত পরমতত্ত্ব।।
আকাশসম নির্মল আমি নিষ্ক্রিয় নির্বিকল্প
নির্বিকার নিরাকার আমি নিরবলম্ব।
কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব শূন্য ভাবাতীত দ্বন্দ্বাতীত
প্রশান্ত অমৃত আমি শাশ্বত অচ্যুত।।
নাহি মোর জন্ম মৃত্যু নাহি মোর উদয় অস্ত
ক্ষয় বৃদ্ধি বিবর্জিত আমি গতাগতি রহিত।
স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংপ্রভু অনন্ত বিভু নিত্যাদ্বৈত
স্বানুভব রসসিন্ধু সারাৎসার স্বাত্মতত্ত্ব।।

(লুম্‌খাম্বাজ—ঝাঁপতাল)

স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ যা স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ, তা না-হলে স্বতঃসিদ্ধ হয় না। 'I am' denotes first person but 'I is' denotes I-Reality, Supreme Person, the Absolute, Atman Brahman. 'I' denotes I-Reality. I-Reality is the self-revealing Reality, 'I' is the Lord of one's own Self, not to speak of all else. I-Reality is the self-evident Self, Lord, infinite, all-pervading, eternally One without a second or secondless, the ocean of infinite bliss of the nature of awareness of Self-Consciousness, the Absolute whole, the truth of one's Self-Reality. That means all Consciousness is verily the Self-Consciousness and vice versa. Everything becomes conscious owing to the presence of Self-Consciousness which is self-evident, self-effulgent, awareness of Self-Consciousness (*Swanubhuti*). This Self-Reality is the Supreme One, the Highest Truth and Goodness, all-perfect, infinite and homogeneous by nature. এই অখণ্ড পূর্ণ ভূমা সত্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। তা হল—

ওঁ সত্যম্ সর্বম্ সত্যমিত্যেতি সত্যপ্রতিষ্ঠাম্
জ্ঞানম্ সর্বম্ জ্ঞানমিত্যেতি জ্ঞানপ্রতিষ্ঠাম্
আনন্দম্ সর্বমানন্দমিত্যেতি আনন্দপ্রতিষ্ঠাম্
একং পূর্ণং নিত্যং অদ্বয়ম্ শাস্তম্ সর্বাধিষ্ঠানম্।।

নিষ্কলং নির্মলং দেবং কর্মাধ্যক্ষং কেবলম্
ধর্মার্থশুভকামং মোক্ষদং দেবাদিনামিষ্টম্
সর্বান্তরভূতম্ ঈশ্বরাত্মানং ব্রহ্মপরম্
বন্দেঽহং সর্বেশম্ স্বানুভবদেবম্।।
অস্তি ভাতি প্রিয়ম্ সচ্চিদানন্দস্বরূপম্
সচ্চিদানন্দস্বরূপম্ সচ্চিদানন্দস্বরূপম্।।

(তত্ত্ববন্দনা)

প্রতি স্তরে স্ববোধে প্রতিষ্ঠা কী করে হয় তা স্বানুভূতির ভাষায় ব্যক্ত করা হল। অর্থাৎ সত্য স্থূলে, সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মতরে প্রতিষ্ঠিত হলে তবে সত্যের তুরীয় স্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। এভাবে হয় সর্বসত্যে প্রতিষ্ঠা। ঠিক একই ভাবে অখণ্ড জ্ঞান আর আনন্দে প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞান সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হল। এই ভাবে হবে সচ্চিদানন্দে প্রতিষ্ঠা, অখণ্ড পূর্ণ ভূমা আমিতে প্রতিষ্ঠা। অনাত্মারূপ অসৎ আমারভাবের অচিৎ নিরানন্দ ভাবের কোনও অস্তিত্ব ও প্রকাশ সম্ভব হবে না পূর্ণ আমিকে স্পর্শ করার। পূর্ণ আমি হল সম্যকরূপে আমারভাবশূন্য সর্ববিধ দ্বৈতপ্রভাব মুক্ত। This is a very direct process of Self-perfection and realization. তা হল আত্মশুদ্ধি, আত্মবোধ ও আত্মমুক্তির সহজ পদ্ধতি ও অভিনব বিজ্ঞান। যদিও অভিমানী মন শয়তান, আত্মবোধ ছেড়ে অনাত্মবোধের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চেষ্টা করে। এই যে এখানে প্রতিদিন আত্মপ্রসঙ্গে অভিনব স্বানুভবসিদ্ধ বিজ্ঞান প্রকাশ করা হচ্ছে তাতে অনাত্মার প্রভাবমুক্ত হয়ে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠা কী করে সম্ভব তার ভিত্তিপত্তন বা গোড়াপত্তন হচ্ছে। সবারই হৃদয়ে আত্মা আছে, কিন্তু তা অনাত্মা অর্থাৎ নিজেরই কল্পনার দ্বারা আবৃত। কল্পনা দিয়ে গড়া ও ভরা কাঁচা আমি। কল্পনা থেকেই ভাব-নাম-রূপের বিস্তার। কল্পনা হল মনেরই স্বভাব, মনেই তার বাস ও কার্য, রূপ-নাম তারই প্রকাশ। জগৎ মনেরই প্রকাশ, মনেই তার বাস, মনের বাইরে কোনও জগৎ নেই, মনেই আবার তার লয়। তাই বলা হয়েছে, 'চিৎ-এর কোলে চিদাভাস মন/চিত্ত প্রকাশে। চিত্তমূলে জগৎ ভাসে। জগতের মূলে চিত্ত হাসে। মনোদয়ে জগতের উদয়, মনোলয়ে জগতের লয়।' উদ্গীত গানে আছে—

আপন ভিন্ন নাহি অন্য কোন জন আপনার অন্তরে
আপনাতে আছে আপন স্বয়ং অন্তর বাহির পূর্ণ করে।।

... ...

আপন ছাড়া যা কিছু ভাবে মন দ্বৈতবোধে সে করে যা গ্রহণ
সবই তার কল্পনা ক্ষণিকের স্বপন ভাসে তা অন্তরে ক্ষণিকের তরে।।

... ...

আর একটি গানে আছে ঃ

এই যে আমি সবার মাঝে সবার আমি এই আমি যে।।
অখণ্ড এক বিশুদ্ধ সত্তা বোধে বোধময় স্ববোধে উদয়

স্বপ্রকাশ সে প্রকাশ করে আপনারে অনন্ত সাজে।
চারিদিকে আমার সত্তা নামরূপেতে ছড়িয়ে আছে।।
আমি ব্রহ্ম আমি আত্মা আমি পরমেশ্বর ভগবান
নিত্য শাশ্বত অমৃত অচ্যুত অদ্বয় অব্যয় সর্বশক্তিমান।
আনন্দবাহুল্যে লীলাকারণ বিশ্বরূপ করি ধারণ
স্বভাব মোর জীব সাধারণ আমি সবার দেহ প্রাণ ও মন।
অন্তর সত্তা বোধবিজ্ঞান জীবনের মান সকল কাজে।।
জীবমাঝে সত্ত্বগুণী মানুষ মোর হয়ে করে সত্য সাধন।
তাদের মাঝে দু'একজন পায় পূর্ণ আমির দরশন।।
জগৎরূপেও আমি সত্য গুণের খেলা তা মোর মাঝে।
অস্তি নাস্তি বিভূতি আমার অনন্ত বক্ষে নিত্য বিরাজে।।

(আশাবরী—ধামার)

অর্থাৎ আপন আত্মার অন্তরে আত্মা ব্যতীত অন্য কোনও কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। আত্মসত্তায় আত্মাই স্বয়ং অন্তর-বাহির পূর্ণ করে বিবাজমান। আপনস্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ অখণ্ড ভূমা স্ববোধে পূর্ণ স্বয়ং, স্ববোধেই সে নিত্য করে বিহার। এই আপনবোধস্বরূপ স্ববোধ-আত্মা নিত্য অদ্বৈত, কিন্তু তাঁর বক্ষে দ্বৈতবোধে মন লীলায়িত হয়। দ্বৈতবোধে সে যা-কিছু গ্রহণ করে, প্রকাশ করে, তা তাঁরই কল্পিত রূপ—ক্ষণকালের জন্য ভেসে ওঠে, আবার আপনবক্ষে মিলিয়ে যায়। এই মনের ভাবনা বৈচিত্র্য কল্পনার মাধ্যমে নাম-রূপের বিলাস রচনা করে, বহির্জগৎ হল তার প্রমাণ। আমি-তুমি, আমার-তোমার, ইহা-উহা যত ধারণা সবই মনেতে মনেরই কল্পনা, তা পুনঃপুনঃ ওঠে ভাসে, আবার মনেই লীন হয়ে যায়। গুণের ধর্ম কর্তা-কর্ম-করণ এবং মনের ধর্ম জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান—এসবই মিশ্র দ্বৈত ভাববোধের খেলা। মনাতীত অব্যক্ত অদ্বৈত আত্মসত্তাস্বরূপে নাম-রূপ-দৃশ্যাদির একান্ত অভাব। সেখানে দ্বৈত কোনও বিলাস নেই। সেখানে শুধু আপনে আপন সমরসসুধাসাগর।

আত্মসত্তা দিয়ে উপরের কথাগুলো বলা হল। সবই কিন্তু অখণ্ড পূর্ণ সচ্চিদানন্দঘন পাকা আমি-র কথা, আমি-রই বর্ণনা। এই অখণ্ড প্রজ্ঞানঘন সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা-ব্রহ্মের আমি, নিত্য সমধর্মী সমরসসার, সত্য-জ্ঞান আনন্দ পরিচয় তাঁর। অসৎ/অজ্ঞানের ধর্ম নানাত্ব-বহুত্ব, সৎ-এর ধর্ম নিত্য এক অদ্বৈত, জ্ঞান আনন্দের ধর্মও তাই। গানের প্রারম্ভে যে শ্যামল আত্মার কথা বলা হয়েছে তা-ই হল পরমাত্মা, সবার হৃদয়ে আমি-র আমি বোধে নিত্যবর্তমান। কর্মীর মধ্যে কর্তা-কর্ম-করণের বিজ্ঞানরূপে, ভক্তের হৃদয়ে করুণা-প্রেম-ভক্তির বিজ্ঞানরূপে, ধ্যানীর অন্তরে যোগ-ধ্যানের বিজ্ঞানরূপে, জ্ঞানীর হৃদয়ে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপে স্বয়ংপ্রকাশমান। সোজা কথায় কর্মী, ভক্ত, যোগী, জ্ঞানীর হৃদয়ে একই আত্মা যথাক্রমে কর্মাত্মা, ভক্তাত্মা, যোগাত্মা, জ্ঞানাত্মা রূপে প্রজ্ঞানঘন আনন্দঘন শ্যাম শুদ্ধ পাকা আমিবোধে স্বয়ংপ্রকাশ। বক্তব্যের প্রারম্ভে শ্যামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই শ্যাম স্বয়ং আত্মারাম

প্রাণারাম পুরুষোত্তম, অর্থাৎ Supreme personality of Godhead Absolute। তিনি নিত্য অদ্বয় আমিরূপে সবার আমি-র ভিতরে স্বয়ং প্রকাশমান, সবার পৃথক আমিরূপে হল তাঁর প্রতিভাস ব্যষ্টি আমি (reflection of Consciousness—ego/I associated with body-identity)। যখনই সে body-identity-র দোষ সম্বন্ধে সচেতন হয় তখনই তা পরিহার করে Self-identity-র সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। তা বিজ্ঞানসম্মত ভাববোধে যে প্রকারে সিদ্ধ হয় সে সম্বন্ধে বহু অধ্যাত্মসাধনার পদ্ধতি আছে। এখানে সবার সামনে কথাপ্রসঙ্গে আমিতত্ত্বের যে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ বাখা হয়েছে তা হল direct process, অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতি বা প্রত্যক্ষানুভূতিব বিজ্ঞান। স্বানুভূতি হল তার ফলশ্রুতি। এই স্বানুভূতির বিজ্ঞান সাধনসাপেক্ষ নয়, কেবলমাত্র শ্রবণসাপেক্ষ। প্রচলিত রীতি অনুসারে গতানুগতিক ধারায় আত্মসাধনার বিজ্ঞান বহু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু স্বানুভূতির মাধ্যমে তা সাধননিরপেক্ষ ভাবে স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশ যেভাবে হয় সেই কথাই সবার কাছে সহজবোধ্য করে পরিবেষণ করা হচ্ছে।

প্রজ্ঞানঘন আমিতত্ত্ব, সচ্চিদানন্দ তার স্বরূপ। তা নিত্য স্বানুভবসিদ্ধ বলে তাঁকে স্বানুভবদেব বলা হয়। এই স্বানুভবসিদ্ধ পাকা আমি ভাব-নাম-রূপ সহযোগে যখন প্রকাশ পায় তখন তা স্বরূপত অদ্বৈত থেকেও দ্বৈতরূপে প্রকাশ পায় এবং মন ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হয় তার খণ্ড পরিচয়। তা হল দেশ-কাল, কার্য-কারণের অধীন। দেশ-কাল, কার্য-কারণের পরিপ্রেক্ষিতে পাকা আমি কাঁচা আমিরূপে প্রতিভাত হয়। এই কাঁচা আমি দেশ-কাল, কার্য-কারণ প্রভৃতি সাপেক্ষ হয়ে চলতেই অভ্যস্ত। এগুলি তার উপাধিগত মল বা প্রতিবন্ধক। সাধক এই মল শোধনের জন্যই সাধনভজন করে। স্বানুভবসিদ্ধপুরুষ তাঁর স্বানুভূতির বিজ্ঞানমাধ্যমে পাকা আমি-র স্বরূপটি দেশ-কাল, কার্য-কারণের উপাধিমুক্ত করে আপনসত্তায় আত্মবোধে অর্থাৎ অদ্বয় আমিবোধে প্রতিষ্ঠিত করে দেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনি বলছি শোন। একজন ঋষি একবার এক রাজদরবারে এসে উপস্থিত হন। রাজা তার গুরুসহ রাজদরবারেই উপস্থিত ছিলেন। গুরু তার পাশেই এক বিশেষ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ঋষি সেখানে উপস্থিত হলে রাজা সিংহাসন ছেড়ে ঋষিকে বন্দনা করে আপন সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে পাশে একটি আসনে নিজে বসলেন। রাজার গুরুর তা মনঃপূত হয়নি। রাজা আপন রাজকার্যে মনোনিবেশ করলেন, সব শুনছেন দেখছেন। ঋষি রাজাকে বললেন—তুমি রাজত্ব চালাচ্ছ কী করে? রাজা উত্তরে বললেন—বুদ্ধি দিয়ে। ঋষি বললেন—বুদ্ধি তো রাজা ঠিকই, কিন্তু দেহের রাজা সে। কিন্তু জগতের রাজা বুদ্ধি নয়। তোমার দেহকে নিয়ে তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পার, কিন্তু জগৎকে নিয়ে তা পারবে না। রাজার গুরু বসে সমস্ত কথাবার্তা শুনছেন। ঋষির অগাধ জ্ঞান, কিন্তু রাজার গুরুর তা পছন্দ হচ্ছে না, তার ভিতরে একটা ঈর্ষার ভাব জাগছে। ঋষির আবির্ভাব ও তাঁর কথাবার্তা রাজগুরুর অসোয়াস্তির কারণ হয়েছে। রাজা কিন্তু ঋষিকে নিয়েই ব্যস্ত। রাজা ঋষিকে বললেন—আপনার কী সেবায় আমি লাগতে পারি? ঋষি বললেন—আমার কোনও সেবার প্রয়োজন

নেই। রাজা—আপনি আমার বাজ্যে অতিথি হয়ে এসেছেন! আমার তো একটা কর্তব্য আছে আপনাকে পরিচর্যা করার! ঋষি বললেন—তোমার রাজ্য! কোথায় তোমার রাজ্য? এ সমস্ত কি তোমার রাজ্য? তুমি সৃষ্টি করেছ? রাজা বললেন—না, তা আমি পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি। ঋষি—তাহলে তা তোমার হল কী করে? তুমি যদি সৃষ্টি না-করে থাক এসব তাহলে তো তা তোমার হতে পারে না। সৃষ্টি হয় স্রষ্টার অধীনে। তুমি কী সৃষ্টি করেছ যে বলছ, আমি এই করেছি, ঐ করেছি! তোমার রাজ্য, সিংহাসন এসব তো তুমি নিজে হাতে তৈরি করনি! এই বাজদরবার, রাজসিংহাসন প্রভৃতি যে-সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীযোগে তৈরি হয়েছে তা তো কোনও কিছুই তুমি তৈরি কবনি। তুমি তো এসবের স্রষ্টা নও। তুমি তো এর মালিক নও। বাজা সব শুনে একেবারে স্তম্ভিত, রাজার গুরুও প্রায় তাই। অবশেষে গুরু রাজাকে বললেন—আমার শরীর ভাল লাগছে না, আমি যাই। সে তো সাজা গুরু, কাজেই ধরা পড়াব ভয়ে তো পালাবেই! সাজা গুরুর এরকমই অবস্থা হয়। তখন ঋষিগুরু রাজাকে বললেন—তোমার অনেককাল রাজত্ব করা হয়েছে, বযস হয়েছে। এবার তুমি আসল রাজার কাছে যাবার এবং তাঁকে জানবার জন্য চেষ্টা কর। রাজা—কেমন করে করব? ঋষি—যেমন করে এতকাল রাজত্ব চালিয়েছ সেরকম করেই করবে। রাজা বুঝতে না-পেরে বললেন—তা কী করে সম্ভব? ঋষি—তুমি বুদ্ধি খাটিয়ে এত কিছু করেছ বলছ, তাহলে এবার বুদ্ধি খাটিয়ে আসল মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা কব। রাজা হতভম্ব হয়ে যাচ্ছেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না। ঋষির বক্তব্য হল, অহংকারের অর্থাৎ কাঁচা আমি-র জীবনে সমস্যাই বেশি, সমাধান নেই। কিন্তু আত্মার আমি অর্থাৎ পাকা আমি-র জীবনে সমস্যাশূন্য কেবল সমাধান পূর্ণ সমবোধ বা একবোধ চিদানন্দধারা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত। তদ্‌বোধেই ঋষি প্রতিষ্ঠিত এবং রাজাকে সেই বোধের অধিকারী বানাতেই এসেছেন। ঋষির কথা অনুসাবে বর্তমানে যারা দীক্ষা দেয় তারা কী বোঝে আর যারা দীক্ষা নেয় তারাই বা কী বোঝে—এ বড় জটিল রহস্য! ক'জন তা বুঝতে পারে!

দীক্ষা ও শিক্ষা শব্দের তাৎপর্য যথার্থ ভাবে জ্ঞাত না-হলে এ দুটি বিষয়ই বিভ্রান্তিকর, খালি সমস্যা পরিপোষণ করে, সমাধান করতে পারে না। কে কাকে শিক্ষা দেবে, কে কাকে দীক্ষা দেবে—সে সম্বন্ধে সম্যকজ্ঞান ক'জনের আছে? এর বিকৃত ব্যবহার সর্বত্র দৃষ্ট হয়। নানা মত পথের লোক 'এর' কাছে সৎপ্রসঙ্গ শোনার জন্য আসে। 'এর' কথা শুনে তারা মনে করে, সত্যের আসল চাবিকাঠি পেয়ে গিয়েছি। এখানকার কথা অন্যত্র ব্যবহার করে তারা বাহাদুরি নেয়। কিন্তু সব কথার জবাব দিতে না-পেরে বিপদে পড়ে। তারা এসে 'একেই' আবার charge করে। তারা বলে, আপনার কথা অনুসারে কথা বলতে গিয়ে অপদস্থ হয়েছি। তখন তাদের বলা হয়েছে, 'এর' কথা তো অপরকে বলতে বলা হয়নি। তোমার চিত্তশুদ্ধি ও আত্মবোধের জাগরণের জন্য তা বলা হয়েছে। তুমি তা নিজের উপর প্রয়োগ না-করে অন্যের কাছে বলে কৃতিত্ব নিতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছ। এখন আবার সাফাই গাইছ কেন? এই তো তোমাদের অবিদ্যা-অজ্ঞানজাত কর্তৃত্বাভিমানের লক্ষণ। তোমার

অসুখ হয়েছে, ডাক্তার তোমাকে দেখে শুনে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করলেন তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য। তুমি সেই ওষুধ ও পথ্য অপর এক রোগীকে বিধান দিলে তার রোগ লক্ষণাদি কিছুই না জেনে বুঝেই। বেশিরভাগ লোকই অন্যের উপরে নিজের স্বল্প বিদ্যা অনুসারে উপদেশ দেয় ও ডাক্তারি ফলায়। নিজেরা সদুপদেশ গ্রহণও করে না, পালনও করে না।

ঋষি ও রাজার প্রসঙ্গে বলছি আবার। ঋষি রাজাকে বললেন—তুমি তো অনেক ভোগ করেছ! এবার একটা কিছু ত্যাগ করে দেখাও যে তুমি ত্যাগ করতে পার। রাজা ভাবছেন, কী ত্যাগ করব! যা ত্যাগ করব আজ, কাল তা দরকার হলে কোথায় পাব? পাটোয়ারি বুদ্ধি নিয়ে সে রাজত্ব করেছে। সংসারীদেরও প্রায় একই অবস্থা! একসময় দেখেছি দেশে গাঁয়ে মুষ্টিভিক্ষা দেবার রীতি ছিল। প্রতিদিনের সংসারযাত্রার উপকরণাদি হতে গৃহস্থ একটি স্বল্প অংশ সরিয়ে আলাদা পাত্রে রাখা হত, যেমন শাকসব্জি, চাল, ডাল, তেল, নুন ইত্যাদি। ঘরে জিনিস বাড়ন্ত হলে অনেকসময় সেখান থেকে নিয়ে কাজ চালনো হত এবং পরে তা পূরণ করে রাখা হত। তা ছাড়াও আবার ভিক্ষার্থী দ্বারে এসে ভিক্ষা চাইলে তার থেকে এক মুঠি দিয়ে দিত। এরকম পাঁচজন প্রার্থী এলে প্রত্যেককে এক মুঠি করে চাল-ডাল ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া হত। হঠাৎ একদিন একজন গৃহস্থ দেখে প্রার্থীদের চাল দিতে গিয়ে চালের ভাণ্ডার শেষ হয়ে গিয়েছে, এমনকী ঘরে খাবার চালও নেই। তখন তার দুশ্চিন্তা হল যে, এতদিন প্রার্থীদের চাল দেওয়া হয়েছে, খেয়াল করা হয়নি যে চাল শেষ হয়ে গিয়েছে। আজ তো নিজেদেরই নেই! গত কয়েকদিন মুষ্টিভিক্ষা না-দিলেই হত, তাহলে আজ আমাদের চলে যেত! এই যে দান সম্বন্ধে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল তা তামসিক দান, সাত্ত্বিক দান নয়। লোক দেখাবার জন্য এরকম অনেকে দান করে, কিন্তু পরে আপশোস করে। শহরে রাস্তায় প্রার্থী একটা পয়সা চাইলে অনেকে দেয় না, আবার অনেকে কিছু দিয়ে দেয়। ট্রামে বাসে টিকিট কাটার সময় যখন দেখে পকেটে পয়সা কম, তখন মনে করে, রাস্তায় পয়সা না-দিলেই ভাল হত! এখন তো হেঁটে বাড়ি যেতে হবে! এরকম অবস্থা অনেকেরই হতে দেখা গিয়েছে।

তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক দানের মধ্যে প্রথম দুই প্রকার দানে প্রতিক্রিয়া হয় স্থান-কাল-পাত্রবিশেষে। কিন্তু সাত্ত্বিক দানে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। অনেকরকম দান আছে—অন্নদান, বস্ত্রদান, অর্থদান, জ্ঞান-উপদেশাদি দান। এসকল দানের ফলে পুণ্য অর্জন হয়, কিন্তু পাপক্ষয় হয় না। পাপ-পুণ্য উভয়ই ভোগের মাধ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানদানের ফলে জ্ঞান বাড়ে বই কমে না, আর সব দান ক্ষয়িষ্ণু। জ্ঞানদানের ফলে জ্ঞান হয় সত্য, কিন্তু অহংকার ছেড়ে না-দিলে জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। আত্মজ্ঞান দানের মতো শ্রেষ্ঠ দান আর কিছু নেই। আত্মজ্ঞানের কথা হয়ত অনেকেই বলতে পারে, কিন্তু তা স্যমকরূপে ফলপ্রদ হয় কেবলমাত্র আত্মজ্ঞানীর কথায়। দানক্রিয়া অহংকারের ক্ষেত্রেই সম্ভব, কিন্তু অহংদেবের ক্ষেত্রে দান করবে কে কাকে? আত্মবোধ তো কেউ কারওকে দিতে পারে না। কেননা দান কর্তা-কর্ম-করণ-উপাদান, দেশ-কাল, কার্য-কারণ সাপেক্ষ। আত্মবিজ্ঞান আত্মাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, বুদ্ধির দ্বারা তা সিদ্ধ নয়। অতি বিস্ময় হল আপনবোধের পরিচয়! আমি অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত, অব্যক্ত হয়েও ব্যক্তের মধ্যে অবস্থান করি, আবার ব্যক্ত হয়েও অব্যক্তই থাকি। তা সাধনসিদ্ধ

ব্যাপার নয়, স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। আমি পরমাত্মা সদাশিব হয়েও জীববোধে ঘুরে বেড়াই এবং জীববোধে চলেও পরমাত্মা শিববোধে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকি। Sense of individuality is an expression of the Absolute Reality and the Absolute Reality is the essence of individual reality. Absolute Reality remains as it is without any change or modification. It is Knowledge of Knowledge, the Supreme Knowledge Itself.

কাঁচা আমি হল embodied soul এবং পাকা আমি হল all-perfect, ever-free soul। This statement is experienced in the knowledge of dual reality, while in the Knowledge of non-dual Reality there is only One Self/I which is Absolute ever-present as 'All Divine for All Time, as It Is'. This Knowledge has been mentioned as Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge (Science of Oneness/Oneness of Science). It is verily Knowledge of Knowledge, the Knowledge Absolute. এ কথা শুনে অনেকের মনেই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবং বহু বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী মন্তব্য করেছিলেন যে, আপনার *Knowledge of Knowledge* বইটি আমরা পড়েছি। সেখানে এই Oneness of Knowledge/Knowledge of Oneness-এর কথা আছে। এই কথার তাৎপর্য কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাই আমরা এই কথার রহস্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। আজকের বক্তব্যের মধ্যে এই কথা যখন বলেছেন তখন বোধের আলোয় অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। কথাপ্রসঙ্গে তাঁদের বলা হয়েছিল যে, 1985-এ Shillong-এ Atomic Energy Research Centre-এর scientist-রা একটা সৎসঙ্গের আয়োজন করেছিল। তাদের কাছে চারদিন যে চারটে speech দেওয়া হয়েছিল, তা সবটাই এই Science of Oneness/Oneness of Science-কে base করে Knowledge of Oneness/Oneness of Knowledge-এর তত্ত্ব বলা হয়েছিল। প্রথমদিনের বক্তব্যের মধ্যে ছিল Oneness of man, God and Universe-এর প্রসঙ্গ। তাতে Science of Oneness/Oneness of Science-কে খুব সুন্দর ভাবে define করা হয়েছে। তাদের বিশেষ অনুরোধ ছিল ধর্ম ও দর্শনের terms বা শব্দ ব্যবহার না-করে science-এর terms দিয়ে মূল বক্তব্যকে প্রকাশ করতে। তার উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, বিজ্ঞানের terms-এর সঙ্গে 'এর' বিশেষ পরিচয় নেই। অবশ্য ধর্ম ও দর্শন বিষয়ের terms-এর সঙ্গেও বিশেষ পরিচয় নেই। কারণ কোনও বিষয়ে পড়াশুনা করার সুযোগসুবিধা 'এ' পায়নি, সেরকমভাবে শোনবার সুযোগও 'এ' পায়নি। তবে নিজের মধ্যে অনন্ত প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা জেগেছে অনেকসময়, অন্তরে তার বিচার-বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান নিজের মতো করেই সাধিত হয়েছে। সেসব কথা শুনতে যদি চাও তাহলে তা 'এ' তোমাদের শোনাতে পারে। তাতে তোমাদের কাজ হবে কি হবে না তা বলা সম্ভব নয়, তবে নিজের সম্বন্ধে অজ্ঞাত বহু জিনিসই জানতে পারবে। তাদের কাছে যে চারটে speech দেওয়া হয়েছিল তা সংকলন করে সেখানকার director S. R. Rajderkar একটা পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন Science of Oneness নামে।

Oneness of Universe, God and Life (Man)—এই অনুভূতি কী করে সম্ভব তা scientist-রা প্রথমে বুঝতে পারেনি। কিন্তু প্রসঙ্গকে ভেঙে ভেঙে বিশ্লেষণ করে জাগতিক ঘটনা ও উপমা অবলম্বনে বুঝিয়ে দেবার পর তারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আরও কথা শুনবার আগ্রহ প্রকাশ করে। তারা বলেছিল, আপনি science বা বিজ্ঞান পড়েননি, অথচ বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য বিষয়বস্তুকে আপনি যেভাবে ব্যক্ত করলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। অতীব সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়কেও আপনি সহজবোধ্য করে ব্যক্ত করেছেন যা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে তাদের বলা হয়েছিল, head doctrine ও heart doctrine-এর কথা। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরতাই বেশি। তোমরা বুদ্ধি দিয়েই সবকিছু চর্চা কর। বুদ্ধিরও একটা limitation আছে, যদিও তা যুক্তির সাহায্যে সবকিছু বুঝতে ও জানতে চায়। বুদ্ধি স্বাধীন নয়, তার নিজস্ব কোনও light বা বোধ নেই। বুদ্ধি হল ত্রিগুণাপ্রকৃতিজাত অন্তঃকরণবৃত্তিমাত্র। It is the reflected light which reflects within and without. কাজেই বুদ্ধির সৃষ্টি সীমিত, তার বোধ বা অনুভূতি ধার করা। প্রকৃতির সত্ত্বগুণজাত বুদ্ধি মূলত জড় হলেও সত্ত্বগুণধর্মী, স্বচ্ছ। সেইজন্য বুদ্ধির পশ্চাতে যে পরমবোধিস্বরূপ (Pure Consciousness) আত্মা আছে তাঁর জ্যোতি বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়। বুদ্ধি তা ধারণ করে বোধের প্রকাশমাধ্যম হয়। তাই বুদ্ধিকে (অন্তঃকরণবৃত্তিকে) চিদাভাস বলা হয়। মানুষমাত্রেই বুদ্ধির অধীন অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত। জাগতিক বিষয়াদি সবই বুদ্ধিসাপেক্ষ, কিন্তু নিজ সত্যস্বরূপ আত্মা বুদ্ধিসাপেক্ষ নয়, তা শুদ্ধবোধসাপেক্ষ। শুদ্ধবোধই হল অহংদেব পাকা আমি পুরুষোত্তম, শুদ্ধ আমি, আত্মার আমি, সকলের সত্য দিব্য মুক্ত সত্য পরিচয়, আপন পরিচয় বা নিজের পরিচয়। 'এ' সেই আমি-র কথাই তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছে। অখণ্ড শুদ্ধবোধস্বরূপ আত্মার আমি/পাকা আমি নিত্য অদ্বৈত সর্ববিধ গুণ-উপাধিবর্জিত নাম-রূপাদি ভেদ রহিত এবং বিকার-পরিণামাদি ষড়্ভাবশূন্য। তা নির্বিকার নিরাকার নির্বিকল্প নিরবলম্ব নিষ্ক্রিয় নির্বিশেষ অদ্বয় হয়েও সর্ববিধ স্ববিরুদ্ধ ভাববোধ-অবস্থা-কারণ-কার্যরূপে নিজেই প্রতিভাত হয় নিজ বক্ষে। সেইজন্য অখণ্ড অদ্বয় অব্যয় অপরিণামী পূর্ণ আমিসত্তার বক্ষে বৈচিত্র্যময় ভাববোধ নাম-রূপের খেলার প্রকাশ বিস্ময়কর জীবজগৎরূপে প্রতিভাত হয়। বাক্য-মন-বুদ্ধি যাতে প্রবেশ করতে পারে না অথচ বাক্য-মন-বুদ্ধির মধ্যে সেই বোধস্বরূপ পাকা আমি স্বয়ংপ্রকাশ। যার দ্বারা বাক্য-মন-বুদ্ধি প্রকাশিত হয় তাকে বাক্য-মন-বুদ্ধি জানে না। তাই বলা হয়েছে 'বাক্‌মনসোগোচরম্' যিনি, তিনিই আবার বাক্য-মনাদির অবভাসক বা প্রকাশক। 'বাক্য-মনাদি দ্বৈতবোধের প্রকাশ, দ্বৈতবোধের সঙ্গেই তার সহবাস ও বিলাস।' কিন্তু অদ্বয় আত্মবোধে তার অস্তিত্বই থাকে না, তা কার্য-কারণাতীত। সুতরাং কার্যাদিও থাকে না।

কারণ থেকে কার্য জাত হয় এবং কারণেই তা অবস্থান করে। কিন্তু কার্য কারণকে জানে না। কার্যের ঘরে কারণ সুপ্ত, আবার কারণের ঘরে কার্য সুপ্ত। প্রকৃতিজাত কারণ-কার্য ও

কার্য-কারণ প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত থাকে, প্রকৃতির উর্ধ্বে যেতে পারে না। প্রকৃতি হল nature। এই nature সক্রিয় হয়ে চারটে স্তরে প্রকাশ পায়। সত্তাশ্রয়ী এই nature বা প্রকৃতি সত্তাকে অতিক্রম করতে পারে না। সত্তা হল নিত্য অখণ্ড ভূমা পূর্ণ। তা নিত্যাদ্বৈত বলে তার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিকল্প নেই। প্রকৃতিযুক্ত সত্তার অংশে সেই নির্বিকার অখণ্ড বোধসত্তা/আমি সগুণ সবিশেষ হয়ে, সমষ্টি-ব্যষ্টি হয়ে ভাব-নাম-রূপের মধ্যে লীলায়িত হয়। সমগ্র পরিদৃশ্যমান জীবজগতের পশ্চাতে এই অখণ্ড বোধসত্তা ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর শুদ্ধ পাকা আমি বোধে নিত্যবর্তমান। তিনি স্বয়ং আবার তাঁর প্রকৃতিযুক্ত অংশকে ঈশ্বর, দেবতা জীবজগৎরূপে প্রকাশ করে তাঁদের মাধ্যমে আপন স্বরূপমহিমাকে স্বভাবপ্রকৃতিরূপে ব্যক্ত করে আবার নিজেব মধ্যেই তা লয় করে নেন। সেইজন্য জীবনের কেন্দ্রসত্তায় তিনিই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ঈশ্বর-আত্মা, অন্তঃসত্তায় তিনি স্বভাবরূপে এবং বহির্সত্তায় তিনিই প্রকৃতিরূপে প্রতিভাত হয়ে নিজবোধে নিজেই মত্ত আছেন। এই হল বৈচিত্র্যময় দুর্বোধ্য জীবজগতের অন্তর্নিহিত সত্যের সামান্য আভাসের পরিচয়।

আপন স্বভাবের মাধ্যমে স্ববোধের প্রকাশ করতে গিয়ে স্ববোধের কিছু অংশকে আবৃত করে স্বভাব ব্যক্ত করে। আবার স্বভাবের প্রকাশকে প্রকৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিয়ে স্বভাবের অংশবিশেষকে আবৃত করে প্রকৃতির মধ্যে ভাব-নাম-রূপে নিজেকে প্রকাশ করে। তার এই প্রকাশের বিজ্ঞানই হল তার এই স্বভাব ও প্রকৃতির দুটো দিক। প্রকাশ করতে গিয়ে তাকে সক্রিয় হতে হয়। তার এই সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্যকে/তাৎপর্যকে স্ববোধাত্মা ঈশ্বর কারণ-কার্য ও কার্য-কারণ নীতির মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। শুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মা হল কারণাতীত কারণ। তাঁর স্বরূপশক্তি সমগ্র কার্য-কারণ নীতির জননী। স্বরূপশক্তি স্বয়ং কারণরূপে থেকে কার্যকে প্রকাশ করে। সেইজন্য কারণ-কার্য নীতি অভিন্ন। তাই কারণ ছাড়া কার্য হয় না আবার কার্য ছাড়াও কারণ হয় না। তা অতীব দুর্বোধ্য ও জটিল হলেও স্ববোধের কৃপায় তা অনুভবগম্য হয়। স্ববোধাত্মা ব্রহ্ম ঈশ্বর কারণাতীত কারণ। স্বরূপশক্তি সহযোগে তাঁর মধ্যে আদি কারণরূপে তাঁর স্বভাব জাত হয়। একদিকে তা আত্মার কার্য এবং অপরদিকে তা হল সমগ্র অন্তর ও বাহির সত্তার কারণ অর্থাৎ স্ববোধের কার্য হল স্বভাব আবার স্বভাবের কার্য হল প্রকৃতি। স্বভাব স্ববোধে কারণ, স্বভাবে কার্য, আবার স্বভাবে কারণ এবং প্রকৃতিতে কার্যরূপে লীলায়িত হয়। সেইজন্য সাধারণ মানুষের কাছে তা দুর্বোধ্য বলেই মনে হয়। কিন্তু অন্তরের স্বভাবের উৎকর্ষের ফলে তা সহজেই অনুভবগম্য হয়। স্বভাবের উৎকর্ষ হয় স্ববোধের অনুশীলন মাধ্যমে। এই অনুশীলন নীতির বিজ্ঞান দ্বিবিধ—একটি বহির্মুখী (efferent) এবং আরেকটি অন্তর্মুখী (afferent)। প্রথমটি হল অবিদ্যাশক্তির অধীন এবং দ্বিতীয়টি হল বিদ্যাশক্তির অধীন। সুতরাং কারণ-কার্য ও কার্য-কারণ নীতি উভয়ই দ্বিবিধ—একবার অন্তর্মুখী এবং আরেকবার বহির্মুখী। বহির্মুখী ধারাতে এক-এর থেকে নানাত্ব-বহুত্ব ও বৈচিত্র্যরূপে তা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে নাম-রূপের মাধ্যমে এবং অন্তর্মুখী গতিতে বাইরের থেকে অর্থাৎ বৈচিত্র্যময় নানাত্ব-বহুত্ব থেকে একধর্মী ও সমধর্মী হয়ে স্ববোধের মধ্যে মিশে যায়। সোজা কথায়,

অবিদ্যার ঘরে মিশ্রণ বেশি, বৈচিত্র্য বেশি, বিকার বেশি এবং প্রতিক্রিয়া বেশি। অপরপক্ষে বিদ্যার ঘরে একত্ব ও সমত্বের প্রাধান্য অধিক বলে মিশ্রণ, বিকার, পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া নেই। উপরোক্ত প্রসঙ্গের মাধ্যমে কারণ দ্বিবিধ এবং কার্যও দ্বিবিধ বলা হল। অবিদ্যার কারণ ও কার্য প্রকৃতির অধীন এবং বিদ্যার কারণ ও কার্য হল স্বভাবের অধীন। স্ববোধের অধীন হল পরাবিদ্যা। তার ঊর্ধ্বে অখণ্ড বোধসত্তা পরব্রহ্ম পরমাত্মা গুণাতীত ভাবাতীত ভেদাতীত দ্বন্দ্বাতীত কেবল অস্তিমাত্র সৎস্বরূপ চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ। আলোচ্য বিষয়টি ব্যক্ত বা প্রকাশ করা হল স্ববোধ আপনবোধ বা আত্মবোধের বিজ্ঞানমাধ্যমে। এই বিজ্ঞানই হল Science of Oneness। তার অন্তর্ভুক্ত হল science of duality and science of relativity অর্থাৎ অনাত্মা অবিদ্যার বিজ্ঞান। তা-ই হল material science, elemental science, physical science, natural science। এই natural science হল science of the becoming, অর্থাৎ non-self science। অপরপক্ষে Self-science হল Science of the Being. Being হল Pure Consciousness পুরুষ ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম এবং becoming হল তাঁর স্বভাবশক্তি, nature বা প্রকৃতি। Being and becoming are One Reality, but appear in life to be dual and manifold, contradictory to one another.

কার্য কারণনীতি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তাতে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে, কার্য কারণের অধীন এবং কারণকে তা অতিক্রম করতে পারবে না। সুতরাং আত্মা ও অনাত্মার ক্ষেত্রে অর্থাৎ Self and non-self প্রসঙ্গে কারণ-কার্য ও কার্য-কারণ নীতির সূত্র ধরে জানা যায়, আত্মার কার্য হল অনাত্মা; আত্মা কারণ এবং অনাত্মা কার্য। সুতরাং অনাত্মা হল আত্মার অধীন, আত্মা অনাত্মার অধীন নয়। তাই অনাত্মা কখনও আত্মাকে অতিক্রম করতে পারে না। কারণ নিরপেক্ষ কার্য নয়, কারণসাপেক্ষ কার্য। সেইরূপ আত্মা নিরপেক্ষ অনাত্মা নয়, আত্মাসাপেক্ষ অনাত্মা। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এবং প্রাকৃতবিজ্ঞানীদের পক্ষে বুদ্ধির বিষয় ও বিজ্ঞানের বিষয় অনাত্মা, আত্মা নয়। তার দ্বারা তারা জীবনের মূলসত্তা আত্মার সন্ধান পাবে না। বুদ্ধিকে সর্বতোভাবে আত্মাসাপেক্ষ করতে হবে, আত্মানিরপেক্ষ বুদ্ধি ধ্বংসের কারণ। স্ববোধাত্মার কাছে বুদ্ধিকে বিনা শর্তে সমর্পণ করতে হবে অথবা বুদ্ধির মধ্যে স্ববোধাত্মাকে বসাতে হবে। আত্মবোধের বিজ্ঞান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, either you have to surrender yourself to the all-pervading Absolute Self-Divine, the Pure Consciousness and Bliss Absolute or you havc to analyze the intellect thoroughly step by step and enquire about the Reality behind it in and through spiritual discrimination, self-analysis, self-meditation, self-redemption, exclusive devotion and self-love।

এই প্রসঙ্গে প্রচলিত কোনও মত পথের কথা উল্লেখ না-করে কেবলমাত্র স্ববোধের অনুসন্ধান বা আপনবোধের বিশ্লেষণ অর্থাৎ *self-enquiry* ও *self-analysis*-এর বিজ্ঞানকে স্বতন্ত্রভাবে অভিনব ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করা হয়েছে। It is the Science of all other branches of science—সমস্ত বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। It is the Knowledge Itself that can reveal all

without any distinction. শুদ্ধবোধই হল স্ববোধ। তাতে কোথাও কোনও ভেদ বা বৈশিষ্ট্য পৃথক করে সিদ্ধ নয়। বোধসত্তার বক্ষে বোধই স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত। এই বোধসত্তা হল Consciousness Itself, Knowledge Absolute, the Supreme Wisdom। সেখানে mental understanding or intellectual understanding অর্থাৎ মন-বুদ্ধির বোধ বা অনুভূতি অসিদ্ধ, কারণ তা হল আভাস বা চিদাভাস মাত্র। আভাস কখনও অবভাসককে প্রকাশ করতে পারে না। আমাদের মধ্যে যে জীবভাব তা মন-বুদ্ধির প্রকাশ, আত্মার প্রকাশ নয়। আত্মার প্রকাশ আত্মা স্বয়ং, শিবভাব বা আত্মভাব হল তার লক্ষণ, আত্মবোধই হল তার কারণ-কার্য, অখণ্ড আমিবোধে তা নিত্যসিদ্ধ। তার কথাই নানা ভঙ্গিমায় সবার সামনে ব্যক্ত করা হচ্ছে। এই আত্মবোধের আমি transcends all distinctions and variations of understanding of duality।

সংসারে অনাত্মসেবী মানুষের এই আত্মবোধ আবৃত থাকে অনাত্মবোধ ও অনাত্মপ্রীতির মাধ্যমে। বহির্প্রকৃতির অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান নাম-রূপের নানাত্ব-বহুত্ব বৈচিত্র্যাদি মানুষের মনকে বিমোহিত করে রেখেছে। তা অতিক্রম করতে হলে বিদ্যাশক্তি তথা Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge-এর সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজন। আত্মার জ্ঞান হল অদ্বৈত জ্ঞান, এক-এর জ্ঞান। তা অখণ্ড নিত্য পূর্ণ সম শান্ত স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপ্রকাশ, আপনবোধে হয় তার ব্যবহার। তার দ্বারা সর্ববিধ অনাত্মভাববোধকে অতিক্রম করে স্বস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে, তাহলেই অমৃতত্ব লাভ হবে। অমর আত্মা মৃত্যুর অধীন নয়, জ্ঞান কখনও অজ্ঞানের অধীন নয়, অদ্বৈত কখনও দ্বৈতের অধীন নয়, পূর্ণ কখনও অপূর্ণের অধীন নয়, আনন্দ কখনও নিরানন্দের অধীন নয়, মুক্তি কখনও বন্ধনের অধীন নয় এবং শান্তি কখনও অশান্তির অধীন নয়। কিন্তু তত্ত্বত অদ্বয় আত্মস্বরূপে অভেদে স্থিত হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিদোষে জীবন আত্মস্মৃতি হারিয়ে অনাত্মপ্রীতির জন্য এসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এসবের মধ্যে ামর আত্মাকে আবিষ্কার করার নামই হল Realization, অর্থাৎ অজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞানকে, বহুত্বের মধ্যে এক-কে, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে, বন্ধনের মধ্যে মুক্তিকে, নিরানন্দের মধ্যে আনন্দকে, অশান্তির মধ্যে শান্তিকে অর্থাৎ সমগ্র জগৎরূপে আপনসত্তাকে সম্যকরূপে দেখা, শোনা, জানা ও অনুভব করাই হল Self-Realization। Mental understanding and intellectual understanding are not realization. They are perception or partial experience. ভুল করে মানুষ মন-বুদ্ধির অনুভূতিকে realization বলে ব্যবহার করে। Realization-এর মর্মার্থ বা তাৎপর্য হল, the Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge—that is Knowledge of Knowledge.

জীবের আমি কাঁচা আমি, অজ্ঞানী, মন ও বুদ্ধির গোলাম। প্রকৃতিজাত মন-বুদ্ধি জীবের ভিতরে কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা সেজে সবকিছু নিজের অধীনে পেতে চায় অহংকারবশত। এই ভুল করে সে বুদ্ধিদোষে। বোধস্বরূপ আত্মার জায়গায় চিদাভাস বুদ্ধি প্রভু সেজে বসে জীবনে এবং নিজের অবিদ্যা-অজ্ঞান জাত কর্মফল নিজেই ভোগ করে। একেই বলে জীবদশা। জীবদশা ভোগ করে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তা অতিক্রম করার ইচ্ছা বা চেষ্টাও তার

নেই। এই অনাত্মপ্রীতির অভ্যাসে আত্মপ্রীতি বিস্মৃত হয়ে আমরা সবাই সংসারে চলি। এই অনাত্মা অভ্যাসের প্রভাবমুক্ত হতে গেলে আমাদের নূতন করে কতগুলি সত্ত্বগুণের অনুশীলন করতে হবে অর্থাৎ we must adapt, adjust and accomodate some new great noble thoughts, ideas and activities। এগুলোকে বলা হয় আদর্শ। কিছু কিছু আদর্শ হয়ত অনেকেই অভ্যাস করে, কিন্তু পূর্ণ ভাবে নয়। সেইজন্য তারা অবিদ্যা-অজ্ঞানজাত সর্বদোষ ও মল হতে মুক্ত হতে পারে না। সর্বোত্তম আদর্শ হল Knowledge of Knowledge। তা জীবনের প্রতি পদে অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ সর্বোত্তম আদর্শকে Science of Oneness and Oneness of Science রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। তা সচেতন ভাবে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে জীবনে প্রতিটি ব্যবহার ও আচরণের সঙ্গে adjust করে অর্থাৎ 'মেনে, মানিয়ে চলে' জীবনকে নূতন ভাববোধে রাঙিয়ে নিতে হবে, সাজিয়ে নিতে হবে, তার মধ্যে বাস করতে হবে। এক কথায় জীবনকে A^4 formula দিয়ে ব্যবহার করে জীবনের লক্ষ্য সেই আত্মবোধ/পাকা আমিতে পৌঁছতে হবে। A^4 মানে adaptation, adjustment, acceptance or accomodation এবং এই তিনটির সমন্বয়ে Absoltue-এ পৌঁছে যাবে। এই A^4 formula-র কথা বিজ্ঞানীদের কাছে বলা হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা এই formula-র বিস্তৃত আলোচনা শুনতে চাইলে তাদের সংক্ষেপে তা বলা হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল, তোমাদের scientific terms-এর সঙ্গে সম্যক মিল না-থাকলেও তার মর্মার্থ তোমরা এই formula-র বিজ্ঞানের সঙ্গে অনায়াসে মিলিয়ে নিতে পার। তাহলেই তোমরা 'এর' বক্তব্যের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। You will be able to realize the implied meaning of My sayings. 'এর' বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল Knowledge of Knowledge which will conduce you to know what the Reality is in essence and not what it appears to be—যা প্রতিভাত হচ্ছে তা নয়, প্রতিভাসকে যে প্রকাশ করছে, অর্থাৎ প্রকাশক বা অবভাসক, the revealer or the illuminator of all, who is the eternal witness of all। All kinds of manifestations and illuminations are subordinate to the revealer. The entire creation is subordinate to the creator, all objects of knowledge are subordinate to the subject knower. All these should be clarified by the right understanding, by the right knowledge which is Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge.

বক্তব্যের প্রারম্ভে গানের মধ্যে 'আনন্দঘন শ্যাম' কথাটা বলা হয়েছে। Right knowledge-ই হল তার অনুভূতি। That means Pure Consciousness is free from all merits and demerits. সর্বরকম বিকারমুক্ত সেই বোধ, তাই আনন্দঘন। কাজেই আনন্দ আর বোধ identical বা অভিন্ন এবং আনন্দ ও বোধ উভয়ই অখণ্ড বলে নিত্যপূর্ণ। সেইজন্য that is the Absolute। আবার যেহেতু তা অখণ্ড পূর্ণ সেহেতু তা সৎ ও নিত্য। 'যদেব পূর্ণম্ তদেব সৎ', আবার 'যদেব সৎ তদেব পূর্ণম্'। আবার 'যদেব সৎ তদেব চিদম্

(সম্বিতম্)'। 'যদেব চিদম্ (সম্বিতম্) তদেব সৎ'। 'যদেব সৎ চিৎস্বরূপম্ তদেব আনন্দম্', আবার 'যদেব আনন্দম্ তদেব সৎ চিৎ (সম্বিতম্)'। প্রসঙ্গ খুব সূক্ষ্ম ও জটিল বলে তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হচ্ছে। সোজা কথায়, যা সৎ তা-ই চিৎ, যা চিৎ তা-ই সৎ, যা সৎ তা-ই আনন্দ, যা আনন্দ তা-ই চিদানন্দ, যা চিৎ তা-ই সদানন্দ, যা আনন্দ তা-ই সচ্চিৎ। প্রত্যেকের যথার্থ সত্য পরিচয় formula দিয়ে বলা হল। পরিচয় শব্দটিতে পরি মানে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠকে চয়ন করাই হল পরিচয় শব্দের অর্থ। গতকাল প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছিল, মন শ্রেষ্ঠ বস্তুকে চায়। সেই শ্রেষ্ঠ বস্তু কী? বাইরের জগতে মানুষ চায় নাম-যশ-খ্যাতি-অর্থ-প্রতিষ্ঠা। এসবই তো কালাধীন, মৃত্যুর অধীন, বিকারী ও পরিণামী। আজকে তুমি ভারতের President হতে পার, চার বছর পরে সেই পদ থেকে তোমাকে আবার সরে আসতে হবে অর্থাৎ তোমার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। তা কিন্তু প্রতিষ্ঠা নয়। প্রতিষ্ঠা মানে যার মধ্যে বিকার নেই তাতে প্রবেশ ও তাতে পূর্ণ স্থিতি। তা সম্ভব Absolute-এর সঙ্গে মিশে identified হয়ে গেলে। সেখানে আর পতনের কোনও সম্ভাবনা নেই। You become One with the Absolute and there is no pitfall, no return from that Absolute. That is perfection. এখানে realization and perfection সম্বন্ধে স্বানুভবসিদ্ধ তত্ত্বের দৃষ্টিতে যা বলা হল তা গতানুগতিক ভাববোধের বিষয় হতে স্বতন্ত্র। একথা খেয়াল রাখতে হবে।

শাস্ত্রের সারাৎসার কথাগুলি যা বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তার গূঢ়ার্থ বা মর্মার্থ সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। এগুলির মধ্যে বুদ্ধির বাহাদুরি কিছু নেই। These are neither intellectual jugglery nor intellectual or speculative theory, doctrine or thesis. Theory. doctrine and thesis সবই মন-বুদ্ধির পরিকল্পিত— all these are imaginary concepts, but what is beyond imagination is the Self-identification. ''যস্য বোধোদয়ে তাবৎ স্বপ্নবৎ ভবতি ভ্রমঃ বিশ্বং।'' যেই বোধ জাগ্রত হলে স্বপ্নময় ও ভ্রান্তিময় জগৎ থাকে না। ''তস্মৈ সুখৈকরূপায় শান্তায় তেজসে।'' সেই সুখস্বরূপ শান্তিস্বরূপ বোধসত্তাকে 'এ' নিজস্বরূপ জেনে তাকে বরণ করে নিয়েছে। যাঁর বোধ হলে অন্য কিছু জানা বোঝা অবশিষ্ট বা বাকি থাকে না, যাঁর দর্শন হলে অন্য কারওকে দর্শন করা অবশিষ্ট বা বাকি থাকে না এবং যা হয়ে গেলে অর্থাৎ যাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলে (তাদাত্ম্য হয়ে গেলে) হওয়ার আর কিছু বাকি থাকে না, তা-ই হল 'আমি-র আমি অহংদেব পাকা আমি আত্মার আমি'। That verily is the true Self, the Self of all and that true Self is verily your Real I which is ever identified with I of Me and not the conditional apparent physical I, mental I or intellecutal I. সেইজন্য আজ গানের ভাষায় বলা হয়েছে—শ্যামল সবল সুঠাম আনন্দঘন শ্যাম। শ্যামকে আশ্রয় করে আনন্দঘন আত্মারামে পৌঁছে যাচ্ছে। তিনিই সবার প্রিয়তমোত্তম। এই প্রসঙ্গে ঋষিদের বাণী স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের মধ্যে একই আত্মা আছে যার জন্য পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসা প্রকাশ পায়। আত্মার জন্যই আত্মা আত্মাকে ভালবাসে। এই আত্মা সর্বব্যাপী all-pervading Reality which is everywhere in everything as it is। সবার মধ্যে এক সত্তা আছে বলেই আত্মার ধর্ম

ভালবাসা আত্মাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায়। অনাত্মা আত্মারই মধ্যে প্রকাশ পায় বলে আত্মপ্রেম থেকে তাও বঞ্চিত নয়। সেইজন্য অনাত্মা বস্তুও মানুষের কাছে প্রিয় হয়, মানুষ তাকে ভালবাসে তার অন্তর্নিহিত এক সত্তার জন্যই। আত্মা শুধু আত্মাকেই জানে। আত্মাকে জানাই হল আত্মাকে ভালবাসা অর্থাৎ knowledge knows the knowledge and not anything else। কাজেই বোধের ঘরে বোধের যে প্রকাশ তা বোধে বোধে বোধময় অদ্বয় অব্যয় অমৃতময়। "সোঽহমস্মি, সোঽহমস্মি, সোঽহমস্মি"—সে-ই আমি, সে-ই আমি, সে-ই আমি। সেই আমি অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দসত্তা। তাঁর কোনও বিকল্প নেই, প্রতিপক্ষ নেই, বিকার নেই।

'একোঽহম্ সচ্চিদানন্দস্বরূপম্ নিত্যম্ পূর্ণম্ অদ্বয়মব্যয়ম্ ভূমা অখণ্ডম্।' কথাগুলোর মধ্যে আসল স্বরূপের নির্দেশ আছে। বারবার শোন, একবার হয়ে যাও। কারণ শ্রুত বিষয়ই হল তোমার নিত্য অমৃত সত্যস্বরূপের পরিচয়। শুধু শ্রবণের মাধ্যমে এই বিজ্ঞান সুসিদ্ধ হয়, কোনও ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নয়। ক্রিয়াকলাপ করে মন-বুদ্ধি। ক্রিয়ার মধ্যে কর্তা, স্বার্থ ও উদ্দেশ্য থাকে। সেইজন্য ক্রিয়াকর্মের ফল অনিত্য, বিকারী ও পরিণামী। মন-বুদ্ধির ক্রিয়ার আরম্ভও আছে, শেষও আছে, কিন্তু শ্রবধারা—শ্রবণ নিরন্তর হয়েই চলেছে। 'বোধের ঘরে বোধের প্রকাশ ওঠে, ভাসে, ডোবে বারেবারে/মিশে যায় তা বোধের সঙ্গে বোধের ঘরে চিরতরে।' আরেকটি গানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

বোধসাগরে বোধের লাগিয়া
খেলে বোধ জীবনরূপ ধরিয়া
জীবনের মাঝে বৈচিত্র্য সাজে
অবিরাম চলে বোধ খেলিয়া।।
বোধের সংসারে বোধের ঘরে
ওঠে ভাসে ডোবে বোধ বোধের তরে
রূপ নাম ভাবে বোধ যুক্ত হইয়া
করে প্রকাশ বোধের স্বরূপ বোধ দিয়া।।
স্বভাবে মাতিয়া নাচিয়া গাহিয়া
সুখে দুঃখে হাসিয়া কাঁদিয়া
পরস্পরে মিলিয়া বোধের অভিনয় করিয়া
খেলা শেষে মিলে এসে সব বোধ শান্ত হইয়া।।
(খাম্বাজ—কাহারবা)

আর একটি গানে আছে ঃ

ধন্য ধন্য ধন্য আমি আমি কৃতকৃত্য
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আমি অচ্যুত নিত্যাদ্বৈত।।
সত্য জ্ঞান আনন্দ পূর্ণ অখণ্ড পরমতত্ত্ব
নামরূপ-বিবর্জিত আমি ভাবাতীত দ্বন্দ্বাতীত।।

সদসদ বিলক্ষণ বাহ্য-অভ্যন্তর সর্বশূন্য
নিষ্কল নির্মল নিরঞ্জন স্বরূপ মম সর্বসম।
শাশ্বত অমৃত আমি প্রশান্ত অনন্ত
নির্বিকল্প নিরালম্ব আমি অবিভক্ত।।
বিশ্বাত্মা সর্বাত্মা আমি ঈশ্বর অক্ষর ভূমা
নাহি মোর আকার বিকার নাহি কোন তুলনা।
অব্যক্ত হতে দেহ পর্যন্ত সর্ববিশ্ব আভাস প্রতীত
স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত ব্রহ্ম-আত্মা সুসংস্থিত।।

(বাগেশ্রী—ঝাঁপতাল)

বোধের সত্তায় বোধের খেলায় বোধ খেলেই চলে। তা rythmic and sonorous। তার প্রকাশ সংগীতরূপে অভিব্যক্ত হয়। ভজনের মাহাত্ম্য *ভজনামৃত*-এ প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি প্রকাশের পরে অনেকেই প্রশ্ন করেছিল যে, ভজনের বিষয়বস্তু আপনি কোথায় খুঁজে পেলেন? উত্তরে তাদের বলা হয়েছে, 'এ' পড়াশুনা কিছু করেনি। সুতরাং কোনও কিছু পাবার প্রশ্নও নেই। 'এ' যা তা-ই। তোমাদের মতো 'এরও' একটা দেহ আছে যা তোমরা দেখছ অর্থাৎ যে দেহটা 'এ' ব্যবহার করে। তোমাদের কাছে তোমাদের দেহের গুরুত্ব অনেক বেশি, কারণ তোমাদের body-identity প্রধান। কিন্তু 'এর' কাছে body-টা হল পোশাকের মতো। 'এর' কাছে self-identity হল প্রধান। I am not limited here or anywhere. I am beyond body-mind complex. Whatever forms or names can be experienced are nothing but the manifestations of the same One Consciousness which verily I am. আমিশূন্য অর্থাৎ আমি নেই এবং অনুভূতি আছে তা কখনওই সম্ভব নয়। তা হয়নি এবং হতেও পারে না। No experience without I is possible. অনেকেই I বলতে গেলে অহংকারকেই বোঝে। অহংকারের আমি ও অহংদেবের আমি-র মধ্যে পার্থক্য পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। অহংকার হল গুণ-উপাধি-ভাবযুক্ত কাঁচা আমি এবং অহংদেব হল সর্ববিধ গুণ-উপাধি-ভাববর্জিত, নাম-রূপাদি ভেদরহিত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াদির পরিণামশূন্য। অহংকার নিজেকে ছাড়া কতগুলি সসীম রূপ-নামকে জানে এবং তাই নিয়ে মেতে থাকে। অনন্ত অসীমকে সে জানেও না, বোঝেও না এবং বুঝতে চায়ও না। এই অহংকারের ঊর্ধ্বে অহংদেবের পরিচয় জানবার জন্য অর্থাৎ নিজের ব্যবহারিক জীবদশা অতিরিক্ত পারমার্থিক নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত দিব্য অমৃত সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য এত কথা তোমাদের বলা হচ্ছে। নিজের পারমার্থিক সত্তার অর্থাৎ পাকা আমি-র পরিচয় অবগত হবার দু'টি উপায় হল—(১) নেতিবাদ ও (২) ইতিবাদ। একটি সর্ব উপাধিশূন্য আমি এবং আরেকটি সর্ব উপাধিযুক্ত আমি। উভয়ই এক আমি-র পরিচয়। প্রথমটি নির্গুণের আমি এবং দ্বিতীয়টি হল সগুণের আমি। নির্গুণের আমি হল নিষেধমুখে সর্বগুণ-উপাধির দোষদৃষ্টিতে নিষেধপূর্বক

শুদ্ধ বোধস্বরূপে স্থিতি। দ্বিতীয়টি হল অখণ্ড ভূমা পূর্ণ আমিকে অবলম্বন করে সবকিছুর মধ্যে নিজে পূর্ণ ভাবে থাকা। উভয় উপায় বা পদ্ধতিতে আত্মতত্ত্ব সিদ্ধ। I am not this, not this—এটা হল negative process। Negative process-এ অবশিষ্ট থাকে শুধু শুদ্ধ I। তা অগাধ অশেষ অরূপগুণবর্ণাক্ষম্ অদ্বয় অব্যয় অমৃতময়। আবার this is also I am, this is also I am —এটা হল positive process। আমিকে ধরেই সব সিদ্ধ। এই শেষোক্ত process-এ অর্থাৎ ইতিবাদে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তে, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণে, বাইরে-অন্তরে-কেন্দ্রে, রূপে-নামে-ভাবে, অজ্ঞানে-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, উর্ধ্ব-অধঃ-মধ্যে যতরকম ভাববোধের অভিব্যক্তি হয় সবই আমি-র পরিচয়। এই বোধে মন-বুদ্ধির সর্ববিধ ব্যবহারের মধ্যে আমিকে অর্থাৎ চিদানন্দস্বরূপ এক সত্তাকেই 'মেনে মানিয়ে চলতে' হয়। আমি ছাড়া বা আমি অতিরিক্ত কোনও বোধের প্রকাশ সম্ভব নয়। অনুভূতিমাত্রেই আমি। এই বিজ্ঞানের সচেতন ব্যবহারের ফলে অর্থাৎ 'মেনে, মানিয়ে চলার' ফলে সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা হবে।

এই বিজ্ঞান সর্ববিজ্ঞানের উৎস এবং পরিণামকে সমভাবে প্রকাশ করে। তাতে Material science (Physical or Natural science) Spiritual science, Divine science বলে পৃথক কোনও ব্যবহারবিজ্ঞান থাকে না। সেসব এই অখণ্ড এক মানার বিজ্ঞানের মধ্যে একীভূত হয়ে যায়। এই হল সমগ্র বেদের সার কথা। This is the august proclamation of the quintessence of the Vedas. বেদের দু'টি ভাগ। প্রথম ভাগ কর্মকাণ্ড যা অপরাবিদ্যা অর্থাৎ যা অহংকারের মাধ্যমে সাধিত হয় জাগতিক ভোগসুখ, ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি ও সংসার জীবনের জন্য। বেদের দ্বিতীয় ভাগ হল জ্ঞানকাণ্ড। তা হল পরাবিদ্যা অর্থাৎ আত্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের লক্ষণ হল—জ্ঞানস্বরূপই আমি, আমিই জ্ঞানস্বরূপ। এই হল আত্মজ্ঞান। এর সমানও কিছু নেই, এর অতিরিক্তও কিছু নেই। আত্মজ্ঞানে আত্মা পূর্ণ, অর্থাৎ আমার দ্বারা আমাতে আমি পূর্ণ। এই আমি হল পাকা আমি, সবার হৃদয়ে তা অধিষ্ঠিত, সর্ব আমি-র আমি, সর্ব আত্মার আত্মা, সর্বদেবদেব পরমদেব। এই আমি নিত্য অদ্বৈত, তাতে দুই বা বহুর কোনও অস্তিত্ব নেই। আর থাকবেই বা কেমন করে? কারণ আমি অতিরিক্ত কিছু নেই, অর্থাৎ 'আমার' বলে আমি-র মধ্যে যে অংশ প্রকাশ পায়, তার কথাও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে পরেও কিছু বলা হবে। When there is only One eternal I Absolute then there is no question of duality, second entity or pairs of opposite which are mere imaginary entity. অখণ্ডের ঘরে সবার যে অধিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠা তা ভুলে গিয়ে কল্পিত খণ্ডের ঘরে, স্বপ্নের ঘরে বাস করে জীব বা কাঁচা আমি। সে ব্যষ্টি স্বার্থে খণ্ডের অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং তার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যকে প্রচার করে। খণ্ডকে ভালবাসলে অখণ্ডকে ভালবাসা যায় না, আবার অখণ্ডকে ভালবাসলে খণ্ডকে ভালবাসা যায় না। খণ্ডের ভাবনার দ্বারা খণ্ডের ধারণাই পুষ্ট হয়, অখণ্ডের ধারণা হয় না। আবার আপনাকে অখণ্ডরূপে ভাবনা করলে খণ্ড ভাবনা সরে যায়।

অখণ্ড ভাবনার মধ্যে দেহবুদ্ধির স্বীকৃতি নেই। সেখানে নিজের আমিকে সর্ব উপাধিশূন্য ভাবনা করতে হয়, যেমন আমি দেহবদ্ধ নই, জীব নই, আমার কোনও সঙ্গ নেই, আমি

অসঙ্গ অনঙ্গ অলিঙ্গ দেহাতীতম্। "দেহস্থোঽপি দেহাতীতম্, প্রাণস্থোঽপি প্রাণাতীতম্, ইন্দ্রিয়স্থোঽপি ইন্দ্রিয়াতীতম্, মনস্থোঽপি মনাতীতম্, ভাবস্থোঽপি ভাবাতীতম্, বুদ্ধ্যাস্থোঽপি বুদ্ধ্যাতীতম্ সর্বস্থোঽপি সর্বাতীতম্।"

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে উপাধিমুক্ত আমি হল আত্মার আমি অহংদেব পুরুষোত্তম পাকা আমি অর্থাৎ অদ্বৈতেব আমি। উপাধিযুক্ত আমি হল দ্বৈতের আমি, গুণাধীন চিদাভাসের আমি, অহংকার, অভিমানী অজ্ঞানী কাঁচা আমি। দ্বৈতবোধের জীবের আমি গুণবদ্ধ, কিন্তু অদ্বৈতবোধের পাকা আমি আত্মার আমি গুণমুক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যপূর্ণ। জীবের আমি কাঁচা আমি পাকা আমি-র শরণাগত হয়ে তাঁর নির্দেশ মেনে চললে গুণ-উপাধি মুক্ত হয়ে আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সর্ববিধ গুণ-উপাধি অস্বীকার ক'রে, নিষেধ ক'রে 'নেতি, নেতি' বিচারে সে সর্ব উপাধি শূন্য হয়। তার জন্য নিজেকে বা আমিকে আমারবোধের যতরকম বৃত্তি আছে সব বৃত্তিকে পরিহার করতে হয় বা অস্বীকার করতে হয়। দেহাত্মবুদ্ধি হল আমারবোধের লক্ষণ। এই 'আমারবোধ' হল মিশ্রবোধ, গুণভাবযুক্ত কতগুলি চিদাভাসের বৃত্তি। যেমন মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত (অন্তঃকরণ); চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়); বাক, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়); প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান (পঞ্চ প্রাণ); নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় (পঞ্চ বায়ু); ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্ষয়-বৃদ্ধি, গতাগতি প্রভৃতি প্রাণ ধর্মাদি; ষড়বিধ অন্তরের ভাবাদি—রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য; চতুবর্গ পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ; পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি মনোবৃত্তি; মন্ত্র, তীর্থ, বেদ, যজ্ঞাদি অনুশীলনাদি; কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্বাদি জৈবিক লক্ষণাদি; ভোজন, ভোজ্য, ভোক্তাদি; বুদ্ধিবৃত্তি; মৃত্যু, শঙ্কা, জাতিভেদ প্রভৃতি চিন্তা; মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, স্ত্রী, বন্ধু, মিত্র প্রভৃতি পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধ; গুরু, শিষ্য প্রভৃতি লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ—এসবই মানসকল্পিত অন্তর্বৃত্তি সমূহ এবং এদের আনুষঙ্গিক আরও অজস্র ভাববৃত্তি সবই উপাধিরূপে স্ববোধাত্মার বক্ষে স্বভাব প্রকৃতির প্রতিফলন। 'বোধময় আমি/আমিময় বোধ' অসঙ্গ নিস্পৃহ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নির্বিকল্প নির্বিকার নিরাকাব সর্ব গুণ-উপাধিশূন্য; সর্ব দ্বৈত ভাবাদি বর্জিত নাম-রূপাদি ভেদরহিত, ষড়ভাব বর্জিত, তিন গুণ (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ), তিন দেহ (স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ), তিন বোধাবস্থা (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি), পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম), পঞ্চকোষ (অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময়) প্রভৃতির অতীত বা শূন্য কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপ পুরুষোত্তম, তদতিরিক্ত অন্যকিছু নয়। এই হল নিত্যাদ্বৈত নিত্যমুক্ত অহংদেব পাকা আমি-র সত্য পরিচয়।

সমাপ্তির ঘণ্টা বাজতে বক্তব্য শেষ করে অল্পকিছু উপসংহারে যা দরকার তা-ই বলা হচ্ছে, মন দিয়ে শোন—অহংকারকে নাশের বিজ্ঞান অহংদেবকে দিয়েই হয়। এক-এর বিজ্ঞান শুনতে শুনতে তোমাদের ভিতরে এক-এর বোধ জেগে উঠবে, পৃথক করে সাধনভজন করার দরকার থাকবে না। আত্মবোধের তথা পাকা আমি বোধের কোনও সাধন নেই, কারণ তার কোনও বিকার বা পরিণাম হয় না। ভ্রান্তি বিস্মৃতি হল অহংকারের বা কাঁচা আমি-র। কাঁচা আমি-র অজ্ঞানবশত অভাববোধ, অজ্ঞানবোধ, বিকারবোধ প্রভৃতি থাকে বলে ক্রিয়াকলাপ

সাধনভজনে রত হয় কল্পনার সাহায্যে, কারণ অহংকার হল কল্পনাপ্রধান। আত্মার আমি অনাত্মার সেবা করে না। তাঁর কোনও অহংকারবোধ নেই, কাম-কর্ম-কর্তৃত্বও নেই। অহংকারের জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-প্রারব্ধ আছে। অহংকারের কাম-কর্ম-কর্তৃত্ব আছে বলে কর্মফলের সঙ্গে তার আসক্তিবশত বন্ধন তৈরি হয়। তার ফলে তার কর্মসংস্কার জমা হয়। এই কর্মসংস্কার থেকেই পুনঃপুনঃ জন্ম হয় এবং কর্মফলের প্রভাবেই তাকে ভোগদশা ভোগ করতে হয়। তাকেই প্রারব্ধ বলে। আত্মার জন্ম-ক্ষয়-বৃদ্ধি-মৃত্যু নেই, সুতরাং তাঁর কোনও প্রারব্ধও নেই। ঘুমের মধ্যে জীবের আমি স্বপ্ন দেখে অর্থাৎ স্বকৃত শুভাশুভ কর্মের সংস্কার তার চিত্তে গাঁথা থাকে। কল্পনার মাধ্যমে তা মন স্বপ্ন অবস্থায় ভোগ করতে চায়। স্বপ্নদৃশ্যকালে মনের কল্পিত কর্তা স্বপ্ন দর্শন করে এবং স্বপ্নের বিষয়কে ভোগ করে। এই কল্পিত সত্তাই হল প্রাতিভাসিক সত্তা। জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-মন দিয়ে সে যা করে তাও কিন্তু একটা স্বপ্ন। একে বলে জাগ্রৎ স্বপ্ন। ভোক্তা জীবের মনে পূর্ব অনুভূতির যে-সকল স্মৃতি জমা থাকে তা সে পুনরায় ভোগ করতে চায় স্বপ্নাবস্থায়। সূক্ষ্ম দেহে বা মানস দেহে যে ভোগ্য সামগ্রী সৃষ্টি করে তা সে ভোগ করে। তার স্বপ্ন ভেঙে গেলে স্থূল দেহে সে ফিরে আসে। তখন সে বুঝতে পারে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ও স্বপ্নদ্রষ্টা উভয়ই জাগ্রৎ অবস্থার কর্তা-ভোক্তারূপে 'আমি-র' থেকে আলাদা। মানুষের তিনটি দেহ। পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ দিয়ে জাগ্রৎ অবস্থায় সে যা-কিছু ব্যবহার করে, অনুভব করে এবং জানে তা-ই সত্য মনে করে। দ্বিতীয় হল সূক্ষ্ম দেহ, মানস দেহ বা প্রাতিভাসিক দেহ। সেই দেহের কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা মন জ্ঞেয়বস্তু নূতন করে সৃষ্টি করে ও ভোগ করে। তা-ই হল স্বপ্ন। এ হল তার প্রাতিভাসিক পরিচয়। গাঢ় ঘুমে (সুষুপ্তিতে) কর্তা-কর্ম-করণাদি সব অব্যক্ত কারণে লীন হয়ে যায়। তার ফলে মন-বুদ্ধির কোনও ক্রিয়া থাকে না। সেইজন্য কারণ দেহের অনুভূতি হল সুখমিশ্রিত অজ্ঞান অর্থাৎ কিছু না-জানা। এই কারণ দেহের ঊর্ধ্বে হল আপন সত্তাস্বরূপের অধিষ্ঠান। সেখানে সবই শুদ্ধবোধে একবোধে সমবোধে স্বয়ংপ্রকাশ। সেখানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় কেউ নেই, জ্ঞানস্বরূপ কেবল আমি বর্তমান। এই হল পারমার্থিক আমি অর্থাৎ পাকা আমি-র পরিচয়।

মন্তব্য ঃ

পঞ্চদশ বিচারের মর্মার্থ হল, কাঁচা আমি জীব জীবনভর কল্পনার সেবাই করে যায় অর্থাৎ একটা স্বপ্নের মধ্যে অনন্ত স্বপ্ন রচনা করে তার ফল ভোগ করে। স্বপ্নময় জগতে স্বপ্নের জীব স্বপ্নকেই সত্য মনে করে আত্মজ্ঞানের অভাবে। স্বপ্নময় জগৎ হল মনোমায়াকল্পিত অনাত্মার জগৎ। অনাত্মাসেবী জীব অনাত্মাকে সত্য মনে করে এবং আত্মার সন্ধান আর পায় না। দেহ হতে বুদ্ধি পর্যন্ত সবই মনোমায়াকল্পিত কল্পনার সীমা। আত্মস্মৃতি হারিয়ে অর্থাৎ আত্মবোধের অভাবে আপাতমনোরম অনাত্মার চমৎকারিতায় ভুলে চিদাভাস জীব অনাত্মার সেবা করে, অনাত্মাকে অনুভব করে, জানে এবং অনাত্মার জয়গান গায়। বিকারী দেশ-কাল, কার্য-কারণের মধ্যে সে জীবন কাটায়। তার কাছে খণ্ড রূপ-নাম-ভাব হল বাস্তব সত্য ও ইন্দ্রিয়-মনগ্রাহ্য, সুতরাং তদতিরিক্ত কোনও কিছু কল্পনা করা তার পক্ষে সম্ভব নয় বলে আত্মতত্ত্ব তার কাছে স্বীকৃত নয়। দেহবুদ্ধির অতীত শুদ্ধ আত্মবোধের কথা পাকা আমি-র প্রসঙ্গ অবলম্বনে তোমাদের

কাছে পরিবেষণ করা হয়েছে। কাঁচা আমি যা ব্যবহার করে তা সবই গুণ-ভাব-উপাধি সহযোগে। কিন্তু পাকা আমি কোনও প্রকার গুণ-ভাব-উপাধি ব্যবহার করে না। এই আমি অখণ্ড ভূমা পূর্ণ বলে নিরবলম্ব নিরুপাধিক নির্বিকল্প নিত্যমুক্ত স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত। এই পাকা আমি-র শরণাগত হয়ে তদ্‌বোধে জীবনে সবকিছু ব্যবহার করলে কাঁচা আমি আর সসীম ও বিকারী থাকে না, অখণ্ডের সেবায় অখণ্ডবোধে অখণ্ডের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। একটা স্থূল উপমা দিয়ে বলা যায়—ব্যাঙ্কে সবাই টাকা জমা রাখে। টাকার অঙ্ক যার যেরকম সে সেরকম সুদ পায়। অখণ্ডবোধের ব্যবহারে তদনুরূপ সুদ পাবে এবং খণ্ডবোধের ব্যবহারে খণ্ড সুদই পাবে। খণ্ডবোধের ব্যবহারে তোমার অভাববোধ, অজ্ঞান, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা যাবে না, তোমার দুঃখকষ্ট লাঘব হবে না। নিজের ভ্রান্তির জন্য তোমার কাঙালপনা থেকেই যাবে। এই কাঙালপনা দূর করার একটিমাত্র উপায়—জীবনের বহির্মুখী গতিকে অন্তর্মুখী করা, আপনবোধ দিয়ে সবকিছুকে গ্রহণ করা, 'মেনে, মানিয়ে চলা' প্রভৃতির ব্যবহার সচেতন ভাবে আচরণ করতে হয়।

জীবনভর তো দ্বৈত ভূমিকায় নানাবিধ উপাধি সহযোগে সংসারে পরস্পরের সঙ্গে অভিনয় করেই চলেছ এবং তার ফলস্বরূপ জীবদশা ভোগ করেই চলেছ। অনাত্মাভূমিতে অনাত্মার অভিনয়ে বহু জনম কাটিয়েছ। এবার আত্মভূমিতে সমবোধে একবোধে আপনবোধে সবার সাথে আত্মার অভিনয় দ্বারা আত্মবোধের অধিকারী হয়ে যাও। আত্মবোধের অধিকারী হলে অদ্বয়বোধের প্রতিষ্ঠা স্বতঃসিদ্ধ হবে। অদ্বয়বোধের জীবনে দ্বৈতবোধের কোনও প্রভাব থাকে না। জীবনযুদ্ধে দ্বৈতবোধে কেবল পরাজয়ই অনুভূত হয়। অদ্বয়বোধে জয়-পরাজয় সমান হয়ে যায়, সুতরাং পৃথক করে তার কোনও প্রভাব থাকে না। তাই অর্জুনকে বলা হয়েছিল যে, সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে সেই এক পাকা আমি-র শরণ নাও। এই পাকা আমি হোক তোমার জীবনের একমাত্র আদর্শ, লক্ষ্য, ইষ্ট, উপায়, প্রভু, গুরু, সাক্ষী, আত্মা, সুহৃদ, মিত্র প্রভৃতি—সর্বেসর্বা।

এই 'পাকা আমিকে' মানার বিজ্ঞানমাধ্যমে ব্যবহার করার কথা দীর্ঘকালযাবৎ 'এ' প্রকাশ করে চলেছে। You have to accept this 'I' and 'Me' under all circumstances i.e. favourable-unfavourable, agreeable-unagreeable, pleasant-unpleasant, right-wrong, success-failure etc. 'পাকা আমি' হল I Absolute—all-pervading Real existence, Knowledge, Bliss and Love Itself which is ever-present in each and every individual as their innermost Self dwelling within the core of their heart। Behind their ego I-Reality ever exists as the witness of the intellect and the rest. Without this witness I no individual can exist nor can function or experience anything in life. This Self-I is your true identity which is beyond any beginning and end. Otherwise everything in the creation has beginning and end. আজকে তোমাদের কাছে তোমাদের Self-identity-র বিজ্ঞান প্রকাশ করে দেওয়া হল।

১৭/০১/০২

।। ষোড়শ বিচার।।

ওঁ

আনন্দ ব্রহ্ম আনন্দ আত্মা আনন্দ ঈশ্বর আনন্দ ভগবান
সচ্চিদানন্দ ভূমা অখণ্ড নিত্য অদ্বৈত ঘনপ্রজ্ঞান।।
স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত শাশ্বত অচ্যুত প্রশান্ত অনন্ত
সর্বসম অনুপম স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংপূর্ণ সর্বসমাধান।।
বোধের বোধ জ্ঞানের জ্ঞান স্ববোধ আপন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান
নিষ্কল নির্মল নিরঞ্জন অমৃত মুক্তি শান্তিনিধান।।

(ব্রহ্মতত্ত্ব)

আত্মবাদীর কাছে আত্মাই হল একমাত্র সত্য বস্তু এবং সেই সত্য বস্তু স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত, অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশমান স্বয়ংপূর্ণ। তাঁ সবসময়ই পূর্ণ। সবকিছুর মধ্যেই তাঁ মিশে আছে, অর্থাৎ আমরা জীবনে যা-কিছু অনুভব করি সেসবই আত্মার পরিচয়। এত lucid, comprehensive and at the same time all encompassing, all embracing আর কোনও সত্য ভাবা যায় না! ঈশ্বরের কথা বললে সৃষ্টি-স্রষ্টা আসে, দ্বৈতভাব আসে। দেবদেবী আছে, তার পরে নানা প্রকার জীব আছে, জগৎ আছে। এত complex আসাতে মানবীয় বুদ্ধি তার নাগাল সহজে পায় না, সহজে সমাধান পাওয়া খুব কঠিন। যুগে যুগে মানুষের যোগ্যতার মান নেমে যায়। মানুষের ক্রমশ দেহাত্মবুদ্ধি বেড়ে যায়। সত্যযুগে মানুষের আয়ু ছিল লক্ষ বছর, তাদের তপস্যা ছিল জ্ঞানময় তপস্যা। ত্রেতায় তা নেমে আসে এক-দশমাংশে অর্থাৎ দশ হাজার বছর। দশ হাজার বছরের আয়ুতে জ্ঞানময় তপস্যা সম্ভব হত না, তখন তাদের মনোময় তপস্যা অর্থাৎ ধ্যান প্রচলিত ছিল। ধ্যান হচ্ছে ত্রেতা যুগের সাধনা। দ্বাপরে এসে গেল তার এক দশমাংশ (one-tenth) অর্থাৎ এক হাজার বছর আয়ু। তখন ধ্যানের থেকে আরও নিচে নেমে এল। তখন হল নামময় যজ্ঞ বা জপ অর্থাৎ পূজা উপাসনা। কলিতে এসে গেল তারও এক দশমাংশ (one-tenth) অর্থাৎ একশো বছর। একশো বছরের average আয়ু সবাই এখন আর পায় না। কমতে কমতে নেমে আসছে, আরও নেমে যাবে। এখনকার পূজা হচ্ছে অন্নময়, অর্থাৎ অন্নময় কোষের, আমাদের দেহগত বুদ্ধি বা অহংকার দিয়ে যা হয় তা-ই হল কলিযুগের পূজা।

সত্যযুগের সঙ্গে এই যুগের যে পার্থক্য তা কী করে makeup দেওয়া যায়? এই চিন্তা মানুষের মধ্যে জেগে উঠলেও মানুষ কিন্তু তার সমাধান খুঁজে পায় না। জন্মের পর থেকে মানুষ নানারকম বিকার, অভাব, রোগ, শোকের সঙ্গে মোকাবিলা করে, তাছাড়াও পারিবারিক,

প্রতিবেশী, সমাজ, দেশ— নানারকম দিক থেকে যে-সমস্ত সমস্যার উৎপত্তি হয় সেগুলো মোকাবিলা করতে হয় মানুষকে। তার সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগাদি তো আছেই। যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগাদি সব যুগেই ছিল, কিন্তু মানুষের যোগ্যতার মান অধিক থাকার ফলে সেই দুর্যোগাদি মানুষকে অভিভূত করতে পারেনি। এখন তা অবশ্য পারে! এখন বন্যা, ঝড় ও ভূমিকম্প হলে মানুষের কীরকম ক্ষয়ক্ষতি হয় তা সবাই মোটামুটি জানতে পেরেছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষকে 'All Divine for All Time, as It Is'–এ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একমাত্র আত্মবিজ্ঞানের সহায়তা সবচাইতে বেশি দরকার বলে এই আত্মার বিজ্ঞানকে ব্যাপকভাবে সবার সামনে রাখা হচ্ছে। ঈশ্বরেরও একটা আত্মা আছে। কাজেই ঈশ্বরবাদী ও আত্মবাদীর মধ্যে মূলত কোনও তফাত নেই কিন্তু দ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে স্বভাবদোষে কার্যত ভেদ প্রতীত হয়। আর ব্রহ্মবাদী তো ব্রহ্ম-আত্মাতেই আছেন। সবক্ষেত্রেই মানুষ চায় অখণ্ড আনন্দ বা শান্তি। কিন্তু অখণ্ড আনন্দ বা শান্তি তো চাইলেই পাওয়া যাবে না। তা তো কোনও দ্রব্য বা বস্তু নয় যে বাজারে গিয়ে কিনে নিয়ে এলাম বা কোনও জায়গা থেকে উঠিয়ে নিয়ে এলাম বা জোর ক'বে কেড়ে নিয়ে এলাম বা লুকিয়ে নিয়ে এলাম—তা নয়। আমাদের দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত অর্থাৎ অন্তর ও বাহিরের যতরকম ভাব, বৃত্তি ও বোধ আছে সবকিছুর balanced development হলে তবেই আমাদের মধ্যে আনন্দের একটা ধারণা তৈরি হয়। এই আনন্দ সম্বন্ধে অতীতে 'এ' অনেক কথা বলেছে, তবু এখানে কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে।

মানুষের দেহের ভিতরে যতগুলি বিভাগ আছে অর্থাৎ যার দ্বারা দেহযন্ত্র পরিচালিত হয়, সেই যন্ত্রের বিকার হলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এই দেহযন্ত্র সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান খুব ব্যাপক নয়। যার জন্য মানুষের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের কোনও বিকার হলে তাকে ডাক্তারের কাছেই ছুটতে হয়। ডাক্তাররাও নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিকারের কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করে, অর্থাৎ বিকার কোথায় কী শোধন করতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু সেসব ক'রেও সবসময় রোগ নিরাময় হয় না। এই মহাপ্রকৃতি যে সৃষ্টি ক'রে চলেছে তাকে প্রথমে বাইরের থেকে বিজ্ঞানীরা blind force-ই বলেছিল এবং ঈশ্বরকে তারা প্রথমদিকে স্বীকার করেনি। তারা বলেছে, সৃষ্টি হল accidental—এরকম judgement তারা দিয়েছে। 'এর' কাছে সংগ্রহ করা আছে last একশো বছরের বিজ্ঞানীদের statement। তাঁরা যা reading পেয়েছে তা-ই তাঁরা বলছে। মানুষ বাইরে সন্ধান ক'রে শ্রেষ্ঠ বস্তুকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে। আবার অন্তরেও শ্রেষ্ঠ বস্তুকে ভাবনা ক'রে তা সংগ্রহ ক'রে পুঁজি করার চেষ্টা করেছে। তাদের মধ্যে যাঁরা ধ্যানী, জ্ঞানী এবং ভক্ত তাঁরা কীভাবে অন্তরে সেই অনুভূতির সাড়া পেয়ে তা বাড়িয়ে তুলেছে এবং সেই অনুভূতির অধিকারী হয়েছে তার কিছু recordও আছে আমাদের দেশে—ধর্মজগতে, বিজ্ঞানজগতে, সাহিত্যজগতে। এই যে অন্তরের বিকাশ তা নিশ্চয়ই স্থূল ব্যাপার নয়। তার কারণ অন্তঃকরণের মধ্যে চারটে বৃত্তি আছে—মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। এই চারটে বৃত্তির একক নামই হল অন্তঃকরণ।

অন্তর মানে inner sense বা inner instrument or organ। কীসের organ? জীবনকে পরিচালনা করতে গেলে যে যন্ত্রের একান্ত দরকার বা যা আবশ্যক তা-ই হল inner organ। দেহ-ইন্দ্রিয়াদি জড় সত্য, কিন্তু জীবন নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ জড় বস্তু নয়। তার মধ্যে চেতনের অংশ আছে, যদিও চৈতন্য সেখানে বহুলাংশে আবৃত। চৈতন্য আর চেতন কিন্তু এক কথা নয়। এই জড় বস্তুকে চালাচ্ছে কে ? Bio-energy. দেহও energy-রই একটা বিশেষ condensed form or grossified state, যার জন্য প্রত্যেকটি অণুকোষ বা দেহকোষ একেবারে lifeless নয়, তার sense আছে। এই যে sense কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে তার কারণ, অখণ্ড চৈতন্যসত্তা হল মৌলিক উপাদান, basic substance or substratum or underlying essence of all creations। সেই underlying essence কিন্তু Consciousness। এই Consciousness compound বা mixture কোনও জিনিস নয়। তা হল original, unmixed, unalloyed substance which is Self-begotten and not created। সৃষ্টির বহু আগে থেকেই তার অস্তিত্ব ছিল। তা হচ্ছে eternal Existence, out of which everything is created। তার ভিতরে ঈক্ষণ হয়, অর্থাৎ তার ভিতরে infinite divine Will সৃষ্টি হয়। সেই Will তিন গুণ যোগে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। Will to create (or Will to do), Will to know and Will to enjoy. অর্থাৎ প্রকাশের ইচ্ছা বা সৃষ্টির ইচ্ছা; জানবার ইচ্ছা এবং অনুভব করার বা আস্বাদন করার ইচ্ছা। এই তিনটে ইচ্ছা নিয়ে সেই Infinite unmanifested Consciousness known as *Brahman/Atman*, the Absolute manifested হলেন নিজেরই মধ্যে নিজে out of His /Her all-divine Will force। তাঁর অন্তর্নিহিত বা inherent power লীলায়িত হল, energized হল। ছিল silent ও static condition-এ, all balanced state-এ, তা energized হল। তার ভিতরে একটা প্রকাশের ইচ্ছা জাগল, ''একোঽহম্ বহুস্যাম্'', অর্থাৎ এক আমি আছি, আমি বহু হব।

গতকাল 'এ' শ্যাম এবং শ্যামলের কথা ব'লেছে। আজকে সেই প্রসঙ্গ থেকে কীভাবে অন্য প্রসঙ্গ আসছে তা-ই বলা হবে। ''একোঽহম্'', অর্থাৎ এই এক আমি-র বহু হবার ইচ্ছা জাগল। বহু হয়েও কিন্তু সে একই থেকে গেল, যার জন্য অব্যক্ত ব্যক্ত হয়েও অব্যক্তই রইল, অদ্বৈত দ্বৈত ও বহু হয়েও অদ্বৈতই রইল। এই জিনিসগুলো কী ক'রে সম্ভব হয়েছে তা-ই আজকে আলোচনা করা হবে। সবটা cover করা যাবে না, তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। বিজ্ঞানের কোনও proposition বা formula যদি বিজ্ঞানীদের কাছে বলতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই একটা সময়ের সঙ্গে মিল রেখেই তাকে বলতে হবে। 'এ' এই 'ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা'— the 'Science of Oneness' মানুষের কাছে যথা সম্ভব intelligible ক'রে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। তার কারণ জানা এবং না-জানা, এই না-জানা থেকে জানাতে মাঝখানের gap-কে পূরণ না-করা পর্যন্ত (untill we fulfill the gap) কারও কাছে সেই অনুভূতি খেলবে না। আমাদের শিক্ষাবিভাগে শৈশব থেকে অর্থাৎ alphabetical stage থেকে জ্ঞান আরম্ভ হয়। শিক্ষা দেবার জন্য নানাদিক থেকে support দিয়ে তার ভিতরে সেই অনুভূতির vibration সৃষ্টি ক'রে দেওয়া হয়। রূপ-নাম থেকে, নানা angle থেকে, কর্মের থেকে, এই

প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তার মধ্যে culmination of experience and knowledge তৈরি হচ্ছে। তা-ই হল education। 'এর' কাছে education-এর সংজ্ঞা হল, education is the unfoldment of perfection which is already within us. Education বাইরে থেকে আসে না, it reveals from within। জ্ঞান কখনও বাইরে থেকে আসে না। ভিতর থেকে বাইরে যা প্রকাশ পায়, that is reflection। এই reflection-কে আবার সে নিজে গ্রহণ করে—তা-ই হল সংহার।

আমরা দেখতে পাই যে, all-pervading Divine Will তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ করছে। সেই তিন ভাগের মধ্যে আমরা পাই—Will to create (Will to express or Will to do); then Will to know i.e. Will to experience and Will to realize এবং তৃতীয়টি হল Will to enjoy। Gross outer-এ, subtle inner-এ, subtler central-এ এবং subtlest transcendental-এ একরকম নয়, প্রত্যেক স্তরেই উত্তরোত্তর তার মাত্রা অধিকতর ব্যাপক ও স্থায়ীরূপ নিয়ে transcendental বা তুরীয়তে মিশে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। তাদাত্ম্যের অর্থ হল তার পৃথক অস্তিত্ব অখণ্ডের সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে যায়। উত্তরণকালে প্রত্যেকটির লক্ষণ পৃথক পৃথক ভাবে অনুভূত হয়। Enjoyment in action and enjoyment in silence—এই দু'টোর মধ্যে অনেক difference আছে। Enjoyment in all positive attitude is quite different from the enjoyment in all negative attitude. এই difference-টা জ্ঞানের মাধ্যমেই অনুভূত হয়। প্রকাশের ধারা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অনুভূত হয়। বিষয়বস্তু শোনার সময় খুব কঠিন মনে হলেও ধারাবাহিক ভাবে শুনলে তা সহজবোধ্য হয়, নতুবা নয়। Light of understanding দিয়ে কী ক'রে সবকিছুর সঙ্গে মিশে আছে সেই eternal one Substratum বা বিশুদ্ধচৈতন্য, which is unalloyed, unmixed, uncreated, Self-begotten Consciousness symptomatized as I-Absolute তা-ই তোমাদের বলা হচ্ছে। এই I-Reality কিন্তু প্রজ্ঞান থেকে আরম্ভ ক'রে অজ্ঞান পর্যন্ত সর্বস্তরেই pervade করছে। তা 'এ' পূর্বে উল্লেখ করেছে, কিন্তু তা point by point focus করলে it will become very easy to understand।

এই তিনটি ইচ্ছাশক্তি সেই চৈতন্যের সঙ্গে, চৈতন্যের বক্ষে জেগে উঠল, তার অর্থ হল Being-এর বক্ষে becoming start হল। Being appears in a different nature which is called becoming. তার মধ্যে তিনটে main unit of Consciousness পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে Will to do, Will to create or express i.e. principle of creation personified as *Brahmaa*, the gross cosmic being। Second-টা হল the principle of experience or Consciousness which is all-pervading universal One personifed as *Vishnu*, subtle cosmic being and the third is the principle of unification, principle of dissolution, disintegration। Integration-এর পরে যে disintegration হচ্ছে বা transformation, that is personified as *Shiva*—এই

তিনজন হলেন chief Godhead in creation। তাঁরা একত্র হয়ে হলেন ঈশ্বর। The three chief Godheads—*Brahmaa, Vishnu, Maheshwara* are the same One Reality in creation. But God beyond creation has no division, no function, no action and no contradiction. That is the Absolute.

ভিতরে যা প্রকাশ হয়েছে তা-ই মানুষের সামনে বলা হচ্ছে। সকল মতপথের লোকের সঙ্গেই অধ্যাত্মপ্রসঙ্গে আলোচনা হয়। প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা যে subject চর্চা করি তা অন্তরে প্রবেশ করে না। সোজা কথায় বলতে গেলে power of understanding যদি না-থাকে আমাদের তাহলে কোনও subject-ই চর্চা করা যায় না। Power of understanding manifests from the background Consciousness. That means Consciousness stands always as the source of all understandings, source of experiences and source of our congnition and recognition. Consciousness Itself হল Realization, সেখানে subject থাকে না।

Realization does not depend on subject-object complex. It is the identity of both subject and object. It is the unity of all different principles of Consciousness. সেইজন্য দেখা যায় যে, নানারকম বিষয়ের জ্ঞান চয়ন ক'রে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি মনের মাধ্যমে তা বুদ্ধির কাছে পৌঁছে দেয়, বুদ্ধি আবার তা বোধস্বরূপ বা পরমবোধির কাছে পৌঁছে দেয়। বোধির থেকে তা আবার sanction হয়ে বুদ্ধির মাধ্যমে, মন ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যখন বাইরে প্রকাশ পায় তখন তা আমরা experience করতে পারি। This is the science! এত অল্প সময়ের মধ্যে তা হয় যে, আমরা কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাই না বিশেষ। কিন্তু যারা বিজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ wise person তাঁদের কাছে এই তত্ত্বগুলি crystal clear। আজকে আনন্দ দিয়ে প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হয়েছে। আনন্দ হচ্ছে সেই principle—তত্ত্ব যা জীবনের পূর্ণমানের লক্ষণ। আনন্দের মধ্যে অভাব কীসের? ভ্রান্তি-ভীতির। ভ্রান্তি-ভীতি হয় দ্বৈতজ্ঞানে বা বহুত্বজ্ঞানে—in duality and plurality-র মধ্যে। কিন্তু অদ্বৈতের মধ্যে কোনও ভ্রান্তি নেই। অদ্বৈতে যেমন ভ্রান্তি নেই, ভীতিও নেই। সেইজন্য দ্বৈত ও বহুত্বে আনন্দের অভাব। অদ্বৈতে আনন্দের কোনও অভাব নেই, তা পূর্ণ অখণ্ড। সেইজন্যই বলা হয়েছে, স্বল্পে সুখ নেই, অনন্তেই সুখ। "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্ ভূমৈব অমৃতম্ স্বল্পৈব মৃতম্" অর্থাৎ ভূমাতেই অমৃত, স্বল্পে মৃত্যু। "ভূমৈব সুখম্"। ভূমা মানে অখণ্ড। তার মধ্যেই সুখ, অনন্তই সুখ। সীমার মধ্যে সুখ নেই, অর্থাৎ সসীমে সুখ নেই। এই আনন্দ জীবনের মধ্যে আবৃত হয়ে আছে। সৎ, চিৎ, আনন্দ—এই তিনটে কথা বলা হয়। সৎ মানে existence, চিৎ মানে তার প্রকাশরূপ বোধ বা Consciousness এবং আনন্দ (Bliss) হল তার পরিপূর্ণতা। কিন্তু সৎ তো সবসময়ই বর্তমান। সৎ-এর জন্য আমাদের কোথাও যেতে হবে না। সব জিনিসেরই একটা অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তার চিদ্ অংশ পরিপূর্ণ প্রকাশমান নয়। তা চর্চা করে তারপরে প্রকাশ করতে হয়। আর আনন্দ অংশ একেবারে আবৃত।

জীবনে আনন্দ আমরা খুঁজে বেড়াই অন্তরে-বাইরে নানারকম ভাবে, কিন্তু পাই না। অনেকে আরামকেই আনন্দ মনে করে কিন্তু আরাম আনন্দ নয়, তা তো sensual plane-এর পর্যায়ে পড়ে। আনন্দ হচ্ছে সব ভাববোধের একক রূপ, পূর্ণ রূপ, সবার essence যা তা-ই হল আনন্দ। অর্থাৎ আনন্দের পরে আর কোনও principle নেই। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন"। ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানার আনন্দ যিনি উপলব্ধি করেন তিনি কখনও ভয় পান না। বিদ্বান যিনি অর্থাৎ যাঁর ভিতরে বিদ্যা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে reveal করেছে তাঁর মধ্যেই আনন্দ স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত। তার কারণ বোধ আর আনন্দ অবিনাভাবী অর্থাৎ indivisible। তা undivided one principle, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা এগুলোকে পৃথক পৃথক ক'রে ব্যবহার করি আমাদের যোগ্যতার অভাবে। কাজেই আমরা অবিভক্তকে বিভক্তরূপে দেখি এবং সেভাবেই ব্যবহার করি ও বুঝি। সেইজন্য গীতায় পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, 'পাকা আমিকে' পেতে হলে বিভক্তের মধ্যে অবিভক্তরূপে 'আমিকে' অনুভব করতে হবে। "অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।" তাহলে অবিভক্তের মধ্যে বিভক্ত এবং বিভক্তের মধ্যে অবিভক্ত পূর্ণমাত্রায় আছে। জ্ঞান আর বিজ্ঞান—এই দু'টোকে না-জানলে কিন্তু যথার্থ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ একটা static এবং আরেকটা হল dynamic।

বিজ্ঞানের মধ্যে dynamism আছে, energizm আছে, কিন্তু প্রজ্ঞান হল static, non-dual, supportless, formless, actionless and homogeneous। আমাদের বুদ্ধির যতক্ষণ পর্যন্ত যোগ্যতার অভাব থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানের বিষয়কে তা পরিহার ক'রে চলে এবং অজ্ঞান নিয়ে খেলা করে। এই খেলা করতে করতে তার ভিতরের অন্তরায়গুলো সরে গেলে আস্তে আস্তে জ্ঞানের বিকাশ হতে থাকে। বীজের মধ্যে থেকে যেমন গাছ প্রথমে অঙ্কুরিত হয়, তারপরে তার মধ্যে ফুল ও ফল হয়। এগুলো হচ্ছে inner unfoldment। এই inner unfoldment ছাড়া জ্ঞান লাভ হয় না। বাইরে থেকে যতই জ্ঞান সংগ্রহ কর তাতে যথার্থ জ্ঞান লাভ হবে না। এই প্রসঙ্গে এখানে একটা সত্য ঘটনা বলা হয়েছিল, খুব interesting! জ্ঞানীরা এসে একবার 'একে' প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি শাস্ত্র পড়েননি অথচ শাস্ত্রজ্ঞানের কথা আপনি কী করে বলছেন? উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, হ্যাঁ তোমরা তো সত্যি কথাই বলেছ! কিন্তু এই প্রকৃতির মধ্যে যা-কিছু তোমরা দেখতে পাচ্ছ সব জিনিসের জ্ঞান কি তোমাদের হচ্ছে? কিন্তু তাই বলে কি সেই জিনিসকে তোমরা ব্যবহার করছ না? একটা বীজের মধ্যে গাছ কী ভাবে লুকিয়ে আছে তা কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ? তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু তা লুকিয়ে আছে। It exists there in one condition which cannot be perceived through your sense organs. আস্তে আস্তে তা যে প্রকাশ হচ্ছে তার process কী? তা কি আমাদের control-এ না আমাদের control-এর বাইরে? কী উত্তর দেবে? একটা পাখির ডিম, তার ভিতরে যে পাখিটা আছে তার অবয়ব, অর্থাৎ পূর্ণ শরীরটা,

শরীরের কী বর্ণ, কীরকম চেহারা পাখিটার হবে, তার বুলি কীরকম হবে তা বাহ্যদৃষ্টিতে ডিমের থেকে বোঝা যায় না। তা হচ্ছে cause state। কাজেই cause state-এর মধ্যে effect-কে বা action-কে discover করা যায় না। Action-এর মধ্যে cause-টা আবার এমন সূক্ষ্মভাবে থাকে যে তাও ধরা যায় না। এই দু'টোকে ধরতে গেলে জ্ঞান আর বিজ্ঞান দুটোকেই জানতে হবে—অর্থাৎ existence বা অস্তিত্ব এবং তার পরে তার প্রকাশরূপ বা ভাতিরূপ। অস্তি আর ভাতি দু'টোকেই জানতে হবে। তবেই ভিতরে আনন্দ প্রকাশের জমি তৈরি হবে। আমরা যাকে আনন্দ বলে মনে করি তা হল আরাম। ইংরাজিতে কতগুলো শব্দ আছে যা আমরা ব্যবহার করি, কিন্তু সেগুলোর সংস্কৃতে যে অর্থ তা সঠিক ভাবে পাওয়া যায় না। অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে তার ঠিক exact english word পাওয়া যায় না। আমরা happiness কথাটা বলি যার অর্থ হল সুখ। Bliss বলতে গেলে আনন্দ, আবার joy বলতে গেলেও আনন্দকে বোঝায়, pleasure বলতে গেলে সুখ, কিন্তু divine সুখ অর্থাৎ divine bliss and bliss in ordinary sense এক কথা নয়। Divine bliss হল infinite and unending। Unending bliss, unending peace কথাগুলো আমরা ব্যবহার করি সাহিত্যে, কিন্তু বুদ্ধির ক্ষমতা নেই তার যথার্থ অর্থ perceive করার। একটা rough use হয় মাত্র।

সত্য কথাটা সবাই ব্যবহার করি কিন্তু তার মর্মার্থ বা তাৎপর্য সঠিক ভাবে না-বুঝেই ব্যবহার করি। সত্য হল all-accepting, all-pervading, all-uniting and all-embracing। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই সত্যবোধটা সবার জাগে না। কেন জাগে না? তার কারণ আমরা মন-বুদ্ধি দিয়ে সবকিছুকে পৃথকবোধে মাপবার চেষ্টা করি। বুদ্ধির পশ্চাতে যে পরমবোধি সেখানে কিন্তু বুদ্ধির দরকার হয় না। Self luminous Consciousness Itself does not require any support or any organ for its manifestation and realization, যদিও আমাদের জীবনের মধ্যে পরমবোধি বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন রূপে দেহের মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে চলেছে। কিন্তু এই প্রকাশধারা স্বতন্ত্র, তা self-sufficient ও spontaneous কিন্তু conditional নয়। বাইরে থেকে দেখতে গেলে conditional মনে হয় owing to the fault of our intellect or lack of our experience। Owing to the lack of our experience, for want of sufficient awareness we cannot recognize all happening within and without. তাহলে আমাদের সেই education-এর অভাব যে education-এর জন্য আমরা জন্মগ্রহণ করি—কিন্তু আমরা সেই education পাই না। Education-টা কী? Balanced development of our physical, vital, mental and intellectual aspects of our life. সেই education-এর মাধ্যমে আমাদের দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্তের balanced development হবে। এর নামই হল ধর্মবিজ্ঞান। 'এর' সংজ্ঞাগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ convention-এর বাইরে। Conventional সংজ্ঞার সঙ্গে 'এর' কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এগুলোকে contradict করাও খুব মুশকিল, কেননা এগুলো direct source থেকে আসছে, where there is no complex at all, no

division, no contradiction। এই যে আনন্দের কথা বলা হল, এই আনন্দ হল সেই অনুভূতি যে অনুভূতি সমস্ত অনুভূতিকে গ্রাস ক'রে absorb ক'রে নেয় বা embrace ক'রে নেয়। সেইজন্য বলা হয়েছে, আনন্দ ব্রহ্ম আনন্দ আত্মা which reveals all without any hesitation, which exists in every manifestation without any condition and limitation and which reveals Itself as It is, without any support, without any second entity, because It is infinite, absolute, all-transcendental and of homogeneous nature।

Homogeneous nature সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই কম। আমরা heterogeneous nature বুঝি, সব জিনিসকে পৃথক করে বা আলাদা ভাবে দেখতে সবাই অভ্যস্ত—ইন্দ্রিয় ও মনের প্রতীতি all heterogeneous। কিন্তু homogeneous কোনটা? Space একটা idea, স্থূল। আরও গভীরে গেলে কী পাওয়া যাবে? The Consciousness Itself is Bliss Itself which is homogeneous. এগুলোকে represent করছে Absolute I। "একোঽহম্ দ্বিতীয় নাস্তি।" এই "একোঽহম্" কী? 'অখণ্ডভূমা সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলোঽহম্।' "একোঽহম্ দ্বিতীয় নাস্তি"—এই কথাটা কিন্তু বুদ্ধি মানতে পারবে না। বুদ্ধি বলবে যে, আমি ইন্দ্রিয় দিয়ে বহু দেখছি আর তুমি বলছ দুই নেই? সবাই 'একে' এই কথাই বলেছে। উত্তরে 'এ' তাদের বলেছে, 'এ' কী করবে? 'এ' যে বহুর মধ্যে এক-কেই দেখছে আর তুমি এক-এর মধ্যে বহুকে দেখছ। এই হল উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির তফাত। That is why you account much for the ignorance and not the wisdom, but 'I' dwells in the wisdom as 'I' verily is the wisdom Itself in essence. 'এ' বোধরূপে বোধের মধ্যেই বাস করে, সুতরাং বোধ ছাড়া 'এর' কোনও অস্তিত্ব নেই, আর বোধের মধ্যে তো বোধ ছাড়া অন্যকিছু নেই। বোধ ছাড়া 'এ' (আমি) হয় না এবং 'আমি' ছাড়া বোধ হয় না, বোধের বক্ষে বোধ ছাড়া আর অন্যকিছু নেই বলে। এই বোধে যিনি প্রতিষ্ঠিত তিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।

আনন্দ কাকে বলে? আনন্দের gradation বোঝাবার জন্য কতগুলো কথা 'এ' সবার সামনে রাখছে যদিও তা indicative। একজন সুস্থ সবল মানুষ, সে tension free, care-free, desire free, বেশ সুখী মানুষ। সে সবকিছুই সহজেই পেয়ে যায়, কোনও অসুবিধা নেই। তার অভাববোধও নেই, চারপাশে সবাই সব ready করে রাখছে তার জন্য। এইরকম যে সুখী মানুষ সে one unit of Ananda-এর অধিকারী। এই আনন্দকে একশো গুণে গুণান্বিত করলে তা হবে এক দেবতার আনন্দ, এই দেবতার আনন্দের একশোগুণ হল দেবরাজ ইন্দ্রের আনন্দ, ইন্দ্রের আনন্দের একশোগুণ হল ব্রহ্মার আনন্দ, ব্রহ্মার আনন্দের একশোগুণ হল বিষ্ণুর আনন্দ, বিষ্ণুর আনন্দের একশোগুণ হল শিবের আনন্দ, শিবের আনন্দের একশোগুণ হল ঈশ্বরের আনন্দ, ঈশ্বরের আনন্দের একশোগুণ হল আত্মা-ব্রহ্মের আনন্দ। 'এ' আনন্দের gradation সম্বন্ধে একটুখানি indicate করল। তা জানা গেল কী

করে? আমরা এক থেকে লক্ষ পর্যন্ত সংখ্যাকে জানলাম কী করে? নিশ্চয়ই তার একটা প্রমাণ আছে। এরও একটা প্রমাণ আছে। আমরা যেমন classification করি সব জিনিসকে class I to higher class পর্যন্ত, gradation আমরা মাপি কী দিয়ে? By virtue of our merit and experience, by virtue of right understanding. এই ভাবে এগুলোর মান নির্ণয় হয়েছে। That right understanding does not depend on ordinary intellect. তা-ই efficiency বা যোগ্যতা। সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় এই যোগ্যতার একান্ত অভাব। সাধারণ মানুষকে এই যোগ্যতা বাড়াতে হবে। কীসের মাধ্যমে? সাধনার মাধ্যমে, শিক্ষার মাধ্যমে, ভাবনার মাধ্যমে এবং তপস্যার মাধ্যমে। যে যেই level-এর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায় সেই level of understanding বা অভিজ্ঞতা তাকে শিক্ষা করতে হবে।

আজকে আনন্দই হল 'এর' প্রধান বক্তব্য। 'আনন্দঘন শ্যাম'—কালকে এই কথাটা একটা গানের মধ্যে বলা হয়েছিল। পুরো গানটার কথার সঙ্গে মনকে রাঙাতে পারলে আমরা একটা unit of experience-এর সঙ্গে পরিচিত হব। আনন্দ সবাই চায়। কে না-চায় আনন্দ? কিন্তু মুশকিল হল, আনন্দ আমরা চাইলেই পাই না। প্রত্যেকটি জীবনই আনন্দ চায়, কারণ প্রত্যেকেই পূর্ণতা থেকে জাত হয়ে পূর্ণতার মধ্যেই বাস করছে। কিন্তু তা সে ভুলে গিয়েছে somehow or the other, he has to regain that। তা-ই Milton-এর *Paradise Lost*-এর বিষয়বস্তু। 'এ' Milton পড়েনি, কিন্তু ধ্যানের গভীরে যা প্রকাশ পেয়েছে তা-ই বলা হচ্ছে। এই কথাটা যখন একজন professor-কে বলা হয়েছিল তিনি অবাক হয়ে 'একে' বলেছিলেন, আপনি আবার Milton-কে কোথা থেকে টেনে নিয়ে এলেন? উত্তরে 'এ' তাকে বলেছিল, Milton-কে যেভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে তা-ই বলা হল। Paradise is lost, and that paradise should be regained. How? The individual soul has come down on account of his own fault, fault of his own intellect. Where? In the ground of ignorance, in the ground of physical plane and he has to transcend this physical plane, he has to get up, rise up to the uppermost plane i.e. transcendental plane. How? By acquiring right knowledge, through the practice of Self-enquiry, Self-analysis, Self-discrimination, devotion and love. এই কথাগুলো কিন্তু conventional অর্থে বলা হয়নি, absolute sense-এ বলা হয়েছে।

Self-enquiry কার জন্য? আমাকে দিয়েই আমাকে আমি দেখছি, আমাকে দিয়েই আমাকে আমি জানছি, আমাকে দিয়েই আমাকে আমি পাচ্ছি। *Therefore I am the cause, I am* the effect. When both cause and effect meet together and come to a state of unification and identification then the underlying essence, the all perfection reveals spontaneously. 'আমি জানি'—এই কথাটার কিন্তু দু'টো part। I am the subject—'জানি', and the act of knowing or the knowledge stands as objec-

tive part or the predicative part। This is duality. No not the ego, 'I' verily is the Knowledge Itself, not the knower. As long as I am ego, the knower I am in ignorance, because Knowledge cannot be knower in Reality and knower cannot realize the Knowledge Absolute. একটু কঠিন হয়ে যাবে এখন বক্তব্য। এই যে আনন্দের কতগুলো gradation দেখানো হল, তার মানে আমরা lowest একটা unit-এর মধ্যে বাস করছি। আমাদের unit-কে বাড়াতে হবে। We must expand ourselves, we must spread out, we must embrace all. Nothing to reject but to accept or embrace all as 'I' or Consciousness. গ্রহণ করা খুব কঠিন, কিন্তু বর্জন করা খুব সহজ। কাজেই everybody can reject, বিরক্ত হয়ে সে বাদ দিয়ে দিতে পারে। সবকিছুকে আপন বলে গ্রহণ করাটা হল সবচাইতে কঠিন এবং সবচাইতে সোজাও। একবারেই কাজ হয়ে যাবে। তা কীভাবে সম্ভব? উত্তরটা মনোযোগ দিয়ে শোন—

'খুব শান্ত ধীর স্থির ভাবে সবদিক থেকে মনকে গুটিয়ে নিয়ে এসে সেই মনকে আবার ঝট করে ছেড়ে দেওয়া। আবার পুরোটা গুটিয়ে নিয়ে এসে আরও বেশি করে ছেড়ে দেওয়া। এই process-এর মধ্যে দিয়ে, 'আমিই কারণ, আমিই কার্য', আবার 'আমিই কার্য, আমিই কারণ'—এই ভাবে বিচার চলতে থাকবে। আমিকে নিয়ে আমি-র খেলা আমি-র সাথে, and with nobody else। Innermost process-টা তোমাদের বলা হল। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত 'এর' ভিতরে অনুভূতির একটু ভাঁটা ছিল বা কম ছিল ততদিন এই formula reveal করা হয়নি।'

'আমি দিয়েই আমিকে খুঁজতে হবে, আমি দিয়েই আমিকে জানতে হবে, আমি দিয়েই আমাতে আমাকে বাস করতে হবে। অর্থাৎ বোধ দিয়েই বোধকে জানতে হবে, বোধ দিয়েই বোধের মধ্যে থাকতে হবে বা বাস করতে হবে এবং পরিশেষে বোধ দিয়েই বোধের সঙ্গে মিশে যেতে হবে।' কথাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 'এ' বলছে only to help the individual mind to follow the universal unit of knowledge and finally the transcendental One। আনন্দবোধে যখন আমরা পৌঁছে যাব তখন আমাদের মধ্যে অন্য কোনও বোধ পৃথক ভাবে থাকবে না। কেননা এই হল আনন্দের স্বরূপমহিমা। তা all-embracing, all absorbing যা সবকিছুকে এক করে নেয়। It makes everything One. আনন্দ আর প্রেমের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। Love and Bliss though used in different sense in our daily life but in Reality they are One. প্রেমে বা আনন্দের মধ্যে সমস্ত contradiction মিশে এক হয়ে যায়। It becomes a flooded state, inundated state. প্লাবন এলে বর্ষার জল যেমন সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেইরকম flood of Consciousness এলে সব একাকার ক'রে দেয়। তখন সবই বোধসাগরে মিশে যায়। সেখানে বোধই শুধু আছে, আর কিছু নেই। সেখানে 'বোধসাগরে বোধের লাগিয়া খেলে বোধ জীবনরূপ ধরিয়া'—জীবনরূপ ধরে খেললেও তা বোধই থাকে।

এই প্রসঙ্গে যে গানটি আছে তা হল—

বোধসাগবে বোধের লাগিয়া
খেলে বোধ জীবনরূপ ধরিয়া
জীবনের মাঝে বৈচিত্র্য সাজে
অবিরাম চলে বোধ খেলিয়া।।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি গানে আছে—

ব্রহ্মসাগরে জীবন রূপ ধরে
আত্মচৈতন্য স্বভাবে লীলা করে।।
পরমাত্মার স্বভাবের বিস্তার অনন্ত ব্যাপ্ত বিশ্বসংসার
ব্যষ্টি সমষ্টি সমগ্র সৃষ্টি
মিলে পরস্পরে আছে তার ভিতরে।।
অমৃত অক্ষর পরম ঈশ্বর হরিহর সুন্দর সদ্গুরু ঠাকুর
লীলা অবতার করুণার পারাবার
যুক্ত সর্বস্তরে স্বভাবের অন্তরে।।
অন্তর্যামী নির্গুণগুণী স্বয়ং সচ্চিদানন্দঘন পুরুষোত্তম
মধুর সুন্দর সুমনোহর
স্বভাব প্রেমে স্ববোধে বিহারে।।

(ইমন—ত্রিতাল)

চিনি দিয়ে নানরকম খেলনা তৈরি হয়, ছাঁচে ঢেলে নানারকম সন্দেশ তৈরি হয় সেই সন্দেশের যেখানেই জিভ লাগাবে সেখানেই মিষ্টি লাগবে—because it is all-embracing। চৈতন্য সবকিছুকে জড়িয়ে আছে রসগোল্লার রসের মতো। বুদ্ধির মাধ্যমে বৃত্তিরূপে যা আসে অর্থাৎ কিছু positive, কিছু negative—সবটাই বৃত্তি বা বোধ। সব বৃত্তিকে একত্র করলে সাগর হয়ে গেল, অখণ্ড বা ভূমা হয়ে গেল। ভূমা হলে আনন্দ হয়ে গেল। কালকে আনন্দঘন শ্যাম কথাটা বলা হয়েছিল। শ্যাম শব্দের অর্থ কী? "বহুস্যাম্", "একোঽহম্ বহুস্যাম্"—শ্যাম বা শ্যামল। শ্যাম থেকে শ্যামল কথাটা এসেছে। শস্য শ্যামলা অর্থাৎ চিরসবুজ। সবুজ মানে lively। চারদিকে ধান সব ছড়িয়ে আছে, সোনার ধানে যেন সব ভরা। শস্যক্ষেত্র একেবারে সবুজ, প্রাণে ভরা, green একটা plane। কাজেই যা অনন্ত অখণ্ড তা আনন্দ হয়ে গেল। এটা যেমন বলা হল, কালকে সেরকমভাবে বলা হয়েছিল—

আনন্দঘন শ্যাম
তু মেরে জীবন কা জীবন প্রাণারাম।।
মেরে প্রীতম্ তু সবকো উরমে তু আত্মারাম
দিব্যমহিমা আপনা প্রেমসে প্রকাশো ভগবান।।
... .

এই যে আনন্দঘন শ্যামের কথা বলা হল তিনি আমাদের ভিতরে কী করছেন? আত্মা কী করছে? 'দিব্য মহিমা আপনা প্রেমসে প্রকাশো, প্রেমসে প্রকাশো ভগবান।' তাঁর দিব্য সম্পদ বা দিব্য মহিমাকে তিনি আপন প্রেমে প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টি হল আনন্দের প্রকাশ। আমাদের মধ্যে যা-কিছু হয়ে চলেছে তা আনন্দের মাধ্যমেই হচ্ছে। কিন্তু তা আমরা অনুভব করতে পারি না। কেননা সেই সূত্রের সঙ্গে, সেই অনুভূতির সঙ্গে আমাদের সম্যক পরিচয় নেই। কতগুলো particular expression-এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু সমগ্রতার সঙ্গে পরিচয় হয়নি।

এই গানটির মাধ্যমে আনন্দস্বরূপের ইঙ্গিত দেওয়া হল। কিন্তু তা বোঝানো খুব মুশকিল। শুনতে শুনতে যখন আমাদের মন একাগ্র হয়ে যায় তখন বাইরের বৈচিত্র্য থেকে সরে আসে মন, এমনকী নিজের দৈহিক কষ্ট, ব্যাধি, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, দুশ্চিন্তা সবকিছু যেন সরে যায়। একটা কথার মধ্যে দিয়ে মন কোথায় চলে যায়। কাজেই সৎপ্রসঙ্গ শুনতে শুনতে আমরা আমাদের গতানুগতিক জীবনের থেকে কিছু সময়ের জন্য অন্তরে প্রবেশ করি। কোথায়? আমাদেরই মধ্যে, যেখানে সৎ-চিৎ-আনন্দ ঘনীভূতরূপে রয়েছে, যার প্রকাশরূপ হল আমাদের এই জীবন। দেহে থেকেও দেহের কথা মনে থাকছে না, প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তাদের কথা মনে থাকছে না। মনের নানারকম দুশ্চিন্তা থাকে। চিন্তা ভাল-মন্দ দুই রকমই আছে। তার সঙ্গে যুক্ত থেকেও সে কথা মনে থাকছে না! হঠাৎ মনটা যেন কোথায় কিছুক্ষণের জন্য চলে যাচ্ছে! এমন প্রসঙ্গ আছে যা দিনের পর দিন শুনলে সেই জিনিসের সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় হবে এবং তখন কিছুক্ষণের জন্য তার mind totally একটা আলাদা plane-এ প্রবেশ করবে, where there is no contradictions, no troubles, no miseries, no worries, agonies, anxieties but only one homogeneous state। তা নিশ্চয়ই সুখপ্রদ। গাঢ় নিদ্রা যেমন আমাদের কাছে খুব সুখপ্রদ তেমনই সেই অবস্থাও সুখপ্রদ। নিদ্রা না-হলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। নিদ্রা হলে মানুষ fit থাকে। এই fitness আসছে কোথা থেকে? Where from is it coming? তা আসছে সেই পূর্ণতা থেকে, একটা wave। সেই পূর্ণতা থেকে যদি wave-এর পর wave আসতে থাকে তখন আমাদের গতানুগতিক যে thought process তা সরে যাবে।

ক্রিয়াকলাপ করে সেখানে পৌঁছানো আমাদের সবার পক্ষে সম্ভব নয়—সে ধ্যান করেই হোক, জপ করেই হোক, পূজাপাঠ করেই হোক, শাস্ত্রপাঠ করেই হোক। One can assert himself and try to find some light which can save him from all miseries and troubles. তা কিন্তু খুব কঠিন। এই ক্ষেত্রে একজন ভাল guide-এর প্রয়োজন যিনি সমস্ত contradiction-এর ঊর্ধ্বে অর্থাৎ permanent ও stable state-এ যিনি প্রতিষ্ঠিত। ক্রিয়াকলাপে যুক্ত আছে এরকম একজন আরেকজনকে আত্মজ্ঞান দিতে পারবে না, সামান্য একটু সাহায্য করতে পারে হয়ত। কাজেই সাধক অবস্থায় একজন সাধক অপরকে কিন্তু perfection-এ নিয়ে যেতে পারবে না। তাকে মোটামুটি একটু light দিতে পারে। যেমন একটা অঙ্ক যে জানে সে আরেকজনকে দেখিয়ে দিচ্ছে, this much। তার মানে তাকে অঙ্ক

পরিপূর্ণ শিখিয়ে দিতে সে পারবে না। সেরকম ধর্মজগতে যারা নিজেরাই practice করছে নানারকম ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ জপ-তপ-ধ্যান- বিচার তারা কিন্তু সত্যব্রহ্ম আনন্দব্রহ্ম আনন্দ আত্মার সন্ধান দিতে পারবে না। কিন্তু যাঁরা realizer অর্থাৎ ব্রহ্ম-আত্মার সঙ্গে identified হয়ে গিয়েছেন তাঁদের কাছে শুধু ঐ একই কথা—Reality cannot have any duplicate, cannot have any substitute or alternative। কিন্তু আমরা কত alternative-এর মধ্যে দিয়েই যাচ্ছি শৈশব থেকে! যেহেতু আমাদের যে guide সে আমাদের সেই light of Oneness দিতে পারছে না। সে নানাভাবে নানারকম জিনিসের কথা বলছে আমাদের—এও হতে পারে, তাও হতে পারে, কিন্তু sure নয়। তাহলে আমরা sure হব কী করে? কেউ বলছে, এই করলে ঈশ্বর মিলবে; কেউ আবার বলছে, ঐ করলে ঈশ্বর মিলবে; কেউ বা আবার বলছে, হ্যাঁ দু'টোর মাধ্যমেই ঈশ্বর মিলবে। কিন্তু ঈশ্বর কি সত্যিই an object of attainment? এই কথাটা কেন মাথায় ঢোকে না যে, object of attainment cannot give you permanent peace and bliss! যে জিনিস আমরা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে অর্জন করি তা subject to change and modification। কর্মজাত যে ফল তা সবসময়ই বিকারী ও পরিণামী। সুকর্ম করে আমরা হয়ত স্বর্গে যেতে পারি, কিন্তু তা অক্ষয় নয়, ক্ষয়িষ্ণু; ক্ষয় হয়ে গেলেই আবার নিচে অর্থাৎ মর্তলোকে নেমে আসতে হবে।

কর্মফলকে অতিক্রম করতে গেলে আমাদের কী করতে হবে? If we want to transcend the results of our actions and the principle of action or law of action, then we must know that action has nothing to do with Me the Supreme Self-I because 'I' is the essence of both action and the result. (অহংদেব পাকা আমি I-Absolute। এই আমি-র ব্যবহার হবে 'I' is দিয়ে, not I am। কিন্তু অহংকারের আমি, কাঁচা আমি, ব্যষ্টি আমি-র ব্যবহার হয় I am দিয়ে। কাঁচা আমি, ব্যষ্টি আমি first person singular number। সেখানে I am, আবার I have, I had, I shall, I was; subjunctive mood-এর ব্যবহারে if I were দিয়ে হয়, যেমন If I were a king I would give away wealth to the poor। কিন্তু Absolute-I হল পুরুষোত্তমের আমি, Supreme person-এর আমি। তার verb সবসময় singular third person-এর মতো used হয় যেমন is, was, has, had, will। এগুলি পাকা আমি-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দু'টি আমি-র ব্যবহারের ক্ষেত্রে verb-এর বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য নির্দেশ করা হল।) Without this right understanding or knowledge action cannot exist. How can it function then? তা function করবে কী ক'রে? কেননা function করতে গেলে একটা background চাই, and that background is verily I-Reality। 'আমি' নেই অথচ আমার সব আছে—তা কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু আমার নেই এবং 'আমি' আছে—তা সম্ভব। গাঢ় ঘুমের মধ্যে আমার থাকে না, আমি থাকে। সমাধির মধ্যে আমার থাকে না, আমি থাকে। যাঁরা realizer তাঁদের আমারটা shadow। Shadow cannot overcome the light. এই কথাগুলোর

মাধ্যমে সবার সামনে 'এ' সকলের আপনার সত্য পরিচয় ব্যক্ত করছে। নিজের যথার্থ পরিচয় অর্থাৎ দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত বাক্যমনাতীত বুদ্ধির অতীত অথচ যার সাহায্যে বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়-প্রাণ function করছে—এই সত্যটি শুধু convince করে দেবার জন্য এত কথা বলা হচ্ছে।

আমাদের বুদ্ধি কোথা থেকে supply পাচ্ছে? মন কোথা থেকে supply পাচ্ছে তার চিন্তার? প্রাণের এই স্পন্দন প্রাণ কোথা থেকে পাচ্ছে? ইন্দ্রিয়গুলি তাদের supply কোথা থেকে পাচ্ছে? এই supply-এর ফলে চোখ রূপ দেখতে পারছে, কান শব্দ নিতে পারছে, ত্বক স্পর্শ নিতে পারছে, নাক গন্ধ নিতে পারছে, জিভ আস্বাদন করতে পারছে! সম্বিৎস্বরূপ বা চিৎস্বরূপ হল আত্মা, তাঁ অমর অর্থাৎ immortal and infinite। অখণ্ড হলেই সে মৃত্যুর অতীত হবে, খণ্ড হলেই কিন্তু মৃত্যুর অধীন। সসীমের মৃত্যু আছে, অনন্ত অসীমের মৃত্যু নেই। সেখানে মৃত্যুরও মৃত্যু হয়েছে। মানে death সেখানে dead হয়ে গিয়েছে। অমর আত্মা সম্বন্ধে একটি গান আছে—

অমর আত্মা সচ্চিদানন্দ নিত্যসত্তা ভূমা অখণ্ড
আপনাতে স্বয়ং আপনি বিরাজে স্বভাব-ঐশ্বর্যে স্ববোধ-মাধুর্যে।।
তুমি আমি সবাই প্রকাশ তাঁহার ওঠে ভাসে ডোবে সবে তাঁরই মাঝে
তুমি-আমি বোধের মাঝে অমর আত্মা নিজেই আছে।
প্রকাশ করে স্বমহিমা নিজে নিত্য নূতন কারণ-কার্যে
স্ববোধসত্তায় নিত্য বিহারে স্বরূপ-সৌন্দর্যে স্বভাব-ঐশ্বর্যে।।
স্বভাবলীলায় আপন খেলে বেড়ায় স্বয়ং শক্তির বৈচিত্র্য সাজে
স্ববোধস্বরূপ আপন হারায় না কখনও থাকে পূর্ণ সতেজে।
স্বভাবশক্তি তাঁর সগুণা-নির্গুণা লীলাচাতুর্যে
স্ববোধস্বরূপ তাঁর সর্বসম নিরুপম আনন্দের আতিশয্যে।।

(কীর্তন—একতাল)

প্রত্যেকের পরিচয় সম্বন্ধে এতক্ষণ যা বলা হল, তা আরও condensed form-এ গানের মধ্যে বলে দেওয়া হল। তা যদি বুদ্ধি না-নিতে পারে তবে তাকে আরও নিচে নেমে আসতে হবে। প্রথমে তো তাকে আপনবোধের অ-আ-ক-খ শেখাতে হবে। তার কারণ বুদ্ধির পরিপূর্ণ খোরাক এখানে দেওয়া আছে। মানুষের প্রয়োজন যে কী তা তার বুদ্ধিও কিন্তু ভাল করে জানে না। একটা জিনিসের প্রয়োজন মিটতে-না-মিটতেই আরেকটা বস্তুর জন্য প্রয়োজনবোধ জেগে ওঠে। তার মানে he is not sure যে, কী পেলে তার সব পাওয়া শেষ হয়ে যাবে। নারদেরও ঠিক এই অবস্থা হয়েছিল। মুনিরা সাধারণ মানুষের থেকে অনেকটা উন্নত হন। নারদ মুনি বেদচর্চা করেছেন, অর্থাৎ চতুর্বেদ অধ্যয়ন করেছেন, বেদাঙ্গ চর্চা করেছেন। তারপর অষ্টাদশ পুরাণ পড়েছেন, একশো আটটি উপনিষদ পড়েছেন, চৌষট্টি কলাবিদ্যার জ্ঞানও লাভ করেছেন। এত জ্ঞান লাভ করেও তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁর শুধু মনে হচ্ছিল, এত কিছু

তো জানলাম, কিন্তু কিছুতেই তো শান্তি পাচ্ছি না! এই জন্য অন্যান্য মুনি-ঋষিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনারা বলতে পারেন যে কী পেলে সব পাওয়া পূর্ণ হয় বা শেষ হয় এবং পাওয়ার আর কিছু বাকি থাকে না? তাঁর প্রশ্নের উত্তরে ঋষিরা বললেন যে, না আমরা তো সেই জিনিসের খবর এখনও জানি না! তিনি এই ভাবে একে একে অনেক মুনি-ঋষিকে একই প্রশ্ন করেও কোনও সদুত্তর পেলেন না। অবশেষে একদিন সনক ঋষির কাছে এসে তিনি উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মার চার মানসপুত্র হলেন—সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনাতন।

এই সনক ঋষির কাছে এসে নারদ মুনি প্রশ্ন করলেন, "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।" অর্থাৎ কী এমন বস্তু আছে যা জানলে সব জানা হয়ে যায়। তাঁর এই প্রশ্ন শুনে সনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এই প্রশ্ন করছ কেন? তখন নারদ বললেন, আমি এত তপস্যা করেছি, বেদ অধ্যয়ন করেছি, বেদাঙ্গ, পুরাণ, উপনিষদ, চৌষট্টি কলাবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, কালতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ভূতবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা ইত্যাদি অধ্যয়ন করেছি, চর্চা করেছি, কিন্তু তবুও শান্তি পাচ্ছি না, আনন্দ পাচ্ছি না। তখন সনক ঋষি বললেন, তুমি বলছ তপস্যা করেছ, কিন্তু তুমি তো শুধুমাত্র কয়েকটা শব্দ চয়ন করেছ! You have collected some words, mere words! তখন নারদ বললেন, সে কী কথা! তাহলে আমি কী করব? তখন সনক ঋষি বললেন, এই শব্দের থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু যা তা তোমায় জানতে হবে। তখন নারদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, শব্দের থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু কী? তিনি বললেন, শব্দের থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু হল ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ই তো শব্দকে চয়ন করে। নারদ মুনি আবার প্রশ্ন করলেন, ইন্দ্রিয়ের থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু কী? ঋষি তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ইন্দ্রিয়ের থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু হল মন। কারণ ইন্দ্রিয়ের কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করে মন। আবার নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করলেন, মনের থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু কী? তিনি উত্তরে বললেন, মনের থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু হল বিজ্ঞান। অর্থাৎ বুদ্ধি, যা determine করে দেয়। Determinating faculty হল বুদ্ধি, তা ascertain করে দেয়, নির্ণয় করে দেয়, নিশ্চয় করে দেয়, যদিও বুদ্ধি একদেশদর্শী। অর্থাৎ একসঙ্গে একটার বেশি দুটো জিনিস নির্ণয় করতে পারে না। As a whole or complete, সবটা বুদ্ধি নিতে পারে না। তখন নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করলেন, বুদ্ধির থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু কী? উত্তরে সনক ঋষি তাঁকে বললেন, তোমাকে আমি একে একে সমস্ত উত্তর বলে যাচ্ছি, কিন্তু তা কি তুমি সত্যিই বুঝতে পারছ? তুমি তো অনেক প্রশ্ন করছ, কিন্তু তা কি তুমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছ? তোমার যদি হজম না-হয় তাহলে তোমার লাভ কী প্রশ্ন করে? তখন নারদ সনক ঋষিকে বললেন, তা তো ঠিকই, আমি সচেতন ভাবে শুনছি, আপনি আমাকে বলে যান। বুদ্ধির থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু কী? সনক ঋষি বললেন, বুদ্ধির থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু হল আশা। তখন নারদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আশার থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু কী? উত্তরে সনক ঋষি বললেন, নারদ তুমি অনধিকার চর্চা করছ! সব জিনিস হজম করতে না-পেরে একধার থেকে তুমি শুধু জিজ্ঞাসা করে চলেছ, যেন তুমি সব বুঝে ফেলেছ! তুমি নিজের অবস্থা সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখ। এই কথা শুনে নারদ খুব লজ্জিত হলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি আবার সনক ঋষিকে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, হ্যাঁ আমি তো এই সুযোগ আর পাব না, আমাকে আপনি ভাল করে বুঝিয়ে দিন। এই আশার থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু কী? তখন সনক ঋষি বললেন, আশার থেকে শ্রেষ্ঠ হল অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণের মধ্যেই আশা জেগে ওঠে। নারদ আবার প্রশ্ন করলেন, এই অন্তঃকরণের থেকে শ্রেষ্ঠ কী? তিনি উত্তরে বললেন, অন্তঃকরণের থেকে শ্রেষ্ঠ হল বুদ্ধিবিজ্ঞান, অর্থাৎ সমষ্টিবুদ্ধি। নারদ আবার প্রশ্ন করলেন, তার থেকে শ্রেষ্ঠ কী? তখন সনক ঋষি বললেন, বুদ্ধিবিজ্ঞানের থেকে শ্রেষ্ঠ হল অন্ন। এবার নারদকে তিনি আরও down-এ নিয়ে এলেন। নারদ তাঁকে আবার প্রশ্ন করলেন, এই অন্নের থেকে শ্রেষ্ঠ কী? অন্ন কেন শ্রেষ্ঠ হবে? সনক ঋষি উত্তরে তাঁকে বললেন, অন্ন গ্রহণ না-করলে তোমার বুদ্ধিই খেলবে না। (দেখ তাকে তার নিজের দোষে কোথায় নামিয়ে আনল!) নারদ তখন প্রশ্ন করলেন, অন্নের থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু কী? সনক ঋষি বললেন, প্রাণ হল অন্নের থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু। নারদ—প্রাণের থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু কী? সনক ঋষি—প্রাণের থেকে শ্রেষ্ঠ হল মুখ্যপ্রাণ। তখন নারদ আবার প্রশ্ন করলেন, মুখ্যপ্রাণের থেকে শ্রেষ্ঠ কী? সনক ঋষি বললেন, বিশ্বপ্রাণ হল মুখ্যপ্রাণ হতে শ্রেষ্ঠ। নারদ ঋষি আবার প্রশ্ন করলেন, বিশ্বপ্রাণের থেকে শ্রেষ্ঠ কী? সনক ঋষি উত্তরে বললেন, নারদ তুমি যা শুনলে তা আগে আমাকে বুঝিয়ে বল তো! তুমি কতটুকু বুঝেছ? তখন নারদ আর তাঁকে এই সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়ে বলতে পারলেন না। তাঁর অযোগ্যতার জন্য তিনি খুব লজ্জা পেলেন। তখন নারদ সনক ঋষিকে বললেন, দেখুন আপনি প্রসঙ্গ বলতে বলতে মাঝখানে থেমে গেলেন, আরেকটু শুনলে হয়ত আমার কাজ হত। সনক ঋষি বললেন, ঠিক আছে। যা বলছি তা মন দিয়ে শোন। বিশ্বপ্রাণের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বমন। বিশ্বমনের উপরে বিশ্বাতীত। তখন নারদ তাঁকে আবার প্রশ্ন করলেন, বিশ্বাতীত কী? তিনি উত্তরে বললেন, তা হল ভূমা। এই ভূমাই ছড়িয়ে আছে সবকিছুর মধ্যে, বিস্তৃত হয়ে আছে। ভূমাই সবকিছুকে আবৃত করে রেখেছে। "ভূমৈব সর্বমিদম্ ভূমা উর্ধ্বস্তাৎ ভূমা অধস্তাৎ ভূমা পশ্চাৎ ভূমা পুরস্তাৎ ভূমা বামতঃ ভূমা দক্ষিণতঃ ভূমা অন্তঃস্থ ভূমা বহিঃস্থ সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি অখণ্ড ভূমা কেবলম্।" তুমি নিজেকে এই ভূমাদেবরূপে দেখ। ভূমাতত্ত্বের উপর একটি গানে আছে—

ভূমার নাই রে জন্ম নাই রে মৃত্যু নাই রে উদয় অস্ত তার
নাই রে তার ক্ষয় বৃদ্ধি কভু নাই রে তার কোন বিকার।
নাই রে তার আদি মধ্য অন্ত অন্তর বাহির নাই তার
নাই রে তার আকার বিকার নাই তার কোন বিকল্প আর।।
নাই তার অঙ্গ নাই সঙ্গ নাই কোন অংশ খণ্ড তার
নাই তার গুণ জাতি ক্রিয়া নাই কোন ধর্ম কর্ম তার।
নাই তার কোন অভিমান নাই তার কোন অহংকার
নাই তার আমি-তুমি ভেদ নাই তার আমার-তোমার ব্যবহার।।

নাই তার কোন অভাব নাই তার স্বভাব উপচার
নাই তার বন্ধন মোক্ষ নাই মুক্তিলাভের ইচ্ছা তার।
নাই তার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নাই কোন নেতৃত্বের ইচ্ছা তার
নাই তার কোন ভেদাভেদ নাইকো ভাবাভাব তার।।
সে যে স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত নিত্য শাশ্বত অচ্যুত
নিত্য অদ্বৈত স্বানুভবসিদ্ধ কেবল সচ্চিদানন্দ
পরমেশ্বর ভগবান পুরুষোত্তম পরমাত্মা পরব্রহ্ম।।
অহংদেব আত্মারাম অমৃত মুক্তি শান্তি নিধান
সর্ববোধের অধিষ্ঠান সর্ব ভাবের সমাধান
আপনবোধে স্বয়ংপ্রকাশ হৃদয়ে সবার
পরমে পরম স্বয়ং-এ স্বয়ং আপনে আপন মহিমা তার।।

(ভীমপলশ্রী—একতাল)

এই ভূমার জায়গায় আমি তোমাকে বসিয়ে দিচ্ছি। 'তুমি উর্ধ্বস্তাৎ তুমি অধস্তাৎ তুমি পশ্চাৎ তুমি পুরস্তাৎ তুমি বামতঃ তুমি দক্ষিণতঃ তুমি অন্তঃস্থ তুমি মধ্যস্থ তুমি বহিঃস্থ সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠসি একস্তং দ্বিতীয় নাস্তি।' এই সত্য সনক ঋষির মুখে শুনে নারদ তৃপ্ত, পূর্ণ ও ধন্য হলেন। তিনি আর কী প্রশ্ন করবেন? অপূর্ব সমাধান!

আবার তুমির জায়গায় আমি বসালে একই বিজ্ঞান সিদ্ধ হয় সমবোধে কীভাবে তা বলছি শোন। 'এ' সেই তোমার জায়গায় আমিকে বসিয়েছে। এই fomula সবার সামনে রেখে দেওয়া হল। "একোঽহম্ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" "অহং উর্ধ্বস্তাৎ অহং অধস্তাৎ অহং পশ্চাৎ অহং পুরস্তাৎ অহং বামতঃ অহং দক্ষিণতঃ অহং অন্তঃস্থ অহং মধ্যস্থ অহং বহিঃস্থ সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠামি একোঽহম্।" সেই জায়গায় "একস্তং" formula দেওয়া হল তোমাদের। এখন ভেবে দেখ, এই যে আত্মবিদ্যা তোমাদের সামনে রাখা হয়েছে, অন্য কোনও বিদ্যা দিয়ে তার সঙ্গে মোকাবিলা করা যায় না। সব বিদ্যাই হল আত্মবিদ্যারই fraction। কী ফুটানি করবে মানুষের অহংকার! অহংটা কার? যাঁর অহং তাঁকে দিয়ে দিতে হবে বা মানতে হবে। অহংটা হল ত্বংকারের—তুমিকে দিতে হবে, তুমিবোধে সবকিছু গ্রহণ করতে হবে। তুমি ও তোমার বোধে এলে আমাদের এই জীবভাব বা অহংকার সরে যাবে। ত্বংকার অর্থাৎ universal Consciousness জেগে উঠবে। Universal Consciousness-এর মধ্যে transcendental Consciousness রয়েছে, তা অখণ্ড ভূমা আমি অহংদেব অর্থাৎ পুরুষোত্তম 'পাকা আমি'। তাঁর কথাই গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—পুরুষোত্তমবাদ। গীতা তো পড়ে অনেকেই, মুখস্থ করে, কিন্তু সার কথা যে নিজের মধ্যেই রয়েছে তা কেউ খেয়াল করে না। "বাসুদেবঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি।" "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।" এখানে অর্জুনকে বলা হয়েছে যে, তোমার মধ্যেও আমি আছি এবং সবার মধ্যেই

আমি আছি, কিন্তু তুমি তা মানতে পারছ না, তাই জানতে পারছ না। তুমি মান, তাহলে তুমি জানবে। কাজেই অখণ্ডের সঙ্গে নিজের পরিচয় একমাত্র আপনবোধে নিরন্তর মানা দিয়ে হতে পারে, জানা দিয়ে নয়।

অখণ্ড তো নিজেই জ্ঞানস্বরূপ, তার চাইতে আবার বড় একটা জ্ঞানের দরকার হয় না। তা তো সম্ভব নয়। তাঁকে মানা যায়, অর্থাৎ আমি যে তাঁর part and parcel, আমি যে তাঁরই প্রকাশ, আমি তিনিই স্বয়ং— এই সত্য আমাদের মানতে হবে, তাহলে আর জানার অপেক্ষা থাকবে না। নদী দূর থেকে সাগরকে দেখছে, কিন্তু অনুমান করতে পারছে না, আন্দাজ করতে পারছে না। কিন্তু নদী যখন সাগরে মিশে যায় তখন তার কি কোনও আলাদা বা পৃথক অস্তিত্ব থাকে সাগরকে জানবার জন্য? When you know yourself to be the Absolute তখন তুমি আর আলাদা করে Absolute-কে কী জানবে? Because your true identity is Absolute and Absolute is real when you are with that One. তা না-হলে Absolute কথাটা একটা mere word হয়ে যায়, একটা কল্পনা হয়ে যায়। ঈশ্বর-ঠাকুর-ব্রহ্ম-মা—এগুলো imagination until and unless we are identified with either One or all of them। মুখে আমাদের কতগুলি কথা, শুধু অনুমান করেই আমরা জীবনটা কাটিয়ে দিই। এদিকে কিন্তু যন্ত্রণায় বুক জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। তখন তো বলা যায় না যে, এ-ই আমি বা এ-ই তুমি। তাহলে তো বোঝা যেত যে, এ-ই তুমি বললে তা হল ভক্তি এবং এ-ই আমি বললে তা হল জ্ঞান, যদি ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কেউ পার্থক্য দেখে। যোগ বলতে গেলে কী বোঝায়? আমিই তো এই ভাবে খেলছি—Self-I is playing in all contradictions, Consciousness is playing in all contradictions, in all different forms, names, ideas, actions and results। All are nothing but the same One Consciousness/I which exists in each of them as their underlying essence.

সবকিছুর উপাদানরূপে রয়েছে চৈতন্য। আর সেই চৈতন্যকে 'এ' 'আমি' বলে নির্দেশ করেছে, কেননা 'আমি' ছাড়া 'চৈতন্যের' ব্যবহার হয় না, আর 'চৈতন্য' ছাড়া 'আমি-র' ব্যবহার হয় না। কথাগুলো একটু ভাবলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, this is nothing strange to you, but you have forgotten this science। ধর্মজগতে এমন কতগুলো জিনিস নিয়ে আমরা সারাজীবন চর্চা করি যে তার ফলে কোনও কিছুর হদিশই খুঁজে পাই না। কাজেই এই ধর্মজগতে যারা নেতা তাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তোমরা সেই পরমসত্য পরমতত্ত্বের সঙ্গে কি একীভূত হয়েছ? যদি হয়ে থাক তাহলে অপরকে তোমার থেকে inferior ভাব কী করে? How can you consider others to be inferior to you? যেন তুমিই একমাত্র superior, আর অন্যেরা inferior। The sense of inferiority and superiority both are imperfection. তোমরা হয়ত প্রশ্ন করতে পার যে, আপনি যে এখানে বলছেন? আমি-ই এখানে বলছি এবং আমিই শুনছি। Self-I exists in each of you. একটা দেহের মধ্যে দিয়ে যে আমি বলছে, আরেকটা দেহের মধ্যে বসে সেই আমিই শুনছে।

আমি মানে Consciousness। কথাটা কিন্তু প্রথমে accept করা খুব কঠিন, কিন্তু I can explain it clearly। আমরা condition তৈরি কবি মন দিয়ে। আবার condition-কে শুদ্ধ করার চেষ্টাও করি মন দিয়ে। তাহলে মন দিয়ে আমরা প্রথমে এক-কে ভাগ ভাগ করছি, আবার সেই মন দিয়েই আমরা সেই ভাগগুলোকে যোগ করবার চেষ্টা করছি। বিভক্ত করছি আবার যোগ করছি! কিন্তু বিভক্ত করা ও যোগ করা—এই দুটোই নিজেকে দিয়েই সম্ভব হচ্ছে। বিভক্ত করার সময়ও আমি ছিলাম, যোগ করার সময়ও আমিই আছি। আমিকে বাদ দিয়ে যোগ-বিয়োগ কোনওটাই সম্ভব নয়। এটা কি বুঝতে খুব কঠিন লাগছে? আমরা যে সাধনভজন করছি তা কার জন্য? আমরা কাকে পাব? আমি যদি infinite হয়ে থাকি এবং তা যদি শুনে থাকি তাহলে আর নতুন করে শুনবার কি কিছু বাকি রইল? আমার শোনা তো সব শেষ হয়ে গেল যখন আমি শুনলাম—I-Reality is the Absolute and that Absolute verily is I-Reality। তিনিই আমার মধ্যে বসে খেলা করছেন—এইটুকু জানাই enough। আর যদি কেউ তা accept করতে রাজি না-হয় তাহলে সে কোনওদিনই কোনও কিছু শিখতে পারবে না, কারণ কোনও কিছু শিখতে গেলে তাকে প্রথমে শুনতে হবে এবং তারপর তা মানতে হবে। অজ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞানকেই মানুষ বেশি গুরুত্ব দেয়, জ্ঞানকে গুরুত্ব দেয় না। আবার জ্ঞানাভাসের ক্ষেত্রে যারা আছে তারা জ্ঞানাভাসকেই মূল্য দেয়, বিজ্ঞানস্বরূপকে মূল্য দেয় না। যারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা বিজ্ঞানকে মূল্য দেয়, প্রজ্ঞানকে মূল্য দেয় না। প্রজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করার কোনও প্রয়োজনই থাকে না। নিজেকে কখনও degrade করো না। নিজেকে degrade করা অপরাধ বা পাপ। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।" Don't degrade yourself. আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করতে হবে।

তুমি যে সাধনভজন, জপ-তপ-ইত্যাদি করছ নিজেকে অনুভব করার জন্য, তা কিন্তু নিজেকে দিয়েই করছ। তুমি যখন সুখ-দুঃখ অনুভব করছ তা নিজেকে দিয়েই অনুভব করছ, আনন্দও তুমি নিজেকে দিয়েই অনুভব করছ, কারণ তুমি নিজেই তত্ত্বত আনন্দস্বরূপ, in Reality you are the Bliss Absolute। আজকে এই প্রসঙ্গ প্রথমেই গানের মধ্যে বলা হয়েছে। যে কথাগুলো তোমাদের বলা হচ্ছে তার মধ্যে কোনও flaw নেই। তার কারণ তোমাদের মধ্যে বসে যে শুনছে, 'এর' মধ্যে বসে সে-ই অর্থাৎ Consciousness-ই বলছে। সেই আমি কিন্তু এক। 'এ' Consciousness-কে 'আমি' বলেছে এবং আমিকেই 'Consciousness' বলা হয়েছে স্বানুভূতির দৃষ্টিতে। এই প্রসঙ্গের সাথে মানুষের কোনও পরিচিতি নেই। মানুষ বুদ্ধিকেই আমি বলছে, অহংকারকেই আমি বলছে। 'এ' বলছে—তা হল reflection. Real I cannot be reflection. False I being ego is reflection. False I is identified with the physical body, senses, mind, intellect and the rest i.e. all sorts of limitations and conditions. মানুষ সবকিছু ভাগ করে 'মেরা' বলছে। কিন্তু 'মেরা' থেকে রক্ষা পেতে হলে 'তেরা' করতে হবে—'তু অউর তেরা'। আর একেবারে চরমে যখন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন 'না মেরা, না তেরা'। তা-ই হল Real I. The Absolute

I is eternally free from the sense of so-called 'I and mine' so-called 'Thou and thine', অর্থাৎ আমরা যে আমি-তুমি ব্যবহার করি তা থেকে স্বতন্ত্র হল 'পাকা আমি'।

'আমি-তুমিশূন্য' যে 'আমি' তা unconditional Consciousness, the Consciousness which is free from the sense of Thou and I. That is Real I or Pure Consciousness or Wisdom Absolute. তা যখন personified হয়ে আসে তখন তাঁকে আমরা ঈশ্বর, ভগবান, ঠাকুর বা দেবতা বলে গ্রহণ করি। তিনি চলে যাবার পরে তাঁর কীর্তিকলাপ নিয়ে মাতামাতি করে বহু লোক—নিজেকে qualify করার জন্য, আর কিছু নয়। সে কিন্তু খুঁজে পাবে নিজেকেই। কাজেই 'এর' কথাগুলো শুনলে যারা conventional বা গোঁড়া তারা ক্ষেপে যাবে। কৃষ্ণকে পাওয়া মানে নিজেকে পাওয়া এবং নিজেকে পাওয়া মানে কৃষ্ণকে পাওয়া। স্বয়ং শব্দের অর্থ হল আত্মা বা Self। আত্মাই সব হয়েছে অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং সবকিছু—"স্বয়ং ব্রহ্মাঃ স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়ং ইন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ স্বয়ং ঈশ্বরঃ স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্বং সস্মাৎ নান্যকিঞ্চম্।" এই স্বয়ং-এর বাইরে কেউ নেই। এই স্বয়ং-এর জায়গায় 'এ' অহং বলছে, Consciousness বলছে, Bliss বলছে। Formula-গুলো কিন্তু একই থেকে যাচ্ছে। এগুলো সব identical। কাজেই যে স্বয়ং দিয়ে স্বয়ংকে দেখা যায়, বোধ দিয়ে বোধকে জানা যায়, সেই বোধের মধ্যে কোনও division নেই। কাজেই সেই আমি দিয়েই আমিকে জানা যায়, যে আমি-র মধ্যে কোনও division নেই। Division হল ইন্দ্রিয় ও মনের ক্ষেত্রে—আমরা সবকিছু পৃথক পৃথক করে দেখতে অভ্যস্ত। ইন্দ্রিয়ের কারণ মনে, মনের কারণ বুদ্ধিতে, বুদ্ধির কারণ সমষ্টি বুদ্ধিতে, সমষ্টি বুদ্ধির কারণ পরম অব্যক্তে, পরম অব্যক্তের কারণ পরমপুরুষে। পরমপুরুষের পরে আর কেউ নেই, তিনিই হলেন পুরুষোত্তম 'পাকা আমি'। "মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।"

দেহকে চালায় ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়কে চালায় প্রাণ, প্রাণকে চালায় মন এবং মনকে চালায় বুদ্ধি। মন আর অহংকার একই কথা। বুদ্ধিকে চালায় সমষ্টি বুদ্ধি, সমষ্টি বুদ্ধিকে চালায় সম্বোধিপরম। সমষ্টি বুদ্ধি প্রকৃতিজাত অর্থাৎ অব্যক্ত ঈশ্বরীয় শক্তি হতে জাত সমষ্টি বুদ্ধি এবং ঈশ্বরীয় শক্তি ঈশ্বরীয় সত্তার সঙ্গে অভিন্ন। কাজেই সেই ঈশ্বরীয় সত্তা এবং শক্তিকে আরাধনা করে ক'জন? আমরা তো কল্পনায় ঈশ্বরকে বানিয়ে নিয়ে পূজা করছি, অসীমকে সীমার মধ্যে কল্পনা ক'রে পূজা করছি, কিন্তু পাচ্ছি কি? মেলাতে পারছি কি? 'সীমার মাঝে অসীম তুমি কর নিত্যবাস।' কিন্তু সীমাকে ধরে কি অসীমকে অনুভব করতে পারছি? যতক্ষণ আশা আছে ততক্ষণ আমাদের নিরাশাও আছে। কাজেই আশাকে যদি চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিই তবেই পূর্ণতা লাভ হবে। চৈতন্যই আশা, আশাই চৈতন্য—এই বোধে তো আমাদের সমস্ত বিকার শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা আশাকে পৃথক করে রাখি। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলি, ঠাকুর তুমি আমার এই করে দিও। ঠাকুর তুমি এই বিপদ থেকে এবারের মতো আমাকে রক্ষা কর। ঠাকুর আর পারছি না, তুমি শিগগিরি একটা কিছু ব্যবস্থা কর। তার মানে আমরা 'আমি-আমারকে' পোষণ করছি, ঠাকুরকে চাইছি না। কিন্তু এর

থেকে মানুষ কী ক'রে উদ্ধার পাবে? কারণ ধর্মজগৎ এই সকামের সাধনায় মানুষকে engage করে রেখেছে। সেইজন্য ক্রিয়াকলাপ, পূজাপার্বণাদির যথার্থ নিয়ম আমরা না-জেনে আন্দাজে অভ্যাস করছি আমাদের ইচ্ছা, সাধ-আহ্লাদ, কল্পনা, কামনাবাসনা সবকিছুকে পূরণ করার জন্য। তা পূরণ হলে আবার আরেকটা অভাব জাগছে। তখন আবার তা পূরণ করতে চাইছি। সেইজন্যই বলা হয়েছে, desire is infinite, desire is insatiable, it is ignorance, desire is never appeased—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।।"

কামনাকে ভোগের দ্বারা তুমি নিবৃত্ত করতে পারবে না, শান্ত করতে পারবে না। যেমন "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব", অর্থাৎ আগুনের মধ্যে ঘি দিলে তা বেড়ে যায়, কমে না। কাজেই আমাদের ইন্দ্রিয়-মনের যে সাধ-আহ্লাদ তা পূরণ করতে গিয়ে আমরা সারাজীবন কষ্ট পাচ্ছি। তা কতটুকু পূরণ হচ্ছে? একটু হলে আরও শতগুণে তা বাড়ছে। আর যদি প্রতিহত হয় তখন মন ক্ষেপে যাচ্ছে। তাই বলা হয়েছে, "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।" সঙ্গের থেকে কামনা আসে, যে জিনিসের সঙ্গ করছ তার থেকে কামনা আসে। বস্তুর সঙ্গ করলে বস্তু পেতে চাইবে, ব্যক্তির সঙ্গ করলে ব্যক্তিকে দখলে পেতে চাইবে। এরকমভাবে আমরা যার সঙ্গ করি তাকেই পেতে চাই। কাম যখন প্রতিহত হয় বা বাধা পায়, অর্থাৎ পূরণ না-হয় তখন কিন্তু মন ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, ক্রোধ জেগে ওঠে, কাজেই "ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ"। ক্রোধ এলে কী হয়? আমাদের ভিতরে কতগুলো secretion হয়, glandular secretion হয় অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন gland থেকে secretion হয়। তার ফলে আমাদের nerves-গুলো shattered হয়ে যায়। ক্রোধের পরে দুর্বলতা আসে, একটা excitement-এর পরে যা হয়, অর্থাৎ pressure বেড়ে যায়, pulse beat বেড়ে যায়, দম ফেলতে পারে না ইত্যাদি, ইত্যাদি। সম্মোহন বা infatuation আসে ক্রোধের পরে। তা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিস্তেজ করে দেয়। "সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ", তার ফলে আমাদের স্মৃতি বা স্মরণশক্তি আবৃত হয়ে যায়। "স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো", স্মৃতি যখন ধ্বংস হয়ে যায় তখন বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধি এই দেহকে চালায়, এই দেহের রাজা হল বুদ্ধি, pilot হল বুদ্ধি। এই বুদ্ধি যখন নাশ হল তখন জীবন শেষ হয়ে গেল—"বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"। এগুলো formula, কিন্তু এগুলো মুখস্থ করার জিনিস নয়, অনুভব করার জিনিস।

শাস্ত্র পড়ে এগুলো অনুভব করা যায় না, তাতে বরং অহংকার বেড়ে যায়। তখন লোকে মনে করে, আমি শাস্ত্র পড়ি। আমি অনেককিছু জানি! সবাই তা জানে না। এই ভেদজ্ঞান আরও বেড়ে যায়। সাধনভজন যারা করে তারা মনে করে, আমিই শ্রেষ্ঠ! এর ফলে কী হয়? সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। বর্তমান যুগে তা বেশি দেখা যায়। 'এর' কাছে বহুলোক এসেছে, তারা 'একে' অভিযোগ করেছে যে, আপনারা কী ধর্ম শিক্ষা দেন যার ফলে বাড়িতে এত অশান্তি! তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কী হয়েছে? তখন তারা বলল, বাড়ির অমুক দীক্ষা নিয়ে এসেছে কোথা থেকে আর তাই নিয়ে রাতদিন বাড়াবাড়ি করছে—এই চলবে না!

ঐ চলবে না! বাড়িতে সবার সঙ্গে দ্বন্দ্ব। তখন তাকে বলা হল, সত্যিই তো! একে তো ধর্ম বলে না। কিন্তু এই রকম ধর্ম আমাদের face করতে হচ্ছে সবাইকে। যাঁরা দীক্ষা দিচ্ছেন তাঁরা কোনও কিছু ভেবে দিচ্ছেন না, দেখছেনও না যে, তিনি যে উপদেশটা দিলেন তা শিষ্যের পক্ষে কতখানি কার্যকরী। কতখানি সে সফল হবে, কোন পরিবেশে সে বাস করে, তার কী সংস্কার, তার বাড়িতে ক'জন member, তাদের কী nature—কিছুই জানা নেই। যে আসছে তাকেই টেনে নিয়ে দীক্ষা দিয়ে দিচ্ছেন। কীসের জন্য? তাঁর number of শিষ্য বাড়াতে হবে তো! প্রচুর শিষ্য হলে তবে তো তিনি লোকের কাছে বলবেন যে, আমার এত লক্ষ শিষ্য! তিনিই না কী সবচেয়ে বড় গুরু! কথাপ্রসঙ্গে তাদের আরও বলা হয়েছিল যে, 'এ' গুরু-শিষ্যের সংবাদ কিন্তু এইভাবে বলেনি। 'এর' বক্তব্য হল, ভগবানের ভক্ত ভগবান স্বয়ং। ভগবানের মধ্যে দ্বিতীয় কেউ নেই যে ভগবানকে আলাদা করে জানবে। তাহলে ভগবান হয়ে যান just like an object of knowledge! আত্মার কোনও প্রতিপক্ষ নেই, duplicate নেই, substitute নেই, alternative নেই। কাজেই God is really God। কিন্তু সৃষ্টি আর সৃষ্টির বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁকে সবাই আলাদা করে দেখছে। আবার বলছে God বা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করে কোথায় আছেন? তিনি মহাশূন্যে স্বর্গে আছেন। কোথায় সেই স্বর্গ? এই প্রশ্ন করাতে তারা বলেছিল, তা তো জানি না! তখন তাদের বলা হয়েছিল, কী ধর্ম কর তোমরা? এই জন্যই ধর্মকে attack করে বহু লোক সমালোচনা করছে। 'একে' আঘাত কম দেয়নি। উত্তরে তাদের বলা হয়েছিল, দেখ 'এ' কিন্তু সত্যিই ধর্ম কিছু করে না। তোমরা বিশ্বাস কর এই কথা! 'এ' শুধু আমিবোধে বাস করে, এর বেশি কিছু বলতে পারবে না।

'এ' সবাইকে বলে, তুমি তো 'আমিবোধেই' বাস করছ, কিন্তু তুমি তা জান না, কারণ তুমি মান না। মানলে তুমিও জানবে। আত্মা কোনও ক্রিয়াকলাপের অধীন নয়। আত্মার জন্য কোনও সাধন নেই। সাধন করে মন/অহংকার (কাঁচা আমি) তার কল্পিত সাধ বা কামনা পূরণের জন্য। আত্মা স্বয়ংপূর্ণ বলে সর্ব সাধনার অতীত। "স্ববেদনে কা নিয়মাদি অবস্থাঃ।" স্ববেদন মানে কী? আপন আত্মবোধের জন্য আবার কোন বোধের দরকার হবে? সূর্যকে দেখার জন্য কি হ্যারিকেন নিয়ে দেখতে হবে যে সূর্য উঠেছে কি ওঠেনি? কাজেই 'এর' বক্তব্য বর্তমান যুগের মানুষ মানতে পারবে না। 'একে' বহুরকম কথা শুনতে হবে সবার কাছে। যখন উত্তর দেওয়া হয় তখন তারা আর দ্বিতীয়বার আসে না। তারা বাইরে থেকেই সমালোচনা করে। তাদের বলা হয়েছে, দেখ 'এ' সমালোচনা শুনে মানে, কারণ তাও আমি। কাজেই 'এর' তো প্রতিবাদ করার কিছু নেই। কাকে প্রতিবাদ করবে? অতিবড় নিকৃষ্ট তার মধ্যেও সেই একই 'চৈতন্য', তা তো সেই 'আমিই'। যার জন্য একসময় বলা হয়েছিল, তোমরা যাকে সবচাইতে নিকৃষ্ট বলছ, মানে worse than the worst, that also verily is Self-I and better than the best is also verily Self-I। 'অণোরণীয়ান, মহতোমহীয়ান'—সবকিছু জুড়েই হল সেই 'আমি'। তা কোন আমি? তা 'পাকা আমি অহংদেব'। 'আমি' আমিশূন্য হয় না। সেই 'আমি', 'এক আমি' ছাড়া দ্বিতীয় কিছু দেখে না ও মানে না। যে

আমি শুধু আমিকেই মানে, এই আমিকেই জানে এবং অন্যকিছু জানার প্রয়োজন থাকে না 'সেই আমি'। 'সেই আমি' তোমাদের মধ্যেই রয়েছে। That is verily your true nature, but your false nature is wrongly identified with your physical body, senses, mind and intellect. তা কিন্তু সবসময় separate entity-কে maintain করতে চায়। সে তার individuality-কে maintain করতে চায় এবং অপরকে সেইজন্য বিরোধিতা করে সময়সুযোগমতো। আবার যখন প্রয়োজন তখন সে অন্যকে তোয়াজ করে, কাউকে প্রশংসা করে আবার কখনও কারও against-এ বলে, কাউকে গালাগালি দেয়, কাউকে দরকার হলে আঘাত করে। এই হল sense of individuality অর্থাৎ পৃথক যে অহংকার সেই অহংকারের এই হল বৈশিষ্ট্য বা characteristics।

অহং-এর সঙ্গে অহংকারকে মানুষ গুলিয়ে ফেলে। অহং আর অহংকার এককথা নয়। কুম্ভকার কুম্ভ তৈরি করে, ঘট পট তৈরি করে। কর্মকার কর্ম করে, কিন্তু কর্মকার কি চিরকালই কর্মকারই থাকবে? শূন্যকুম্ভ আর কুম্ভশূন্য দুটো কথা যদি বলা হয় তার অর্থ কি এক? সেইরকম অহংকারশূন্য আর শূন্য অহংকার দুটোর এক অর্থ নয়। 'শূন্য অশূন্য যেখানে শূন্য সেখানে আমি নিত্যপূর্ণ।' কথাটা কিন্তু একেবারে directly focus করা হচ্ছে। I Absolute is ever-perfect, self-evident, ever-present, all positive and negative expressions that our intellect or sense of individuality perceives। কাঁচা আমি সবকিছু পৃথক করে দেখলেও পৃথকের তত্ত্বত কোনও অস্তিত্ব নেই। তা হল কাঁচা আমি-র স্বপ্নবিলাস, কেননা মন দিয়ে তা দেখছে। বোধ দিয়ে দেখলে কিন্তু পৃথক দেখবে না। 'এর' কথাগুলো ভাল করে মন দিয়ে শুনবার চেষ্টা কর। আমরা ভেদ দেখি মন দিয়ে সবকিছুকে দেখি বলে। কিন্তু বোধস্বরূপ দিয়ে যখন দেখবে তখন ভেদ থাকবে না, সেখানে সব One—all contradictions, all duality, all variations dissolve and only Oneness prevails। অদ্বৈত জেগে উঠল। That is Absolute Reality. মন হল চিদাভাসের প্রকাশ, দ্বৈত বহুত্ব ভাবের বিলাসে পূর্ণ। অপরপক্ষে বোধ হল বোধস্বরূপ স্বয়ং নিত্য অদ্বৈত গগনোপম সমরসসার।

যদি culture-এর কথা বলে মানুষ, তবে কার culture করছে সে? মানুষ তো করছে duality-র culture। কীসের জন্য? In order to please his mind, imaginary mind, তার ফলে reaction তাকে ভোগ করতে হচ্ছে, contradiction ভোগ করতে হচ্ছে এবং suffer করতে হচ্ছে। Suffering-টা কোথায় শেষ? যেখানে মৃত্যুরও মৃত্যু হয়েছে অর্থাৎ 'দুই যেখানে নেই দ্বন্দ্ব সেখানে নেই'। সেই এক-এ কী আছে? এক-এ দ্বৈতভাববোধের একান্ত অভাব। সেখানে দ্বন্দ্ব নেই, subject নেই, object নেই, outer নেই, inner নেই, central নেই, transcendental নেই। তাহলে কী আছে? All-pervading One Reality. All-perfect Reality is of homogeneous nature which is *Saccidananda Akhanda Purna*. আজকে গানগুলোর মধ্যে দিয়ে আত্মার মহিমাকে প্রকাশ করা হয়েছে। কথাপ্রসঙ্গে পূর্বে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে একটি গানের মাধ্যমে—

'অমর আত্মা সচ্চিদানন্দ নিত্যসত্তা ভূমা অখণ্ড। আপনাতে স্বয়ং আপনি বিরাজে স্বভাব ঐশ্বর্যে স্ববোধ মাধুর্যে.....।' আর একটি গানে আছে ঃ

ধন্য ধন্য ধন্য আমি ধন্য আমি ধন্য
স্বানুভবসিদ্ধ আমি স্বাত্মবোধে পূর্ণ।।
ধন্য ধন্য ধন্য আমি ধন্য আমি ধন্য
স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত ব্রহ্মানন্দ পূর্ণ।।
ধন্য ধন্য ধন্য আমি ধন্য আমি ধন্য
সংসার দুঃখশূন্য আমি অজ্ঞান-মোহশূন্য।
ধন্য ধন্য ধন্য আমি ধন্য আমি ধন্য
নাহি মম কর্তব্য আর নাহি কোন কর্ম।।
ধন্য ধন্য ধন্য আমি ধন্য আমি ধন্য
নাহি মম কৃতাকৃত্য নাহি পুণ্য অপুণ্য।।
ধন্য ধন্য ধন্য আমি ধন্য আমি ধন্য
সাধ্য সাধন নাহি মম নাহি ধর্ম অধর্ম।।
ধন্য ধন্য ধন্য আমি ধন্য আমি ধন্য
ভাবাতীত নিত্যতৃপ্ত ভেদাতীত অনুপম।
ধন্য ধন্য ধন্য আমি ধন্য আমি ধন্য
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ মম অদ্বয় অব্যয় অনন্য।।
ধন্য ধন্য ধন্য আমি ধন্য আমি ধন্য
পুনঃপুনঃ ধন্য অহো পুনঃপুনঃ ধন্য।।

(কীর্তন—ঝাঁপতাল)

মন্তব্য ঃ

পঞ্চদশ বিচারের পরিণাম হল ষোড়শ বিচার। এই ষোড়শ বিচারের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল পূর্বোক্ত সর্ব বিচারের পূর্ণ সমাধান। এই বিচারের মূল বিষয়ই হল সচ্চিদানন্দ ভূমাতত্ত্ব অহংদেব পাকা আমি ব্রহ্ম-আত্মা। তাঁর সচ্চিদানন্দস্বরূপের বক্ষে সচ্চিদানন্দের স্বভাব লীলায়িত হয় শক্তির ত্রিবিধ ইচ্ছার মাধ্যমে। তার ত্রিবিধ ইচ্ছাই হল আপনবক্ষে আপন সৎ-চিৎ-আনন্দ ভাব ও বোধের লীলাবিলাস। আমি নিত্য অদ্বয় বহু হয়ে বহুর মাঝে নিজেকে আমি আস্বাদন করব। সেইজন্য স্ববোধবক্ষে স্বভাবের উদয় হল। স্বভাবের ইচ্ছা বহু আমি সেজে অহংকারের বেশে তাদের মাঝে স্বভাবের ইচ্ছাকে প্রসারিত ক'রে ছড়িয়ে দেব কর্মের মাধ্যমে, জ্ঞানের ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের জানব, অনুভব করব এবং ভাবের মিলন দ্বারা আপন আস্বাদনকে আপনার মধ্যে মিলিয়ে নেব।

সত্তার আমি, স্ববোধের আমি, পাকা আমি এবং শক্তির আমি স্বভাবের আমি, কাঁচা আমি। স্ববোধের আমি বোধধর্মী এবং স্বভাবের আমি মনোধর্মী। মনের বৃত্তিগুলি হল ভাব,

গুণ ও উপাধি। তা বিসম, বিকারী, পরিণামী, কিন্তু ইন্দ্রিয়-মনের প্রিয় ও গ্রাহ্য বিষয়। সবার মধ্যেই বোধের আমি-র অধিষ্ঠান নিত্যবর্তমান। তাঁর জ্যোতিতেই সব প্রকাশমান, সে-ই অবভাসক কিন্তু সাক্ষিচৈতন্যরূপে সবসময়ই সমানে থাকে। মনোধর্ম বৈচিত্র্যপ্রধান বলে বৈচিত্র্য কল্পনা ক'রে গুণ-উপাধিযোগে জগৎ মেলা রচনা করে যাদুকরের ইন্দ্রজালবৎ। তা আস্বাদন করতে গিয়ে স্ববিরুদ্ধ ভাবের বিপাকে প'ড়ে কষ্ট পায়। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির চক্রে চোখ ঢাকা কলুর বলদের মতো বহু জন্ম ঘুরে বেড়ায়। জ্ঞানের অভাবে অল্প জ্ঞানে, অল্প সুখে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে। আবার স্বভাবের তাড়নায় কাঁচা আমি অহংকার জরা-ব্যাধি-জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ থেকে মুক্ত হতে চায়। তখন সে পাকা আমি-র শরণ নেয়। পাকা আমি-র সঙ্গ ক'রে তাঁর অনুগ্রহে কাঁচা আমি-র স্বভাবের উত্তরণ হয় এবং স্ববোধে প্রতিষ্ঠা হয়।

ষোলোটি বিচারের মাধ্যমে আমিতত্ত্বের গুপ্ত রহস্যকে আমি-র কাছে আমি প্রকাশ ক'রে আমি-র নিত্য পূর্ণ স্বরূপকে এক অভিনব ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করল। তাতে আমি আদি, আমি মধ্য, আমি অন্ত। এই আমি সচ্চিদানন্দঘন পরমসত্য পরমতত্ত্ব সর্বসংপ্রাপ্তিস্বরূপ নিজবোধ আপনবোধ স্ববোধের পরিচয়। এই প্রজ্ঞানঘন আমি তার আপনবোধের বিজ্ঞানমাধ্যমে আপনবোধের বিলাসকে আপন স্বভাবজাত চিদাভাসরূপী জীবের কাছে নানাবিধ অনুভূতি ও ভাবের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিয়ে বৈচিত্র্যময় নাম-রূপের যে বিস্তার তার পূর্ণ সমাধান স্ববোধ বা আপনবোধ দিয়ে অতি চিত্তাকর্ষক ও মনোরম ভাবে প্রকাশ ক'রে স্বমহিমায় স্বয়ং মহিমান্বিত হয়ে স্বস্বরূপের পাকা আমি-র সত্য পরিচয়কে সহজ সরল উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল সমগ্র ব্যষ্টি আমি, কাঁচা আমি-র সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকল্যাণ শুভ অমৃত মুক্তি শান্তির উদ্দেশ্যে।

'এ' আনন্দ দিয়ে প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছিল, এই আনন্দ দিয়েই শেষ করা হচ্ছে। কেননা আদিতে আনন্দ, মধ্যে আনন্দ এবং অন্তে আনন্দ। তাহলে মাঝখানে তোমাদের নিরানন্দকে কী করে সরিয়ে দেওয়া যায় আজকের বক্তব্যের মধ্যে শুধু তার বিজ্ঞানটাই রয়েছে। যদি তা কারও ভাল লাগে তবে নিশ্চয়ই সে তা অনুভব করবে আর মন্দ লাগলে বাদ দিয়ে দেবে। আজকে আর বেশি সময় নেই, কাজেই কিছুক্ষণ পরেই সচ্চিদানন্দ করতে হবে। এর পরে আর বোধহয় বসা সম্ভব হবে না। তবে যারা এখানে শুনতে এসেছে 'এ' কিন্তু তাদেরকে উদ্দেশ করে কিছু বলেনি, 'আমি আমিকেই' বলেছে, সে-ই শুনেছে। তার বেশি 'এ' আর কিছু জানে না। 'এই আমি-র' কিন্তু আদি-অন্ত নেই। নিজেকে তুমি সসীম ভেবে কষ্ট পাবে শুধু, অনন্ত অসীম অখণ্ড ভাবলে কষ্ট সরে যাবে। তা-ই খুব ছোট করে বলা হল যাতে সহজেই তা তোমরা মনে রাখতে পার। আমি দেহের অধীন নই, ইন্দ্রিয়-প্রাণের অধীন নই, মন-বুদ্ধির অধীন নই, অহংকারের অধীন নই এবং আমি প্রকৃতির অধীন নই, এগুলো সবই আমার (আমি-র) দ্বারাই প্রকাশিত হচ্ছে। আমি এদের প্রকাশক, 'I' is the reflector and revealer of all, অর্থাৎ আমি এগুলোর অবভাসক। এই কথাটা নিশ্চয়ই মনে রাখা খুব কঠিন নয় যে, আমি কোনও কিছুর অধীন নই। অর্থাৎ দুঃখ আমার নয়, জন্ম-মৃত্যুও আমার নয়। এই pair of opposites-কে বলা হয় মনোধর্ম।

মনের দুটো ভাব আছে—একটা হল সৎ এবং আরেকটা হল অসৎ; একটা চিৎ এবং আরেকটা অচিৎ; একটা আনন্দ এবং আরেকটা নিরানন্দ; একটা এক এবং আরেকটা বহু; একটা সুখ এবং আরেকটা দুঃখ; একটা জ্ঞান এবং আরেকটা অজ্ঞান; একটা আমি এবং আরেকটা আমার। এইরূপ দ্বন্দ্ব বা pair of opposites নিয়ে মন খেলা করে। কিন্তু দুই-এর মধ্যে তুমি সবসময় ছিলে, আছ এবং থাকবে। আবার তুমি দুই-এর অতীত না-হলে দুই-এর মধ্যে সবসময় থাকবে কী করে? নিজেকে একটু assert করে ভাবতে চেষ্টা করলেই কিন্তু এগুলো প্রকাশ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা সবসময়ই সব জিনিসকে আমাদের ইন্দ্রিয়-মনের মধ্যে নিয়ে এসে তার অধীনে পেতে চাই। এই হল অজ্ঞানক্রিয়া অর্থাৎ নিজেকে বস্তু-ব্যক্তি-কর্ম-কালের অধীনে যুক্ত রাখতে চাই আমরা। এই হল অজ্ঞানের খেলা। আসলে এই অজ্ঞানের নিজস্ব কোনও অস্তিত্ব নেই, তা জ্ঞানাভাস দ্বারাই প্রতিভাত হচ্ছে। জ্ঞানাভাসেরও নিজস্ব কোনও অস্তিত্ব নেই, তা জ্ঞানসত্তার দ্বারা প্রতিভাত হচ্ছে। জ্ঞানসত্তা স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ।

'এ' কোনও মতপথের কথা তোমাদের কাছে বলেনি, কেননা 'এর' নিজস্ব কোনও মতপথ নেই। 'এ' অন্যান্য মত-পথকেও আঘাত করেনি, 'এ' শুধু তোমাদের স্বরূপের কথাই সামনে রেখেছে। 'যে আমি আমাতে সেই আমি সবার আমিতে।' 'যে আমি সবার আমিতে সেই আমি আমার আমিতে।' 'এ' অহংকারের কথা বলেনি। অহংকার তোমার specific কতগুলি thoughts-কে maintain করছে। আর অহংদেব সেই infinite-কে maintain করছে। কাজেই তুমি infinite ছেড়ে finite-এর ঘরে যাবে কেন? ভুল করে গেলেও সেই ভুল শোধন করা সম্বন্ধে তো অনেক কথা শুনলে, এর পরেও যদি যাও তাহলে কয়েকটা ধাক্কা খাবে। এই বক্তব্যগুলো তোমাদের মধ্যে কিন্তু হারিয়ে যাবে না। তা হল অব্যয় বীজ—imperishable seed of Consciousness। কেননা Consciousness-এর কোনও আদি-মধ্য-অন্ত নেই এবং নাশও নেই। 'এ' কিন্তু imaginary God সম্পর্কে কোনও কথা বলেনি। কেন না imagination-টাও নির্ভর করছে যার উপরে তা-ই হলে তুমি অর্থাৎ তোমার আমি। You are not mind but the source of mind, you are the essence of mind, you are the background of mind, you are the revealer of mind. কাজেই নিজেকে ছেড়ে তুমি পাবে কাকে? কাকে পাবে তুমি? অপরকে নিজের মতো করে তুমি কোনওদিনই পাবে না। বাইরের বস্তুকে তুমি যতই ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখ, এই ইন্দ্রিয়ের level-এ তা কখনও সমান হবে না। পৃথিবীর কোনও এক দেশ বাইরে সব সমান করতে গিয়ে ডিগবাজি খেয়ে মরল। আঙুলগুলো যদি সব সমান করে কেটে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু আর কাজ করা যাবে না। বাইরে অসমান থাকবেই। কাজেই এই অসমানের মধ্যে সমান হচ্ছে একমাত্র তুমি—তোমার আমি, কারণ আমিবোধেই তুমি নিজেকে ব্যবহার কর। অসমান হচ্ছে দৃশ্যাদি। মনের মধ্যে তোমার কী আছে? জগৎ। জগতের মধ্যে আছে মন। 'মনোদয়ে জগতের উদয়, মনোলয়ে জগতের লয়।' জগৎ মানে all bundle of contradiction। কাজেই মনকে

পোষণ করলে জগৎকেই পোষণ করা হয়। তাতে কিন্তু তুমি নিজের আমিকে দিয়েই নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। কিন্তু যখন তুমি আমিকে স্মরণ করছ তখন আমার সরে যেতে বাধ্য। কেননা 'আমার' কখনও আমিকে প্রকাশ করতে পারে না। আমিই আমার-কে প্রকাশ করে।

কে এই আমি? যে সবকিছুকে প্রকাশ কবে সেই আমি। 'একে' অনেকে প্রশ্ন করেছে এসে যে, who am I? উত্তরে 'এ' বলেছে, এই কথাটাই তো তুমি। এ কথা শুনে তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, এর মানে! তখন তাদের উত্তরে বলা হয়েছিল, প্রশ্ন করছে কে? Who is asking? Who am I? The answer is in your word. তোমার কথার মধ্যেই তোমার প্রশ্নের উত্তর বা answer নিহিত আছে। তারপর অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলে শেষে মাথা নিচু করে নিল। তখন ভাবল যে, এ তো মহামুশকিলে পড়ে গেলাম! আমি তো নিজের কথাকে আর খণ্ডন করতে পাবছি না। আমিই বলছি আমি কে? কীরকম কথা এটা! আমি কে —এই কথাটা কে বলছে? আমিই তো বলছে। আমি কে? আমিই। তখন তারা বলল যে, আপনি উকিল হলে ভাল করতেন, একেবারে supreme court-এর supreme judge হতে পারতেন। উত্তরে তখন তাদের বলা হল, কোনও পদের লালসা 'এর' কোনওদিনই ছিল না। 'এ' পরমপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এইরকম বিকৃতপদ 'এ' কোনওদিনই দখল করতে ইচ্ছুক নয়। যে পদ আজ আছে কাল নেই, সেই পদ নিযে 'এ' কী করবে? সেই পদের 'এর' কোনও প্রয়োজন নেই। যাই হোক, সচ্চিদানন্দস্বরূপের পরিচয় সচ্চিদানন্দের কাছেই প্রকাশ করা হল। সবাই সচ্চিদানন্দেরই এক একটি embodiment। এখন সচ্চিদানন্দ বুঝবে কী করবে বা না-করবে! জয় সচ্চিদানন্দ অহংদেব পাকা আমি-র জয়।

১৮/০১/০২

সচ্চিদানন্দঘন ওঁ তৎ সৎ ওঁ